প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

অষ্টম ভাগ।

১৩১৫

কলিকাতা।

মূল্য তিন টাকা ছয় আনা।

বিষয়ের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

চিত্র সূচী।

সূচীপত্র।

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনার বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

করুণা।

লেনার্ডো ডাভিন্সি কর্ত্তৃক অঙ্কিত ঈশার চিত্র হইতে।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

৮ম ভাগ। | কার্ত্তিক, ১৩১৫। | ৭ম সংখ্যা।

গোরা।

৩৩

বিনয় তখনি আনন্দময়ীর বাড়ীর দিকে চলিল। লজ্জায় বেদনায় মিশিয়া মনের মধ্যে ভারি একটা পীড়ন চলিতেছিল। এতক্ষণ কেন সে মার কাছে যায় নাই! কি ভুলই করিয়াছিল! সে মনে করিয়াছিল তাহাকে ললিতার বিশেষ প্রয়োজন আছে! সব প্রয়োজন অতিক্রম করিয়া সে যে কলিকাতায় আসিয়াই আনন্দময়ীর কাছে ছুটিয়া যায় নাই সেজন্য ঈশ্বর তাহাকে উপযুক্ত শাস্তিই দিয়াছেন! অবশেষে আজ ললিতার মুখ হইতে এমন প্রশ্ন শুনিতে হইল "গৌর বাবুর মার কাছে একবার যাবেন না?" কোনো এক মুহূর্ত্তেও এমন বিভ্রম ঘটিতে পারে যখন গৌর বাবুর মার কথা বিনয়ের চেয়ে ললিতার মনে বড় হইয়া উঠে! ললিতা তাঁহাকে গৌর বাবুর মা বলিয়া জানে মাত্র কিন্তু বিনয়ের কাছে তিনি যে জগতের সকল মায়ের একটি মাত্র প্রত্যক্ষ প্রতিমা।

তখন আনন্দময়ী সদ্য স্নান সারিয়া ঘরের মেঝেয় আসন পাতিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন;—বোধ করি বা মনে মনে জপ করিতেছিলেন। বিনয় তাড়াতাড়ি তাঁহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া কহিল—"মা।"

আনন্দময়ী তাহার অবলুণ্ঠিত মাথায় দুই হাত বুলাইয়া কহিলেন, "বিনয়!"

মার মত এমন কণ্ঠস্বর কার আছে! সেই কণ্ঠস্বরেই বিনয়ের সমস্ত শরীরে যেন করুণার স্পর্শ বহিয়া গেল। সে অশ্রুজল কষ্টে রোধ করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "মা, আমার দেরি হয়ে গেছে!"

আনন্দময়ী কহিলেন, "সব কথা শুনেছি বিনয়!"

বিনয় চকিত হইয়া উঠিয়া কহিল, "সব কথাই শুনেছ!"

গোরা হাজত হইতেই তাঁহাকে পত্র লিখিয়া উকিল বাবুর হাত দিয়া পাঠাইয়াছিল। সে যে জেলে যাইবে সেকথা সে নিশ্চয় অনুমান করিয়াছিল।

পত্রের শেষে ছিল—"কারাবাসে তোমার গোরার লেশমাত্র ক্ষতি করিতে পারিবে না। কিন্তু তুমি একটুও কষ্ট পাইলে চলিবে না। তোমার দুঃখই আমার দণ্ড, আমাকে আর কোনো দণ্ড ম্যাজিষ্ট্রেটের দিবার সাধ্য নাই। একা তোমার ছেলের কথা ভাবিও না মা, আরো অনেক মায়ের ছেলে বিনা দোষে জেল খাটিয়া থাকে, একবার তাহাদের কষ্টের সমান ক্ষেত্রে দাঁড়াইবার ইচ্ছা হইয়াছে; এই ইচ্ছা এবার যদি পূর্ণ হয় তুমি আমার জন্য ক্ষোভ করিও না।"

"মা, তোমার মনে আছে কি না জানি না, সেবার

দুর্ভিক্ষের বছরে আমার রাস্তার ধারের ঘরের টেবিলে আমার টাকার থলিটা রাখিয়া আমি পাঁচ মিনিটের জন্য অন্য ঘরে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি থলিটা চুরি গিয়াছে। থলিতে আমার স্কলারশিপের জমানো পঁচাশি টাকা ছিল; মনে সংকল্প করিয়াছিলাম আরো কিছু টাকা জমিলে তোমার পা ধোবার জলের জন্য একটি রূপার ঘটি তৈরি করাইয়া দিব। টাকা চুরি গেলে পর যখন চোরের প্রতি ব্যর্থ রাগে জ্বলিয়া মরিতেছিলাম তখন ঈশ্বর আমার মনে হঠাৎ একটা সুবুদ্ধি দিলেন; আমি মনে মনে কহিলাম, যে ব্যক্তি আমার টাকা লইয়াছে আজ দুর্ভিক্ষের দিনে তাহাকেই আমি সে টাকা দান করিলাম। যেমনি বলা অমনি আমার মনের নিষ্ফল ক্ষোভ সমস্ত শান্ত হইয়া গেল। আজ আমার মনকে আমি তেমনি করিয়া বলাইয়াছি যে, আমি ইচ্ছা করিয়াই জেলে যাইতেছি। আমার মনে কোনো কষ্ট নাই, কাহারো উপরে রাগ নাই। জেলে আমি আতিথ্য লইতে চলিলাম। সেখানে আহার বিহারের কষ্ট আছে—কিন্তু এবারে ভ্রমণের সময় নানা ঘরে আতিথ্য লইয়াছি; সে সকল জায়গাতে ত নিজের অভ্যাস ও আবশ্যকমত আরাম পাই নাই। ইচ্ছা করিয়া যাহা গ্রহণ করি সে কষ্ট ত কষ্টই নয়; জেলের আশ্রয় আজ আমি ইচ্ছা করিয়াই গ্রহণ করিব; যতদিন আমি জেলে থাকিব একদিনও কেহ আমাকে জোর করিয়া সেখানে রাখিবে না ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও।

পৃথিবীতে যখন আমরা ঘরে বসিয়া অনায়াসেই আহার বিহার করিতেছিলাম, বাহিরের আকাশ এবং আলোকে অবাধ সঞ্চরণের অধিকার যে কত বড় প্রকাণ্ড অধিকার তাহা অভ্যাসবশতঃ অনুভবমাত্র করিতে পারিতেছিলাম না সেই মুহূর্ত্তেই পৃথিবীর বহুতর মানুষই দোষে এবং বিনা দোষে ঈশ্বরদত্ত বিশ্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া যে বন্ধন এবং অপমান ভোগ করিতেছিল আজ পর্য্যন্ত তাহাদের কথা ভাবি নাই, তাহাদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই রাখি নাই—এবার আমি তাহাদের সমান দাগী হইয়া বাহির হইতে চাই; পৃথিবীর অধিকাংশ কৃত্রিম ভাল-মানুষ যাহারা ভদ্রলোক সাজিয়া বসিয়া আছে তাহাদের দলে ভিড়িয়া আমি সম্মান বাঁচাইয়া চলিতে চাই না।

মা, এবার পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় হইয়া আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে। ঈশ্বর জানেন পৃথিবীতে যাহারা বিচারের ভার লইয়াছে তাহারাই অধিকাংশ কৃপাপাত্র। যাহারা দণ্ড পায় না দণ্ড দেয়, তাহাদেরই পাপের শাস্তি জেলের কয়েদিরা ভোগ করিতেছে; অপরাধ গাড়িয়া তুলিতেছে অনেকে মিলিয়া, প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে ইহারাই। যাহারা জেলের বাহিরে আরামে আছে সম্মানে আছে তাহাদের পাপের ক্ষয় কবে কোথায় কেমন করিয়া হইবে তাহা জানি না। আমি সেই আরাম ও সম্মানকে ধিক্কার দিয়া মানুষের কলঙ্কের দাগ বুকে চিহ্নিত করিয়া বাহির হইব, মা তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, তুমি চোখের জল ফেলিও না। ভৃগু-পদাঘাতের চিহ্ন শ্রীকৃষ্ণ চিরদিন বক্ষে ধারণ করিয়াছেন; জগতে ঔদ্ধত্য যেখানে যত অন্যায় আঘাত করিতেছে ভগবানের বুকের সেই চিহ্নকেই গাঢ়তর করিতেছে। সেই চিহ্ন যদি তাঁর অলঙ্কার হয় তবে আমার ভাবনা কি, তোমারই বা দুঃখ কিসের?"—

এই চিঠি পাইয়া আনন্দময়ী মহিমকে গোরার কাছে পাঠাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহিম বলিল, আপিস্ আছে, সাহেব কোনোমতেই ছুটি দিবে না। বলিয়া গোরার অবিবেচনা ও ঔদ্ধত্য লইয়া তাহাকে যথেষ্ট গালি দিতে লাগিল, কহিল, উহার সম্পর্কে কোন্‌দিন আমার শুদ্ধ চাকরিটি যাইবে। আনন্দময়ী কৃষ্ণদয়ালকে এসম্বন্ধে কোনো কথা বলা অনাবশ্যক বোধ করিলেন। গোরা সম্বন্ধে স্বামীর প্রতি তাঁহার একটি মর্ম্মান্তিক অভিমান ছিল;—তিনি জানিতেন, কৃষ্ণদয়াল গোরাকে হৃদয়ের মধ্যে পুত্রের স্থান দেন নাই; এমন কি, গোরা সম্বন্ধে তাঁহার অন্তঃকরণে একটা বিরুদ্ধ ভাব ছিল। গোরা আনন্দময়ীর দাম্পত্য সম্বন্ধকে বিন্ধ্যাচলের মত বিভক্ত করিয়া মাঝখানে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার একধারে অতি সতর্ক শুদ্ধাচার লইয়া কৃষ্ণদয়াল একা, এবং তাহার অন্যপারে তাঁহার ম্লেচ্ছ গোরাকে লইয়া একাকিনী আনন্দময়ী। গোরার জীবনের ইতিহাস পৃথিবীতে যে দুজন জানে তাহাদের মাঝখানে যাতায়াতের পথ যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে সংসারে গোরার প্রতি আনন্দময়ীর স্নেহ নিতান্তই তাঁহার একলার ধন ছিল। এই পরিবারে

গোরার অনধিকারে অবস্থানকে তিনি সবদিক দিয়া যত হাল্কা করিয়া রাখা সম্ভব তাহার চেষ্টা করিতেন। পাছে কেহ বলে, তোমার গোরা হইতে এই ঘটিল, তোমার গোরার জন্য এই কথা শুনিতে হইল, অথবা তোমার গোরা আমাদের এই লোকসান করিয়া দিল, আনন্দময়ীর এই এক নিয়ত ভাবনা ছিল। গোরার সমস্ত দায় যে তাঁহারই! আবার তাঁহার গোরাও ত সামান্য দুরন্ত গোরা নয়! যেখানে সে থাকে সেখানে তাহার অস্তিত্ব গোপন করিয়া রাখা ত সহজ ব্যাপার নহে। এই তাঁহার কোলের ক্ষ্যাপা গোরাকে এই বিরুদ্ধ পরিবারের মাঝখানে এতদিন দিন-রাত্রি তিনি সামলাইয়া এতবড় করিয়া তুলিয়াছেন;—অনেক কথা শুনিয়াছেন যাহার কোনো জবাব দেন নাই, অনেক দুঃখ সহিয়াছেন যাহার অংশ আর কাহাকেও দিতে পারেন নাই।

আনন্দময়ী চুপ করিয়া জানলার কাছে বসিয়া রহিলেন;—দেখিলেন, কৃষ্ণদয়াল প্রাতঃস্নান সারিয়া ললাটে বাহুতে বক্ষে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ লাগাইয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে বাড়িতে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার কাছে আনন্দময়ী যাইতে পারিলেন না। নিষেধ, নিষেধ, নিষেধ, সর্ব্বত্রই নিষেধ। অবশেষে নিঃশ্বাস ফেলিয়া আনন্দময়ী উঠিয়া মহিমের ঘরে গেলেন। মহিম তখন মেঝের উপর বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, এবং তাঁহার ভৃত্য স্নানের পূর্ব্বে তাঁহার গায়ে তেল মালিশ করিয়া দিতেছিল। আনন্দময়ী তাঁহাকে কহিলেন, "মহিম, তুমি আমার সঙ্গে একজন লোক দাও, আমি যাই গোরার কি হল দেখে আসি। সে জেলে যাবে বলে মন স্থির করে বসে আছে; যদি তার জেল হয় আমি কি তার আগে তাকে একবার দেখে আসতে পারব না?"

মহিমের বাহিরের ব্যবহার যেমনি হউক, গোরার প্রতি তাঁহার একপ্রকারের স্নেহ ছিল। তিনি মুখে গর্জ্জন করিয়া গেলেন যে, "যাক্ লক্ষ্মীছাড়া জেলেই যাক্—এতদিন যায় নি, এই আশ্চর্য্য" এই বলিয়া পরক্ষণেই তাঁহাদের অনুগত পরাণ ঘোষালকে ডাকিয়া তাহার হাতে উকিল খরচার কিছু টাকা দিয়া তখনি তাহাকে রওনা করিয়া দিলেন এবং আপিসে গিয়া সাহেবের কাছে ছুটি যদি পান এবং বৌ যদি সম্মতি দেন তবে নিজেও সেখানে যাইবেন স্থির করিলেন।

আনন্দময়ীও জানিতেন, মহিম গোরার জন্য কিছু না করিয়া কখনো থাকিতে পারিবেন না। মহিম যথা-সম্ভব ব্যবস্থা করিয়াছেন শুনিয়া তিনি নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি স্পষ্টই জানিতেন গোরা যেখানে আছে সেই অপরিচিত স্থানে এই সঙ্কটের সময় লোকের কৌতুক কৌতূহল ও আলোচনার মুখে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে এ পরিবারে এমন কেহই নাই। তিনি চোখের দৃষ্টিতে নিঃশব্দ বেদনার ছায়া লইয়া ঠোঁটের উপর ঠোঁট চাপিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। লছমনিয়া যখন হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল তাহাকে তিরস্কার করিয়া অন্যঘরে পাঠাইয়া দিলেন। সমস্ত উদ্বেগ নিস্তব্ধভাবে পরিপাক করাই তাঁহার চিরদিনের অভ্যাস। সুখ ও দুঃখ উভয়কেই তিনি শান্তভাবেই গ্রহণ করিতেন, তাঁহার হৃদয়ের আক্ষেপ কেবল অন্তর্যামীরই গোচর ছিল।

বিনয় যে আনন্দময়ীকে কি বলিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু আনন্দময়ী কাহারো সান্ত্বনাবাক্যের কোনো অপেক্ষা রাখিতেন না;—তাঁহার যে দুঃখের কোনো প্রতিকার নাই সে দুঃখ লইয়া অন্যলোকে তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিতে আসিলে তাঁহার প্রকৃতি সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত। তিনি আর কোনো কথা উঠিতে না দিয়া বিনয়কে কহিলেন, "বিনু, এখনো তোমার স্নান হয় নি দেখ্‌ছি—যাও, শীঘ্র নেয়ে এস গে—অনেক বেলা হয়ে গেছে!"

বিনয় স্নান করিয়া আসিয়া যখন আহার করিতে বসিল তখন বিনয়ের পাশে গোরার স্থান শূন্য দেখিয়া আনন্দময়ীর বুকের মধ্যে হাহাকার উঠিল;—গোরাকে আজ জেলের অন্ন খাইতে হইতেছে, সে অন্ন নির্ম্মমশাসনের দ্বারা কটু, মায়ের সেবার দ্বারা মধুর নহে, এই কথা মনে করিয়া আনন্দময়ীকেও কোনো ছুতা করিয়া একবার উঠিয়া যাইতে হইল।

৩৪

বাড়ি আসিয়া অসময়ে ললিতাকে দেখিয়াই পরেশবাবু বুঝিতে পারিলেন তাঁহার এই উদ্দাম মেয়েটি অদ্ভুতপূর্ব্বরূপে

একটা কিছু কাণ্ড বাধাইয়াছে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তিনি তাহার মুখের দিকে চাহিতেই সে বলিয়া উঠিল, "বাবা, আমি চলে এসেছি। কোনো মতেই থাকতে পারলুম না।"

পরেশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কি হয়েচে?"

ললিতা কহিল—"গৌর বাবুকে ম্যাজিষ্ট্রেট জেলে দিয়েচে।"

গৌর ইহার মধ্যে কোথা হইতে আসিল কি হইল পরেশ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ললিতার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তৎক্ষণাৎ গোরার মার কথা মনে করিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে ভাবিতে লাগিলেন, একজন লোককে জেলে পাঠাইয়া কতকগুলি নিরপরাধ লোককে যে কিরূপ নিষ্ঠুর দণ্ড দেওয়া হয় সে কথা যদি বিচারক অন্তঃকরণের মধ্যে অনুভব করিতে পারিতেন তবে মানুষকে জেলে পাঠানো এত সহজ অভ্যস্ত কাজের মত কখনই হইতে পারিত না। একজন চোরকে যে দণ্ড দেওয়া গোরাকেও সেই দণ্ড দেওয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের পক্ষে যে সমান অনায়াসসাধ্য হইয়াছে এরূপ বর্ব্বরতা নিতান্তই ধর্ম্মবুদ্ধির অসাড়তা বশত সম্ভবপর হইতে পারিয়াছে। মানুষের প্রতি মানুষের দৌরাত্ম্য জগতের অন্য সমস্ত হিংস্রতার চেয়ে যে কত ভয়ানক, তাহার পশ্চাতে সমাজের শক্তি রাজার শক্তি দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে যে কিরূপ প্রচণ্ড প্রকাণ্ড করিয়া তুলিয়াছে গোরার কারাদণ্ডের কথা শুনিয়া তাহা তাঁহার চোখের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল।

পরেশ বাবুকে এইরূপ চুপ করিয়া ভাবিতে দেখিয়া ললিতা উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা, বাবা, এ ভয়ানক অন্যায় নয়?"

পরেশ বাবু তাঁহার স্বাভাবিক শান্তস্বরে কহিলেন—"গৌর যে কতখানি কি করেচে সেত আমরা ঠিক জানিনে; তবে এ কথা নিশ্চয় বলতে পারি গৌর তার কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রবলতার ঝোঁকে হয়ত হঠাৎ আপনার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করতে পারে কিন্তু ইংরেজি ভাষায় যাকে ক্রাইম্ বলে তা যে গোরার পক্ষে একেবারেই প্রকৃতিবিরুদ্ধ তাতে আমার মনে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু কি করবে মা—কালের ন্যায়বুদ্ধি এখনো সে পরিমাণে বিবেক লাভ করে নি। এখনো অপরাধের যে দণ্ড, ত্রুটিরও সেই দণ্ড; উভয়কেই একই জেলের একই ঘানি টান্‌তে হয়। এ রকম যে সম্ভব হয়েচে কোনো একজন মানুষকে সে জন্য দোষ দেওয়া যায় না। সমস্ত মানুষের পাপ এজন্য দায়ী।"

হঠাৎ এই প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া পরেশ বাবু জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, "তুমি কার সঙ্গে এলে?"

ললিতা বিশেষ একটু জোর করিয়া যেন খাড়া হইয়া কহিল, "বিনয় বাবুর সঙ্গে।"

বাহিরে যতই জোর দেখাক্ তাহার ভিতরে দুর্ব্বলতা ছিল। বিনয় বাবুর সঙ্গে আসিয়াছে এ কথাটা ললিতা বেশ সহজে বলিতে পারিল না—কোথা হইতে একটু লজ্জা আসিয়া পড়িল এবং সে লজ্জা মুখের ভাবে বাহির হইয়া পড়িতেছে মনে করিয়া তাহার লজ্জা আরো বাড়িয়া উঠিল।

পরেশ বাবু এই খামখেয়ালি দুর্জ্জয় মেয়েটিকে তাঁহার অন্যান্য সকল সন্তানের চেয়ে একটু বিশেষ স্নেহই করিতেন। ইহার ব্যবহার অন্যের কাছে নিন্দনীয় ছিল বলিয়াই ললিতার আচরণের মধ্যে যে একটি সত্যপরতা আছে সেইটিকে তিনি বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছেন। তিনি জানিতেন ললিতার যে দোষ সেইটেই বেশি করিয়া লোকের চোখে পড়িবে কিন্তু ইহার যে গুণ তাহা যতই দুর্লভ হউক না কেন লোকের কাছে আদর পাইবে না। পরেশ বাবু সেই গুণটিকে যত্নপূর্ব্বক সাবধানে আশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন;—ললিতার দুরন্ত প্রকৃতিকে দমন করিয়া সেই সঙ্গে তাহার ভিতরকার মহত্ত্বকেও দলিত করিতে তিনি চান নাই। তাঁহার অন্য দুইটি মেয়েকে দেখিবা মাত্রই সকলে সুন্দরী বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদের বর্ণ উজ্জ্বল, তাহাদের মুখের গড়নেও খুঁৎ নাই—কিন্তু ললিতার রং তাহাদের চেয়ে কালো, এবং তাহার মুখের কমনীয়তা সম্বন্ধে মতভেদ ঘটে। বরদাসুন্দরী সেইজন্য ললিতার পাত্র জোটা লইয়া সর্ব্বদাই স্বামীর নিকট উদ্বেগ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু পরেশ বাবু ললিতার মুখে যে একটি সৌন্দর্য্য দেখিতেন তাহা রঙের সৌন্দর্য্য নহে, গড়নের সৌন্দর্য্য নহে তাহা অন্তরের গভীর সৌন্দর্য্য। তাহার মধ্যে কেবলমাত্র লালিত্য নহে, স্বাতন্ত্র্যের তেজ এবং শক্তির দৃঢ়তা আছে—

সেই দৃঢ়তা সকলের মনোরম নহে। তাহা লোকবিশেষকে আকর্ষণ করে কিন্তু অনেককেই দূরে ঠেলিয়া রাখে। সংসারে ললিতা প্রিয় হইবে না কিন্তু খাঁটি হইবে ইহাই জানিয়া পরেশ বাবু কেমন একটু বেদনার সহিত ললিতাকে কাছে টানিয়া লইতেন—তাহাকে আর কেহ ক্ষমা করিতেছে না জানিয়াই তাহাকে করুণার সহিত বিচার করিতেন।

যখন পরেশ বাবু শুনিলেন, ললিতা একলা বিনয়ের সঙ্গে হঠাৎ চলিয়া আসিয়াছে তখন তিনি এক মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিলেন এজন্য ললিতাকে অনেকদিন ধরিয়া অনেক দুঃখ সহিতে হইবে; সে যে টুকু অপরাধ করিয়াছে লোকে তাহার চেয়ে বড় অপরাধের দণ্ড তাহার প্রতি বিধান করিবে। সেই কথাটা তিনি চুপ করিয়া ক্ষণকাল ভাবিতেছেন এমন সময় ললিতা বলিয়া উঠিল, "বাবা, আমি দোষ করেছি। কিন্তু এবার আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি যে, ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে আমাদের দেশের লোকের এমন সম্বন্ধ যে তাঁর আতিথ্যের মধ্যে কিছুই সম্মান নেই কেবলি অনুগ্রহ মাত্র। সেটা সহ্য করেও কি আমার সেখানে থাকা উচিত ছিল?"

পরেশ বাবুর কাছে প্রশ্নটি সহজ বলিয়া বোধ হইল না। তিনি কোনো উত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়া একটু হাসিয়া ললিতার মাথায় দক্ষিণ হস্ত দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া বলিলেন—"পাগ্‌লি!"

এই ঘটনা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে সেদিন অপরাহ্ণে পরেশ বাবু যখন বাড়ীর বাহিরে পায়চারি করিতেছিলেন এমন সময় বিনয় আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। পরেশ বাবু গোরার কারাদণ্ড সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করিলেন কিন্তু ললিতার সঙ্গে ষ্টীমারে আসার কোনো প্রসঙ্গই উত্থাপন করিলেন না। অন্ধকার হইয়া আসিলে কহিলেন "চল, বিনয়, ঘরে চল।"

বিনয় কহিল—"না, আমি এখন বাসায় যাব।"

পরেশ বাবু তাহাকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিলেন না। বিনয় একবার চকিতের মত দোতলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

উপর হইতে ললিতা বিনয়কে দেখিতে পাইয়াছিল। যখন পরেশ বাবু একলা ঘরে ঢুকিলেন তখন ললিতা মনে করিল বিনয় হয়ত আর একটু পরেই আসিবে। আর একটু পরেও বিনয় আসিল না। তখন টেবিলের উপরকার দুটো একটা বই ও কাগজচাপা নাড়াচাড়া করিয়া ললিতা ঘর হইতে চলিয়া গেল। পরেশ বাবু তাহাকে ফিরিয়া ডাকিলেন—তাহার বিষণ্ণমুখের দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া কহিলেন—"ললিতা আমাকে একটা ব্রহ্মসঙ্গীত শোনাও।" বলিয়া বাতিটা আড়াল করিয়া দিলেন।

৩৫

পরদিনে বরদাসুন্দরী এবং তাঁহাদের দলের বাকি সকলে আসিয়া পৌঁছিলেন। হারান বাবু ললিতা সম্বন্ধে তাঁহার বিরক্তি সম্বরণ করিতে না পারিয়া বাসায় না গিয়া ইহাদের সঙ্গে একেবারে পরেশ বাবুর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বরদাসুন্দরী ক্রোধে ও অভিমানে ললিতার দিকে না তাকাইয়া এবং তাহার সঙ্গে কোনো কথা না কহিয়া একেবারে তাঁহার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। লাবণ্য ও লীলাও ললিতার উপরে খুব রাগ করিয়া আসিয়াছিল। ললিতা এবং বিনয় চলিয়া আসাতে তাহাদের আবৃত্তি ও অভিনয় এমন অঙ্গহীন হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহাদের লজ্জার সীমা ছিল না। সুচরিতা, হারান বাবুর ক্রুদ্ধ ও কটু উত্তেজনায়, বরদাসুন্দরীর অশ্রুমিশ্রিত আক্ষেপে অথবা লাবণ্যলীলার লজ্জিত নিরুৎসাহে কিছুমাত্র যোগ না দিয়া একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া ছিল—তাহার নির্দ্দিষ্ট কাজটুকু সে কলের মত করিয়া গিয়াছিল। আজও সে যন্ত্রচালিতের মত সকলের পশ্চাতে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। সুধীর লজ্জায় এবং অনুতাপে সঙ্কুচিত হইয়া পরেশ বাবুর বাড়ীর দরজার কাছ হইতেই বাসায় চলিয়া গেল—লাবণ্য তাহাকে বাড়ীতে আসিবার জন্য বারবার অনুরোধ করিয়া কৃতকার্য্য না হইয়া তাহার প্রতি আড়ি করিল।

হারান পরেশ বাবুর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"একটা ভারি অন্যায় হয়ে গেছে!"

পাশের ঘরে ললিতা ছিল, তাহার কানে কথাটা প্রবেশ করিবা মাত্র সে আসিয়া তাহার বাবার চৌকির পৃষ্ঠদেশে দুই হাত রাখিয়া দাঁড়াইল এবং হারান বাবুর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

পরেশ বাবু কহিলেন, "আমি ললিতার কাছ থেকে সমস্ত সংবাদ শুনেছি। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে এখন আলোচনা করে কোনো ফল নেই।"

হারান শান্ত সংযত পরেশকে নিতান্ত দুর্ব্বলস্বভাব বলিয়া মনে করিতেন। তাই কিছু অবজ্ঞার ভাবে কহিলেন—"ঘটনা ত হয়ে চুকে যায় কিন্তু চরিত্র যে থাকে, সেই জন্যেই যা হয়ে যায় তারও আলোচনার প্রয়োজন আছে। ললিতা আজ যে কাজটি করেচে তা কখনই সম্ভব হত না যদি আপনার কাছে বরাবর প্রশ্রয় পেয়ে না আস্ত—আপনি ওর যে কতদূর অনিষ্ট করেচেন তা আজকের ব্যাপার সবটা শুন্‌লে স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারবেন।"

পরেশ বাবু পিছন দিকে তাঁহার চৌকির গাত্রে একটা ঈষৎ আন্দোলন অনুভব করিয়া তাড়াতাড়ি ললিতাকে তাঁহার পাশে টানিয়া আনিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন, এবং একটু হাসিয়া হারানকে কহিলেন, "পানু বাবু, যখন সময় আসবে তখন আপনি জান্‌তে পারবেন, সন্তানকে মানুষ করতে স্নেহেরও প্রয়োজন হয়।"

ললিতা এক হাতে তাহার পিতার গলা বেড়িয়া ধরিয়া নত হইয়া তাঁহার কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল—"বাবা, তোমার জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্চে তুমি নাইতে যাও!"

পরেশ বাবু হারানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন—"আরেকটু পরে যাবো—তেমন বেলা হয়নি।"

ললিতা স্নিগ্ধস্বরে কহিল, "না বাবা, তুমি স্নান করে এস—ততক্ষণ পানু বাবুর কাছে আমরা আছি।"

পরেশ বাবু যখন ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন তখন ললিতা একটা চৌকি অধিকার করিয়া দৃঢ় হইয়া বসিল এবং হারান বাবুর মুখের দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া কহিল—"আপনি মনে করেন সকলকেই আপনার সব কথা বল্‌বার অধিকার আছে!"

ললিতাকে সুচরিতা চিনিত। অন্যদিন হইলে ললিতার এরূপ মূর্ত্তি দেখিলে সে মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিত। আজ সে জানলার ধারের চৌকিতে বসিয়া একটা বই খুলিয়া চুপ করিয়া তাহার পাতার দিকে চাহিয়া রহিল। নিজেকে সম্বরণ করিয়া রাখাই সুচরিতার চিরদিনের স্বভাব ও অভ্যাস। এই কয়দিন ধরিয়া নানাপ্রকার আঘাতের বেদনা তাহার মনে যতই বেশি করিয়া সঞ্চিত হইতেছিল ততই সে আরো বেশি করিয়া নীরব হইয়া উঠিতেছিল। আজ তাহার এই নীরবতার ভার দুর্ব্বিষহ হইয়াছে—এই জন্য ললিতা যখন হারানের নিকট তাহার মন্তব্য প্রকাশ করিতে বসিল তখন সুচরিতার রুদ্ধ হৃদয়ের বেগ যেন মুক্তিলাভ করিবার অবসর পাইল।

ললিতা কহিল—"আমাদের সম্বন্ধে বাবার কি কর্ত্তব্য, আপনি মনে করেন, বাবার চেয়ে আপনি তা ভাল বোঝেন! সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের আপনিই হচ্চেন হেড্‌মাষ্টার!"

ললিতার এই প্রকার ঔদ্ধত্য দেখিয়া হারান বাবু প্রথমটা হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন। এইবার তিনি তাহাকে খুব একটা কড়া জবাব দিতে যাইতেছিলেন—ললিতা তাহাতে বাধা দিয়া তাঁহাকে কহিল—"এতদিন আপনার শ্রেষ্ঠতা আমরা অনেক সহ্য করেছি কিন্তু আপনি যদি বাবার চেয়েও বড় হতে চান তা হলে এবাড়িতে আপনাকে কেউ সহ্য করতে পারবে না—আমাদের বেয়ারাটা পর্য্যন্ত না।"

হারান বাবু বলিয়া উঠিলেন—"ললিতা তুমি"—

ললিতা তাঁহাকে বাধা দিয়া তীব্রস্বরে কহিল—"চুপ করুন। আপনার কথা আমরা অনেক শুনেছি আজ আমার কথাটা শুনুন্! যদি বিশ্বাস না করেন তবে সুচি দিদিকে জিজ্ঞাসা করবেন—আপনি নিজেকে যত বড় বলে কল্পনা করেন আমার বাবা তার চেয়ে অনেক বেশি বড়। এইবার আপনার যা কিছু উপদেশ আমাকে দেবার আছে আপনি দিয়ে যান্।"

হারান বাবুর মুখ কালো হইয়া উঠিল। তিনি চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কহিলেন—"সুচরিতা!"

সুচরিতা বইয়ের পাতা হইতে মুখ তুলিল। হারান বাবু কহিলেন—"তোমার সাম্‌নে ললিতা আমাকে অপমান করবে!"

সুচরিতা ধীরস্বরে কহিল, "আপনাকে অপমান করা ওর উদ্দেশ্য নয়—ললিতা বল্‌তে চায় বাবাকে আপনি সম্মান করে চল্‌বেন। তাঁর মত সম্মানের যোগ্য আমরা ত কাউকেই জানিনে!"

একবার মনে হইল হারান বাবু এখনি চৌকি ছাড়িয়া

উঠিয়া যাইবেন কিন্তু তিনি উঠিলেন না। মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া বসিয়া রহিলেন। এ বাড়ীতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার সম্ভ্রম নষ্ট হইতেছে ইহা তিনি যতই অনুভব করিতেছেন ততই তিনি এখানে আপন আসন দখল করিয়া বসিবার জন্য আরো বেশি পরিমাণে সচেষ্ট হইয়া উঠিতেছেন। ভুলিতেছেন যে, যে আশ্রয় জীর্ণ তাহাকে যতই জোরের সঙ্গে আঁকড়িয়া ধরা যায় তাহা ততই ভাঙিতে থাকে।

হারান বাবু রুষ্ট গাম্ভীর্য্যের সহিত চুপ করিয়া রহিলেন দেখিয়া ললিতা উঠিয়া গিয়া সুচরিতার পাশে বসিল এবং তাহার সঙ্গে মৃদুস্বরে এমন করিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিল যেন বিশেষ কিছুই ঘটে নাই।

ইতিমধ্যে সতীশ ঘরে ঢুকিয়া সুচরিতার হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, "বড় দিদি এস!"

সুচরিতা কহিল, "কোথায় যেতে হবে?"

সতীশ কহিল, "এস না, তোমাকে একটা জিনিষ দেখাব! ললিতা দিদি, তুমি বলে দাও নি?"

ললিতা কহিল, "না"।

তাহার মাসীর কথা ললিতা সুচরিতার কাছে ফাঁস করিয়া দিবে না সতীশের সঙ্গে এইরূপ কথা ছিল; ললিতা আপন প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছিল।

অতিথিকে ছাড়িয়া সুচরিতা যাইতে পারিল না— কহিল, "বক্তিয়ার, আর একটু পরে যাচ্চি—বাবা আগে স্নান করে আসুন।"

সতীশ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। কোনোমতে হারান বাবুকে বিলুপ্ত করিতে পারিলে সে চেষ্টার ত্রুটি করিত না। হারান বাবুকে সে অত্যন্ত ভয় করিত বলিয়া তাঁহাকে কোনো কথা বলিতে পারিল না। হারান বাবু মাঝে মাঝে সতীশের স্বভাব সংশোধনের চেষ্টা করা ছাড়া তাহার সঙ্গে আর কোনো প্রকার সংস্রব রাখেন নাই।

পরেশ বাবু স্নান করিয়া আসিবামাত্র সতীশ তাহার দুই দিদিকে টানিয়া লইয়া গেল।

হারান কহিলেন, "সুচরিতা সম্বন্ধে সেই যে প্রস্তাবটা ছিল, আমি আর বিলম্ব করতে চাইনে। আমার ইচ্ছা, আসচে রবিবারেই সে কাজটা হয়ে যায়।"

পরেশ বাবু কহিলেন, "আমার তাতে ত কোনো আপত্তি নেই, সুচরিতার মত হলেই হল।"

হারান। তাঁর ত মত পূর্ব্বেই নেওয়া হয়েচে।

পরেশ বাবু। আচ্ছা তবে সেই কথাই রইল।

৩৬

সেদিন ললিতার নিকট হইতে আসিয়া বিনয়ের মনের মধ্যে কাঁটার মত একটা সংশয় কেবলি ফিরিয়া ফিরিয়া বিঁধিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, "পরেশ বাবুর বাড়ীতে আমার যাওয়াটা কেহ ইচ্ছা করে বা না করে তাহা ঠিক না জানিয়া আমি গায়ে পড়িয়া সেখানে যাতায়াত করিতেছি। হয়ত সেটা উচিত নহে। হয়ত অনেকবার অসময়ে আমি ইহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছি। ইহাদের সমাজের নিয়ম আমি জানি না; এ বাড়ীতে আমার অধিকার যে কোন্ সীমা পর্য্যন্ত তাহা আমার কিছুই জানা নাই। আমি হয় ত মূঢ়ের মত এমন জায়গায় প্রবেশ করিতেছি যেখানে আত্মীয় ছাড়া কাহারো গতিবিধি নিষেধ!"

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহার মনে হইল ললিতা হয়ত আজ তাহার মুখের ভাবে এমন একটা কিছু দেখিতে পাইয়াছে যাহাতে সে অপমান বোধ করিয়াছে। ললিতার প্রতি বিনয়ের মনের ভাব যে কি এতদিন তাহা বিনয়ের কাছে স্পষ্ট ছিল না, আজ আর তাহা গোপন নাই। হৃদয়ের ভিতরকার এই নূতন অভিব্যক্তি লইয়া যে কি করিতে হইবে তাহা সে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। বাহিরের সঙ্গে ইহার যোগ কি, সংসারের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ কি, ইহা কি ললিতার প্রতি অসম্মান, ইহা কি পরেশ বাবুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, তাহা লইয়া সে সহস্রবার করিয়া তোলাপাড়া করিতে লাগিল। ললিতার কাছে সে ধরা পড়িয়া গেছে এবং সেই জন্যই ললিতা তাহার প্রতি রাগ করিয়াছে এই কথা কল্পনা করিয়া সে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল।

পরেশ বাবুর বাড়ী যাওয়া বিনয়ের পক্ষে অসম্ভব হইল এবং নিজের বাসার শূন্যতাও যেন একটা ভারের মত হইয়া তাহাকে চাপিতে লাগিল। পরদিন ভোরের বেলাই সে আনন্দময়ীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, "মা, কিছুদিন আমি তোমার এখানে থাকব।"

আনন্দময়ীকে গোরার বিচ্ছেদশোকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ও বিনয়ের মনের মধ্যে ছিল। তাহা বুঝিতে পারিয়া আনন্দময়ীর হৃদয় বিগলিত হইল। কোনো কথা না বলিয়া তিনি সস্নেহে একবার বিনয়ের গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন।

বিনয় তাহার খাওয়া দাওয়া সেবাশুশ্রূষা লইয়া বহুবিধ আবদার জুড়িয়া দিল। এখানে তাহার যথোচিত যত্ন হইতেছে না বলিয়া সে মাঝে মাঝে আনন্দময়ীর সঙ্গে মিথ্যা কলহ করিতে লাগিল। সর্ব্বদাই সে গোলমাল বকাবকি করিয়া আনন্দময়ীকে ও নিজেকে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিল। সন্ধ্যার সময় যখন মনকে বাঁধিয়া রাখা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইত, তখন বিনয় উৎপাত করিয়া আনন্দময়ীকে তাঁহার সকল গৃহকর্ম্ম হইতে ছিনাইয়া লইয়া ঘরের সম্মুখের বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসিত; আনন্দময়ীকে তাঁহার ছেলেবেলার কথা, তাঁহার বাপের বাড়ীর গল্প বলাইত; যখন তাঁহার বিবাহ হয় নাই, যখন তিনি তাঁহার অধ্যাপক পিতামহের টোলের ছাত্রদের অত্যন্ত আদরের শিশু ছিলেন, এবং পিতৃহীনা বালিকাকে সকলে মিলিয়া সকল বিষয়েই প্রশ্রয় দিত বলিয়া তাঁহার বিধবা-মাতার বিশেষ উদ্বেগের কারণ ছিলেন, সেই সকল দিনের কাহিনী। বিনয় বলিত, "মা, তুমি যে কোনো দিন আমাদের মা ছিলে না সে কথা মনে করলে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়। আমার বোধ হয় টোলের ছেলেরা তোমাকে তাদের খুব ছোটো এতটুকু মা বলেই জানত। তোমার দাদামশায়কে বোধ হয় তুমিই মানুষ করবার ভার নিয়েছিলে।"

একদিন সন্ধ্যাবেলায় মাদুরের উপরে প্রসারিত আনন্দময়ীর দুই পায়ের তলায় মাথা রাখিয়া বিনয় কহিল, "মা, ইচ্ছা করে আমার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি বিধাতাকে ফিরিয়ে দিয়ে শিশু হয়ে তোমার ঐ কোলে আশ্রয় গ্রহণ করি। কেবল তুমি, সংসারে তুমি ছাড়া আমার আর কিছুই না থাকে।"

বিনয়ের কণ্ঠে হৃদয়ভারাক্রান্ত একটা ক্লান্তি এমন করিয়া প্রকাশ পাইল যে আনন্দময়ী ব্যথার সঙ্গে বিস্ময় অনুভব করিলেন। তিনি বিনয়ের কাছে সরিয়া বসিয়া আস্তে আস্তে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনু, পরেশ বাবুদের বাড়ীর সব খবর ভাল ?"

এই প্রশ্নে হঠাৎ বিনয় লজ্জিত হইয়া চমকিয়া উঠিল। ভাবিল, "মার কাছে কিছুই লুকানো চলে না, মা আমার অন্তর্যামী।" কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, "হাঁ, তাঁরা ত সকলেই ভাল আছেন।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "আমার বড় ইচ্ছা করে পরেশ বাবুর মেয়েদের সঙ্গে আমার চেনা পরিচয় হয়। প্রথমে ত তাঁদের উপর গোরার মনের ভাব ভাল ছিল না কিন্তু ইদানীং তাকেসুদ্ধ যখন তাঁরা বশ করতে পেরেচেন তখন তাঁরা সামান্য লোক হবেন না।"

বিনয় উৎসাহিত হইয়া কহিল, "আমারো অনেক বার ইচ্ছা হয়েচে পরেশ বাবুর মেয়েদের সঙ্গে যদি কোনো-মতে তোমার আলাপ করিয়ে দিতে পারি। পাছে গোরা কিছু মনে করে বলে আমি কোনো কথা বলিনি।"

আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড় মেয়েটির নাম কি ?"

এইরূপ প্রশ্নোত্তরে পরিচয় চলিতে চলিতে যখন ললিতার প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়িল তখন বিনয় সেটাকে কোনোমতে সংক্ষেপে সারিয়া দিবার চেষ্টা করিল। আনন্দময়ী বাধা মানিলেন না। তিনি মনে মনে হাসিয়া কহিলেন, "শুনেচি ললিতার খুব বুদ্ধি।"

বিনয় কহিল, "তুমি কার কাছে শুনলে ?"

আনন্দময়ী কহিলেন—"কেন, তোমারি কাছে!"

পূর্ব্বে এমন এক সময় ছিল যখন ললিতার সম্বন্ধে বিনয়ের মনে কোনো প্রকার সঙ্কোচ ছিল না। সেই মোহমুক্ত অবস্থায় সে যে আনন্দময়ীর কাছে ললিতার তীক্ষ্ণবুদ্ধি লইয়া অবাধে আলোচনা করিয়াছিল সে কথা তাহার মনেই ছিলনা।

আনন্দময়ী সুনিপুণ মাঝির মত সমস্ত বাধা বাঁচাইয়া ললিতার কথা এমন করিয়া চালনা করিয়া লইয়া গেলেন যে বিনয়ের সঙ্গে তাহার পরিচয়ের ইতিহাসের প্রধান অংশগুলি প্রায় সমস্তই প্রকাশ হইল। গোরার কারাদণ্ডের ব্যাপারে ব্যথিত হইয়া ললিতা যে ষ্টীমারে একাকিনী

বিনয়ের সঙ্গে পলাইয়া আসিয়াছে সে কথাও বিনয় আজ বলিয়া ফেলিল। বলিতে বলিতে তাহার উৎসাহ বাড়িয়া উঠিল—যে অবসাদে সন্ধ্যাবেলায় তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছিল তাহা কোথায় কাটিয়া গেল! সে যে ললিতার মত এমন একটি আশ্চর্য্য চরিত্রকে জানিয়াছে এবং এমন করিয়া তাহার কথা কহিতে পারিতেছে ইহাই তাহার কাছে একটা পরম লাভ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। রাত্রে যখন আহারের সংবাদ আসিল এবং কথা ভাঙিয়া গেল—তখন হঠাৎ যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া বিনয় বুঝিতে পারিল তাহার মনের যাহা কিছু কথা ছিল আনন্দময়ীর কাছে তাহা সমস্তই বলা হইয়া গেছে। আনন্দময়ী এমন করিয়া সমস্ত শুনিলেন, এমন করিয়া সমস্ত গ্রহণ করিলেন যে, ইহার মধ্যে যে কিছু লজ্জা করিবার আছে তাহা বিনয়ের মনেই হইল না। আজ পর্য্যন্ত মার কাছে লুকাইবার কথা বিনয়ের কিছুই ছিল না—অতি তুচ্ছ কথাটিও সে তাঁহার কাছে আসিয়া বলিত। কিন্তু পরেশ বাবুর পরিবারের সঙ্গে আলাপ হইয়া অবধি কোথায় একটা বাধা পড়িয়াছিল। সেই বাধা বিনয়ের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হয় নাই। আজ ললিতার সম্বন্ধে তাহার মনের কথা সূক্ষ্মদর্শিনী আনন্দময়ীর কাছে একরকম করিয়া সমস্ত প্রকাশ হইয়া গেছে তাহা অনুভব করিয়া বিনয় উল্লাসিত হইয়া উঠিল। মাতার কাছে তাহার জীবনের এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নিবেদন করিতে না পারিলে কথাটা কোনোমতেই নির্ম্মল হইয়া উঠিত না—ইহা তাহার চিন্তার মধ্যে কালীর দাগ দিতে থাকিত।

রাত্রে আনন্দময়ী অনেকক্ষণ এই কথা লইয়া মনে মনে আলোচনা করিয়াছিলেন। গোরার জীবনের যে সমস্যা উত্তরোত্তর জটিল হইয়া উঠিতেছিল, পরেশ বাবুর ঘরেই তাহার একটা মীমাংসা ঘটিতে পারে এই কথা মনে করিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন যেমন করিয়া হউক্ মেয়েদের সঙ্গে একবার দেখা করিতে হইবে।

ভারতীয় ইতিহাস প্রসঙ্গ।

ভারতবর্ষের ইতিহাস সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত; স্বাধীনকাল, মুসলমান শাসনকাল এবং ব্রিটিশ শাসনকাল। ভারতবর্ষের স্বাধীন যুগ এবং মুসলমান শাসনাধীন যুগের মধ্যে সূক্ষ্ম রেখা টানিয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে। কারণ, ভারতবর্ষ মুসলমানের সংস্পর্শে আসিয়াও সুদীর্ঘকাল আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে কদাচিৎ কোন স্থানে মুসলমানের অধিকার স্থাপিত হইত; কিন্তু দুর্জ্জয় হিন্দুগণ অচিরে স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার সাধন করিতেন; কেবল পঞ্জাবের একাংশে মুসলমানের স্থায়ী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

৬৩৬ খৃষ্টাব্দে আরবদেশীয় মুসলমানগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ইহাই মুসলমান কর্ত্তৃক প্রথম ভারত আক্রমণ। এই প্রথম আক্রমণের পাঁচশত সাতান্ন বৎসর পরে পাঠানজাতীয় মুসলমানগণ উত্তর ভারতে অধিকার স্থাপন করেন।

প্রাগুক্ত সময় মধ্যে কতিপয় আরবা লেখক ভারত-বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল লেখকের গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের মধ্য যুগের বিবরণ সঙ্কলন করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

আমরা প্রধানতঃ ছয় জন লেখকের গ্রন্থ হইতে এই প্রবন্ধের উপাদান সংগ্রহ করিব। এই সকল লেখকের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রথমে প্রদত্ত হইতেছে।

বণিক সোলেমান, ইনি বাণিজ্য উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ৮৫১ খৃষ্টাব্দ সোলেমানের ভারত ভ্রমণের সময়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ইবন খুরদতবা, ইনি বোগদাদের খলিফাগণের রাজত্বকালে বিশিষ্ট রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ৯১২ খৃষ্টাব্দে ইবন খুরদতবার মৃত্যু হয়।

অলমস্‌উদি, ইহার প্রকৃত নাম আবু হাসন আলি; অলমস্‌উদি উপাধি মাত্র। অলমস্‌উদির জনৈক পূর্ব্বপুরুষ মহাপুরুষ মোহাম্মদের মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদিনায় গমনকালে তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। অলমস্‌উদির জীবনের

অধিকাংশ দেশভ্রমণে অতিবাহিত হয়। ৯৫৬ খৃষ্টাব্দ তাঁহার মৃত্যুকাল।

অলইস্তখরি, ইনি সুপ্রসিদ্ধ ইস্তখরে জন্মপরিগ্রহ করেন বলিয়া অলইস্তখরি নামে খ্যাত হইয়াছিলেন, প্রকৃত নাম সেখ আবু ইসাক। আবু ইসাক একজন প্রসিদ্ধ দেশপর্য্যটক ছিলেন। মুসলমান অধ্যুসিত সমস্ত দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়।

ইবন হৌকন,—ইবন হৌকন বোগদাদের অধিবাসী ছিলেন, ইঁহার প্রকৃত নাম মোহাম্মদ আবুল কাসিম। আবুল কাসিমের বাল্যকালে তুর্কীগণ বোগদাদ আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাদের নির্ম্মম আক্রমণে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হন; এ কারণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিদেশে বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে সংকল্প করেন। আবুল কাসিম ৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বোগদাদ পরিত্যাগ করেন এবং বহুদেশে পর্য্যটন করিয়া ৯৬৮ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাগত হন।

অল ইদ্রিসি। ইনি মরোক্কোর অধিবাসী ছিলেন; নানা ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া সিসিলিতে স্থায়ী বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। সিসিলির অধিপতির আদেশে তিনি আপন ভ্রমণ-বৃত্তান্ত গ্রন্থাকারে রচনা করেন।

আমাদের অবলম্বনস্বরূপ ছয়জন লেখকই দেশ পর্য্যটন বা বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, ইঁহারা সকলেই আরব্যকুল-সম্ভূত ছিলেন। এই সকল আরব্য লেখক ভারতবর্ষের যে বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তৎসাময়িক সুন্দর চিত্র।

অলমসুদি স্বীয় গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষ অতি বৃহৎ দেশ, সমুদ্র ভূমি ও পর্ব্বতে বিস্তৃত; যবদ্বীপ পর্য্যন্ত ভারতের সীমা বিস্তৃত, অন্য দিকে সিন্ধু ও খোরসান পর্য্যন্ত বিস্তৃত; ভারতবর্ষের অন্য পার্শ্বে তিব্বত অবস্থিত। এই দেশে ধর্ম্ম ও ভাষা সম্বন্ধে যথেষ্ট ভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে; ভারতবাসীরা অনেক সময় পরস্পর যুদ্ধ করে। অধিকাংশ ভারতবাসীই পরকাল ও পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাসী। বিদ্যা বুদ্ধি, শাসনপ্রণালী, দর্শনশাস্ত্র, শারীরিক বল ও বর্ণের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে হিন্দুগণ অন্যান্য কৃষ্ণকায় জাতি হইতে বিভিন্ন।

এই নানা ভাষা ও নানা ধর্ম্ম সংবলিত অনন্যসাধারণ সুবিস্তৃত দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক মণ্ডলে স্বতন্ত্র রাজবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। আরব্য পর্য্যটকগণ বহুসংখ্যক রাজবংশের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে আমরা কতিপয় রাজ্যের বিবরণ অবগত হইয়া থাকি। আমরা এখানে সেই সকল রাজ্যের নাম উল্লেখ করিতেছি। বল্লার, জুরজ, তাফন, রুমি, কাসবিন, খান, কামরুন, সর, কুমার।

বল্লার, আরব্য ভ্রমণকারিগণের হস্তে পতিত হইয়া বল্লভিপুর বল্লার নামে পরিচিত হইয়াছে। এই বল্লভিপুরের রাজন্যগণ বল্লভি নামে এক অব্দের প্রচলন করিয়াছিলেন। টড সাহেব লিখিয়াছেন যে, বল্লভিপুর রাজ্য মালব দেশে অবস্থিত ছিল। ফরাসী পণ্ডিত রেইনাড সাহেবও এই মতাবলম্বী। দক্ষিণে তাপ্তী নদী এবং উত্তরে আরাবলী পর্ব্বত পর্য্যন্ত বল্লভিপুর রাজ্যের সীমা প্রসারিত ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হায়েন সাঙ বল্লভিপুর রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। টমাস সাহেবের মতে ৭৪৫ খৃষ্টাব্দে বল্লভি বংশের বিলোপ সাধিত হইয়াছিল। টমাস সাহেবের নিরূপণ সঙ্গত নহে। কারণ আরব্য লেখকগণের সময়েও বল্লভিপুর রাজ্যের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল; আরব্য লেখকগণের ভারত আগমনের কাল ৮৫১ খৃঃ—৯৬৮ খৃঃ। যাহা হউক, বল্লভিবংশের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ এখনও ভবনগরের ২০ মাইল দূরে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

জুরজ, আরব্য লেখকগণ গুর্জ্জর বা গুজরাট নাম বিকৃত করিয়া জুরজ করিয়াছেন। গুজরাট রাজ্য বল্লভিপুরের উত্তরে অবস্থিত ছিল। হায়েন সাঙ বল্লভিপুর রাজ্য অতিক্রম করিয়া সুরাট ও গুজরাটে উপনীত হইয়াছিলেন।

তাফন—সোলেমান লিখিয়াছেন, "তাফক;" ইবন খুরদতবা এবং মসুদির মতে "তাফন"। আরব্য লেখকগণ তাফক বা তাফনবাসিনী রমণীগণের শারীরিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা আপনাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ফরাসী পণ্ডিত রেইনাড সাহেব এই বর্ণনার সঙ্গে মহারাষ্ট্রী রমণীর সাদৃশ্য দেখিয়া তাফক বা তাফন আরঙ্গাবাদের

নিকট কোন স্থানে অবস্থিত ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রেইনাড সাহেবের নির্দ্দেশ ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়। সোলেমান লিখিয়াছেন, তাফক গুর্জ্জরের পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। মস্হুদি লিখিয়াছেন, তাফন পার্ব্বত্য রাজ্য। ১০২৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ তৈফন্দ নামক দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া আসারু ল-বিলাদ নামক গ্রন্থে উল্লিখিত রহিয়াছে। "তৈফন্দ" "তাফন" হইতে অভিন্ন, এরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আসরু-ল-বিলাদে তৈফন্দ রাজ্যের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্ট উপলব্ধি জন্মায়, তাফন রাজ্য ঝিলাম ও সিন্ধুনদের মধ্যস্থিত পর্ব্বত মালায় অবস্থিত ছিল।

রুমি,—প্রাগুক্ত রেইনাড সাহেব লিখিয়াছেন, রুমি রাজ্য প্রাচীন বিশাপুর রাজ্যের সহিত অভিন্ন। কিন্তু এই বিশাপুর রাজ্যের অবস্থানও অদ্য পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে নাই। মস্হুদি লিখিয়াছেন, রুমিরাজ্যের পার্শ্বে কামন নামক এক দেশ অবস্থিত ছিল ; ইবন খুরদতবা লিখিয়াছেন, কামরুন রাজ্য রুমির সহিত সংযুক্ত এবং কামরুন রাজ্যের পার্শ্বেই চীন রাজ্যের সীমা ছিল। আমাদের বোধ হয় যে, কামরূপই আরব লেখকগণের হস্তে পতিত হইয়া "কামন" বা "কামরুনে" দাঁড়াইয়াছে। যদি আমাদের এই অবধারণ যথার্থ হয়, তবে রুমি রাজ্য পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থিত ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

কাসবিন,—টড লিখিয়াছেন, কাসবিন রাজ্য প্রাচীন কচ্ছ ভোজ রাজ্যের নামান্তর মাত্র। কিন্তু রেইনাড সাহেবের মতে কাসবিনের আধুনিক নাম মহীশূর। ঐতিহাসিক ডোসন সাহেব লিখিয়াছেন, কাসবিন রাজ্যের বর্ত্তমান নাম নির্ভুলরূপে ঠিক করিবার কোন উপায় নাই।

যান,—যানরাজ্য কোন স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহা অদ্যাপি নির্দ্ধারিত হয় নাই।

কামরুন,—কামরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া কামরুন হইয়াছে।

—আব,—যাবরাজ্য কোন স্থানে ছিল তাহা অদ্যাপি নির্দ্ধারিত হয় নাই।

কুমার,—কুমারিকা অন্তরীপ এবং ত্রিবাঙ্কুরের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে কুমাররাজ্য বিস্তৃত ছিল। ইবন ফকিয়া নামক একজন আরব্য ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন, মদ্যপায়ীদিগকে শাস্তি দিবার জন্য উত্তপ্ত লৌহশলাকা তাহাদের শরীরে স্থাপন করিয়া উহা শীতল না হওয়া পর্য্যন্ত তদবস্থাতেই রাখা হইত ; ইহাতে অনেক ব্যক্তির জীবন নাশ পর্য্যন্ত ঘটিত।

আরব্য লেখকগণের মতে ভারতীয় রাজ্য সমূহে বল্লারের নরপতি প্রতাপে, ক্ষমতায়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। আমরা অলমস্হুদির গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "বর্ত্তমান সময়ে মানকির সম্রাট ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। ভারতবর্ষের অনেক অধিপতি মানকির রাজদূতের তোষামোদ করিয়া থাকেন। বল্লারের চারিদিকে অনেক ক্ষুদ্র রাজ্য বিদ্যমান। বল্লারের সৈন্য ও হস্তীর সংখ্যা অপরিমিত। রাজধানী মানকির পর্ব্বতে অবস্থিত, এ কারণ অধিকাংশ সৈন্যই পদাতিক।"

বল্লারের নরপতির সমকক্ষ না হইলেও তৎকালে গুজরাটাধিপতিও সাতিশয় প্রতাপশালী ছিলেন। বণিক সোলেমান লিখিয়াছেন, গুজরাটের সৈন্য সংখ্যা অগণ্য। ভারতবর্ষের রাজন্যগণের তাদৃশ উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্য নাই। ভারতীয় রাজন্যবৃন্দ মধ্যে গুজরাটাধিপতিই ইসলাম ধর্ম্মের প্রবলতম শত্রু। গুজরাটাধিপতি সাতিশয় সম্পদশালী, তাঁহার উষ্ট্র ও অশ্বের সংখ্যা অপরিমিত। গুজরাটে বিনিময়ের জন্য স্বর্ণ রৌপ্যের কণিকা সকল ব্যবহৃত হয় ; এই দেশে স্বর্ণ রৌপ্যের খনি আছে বলিয়া লোকশ্রুতি বিদ্যমান রহিয়াছে।

আরব্য লেখকগণ ভারতীয় রাজবংশের পরিচয় প্রদান করিয়াই আপনাদের গ্রন্থ সমাপ্ত করেন নাই, রাজনীতি সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। আমরা পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণ জন্য ঐ আলোচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। মস্হুদি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, "ভারতীয় রাজকুমারগণ চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বে রাজপদ গ্রহণ করিতে সমর্থ নহেন। রাজন্যবৃন্দ কদাচিৎ প্রকৃতিপুঞ্জের সম্মুখীন হয়েন ; রাজকার্য্য সম্পাদনের সময় ব্যতীত অন্য কোন উপলক্ষে প্রকৃতিপুঞ্জের পক্ষে রাজদর্শন করিবার উপায় নাই। হিন্দুজাতির মতে নরপতি সর্ব্বদা প্রকৃতিপুঞ্জের সম্মুখীন হইলে তাঁহার মর্য্যাদার লাঘব এবং

বিধিদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার হয়। ভারতবর্ষে শাসন কার্য্য প্রকৃতিপুঞ্জের সদ্ভাব এবং রাজপুরুষগণের প্রভাব প্রতিপত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। রাজপদ বংশানুক্রমিক। রাজমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি প্রভৃতি বিশিষ্ট রাজপুরুষগণও পুরুষানুক্রমে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। হিন্দুজাতি সুরাপানে বিরত রহিয়াছেন; যাহারা সুরাপান করিয়া আপনাদের চরিত্র কলুষিত করে, তাহারা হিন্দু সমাজে সাতিশয় তিরস্কৃত হয়। সুরাপান কেবল শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়াই যে, হিন্দুজাতি উহার ব্যবহারে বিরত রহিয়াছেন, তাহা নহে; সুরা বুদ্ধির ভ্রংশ এবং শক্তির বিলোপ সাধন করে, এজন্যও তাঁহারা সুরাপানে বিরত রহিয়াছেন। যদি এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোন নরপতি সুরাপানে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তবে তিনি রাজ্য শাসনের অযোগ্য বলিয়া রাজ্যচ্যুত হন।"

সোলেমানের গ্রন্থেও ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা তাঁহার মতামতও এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ভারতবর্ষের রাজ্য সমূহে অভিজাত সম্প্রদায় এক বংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা কেবল এই অভিজাতগণের হস্তগত রহিয়াছে। নরপতিগণ আপনাদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। হিন্দুজাতি বিলাসব্যসনের বিরোধী। তাঁহারা সুরাপান করেন না; সুরা তাঁহাদের নিকট ঘৃণ্য। তাঁহাদের মতে সুরাপায়ী নরপতি রাজা নামের যোগ্য নহেন। ভারতবর্ষের রাজন্যগণ শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করেন, এই কারণ তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সন্ধি বিগ্রহে লিপ্ত হইতে হয়। প্রকৃতিপুঞ্জ বলিয়া থাকে, যদি রাজা সুরাপানে মত্ত হন, তবে কি প্রকারে তিনি রাজ্যের গুরুভার বহন করিবেন? ভারতীয় নরপতি কখন কখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়েন। যদি পার্শ্ববর্ত্তী কোন রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে পরাভূত হন, তবে বিজয়ী রাজা পরাজিত বংশের কোন রাজকুমারকেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন, এই নবাভিষিক্ত রাজা বিজেতার অধীন হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হন। ঈদৃশ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন ব্যতীত বিজিত দেশের প্রজাবর্গকে শান্ত ও বশীভূত করিবার অন্য উপায় নাই।

ভারতীয় রাজন্যবৃন্দের অসংখ্য সৈন্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল সৈন্যকে বেতন দিবার প্রথা নাই। (১) কোন ধর্ম্মযুদ্ধ উপস্থিত হইলে এই সকল সৈন্য সমবেত হইয়া যুদ্ধ করে। তারপর যুদ্ধ শেষ হইলে তাহারা কপর্দ্দক মাত্রও গ্রহণ না করিয়া স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাবৃত্ত হয়।

ভারতবর্ষের কোন কোন দেশের রাজার মৃত্যু হইলে এক অদ্ভুত প্রথার অনুষ্ঠান হইত বলিয়া সোলেমান উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এখানে ঐ প্রথার বর্ণনা করিতেছি। রাজ-শব শ্মশানে বহন করিয়া লইবার সময় একজন স্ত্রীলোক অগ্রে অগ্রে সম্মার্জ্জনী হস্তে গমন করিত এবং চীৎকার করিয়া বলিত, "নগরবাসিগণ, তোমরা দেখ, এই ব্যক্তি গত কল্য তোমাদের অধিপতি ছিলেন, তোমাদিগকে শাসন করিতেন, তাঁহার সমস্ত আদেশ জনসাধারণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইত; দেখ আজ তাঁহার কি দশা হইয়াছে। তিনি পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, যমদূত বা বিষ্ণুদূত তাঁহার আত্মা লইয়া গিয়াছেন। অতএব জীবনের সুখে উদ্ভ্রান্ত হইয়া বিপথগামী হইও না।" এই বর্ণনার পর ভারতবর্ষের রাজবংশে যে সতীদাহের প্রথা বিদ্যমান ছিল, তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজ-শব দাহন করিবার সময় রাজমহিষীগণ চিতায় প্রবেশ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতেন। কিন্তু তাঁহারা অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া জীবন নাশ, কি জীবিত থাকিয়া বৈধব্য অবলম্বন করিবেন, তৎসম্বন্ধীয় নির্দ্ধারণ তাঁহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত।

সোলেমানের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে ভারতবর্ষের রাজান্তঃপুরিকাগণের অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ অবগত হইতে পারি। সোলেমান লিখিয়াছেন যে, অধিকাংশ নরপতিই পুরাঙ্গনাদিগকে রাজসভায় আনয়ন করিতেন; তাঁহারা বিনা অবগুণ্ঠনে সর্ব্বজন সমক্ষে উপস্থিত থাকিতেন।

জাতিভেদ ভারতবর্ষের বিশেষত্ব। এই বর্ণবৈষম্য বিদেশী মাত্রেরই চোখে পড়ে। আমাদের আরব্য পর্য্যটকগণের ভ্রমণবৃত্তান্তেও ভারতবর্ষের বর্ণবৈষম্য সম্বন্ধে নানা

(১) কোন কোন স্থলে এই প্রথার ব্যতিক্রম হইত। বল্লারের নরপতি অর্থ দ্বারা সৈন্য পরিপোষণ করিতেন, আরব্য ভ্রমণকারিগণের লেখা হইতেই এই প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তথ্য লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমরা এখানে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

ইবন খুর দতবা লিখিয়াছেন, হিন্দু জাতি সাত ভাগে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর নাম সার কুক্রিয়া। অল ইদ্রিসি লিখিয়াছেন, কক্রিয়া। এই শ্রেণীর দ্বারা কোন্ বংশ উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমরা নির্দ্দেশ করিতে অক্ষম। ইবন খুর দতবা এবং অল ইদ্রিসি উভয়েই লিখিয়াছেন, ঐ শ্রেণী অতিশয় সম্ভ্রান্ত; রাজগণ এই শ্রেণী হইতে গৃহীত হইয়া থাকেন। ভারতবর্ষের আপামর সাধারণ সকলেই এই শ্রেণীভুক্ত লোকদিগকে সম্মান প্রদর্শন করে; কিন্তু ইঁহারা কাহারও নিকট মস্তক অবনত করেন না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণগণ কখনও সুরা স্পর্শ করেন না। শাস্ত্র চর্চ্চায় ইঁহাদের জীবন অতিবাহিত হয়। ব্রাহ্মণগণ ব্যাঘ্রচর্ম্ম বা অন্য কোন পশুচর্ম্ম পরিধান করিয়া লজ্জা নিবারণ করেন। কখন কখন ব্রাহ্মণগণ দণ্ডধারণ করিয়া চতুঃপার্শ্বে সমাগত জনমণ্ডলীকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান পূর্ব্বক পরমেশ্বরের শক্তি ও মহিমা ঘোষণা করেন। ইঁহারা দেবোপাসক; ইঁহাদের বিশ্বাস যে, দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরের করুণা লাভ করা যায়। জ্যোতির্ব্বিদ, দার্শনিক, কবি এবং গণক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর বিদ্বজ্জন মাত্রেই ব্রাহ্মণবংশজাত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। রাজন্যগণ তাদৃশ বিদ্বজ্জনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন। ইঁহারা পুরুষানুক্রমে এই সকল শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। অধ্যয়ন অধ্যাপনায় কেবল ব্রাহ্মণের অধিকার আছে।

তৃতীয় শ্রেণীর নাম ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তিন পাত্রের অধিক সুরাপান নিষিদ্ধ। ইবন খুর দতবা লিখিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করেন, কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিতে অসমর্থ। কিন্তু অল ইদ্রি সি অন্যরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণকন্যার পাণি পীড়ন করেন; ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় কন্যার পাণিপীড়ন করিতে অসমর্থ।

চতুর্থ শ্রেণীর নাম শূদ্র। শূদ্রগণ কৃষি ও শ্রমজীবী।

পঞ্চম শ্রেণীর নাম বৈশ্য। বৈশ্যগণ শিল্প-ব্যবসায়ী।

ষষ্ঠ শ্রেণীর নাম চণ্ডাল। চণ্ডালগণ সর্ব্বপ্রকার নিকৃষ্ট কাজ করে। চণ্ডালগণ গান বাদ্য পটু, তাহাদের রমণীরা সুন্দরী।

সপ্তম শ্রেণীর নাম বাজিকর ইত্যাদি।

আরব্য লেখকগণের মতে হিন্দুগণ ৪২টি ধর্ম্মসম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। অধিকাংশ ধর্ম্মসম্প্রদায়ই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন। ইঁহাদের কোন কোন সম্প্রদায় অবতার-বাদী ছিলেন। তৎকালে নিরীশ্বর ধর্ম্মসম্প্রদায়ও পরিদৃষ্ট হইত। অনেকে শালগ্রাম বা লিঙ্গ উপাসক ছিলেন। এই সকল শিলার মস্তকে ঘৃত ও তৈল মর্দ্দিত হইত। কোন কোন সম্প্রদায় সূর্য্যের উপাসনা করিতেন; তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, সূর্য্যই সৃষ্টিস্থিতিপালনকর্ত্তা। কোন কোন সম্প্রদায় মধ্যে হোমের অনুষ্ঠান দেখা যাইত। কোন কোন সম্প্রদায় মধ্যে বৃক্ষ বা সর্পের পূজা প্রচলিত ছিল। দুই একটি ধর্ম্মসম্প্রদায় সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মচর্চ্চা হইতে বিরত হইয়া সমস্ত মত অস্বীকার করিতেন।

আমরা আরব্য পর্য্যটকগণের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া যে বিবরণ সঙ্কলন করিলাম, তাহা হইতে দুইটি বিষয় স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। প্রথম হিন্দু জাতির বিলাসবিমুখতা, দ্বিতীয়, কষ্টসহিষ্ণুতা। হিন্দু জাতির সাধু সন্ন্যাসীর জীবনে বিলাস-বিমুখতা ও কষ্টসহিষ্ণুতার চরম দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইত। এতৎ সম্বন্ধে বণিক সোলেমান যাহা লিখিয়াছেন, এখানে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। "ভারতবর্ষে এক শ্রেণীর লোক পর্ব্বতে ও বনে বাস করেন। তাঁহারা কদাচিৎ লোকালয়ে উপস্থিত হন। অনেক সময় তাঁহারা কেবল স্বচ্ছন্দবনজাত ফল বা শাক শবজি আহার করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। তাঁহাদের অনেকে উলঙ্গ অবস্থায় অবস্থিতি করেন। অনেকে সূর্য্যাভিমুখ হইয়া দণ্ডায়মান থাকেন। আমি একজন সাধুকে এইভাবে দণ্ডায়মান দেখি; তারপর ষোল বৎসর পরে পুনর্ব্বার ঐ স্থানে আগমন করিয়া তাঁহাকে তদবস্থাতেই দেখিতে পাইয়াছিলাম। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, রৌদ্রতাপে সাধু দ্রবীভূত হয়েন নাই।"

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

মার্কিনরা ধর্ম্মের দ্বারা স্বারাজ্য লাভ করিয়াছিল কি না।

শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—

"মার্কিনদিগের রাজনৈতিক অধ্যবসায়ের গোড়াপত্তন করা হইয়াছিল ধর্ম্মের উপরে, তাই তাহার ফল হইল নিষ্কণ্টক স্বারাজ্য লাভ।"

পুনশ্চ—

"পক্ষান্তরে মার্কিনদেশীয় স্বারাজ্যপন্থীরা ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করিয়া একটি কথাও মুখে উচ্চারণ করে নাই—একটি কার্য্যেও হস্তপ্রসারণ করে নাই, অপর কোনো জাতির ন্যায্য অধিকারের অন্তঃপাতী সূচ্যগ্রপরিমাণ ভূমিখণ্ডেও হস্তপ্রসারণ করে নাই; আবার তাঁহাদের নেতা যিনি ওয়াশিঙ্‌টন তাঁহার তো কথাই নাই! তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার ছিলেন বলিলেই হয়। তাই তাঁহাদের স্বারাজ্যের জয়-পতাকায় 'যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ' স্বর্ণাক্ষরে জল্‌ জল্‌ করিতেছে তারকার বেশে।"

মার্কিনদিগের রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবুর একেলার হইলে এ বিষয়ে আলোচনার বিশেষ আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু দেখিয়াছি, এদেশের অনেক শিক্ষিত লোকই মনে করেন, মার্কিনগণ যে স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ, তাহারা বরাবর ধর্ম্মের পথে চলিয়াছে, সুতরাং ধর্ম্মই তাহাদিগকে জয়শ্রী দান করিয়াছেন। এই প্রকার ধারণার ঐতিহাসিক ভিত্তি কি, একবার আলোচনা করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করি।

মার্কিনদিগের রাজনৈতিক অধ্যবসায়ের গোড়া পত্তন—

(১) আমেরিকায় উপনিবেশস্থাপন।

সকলেই জানেন, আমেরিকা শ্বেতাঙ্গগণের "স্বদেশ" ছিল না। তাঁহারা ইয়ুরোপ হইতে দলে দলে বিভিন্ন সময়ে যাইয়া তথায় বসতি করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদিগের এই বিদেশ-গমন ব্যাপারটা নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্মমূলক ছিল না। সত্য বটে, ইংলণ্ডের পিউরিটান সম্প্রদায়ের অনেকে ধর্ম্মের খাতিরেই স্বদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। উপনিবেশিকগণের অধিকাংশই ধনলোভে আমেরিকায় গমন করেন, অনেকে ধর্ম্মের ভাণ করিতেন, এই মাত্র। প্রথম যুগের যাত্রীদিগের চিত্তে অর্থ ও পরমার্থ একই পর্য্যায়ভুক্ত ছিল।* যাঁহারা সরল ধর্ম্মবিশ্বাসী ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও দেবত্ব ও পশুত্ব একসঙ্গে বাস করিত। তাঁহারা যেমন একদিকে ধর্ম্মের জন্য আশ্চর্য্য আত্মত্যাগ দেখাইয়াছেন, অপরদিকে তেমনি লোমহর্ষণ নিষ্ঠুরতা, অর্থগৃধ্নুতা ও প্রবঞ্চনাপরায়ণতা দ্বারা ধর্ম্মের যৎপরোনাস্তি অবমাননা করিয়াছেন। ধর্ম্মের জন্যই কলম্বস্‌ ও অন্যান্য অনেকে আদিমনিবাসীদিগকে হত্যা ও দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পরামর্শ দেন, এবং ধর্ম্মের জন্যই Las Casas তাহাদিগের সহিত সদয় ব্যবহার করিতে অনুরোধ করেন। ধর্ম্মের জন্যই De Gourgues স্পানিয়ার্ডদিগকে ফাঁসিকাষ্ঠে বিনাশ করেন। ধর্ম্মের জন্যই পিউরিটানগণ ইংলণ্ড হইতে হল্যাণ্ডে ও হল্যাণ্ড হইতে আমেরিকায় গমন করেন, এবং তথায় ধর্ম্মচর্চ্চার স্বাধীনতা লাভ করিয়া ভিন্নমতাবলম্বী প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানদিগকে নির্ব্বাসিত, ও কোয়েকারদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেন।† সুতরাং দেখা যাইতেছে মার্কিন-

* "In the creed of the early explorers God and gold were closely bracketed."—The Historians' History of the World, Vol. XXII, p. 532.

† 'In the colonisation of America, religion appears everywhere, now as the inspiration of unbounded heroism, endurance and justice, now as the technical excuse for unlimited duplicity, ravage, and murder. It was "for the good of the Catholic cause" that Columbus and others advocated the enslaving and slaughter of the heathen; it was "for the good of the Catholic cause" that Las Casas advocated liberty, gentleness, and the importance of setting the unconverted a good example. It was "for the sake of calvinism" that De Gourgues hanged the Spaniards left by Mendez. It was religious example that led the Puritans to forsake England for Holland, then Holland for America, and in the new home of religious liberty, to banish dissenters, and to inflict heathenish cruelties upon the Quakers who had left the same country for

দিগের রাজনৈতিক জীবনের গোড়াপত্তন ধর্ম্মাপেক্ষা অধর্ম্মেই অধিক হইয়াছিল। একজন ইংরেজ লেখক যথার্থই বলিয়াছেন, "স্বর্ণই স্পানিয়ার্ড ও ইংরেজদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।"* ধর্ম্ম তাহাদিগকে দুঃখ, ক্লেশ, বিপৎ, মহামারীতে অদম্য সাহস দিয়াছে, সত্য—কিন্তু তাহা অন্ধকুসংস্কার ও পৈশাচিক পাপাচার হইতে মুক্ত ছিল না।

(২) আমেরিকা কাহাদের।

স্বর্ণখনির লোভেই হউক, আর ধর্ম্মচর্চ্চার অব্যাহত অধিকার লাভের জন্যই হউক, শ্বেতাঙ্গগণ পঙ্গপালের মত আমেরিকায় যাইয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু আমেরিকা তো মরুভূমি ছিল না! সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া আদিমনিবাসিগণ সেখানে বাস করিতেছিল। সুতরাং ইয়ুরোপ হইতে যাইয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া (হত্যার কথা পরে বলিব) তাহাদিগের জন্মভূমি দখল করিবার শ্বেতাঙ্গগণের কি ধর্ম্মসঙ্গত স্বত্ব ছিল, এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে। সহজ বুদ্ধিতে বোধ হয় পরদেশ হরণ ও পরস্বাপহরণ একই কথা। কিন্তু যাঁহারা বড় বড় রাজনীতিবিৎ, বিশালদেশের অধিনায়ক, তাঁহারা আমেরিকা অধিকারের পক্ষে একটা যুক্তি দেখাইয়া থাকেন। যুক্ত রাজ্যের বর্ত্তমান দেশনায়ক রুজ্‌ভেল্ট বলেন, আমেরিকায় "সীমাহীন প্রান্তর ও বনে ইণ্ডিয়ানদিগেরই একমাত্র স্বত্ব—অর্থাৎ জনকয়েক নোংরা বর্ব্বর সহস্র যোজনব্যাপী দেশে কখনও কখনও শিকার করিয়া বেড়ায়; সুতরাং এই দেশে কেবল তাহাদিগেরই একমাত্র অধিকার—এ কথা যদি ঠিক হয়, তবে উহা যে কোন শ্বেতাঙ্গ শিকারী, স্বেচ্ছাধিবাসী, ঘোটকাপহারক, বা যাযাবর গোরক্ষকের হইবে না কেন?"†

আর একজন লেখক বলেন, "আমেরিকার বিস্তীর্ণ বনভূমিগুলি কয়েক শত ইণ্ডিয়ানের সম্পত্তি, ইহা অতি হাস্যাস্পদ কথা। তাহারা ঐ ভূমিগুলি পরিষ্কৃত বা কর্ষিত করে নাই, উহাতে গৃহ নির্ম্মাণ করে নাই, উহাদিগের সীমানা সরহদ্দ নির্দ্দেশ করে নাই, এমন কি, ওগুলি দখল করিবার জন্য এক শিকারের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহও করে নাই। সুতরাং ঐ সকল ভূমিতে শ্বেতাঙ্গদিগের সমান স্বত্ব ছিল—বরং তাহারা যে ভাবে বন জঙ্গল আবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতে তাহাদিগের স্বত্বই শ্রেষ্ঠতর বলিতে হইবে।"* অনেকটা এইরূপ যুক্তির অনুসরণ করিয়াই একজন ইংরেজ (দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, না রাজনীতিবিৎ ঠিক বুঝিতে পারি নাই) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, "এমন দিন আসিতেছে, যখন ইয়ুরোপের উন্নত ও ধর্ম্মিষ্ঠ জাতি সকল উষ্ণপ্রধান দেশসমূহের শাসনভার গ্রহণ করিবে। তাহারা তদ্দেশবাসীদিগকে কুকুর বিড়ালের মত হত্যা করিবে না বটে, কিন্তু ঐ সকল দেশের স্বভাবজ ঐশ্বর্য্য উহাদিগের হাতে পড়িয়া যে মাটী হইতেছে, ইহা তাহারা কিছুতেই সহ্য করিবে না।"†

the same religious liberty. It was religion that warmed them in the bleak wilderness; and upheld them through pestilence, starvation, and the dread of the stealthy and ghostly Indian enemy.'—History,—p. 532.

* The Spanish and the English made gold their first ambition.—Do.

† 'To recognise the Indian ownership of the limitless prairies and forests of this continent—that is, to consider the dozen squalid savages who hunted at long intervals over a territory of a thousand square miles as owning it outright—necessarily implies a similar recognition of the claims of every white hunter, squatter, horse-thief, or wandering cattle-man.'—History, p. 502.

* 'It is ridiculous to say that a few hundred Indians secured a property-right over the great forest lands which they did not clear and till, did not mark out with boundaries, fixed no habitations upon, and about whose ownership they did not even fight among one another, except when it was for the time rich in game. The whites had quite as good a right here as the Indians, and the nature of their plans made the right superior.—History, p. 505.

† It will probably be made clear, and that at no distant date, that the last thing our civilisation is likely to permanently tolerate is the wasting of the resources of the richest regions of the earth through the lack of the elementary qualities of social efficiency in the races possessing them. The right of those races to remain in possession will be recognised; but it will in all probability be no part of the future conditions of such recognition that they shall be allowed to prevent the utilisation of the immense natural resources which they have in charge.

এই লেখকের মতে, ইহাই ভবিষ্যতের পরার্থপরতা! (altruism!) অতএব শ্বেতাঙ্গগণ আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগের অক্ষম হস্ত হইতে তাহাদিগের দেশ কাড়িয়া লইয়া যে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছে, এমন কথা বলিতে আমাদিগের সাহস হইতেছে না! সুতরাং তাহাদিগের সহিত ব্যবহারটা কেমন হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে বিচার্য্য।

আদিম অধিবাসীদিগের ব্যবহার।

মোরেভিয়ান সম্প্রদায়ের জর্ম্মনদেশীয় একজন প্রচারক (Rev. John Heckewelder) দীর্ঘকাল ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে বাস করেন। তাঁহার নিকট তাহারা শ্বেতাঙ্গদিগের আচরণ সম্বন্ধে যে অভিযোগ করে, তাহার কিঞ্চিৎ মর্ম্ম দিতেছি।—

"ইংরেজগণ যখন ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশে আগমন করে, তখন আমরা তাহাদিগকে সমাদরে গ্রহণ করি, এবং সহোদরের ন্যায় আমাদিগের সহিত বাস করিতে আহ্বান করি। কিন্তু তাহারা আমাদিগের সদয় অভ্যর্থনার কি প্রতিদান দিয়াছে? তাহারা প্রথমে আমাদিগের নিকট স্বীয় জীবিকোপযোগী শস্যোৎপাদন ও গোচারণের জন্য সামান্য ভূমিখণ্ড যাচ্ঞা করে, আমরাও আহ্লাদের সহিত তাহা প্রদান করি। কিয়ৎকাল পরেই তাহারা আরও ভূমি চাহে,—তাহাও আমরা দান করি। আমাদিগের জীবিকার জন্য মহান্ পুরুষ (The Great Spirit) বনে অনেক মৃগ রাখিয়াছিলেন; দেখিয়া তাহাও তাহারা প্রার্থনা করে। আমাদিগের বনে প্রবেশ করিয়া তাহারা অনেক স্পৃহণীয় ভূমিখণ্ড দেখিতে পায় এবং আমাদিগকে উহাও দান করিতে অনুরোধ করে! আমরা দেখিলাম, উহারা যথেষ্ট ভূমি পাইয়াছে, সুতরাং আর ভূমি দিবার প্রয়োজন নাই; তখন উহারা বলপ্রয়োগ করিয়া আমাদিগকে বহুদূরে তাড়াইয়া দিয়া আমাদিগের পৈতৃক বাসভূমি অধিকার করে।"*

remote date, with the means at the disposal of our civilisation, the development of these resources must become one of the most pressing and vital questions engaging the attention of the Western races.—Social Evolution, by Benjamin Kidd, p. 348.

* American History told by Contemporaries, Vol. III, pp. 467-68.

তার পর ওলন্দাজদিগের পালা; তৎপর অন্যান্য ইয়ুরোপীয় জাতির আগমন। ঐ একই কাহিনী। যাঁহারা সেই করুণ কাহিনী পাঠ করিতে চাহেন, তাঁহারা পাদটীকায় উদ্ধৃত গ্রন্থের ৪৬৭ হইতে ৪৭১ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করিবেন।

মনে হইতে পারে, ইণ্ডিয়ানদিগের এ বর্ণনা অতিরঞ্জিত। কিন্তু একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক কি বলেন? "শ্বেতাঙ্গগণ ইণ্ডিয়ানদিগকে অজস্র প্রবঞ্চিত করে, তাহাদিগের নিকট লক্ষ মিথ্যা কথা বলে, তাহাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করে, তাহাদিগকে দাসত্বে আবদ্ধ করে এবং জিঘাংসার বশবর্ত্তী হইয়া রম মদ দ্বারা তাহাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করে।"*

বসন্ত ও ব্রাণ্ডী।

ইয়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ এই একটী তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন যে অনুন্নত বর্ব্বর জাতি উন্নততর, সুসভ্য জাতির সংস্পর্শে আসিলে স্বভাবতঃই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই নিয়মানুসারেই অষ্ট্রেলিয়া ও নিউ জিলণ্ডের আদিম অধিবাসিগণ প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, আমেরিকার বিভিন্ন জাতিসমূহ বুঝি এই নিয়মেই এক রকম নির্ম্মূল হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। সুইডেন দেশীয় অধ্যাপক Peter Kalm ১৭৪৮—১৭৫১ সনে আমেরিকায় ভ্রমণ করেন। তিনি কি বলেন, শুনুন। "ইয়ুরোপীয়দিগের সংশ্রবে আসিবার পূর্ব্বে, ইণ্ডিয়ানগণ বসন্ত কাহাকে বলে জানিত না। তাঁহাদিগের সংস্পর্শে আসিয়া অসংখ্য ইণ্ডিয়ান এই রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। * * * কিন্তু ব্রাণ্ডীই অধিকাংশ ইণ্ডিয়ানকে বিনাশ করিয়াছে। ইয়ুরোপীয়গণের আগমনের পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ানেরা এই মদিরা সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ ছিল।"†

* The White cheated the Indian right and left, lied to him, robbed him, enslaved him, gave him rum with malice prepense.—The Historians' History, Vol. XXII, p. 505.

† "—the small pox, a disease which the Indians were unacquainted with before their commerce with the Europeans, and which since that time has killed incredible numbers of them. * * But brandy has killed most of the Indians. This liquor was likewise entirely unknown to them before the Europeans came hither."—American History told by Contemporaries, Vol. II, pp. 330-331.

অমানুষিক নিষ্ঠুরতা।

জন্মভূমি পরহস্তগত ও স্বদেশীয়দিগকে লাঞ্ছিত, প্রতারিত ও দিনে দিনে মৃত্যুমুখে পতিত দেখিয়া বর্ব্বরজাতি সুস্থির থাকিতে পারে না। সুতরাং ইয়ুরোপীয়গণের সহিত ইণ্ডিয়ানদিগের শতাব্দীব্যাপী জীবন-মরণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এই সংগ্রামের ফলাফলের উপর আমেরিকার বর্ব্বর অধিবাসীদিগের ধন, জন, জীবন—এমন কি, তাহাদিগের জাতীয় অস্তিত্ব—নির্ভর করিত;—সুতরাং তাহারা যে উল্কাপিণ্ডবৎ সহসা আপতিত জাতীয় শত্রুদিগকে হাতে পাইলে তাহাদিগের প্রতি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কিন্তু উন্নত, সভ্যতাগর্ব্বিত, ধর্ম্মান্ধ ইয়ুরোপীয়গণ আমেরিকায় যে পৈশাচিক লীলার অভিনয় করিয়াছে, বর্ত্তমান যুগে তথাকথিত অনুন্নত এসিয়াবাসী কোনও জাতির ইতিহাসে তদনুরূপ কিছুই দৃষ্ট হয় না। এই প্রসঙ্গে স্পানিয়ার্ডদিগের ঘৃণিত বিশ্বাসঘাতকতা ও রাক্ষসোচিত নৃশংসতা বর্ণনা করিবার অবসর নাই। মার্কিনজাতির ধর্ম্মপ্রাণ পূর্ব্বপুরুষগণের আচরণই প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়। অপর প্রমাণের আবশ্যক নাই। স্বয়ং দেশপতি রুজ্‌ভেল্ট সুললিত ও ওজস্বিনী ভাষায় ইণ্ডিয়ানদিগের সহিত যুদ্ধ-কাহিনী বিবৃত করিয়া উপসংহারে বলিতেছেন—"এই যুদ্ধের ইতিহাসে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের ভীষণ দুর্দ্ধর্ষ বীরত্ব কাহিনীর সহিত অতি কদর্য্য পরস্বাপহরণপ্রিয়তা, জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা ও লোমহর্ষণ নিষ্ঠুরতা জড়িত রহিয়াছে। আমরা তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক কঠোর, বীরোচিত গুণ দেখিতে পাই বটে, কিন্তু পতিত, দুর্ব্বল, অসহায়জনের প্রতি দয়া, কিংবা পরাজিত, নির্ভীক শত্রুর প্রতি করুণার পরিচয় অতি অল্পই প্রাপ্ত হই।"* যুদ্ধে যে সকল ইণ্ডিয়ান বন্দী হইত, শ্বেতাঙ্গগণ তাহাদের সকলকেই হত্যা করিত। শুধু তাহাই নহে। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে (অর্থাৎ স্বাধীনতা সমর আরম্ভ হইবার মোটে দশ বৎসর পূর্ব্বে, তখন দেশে শান্তি বিরাজমান), সুবিখ্যাত সাধু উইলিয়ম পেনের পৌত্র ঘোষণা করেন, প্রত্যেক ইণ্ডিয়ান নারীর মস্তকের জন্য ৫০ ডলার, এবং দশ বৎসরের নিম্নবয়স্ক প্রত্যেক ইণ্ডিয়ান বালকের মস্তকের জন্য ১৩০ ডলার পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। এখন যে ইণ্ডিয়ানগণ বশ্যতাস্বীকার করিয়াছে—এখনও তাহাদিগের সহিত ব্যবহারে এরূপ বুঝা যায় না, যে সাধুতা, দয়া ও সত্যবাদিতা ইয়ুরোপীয়গণেরই একচেটিয়া গুণ।*

* "Their feats of terrible prowess are interspersed with deeds of the foulest and most wanton aggression, the darkest treachery, the most revolting cruelty; and though we meet with plenty of the rough, strong coarse virtues, we see but little of such qualities as mercy for the fallen, the weak and the helpless, or pity for a gallant and vanquished foe."—Historians' History, Vol. XXII, p. 530.

* Historians' History, Vol. XXII, p. 505.

(২) দাসত্ব-প্রথা।

এইরূপে একদিকে বহুযুগব্যাপী সংগ্রামে ও নির্দ্দয় অত্যাচারে আদিম অধিবাসিগণ উচ্ছিন্ন হইতে লাগিল, অপরদিকে সুতরাং শ্রমজীবীর অভাব উপস্থিত হইল। তখন খৃষ্টাশ্রিত ইয়ুরোপীয়গণ আফ্রিকা হইতে সহস্র সহস্র নর, নারী, বালক, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী অপহরণ করিয়া আমেরিকায় বিক্রয় করিতে লাগিল। আফ্রিকা হইতে আমেরিকার পথে এই সকল হতভাগ্য কৃষ্ণকায় মানুষগুলি যে যমযাতনা ভোগ করিত, এবং দাসরূপে বিক্রীত হইয়া ইহারা আজীবন যেরূপ মূক পশুবৎ ব্যবহৃত হইত, তাহার যথাযথ বর্ণনা করিবার প্রয়াস করিয়া আমি আপনার অক্ষমতার পরিচয় দিতে চাহি না। এদেশে শিক্ষিতদিগের মধ্যে 'টমকাকার কুটীর' কে না পাঠ করিয়াছেন? যাহারা শতাব্দীর পর শতাব্দী লক্ষ লক্ষ নরনারীকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিয়া তাহাদিগকে কুকুর বিড়াল অপেক্ষাও হেয় রূপে লাঞ্ছিত করিতে পারে—পতি হইতে পত্নীকে, জননী হইতে সন্তানকে নির্দ্দয়ভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া চিরদিনের জন্য তাহাদিগের জীবনের যৎকিঞ্চিৎ ম্লান আনন্দটুকু নির্ব্বাপিত করিয়া দিতে পারে—ঈশার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াও তৈজসপত্রের ন্যায় মানুষ লইয়া ব্যবসায় করিতে পারে—ধর্ম্ম যদি একান্ত তাহাদিগেরই পক্ষাশ্রিত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে নিতান্তই পক্ষপাতী বলিতে হইবে। পর-

দেশ হরণে যে জাতীয় জীবনের আরম্ভ, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও নিষ্ঠুরতায় যাহার পরিপুষ্টি, নারকীয় দাসত্বপ্রথা যাহার ঐহিক সম্পদের ভিত্তি—সেই মার্কিন জাতীয় জীবনের গোড়া পত্তন যদি নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্মের উপরে করা হইয়া থাকে, তবে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের পার্থক্য কি, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

স্বারাজ্য-লাভ।

এক্ষণে দেখা যাউক, "মার্কিন দেশীয় স্বারাজ্যপন্থীরা ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করিয়া একটি কথাও মুখে উচ্চারণ করে নাই," এই উক্তি যথার্থ কি না।

মার্কিনদেশে স্বারাজ্যপন্থীদিগের প্রথম আবির্ভাব ষ্ট্যাম্প-আইন ঘটিত কলহ লইয়া। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। স্বাধীনতার সংগ্রাম পর্য্যন্ত মার্কিন দেশ তেরটী প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক প্রদেশের বিভিন্ন শাসনকর্ত্তা ও জনসাধারণ সভা ছিল। উহারা ইংলণ্ডের অধীন হইলেও কোনও প্রকার কর প্রদান করিত না; এমন কি শাসনকর্ত্তাদিগের বেতন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডকে যোগাইতে হইত। এতদ্ব্যতীত, ১৭৫৬ হইতে ১৭৬৩ সন পর্য্যন্ত ফরাসিদের সহিত ইংরেজদিগের বিপুল সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সেই সংঘর্ষে ইংলণ্ডের সাহায্য না পাইলে মার্কিনেরা ফরাসিদিগের গ্রাসে পতিত হইত। উহারা তখন ইংরেজদিগের সহিত মিলিত হইয়া যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধের ব্যয় অধিকাংশ ইংলণ্ডকেই বহন করিতে হয়, এবং যুদ্ধাবসানে মার্কিনদেশের রক্ষার্থ যে দশ সহস্র সৈন্য ঐদেশে রাখা হয়, তাহার ব্যয়ভারও ইংরেজদিগের স্কন্ধেই পতিত হয়। ইংলণ্ডের সহিত যুক্ত থাকিয়া আপদে বিপদে রক্ষিত হইবে, এবং শান্তির সময় পূর্ণমাত্রায় সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিবে, অথচ মার্কিনেরা তদর্থে এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিবে না, ইহা ন্যায়বিগর্হিত মনে করিয়া ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী জর্জ্জ গ্রেন্‌ভিল ১৭৬৫ সনে পার্লিয়ামেণ্টে ষ্ট্যাম্প আইনের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। উহার মর্ম্ম এই যে বিবাহে, কুসীদব্যবসায়ে, বাণিজ্যে, স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ে, আদালতে মামলা মোকদ্দমায় ষ্ট্যাম্পযুক্ত দলিল ব্যবহার করিতে হইবে। প্রস্তাবটী শুনিবামাত্র মার্কিনেরা জলিয়া উঠিল। তাহাদের প্রধান আপত্তি, পার্লিয়ামেণ্টে তাহারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে না, সুতরাং উহা তাহাদিগের উপর কর স্থাপন করিতে পারে না। বলা বাহুল্য, বার্ক, মেকলে প্রভৃতি সুপণ্ডিত রাজনীতিজ্ঞগণের মতে এই আপত্তি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। পার্লিয়ামেণ্টের কোন কোন সভ্য এরূপ বুঝাইতেও চেষ্টা করিলেন যে তাঁহারা যেমন ইংলণ্ডের, তেমনি আমেরিকারও প্রতিনিধি। (যেমন ভূতপূর্ব্ব ভারতসচিব সর হেনরী ফাউলার বলিয়াছিলেন, পার্লিয়ামেণ্টের প্রত্যেক সভ্যই ভারতের প্রতিনিধি!) কিন্তু মার্কিনেরা তাহাতে সন্তুষ্ট হইল না। তাহারা বিস্তর আবেদন নিবেদন করিতে লাগিল, এবং বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতি বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে প্রতিনিধি (agent) রূপে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া ষ্ট্যাম্প আইন যাহাতে বিধিবদ্ধ না হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা প্রধান মন্ত্রীর নিকট এরূপ প্রস্তাবও করিল, "ষ্ট্যাম্প আইন উঠাইয়া লউন, আমরা নিজেরাই আমাদিগের উপর কর স্থাপন করিতেছি।" কিন্তু জর্জ্জ গ্রেন্‌ভিল অত্যন্ত একগুঁয়ে লোক ছিলেন। তিনি দেখাইতে চাহেন, পার্লিয়ামেণ্টের উপনিবেশ সমূহের উপর কর স্থাপনের অব্যাহত ক্ষমতা আছে। সুতরাং মার্কিনদিগের সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হইল। জনসাধারণসভায় দুই চারিজন আইনের প্রতিবাদ করিলেন বটে, কিন্তু অধিকাংশের মতে উহা বিধিবদ্ধ হইয়া গেল এবং অভিজাতবর্গের সভায় উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

মার্কিনদিগের অসন্তোষ দূর করিবার জন্য গ্রেন্‌ভিল ধার্য্য করিলেন, মার্কিনদের কাঠের ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য অর্থসাহায্য প্রদত্ত হইবে এবং কফি ও অন্যান্য পণ্যের ব্যবসায়ে বিশেষ অধিকার দেওয়া যাইবে,* এবং ষ্ট্যাম্প বিক্রয় করিয়া যে আয় হইবে, উহা আমেরিকায়ই ব্যয়িত হইবে। অধিকন্তু তিনি মার্কিনদিগকেই ষ্ট্যাম্প বিক্রয়ের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতি প্রতিনিধিগণের প্রত্যেকেই মনে করিতে লাগিলেন অতঃপর সমস্ত গোলযোগ থামিয়া যাইবে। তাঁহারা কেহই কল্পনা করেন নাই যে মার্কিনেরা

---

* Bancroft's History of the United States, Vol. IV, p. 177.

বরং যুদ্ধ করিবে, তথাপি ষ্ট্যাম্প-আইন মানিয়া চলিবে না। তাঁহারা স্বদেশীয়দিগকে উপদেশ দিলেন, রাজার আইন শিরোধার্য্য করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। প্রতিনিধিদিগের কেহ কেহ প্রকাশ্যে ষ্ট্যাম্প আইনের সমর্থনও করিয়াছিলেন। কিন্তু মার্কিনদেশীয় স্বারাজ্যপন্থীরা কোন্ পন্থা অবলম্বন করিল? সেই পন্থা, যাহাতে কৃতকার্য্য হইলে ধর্ম্মের জয় হইল বলিয়া লোকে যশোগীতি গান করে, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলে অধম, নারকীয় রাজদ্রোহী বলিয়া বিশ্বসংসারের ঘৃণাভাজন হইতে হয়। তাঁহারা লক্ষ কণ্ঠে হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখি কাহার সাধ্য আমাদের দেশে ষ্ট্যাম্প বিক্রয় করে।" কনেক্টিকট প্রদেশবাসী Jared Ingersoll ইংলণ্ডে ঐ প্রদেশের প্রতিনিধি ছিলেন, এবং ষ্ট্যাম্প আইন পাস হইলে উহার ষ্ট্যাম্পবিক্রেতা নিযুক্ত হন। তিনি ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বদেশে যাইতেছিলেন। Wethersfieldএ উপস্থিত হইলে একদল লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহারা বলিল, তাঁহাকে এখনই কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে। তিনি বলিলেন, "আমি গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি; আর, আমি যদি কর্ম্মত্যাগ করি, সরকার বাহাদুর আর একজনকে নিযুক্ত করিতে পারেন।" জনমণ্ডলী বলিয়া উঠিল, "গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় আবার কি? আমাদের অভিপ্রায়ই গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়। এদেশে কেহ ষ্ট্যাম্প বিক্রয়ের কর্ম্ম করিতে পারিবে না।" Ingersoll জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি আমি কর্ম্মত্যাগ না করি, তবে কি হইবে?" সহস্র-কণ্ঠে যুগপৎ ধ্বনি হইল, "মৃত্যু!" তিনি বলিলেন, "একবার বই দুইবার মরিতে হইবে না, আমি এখনি মরিতে প্রস্তুত।" জনমণ্ডলীর নেতা বলিলেন, "ইহাদিগকে উত্তেজিত করিবেন না।" তখন অনন্যোপায় হইয়া Ingersoll বলিলেন, "আচ্ছা, আমাকে হার্টফোর্ডে যাইতে দেও।" সকলে বলিল, "না, এখানেই কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে।" তখন অগত্যা তিনি নিকটবর্ত্তী একগৃহে কয়েকজনের সহিত প্রবেশ করিলেন, এবং শাসনকর্ত্তাকে সংবাদ দিয়া কয়েক ঘণ্টা কথাবার্ত্তা বলিয়া ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বিলম্ব দেখিয়া বাহিরের জন-মণ্ডলী বিরক্ত হইল। তখন প্রাণরক্ষার জন্য Ingersoll শপথপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ করিলেন, এবং বাহিরে আসিয়া সকলের সমক্ষে তিনবার "স্বাধীনতা ও স্বত্বের" উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি করিতে বাধ্য হইলেন।*

এইরূপে, অন্যান্য প্রদেশের ষ্ট্যাম্পবিক্রেতাদিগকেও প্রাণের ভয়ে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইল। নানা স্থানে দাঙ্গাহাঙ্গামা হইতে লাগিল। কোন কোন স্থানের সরকারী আফিস ও কাগজপত্র পুড়াইয়া দেওয়া হইল। এই গোলযোগের মধ্যে গ্রেন্‌ভিল পদচ্যুত হন এবং লর্ড রকিংহাম তাঁহার স্থান গ্রহণ করেন। আমেরিকা হস্তচ্যুত হয় দেখিয়া নূতন মন্ত্রীসমাজ ষ্ট্যাম্প আইন রহিত করেন—কিন্তু তাঁহারা মুখবন্ধে একথা বলিয়া রাখেন যে মার্কিনদিগের উপর কর স্থাপনের অধিকার পার্লিয়ামেণ্টের অবশ্যই আছে।

বিদ্রোহবহ্নি আপাততঃ নির্ব্বাপিত হইলেও প্রধূমিত অবস্থায় রহিল। প্রেম একবার ব্যাহত হইলে তাহাকে আবার অখণ্ডাকারে পুনরুজ্জীবিত করা কঠিন। উভয় পক্ষই বুঝিলেন, অনুকূল বাতাস পাইলেই আগুন পুনরায় জ্বলিয়া উঠিবে। কাজেও তাহাই হইল। কুক্ষণে পার্লিয়ামেণ্ট চায়ের উপর শুল্ক ধার্য্য করিলেন। মার্কিনদেশের স্বারাজ্য-পন্থীরাও "যুদ্ধংদেহি" বলিয়া অগ্রসর হইল।

ষ্ট্যাম্প আইন করিয়া ইংরেজেরা অধর্ম্ম করিয়াছিল, এরূপ বলা যায় না; কাজটা বুদ্ধিমানের মত হয় নাই, এ কথা বলাই ঠিক। স্বাধীনতা-সংগ্রামেও মার্কিনদিগের জয় হইল—এজন্য নয়, যে তাহারা মোটেই ধর্ম্মলঙ্ঘন করে নাই, কিন্তু প্রধানতঃ এই জন্য যে ইংলণ্ডের চিরশত্রু ফ্রান্স ও স্পেন তাহাদিগের সহিত যোগ দিয়াছিল। ফরাসিরা ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের নিকট পরাজিত হইয়া ও কানাডা হারাইয়া মর্ম্মদাহে জ্বলিয়া মরিতেছিল। এখন তাহারা বৃটিশসাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন করিয়া ইংরেজদিগকে জব্দ করিবার জন্য উৎসাহের সহিত মার্কিন-দিগের সহায়তা করিতে লাগিল। মার্কিনেরা শুধু "অপরের ন্যায্য অধিকারের অন্তঃপাতী সূচ্যগ্র ভূমিখণ্ড" কেন, সুবিস্তীর্ণ কানাডা দেশেও হস্তপ্রসারণ করিয়াছিল, কিন্তু সেখানে দন্তস্ফুট করিতে না পারিয়া ভগ্নমনোরথ ও দুর্দশাপন্ন

* Bancroft, Vol. 4, pp. 224-225.

হইয়া ফিরিয়া আইসে। তাঁহাদের নেতা ওয়াশিংটন "সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার" ছিলেন বটে, কিন্তু তিনিও একজন গরিব শিক্ষককে গুপ্তচরের বেশে শত্রুশিবিরে পাঠাইয়াছিলেন, বেচারা ধরা পড়িয়া ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ হারায়। মার্কিনদেশীয় স্বারাজ্যপন্থীদিগের জয়পতাকায় তাহাদিগের স্বদেশপ্রেম, সাহস ও আত্মত্যাগ, এবং ফরাসিদিগের স্বার্থগন্ধযুক্ত উদারতা স্বর্ণাক্ষরে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে, সত্য; কিন্তু যে ক্ষেত্রে প্রথমাবধি ধর্ম্মের সহিত এতখানি পাপমিশ্রিত, সেখানে "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ" এই নীতি তায়কার বেশে শোভা পাইতেছে কিনা, সন্দেহ।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে কেবল বিশুদ্ধ ধর্ম্মেরই জয় হয়, ইহা একটা কুসংস্কার। কোনও জাতির ইতিহাসেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। জাতীয় জীবনে যে সকল গুণ থাকিলে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করা যাইতে পারে গ্রীক ও রোমকদিগের তাহা ছিল, এই জন্যই তাহাদিগের এত গৌরব—নতুবা তাহাদিগের ধর্ম্মসম্পৎ অধিক কি ছিল? বরং তাহাদিগের মধ্যে যে সকল জঘন্য পাপ বর্ত্তমান ছিল, পরপদদলিত ভারতবর্ষে তাহা কখনও দেখা যায় নাই। অধিকদিনের কথা নয়—ইটালীর অভ্যুত্থানের ইতিহাসে কি দেখিতে পাই? দেবচরিত্র ম্যাট্‌সিনি দ্বারা ইটালীর উদ্ধার সম্পন্ন হইল না। যাঁহাদিগের নিকট ইটালী জাতি স্বাধীনতার জন্য ঋণী, তাঁহাদিগের মধ্যে ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান-বর্জ্জিত, পিড্‌মণ্টের রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল চরিত্রহীন, রাজনীতিবিৎ ক্যাভুর মিথ্যাবাদী। বর্ত্তমান জর্ম্মন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিস্মার্ক যথেচ্ছ মিথ্যাকথা বলিতে পারিতেন। এই সকল দেশের অভ্যুত্থান বিশুদ্ধ ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিলে, অনন্তকাল অপেক্ষা করিতে হইত।

তবে কি, আমি অধর্ম্মাচরণের সমর্থন করিতেছি? না, তাহা নহে। আমি যাহা বলিতেছি, তাহার মর্ম্ম এই যে স্বাধীনতাসংগ্রামে হয় ধর্ম্মের নূতন সংজ্ঞা দেওয়া আবশ্যক; নতুবা যথার্থ ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিদিগের উহা হইতে বিযুক্ত থাকা অপরিহার্য্য।*

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

* স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেই ধর্ম্মবিগর্হিত কোন না কোন কাজ করিতেই হইবে, অথবা কেবল ধর্ম্মপথে থাকিয়াও স্বাধীনতা লাভ করা যায়, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। তবে মোটের উপর একথা বলা যায় যে, সাধুতম ব্যক্তির জীবনের অন্যান্য কাজেও যেমন ধর্ম্মাধর্ম্ম মিশ্রিত থাকে, তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে তাহাতেও তেমনি ধর্ম্মাধর্ম্ম মিশ্রিত থাকিতে পারে। কোন মানুষের দীর্ঘকালব্যাপী কোন কাজই এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ দোষত্রুটিশূন্য দেখা যায় নাই। আমি অধর্ম্মের পক্ষে ওকালতী করিতেছি না। ধর্ম্মই সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা অবলম্বনীয়, ইহাই আমার মত। আমি কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, অধর্ম্মের লেশমাত্রশূন্য নহে বলিয়া মানুষ যখন জীবনের অন্যান্য কাজ পরিত্যাগ করে না, তখন সম্পূর্ণ ধর্ম্মপথে থাকিয়া যদি স্বাধীনতা লাভ করা না যায়, তাহা হইলে তাহা হইতেই বা বিরত থাকিবে কেন? দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরুন, ধর্ম্মপ্রচারকের কাজ খুব পবিত্র ও ধর্ম্মসঙ্গত। কিন্তু এমন ধর্ম্মপ্রচারকের নাম কেহ করিতে পারেন কি, যাঁহার কার্য্যে অধর্ম্মের লেশমাত্র ছিল না বা নাই? শিক্ষকের কাজ খুব পবিত্র ও ধর্ম্মসংগত; কিন্তু তাঁহারা ঐ কার্য্যে ছাত্রদের প্রতি ব্যবহারে বা স্বীয় কর্ত্তব্যপালনে, রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানের স্বাভাবিক অধিকার ভয়ে পরিত্যাগে, কিম্বা কোন কোন মিথ্যাকথাসংবলিত ভারতেতিহাস শিক্ষা দেওয়ায় তাঁহারা কোনও অধর্ম্ম করেন না কি? ধর্ম্মপথে থাকিয়াই স্বাধীনতার চেষ্টা করিব, কিন্তু অধর্ম্ম যদি আমাদের প্রকৃতিদোষে বা অন্য কারণে আসিয়া জুটে, তাহা হইলে জীবনের অন্যান্য কাজ যেমন ছাড়িয়া দি না, স্বাধীনতার চেষ্টাও তেমনি ছাড়িব না,—ইহাই বোধ হয় মানুষের ঠিক্ আদর্শ। কারণ, স্বাধীনতা ব্যতীত ধর্ম্ম রক্ষা হয় না। পরাধীন দেশে কোন্ ধর্ম্মোপদেশক সম্পূর্ণ সত্য কথা বলিতে পারেন? যীশুও পারেন নাই। তাঁহাকে কৌশলপূর্ণ উত্তর দিয়া ফিরূসীদিগকে নিরস্ত করিতে হইয়াছে। আমাদের দেশেও ত এখন অনেক ধর্ম্মোপদেষ্টা আছেন। তাঁহারা দেশের রাজনৈতিক ঘটনা ও অবস্থা সম্বন্ধে নির্ভীক ভাবে সম্পূর্ণ সত্য কথাটা কেন বলিতে বা লিখিতে পারিতেছেন না? কারণ, তাঁহারা পরাধীন। আমরাও খবরের কাগজ চালাইয়া প্রত্যহ, সত্য মত গোপন করিয়া, অধর্ম্ম করিতেছি। পরাধীন দেশে আদর্শ ধার্ম্মিকের কথা না বলাই ভাল।

পরিশেষে বক্তব্য, ধর্ম্ম এ জন্য অবলম্বনীয় নহেন যে তিনি স্বাধীনতা বা ঐশ্বর্য্য দেন; ধর্ম্মের জন্যই ধর্ম্ম অনুসরতব্য;—ফল যাহাই হউক।—প্রবাসীর সম্পাদক।

রাজা দেবী সিংহ।

(১)

কলঙ্ক টীকা।

Mr. Hastings was very far from indifferent to the character of the persons he dealt with. On the contrary, he made a most careful selection; he had a very scrupulous regard to the aptitude of the men for the purposes for which he employed them; and was much guided by his experience of their conduct in those offices which had been sold to them upon former occasions. Except Ganga Govind Singh (whom, as justice required, Mr. Hastings distinguished by the highesst marks of his confidence), there was not a man in Bengal, perhaps not upon earth, a match for this Devi Singh.—E. Burke.

বাঙ্গালার এমন দিন ছিল যখন গঙ্গাগোবিন্দ বা দেবী সিংহের নাম শ্রবণ করিলে লক্ষপতি হইতে পর্ণকুটীরবাসী পর্য্যন্ত সকলেই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত। কোম্পানী বাহাদুরের আমলে এই সকল অর্থ-গৃধ্নু নরপিশাচগণ নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি ও কোম্পানীর তুষ্টিবিধান মানসে বঙ্গদেশ উৎসন্ন দিতে বসিয়াছিল। তাহাদিগের ঘৃণিত চিত্র বাঙ্গালার ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালার কাহিনী বাঙ্গালীর সুখের চিত্র নহে—রক্তরাঙ্গা বেদনায় অশ্রুসিক্ত কাহিনী।

মহম্মদ রেজা খাঁ যখন কোম্পানী বাহাদুরের নায়েব-সুবাদার তখন দেবী সিংহ নানা অসদুপায়ে অর্থসঞ্চয় করিতেছিলেন। রেজা খাঁ তাঁহার নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন—দেবী সিংহের অদৃষ্ট ফিরিল—পূর্ণিয়া, রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের শিরে বজ্র পতন হইল—দেবী সিংহের ভবিষ্যৎ মুক্তির পথ সুগম হইয়া রহিল!

পূর্ণিয়া তখন ধনে জনে বাঙ্গালার একটী সুবিখ্যাত জনপদ বলিয়া পরিচিত ছিল। রেজা খাঁ দেবী সিংহকে পূর্ণিয়ার রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করিলেন। তিনি তথায় যাইয়াই (১৭৬৮) প্রায় সকল পরগণাগুলিই ইজারা লইলেন। তাঁহার কার্য্যকুশলতা ও অর্থলাভের উৎসাহে অল্পকাল মধ্যেই পূর্ণিয়া প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িল—তাহার সে শোভা, সে সমৃদ্ধি আর রহিল না। পূর্ণিয়া শ্মশান হইল! দেবী সিংহের ইজারার কাল শেষ হইলে যাঁহারা একান্ত আশান্বিত হইয়া পূর্ণিয়ার রাজস্ব আদায়ের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, দেশের অবর্ণনীয় দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহারা অবিলম্বে ইস্তফা দিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন এবং এক লক্ষ বিংশ সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিয়াও যে দায়মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন সে জন্য আপনাদিগকে পরম ভাগ্যবান্ মনে করিয়াছিলেন! * যে পূর্ণিয়া হইতে ১৬ লক্ষ মুদ্রা রাজস্ব আদায় হইত, দেবীসিংহের দোহন-নৈপুণ্যে সেই পূর্ণিয়া পরে ৬ লক্ষ মুদ্রার অধিক আর দিতে পারে নাই!

১৭৭০ খৃঃ অব্দে বঙ্গের সেই ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, দেবী-সিংহের রাজস্ব তাহাতে কমিল না—কোম্পানী-বাহাদুরের রাজস্বও কমিল না। দেশে ধান্য ছিল না, সুতরাং প্রজাগণ রাজস্ব দিতে পারিল না। মহম্মদ রেজা-খাঁ সে কথা শুনিলেন না—দেবী সিংহ কাহারও দুর্দ্দশার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না। তিনি জমীদারদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের সিন্দুক তখন শূন্য ছিল—দেবী-সিংহই উহা শূন্য করিয়াছিলেন! অগ্নিশিখা যেমন সর্ব্বদা অতৃপ্ত—দেবীসিংহও তদ্রূপ ছিলেন। তিনি জমীদারদিগের জাতি-কুল-মান ধ্বংস করিতে লাগিলেন—তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করিলেন—প্রহার করিলেন—অপমানিত করিলেন। তাহাতেও যখন বাঞ্ছিত অর্থ আসিল না, তখন পাপিষ্ঠ দেবীসিংহ তাঁহাদিগের জননী—ভগিনী—দুহিতাদিগকে কাছারিতে আনাইয়া অঙ্গের ভূষণাদি কাড়িয়া লইলেন এবং বিবস্ত্রা করিয়া সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করিলেন!*

দেবীসিংহের অত্যাচারকাহিনী অধিক দিন গুপ্ত থাকিল না। মহম্মদ রেজা খাঁ তখন পদচ্যুত হইলেন। সেনাপতি গেলেন বটে—কিন্তু উপযুক্ত অধিনায়ক দেবীসিংহ তখনও অক্ষত দেহে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে যে পরিদর্শন কমিটি বসিয়াছিল হেষ্টিংস বাহাদুর তাহার সভাপতি ছিলেন। কমিটীর বিচারে দেবীসিংহও পদচ্যুত হইলেন। বিচার শেষে হেষ্টিংস সাহেব মন্তব্য লিখিলেন—মানুষ যতদূর নৃশংসতা করিতে সক্ষম, মানুষ যে সকল ভীষণ কুকার্য্য করিতে পারে, তাহার কোনটাই দেবীসিংহের পক্ষে অসম্ভব নহে! গবর্ণর জেনেরলের স্বহস্তপ্রদত্ত কালিমা টীকা কালে দেবীসিংহের ভালে রাজটীকা স্বরূপ সুশোভিত হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক উপন্যাস "দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহে" আমরা দেখিতে পাই যে দুই ব্যক্তি কথোপকথন করি-

* They were so shocked at the hideous and squalid scenes of misery and desolation that glared upon them in every quarter, that they instantly fled out of the country, and thought themselves but too happy to be permitted, on the payment of a penalty of £12000, to be released from their engagements.—E. Burke.

* বাঙ্গালী যে এই অত্যাচার সহ্য করিয়াছিল, ইহা অপেক্ষা কলঙ্ক ও পাপ আর নাই। ইহার প্রায়শ্চিত্ত এখনও হয় নাই।—প্রবাসীর সম্পাদক।

তেছেন। একজন কৃষ্ণকায় দীর্ঘপুরুষ—তিনি দেবী সিংহ, এবং অপর আর একজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ—তিনি দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। গঙ্গাগোবিন্দ কহিলেন—

"মহাশয় দাগী হওয়াই ভাল। আবশ্যক মত সেই দাগ দেখিয়াই লোক বাছিয়া লওয়া যায়। সেই দাগ ছিল বলিয়া মুর্শিদাবাদের রাজস্ব সমিতির দেওয়ান হইয়াছেন।"

* * * *

"আপনার এই সকল কথার কিছু অর্থ আমি বুঝি না। গবর্ণর-জেনেরল যদি আমাকে কার্য্যদক্ষ বলিয়া মনে করিতেন, তবে ১৭৭২ সনের পরিদর্শনকালে আমাকে পদচ্যুত করিলেন কেন?

* * * *

"তিনি কি আর ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে বরখাস্ত করিয়াছিলেন, বিলাতি সভ্যতার অনুরোধে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের অনুরোধে আপনাকে তখন বরখাস্ত না করিলে চলে না, তাই আপনাকে বরখাস্ত করিয়াছিলেন।"

দেবী সিংহের কর্ম্মকুশলতা ধীরে ধীরে শুক্লপক্ষের শশীর ন্যায় পূর্ণাঙ্গ হইতে লাগিল। তখন হেষ্টিংস তাঁহার স্বহস্ত প্রদত্ত "রাজটীকা" অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং সেই ললাটতিলক দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য দেবী সিংহই উপযুক্ত অস্ত্র! তাই ১৭৭৩ সালে যখন কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা, বর্দ্ধমান, ঢাকা ও দিনাজপুরে রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রাদেশিক সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তখন দেবী সিংহই মুর্শিদাবাদের রাজস্ব আদায় করিবার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন!

মুর্শিদাবাদে দেওয়ান হইয়াই দেবী সিংহ দেখিলেন যে প্রাদেশিকসমিতি দামোক্লিসের তরবারির ন্যায় তাঁহার মস্তকের উপর বিলম্বিত রহিয়াছে। সে তীক্ষ্ণ অস্ত্র ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না—তাই তিনি অস্ত্রের পূজা আরম্ভ করিলেন! সে পূজা-পদ্ধতি অভিনব এবং দেবী সিংহেরই উপযুক্ত ছিল!

সেকালে বারবনিতাদিগের উপর একটী কর ধার্য্য ছিল। দেবী সিংহ তাহার ইজারা লইলেন এবং প্রকাশ্য ভাবে একটী বারবনিতাশালা খুলিলেন বলিলেও বলা যায়। সমিতির কর্ত্তাগণ তখন তরুণ যুবক—তাঁহারা চঞ্চলচিত্ত ও বিলাসী ছিলেন। তাঁহাদিগের তুষ্টিসাধনের জন্য দেবী সিংহ বাছিয়া বাছিয়া একদল সুন্দরী যুবতী রমণী সংগ্রহ করিলেন এবং নানাবিধ তরল শ্লথ ও উন্মাদনাপূর্ণ নামে তাহাদিগকে আখ্যাত করিয়া কামোন্মত্ত ইংরাজকর্ত্তাদিগকে জানাইলেন যে তাঁহার নারীবিপণিতে "তপ্তকাঞ্চন," প্রভৃতি অনায়াসে পাওয়া যায়! * তরুণ ইংরাজযুবকগণ ভূপের সুরা এবং দেবী সিংহের "তপ্তকাঞ্চন" প্রভৃতি লইয়াই পরম পরিতুষ্ট রহিলেন—তাঁহার কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করিবার আর অবসর রহিল না। তাঁহারা যখন ফরাসী মন্ত্রের মত্ততায় এবং "তপ্তকাঞ্চন প্রভৃতির রূপলাবণ্যে একান্ত বিমোহিত—একান্ত অজ্ঞান, যখন স্ফটিকাধারে উজ্জ্বল শেরি বা শ্যাম্পেন জ্বলিতেছে, যখন রমণীগণের লীলা-চঞ্চল অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে শত বিদ্যুৎ চমকিতেছে, যখন তাহাদিগের কলকণ্ঠে প্রাণ-মন বিমোহিত হইতেছে, যখন গ্রীষ্মাতিশয্যপূর্ণ আসিয়ায় বসিয়া শীতকামী ইংরাজ "পুঙ্গব" এইরূপে য়ুরোপের স্বর্গসুখ অনুভব করিতেন—সয়তান দেবী সিংহ তখন নিজে অবিচলিত থাকিতেন। সুরার তরঙ্গ—রমণীর লীলা-বিভঙ্গ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে, কোন্ মাহেন্দ্রক্ষণে, কোন্ উন্মত্ততার সাহায্যে তিনি তাঁহার ঘৃণিত কর্ম্মগুলি প্রাদেশিক সমিতির সভ্যদিগের নিকট হইতে 'মনজুর' করিয়া লইবেন, তখন দেবী সিংহ সর্ব্বদা সেই চিন্তাতেই ব্যাকুল থাকিতেন।

দেবী সিংহ ধীরে ধীরে নানা ছদ্মবেশে নানা নামে পরিচিত হইয়া নানাপ্রকার রাজস্বের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িলেন। কখনো বা আত্মপ্রকাশ করিয়া, কখনো বা আত্মগোপন পূর্ব্বক নামান্তর গ্রহণ করিয়া তিনি কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রাদেশিক সমিতি তখনও সুরা এবং রমণী লইয়াই মত্ত ছিলেন। একবার এমনও হইয়াছিল যে ছদ্মবেশধারী নামান্তরে পরিচিত দেবী সিংহ সরকারের কোন একটী রাজকর যোগাইতে না পারায় তাঁহার উপর বেত্রদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। দেবী সিংহকে সে দণ্ড ভোগ করিতে হয় নাই—তাঁহার প্রতিনিধি উহা

* For, if they (the names) were to be translated, they would sound—Riches of my life ; Wealth of my soul ; Treasure of Perfection ; Diamond of Splendour ; Pearl of Price ; Ruby of Pure Blood and other metaphorical descriptions that calling up dissonant passions to enhance the value of the general harmony, heightened the attractions of love with the allurements of avarice.—E. Burcke.

ভোগ করিয়া কোম্পানী বাহাদুরের আদেশের সম্মান রক্ষা করিয়াছিল !*

হেষ্টিংস সাহেব এতদিন নিদ্রিত ছিলেন না। তিনি আগ্রহের সহিত দেবী সিংহের ক্রমোন্নতি (!) দর্শন করিতেছিলেন ;—পিতা যেরূপ গর্ব্বস্ফীতহৃদয়ে পুত্রের ক্রমোন্নতি দর্শন করে সেইরূপ! সুচতুর হেষ্টিংস যখন বুঝিয়াছিলেন যে দেবী সিংহ এতদিনে কসিত কাঞ্চন সদৃশ হইয়াছেন, এতদিনে কর্ম্মক্ষম হইয়াছেন তখন একদিন অকস্মাৎ প্রাদেশিক সমিতির মত্ততা ছুটিয়া গেল। তাঁহারা ঘৃণার সহিত দেখিলেন, নরপিশাচ দেবীসিংহ কোম্পানী বাহাদুরের রাজস্বে ঘনমসী ঢালিয়া দিয়াছে! তাঁহারা তখন দেবী সিংহকে বিদূরিত করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন।

রাজা দেবী সিংহের অর্থের অভাব ছিল না—কিরূপে উৎকোচ গ্রহণ করিতে হয়, সে কালের অনেক ইংরাজও তাহা বিশেষরূপেই জানিতেন। তাই আশায় বুক বাঁধিয়া দেবী সিংহ তখন প্রাদেশিক সমিতির প্রত্যেক সভ্যকে যথোপযুক্ত উৎকোচ দিতে চাহিলেন—তাহার পর বিশেষ উৎকোচের প্রলোভন দেখাইলেন—শেষে কহিলেন, যে যাহা চাহিবে আমি তাহাই দিব—আমার ভাণ্ডারদ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছি!

কিছুতেই কিছু হইল না। প্রাদেশিক. সমিতি সেই ঘৃণিত উৎকোচের প্রস্তাবে পদাঘাত পূর্ব্বক দেবী সিংহকে পদচ্যুত করিতে বসিলেন। দেবী সিংহ আর কালবিলম্ব না করিয়া কোম্পানীর শিরোমণির অন্বেষণে চলিলেন। তিনি জানিতেন যে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ হেষ্টিংসের দক্ষিণ হস্ত, হেষ্টিংস বাহাদুর কোম্পানীর কর্ত্তা এবং উৎকোচ হেষ্টিংসের বিধাতা পুরুষ!

দেবী সিংহ গঙ্গাগোবিন্দের শরণ লইলেন। তাঁহার কলঙ্কটীকা রাজটীকা হইল।

২

যোগং যোগ্যেন যোজয়েৎ।

It was not enough that the English were thus sacrificed to the revenge of Debi Singh. It was necessary to deliver over the natives to his avarice. By the intervention of bribe brokerage he (Hastings) united the two great rivals in iniquity, who before, from an emulation of crimes, were enemies to each other, Ganga Govinda Singh and Debi Singh.—Burke.

বঙ্গের জমীদারগণ সেকালে প্রজাদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন—তাঁহারা তাহাদিগকে রক্ষা করিতেন, ধ্বংস করিতেন না। হেষ্টিংস সাহেব মনে করিতেন যে জমীর উপর জমীদারের কোন স্বত্ব নাই। হেষ্টিংস বাহাদুর অনেকের সহিত ইজারা বন্দোবস্ত করিলেন। কালে তাহাতে আদৌ কোন ঝঞ্ঝাট ছিল না। ইজারাদারগণ বাঙ্গালার রক্তশোষণ করিতেই আসিয়াছিল—বাঙ্গালাকে সজীব রাখিতে আসে নাই! অর্থলোলুপ ইজারাদারগণ অল্পকালের জন্য ইজারা গ্রহণ করিয়াই ছলে বলে বা কৌশলে বঙ্গের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইত এবং সেই অর্থ কোম্পানীর রাজস্ব ও প্রতিশ্রুত উৎকোচাদি প্রদান করিয়া আপনাদের শূন্য সিন্দুক পূর্ণ করিত!

যে সকল ইংরাজ কালেক্টরগণ সেকালে কোম্পানীর রাজস্ব আদায় করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিলেন—তাঁহারা রক্ষক না হইয়া ভক্ষক হইলেন। ইতিহাস-বিশ্রুত পাঁচসনা বন্দোবস্তের পর (১৭৭২) নবসৃষ্ট ইংরাজ তহশিলদারগণ বেনামী করিয়া ইজারা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যে রাজস্ব আদায় করিতেন তাহার অধিক পরিমাণই আত্মসাৎ করিতেন—কোম্পানী বাহাদুরের অর্থাগার শূন্যই থাকিত। সুতরাং কোম্পানীর রাজস্ব ক্রমেই বাকি পড়িতে লাগিল।

উৎকোচগ্রাহী হেষ্টিংস* ইংরাজ তহশিলদারদিগকে শাসন করিতে পারিতেন না ; পাছে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়া বিলাতে তাঁহার চরিত্র কীর্ত্তন করে এই ভয়ে তাঁহাকে সর্ব্বদাই নির্ব্বাক থাকিতে হইত! প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিলের উচ্ছেদ সাধন করা ক্রমে ক্রমে হেষ্টিংস সাহেবের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া উঠিল।

* And for one of those frauds committed by him in another name, by which he became deeply in balance to the revenues, he was *publicby whipped by proxy.*—E. Burke.

* "In the late proceedings of the Revenue Board" observes the majority of the council, "there is no species of *peculation* from which the Hon'ble Governor General has thought it right to abstain."

—History of India, Beveridge, p. 383.

বেহার প্রদেশ তখন বাঙ্গালার সহিত যুক্ত ছিল। মহারাজা সিতাবরায়ের পুত্র পাটনা বিভাগের অনেক জমী বন্দোবস্ত করিয়া লইতে চাহিলেন। পাটনা কৌন্সিলের সেরূপ অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু কল্যাণ সিংহ উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলেন; তিনি গবর্ণর জেনেরালকে চারি লক্ষ মুদ্রা উৎকোচ দিতে চাহিলেন! সুতরাং পাটনার প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিলও বিলুপ্ত করিবার আবশ্যকতা ঘটিল! *

কিছুদিন পর ইংরাজ তহশিলদারদিগের আমলে দেশীয় তহশিলদারগণ আসিয়া বসিলেন—এ দিকে তখন পাঁচসনা বন্দোবস্তের কালও শেষ হইয়া গেল। এই দীর্ঘ পঞ্চবর্ষ ধরিয়া হেষ্টিংস বাহাদুর দেখিয়া আসিতেছিলেন, যে প্রাদেশিক সমিতি জমীর বন্দোবস্ত করিলে তাঁহার কোনো লাভ থাকে না। সুতরাং দেশের শাসন-ব্যবস্থা ভাল হউক বা মন্দ হউক প্রাদেশিক সমিতিগুলিকে বিলুপ্ত করিতেই হইবে! সমিতির সভ্যগণ তখন শির উত্তোলন পূর্ব্বক দেবী সিংহকে দংশন করিবার জন্য রোষনেত্রে চাহিতেছিল। হেষ্টিংস সাহেব প্রমাদ গণিলেন। যদি গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এবং দেবী সিংহ না থাকেন তবে আর তাঁহার থাকিল কি? কোম্পানীর সিংহাসন ভাগীরথী মধ্যে নিমজ্জিত হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু দেবী সিংহ এবং গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে চাই-ই-চাই! যে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নামে সমগ্র ভারতভূমি বিবর্ণ হইয়া উঠিত, যে গঙ্গাগোবিন্দের ন্যায় পাপিষ্ঠ, ভীষণপ্রকৃতি, নিষ্ঠুর, খলস্বভাব, নৃশংস দস্যু তৎকালে আর ছিল না বলিলেও চলে†—হেষ্টিংস দেখিলেন, স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহাকে চাই-ই-চাই! যে দেবী সিংহের নাম করিলেও পাপ স্পর্শে, হেষ্টিংস অন্তরে অন্তরে বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহাকেও চাই, নতুবা বাঙ্গালার মসনদে বসিয়া লাভ নাই!

কিন্তু ডিরেক্টর সভা গবর্ণর জেনেরালের কোন কথাই শুনিলেন না—হেষ্টিংসের অনুচর এণ্ডারসন এবং বোগেল সাহেবের ১৭৭৬ সালের মফস্বল-রিপোর্টেও কোন ফল হইল না। তৎকালে নিয়ম ছিল যে ইংরাজ তহশিলদারগণ কিম্বা তাঁহাদের অধীনস্থ কোন ব্যক্তিই ইজারা গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু হেষ্টিংসের "বেনিয়ান্" কান্ত বাবু অন্যূন উনত্রিশটী পরগণা ইজারা লইয়াছিলেন। থান্দু বাহাদুর নাম গ্রহণ করিয়া মুঙ্গেরের তহশিলদার বৌম্যান্ সাহেব মুঙ্গের এবং খারিদাপুর ইজারা গ্রহণ করিলেন—থেকারে সাহেব গোপনে শ্রীহট্টের ইজারদার হইলেন! দুষ্ট লোকে কহে গবর্ণর জেনেরালের সভার অন্যতম সভ্য বারওয়েল সাহেবও এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। গবর্ণরজেনেরাল এবং বারওয়েল ইজারদার থেকারের কার্য্যাদি গোপন করিবার জন্য যে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, ডিরেক্টর সভার পত্রাদিতেই তাহার প্রমাণ আছে।* ডিরেক্টর সভা সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিল উঠাইয়া দিতে অসম্মত হইলেন। †

ডিরেক্টর সভার বিরুদ্ধে বীরের ন্যায় অস্ত্রধারণ করিবার শক্তি হেষ্টিংস সাহেবের ছিল না। তিনি তখন কি করিলেন? তাঁহার স্বদেশীয়ের বাক্য আজিও মেঘমন্দ্রে সেই কথা কহিয়া থাকে—দ্বিধাশূন্য সঙ্কোচশূন্য হেষ্টিংস নিরপরাধী কর্ম্মচারীদিগকে বিক্রীত করিলেন; কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ—কর্ত্তব্যের অনুরোধে হেষ্টিংস সাহেব যাহাদিগকে আশ্রয় দিতে বাধ্য ছিলেন—তিনি তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন; যে সকল ইংরাজপ্রজা, জাতীয় সহানুভূতির বন্ধনে তাঁহার সহিত আবদ্ধ হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকেও বিক্রয় করিলেন—এমন কি ইংরাজের সম্মান পর্য্যন্ত তিনি বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন! বিনা অভিযোগে—বিনা অপরাধে—অপরাধের সন্দেহ পর্য্যন্ত না থাকাতেও তিনি কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকে সে দেশের (বাঙ্গালার) একজন ঘৃণিত পরিত্যক্ত ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিলেন!

'মুর্শিদাবাদ কৌন্সিল দ্বাদশ বর্ষ ধরিয়া সে দেশ (বাঙ্গালা) শাসন করিতেছিল (ভারতের পরিবর্ত্তনশীল' ইতিহাসে

* Edmund Burke in 1788.

† Edmund Bruke in 1788.

* Company's General Letter, paras 45 and 48, Dated 28th Nov., 2777, and para 131 of General Letter, Dated 23rd Dec., 1778.

† Company's General Letter to Bengal, paras 36 and 37, Dated 4th July, 1777.

বারশবর্ষ অতিশয় দীর্ঘ কাল), যখন সেই কৌন্সিল অনেকাংশে সুদৃঢ় এবং অভিজ্ঞ হইয়াছিল, যখন কর্ম্মতৎপর হইয়া সেই কৌন্সিল পূর্ব্বকৃত ভ্রমসংশোধনে নিযুক্ত ছিল —হেষ্টিংস সাহেব সেই সময়ে শুধু দেবী সিংহের জন্য উহা বিলুপ্ত করিয়া দিলেন!'*

তখন কর্ণেল মন্‌সন্‌ এবং জেনেরাল ক্লেবারিংকে সমাহিত করিয়া, ফ্রান্সিস্‌ সাহেবকে নিক্ষিপ্ত করিয়া হেষ্টিংস নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পাইয়াছিলেন। বাঙ্গালায় যখন সততা ও সম্মানের রাজত্ব ছিল, হেষ্টিংস সাহেব তখন বাধ্য হইয়া পরস্বাপহরণ হইতে বঞ্চিত ছিলেন—এখন নির্মক্ষিক হইয়া তিনি তাহার সুদসহ আদায় করিবার জন্য আত্মচরিত প্রকাশ করিয়া বসিলেন।

দেবী সিংহের প্রতিহিংসামন্দিরতলে শুধু যে ইংরাজদিগকে বলি দিয়াই হেষ্টিংস সাহেব ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে—তাঁহার ধনলিপ্সার সম্মুখে নির্দ্দোষী ভারতবাসীদিগকেও সমর্পণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। গঙ্গাগোবিন্দ এবং দেবী সিংহ যদিও পরস্পর পরস্পরের শত্রু ছিলেন, কিন্তু উৎকোচের দালালীর খাতিরে হেষ্টিংস সাহেব সেই প্রতিদ্বন্দ্বী পাপিদ্বয়কে একত্র মিলাইয়া দিয়াছিলেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ মধ্যস্থ হইয়া গবর্ণরজেনেরালের সহিত দেবী সিংহের উৎকোচ এবং ইজারার কথাবার্ত্তা জানাইতে লাগিলেন! শেষে দেবী সিংহ একদিন দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও ইদ্রাকপুরের ইজারা প্রাপ্ত হইয়া দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস একদিন যাঁহাকে সর্ব্বপাপক্ষম বলিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, কালপূর্ণ হইলে তাঁহার সেই কলঙ্কটীকা রাজটীকা হইয়া উঠিল।

দেবী সিংহের আগমনেই রঙ্গপুরের রাজস্ব সাত লক্ষ মুদ্রা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কাগজপত্র ঠিক রাখিবার মানসেই বোধ হয় হেষ্টিংস সাহেব তখন আদেশ দিলেন—কৃষির উন্নতি বিধান করিয়া ইজারাদার দেবী সিংহ রঙ্গপুরের বর্দ্ধিত জমা আদায় করিবেন, অত্যাচার করিয়া নহে।

বঙ্গভাগ্যলক্ষ্মী তখন একান্ত অপ্রসন্না হইয়াছিলেন। দিনাজপুরের মহারাজা তাই একটী দত্তক পুত্র রাখিয়া ১৭৮০ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করিলেন। সিংহাসনের অধিকার লইয়া সেই দত্তক পুত্রে এবং মহারাজার বৈমাত্রের ভ্রাতায় বিবাদ আরম্ভ হইল। বঙ্গের রক্ষক হেষ্টিংস বাহাদুর নিজে সেই বিবাদ মিটাইতে বসিয়া দত্তক পুত্রকে পিতার রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। হেষ্টিংস সাহেব এই সুযোগ পরিহার না করিয়া চারিলক্ষ মুদ্রা "মেহনৎ আনা" গ্রহণ করিলেন—দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ এই উৎকোচের দালালী করিয়াই যশস্বী হইলেন!

একজন ইংরাজ গুড্‌ল্যাড্‌ এই সময়ে কলেক্টর রূপে অবতীর্ণ হইয়া বাঙ্গালী গুড্‌ল্যাডের সহিত মিলিত হইলেন। রঙ্গপুর দিনাজপুর ও ইদ্রাকপুর তাঁহাদিগের শাসনে ত্রাহি ত্রাহি ডাকিয়া উঠিল! রঙ্গপুরে তখন ইংরাজ গুড্‌ল্যাড্‌ কলেক্টার—বাঙ্গালী গুড্‌ল্যাড্‌ তাঁহার দেওয়ান এবং সেই সঙ্গে সমগ্র দেশের ইজারাদার। যোগ্যের সহিত যোগ্যের মিলন হইল।*

নাবালকের সংসারে ব্যয়বাহুল্য দর্শনে ব্যথিত হইয়া গুড্‌ল্যাড্‌গণ তখন পুরাতন রাজকর্ম্মচারীদিগকে বিতাড়িত করিলেন। ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য রাণী যে মুশহারা পাইতেন অবিলম্বে তাহা রহিত হইয়া গেল—রাজভ্রাতার প্রাপ্য ১৬০০০ টাকা সঙ্কুচিত হইয়া ৬০০তে আসিয়া দাঁড়াইল—এমন কি রাণীর পিতা বা অন্য আত্মীয় কেহ আসিলে রাজবাটীতে আর আহার পাইত না! এদিকে ম্যানেজার গুড্‌ল্যাড্‌ সাহেবের বন্ধুবান্ধবগণ রাজসরকারের ব্যয়ে শেরি শ্যাম্পেনের শ্রাদ্ধ করিতে লাগিলেন!

রঙ্গপুরের ঐতিহাসিক গ্লেজিয়র সাহেব বলিয়াছেন, দেবী সিংহ যতই কেন কুক্রিয়াসক্ত না থাকুন, গুড্‌ল্যাড্‌ সাহেবের সহিত সে সকল কুকর্ম্মের কোন সংশ্রব ছিল না। এদ্মন্দ বার্ক হেষ্টিংসের নামে অভিযোগ করিবার সময় এতই বিচারবিবেচনাশূন্য হইয়াছিলেন যে গুড্‌ল্যাডের নামেও অযথা দোষারোপ করিয়াছিলেন!†

ইতিহাস গ্লেজিয়র সাহেবের উক্তির বিচার করিবে।

৩

নরমেধ যজ্ঞ।

I Charge him (Mr. Hastings) with having committed to the management of Debi Singh three great

* Edmund Burke.

* Glazier's Rungpore.
† Do Do

provinces; and thereby, with having wasted the country, ruined the landed interest, cruelly harassed the peasants, burnt their houses, seized their crops, tortured and degraded their persons, and destroyed the honour of the whole female race of that country.

—E. Burke.

দেবী সিংহের ইজারা লইবার পূর্ব্ব হইতেই দিনাজপুর, রঙ্গপুর প্রভৃতির আর সে পূর্ব্ব সমৃদ্ধি ছিল না। জমীদারগণ সেই সময়েই সরকারী রাজস্ব সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিতে পারে নাই। দেবী সিংহ আসিয়াই তাঁহাদিগের নিকট বৃদ্ধি জমা চাহিলেন। একে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে লোকক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে আয়ক্ষয়, তাহার পর আবার পাঁচশালা বন্দোবস্ত কালে বৃদ্ধি জমায় জমী গ্রহণ! জমীদারগণ দেবী সিংহের আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিলেন না। দেবী কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাদিগকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। নিরপরাধ জমীদারগণ লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া সে কালের ছাদহীন কারাগৃহে অতি কষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা ইস্তফা দিতে চাহিলেন, বাকি রাজস্বের জন্য তাঁহাদিগকেও কারারুদ্ধ হইতে হইল। যখন যন্ত্রণা অসহ্য হইল, তখন তাঁহারা নিরুপায় হইয়া বৃদ্ধি হারে কবুলিয়ত দিতে সম্মত হইলেন—কোন প্রকারে জীবন রক্ষা হইল!

জমীদারদিগকে একবার আত্মবশে লইয়াই রাজা দেবী সিংহ নূতন নূতন কর ধার্য্য করিতে লাগিলেন। ভূস্বামী-দিগের যথা সর্ব্বস্ব সেই দায়ে বিকাইতে লাগিল! দেবী সিংহ সেই সকল সম্পত্তির মূল্য হ্রাস করিয়া দিয়া নিজেই সমুদয় ক্রয় করিয়া লইলেন! ইহাতেও জমীদারদিগের ঋণ শোধ গেল না। সুতরাং স্থাবরের সঙ্গে সঙ্গে অস্থাবর দ্রব্যাদিও বিক্রীত হইয়া গেল! রমণী ভূস্বামিনীদিগের গৃহের চতুর্দ্দিকে সশস্ত্র সৈনিক প্রভুরা প্রহরীকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পলায়নের পথ রুদ্ধ করিয়া দিল। তখন নারী পেয়াদাগণ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা পাইল তাহাই লইতে লাগিল। তখন পর্য্যন্তও দেবী সিংহ রমণীর সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন।

দেবী সিংহ কর্ম্মোপলক্ষে দিনাজপুরেই থাকিতেন। তাঁহার কর্ম্মচারী কৃষ্ণপ্রসাদ রাজস্ব আদায়ের জন্য রঙ্গপুরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কোন কোন জমীদার দেবী সিংহের নিকট আবেদন জানাইবার মানসে দিনাজপুর যাত্রা করিয়াছিলেন। দেবী সিংহ সেই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ প্রসাদের অক্ষমতা দর্শনে তাঁহার স্থানে হররামকে প্রেরণ করিলেন ও সেই সঙ্গে আবেদনকারী করুণাপ্রার্থী ভূস্বামি-গণও বন্দিরূপে রঙ্গপুরে প্রেরিত হইলেন! শৃঙ্খলাবদ্ধ জমীদারগণ তখন হররামের বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন!

দেশের জমীদারদিগেরই যখন এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তখন রামধন, মবারক ও জবান্ অস্কন্দের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। দেবী সিংহ নিজেই একবার বলিয়াছিলেন—"এ দেশের সকল স্থান অপেক্ষা রঙ্গপুরের কৃষকগণই নিতান্ত দরিদ্র। ফসলের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে তাহাদিগের কপর্দ্দকও থাকে না।... কয়েক খানি মৃণ্ময় তৈজস ও খড়ের ভগ্ন জীর্ণ কুটীর ভিন্ন কৃষকদিগের আর কিছুই নাই!" অথচ দেখিতে পাওয়া যায়, এই প্রকার ধনাঢ্যদিগের নিকট হইতেই ইজারাদারের নিজ লভ্যাংশ এবং বৃদ্ধি জমা ছাড়াও হেষ্টিংস সাহেবের চারি লক্ষ মুদ্রা উৎকোচ আদায় করা হইয়াছিল!

যতই অর্থের অভাব হইতে লাগিল দেবী সিংহের চরগণ ততই চতুর্দ্দিকে রাক্ষসের মত ছুটিয়া দরিদ্র নিরন্ন হতভাগ্য কৃষকদিগকে বন্ধন করতঃ ছলে, বলে ও কৌশলে বৃদ্ধি জমার কবুলিয়ত আদায় করিয়া লইতে লাগিল। তাহারা তখন ঋণগ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। উত্তমর্ণগণ এই সুযোগে কৃষকদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজেদের অর্থলালসা পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। হেষ্টিংস সাহেবের প্রাপ্য উৎকোচ এবং পেষকস্ পরিশোধ করিবার জন্য হতভাগ্য অন্নহীন দীন দরিদ্রগণ শতকরা কত হারে সুদ দিয়া ঋণ গ্রহণ করিয়া-ছিল? পাঁচ, দশ, কুড়ি, চল্লিশ মুদ্রা? ইহার অধিক আর কল্পনায় আইসে না। কিন্তু দেবী সিংহের কালে কল্পনা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। শতকরা ছয় শত মুদ্রা সুদে যে দেশের কৃষকগণ ঋণ গ্রহণ পূর্ব্বক কোম্পানীর রাজস্ব পরিশোধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, সে দেশ বিধাতার অভিসম্পাতে ভস্মসাৎ হয় নাই কেন তাহাই বিস্ময়ের বিষয়।*

* And what were the terms these poor people were obliged to consent to to answer the bribes and peshkush

রামধন ও মবারক কারাগারে গেল—দেবী সিংহের দূতেরা তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ফেলিল—দুর্ব্বৎসরের জন্য সঞ্চিত ধান্য পর্য্যন্তও রাখিল না! এত করিয়াও দেবী সিংহের আশা মিটিল না।

তিনি প্রতিদিন যতই বিফল মনোরথ হইতে লাগিলেন ততই তাঁহার ক্রোধ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন গৃহস্থগণ কোন গুপ্ত স্থানে অর্থ লুকাইয়া রাখিয়া তাহাকে ফাঁকি দিতেছে। তাই তাঁহার আদেশে গৃহস্থদিগের শূন্য গৃহ পর্য্যন্ত পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। তাহারা তখন কারাগারে। গৃহ গেল, তৈজসাদি গেল, শস্য গেল, পশ্বাদি গেল—যখন সমস্তই গেল তখন রহিল শুধু তাহাদিগের শক্তিহীন দেহ ও অন্নহীন পরিবার-পরিজন। রাজকর দিতেই হইবে—তাহাতে ক্ষমা নাই, কৃপা নাই, মুক্তি নাই! অবশেষে পিতা পুত্রকে বিক্রয় করিয়া—স্বামী স্ত্রীকে বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে রাজস্ব এবং উৎকোচ পরিশোধ করিতে লাগিল! হেষ্টিংস সাহেবের অত্যাচারে পিতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভগিনী, পতি-পত্নী প্রভৃতি স্নেহের সম্বন্ধগুলি লুপ্ত হইয়া গেল—রঙ্গপুরে আর স্নেহ মমতা কিছুই রহিল না!*

দেবী সিংহ মনে করিলেন 'এখনো হয় নাই—আর একটু অধিক শাস্তি না দিলে অর্থ আদায় হইবে না, গুপ্ত শস্যাদিও পাওয়া যাইবে না।' কিন্তু তখন কেবল অবশিষ্ট ছিল বেত্রাঘাত-বিক্ষত কারাক্লিষ্ট অর্দ্ধজীবিত দেহ। হতভাগ্য রামধন ও মবারক সেই দেহ রক্ষার জন্যই গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে চাহিল—কিন্তু তাহার উপায় ছিল না, পথে পথে সৈনিকের ঘাঁটি বসিয়াছিল। দেবী সিংহ সেই সকল সৈনিকদিগের বেতন দিতেন না—রামধন ও মবারক নিজেদের চরণশৃঙ্খলের মূল্য প্রদান করিতে বাধ্য হইল—সেই নবীন আবওয়াব "চৌকীবন্দী" নামে পরিচিত থাকিয়া আজিও দেবী সিংহের অত্যাচার কাহিনী কহিতেছে!

কারাগার, গৃহদাহ, ভয়প্রদর্শন প্রভৃতি যখন ব্যর্থ হইয়া গেল—তখন দেবী সিংহের রাক্ষসী প্রকৃতি রক্ত চাহিল—দরিদ্র, নিরন্ন, সহায়-সম্বলবিহীন কাঙ্গালের রক্ত চাহিল!! তিনি জানিতেন যে হেষ্টিংসের প্রাপ্য কড়ায়-গণ্ডায় পরিশোধ করিতেই হইবে—হেষ্টিংস বিলম্ব মানিবেন না, কপর্দ্দক কমও লইবেন না। দেবী-দূত তখন রামধন, মবারক ও জবান অস্কন্দদিগকে ধৃত করিয়া তাহাদিগের হস্তের অঙ্গুলীগুলি কঠিন পেষণে বন্ধন করিল। সে বজ্র-বন্ধনে একটী অঙ্গুলী অপরটীর সহিত যেন মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেল। দুর্ব্বৃত্তগণ তখন সেই নিষ্পিষ্ট অঙ্গুলী-গুলির মধ্যে সুতীক্ষ্ণ লৌহশলাকা প্রবিষ্ট করাইবার জন্য শলাকাশিরে মুদ্গর প্রহার করিতে লাগিল! হৃদয়বিদারক করুণ আর্ত্তনাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। হায়, দুরন্ত দেবী সিংহের হৃদয় তাহাতে গলিল না।

আঘাতের পর আঘাতে সেই লৌহ শলাকা দৃঢ়বদ্ধ অঙ্গুলী-গুলি ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া প্রবেশ করিতে লাগিল—রামধন ও মবারকের হস্ত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া অত্যাচারকারীদিগের পদতলে পতিত হইল। যে ক্ষীণ হস্ত হয়ত একবেলা ভিন্ন অনেক দিন দুই বেলা অন্ন তুলিয়া মুখে দিতে পারে নাই—যে বাহুর বলে ধরণীবক্ষ হইতে স্বর্ণরাশি উত্থিত হইয়া পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত কোম্পানী বাহাদুরের চীন বাণিজ্যের অর্থ যোগাইয়াছিল—যে অর্থ প্রতি বৎসর বিলাতে যাইয়া লর্ড দিগের "ডিনার" সজ্জিত করিত, লণ্ডনের শোভা বর্দ্ধন করিত—সেই বাহু এখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল।

সম্পন্ন এবং প্রধান গৃহস্থগণ, গ্রামের দলপতিগণ কৃষকগণ তখন পদে পদে সম্বদ্ধ হইয়া যুগলে যুগলে আনীত হইতে লাগিল। একখানি কাষ্ঠের উপর তাহাদিগকে অবনত শিরে স্থাপন করিয়া নৃশংসগণ পদতলে বেত্রাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। সেই নিদারুণ আঘাতে যতক্ষণ পাদাঙ্গুলী হইতে নখ খসিয়া না পড়িল, ততক্ষণ সে আঘাতের বিরাম ছিল না। যখন নখ খসিয়া গেল—যখন রুধির স্রোতঃ ছুটিল, তখন সেই যমদণ্ড আবার ভীমবেগে তাহাদিগের অবনত-শিরে পতিত হইতে লাগিল! দেখিতে দেখিতে নয়নে, বদনে, নাসিকায় রক্ত-নদী বহিল। সেই সুতপ্ত-তরল শোণিতে আপন আপন পাদমূল রঞ্জিত করিয়া সয়তানের অনুচরগণ হতভাগ্য-দিগকে কারামধ্যে নিক্ষেপ করিল!

---

paid to Mr. Hastings? five, ten, twenty, forty per cent? No! at an interest of six hundred per cent per annum, payable by the day!—E. Burke.

* The tyranny of Mr. Hastings extinguished every sentiment of father, son, brother and husband!

—E. Burke.

সাধারণ বেত্র বা বংশযষ্টি নিগ্রহের পক্ষে উপযুক্ত নহে বিবেচনায় সকণ্টক বিল্বশাখা আসিল। তখন দীনের দেহ বেত্রের পরিবর্ত্তে বিল্বশাখার আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল—প্রতি আঘাতে শত কণ্টক দেহ মধ্যে বিদ্ধ হইয়া মাংস, মেদ, মজ্জা টানিয়া ছিঁড়িতে লাগিল! বিছুটীর যাতনাময় দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কাহারও কাহারও দেহে দোষযুক্ত ক্ষত দেখা দিল—জ্বালা!—জ্বালা!—অগ্নিময়ী জ্বালায় তাহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল!

দেখিতে দেখিতে রাত্রি আসিল। বিশ্বসংসার তখন নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে অচেতন, কিন্তু দেবী সিংহের বন্দীদিগের নিদ্রা ছিল না—নিদ্রার অবসর ছিল না। তাহারা প্রতি রজনীতে তিনবার করিয়া প্রহৃত হইয়া প্রহর গণনা করিতে বাধ্য হইত!

ধীরে ধীরে রজনী প্রভাত হইতে চলিয়াছে, তখনও অরুণোদয় হয় নাই। মাঘের দারুণ শীতে জীব-জগৎ জড়বৎ অবস্থান করিতেছে—উত্তরপবন শরীর মধ্যে সূচীবিদ্ধ করিয়া দিতেছে। সেই সময়ে দেবী সিংহের অথবা যমের কারাদ্বার মুক্ত হইল; প্রহরীদিগের পশ্চাতে পশ্চাতে ভগ্নপাদ ভগ্নবাহু শতক্ষতপূর্ণদেহ বন্দিগণ অতি কষ্টে বাহিরে আসিল—অতি কষ্টে প্রহরীদিগের অনুসরণ করিতে লাগিল। উহারা কোথায় যাইতেছে? শ্মশানে না মশানে? শ্মশানে নহে, মশানে নহে; ওই দেখ, উহারা সেই দারুণ শীতে তুহিনশীতল বারি মধ্যে আগ্রীব নিমজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে—ওই দেখ, শীতে উহাদিগের অস্থি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিতেছে, দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ হইতেছে। তারপর দেখ, দেবী সিংহের অনুচরদিগের সেই সকণ্টক বিল্বশাখা বা বিছুটীর যষ্টি উহাদিগের সিক্তদেহে পতিত হইতেছে—ওই শুন, মর্ম্মস্পৃক্ যাতনায় আর্ত্তনাদ মুখ ফুটিয়া বাহির হইতে পারিতেছে না—শীতে কথা ফুটিতেছে না! ওই দেখ, ছিন্নদেহ শতছিন্ন হইয়া রুধির স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে। দয়া নাই—লজ্জা নাই—করুণা নাই—মৃত্যুও নাই!

মাঘের হিমরজনী প্রভাত হইল। তরুণ অরুণ রক্তরাজা হইয়া পূর্ব্বগগনে হাসিয়া উঠিল। সৈনিকদিগের উলঙ্গকৃপাণে, পরিচ্ছন্ন বসনে সেই অরুণরাগ ঝলসিয়া উঠিল। তাহাদিগকে দেখিয়া গ্রামের নরনারী উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল—মৃগ যেমন সিংহকে দেখিয়া পলায়ন করে সেইরূপ। ওই দেখ সৈনিকদিগের পশ্চাতে হারাধন ও গঙ্গারাম কিনু সর্দ্দার ও মতিমৃধা পড়িতে পড়িতে পথ হাঁটিতেছে। হাঁটিতে হাঁটিতে ভূমিতলে পতিত হইতেছে। তাহাদিগের নগ্নদেহ শত স্থানে ছিন্ন—শতধারে রক্ত বহিতেছে। দেবী সিংহের সৈনিক যখন হারাধনের গৃহের নিকটে আসিল, তখন বজ্রনিনাদে ডাকিয়া কহিল—

"কোথায় চাউল লুকাইয়া রাখিয়াছিস্ দে—"

"আমি চাউল কোথায় পাইব?"

"তবে চল্, টাকা ধার কর।"

"আমি আর ধার করিব না, কে আমাকে ধার দিবে?"

"চল্ তবে আবার কারাগারে।"

হারাধন তখন কি করিবে? পুনরায় কারাগৃহ অভিমুখে চলিতে লাগিল—যাইতে যাইতে দেখিল তাহার জীর্ণ কুটীর অগ্নিসংযোগে জ্বলিতেছে—সৈনিকগণ তাহার পুত্র ও পত্নীকে বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে।

এই সকল অত্যাচার দেখিয়া যাহারা একান্ত মরিয়া হইয়াছিল, তাহারা অত্যাচারকারীদিগের বশ্যতা স্বীকার করিল না—অম্লানবদনে সকল যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও অটল রহিল। তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাদের পুত্র কন্যা কারাদ্বারে আনীত হইল। পাষণ্ডগণ পিতার সহিত পুত্রকে দৃঢ়বন্ধনে বাঁধিয়া কখনো বা পুত্রকে—কখনো বা পিতাকে প্রহার করিতে লাগিল। যে বেত্রদণ্ড হয়ত পিতার দেহ লক্ষ্য করিয়া উত্থিত হইয়াছিল তাহা যদি অকস্মাৎ তাহাকে স্পর্শ করিতে না পারিল—তথাপি একেবারে বৃথা গেল না। উহা সেই ভীত রোরুদ্যমান রুধিরাপ্লুত দেহ ক্ষুধাকাতর শুষ্ককণ্ঠ সন্তানের কোমল দেহের উপর পতিত হইয়া তাহার মাংস কাটিয়া লইল—পুত্রের শোণিতে পিতার হৃদয় রঞ্জিত হইয়া গেল—মুমূর্ষু সন্তান "বাবাগো" বলিয়া পিতার দেহের উপর ঢলিয়া পড়িল! তখনো বিরাম নাই, তখনো প্রহারের শেষ নাই! হারাধন আর সহ্য করিতে পারিল না। চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কহিল, 'দোহাই তোমাদের আমার কালুকে আর মারিও না, আমি এখনই টাকা কর্জ্জ করিয়া খাজানা দিতেছি।'

পৃথিবীতে বুঝি আর এমন দেশ নাই যে দেশের ইতিহাস এইরূপ কৃষ্ণবর্ণ—এইরূপ পাপলিপ্ত—এইরূপ ঘৃণিতচিত্রে পূর্ণ! পাঠক! তুমি চক্ষু ফিরাইও না।

ওই দেখ মবারকের দুহিতা, রামধনের বনিতা, দাদাঠাকুরের পুত্রবধূ দেবী সিংহের অন্ধকার কারাগৃহে, অন্ধ গহ্বর মধ্যে বন্দিনী। ওই দেখ, তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক টানিয়া বাহির করিয়া দেবী সিংহের দূতগণ নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতেছে—ওই দেখ, তাহাদিগের নগ্নদেহ ফাটিয়া রক্ত ছুটিতেছে! বেদনার দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই—তাহারা কাতরে কাঁদিয়া কহিতেছে, 'যদি কেহ পুত্র থাক নয়ন নিমীলিত কর—উলঙ্গিনী জননীর দিকে চাহিও না!' ওই দেখ, কোন যুবতীর উন্নত কুচ-যুগে বংশের বাতা চাঁচিয়া বাঁধিয়া দিয়া প্রহরিগণ হাসিতেছে—বংশখণ্ড স্তনদ্বয় ছিন্ন করিয়া লইয়া ছুটিয়া যাইতেছে! ওই দেখ, প্রজ্জ্বলিত মশাল জীবজগতের জন্মস্থান দগ্ধ করিয়া দিতেছে! পশুও যে সেও লজ্জাশীলতা রক্ষা করে—হায়! সে কালে মানুষেও তাহা করে নাই! ধন্য অর্থলিপ্সা—ধন্য হেষ্টিংস বাহাদুর—ধন্য পাপাচারী রাজা দেবী সিংহ!

করুণ-হৃদয় পাঠক! তুমি কি আরও দেখিতে চাও? তবে দেখ, অসূর্য্যম্পশ্যা কুলকামিনীগণ ভয়ে রোদনবিহ্বলা। ওই দেখ, 'রক্ষা কর—রক্ষা কর' বলিয়া তাহারা বিচার-মণ্ডপতলে লুটাইয়া পড়িতেছে! কিন্তু হায়, যে আসন ধর্ম্মের জন্য—পাপের জন্য নহে—সেই আসনে বহুদিন হইতে আর ধর্ম্মপ্রাণ ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক বসিয়াছিলেন না, সে আসন তখন হেষ্টিংস সাহেবের দুর্ব্বৃত্ত লুঠেড়া ঘাতকগণে পূর্ণ ছিল। রমণীগণ সেই আসনতলে দণ্ডায়মান হইয়া যুক্তকরে কাঁদিয়া কহিতেছে—'রক্ষা কর, জাতি রক্ষা কর—ধর্ম্ম রক্ষা-কর!' দেবী সিংহের হৃদয় কি টলিল?

হতভাগিনীদিগের হস্তপদবদ্ধ পিতা বা ভ্রাতা বা পতি বা পুত্র তখন একান্ত শক্তিহীন। তাহারা কি করিবে? নীরবে সহস্রবৃশ্চিকদংশন সহ্য করিতে লাগিল। দেবী-সিংহের অনুচরগণ—সেই নরপিশাচগণ ওই দেখ, রমণীদিগকে স্পর্শ করিল—ওই দেখ বলপ্রয়োগে তাহাদিগকে সর্ব্বসমক্ষে উলঙ্গিনী করিল! তার পর বিশ্বসংসার অন্ধকার হইয়া গেল—সর্ব্বলোচন সমক্ষে সতীর ধর্ম্ম নষ্ট হইল! পিতার সমক্ষে কন্যার—ভ্রাতার সমক্ষে ভগ্নীর—পতির সমক্ষে পত্নীর ধর্ম্ম গেল—বঙ্গভূমি অনন্ত পাপসাগরে নিমজ্জিত হইল!

শ্রী————

প্রবাসীর পত্র।

অনেক দিন হইতে আমার জীবনের ইচ্ছা যে এমেরিকা যাইয়া কোন প্রকার কার্য্য শিখিয়া আসি। ভগবানের কৃপায় আজ (২রা জুন) সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইল। এখানে মাদ্রাজ হইতে চামড়া তৈয়ার করা কার্য্য শিখিয়া আজ এমেরিকায় তাহা আরো ভালরূপ শিখিবার জন্য রওনা হইতেছি। আজ সকাল ৮॥০ টার সময় আমাদের জাহাজ ছাড়িবে। সকালে ৫॥০টার সময় উঠিয়া মুখ হাত প্রক্ষালন করিয়া পোষাক পরিয়া ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে জাহাজের জন্য রওনা হইলাম। চাঁদপাল ঘাট হইতে ছোট Steam Launchএ করিয়া আমাদের জাহাজে লইয়া গেল। যখন জাহাজ ছাড়িল তখন মনে এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হইল। সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে ছাড়িয়া আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে ছাড়িয়া কোথায় এক নূতন স্থানে চলিয়াছি। কেবল মনে হইতে লাগিল যে যখন ভাল কার্য্যের জন্য যাইতেছি তখন ভগবানের কৃপায় কখনই মন্দ হইবে না। ক্রমশ জাহাজ ছাড়িল। এক এক করিয়া পরিচিত স্থানগুলিকে পশ্চাতে রাখিয়া আমাদের জাহাজ বঙ্গ উপসাগরের দিকে চলিল। আমি একখানি চেয়ার লইয়া জাহাজের ডেকের উপর বসিয়া নানা রকম বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল তখন নিজের কেবিনে যাইলাম! এই জাহাজের নাম "ডানেরা" (Dunera)। যখন প্রভাত হইল তখন দেখি যে মাথা ঘুরিতেছে ও গা বমি বমি করিতেছে। ইংরাজীতে ইহাকে Sea-sickness বলে। সেদিন আদৌ উঠিতে পারিলাম না এবং কিছু খাইতেও পারিলাম না। দুইদিন এই অবস্থায় থাকিয়া তৃতীয় দিনের দিন আস্তে আস্তে ডেকে যাইয়া বসিলাম। সেদিন কিছু খাইতেও পারিলাম।

আমি যখন আসি তখন অনেকের নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম যে জাহাজে ব্যবহারের জন্য একটী কিম্বা দুইটী পোঁষাক হইলেই হয় কিন্তু সেটা বড় ভুল। অন্তত ৩টী সাদা প্যাণ্টালুন ও কোট এবং একটী কোনরূপ কাল রংএর ছিটের কোট ও প্যাণ্টালুন চাই। ইহা ছাড়া ৩টী কিম্বা ৪টী টুইলের সার্ট চাই। সার্টগুলির প্লেট ও শক্ত কাফ্ না থাকাই ভাল। ক্রমশ চতুর্থ দিনের দিন আমাদের জাহাজ মাদ্রাজ আসিয়া পৌঁছিল। মাদ্রাজে জাহাজ দুইদিন ছাড়িয়া ৮ দিনের দিন কলোম্বো আসিয়া পৌঁছিল। জাহাজে মিঃ হরটন্ বলিয়া একটী সাহেবের সহিত আলাপ হইল। তিনি রসায়নী বিদ্যা খুব ভাল রকম জানেন। তাঁহার সঙ্গে কেমিষ্ট্রী সম্বন্ধে ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইত। আমাদের জাহাজ কলম্বোতে ১২ ঘণ্টা থাকিয়া এদেনের (Aden) দিকে রওনা হইল। কলোম্বো ছাড়িয়া ক্রমশ হাওয়ার জোর হইতে লাগিল ও সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ দেখা যাইতে লাগিল। ৩।৪ দিন পরে জাহাজ এত দুলিতে লাগিল যে বসিয়া থাকাও কষ্টকর হইয়া উঠিল। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সেই প্রকাণ্ড ঢেউগুলি দেখিলে যেমন মনে ভয় হয় সেই সঙ্গে প্রকৃতির অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতে হয়। খাইবার সময় টেবিলে কাঠের সিংড়ির মতন একরকম পাতিয়া দেয়। পাছে প্লেট ও অন্যান্য জিনিষ টেবিল হইতে পড়িয়া যায়। জাহাজ যখন অতিশয় দুলিতে থাকে তখন এইরূপ দেয়। আমাদের জাহাজেও সেইরূপ দিতে হইয়াছিল। যাহা হউক ভগবানের কৃপায় আমাদের জাহাজ এদেনে আসিয়া পৌঁছিল। এদেনে ৮ ঘণ্টা থাকিয়া জাহাজ ৫ দিন বাদে সুয়েজে আসিয়া পৌঁছিল। সুয়েজে ১দিন থাকিয়া ২৪ ঘণ্টা বাদে পোর্টসেড্এ আসিয়া পৌঁছিল। সুয়েজ হইতে পোর্ট সেড্ আসিতে যে রাস্তাটী তাহা অতি মনোরম। তাহাকে 'সুয়েজ ক্যানাল বলে।' সুয়েজ ক্যানাল প্রস্থে খুব ছোট। জাহাজ হইতে মনে হয় যে জোরে ঝাঁপ দিয়া পড়িলে জমিতে পড়া যায়। দুইধারে সুন্দর সুন্দর গাছ, সবুজ ঘাস ও ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরগুলি দেখিলে ঠিক মনে হয় যেন আমাদের দেশের কোন পাড়াগাঁর ভিতর দিয়া যাইতেছি। ২০ দিন খালি জল দেখিবার পর যখন এইরূপ দৃশ্য দেখা যায় তখন মনে যে কি আনন্দ হয় তাহা বলা যায় না। পোর্টসেড্এ যখন আমাদের জাহাজ আসিল তখন আমাদের জাহাজের উপর রীতি মত দোকান বসিয়া গেল। কলিকাতার একটী ছোট বাক্স আঙ্গুরের দাম ছয় আনা কিন্তু এখানে একসের আঙ্গুরের দাম ছয় আনা। পোর্টসেড্এ আমাদের জাহাজ একদিন থাকিয়া ৫দিন বাদে জেনোয়া আসিয়া পৌঁছিল। ছেলেবেলায় গল্পে পরীর রাজ্যের কথা শোনা যায়। রাত্রে জাহাজ হইতে জেনোয়া সহরটী সেই রকম দেখায়। এ রকম সুন্দর সহর কোথাও দেখি নাই। বড় বড় পাহাড় তাহার উপর স্তরে স্তরে বাড়ীগুলি রহিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে সবুজ বর্ণের গাছগুলি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেখিতে বড়ই সুন্দর। জেনোয়াতে দুইদিন থাকিয়া তৃতীয় দিনে আমাদের জাহাজ মারসেল্এর দিকে রওনা হইল। ৩৬ ঘণ্টা বাদে মার্সেল আসিয়া পৌঁছিল। মার্সেল সহরটীও দেখিতে সুন্দর কিন্তু জেনোয়ার মতন অত সুন্দর নহে। মার্সেল হইতেই বিলাতী সহরের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। মার্সেলে ২দিন থাকিয়া ১০দিন বাদে আমাদের জাহাজ লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিল, লণ্ডন একটী প্রকাণ্ড সহর। লণ্ডন সম্বন্ধে এত লেখা হইয়াছে যে সে বিষয় আর অধিক কিছু লিখিবার প্রয়োজন নাই। লণ্ডনে ১০দিন থাকিয়া টিউটনিক্ নামক ষ্টীমারে করিয়া এমেরিকার জন্ম রওনা হইলাম। এই জাহাজের অতি সুন্দর বন্দবস্ত। ৮দিন বাদে আমাদের জাহাজ New Yorkএ আসিয়া পৌঁছিল। জাহাজ যখন নিউ ইয়র্কএর কাছে আসিল, তখন আমি Statue of Liberty দেখিতে পাইলাম। সমুদ্রের মাঝে প্রকাণ্ড এক মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। জগৎকে দেখাইতেছে যে এই সেই স্বাধীন রাজ্য যেখানে সবাই সমান। New Yorkএ জাহাজ আসিয়া পৌঁছিলে প্রথমে ভাবনা হইল কোথায় যাই। এখানে হোটেলে ভয়ানক খরচ। ছোট হোটেলেতেও সপ্তাহে ১০ ডলার (অর্থাৎ ৩১।০ টাকা) করিয়া দিতে হয়। তাহা ছাড়া নূতন যায়গা, কোথায় কি রকম কিছুই জানা নাই। এখানে India House বলিয়া একটী স্থান আছে। সেখানে যুবকেরা আসিয়া উঠিতে পারে এবং তাহাদের উঠা উচিত। ইহা বাঙ্গালী যুবকদের

একটী প্রধান নিরাপদ স্থান। এখানে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলিয়া একটী বাঙ্গালী আছেন। তিনি এই India Houseএর Secretary। ইনি বাঙ্গালী যুবকদের জন্য তাঁহার শরীর মন সমস্ত দিয়াছেন ও দিতেছেন। যখন এখানে আসা যায় তখন মনে হয় যেন কোন আপনার লোকের বাড়ী আসিলাম। গিরীন্দ্র বাবু যে সকল যুবক আসেন তাহাদের সমস্ত বিষয় দেখা এবং তাঁহারা যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছেন যাহাতে তাহা সফল হয় তাহার জন্য প্রাণপণ করেন। ইহার যিনি President তাঁহার নাম Myron Phelps। ইনি যুবকদের জন্য মানুষের ক্ষমতাতে যাহা হয় তাহা করিতে ক্রটী করেন না। এই বাড়ীটির ভাড়া ও চাকরের মাহিনা ইত্যাদিতে মাসিক ৩০০ টাকা করিয়া লাগে। এই টাকাটী সমস্ত Mr. Phelps ও গিরীন্দ্র বাবুকে দিতে হয়। এই রকম একটী আশ্রয় থাকায় যে কত উপকার হইয়াছে তাহা বলা যায় না। এখানে যে কেহ বিপদে পড়িয়া এই বাড়ীতে আসে তাঁহারা তাহাকে স্থান দেন এবং কোন কোন সময় তাঁহাদের খাবার খরচ পর্য্যন্ত দেন। এই রকম একটী বাড়ী থাকা খুব দরকার এবং ইহা রক্ষা করিবার জন্য যদি কেহ কিছু সাহায্য পাঠান তাহা হইলে তাহা যুবকদেরই সাহায্য করা হইবে। এই নিউ ইয়র্ক সহরটী একটী প্রকাণ্ড সহর। এখানকার লোকেরা দিন রাত ব্যস্ত। এখানকার লোকেদের দেখিলে মনে হয় যেন তাহারা কার্য্য করিতেই জন্মিয়াছে। নিউ ইয়র্ক সহরে কোন ফ্যাকটারী নাই বটে কিন্তু সহরের কাছেই বড় বড় কারখানা সব আছে। এখানে যদি কোন বাড়ীতে কোন ভদ্র পরিবারের সহিত থাকা যায় তাহা হইলেও মাসে ২২ ডলার করিয়া লাগে। ২০।২১ ডলার খাবার খরচ এবং ১ ডলার ধোবা ইত্যাদিতে লাগে। ইহার কম কোন মতেই থাকা যায় না। এখানকার এক ডলার আমাদের ৩৵০। এখানে সমস্ত জিনিষেরই দাম অতিশয় বেশী। একটী সার্ট ধুইতে ।৴৹ আনা লাগে। এখানকার যাহারা রাস্তা পরিষ্কার করে তাহারাও মাসে ১২০ টাকা করিয়া রোজগার করে। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে একটী যুবকের পক্ষে থাকিতে ২২ ডলার বা ৬৮ টাকা কিছুই নয়। এখানে কোন ফ্যাকটারীতেই বাঙ্গালীদের লইতে চাহে না। অনেক চেষ্টা করিয়া তবে ফ্যাকটারীতে কার্য্য শিখিতে পারা যায়। ভগবানের কৃপায় এবং এখানকার দুইটী ভদ্র বড়লোকের কৃপায় নিউ ইয়র্ক সহরের কাছে নিউ জারসী সহরের একটী ফ্যাকটারীতে যাইতে পারিয়াছি। আর একটী কথা বলিবার আছে। যখন আসি তখন কি কি জিনিষ লইয়া আসিব এই লইয়া একটী মহা ভাবনা হইয়াছিল। নানা লোকের নিকট নানা প্রকার শুনিয়া কতকগুলি জিনিষ আনিয়াছি যাহার কোন দরকার নাই। সার্জস্যুট, প্যান্টলুন ও কোট ঢিলা হওয়া চাই। ৪টী সাদা সার্ট, দুইটী ফ্লানেল সার্ট (এখানে সকলেই ছিটের সার্ট ব্যবহার করে, এবং তাহা এখান হইতে কেনাই সুবিধা)। একটী মোটা ওভার কোট, ৬টী কলার, ৬ খানি রুমাল, একটী পাগড়ী, একটী ছাতা, কামাইবার সরঞ্জাম, একজোড়া বুট জুতা, একজোড়া এলবার্ট শ্লীপার, একটী হ্যাট, দুটী স্লীপীং স্যুট, একটী বেল্ট, এক বোতল নারিকেল তৈল, দু খানি তোয়ালে, সাবান ৩ বাক্স, বেঙ্গল কেমিকালের টুথ পাউডার, আরশী, চিরুণী, জুতার ব্রুস, চিঠির কাগজ ও খাম, একটী ফাউন্‌টেন্ পেন্, ৪টী টাই (টাইগুলি চওড়া হইলেই ভাল), ২।৪ খানি ভাল বই; একটী ড্রেসিং গাউন (জাপানী সুতার ড্রেসীং গাউন হইলেই হইবে), ৪ জোড়া মোজা। আমার মনে হয় এই হইলেই হইবে। এখানে সেণ্ট্রাল পার্ক বলিয়া একটী সকলের বেড়াইবার জন্য বাগান আছে। সেটী প্রকাণ্ড বাগান। লম্বায় ১ মাইলের উপর এবং চওড়ায় অর্দ্ধ মাইলের উপর। তাহার ভিতর ৩।৪টী বড় পুষ্করিণী (Lake) আছে। সেই বাগানটীর ভিতর রাস্তাগুলি কোথাও উঁচু কোথাও নীচু কোথাও গাছের ঝোপগুলি সুন্দর ভাবে সাজান, দেখিলে মনে একটী শান্তির ভাব আসে। সেই বাগানের ভিতর একটী মিউজিয়াম আছে। সেখানে নানা রকম ছবি ও নানা দেশের পুরাতন জিনিষ সমস্ত আছে। ইহার পরের লেখাতে সমস্ত খবর দিব।

শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ।

রাজসাহী, মালদহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ী, রঙ্গপুর, বগুড়া এবং পাবনা জেলা লইয়া আধুনিক "রাজসাহী-বিভাগ" গঠিত। তাহাই "উত্তর-বঙ্গ" নামে কথিত হইয়া থাকে। তাহার কিয়দংশ মিথিলার, কিয়দংশ বরেন্দ্রের এবং কিয়দংশ কমতা-বিহারের পুরাতন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহা এক সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি নামেও উল্লিখিত হইত।*

এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে যে সকল হিন্দু-বৌদ্ধ কীর্ত্তিচিহ্ন বর্ত্তমান ছিল, এখনও স্থানে স্থানে তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল পুরাতন ইষ্টকপ্রস্তর-গঠিত অট্টালিকা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াই অধিকাংশ মুসলমান-মস্জেদ নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। ইহা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করে না। এখনও কোন কোন মস্জেদে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোন মস্জেদ পুরাতন দেবস্থানের উপরেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহারও নানা নিদর্শন বর্ত্তমান আছে। এ সকল কথা মুসলমান-লিখিত ইতিহাসে গৌরবের সঙ্গেই উল্লিখিত হইয়াছে। যে সকল ইংরাজ-রাজপুরুষ পুরাকীর্ত্তির তথ্যানুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

এই সকল কারণে, উত্তর বঙ্গের অধিকাংশ স্থানেই হিন্দুবৌদ্ধকীর্ত্তি অক্ষত অবস্থায় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। তোরণ, স্তম্ভ, এবং প্রস্তরমূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ মাত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এ পর্য্যন্ত তাহার বিস্তৃত বিবরণ সংকলনের জন্য কোনরূপ ধারাবাহিক আয়োজন আরব্ধ হয় নাই।

হিন্দুবৌদ্ধ-শাসন সময়ের যে সকল কীর্ত্তিচিহ্ন অপেক্ষাকৃত অক্ষতকলেবরে স্বস্থানে বর্ত্তমান আছে, তাহা কেবল দীর্ঘিকা এবং সরোবর। তাহাদের পুরাতন নাম এখনও জনসমাজে প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে মালদহের "সাগর দীঘি", এবং দিনাজপুরের "মহীপাল দীঘি" সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত।

উত্তর-বঙ্গে এরূপ পুরাতন দীঘি সরোবরের অভাব নাই। কোন কোন সরোবরের সোপানাবলীর ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে; কিন্তু অধিকাংশ সরোবরেই তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই সকল সরোবর উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ;—তাহাই হিন্দুবৌদ্ধ-শাসনকালের পরিচয়-বিজ্ঞাপক বলিয়া ঐতিহাসিক-সমাজে সুপরিচিত।†

সরোবরতীরে দেবায়তন নির্ম্মাণ করিবার প্রথা ছিল। তজ্জন্য সেকালের অধিকাংশ সরোবর তীরেই দেবায়তন দেখিতে পাওয়া যাইত। এখন তাহা বর্ত্তমান নাই। কেবল কোন কোন সরোবর তীরে মুসলমান-মস্জেদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা যে পুরাতন দেবায়তনের ইষ্টকপ্রস্তর লইয়াই গঠিত হইয়াছিল, দুই একস্থলে তাহার নিদর্শনও অদ্যাপি দেদীপ্যমান!

উত্তরবঙ্গের কোন্ কোন্ স্থানে এইরূপ পুরাতন সরোবর বর্ত্তমান আছে,—জনসমাজে তাহা কোন্ নামে সুপরিচিত,—তাহার সহিত কাহার পুণ্যস্মৃতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে,—সকল স্থলে তাহার বিবরণ সংকলন করিবার উপায় না থাকিলেও, অনেক স্থলে এখনও কিছু কিছু পূর্ব্ববিবরণ সংকলিত হইতে পারে।‡

উত্তরবঙ্গে এই সকল দীঘি-সরোবরের আধিক্য দেখিয়া মনে হয়,—মুসলমান শাসন সময়ে নূতন করিয়া সরোবর খনন করাইবার অধিক প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। এই সকল পুরাতন সরোবর জননিবাসপূর্ণ গ্রাম নগরেই খনিত হইয়াছিল। যেখানেই এরূপ দীঘি সরোবর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নিকটই—অনেক দূর পর্য্যন্ত—পুরাতন গ্রাম নগর বর্ত্তমান থাকিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার অনেক স্থল এখন নিবিড় বনে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে,—সেখানে আর জনসমাজের বসতি বর্ত্তমান নাই। কেবল সাঁওতালগণ সম্প্রতি বনভূমি পরিষ্কৃত করিয়া, কৃষিকার্য্যের সূত্রপাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই সকল স্থানের জনশ্রুতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

* মহারাজ তোডরমল্লের "জমা তুমারী"তে সমগ্র বঙ্গদেশ ১৯ সরকারে বিভক্ত হইয়াছিল। তদনুসারে সরকার লক্ষ্মণাবতী, সরকার তাজপুর, সরকার পাঞ্জরা, সরকার ঘোড়াঘাট, সরকার বার্ব্বাকাবাদ, এবং সরকার বাজুহা মধ্যে উত্তরবঙ্গ অবস্থিত।

† গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সকল পুরাতন দীঘি সরোবর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার বর্ণনা করিবার সময়ে মিষ্টার রাভেন্শা এই কথাই পুনঃ পুনঃ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

‡ মালদহের "হোমদীঘি" এবং দিনাজপুরের "তর্পণ দীঘি" ইহার বিশিষ্ট উদাহরণ রূপে উল্লিখিত হইতে পারে।

তথাপি পুরাতন দীঘি-সরোবরের অনুসন্ধানকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, সকল শ্রম একেবারে ব্যর্থ হইবার আশঙ্কা নাই। তাহাতে আর কিছু না হউক, পুরাতন গ্রামনগরের অবস্থান সম্বন্ধে অনেক তথ্য লাভ করা যাইতে পারিবে। ইউরোপের কোন কোন স্থান কালক্রমে সমুদ্রগর্ভে এবং ভূগর্ভে নিহিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার বিলুপ্ত তথ্য আবিষ্কৃত করিবার জন্য এখনও লোকে কত আয়াস স্বীকার করিয়া থাকে। আমাদিগের আবাসস্থলের নিকটে যে সকল পুরাতন গ্রাম নগর এখন বিজন বনভূমিতে পরিণত হইয়াছে, তাহার তথ্যানুসন্ধান করা অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। তথাপি তাহার জন্য যথাযোগ্য আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না!

গ্রামনগরের শোভা সম্পাদনের জন্যই এই সকল দীঘি, সরোবর খনিত হইত না। ইহা হইতেই সেকালের বাঙ্গালী স্বাস্থ্য এবং শক্তি লাভ করিত। কেবল কৃষিক্ষেত্রে জল-সেচন করিবার উদ্দেশ্যেও অধিক সরোবর খনিত হইত না। নদীবহুল উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ স্থানেই বর্ষাকালের প্রবলপ্লাবন নৈসর্গিক নিয়মে ভূমির উর্ব্বরতা সাধন করিত। স্নান তর্পণ এবং পিপাসা শান্তির জন্যই দীঘি সরোবর খনিত হইত। উত্তরবঙ্গের সকল নদনদীর অবস্থাই একরূপ;—তাহা কেবল হিমালয়ের পাদোদক বহন করিবার জন্যই সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান! তাহার জলের উপর নির্ভর করিয়া, উত্তরবঙ্গের লোকে স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারিত না বলিয়াই, দীঘি সরোবর খনন করিতে বাধ্য হইয়া থাকিবে। এখনও উত্তর বঙ্গের অনেক স্থানে নদনদীর জল ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু এখন আর সেকালের মত সুবিস্তৃত সরোবর খনিত হইতেছে না!

গৌড়েশ্বরগণ এবং তাঁহাদিগের রাজ্যরক্ষক রাজন্যবর্গ উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে যে সকল দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার অনেক দুর্গ এখনও স্বস্থানে বর্ত্তমান আছে। তাহাদের মৃৎপ্রাচীরের উপরে বৃক্ষলতা অঙ্গবিস্তার করিয়াছে;—পরিখার জল শুষ্ক অথবা শৈবালাকীর্ণ হইয়াছে,—স্থানে স্থানে আধুনিক হলকর্ষণ প্রভাবে দুর্গ-প্রাচীরের কিয়দংশ সমতলক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে!

কোন কোন দুর্গাভ্যন্তরে এখনও পুরাতন অট্টালিকাদির ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে; এবং তাহার সহিত কোন না কোনরূপ গ্রাম্য জনশ্রুতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে। দুর্গরক্ষার জন্য দুর্গের বাহিরে অনেকদূর পর্য্যন্ত "জাঙ্গাল" নামক মৃৎপ্রাচীর গঠিত হইত। কোন কোন স্থানে তাহারও যথেষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।* এই সকল "জাঙ্গাল" নানা প্রয়োজন সিদ্ধ করিত;—শত্রুসেনার আক্রমণবেগ প্রতিহত করিত,—জলপ্লাবন হইতে দুর্গমূল রক্ষা করিত,—একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াতের রাজপথ রূপেও ব্যবহৃত হইত। দুর্গের জন্য স্থান নির্ব্বাচনের এবং "জাঙ্গালের" জন্য দিঙ নির্ণয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে, এখনও সেকালের সামরিক প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

উত্তরবঙ্গের কোন্ স্থানে কোন্ পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে, তাহার তালিকা সংগ্রহ করিবা মাত্র দেখা যাইবে,—এক সময়ে এদেশের অধিবাসিবর্গ আত্ম-রক্ষার জন্য কিরূপ সামরিক আয়োজন করিতে বাধ্য হইত। তাহার কারণপরম্পরার অভাব ছিল না। উত্তরে পার্ব্বত্য রাজ্য, পূর্ব্বে কামরূপের অধিকার,, পশ্চিমে মিথিলার পুরাতন জনপদ বর্ত্তমান থাকায়, প্রায় সকল দিক হইতেই উত্তরবঙ্গ পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইত। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্যই দুর্গ রচনার প্রয়োজন উপস্থিত হইত।

যাহারা এইরূপে নিয়ত বাহুবলে আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইত, তাহারা রণভীরু বা কাপুরুষ বলিয়া নিন্দিত হইতে পারে না। যাহারা এই সকল দুর্গপ্রাচীর রচনা করিয়াছিল, তাহারা বাহুবলে মুসলমানের গতিরোধ করিতেও ক্রটি করে নাই। উত্তর বঙ্গের রাজন্যবর্গ তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, অধ্যাপক ব্লকম্যান তাহার পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।† মুসলমান-

---

* বগুড়ার নিকটবর্ত্তী "মহাস্থান গড়" ইহার বিশিষ্ট নিদর্শনরূপে উল্লিখিত হইতে পারে। তথায় এখনও "জাঙ্গাল" বর্ত্তমান আছে।

† The Rajahs of Northern Bengal were powerful enough to preserve a semi-independence in spite of the numerous invasions from the time of Bakhtiyar Khilji, when Devkote, near Dinajpur, was looked upon as the most important military station towards the North.—*Prof. Blochmann.*

লিখিত ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায়,—বক্তিয়ার খিলিজি এবং তাঁহার দিগ্বিজয়ী অনুচরবর্গ লক্ষ্মণাবতীর রাজধানী ছাড়িয়া, উত্তর বঙ্গের সেনানিবাসে,—দেবকোটেই,—অবস্থান করিতে বাধ্য হইতেন! অষ্টাদশ অশ্বারোহীর অলৌকিক দিগ্বিজয় কাহিনীর সহিত ইহার সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

যাঁহারা ইতিহাসের অস্পষ্ট ছায়া অবলম্বন করিয়া উপাখ্যান নাটকাদি রচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা উত্তর বঙ্গের সকল স্থানেই তাহার পর্য্যাপ্ত আখ্যানবস্তু লাভ করিতে পারেন। তাঁহাদের চেষ্টা সে পথে ধাবিত হইলে, উত্তর বঙ্গের অনেক পুরাতন দুর্গ বীরবিক্রমের লীলাভূমি বলিয়া জনসমাজে [illegible]চিত হইতে পারিবে।

উত্তরবঙ্গ চিরবিপ্লবের লীলানিকেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ। একসময়ে পার্ব্বত্য হূনজাতি উত্তর বঙ্গের উপর আপতিত হইয়া অনেক অনর্থ উৎপন্ন করিত। পালবংশীয় এবং সেনবংশীয় নরপালগণের শাসন সময়েও তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কলিঙ্গ-সমর, কাশী-সমর, কামরূপ-সমর উত্তরবঙ্গের পুরাতন ইতিহাসের বিচিত্র বীরত্বকাহিনীতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কখন হিন্দু-বৌদ্ধ-সংঘর্ষ, কখন হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ উত্তরবঙ্গের পুরাকাহিনীকে রুধিরাক্ত করিয়া রাখিয়াছে! তথ্যানুসন্ধানের অভাবে তাহার সকল কথাই ক্রমে ক্রমে জনসমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

এই সকল রাষ্ট্রবিপ্লবে উপর্য্যুপরি বিপর্য্যস্ত হইয়া, মুসলমান শাসনকালের অবসান সময়েও, উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে যে সকল পুরাতন বৌদ্ধকীর্ত্তি অপেক্ষাকৃত অক্ষত কলেবরে স্বস্থানে বর্ত্তমান ছিল, তাহার কথা বিশেষভাবে আলোচিত হইবার যোগ্য। তাহার যথাযোগ্য আলোচনার অভাবে নানা ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইবার সুযোগলাভ করিতেছে!

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটির প্রসিদ্ধ পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—"ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভাগ্যে যাহা ঘটুক না কেন, ভারতবর্ষের পূর্ব্বাংশে বৌদ্ধধর্ম্মকে বড়ই নিদারুণ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। এমন কি,—এতদূরও বলা যাইতে পারে,—প্রাচ্যভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম অগ্নি এবং তরবারি বলেই তাড়িত হইয়া গিয়াছিল!"*

উত্তরবঙ্গের ইতিহাস এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতে পারে না। ইহাই প্রকৃত তথ্য হইলে, উত্তরবঙ্গে কোনরূপ অক্ষত বৌদ্ধকীর্ত্তি বর্ত্তমান থাকিতে পারিত না।† পাল-নরপালগণের শাসন সময়ে বৈদিকাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ প্রধানামাত্যের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন;‡ হিন্দু ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনপরায়ণ সেননরপালগণের সময়ে বৌদ্ধ পুরুষোত্তম দেব রাজসভায় সমাদর লাভ করিতেন।§ লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্রশাসনে যে সকল ভূমির চতুঃসীমা উল্লিখিত আছে, তাহার পার্শ্বেই বৌদ্ধবিহার বর্ত্তমান থাকিবার কথাও উল্লিখিত আছে। ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারিত না।||

উত্তরবঙ্গের নানাস্থানের অক্ষত বৌদ্ধমূর্ত্তি, প্রস্তরচৈত্য, সাধনগুহা "অগ্নি এবং তরবারি" প্রয়োগের আখ্যায়িকাকে অলীক বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে পারে। অল্পকাল পূর্ব্বেও দিনাজপুরের অন্তর্গত পত্নীতলা থানার অধিকার মধ্যে এই শ্রেণীর একটি প্রস্তরচৈত্য বর্ত্তমান

---

* Whatever might have been the fate of Buddhism in other parts of India, in the provinces of Eastern India, it had to suffer serious persecution; nay, it may be said, that Buddhism was expelled from Eastern India by fire and sword.—J. A. S. B. vol. LXIV. p. 55.

† কেবল উত্তরবঙ্গে কেন, প্রশান্ত মহাসাগরের প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জেও বৌদ্ধকীর্ত্তির পার্শ্বদেশেই শৈবকীর্ত্তি,—উভয় কীর্ত্তিই অক্ষতকলেবরে বর্ত্তমান!

‡ ভট্টগুরবের গরুড় স্তম্ভলিপিতে ইহার অভ্রান্ত প্রমাণ বর্ত্তমান আছে।

§ লক্ষ্মণসেন দেবের আজ্ঞায় বৌদ্ধ পুরুষোত্তম দেব পাণিনীর লৌকিক সূত্রের "ভাষাবৃত্তি" রচনা করিয়াছিলেন; তাহার পঠন পাঠন অল্পদিন পূর্ব্বেও উত্তরবঙ্গে প্রচলিত ছিল।

|| গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেন দেবের বিজয় রাজ্যের সপ্তমবর্ষের তৃতীয় ভাদ্রদিনে যে তাম্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা দিনাজপুরের তর্পণদীঘির নিকট আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মিষ্টার ওয়েষ্টমেকট কর্ত্তৃক তাহা ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহাতে "পূর্ব্বে বুদ্ধ-বিহারী দেবতা" ইত্যাদি লিখিত আছে। মিষ্টার ওয়েষ্টমেকট তাহার অনুবাদ উপলক্ষে লিখিয়া গিয়াছেন,—bounded on the East by the eastern *ail* of the rent free *aman* and given to the god Buddha-Bihari, which is sown with an *arha* of seed.

ছিল। দিনাজপুরের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টার মিষ্টার ওয়েষ্টমেকট তাহা স্থানান্তরিত করিয়া লইয়া গিয়াছেন। তাহার চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে,—"অগ্নি বা তরবারি" তাহাকে স্পর্শ করিবার জন্য একবারও চেষ্টা করে নাই; কোনও আকস্মিক কারণে চৈত্যচূড়া ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকিবে, কিন্তু বুদ্ধমূর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে!* এরূপ একটি মাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনেক জল্পনা কল্পনা অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। উত্তরবঙ্গে এরূপ বৌদ্ধচৈত্যের অভাব ছিল না;—যাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা যে "অগ্নি বা তরবারি" বলে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এরূপ অনুমানের অবতারণা করিবার উপযুক্ত প্রমাণ অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই! যাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা রাষ্ট্রবিপ্লবের অপরিহার্য্য পরিণাম বলিয়াই উল্লিখিত হইতে পারে।
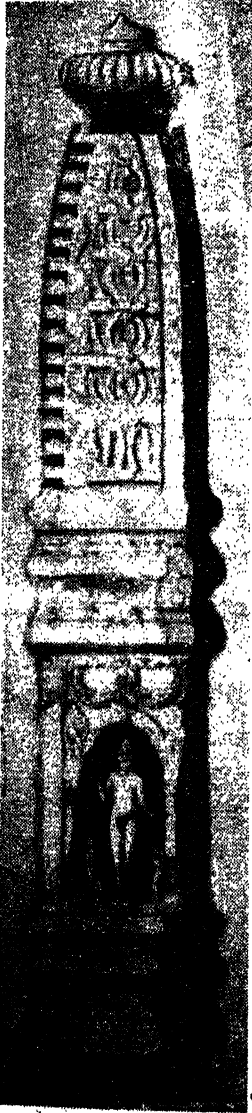
বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবকালে যে সংঘর্ষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা শীঘ্রই সামঞ্জস্যসাধনে শান্তি সংস্থাপিত করিয়াছিল। তাহার পর ভগবান বুদ্ধ নারায়ণের অবতাররূপে হিন্দুসমাজেও পূজা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বৌদ্ধবিহার শিক্ষা এবং সদাচারের বিশ্রামভূমি বলিয়া পরিচিত ছিল; বৌদ্ধচৈত্য জনসমাজের নিকট সমাদরের সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইত; বৌদ্ধমূর্ত্তি শ্রীমন্নারায়ণ মূর্ত্তি বলিয়াই হিন্দুসমাজের নমস্য হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং উত্তরকালের হিন্দু সমাজের পক্ষে বৌদ্ধাচার তাড়িত করিবার জন্য উত্তরবঙ্গে "অগ্নি বা তরবারি" প্রয়োগের কারণ উপস্থিত হইতে পারে নাই। উত্তরবঙ্গের কোন স্থানেই তাহার জনশ্রুতি পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নাই। বরং সমন্বয়সংস্থাপনের কিছু কিছু পরিচয় অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বগুড়া জেলার অন্তর্গত বেল আমলা নামক গ্রাম হইতে সম্প্রতি এইরূপ পরিচয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। বগুড়ার ডেপুটী কালেক্টার চিরস্নেহাস্পদ শ্রীমান রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, তৎসম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ প্রবন্ধ উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের (রঙ্গপুরের) প্রথম অধিবেশনে পঠিত হইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বেল আমলা একটি পুরাতন গ্রাম। তথায় কতকগুলি পুরাতন দেবমন্দির বর্ত্তমান আছে। তাহা সমধিক পুরাতন না হইলেও, অনুসন্ধানের যোগ্য বলিয়া, শ্রীমান রাজেন্দ্রলাল তথায় উপনীত হইয়া, গ্রামের মধ্যে একটি পুরাতন চতুর্ভুজা মূর্ত্তির সন্ধান লাভ করেন। এই মূর্ত্তি কোনও পুরাতন মন্দির হইতে আনীত হইয়া, গ্রামের মধ্যে রক্ষিত হইয়াছিল। মূর্ত্তিটি প্রস্তরগঠিত; তাহার পাদদেশে পুরাতন অক্ষরের একটি খোদিত লিপি বর্ত্তমান আছে। যতদূর পাঠ করিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয়—"রাজ্ঞী * * শ্রীগীতা তারা" লিখিত আছে। হিন্দুদিগের তারামূর্ত্তির সহিত এই মূর্ত্তির কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। ইহা বৌদ্ধ তারামূর্ত্তি। তাহাকে কখন "অগ্নি বা তরবারি" স্পর্শ করে নাই! গ্রামের নিকটে একটি পুরাতন মন্দির ছিল বলিয়া এখনও জনশ্রুতি বর্ত্তমান আছে। তাহার চিহ্নমাত্রও বর্ত্তমান নাই। কবে কিরূপ ঘটনাসূত্রে সে মন্দির বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারও তথ্যলাভের আশা নাই। যেখানে মন্দির ছিল, সেখানে এখনও ইষ্টকপ্রস্তরের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় অনুসন্ধানকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, শ্রীমান রাজেন্দ্রলাল একখানি খোদিত প্রস্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহা প্রায় সমচতুষ্কোণ;—তাহার উভয় পৃষ্ঠেই নানামূর্ত্তি খোদিত আছে।

* এই প্রস্তরচৈত্যের পাদদেশের খোদিত লিপিতে বৌদ্ধবিজয় বিঘোষিত; তাহা অক্ষুণ্ণ অবস্থায় বর্ত্তমান আছে।

একপৃষ্ঠে কতকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রকোষ্ঠ অঙ্কিত আছে। তাহার প্রধান প্রকোষ্ঠে একটি যোগাসনে উপবিষ্ট, চতুর্ভুজ মূর্ত্তি;—উপরের দুই হস্তে গদাপদ্ম,—নীচের দুই হস্ত জানুবিন্যস্ত,—দেখিবা মাত্র বুঝিতে পারা যায়, বুদ্ধ মূর্ত্তির সহিত দুইটি অতিরিক্ত হস্তযোজনা করিয়া, তাহাকে শ্রীমন্নারায়ণ মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে! শ্রীমূর্ত্তির পদতলের প্রকোষ্ঠে যে সকল বিচিত্র কারুকার্য্য খোদিত ছিল, তাহারই অংশবিশেষ পরিবর্ত্তিত করিয়া, একটি গরুড় মূর্ত্তির আভাস প্রদান করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু উভয় পার্শ্বের বা শীর্ষদেশের প্রকোষ্ঠগুলির অন্যান্য খোদিত মূর্ত্তির কোনরূপ পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করা হয় নাই। তাহাতেই এই প্রস্তর ফলকের বৌদ্ধকীর্ত্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। শ্রীমূর্ত্তির শীর্ষদেশে আর একটি যোগাসনে উপবিষ্ট দ্বিভুজ
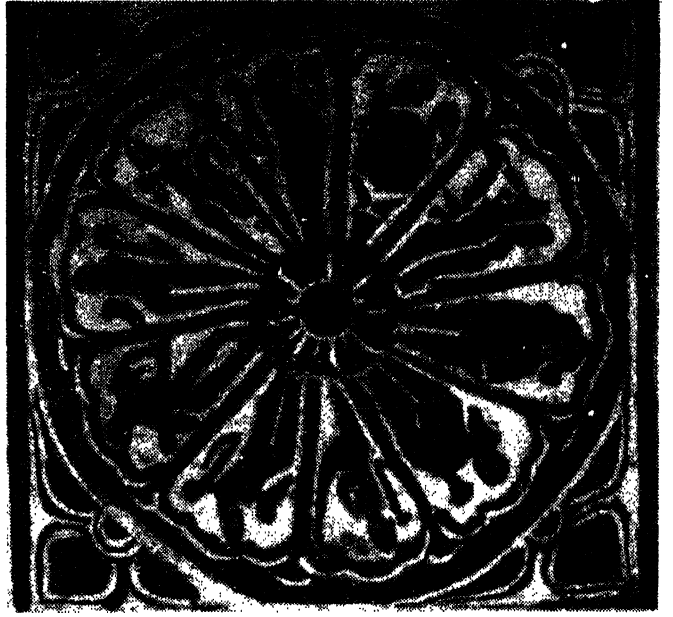
মূর্ত্তি; দুই দিক হইতে দুইটি হস্তি তাহার মস্তকে জলসেক করিতেছে! ঠিক এইরূপ একটি চিত্র সাঁচি স্তূপের পূর্ব্বদ্বারেসংযুক্ত আছে। সুতরাং ইহা যে বৌদ্ধযুগের কীর্ত্তিচিহ্ন, তাহাতে সংশয় নাই। তাহাকে সমন্বয়যুগে নারায়ণবিগ্রহের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার্থ যথাসাধ্য রূপান্তরিত করা হইয়াছে। অপর পৃষ্ঠায় একটি দশদল পদ্ম;—তাহার প্রতি দলে বিষ্ণুর দশাবতারের এক একটি চিত্র খোদিত করা হইয়াছে। প্রথমে মৎস্য, তাহার পর যথাক্রমে কল্কি পর্য্যন্ত অন্যান্য অবতার। নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুর উদর বিদীর্ণ করিতেছেন;—বামন ছত্রমস্তকে দণ্ডায়মান;—কুঠারহস্তে পরশুরাম;—সংগ্রামোচিত পদবিন্যাসে রামচন্দ্র;—হলফলকধারী বলরাম;—যোগীবর বুদ্ধ;—অশ্বারোহী কল্কিদেব;—সকলেই যথাযোগ্য আয়ুধাদিতে শোভা পাইতেছেন!

উভয় পৃষ্ঠের শিল্পকৌশলের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—দশাবতার অঙ্কনের শিল্পকৌশল অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট; বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত যে দুই খানি অতিরিক্ত হস্ত সংযুক্ত হইয়াছে, তাহার শিল্পকৌশলও তদ্রূপ। ইহাতে ধর্ম্মসমন্বয়ের সুস্পষ্ট পরিচয় অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। পালনরপালগণের শাসন সময়ে ধর্ম্মসমন্বয় সাধিত হইবার প্রমাণপরম্পরার অভাব নাই। তাঁহারা মহাভারত পাঠ করাইয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান করিতেন; মহা সামন্তাধিপতির আবেদনে শ্রীমন্নারায়ণ বিগ্রহের স্থাপনার জন্য ভূমিদান করিতেন;—

এইরূপ নানা প্রমাণ তাম্রশাসনে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার সহিত "অগ্নি এবং তরবারির" আখ্যায়িকার সামঞ্জস্য নাই!

দিনাজপুরের অন্তর্গত একটি স্থান এখনও "যোগীগুফা" নামে কথিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত "গুহা," পালি "কুভা," উত্তর বঙ্গে "গুফা" নামে পরিচিত ছিল। "যোগী-গুফা" একটি দর্শনীয় স্থান। সেখানে এখনও অর্চ্চনার অভাব উপস্থিত হয় নাই। সেখানেও বুদ্ধমূর্ত্তি নারায়ণ "চতুর্ভুজ" রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মায়াদেবীর মূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। ভূগর্ভনিহিত "যোগী-গুফার" এই সকল অক্ষত বৌদ্ধমূর্ত্তি দর্শন করিয়া, মিষ্টার ওয়েষ্টমেকট তাহার সাক্ষ্যদান করিয়া গিয়াছেন।* সেখানেও "অগ্নি এবং তরবারি" প্রয়োগের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। খেতলাল নামক স্থানে, থানার নিকটে, মায়াদেবীর মূর্ত্তির এবং অন্যান্য বৌদ্ধমূর্ত্তির নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। লোকে এখনও তাহার অর্চ্চনা করিয়া থাকে!

উত্তরবঙ্গের অনেক স্থান "পাহাড়পুর" নামে কথিত। রাজসাহীর উত্তরাংশে একটি "পাহাড়পুর" নামক স্থানে এখনও প্রায় একশত ফুট উচ্চ একটি বৌদ্ধস্তূপ বর্ত্তমান আছে। মিষ্টার বুকানন হামিল্টন্ এই স্তূপ পরিদর্শন করিয়া, বহুকাল পূর্ব্বে তাহার সন্ধান প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার যথাযোগ্য অনুসন্ধান কার্য্য আরব্ধ হয় নাই! †

* At the curious subterranean place of worship called Jogigupha, I saw stone carvings of undoubted Buddhist origin. On one slab, twenty one inches long, was carved Mayadevi, recumbent, with the baby by her side and attendants round her. With it was a slab, 40 inches long, with a relief of Narayana Chaturbhuj bearing the Shankha, gada, lotus and the disc, showing that the Buddhist carving had been preserved by the votaries of a later religion. The carvings were singularly perfect. In a field near the Thanah of Khetlal, * * * * I saw carvings corresponding curiously with those at Jogigupha. The carvings at Khetlal are four. They are set up in a field as objects of worship.—*Westmacott.*

† পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ শ্রীরাম মৈত্রেয় আমার উপদেশে নানা ক্লেশে এই স্তূপের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি ইহার বিবরণ সংকলনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপে এক একটি পুরাকীর্ত্তির তথ্যানুসন্ধানের জন্য এক এক জন ভার গ্রহণ করিলে, সহজেই নানা তথ্য সংকলিত হইতে পারে।

উত্তরবঙ্গের হিন্দুদিগের দ্বারা বিবিধ বৌদ্ধকীর্ত্তি প্রকারান্তরে সুরক্ষিত হইবারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়;—"অগ্নি বা তরবারি" প্রয়োগে কোনও কীর্ত্তি বিনষ্ট হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

আমাদের লিখিত ইতিহাস বর্ত্তমান না থাকায়, ইতিহাস রচনার ব্যস্ততা আমাদিগকে তথ্যনির্ণয়ের জন্য অবসর দান করিতে সম্মত হইতেছে না! তাহাতেই আমরা একদেশ-মাত্র পর্য্যালোচনা করিয়া যে কোনও সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক তথ্যরূপে প্রচারিত করিতেছি! উত্তরবঙ্গের বিবিধ পুরাকীর্ত্তির যথাযোগ্য তথ্যানুসন্ধান ও সমালোচনা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে, বঙ্গভূমির প্রকৃত পুরাবৃত্ত সংকলিত হইতে পারে না। কিন্তু সময় নষ্ট করিয়া, পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, অস্বাস্থ্যকর উত্তরবঙ্গের নিবিড় অরণ্যপথে ভ্রমণক্লেশ সহ্য করিয়া, নিপুণভাবে তথ্যাবিষ্কারের জন্য এখনও অধিক লেখক অগ্রসর হন নাই। যাঁহারা ইহাতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারাই নানা বিস্ময়-বিজড়িত পুরাতত্ত্বের সন্ধান লাভ করিয়া, কৃতার্থ হইতে পারিবেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

কবি।

যদি কেউ না শোনে তবু—তবু কবি, তোমার অনুরাগে
গেয়ে উঠ উচ্চকণ্ঠে। তোমার এমন দুঃখ নাইক কোন—
নিজের কুঁড়ের দ্বারে বসে' নিজেই গাহ, নিজেই তাহা শোন।
নেহাইৎ খারাপ সে গান নহে—যদি তোমার নিজের
ভালো লাগে।

উষার রাগে সন্ধ্যা-রাগে মিলিয়ে একটি মধুর স্বপ্ন বোনো;—
তোমার নিশীথ-নিদ্রাখানি আলোকিত কর্ব্বে তাহার আলো!
কেন মূঢ়, অলসভাবে দিনের দীপ্ত প্রহরগুলি গোণো?
গাহো, গাহো কবি, অন্যের লাগে কিম্বা নাইবা লাগে ভালো।
আরও—যে সম্পত্তি তুমি নিয়ে কবি, এসেছ এ ভবে—
গাইতে যদি নাহি চাহো অভিমানে, গাইতে তবু হ'বে!

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

প্রাথমিক শিক্ষা।

আমাদের দেশের লোকেদের মধ্যে যে সমস্ত ব্যবধান আছে তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইতেছে শিক্ষিতে অশিক্ষিতে। শিক্ষিতে অশিক্ষিতে যে কেবল সমবেদনা নাই তাহা নহে অনেক জায়গায় তাহার ঠিক্ উল্টাভাব আছে। দুঃখের বিষয় এই যে এ ব্যবধানটা আমরা নিজেরাই গড়িয়া তুলিয়াছি। যে শিক্ষা অন্য দেশে মিলনের সেতু বন্ধন করে কপালগুণে আমাদের কাছে তাহাই বিরোধের হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এতদিন ইহা একরকম চাপাই ছিল, এবারে বঙ্গচ্ছেদের আন্দোলন উপলক্ষ্যে অশিক্ষিতদের ডাকিয়া সাড়া না পাইয়া আমাদের চেতনা হইয়াছে, আমরা বুঝিয়াছি ইহারা যদি আমাদের পশ্চাতে থাকিত তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট এত সহজে আমাদের উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। দেশের প্রকৃত শক্তি যে কোথায় তাহা জানিতে পারিয়া আমরা অবসাদের মধ্যেও একটা আনন্দলাভ করিয়াছি।

কাজেই এখন শিক্ষিত অশিক্ষিতের মিলনের দিকে কাহারো কাহারো দৃষ্টি পড়িয়াছে। যে যে উপায়ে এই মিলন সাধিত হইতে পারে তাহার মধ্যে একটি প্রধান উপায় যে শিক্ষার বিস্তার তাহা বোধ করি কেহই অস্বীকার করিবেন না।

এই শিক্ষার প্রসার যে আমাদের সমাজে কত সঙ্কীর্ণ তাহা প্রমাণ করিবার জন্য Statistics খুঁজিয়া অন্যদেশের সঙ্গে তুলনার অপেক্ষা রাখে না। একবার দেশের প্রতি চোখ মেলিয়া তাকাইলেই বোঝা যায়। ইহার জন্য আমরা সাধারণতঃ গবর্ণমেণ্টকে দোষ দিয়া থাকি কিন্তু বিদেশী গভর্ণমেণ্ট তাহার নিজের আট্ঘাট্ বাঁধিবার দিকে যে বেশী নজর দিবে ইহা কিছু বিচিত্র নয়। এ অবস্থায় তারা যা করে তাই যথেষ্ট।

গভর্ণমেণ্টকে দোষ দেবার সময় স্বতঃই আমাদের নিজের দিকে একবার দৃষ্টিটা পড়ে। তখন দেখি আমরাও কিছুই করিতেছি না, কাজে কিছু করা দূরে থাকুক চিন্তাও করি না। য়ুরোপে দিন দিন শিক্ষায় নব নব প্রণালী উদ্ভাবিত হইতেছে আর আমাদের প্রাচীন গুরু মহাশয়েরা সেই মান্ধাতার আমল হইতে একই বাঁধা নিয়মে শিক্ষা দিতেছেন।

এইখানে বলা আবশ্যক যে আমি কেবল 'প্রাথমিক' শিক্ষা সম্বন্ধেই কিছু বলিব; কারণ উচ্চশিক্ষার গোড়ার পত্তন এইখানেই হইয়া থাকে।

পাঠশালার কথা বলিতে গেলে আমাদের মনে যে স্মৃতির উদয় হয় তাহা খুব সুখকর নহে। এমন কি কাহারো কাহারো হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

পাঠশালার এইরূপ বিভীষিকার কারণ হইতেছে প্রাচীন গুরু মহাশয়েরা। ছেলেদের অজ্ঞানতা দূর করিবার পক্ষে লাঠিকেই তাঁহারা একমাত্র ঔষধ বলিয়া জানেন। আমাদের দেশের শিক্ষার যদি কোনো সংস্কার করিতে হয় তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমে ইহাঁদিগকে বিদায় দিতে হইবে। তা না হইলে সরস্বতী কখনো আমাদের শিশুসম্প্রদায়ের প্রতি সুপ্রসন্ন হইবেন না।

কিন্তু এই সমস্ত লোককে বিদায় দিলেইত হইল না! ইহাদের স্থান অধিকার করিবেন কারা? আমাদের সমাজ ত গুরুমশায়গিরি কাজকে খুব সম্মানের চক্ষে দেখে না! শিক্ষিত ভদ্রসন্তান কেন এ কাজের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিবে?

ইহার ফল আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এবার পূজার ছুটীতে আমাদের গ্রামে নূতন ধরনের একটি শিশু-বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করি। প্রথমে ত শিক্ষক পাওয়াই মুস্কিল হইল, তারপরে অনেক সাধ্যসাধনার পর একটি শিক্ষিত ভদ্রসন্তান এ কাজে রাজি হইলেন, কিন্তু যেদিন বিদ্যালয় খুলিবার কথা সেদিন শুনিলাম যে এই কাজে নিযুক্ত থাকিলে বিবাহের সময় মেয়ে দুর্লভ হইবে এই আশঙ্কায় তাঁহার আত্মীয়েরা বাঁকিয়া বসিয়াছেন।

এই ত সম্মান। টাকা পয়সার দিক্ দিয়া দেখিলেও তথৈবচ। সাধারণ গ্রাম্য শিক্ষকের মাসিক আয় ঊর্দ্ধ সংখ্যা পাঁচ টাকা, তাও নিয়মমত আদায় হয় না; খাওয়া আবার নিজের মধ্যে। মনে করিয়া দেখিবেন আমাদের একজন চাকরও ইহা হইতে বেশী উপায় করে।

কাজেই গুরু মশায়কে পরিবার প্রতিপালনের জন্য অন্য কাজ করিতে হয়। কেউ দোকানদারি করেন কেউবা ডাকপিয়ন হন, সময়ে সময়ে ছাত্রগণকে শিক্ষক মহাশয়ের এই সমস্ত কাজে সাহায্যও করিতে হয়।

এইখানে একটা কথা বলা আবশ্যক যে আমাদের মধ্যে যাঁহারা সহরবাসী তাঁহারা কেহ কেহ আমার কথা-গুলিকে অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিতে পারেন কিন্তু যাঁহারা খাঁটি পল্লীগ্রামের লোক তাঁহারা ইহার সত্যতা অনুভব করিতে পারিবেন।

এই ত গেল শিক্ষক সম্বন্ধে। এখন শিক্ষার প্রণালীটা দেখা যাউক। সাধারণতঃ শিক্ষার বিষয় তিনটি বাংলা—লেখা, পড়া ও অঙ্ক। ইহাদের এক একটা করিয়া ধরা যাউক।

লেখা—প্রথমে একটা তালপাতায় অক্ষরগুলি দাগিয়া দেওয়া হয় এবং ছেলেকে সেই দাগের উপর দিয়া কলম বুলাইয়া লিখিত অক্ষরটি উচ্চারণ করিয়া যাইতে হয়। ইহাকে আমাদের দেশে বলে 'থাড়া' লেখা। এইরূপে দাগা পাতার উপর যখন কলম বেশ সহজে চলিতে লাগিল তখন ছেলেকে একটা শাদা পাতায় দেখিয়া দেখিয়া ক, খ লিখিতে হয়। কিছুদিন পরেই অবশ্য না দেখিয়া লিখিতে শেখে। এইটুকু অভ্যাস করিতে এক বৎসর চলিয়া যায়। না দেখিয়া ক, খ, লেখা যখন দুরস্ত হইয়া আসিল তখন বানান ধরানো হয়। একটা পাতায় ক, কা, কি, কী, কু, কূ, কে, কৈ, কং, কঃ এইরূপ লেখা থাকে। ছেলেরা এই স্বরগুলিকে অন্য সমস্ত ব্যঞ্জনে যোগ করিয়া লিখিয়া যায় যথা ; খ, খা, খি, খী ; গ, গা, গি, গী ইত্যাদি। এই বানানেও ছয় মাস, তার পরে ফলা। সে ত আরো ভয়ানক জিনিস। সাধারণতঃ যে ব্যঞ্জন-গুলি যুক্তভাবে ব্যবহৃত হয় সেই গুলিকে লইয়া বানানেরই মত একটা লিষ্ট তৈরি করা হইয়াছে ; যথা—ক-য়ে র-ফলা ক্র, খ-য়ে র-ফলা খ্র ; ক-য়ে য-ফলা ক্য, খ-য়ে য-ফলা খ্য ইত্যাদি। এই ফলা শেষ হইবার পূর্ব্বে ছেলেরা একটিও বাংলা শব্দ লিখিতে শেখে না। ইহার পর তালপাতা ছাড়িয়া কলাপাতায় নাম লেখা আরম্ভ হয়, যথা 'কামিনীমোহন সেন', 'শশাঙ্ক ভূষণ গুপ্ত', ইত্যাদি। ফলা এবং নামও একবছরের কমে হয় না। তার পরে ছেলেরা বই দেখিয়া কাগজে হস্ত-লিপি প্রভৃতি লেখে। অন্যূন তিন বছরের পূর্ব্বে কোনো ছেলে বাংলার একটি সামান্য কথাও লিখিতে বা পড়িতে পারে না।

পড়া—এই ত গেল লেখার কথা। পড়ায়ও এইরূপ। ক, খ লেখা পাকা হইবার পূর্ব্বে ত পড়া আরম্ভই হয় না। যে বইগুলি পড়ান হয় সে গুলিকে ছেলেদের হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য কোনো চেষ্টা করা হয় নাই। তারপর বইয়ের মধ্যে এমন সকল শব্দ দেওয়া হইয়াছে যাহার মানে জানিবার জন্য সময় সময় অভিধানের পাতা উল্টাইতে হয়। তা ছাড়া কতকগুলি শব্দকে গাঁথিয়া একটা পুরা বাক্যও করিয়া দেওয়া হয় নাই,—যেন শব্দগুলিকে পৃথক পৃথক পড়িতে পারিলেই সব হইয়া গেল। রামসুন্দর বসাকের 'বাল্যশিক্ষা' এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয়' এ দু'খানি বইই ইহার একটা দৃষ্টান্ত।

গণিত—লেখা এবং পড়া যদি এইরূপ হয় তবে অঙ্কটা কি রকম হয় তা বুঝিতেই পারেন। কিছুমাত্র গুণিতে শিখিবার পূর্ব্বেই ছেলে অন্যান্য বালকের সঙ্গে 'নামতা' 'কড়াকিয়া' প্রভৃতি পড়িয়া যায় এবং তোতা পাখীর মত মুখস্থ করে। যে ১, ২ গোণা ছেলেদের পক্ষে অধিক দরকারী তাহাই পরে আরম্ভ হয়। তারপরে সে গোণাটাও মুখে মুখে হওয়াতে সংখ্যা সম্বন্ধে কোনো সম্যক জ্ঞান হয় না। লিখিবার সুবিধার জন্য একটা অতি কদর্য্য নিয়ম আমাদের পাঠশালায় প্রচলিত আছে এই যে ১০ এর পর হইতে ১ এর পিঠে ১ এগার, ১ এর পিঠে ২ বার ইত্যাদি করিয়া গুণিতে শেখান হয়। ইহাতে ছেলেদের স্থানীয় মান বা local value সম্বন্ধে জ্ঞান হইবার বিশেষ বাধা জন্মায়। আরম্ভই যদি এইরূপ ত পরে কিরূপ হয় বুঝিতেই পারেন। শিক্ষার যতগুলি বিষয় আছে তার মধ্যে অঙ্কশিক্ষাই বোধ করি সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ। আমাদের পাঠশালাসমূহে ইহার কিরূপ শ্রাদ্ধ হয় তাহার উল্লেখ মাত্র করিলাম। বেশী উদাহরণ দ্বারা প্রবন্ধের আকার বাড়াইতে ইচ্ছা করি না।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর কথা আলোচনা করিতে গেলেই নবপ্রবর্ত্তিত কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর কথা মনে পড়ে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট প্রণালী সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমার মনে হয় এখনো কেহ ইহাকে হজম করিয়া আমাদের দেশোপযোগী আকারে খাড়া করিতে পারেন নাই। কেবল যে যে জায়গায় য়ুরোপীয়দের নকল চলে তাহারি অনুকরণ করিয়া বই লিখি-য়াছেন মাত্র। তারপর আজকালকার কিণ্ডার গার্টেনের মালমসলা যোগান সাধারণ পাঠশালার পক্ষে অসাধ্য এবং ইহার মূলভাবটা হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণ গুরু মহাশয়ের

পক্ষে একেবারে অসম্ভব। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর সমালোচনা অত্যন্ত সংক্ষেপে সারিলাম। এক্ষণে আমি যে প্রণালী অনুসরণ করিয়া কিঞ্চিৎ ফললাভ করিয়াছি তাহার কিছু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় ইহাও যথাসাধ্য সংক্ষেপ করিব।

আজকাল যে সমস্ত বিষয় সাধারণ পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, প্রথমতঃ সেই সমস্ত বিষয় অবলম্বন করিয়াই আমার বক্তব্য বলিব। বাংলা লেখা ও পড়া সম্বন্ধে কোনো কথা বলিবার পূর্ব্বে ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে একটা সাধারণ কথা মানিয়া লওয়া আবশ্যক। সেটি এই যে ভাষা শিক্ষাকালে আগে ব্যবহৃত হয় 'কান' তারপরে 'জিব' পরে 'চক্ষু' এবং সর্ব্বশেষে 'হাত'। এটি যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী তাহা বোধ হয় আপনারা কেহই অস্বীকার করিবেন না। আমি অন্ততঃ এটিকে ভাষা শিক্ষার মূলমন্ত্র বলিয়া গণ্য করি। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা বলিয়া কান ও জিবের কাজটা কথাবার্ত্তার দ্বারা আপনা আপনিই হইয়া আসে। কাজেই বাংলা শিক্ষাটা আরম্ভ করিতে হইবে 'চক্ষু' দিয়া। এইখানেই বর্ত্তমান প্রণালীর বিরুদ্ধে আমার প্রথম নম্বরের নালিশ। ইহাতে হাতের কাজ চোখের আগেই হইয়া থাকে অর্থাৎ অক্ষর চেনার আগেই লেখা আরম্ভ হয়। প্রথমে পড়া আরম্ভ করিতে হইলে আগে অক্ষর চেনা দরকার, কিন্তু এই অক্ষর চেনা ব্যাপারটা যে অত্যন্ত নীরস! ইহাকে একটু সরস করিয়া তুলিবার জন্য আমি এটাকে খেলার আকার দিতে চেষ্টা করিয়াছি। শিক্ষক এবং ছাত্রের হাতে এক জোড়া করিয়া বর্ণমালার তাস থাকিবে, শিক্ষক তাঁহার তাস হইতে একখানি লইয়া ছাত্রের সামনে রাখিবেন এবং তাহার অনুরূপ তাস খানি ছাত্রকে বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিতে বলিবেন। ছাত্র যদি ঠিক্ তাসখানি বাহির করিতে পারিল তবে তার জিত হইল আর তা না পারিলে আবার চেষ্টা করিতে দেওয়া যাইবে। এইরূপে যখন আস্তে আস্তে অক্ষর-গুলির চেহারা মাথায় এক রকম বসিয়া গেল তখন অক্ষরের নাম শেখানো যাইতে পারে। এই প্রণালীতে আমি অল্প সময়ের মধ্যেই সহজে ছেলেদের অক্ষর পরিচয় হইতে দেখিয়াছি। অক্ষর পরিচয় হবার পর বই ধরাইতে হইবে। আমি যতগুলি বই দেখিয়াছি তাহার মধ্যে রামানন্দ বাবুর বর্ণপরিচয়কেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বাছিয়া লইয়াছি। দুঃখের বিষয় আমাদের পূর্ব্ববঙ্গ রামসুন্দর বসাকের এবং পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মায়া এখনো কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিয়াই আজ কাল ছেলেরা বিজ্ঞান-রীডার নামক এক কিম্ভূত-কিমাকার বই ধরে, তাহাতে না হয় বিজ্ঞান শিক্ষা—কারণ বিজ্ঞানকে বইয়ের জিনিস করিয়া তুলিলেই তাহার জাত মারা হয়—না হয় ভাষাশিক্ষা। এই সমস্ত পুস্তকের অভিনব বাংলা সুকুমার-মতি বালকদের পক্ষে দন্তস্ফুট করাই কঠিন। আমার মনে হয় বানানটা শেষ হইলেই শাদা-কথায়-লেখা কোনো গল্পের বই ছেলেদের পড়িতে দেওয়া উচিত। ইহাতে যেমন একদিকে তাহাদের গল্পের তৃষ্ণা মিটিবে তেমনি অন্যদিকে সুললিত ভাষার সঙ্গে পরিচয় সাধন হইতে থাকিবে।

লেখা—লেখা শিখাইবার জন্য আমি বাংলা বর্ণমালার আকার সাদৃশ্য অনুসারে কয়েকটা শ্রেণী তৈরি করিয়া লইয়াছি যথা—'ব' শ্রেণী—ইহাতে ব, র, ক, ধ, বা, ঋ এই কয়টি প্রায় একই চেহারার অক্ষর আছে। ইহাদের একটিকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই আর সবগুলি লেখা অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়ে। এই প্রণালী অনুসারে লেখা শেখাইয়া আমি বেশ ফল পাইয়াছি। অক্ষর যখন কিছু কিছু লিখিতে শিখিল তখন হইতেই ছোট খাট শব্দ লিখিতে দেওয়া উচিত। ক্রমে ক্রমে বানান ও ফলা আনিয়া যোগ করিতে হইবে।

তার পরে গণিত। গণিত সম্বন্ধে কিছু বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র; তবু প্রবন্ধের অঙ্গহানির আশঙ্কায় দুই এক কথা বলিতে হয়। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রণালীর বিরুদ্ধে আমার প্রধান অভিযোগ এই যে ইহাতে গণিত ব্যাপারটাকে অত্যন্ত abstract অর্থাৎ জড় পদার্থের সহিত সম্বন্ধ হীন করিয়া তোলা হয়। বস্তুবিষয়ের সঙ্গে না মিলাইয়া আমরা যে কোনো জ্ঞান লাভ করি তাহাই অসম্পূর্ণ। গণিত শিক্ষাকে যদি কার্য্যকরী করিতে হয় তাহা হইলে ইহাকে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর সাহায্যে আরম্ভ করিতে হইবে।

আমার নিয়মে ছেলেরা বকুলবীচি, বাঁশ, বঁটপাতা প্রভৃতির সাহায্যে গুণিতে শেখে—তার পরে উহাদেরি সাহায্যে ছোট ছোট যোগ বিয়োগ শেখে। ক্রমে অধিক

সংখ্যার যোগ বিয়োগে অগ্রসর হয়। ইহার পর স্থানীয় মানটা বোঝাইয়া লেখা ধরাইয়া দি।

অঙ্ক সম্বন্ধে আর কিছু বলিয়া আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করিব না।

আজকালকার পাঠশালায় লেখা, পড়া এবং গণিত ছাড়া আর কোনো বিষয়ই শেখানো হয় না। কিন্তু অন্যান্য সভ্য-দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে কিছু কিছু বিজ্ঞান, ইতিহাস ভূগোলও স্থান পাইয়াছে। ইহাতে তাহাদের শিশুরা কেবল যে জড় ভাবে মুখস্থ করে তাহা নহে, নিজের চোখ কান বুদ্ধিবৃত্তিকে স্বাধীন ভাবে খাটাইতে পায়। আমাদের এখানেও তাহাই করা উচিত, কিন্তু গোড়ায় যে গলদ! সে শিক্ষক কোথায় যিনি স্বদেশেতিহাসের সজীবমূর্ত্তি ছেলেদের সম্মুখে ধরিবেন, যিনি আমাদের দৃশ্যমান জগতের উপরে বিজ্ঞানের আলোক নিক্ষেপ করিবেন—যিনি গিরি নদী কানন সমুদ্র অধিষ্ঠিত এই বসুন্ধরাকে শিশুদের চক্ষের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিবেন? এ রকম শিক্ষক দুর্লভ বটে কিন্তু সম্পূর্ণতার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে এই সব অত্যাবশ্যক জিনিসকে ত বাদ দেওয়া চলে না। এই ভাবিয়াই আমি আমার বিদ্যালয়ে যথাসাধ্য একটু বিজ্ঞানের স্থান করিয়া দিয়াছি এবং ভবিষ্যতে ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষা দিবারও আশা রাখি।

বিলাতে নৈতিক শিক্ষা বলিয়া একটা ব্যাপার প্রচলিত আছে। আমাদের দেশেও সে জিনিসটা ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিতেছে, তবে এখনো পাঠশালা পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছায় নাই। যদি পাঠশালার মধ্যেও ইহার স্থান করিতে হয় তবে যেন ইহাকে অন্য জায়গার মত নীরস করিয়া তোলা না হয়, আমাদের দেশের অক্ষয় ভাণ্ডার রামায়ণ ও মহাভারতের ভিতর দিয়া ছেলেরা যেন গল্পের মাধুর্য্য, সাহিত্যের রস এবং নৈতিক শিক্ষা একই সঙ্গে উপভোগ করিতে পারে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত বাংলাদেশের শিশুসম্প্রদায়কেই সামনে রাখিয়া আমার বক্তব্য বলিয়াছি। কিন্তু অশিক্ষিত বলিতে কেবল ত শিশু বোঝায় না। আমাদের দেশের অধিক বয়স্ক মেয়ে পুরুষও ত অনেকেই অশিক্ষিত, তাদের ত আর পাঠশালায় যাবার সময় নাই, তাদের ব্যবস্থা কি হইবে?

আমার মনে হয় অধিক বয়স্ক পুরুষদের জন্য নাইট্-স্কুল স্থাপন করা দরকার। যদিও এ বিষয়ে গভর্মেণ্ট ও খ্রীশ্চিয়ান পাদ্রীরা কিছু কিছু কাজ করিতেছেন বটে, তবুও এত বড় দেশের পক্ষে তাহা যথেষ্ট নয়। এদিকে সমাজের দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

আমাদের সমাজের যেরূপ অবস্থা তাহাতে সাধারণ পাঠশালায় স্ত্রীশিক্ষার কোনো ব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব। কাজেই বাড়ীতে বসিয়া যাতে তাঁরা কিছু শিখিতে পারেন তার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু সকল পরিবারেই ত শেখাবার মত লোক থাকে না এবং সকলেই ত মাহিনা করিয়া স্ত্রীশিক্ষক রাখিতে পারে না।

আমার মনে হয় এই সব স্থলে অন্ততঃ ভদ্রপল্লীসমূহে একটা উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। আপনারা সকলেই জানেন যে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা বাড়ীর কাজ কর্ম্ম সারিয়া অনেক সময়ে একত্র সমবেত হন। এই সময়ে তাঁদের মধ্যে যাঁরা একটু শিক্ষিত তাঁরা যদি অন্যকে কিছু কিছু করিয়া সাহায্য করেন, তাহা হইলে কতকটা উপকার হইতে পারে। আমি জানি এইরূপে আমাদের গ্রামের অনেক স্ত্রীলোক কাজ চালানো রকমের লেখা পড়া শিখিয়াছে। এই কাজে বিধবা স্ত্রীলোকদের নিযুক্ত করা যাইতে পারে, ইহাতে একদিকে যেমন তাঁহাদের কাজে কর্ম্মে অন্যমনস্ক রাখিবে তেমনি অন্যদিকে মঙ্গলকর্ম্মের গৌরব তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্যকে সার্থক করিবে।

তবে এইখানে শেষ করি। আমার মোট কথা এই যে বাংলা দেশের শিশুশিক্ষার সংস্কার করিতে হইলে প্রাচীন গুরু মহাশয়দের স্থলে শিক্ষিত ভদ্র সন্তানকে বসাইতে হইবে এবং সমাজকেও তাহার অনুকূল হইতে হইবে। শিক্ষা-প্রণালীকে পূর্ব্ব সংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া ইহার মধ্যে নূতন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, অধিক বয়স্ক মেয়ে পুরুষদের শিক্ষার জন্য নাইট-স্কুল স্থাপন এবং বিধবাদের নিয়োগ করিতে হইবে। এইরূপে শিক্ষাকে বিস্তৃত করিলেই শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যের বিচ্ছেদসমুদ্র আপনা আপনি বুজিয়া আসিবে এবং বাংলা দেশের হৃদয়ের মধ্য দিয়া এমন একটি রাস্তা প্রস্তুত হইবে যাহা ধরিয়া একদিন 'স্বরাজে' উত্তীর্ণ হইতে পারিব।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ।

১। শক্তি প্রয়োগের নূতন ব্যবস্থা।

প্রকৃতির নানা উচ্ছৃঙ্খল শক্তিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ঘরের কাজে লাগানো, আজকাল বিজ্ঞানচর্চ্চার একটা প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিছক্ জ্ঞানোন্নতির ইচ্ছায় অতি অল্প লোকেই বিজ্ঞানচর্চ্চা করিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিকগণ কয়লা ও কাষ্ঠাদির অন্তর্নিহিত শক্তির সাহায্যে সুকৌশলে বিদ্যুৎ ও বাষ্প উৎপন্ন করিয়া যে সকল ইন্দ্রজাল রচনা করিতেছেন তাহা প্রকৃতই বিস্ময়কর। অনেক স্থানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিবার জন্য এখন আর কয়লা পোড়াইবার আবশ্যক হয় না। বড় বড় জলপ্রপাত ও পার্ব্বত্য নদীর ধারায় কল পাতিয়া চলিষ্ণু জলের শক্তিতে কলে বিদ্যুৎ উৎপাদিত করা হইতেছে, এবং শত শত মাইল দূরবর্ত্তী সহরগুলির কলকারখানার কাজ সেই বিদ্যুতের শক্তিতে চলিতেছে। আমাদের দেশেও কাশ্মীর ও মান্দ্রাজ অঞ্চলের দুইটি জলপ্রপাতকে ঐ প্রকারে শৃঙ্খলিত করিয়া কাজে লাগাইবার জন্য আয়োজন হইতেছে। পবনদেব বহুকাল হইতেই নিগড়বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। নৌ-চালন ও ছোট-খাটো কলের পরিচালনা অতি প্রাচীন কাল হইতে বায়ু দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। কিন্তু বায়ু জিনিসটার গতিবিধি এত অনিশ্চিত যে, ছোটখাটো দুই একটা কাজ ছাড়া বৃহৎ ব্যাপারে ইহাকে লাগাইবার সুব্যবস্থা আজও উদ্ভাবিত হয় নাই।

সূর্য্যের তাপ ও জোয়ার ভাঁটার জলোচ্ছ্বাসে যে বিশাল শক্তি নিহিত আছে, আজ কাল তাহারি প্রতি বৈজ্ঞানিক-দিগের দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাপ ও আলোকের আকার পরিগ্রহ করিয়া যে শক্তি সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আসিয়া পতিত হয়, তাহার অতি অল্পই সংসারের কাজে লাগে। ইহার অধিকাংশই পৃথিবী মহাশূন্যে বিকিরণ করিয়া নষ্ট করে মাত্র। চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণে সমুদ্রের যে জলোচ্ছ্বাস হয়, তাহারো শক্তি নদ নদীর জলে আলোড়ন উপস্থিত করিয়া ও তীরভূমিকে অনাবশ্যক ভাঙিয়া চুরিয়া বৃথা ক্ষয় প্রাপ্ত করে। বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতির এই দুটা বাজে খরচ কমাইয়া, উদ্বৃত্ত শক্তিকে আমাদের ঘরের কাজে লাগাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

এ চেষ্টা একবারে নূতন নয়। আমরা বাল্যকাল হইতেই সূর্য্যের তাপে কারখানা চালাইবার কথা শুনিয়া আসিতেছি, এবং এই শক্তি প্রয়োগের সুবিধা অসুবিধার কথাও বৈজ্ঞানিকদিগের মুখে অনেক শুনিয়াছি; কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যন্ত্রের উদ্ভাবন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ যোষী মহাশয়ের ভানুতাপ যন্ত্র অনেকেরই পরিচিত। সম্প্রতি একখানি মার্কিন বৈজ্ঞানিক পত্রে (Scientific American) যে এক সুন্দর সৌরতাপ চালিত যন্ত্রের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আশা করা যাইতেছে, হয় ত বৈজ্ঞানিকগণ শীঘ্রই সূর্য্যের বিশাল তাপরাশির কিয়দংশ যন্ত্রায়ত্ত করিয়া কাজে লাগাইতে পারিবেন।

নিম্নপৃষ্ঠ দর্পণ (Concave Mirror) এবং স্থূলমধ্য কাচ খণ্ডের (Convex lens) কার্য্য পাঠক অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। তাপ বা আলোকের রশ্মিজাল ইহাদের উপরে পড়িলেই, সেগুলি প্রতিফলিত বা বিবর্ত্তিত (Refracted) হইয়া এক সংকীর্ণ স্থানে জড় হয়। যে তাপালোক সমগ্র দর্পণখানি জুড়িয়াছিল, এই ব্যবস্থায় তাহার প্রায় সকলি স্বল্পপরিসর স্থানে পুঞ্জীভূত হইয়া পড়ায়, তাপ ও ও আলোক উভয়েরই প্রাখর্য্য বাড়িয়া যায়।

বড় বড় দর্পণ সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সূর্য্যের তাপ পুঞ্জীভূত করিয়া কল চালাইবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ এপর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। অধিক তাপ পাইতে হইলে, দর্পণকেও খুব বড় করা আবশ্যক, এবং দর্পণ বড় করিতে থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার নির্ম্মাণ ব্যয়ও খুব বাড়িয়া যায়। হিসাবে দেখা গিয়াছিল, দর্পণ সাহায্যে সূর্য্যতাপ সংগ্রহ করিয়া কল চালাইতে যে খরচ পড়ে, কয়লা দ্বারা সেই কল চালাইলে খরচটা তাহা অপেক্ষা অনেক কম হয়। কাজেই বৈজ্ঞানিকগণ হতাশ হইয়া সূর্য্যতাপ সংগ্রহের এই পদ্ধতিটিকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সৌরতাপ সংগ্রহের যে নব পদ্ধতির কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে ঐ প্রকার বহুমূল্য বৃহৎ দর্পণের আবশ্যক হয় না, এবং সাজসরঞ্জামের খরচও অতি অল্প

লাগে। পাঠক বোধ হয় অবগত আছেন, কেবল কাচ দ্বারা আচ্ছাদিত বাক্সের দিকে সূর্য্যালোক ফেলিলে, তাপ ও আলোক স্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়া অনায়াসে বাক্সে প্রবেশ করে, এবং তাহাতে ভিতরের বায়ু বেশ গরম হইয়া উঠে। কিন্তু এই গরম বায়ু যখন নিজের তাপ বিকিরণ করিতে আরম্ভ করে, তখন সেই সকল তাপরশ্মি কাচের বাধা ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে পারে না। কাচ ও সৌর-তাপের এই সম্বন্ধটি অতি সুপরিচিত। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের গাছপালা শীতের দেশে জন্মে না। কারণ ইহাদের বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে পরিমাণ উষ্ণতার আবশ্যক শীত-প্রধান দেশে তাহা পাওয়া যায় না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উদ্ভিদকে শীতের দেশে জীবিত রাখিতে হইলে, উহাকে কাচের ঘরের ভিতর আবদ্ধ রাখা হয়, এবং মাঝে মাঝে তাহার ভিতর সূর্য্যের তাপ ও আলোক প্রবেশ করানো হয়। এই ব্যবস্থায় সূর্য্যতাপ কাচের ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া আর বাহির হইতে পারে না। কাজেই ঘরের বাতাস গরম থাকিয়া যায়—এবং গাছগুলিও সুস্থ থাকে।

সূর্য্যতাপ সংগ্রহের মার্কিনপদ্ধতিটি কাচ ও সূর্য্যতাপের পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাবলম্বনে উদ্ভাবিত হইয়াছে। ফিলাডেল্‌ফিয়ায় ইহার যে পরীক্ষা হইয়া গেছে, তাহাতে পরীক্ষক কেবল কাচ-ফলকদ্বারা একটি নাতি উচ্চ বৃহৎ বাক্স প্রস্তুত করিয়া তাহারি ভিতরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সূর্য্যতাপ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাক্সের ভিতরে ইথরপূর্ণ বড় বড় নল কুণ্ডলিত করিয়া রাখা হইয়াছিল, এবং যাহাতে আবদ্ধ সূর্য্যতাপ সহজে শোষণ করিয়া নলের ইথর বাষ্পীভূত হইয়া পড়ে, তাহার জন্য নলগুলির উপরে কালো রঙের প্রলেপ দেওয়া হইয়াছিল। অতি অল্পক্ষণের জন্য বাক্সটিকে সূর্য্যালোকে উন্মুক্ত রাখার পর নলের ইথর ফুটিয়া এত বাষ্প উদ্গত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, সাড়ে তিন ঘোড়ার জোরের* একটি কল উহার বলে সবেগে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

বহুকালের চেষ্টা ও চিন্তার ফলে কলে সূর্য্যতাপপ্রয়োগের পূর্ব্বোক্ত উপায়টির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু জোয়ার ভাটার শক্তি গার্হস্থ্য কার্য্যে লাগাইবার চেষ্টা সম্পূর্ণ আধুনিক এবং ইহাতে যতটুকু সাফল্য লাভ করা গিয়াছে, তাহার গৌরব আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগেরই প্রাপ্য। যান্ত্রবিজ্ঞানে মার্কিনেরা আজকাল যে প্রকার কৃতিত্ব দেখাইতেছেন, তাহা প্রকৃতই অতুলনীয়। কিন্তু জোয়ার ভাটার শক্তিকে যন্ত্রায়ত্ত করার ব্যাপারে জর্ম্মান বৈজ্ঞানিকেরাই অগ্রণী হইয়াছেন। এলব নদীর সঙ্গমস্থানে ইতিমধ্যেই ইহার কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পেইন্‌ নামক জনৈক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এই কার্য্যের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি বলিতেছেন, অতি শীঘ্রই কেবল জোয়ার ভাটার শক্তির দ্বারা জর্ম্মানির বড় বড় সহরের ট্রামগাড়ি ও বিদ্যুতের কল চলিবে। অর্থের অভাব হয় নাই। আরব্ধকার্য্যের সাফল্য অবশ্যম্ভাবী জানিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে সকলে অর্থদান করিতেছে।

জর্ম্মনির উৎসাহ দেখিয়া ইটালির কয়েকজন বৈজ্ঞানিক জোয়ার ভাটার শক্তিকে ব্যবহারোপযোগী করিবার আয়োজন করিতেছেন। ভূ-মধ্যসাগরে জোয়ার ভাটার শক্তি তত প্রবল নয়। এই অল্প শক্তি দ্বারাও কল চালাইয়া ইহাঁরা সুফল পাইয়াছেন। ইটালীর বৈজ্ঞানিকদিগের যন্ত্রটি একেবারে জটিলতাবর্জ্জিত। তীর হইতে সুরু করিয়া কতকগুলি রেল সমুদ্রগর্ভ পর্য্যন্ত সাজাইয়া রাখা হয়, এবং এই সকল ঢালু রেলের উপর কতকগুলি গাড়ি সজ্জিত থাকে। সমুদ্রের তরঙ্গ ও জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস ধাক্কা দিয়া এই গাড়িগুলিকে উপরে উঠাইয়া দেয়, এবং তরঙ্গ সরিয়া গেলে বা উচ্ছ্বাস প্রশমিত হইলে গাড়িগুলি নিজেদের ভারে নিজেরাই নীচে নামিতে আরম্ভ করে। ক্রমনিম্ন রেলের উপরে সজ্জিত গাড়িগুলিতে এই প্রকার ঊর্দ্ধাধোগতি আপনা হইতেই অবিরাম চলিতে থাকে। ইটালির যান্ত্র-শিল্পিগণ এই গতি দ্বারা পম্প সাহায্যে সমুদ্রজলকে উচ্চ স্থানে উঠাইতেছেন, এবং পরে এই সঞ্চিত জল ছাড়িয়া দিয়া তাহারি নিম্নগমনবেগে যন্ত্রাদি চালাইতেছেন। হিসাবে দেখা গিয়াছে, কয়লা পোড়াইয়া কল চালাইতে যে ব্যয় হয়, এই উপায় অবলম্বন করিলে তদপেক্ষা অনেক অল্প খরচে কল কারখানা চলে।

---

* ইংরাজি "Horse-power" কে "ঘোড়ার জোর" বলিতেছি। এই কথাটিকে পাঠক অশ্বের ভারবহনশক্তি না বুঝেন। প্রায় চারিশত মণ জলকে [illegible] এক মিনিট সময়ে ভূমি হইতে এক ফুট্ ঊর্দ্ধে উঠাইতে যে শক্তির আবশ্যক হয়, তাহাকেই বিজ্ঞানের ভাষায় এক Horse-power বলে।

২। এক নূতন বিভীষিকা।

মৃত্যু ও পরলোকতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া যত মসীপত্রের অপব্যবহার ও তর্ককোলাহলের সৃষ্টি হইয়াছে, বোধ হয় অপর কোন বিষয়েই সে প্রকার হয় নাই। কারণ যে তত্ত্ব যত দুরধিগম্য তাহাকে অবলম্বন করিয়া ততই অযথা বাক্যব্যয় করা মানুষের একটা স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। বলা বাহুল্য ইহাতে মূল জিনিসটাকে কোন ক্রমেই চেনা যায় না, বরং শত শত বিরোধী মতবাদের কুহেলিকা চারিদিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে অস্পষ্ট করিয়া তোলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মর্ম্মস্থানে পৌঁছিবার পথটাও দুর্গম হইয়া পড়ে।

"মৃত্যু" ও "পরলোক তত্ত্বের" ন্যায় পৃথিবীর পরিণামটাও আজকাল বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট একটা প্রকাণ্ড তর্কের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জগতে কোন বস্তুরই অবস্থা চিরস্থির নয়। সুতরাং নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া পৃথিবী আজ যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে যে চিরকাল সেখানে থাকিবে না, তাহা আমরা সকলেই বুঝি। জীব যেমন জন্মকাল হইতে পলে পলে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়, পৃথিবীও সেইপ্রকার প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যুপথকে ছোট করিয়া আনিতেছে। মৃত্যু নিশ্চয়। এই মৃত্যু কোন্ বেশে দেখা দিয়া এই উদ্ভিদ-প্রাণিময় সজীব পৃথিবীকে নির্জ্জীব করিয়া দিবে, তাহাই তর্কের বিষয়। বৈজ্ঞানিক বৈদ্যগণ পৃথিবীর নাড়ী টিপিয়া তাহার মৃত্যুদিন ও মৃত্যুব্যাধি এখনি ঠিক্ করিয়া রাখিতে চাহিতেছেন।

বৈদ্যসঙ্কট হইলে রোগীর মৃত্যুপথ পরিষ্কার হইয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাযাত্রার মুহূর্ত্তটি পর্য্যন্ত জানা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। ভূতত্ত্ববিদ্ জীবতত্ত্ববিদ্ রসায়নবিদ্ ও জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রভৃতি মিলিয়া সত্যই বৈদ্যসঙ্কট উপস্থিত করিয়াছেন। ইহাতে বৈজ্ঞানিকগণ মৃত্যুকে টানিয়া আনিতে পারিতেছেন না সত্য, কিন্তু মৃত্যুদিন ও মৃত্যুরোগের নির্ণয় ক্রমেই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহাঁরা ধূমকেতুর মুণ্ডপাত, নক্ষত্রের সংঘর্ষণ, জলবায়ুর লোপ, ভূজঠরাগ্নি ও সূর্য্যের নির্ব্বাণ প্রভৃতি নানা মৃত্যুব্যাধির উল্লেখ করিয়াও ক্ষান্ত হন নাই। সম্প্রতি লায়েল নামক জনৈক মার্কিন বৈজ্ঞানিক পৃথিবীকে আর এক নূতন বিভীষিকা দেখাইতেছেন।

ভূ-গোলকের (globe) প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, কর্কট ও মকর ক্রান্তির (Tropics of cancer and capricorn) মধ্যে যে বলয়াকার প্রদেশ আমাদের পৃথিবীকে ঘেরিয়া রহিয়াছে, তাহার অনেকটাই অনুর্ব্বর ও জীববাসের অনুপযোগী। ইহারি বিশেষ বিশেষ অংশ অধিকার করিয়া আরব ও মধ্যএসিয়ার মরুভূমি এবং আরিজোনা ও সাহারা প্রভৃতি মহামরু-অবস্থান করিতেছে। লায়েল সাহেব এই বলয়াকার ভূভাগের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, ইহাই পৃথিবীর মৃত্যু চিহ্ন। দুষ্ট ক্ষত প্রাণিদেহের সূচ্যগ্র প্রমাণ স্থান অধিকার করিয়া যেমন ক্রমে ক্রমে সমগ্র দেহটিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, ঐ মরুভূমিগুলিও লায়েল সাহেবের মতে কালক্রমে পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গ অধিকার করিয়া ফেলিবে। ইহারাই পৃথিবীর মৃত্যুর সূচনা করিয়া দিয়াছে, এবং আমাদের অলক্ষিতে ইহারাই পরিসরযুক্ত হইয়া সংহারকার্য্যকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। মরুভূমির গ্রাস হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার আর উপায় নাই।

লায়েল সাহেব কিপ্রকারে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন এখন দেখা যাউক। ইনি বলেন, আমেরিকার আরিজোনা মরুপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে গেলে, বড় বড় শাখা প্রশাখা সহ বৃক্ষকাণ্ড ভ্রমণকারী মাত্রেরই চোখে পড়ে। হঠাৎ দেখিলে সেগুলিকে সদ্যশ্ছিন্ন দেখায়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। ইহাদের সকলেই শিলাময়। বহুকাল মৃৎপ্রোথিত থাকায় বৃক্ষের কষ্ঠময় দেহ শিলায় পরিণত হইয়া গেছে। কাজেই বলিতে হয়, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই মরুভূমির অধিকাংশই উর্ব্বর ছিল, এবং সেই সময়ে এই সকল মহাতরু জন্মগ্রহণ করিয়া কোন আকস্মিক দৈব উৎপাতে ভূশায়ী ও মৃৎপ্রোথিত হইয়া পড়িয়াছিল।

এই সকল প্রদেশের বর্ত্তমান অনুর্ব্বরতার কারণ অনুসন্ধান করিলে বৃষ্টিহীনতা ব্যতীত অপর কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুজলা প্রদেশও যে ক্রমে, অল্প-পরিসর হইয়া মরুর প্রসার বৃদ্ধি করিতেছে, তাহা এই সকল প্রদেশের প্রান্তবর্ত্তী ভূভাগ পরীক্ষা করিলে বেশ

বুঝা যায়। ইহাদের নানা অংশে আধুনিক বৃক্ষাদির চিহ্ন ভূগর্ভে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

প্রদেশের উচ্চতা লইয়া হিসাব করিলেও মরুভূমির ক্রমপ্রসারণের আরো সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। লায়েল সাহেব দেখাইয়াছেন, আমেরিকার আধুনিক মরুভূমির অন্তর্গত যেসকল স্থানের উচ্চতা দেড় হাজার ফিট্ মাত্র, এ অঞ্চলে তাহাতে প্রচুর বারিপাত হইত। ভূপ্রোথিত বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরীভূত বৃক্ষ অদ্যাপি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু আধুনিক যুগে সেই সকল প্রদেশেরই সাড়ে ছয় হাজার ফুট্ উচ্চ স্থানে বৃষ্টি হয় না। ইহা যে আকস্মিক ভূবিপ্লবের ফল নয়, তাহা লায়েল সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন। কাজেই বলিতে হয়, যুগযুগান্তর ধরিয়া ভূবায়ু ধীরে ধীরে শুষ্ক হইয়া এখন এপ্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পূর্ব্বের তুলনায় চারি হাজার ফুট্ উচ্চস্থানেও এখন বারিপাত হইতেছে না।

লেখক কেবল এক আমেরিকার এক মরুপ্রদেশ লইয়া পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। পৃথিবীর অপর অংশের মরুভূমি গুলি এই প্রকারে বিস্তারলাভ করিতেছে কি না, সে সম্বন্ধে কোন কথাই শুনা যায় নাই।

৩। বৃহস্পতির অষ্টম উপগ্রহ।

গ্রহরাজ বৃহস্পতির কেবল চারিটি উপগ্রহের সহিতই আমাদের পরিচয় ছিল। আধুনিক জ্যোতিষ শাস্ত্রের জনক গ্যালিলিয়ো ১৬১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্বহস্তনির্ম্মিত দূরবীণে ঐ চারিটি উপগ্রহকে সর্ব্বপ্রথমে দেখিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে প্রায় তিনশত বৎসর ধরিয়া জ্যোতিষিগণ বৃহস্পতির অনুচরের সংখ্যা চারিটি বলিয়াই জানিয়া আসিতেছিলেন। গত ১৮৯২ সালে হঠাৎ সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, সুবিখ্যাত আমেরিকান্ জ্যোতিষী বার্নাড্ সাহেব সেই চারিটি উপগ্রহের নিকটে আর একটি অতি ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কের সন্ধান পাইয়াছেন। গণনায় সেটিকে বৃহস্পতির উপগ্রহ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল। ইহার পর কয়েক বৎসর আর বৃহস্পতি-পরিবারের নূতন খবর পাওয়া যায় নাই। আজ তিন বৎসর হইল, হঠাৎ একদিন শুনা গিয়াছিল গ্রহরাজের আরো দু'টি নূতন অনুচরের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। এই ষষ্ঠ ও সপ্তম উপগ্রহের আবিষ্কারও মার্কিন্ জ্যোতিষিগণের চেষ্টায় সুসম্পন্ন হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ আমেরিকান্ জ্যোতিষী পেরিন্ (Perrine) সাহেব লিক্ মানমন্দিরের বৃহৎ দূরবীণের সাহায্যে উভয়কেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

অষ্টম উপগ্রহটির আবিষ্কারের গৌরব এবারে ইংলণ্ডের ভাগ্যে পড়িয়াছে। গ্রীন্‌উইচ্ মানমন্দিরের জ্যোতিষী অধ্যাপক ক্রমেলিন্ (Crommelin) ইহার আবিষ্কর্ত্তা। গ্যালিলিয়োর চারিটি উপগ্রহ আবিষ্কার হওয়ার পরও তিনটি নূতন ক্ষুদ্র উপগ্রহের সন্ধান পাইয়া, বৃহস্পতির আরো ক্ষুদ্র সহচর আছে বলিয়া আধুনিক জ্যোতিষিগণের মনে হইয়াছিল। এজন্য কয়েক বৎসর ধরিয়া বৃহস্পতিক্ষেত্র শত শত জ্যোতিষীর লক্ষ্যস্থল হইয়া পড়িয়াছিল। জ্যোতিষিগণ বড় বড় দূরবীণ দ্বারা বৃহস্পতিকে সন্ধান করিয়া যন্ত্রসংলগ্ন ফটো-গ্রাফের ক্যামেরায় তাহার ছবি উঠাইতেন। কাচফলকে বৃহস্পতি ও তাহার অনুচরগুলির ছবি উঠিত, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেইস্থানের শত শত ছোট বড় নক্ষত্রের চিত্রও অঙ্কিত হইয়া যাইত। চিত্রস্থ বহুজ্যোতিষ্কের মধ্যে কোন্‌টি নক্ষত্র এবং কোনটিই বা উপগ্রহ তাহা স্থির করা কঠিন নয়। আকাশের সর্ব্বাংশের নক্ষত্রগুলির ফোটোগ্রাফ্ ছবি প্রত্যেক জ্যোতিষীরই হাতের গোড়ায় থাকে। এই নক্ষত্রচিত্রের সহিত নূতন নক্ষত্রচিত্র মিলাইয়া দেখিলেই কোন নূতন জ্যোতিষ্ক চিত্রে স্থান পাইয়াছে কি না সহজে ধরা যায়।

গ্রীন্‌উইচের জনৈক জ্যোতিষী দূরবীন্ ও ক্যামেরার দ্বারা বৃহস্পতিক্ষেত্রের এক ছবি প্রস্তুত করিয়া, নাক্ষত্রিক চিত্রের সহিত তাহাকে মিলাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। উভয় চিত্র ঠিক মিলিয়া গিয়াছিল, এবং সাতটি উপগ্রহসহ বৃহস্পতিকে চিত্রে সুস্পষ্ট দেখা গিয়াছিল। কিন্তু একটি অতিক্ষুদ্র নূতন জ্যোতিষ্কের ছবি কাচফলকে কিপ্রকারে মুদ্রিত হইয়া পড়িল, পর্য্যবেক্ষক তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। এই সময়ে অধ্যাপক ক্রমেলিন্ ছবিখানিকে লইয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং ইঁহারি পরীক্ষায় ছবির জ্যোতিষ্কটি যে সত্যই বৃহস্পতির একটি নূতন উপগ্রহ তাহা নিঃসন্দেহে স্থির হইয়া গিয়াছিল।

ক্রমেলিন্ সাহেব প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ নূতন জ্যোতিষ্কটি কোন ক্ষোদিষ্ট-গ্রহ (Asteroids)

হইবে। এই ক্ষুদ্রকায় গ্রহগুলি মঙ্গল ও বৃহস্পতির পরিভ্রমণ পথের মধ্যস্থানটি অধিকার করিয়া দলে দলে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। ক্রমেলিন্ সাহেবের এই ভ্রম শীঘ্রই দূরীভূত হইয়াছিল। তিনি জ্যোতিষ্কের নূতন গতিবিধি কয়েক দিন মাত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছিলেন, সেটি সত্যই বৃহস্পতির চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়।

নূতন উপগ্রহটির পরিভ্রমণ কালাদি সম্বন্ধে আজও ঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই। আবিষ্কারক মহাশয় বলিতেছেন, বৃহস্পতির অপর উপগ্রহগুলি যেদিক ধরিয়া গ্রহরাজকে প্রদক্ষিণ করে এই নূতন জ্যোতিষ্কটি সম্ভবতঃ তাহার বিপরীত দিক ধরিয়া চলে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

অতুল।

স্তন্য-সুধাপায়ী শিশু হাসে 'মা, মা' বলে';
চুমি'ছে সে মুখ মাতা ভাসি' আঁখি-জলে।
দার্শনিক হেরি' তাহে কহে—"এ যে ভুল"!
মুগ্ধ কবি কাঁদি কহে—"অতুল, অতুল"!

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল।

(১) হাসির কবিতা।

একালে বাঙ্গলা সাহিত্যের নেতা ইংরেজিনবীসেরা; কিন্তু এ কথায় কেহ মনে করিবেন না, যে ইংরেজি শিক্ষিতেরা সকলেই বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া থাকেন। অতি অল্পসংখ্যক কয়েক জন সুশিক্ষিত ব্যক্তি দেশের ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করিতেছেন বটে, কিন্তু ইংরেজি শিক্ষিত দলের মধ্যে পাঠকের সংখ্যা তত অধিক নয়। এখনো অনেকে মনে করেন যে বাঙ্গালায় পড়িবার মত জিনিস কিছুই নাই। টোলের পণ্ডিতেরা ত ভাষা সাহিত্য পড়িয়া কদাপি তাঁহাদের গৌরব নষ্ট করিতেন না; এখনো করেন না। নৈষধের কবিত্বশূন্য শব্দালঙ্কারের ছটা দেখিয়া তাঁহারা মুগ্ধ থাকেন, কিন্তু চণ্ডীদাসের যে কবিতার "অমিয় বরিখে" তাহা তাঁহারা স্পর্শও করেন না। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল নিমাই ঠাকুরের আহ্বানে যাহাদিগকে বলিয়াছেন, "ছেঁড়া পুঁথি ফেলে তোরা চলে আয়", কে তাঁহাদিগকে আজি শ্রীহর্ষের দময়ন্তী ভুলিয়া মধুসূদনের প্রমীলা দেখিতে বলিবে, ভ্রমরের কালরূপে মুগ্ধ হইতে বলিবে, এবং চাঁষার মেয়ে ক্ষেত্রমণির সতীত্বের পূজা করিতে বলিবে? অন্যদিকে আবার যাঁহারা কিপ্‌লিং ও মেরী কোরালী প্রভৃতির অতি অসার অপদার্থ রচনা পড়িতে পারেন, তাঁহারা যে কেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের কথাগ্রন্থ পড়েন না, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর পদাঘাতে খবরের কাগজে জড়ান অপক্ব কদলীগুলি একেবারে দূরীভূত হয় নাই বটে; কিন্তু এখন যে বঙ্গসাহিত্যের দোকানে অনেক সরস ও সুপক্ব ফল পাওয়া যায়, তাহা দেখাইতেছি। কিন্তু ঘটত্বের দোকানের প্রহরীরা এখনো ঝুনা নারিকেলের ছোবড়াই কামড়াইতেছেন; এবং এখনো শাস্ত্রের গভীর অর্থের আলোচনায় সভায় "নরহরি শাস্ত্রীর" দল, "মনু হাতে ক'রে", "পাত্রাধার তৈল"র ব্যাখ্যার শেষে, "কোরে দেন সুসম্পন্ন পরস্পরের শ্রাদ্ধ।"

তবেই দাঁড়াইল এই, যে, যাঁহাদের ঘরে কিছু পয়সা আছে, অথবা পয়সা খরচ করিবার বাতিক আছে, তাঁহারাই কয়েকজন বঙ্গসাহিত্যে গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন। একজন ইংরেজিশিক্ষিত জমীদার একটা বড় মজলিসে আপনার গৌরব দেখাইবার জন্য বলিয়াছিলেন,—"আমি বঙ্কিমবাবুর রচনার একছত্রও পড়ি নাই।" ঘটিরাম ডেপুটির মত যাঁহারা ইংরেজিতে ভারি লায়েক, অর্থাৎ "কেটে জোড়া দেন", এখনো তাঁহারা কেবল মাত্র বাঙ্গালা না পড়ার সুযশের জোরে, ইংরেজিতে পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইতে চাহেন। যে কৃপার পাত্রেরা মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র এবং হেমচন্দ্রের রচনা পড়েন নাই, রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের কতকগুলি রচনার সহিত তাঁহারা পরিচিত হইয়াছেন দেখিয়াছি। তাহার কারণ আছে। যিনি ইংরাজিতে যত বড় পণ্ডিতই হউন, সামাজিক আমোদ প্রমোদ, হাসি তামাসাটা আগাগোড়া খাঁটি ইংরেজিতে চালাইয়া উঠিতে পারেন না। সামাজিকতায় সন্তোষের জন্য প্রেমের গান

কিম্বা হাসির গান, বিলাত হইতে আমদানি করা চলে না। এই জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রেমবিষয়ক কয়েকটা গান, এবং দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানগুলি নূতন "পালিস্ ষষ্ঠী" লুটিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ঐ গানগুলি ছাড়া কবিদ্বয়ের রচনায় আর কি আছে, তাহা তাঁহারা জানেন না; সম্ভবতঃ ঐ গানগুলিও কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরিয়াই তাঁহাদের মজ্‌লিসে পৌঁছিয়াছে; ছাপার অক্ষরে সেগুলি মুদ্রিত দেখেন নাই। যাঁহাদের পড়া উচিত তাঁহারা পড়েন না; এই সমালোচনা প্রকাশ করিলেও যে বাঙ্গালা সাহিত্যের পাঠক বাড়িবে তাহাও নয়। তবুও চেষ্টা করা মন্দ কি?

(১) সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম প্রতিষ্ঠা হাস্যরসের রচনায়। বঙ্গসাহিত্যে সে কালে একালে হাস্যরসের যথেষ্ট আদর থাকিলেও অনেক পেচক পণ্ডিতেরা উহা ভাঁড়ামির অঙ্গমাত্র মনে করেন। হাসি যে শারীরিক ও নৈতিক স্বাস্থ্যের অভিব্যক্তি, সে কথা কি কাহাকেও বুঝাইতে হইবে? লবক যথার্থই বলিয়াছেন, যে হাস্যরস (Humour) সাহিত্যব্যঞ্জনের লবণ; যে হাসিতে পারে না সে রাক্ষস। সকল ঝড় তুফান মাথায় করিয়া, যাহার প্রাণ, বন্যার মত ভাসিয়া থাকিতে পারে, আমি তাহাকে অসাধারণ মানুষ মনে করি। যদি কেবল হাসির গানেই দ্বিজেন্দ্রলালের যশ প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তবুও কবির প্রতিভা অসাধারণ বলিয়া মনে করিতাম। সমাজের যে সকল নীচতা এবং ভণ্ডামি দেখিয়া সংস্কারকেরা ছটফট করিয়া উঠেন, কেহ বা রাগ করিয়া গালি দেন, কেহবা গম্ভীরভাবে উপদেশ দিতে বসেন, কবি তাহা দেখিয়া কেবল হো হো করিয়া হাসিয়াছেন। আমার বিশ্বাস যে এ বিষয়ে কবি Francis এর উক্তিটি ঠিক, যে যেখানে গম্ভীর বিচার নিষ্ফল হয়, সেখানে তামাসায় বেশি কাজ দেখে।

> Ridicule shall frequently prevail
> And cut the knot when graver reasons fail.

কবি যখন যৌবনের প্রারম্ভে ইউরোপ হইতে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেখিলেন, যে দেশবিদেশে পরিভ্রমণের দোষে (?) চিরপরিচিত সমাজ তাঁহাকে কাছে ঘেঁসিতে দিতে চায় না। কেন? মানুষ কি এত নির্ম্মম, এত ভণ্ড, এত মূর্খ? কবির একটু রাগ হইয়াছিল; তিনি "একঘরে" লিখিয়াছিলেন। যাক্ বইখানি আর মুদ্রিত হয় না। সরল হৃদয়ের রাগটুকু দেখিতে দেখিতে উবিয়া গেল; তিনি শেষে এই অসীম ভণ্ডতা, এবং অমানুষিক নির্ম্মমতার দিকে চাহিয়া হো, হো, করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার হাসির প্রথম কবিতা Reformed Hindus। লোকে বলিল হাস কেন? কবি বলিলেন,—

> বলিত হাস্‌বনা, হাসি রাখ্‌তে চাইত চেপে,—
> কিন্তু এ ব্যাপার দেখে, থেকে থেকে, যেতে হয় প্রায় ক্ষেপে।
> যবে নিয়ে উড়োতর্ক শাস্ত্রীবর্গ টিকি দীর্ঘ নাড়ে;
> একটু গ্যানো পোড়ে কেহ চড়ে বিজ্ঞানেরই ঘাড়ে;
> কত্তে এক ঘরের মস্ত বন্দোবস্ত ব্যস্ত কোন ভায়া;
> তখন আমি হাসি জোরে, শুষ্ক ভরে', ছেড়ে প্রাণের মায়া।

যিনি নাট্যরচনায় মানবচরিত্রবিশ্লেষণে যথেষ্ট ক্ষমতা দেখাইতেছেন, কোন ভণ্ডই ধর্ম্মের নামে তাঁহার চোখে ধূলা দিতে পারে নাই। নবযুগের বঙ্গসাহিত্যের প্রথম অবস্থায় কালীপ্রসন্ন সিংহ অতি সরল গ্রাম্য ভাষায় ভণ্ডদলের মুখের উপর বলিয়াছিলেন যে তাহারা ভণ্ড। তিনি নির্ভীক পুরুষ ছিলেন বটে; কিন্তু সময়মাহাত্ম্যে তাঁহাকে একটু অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া হুতুম প্যাঁচা সাজিতে হইয়াছিল। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল নির্ভীক, এবং তাঁহার সেই তেজস্বিতায় বৃথা দম্ভ (*Bravado*) নাই; তিনি সরলস্বভাব—কোন রকম পেঁচালো ভাষায় দুকূল রাখিবার কথা কহেন নাই। চণ্ডীচরণের দল যখন দেশমান্য গীতার দোহাই দিয়া আসরে নামিল, তখন গীতার খাতিরে অনেকে কি বলিবেন, কি না বলিবেন, ভাবিতেছিলেন। কিন্তু কবি যখন দেখিলেন ভণ্ডেরা বৃথা আত্মাভিমানের জালে লোকগুলিকে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং বিশ্বের সকল জ্ঞান "গীতার একটি অধ্যায়েরি মধ্যে" আছে বলিয়া টিকি নাড়িতেছে, তখন অতি সহজেই তাহাদের গীতার আবিষ্কার করিয়া ভণ্ডদলকে হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। দেশের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে মধুসূদনও একবার কলম তুলিয়াছিলেন। কিন্তু "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ"র পরে তিনি আর কিছুই লেখেন নাই।

কবি "একঘরে" লিখিয়া দেশের লোককে দৈবাৎ গালি দিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু পরে যখন দেখিলেন চারিদিকেই ভণ্ডামির ব্যবস্থা, তখন সকল ভণ্ডকে জড় করিয়া কল্কী অবতারের কাছে পেশ করিয়া দিলেন। তোমরা ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়া স্বর্গে যাইবে যাও; কিন্তু স্বর্গে যখন বাঘে মেষে এক

ঘাটে জল খায়, তখন এ পৃথিবীতে তোমরা ধর্ম্মের নামে দলাদলি বাধাইয়া মানুষে মানুষেও এক নদীতে জল খাইতে দিতে চাও না কেন? ধর্ম্মের মূল যে নরপ্রীতি, তাহা উড়িয়া গিয়া কেবল কিচিরমিচির দেখিয়া, কবি উদার প্রাণে সকলকে কোলাকুলি করিতে আহ্বান করিলেন। কবি বলিতেছেন:—

কদিন সমাজ একঘরের ভয়ে টি'কে থাকে?
বিশ্বাস, প্রেম, মনুষ্যত্বই সমাজকে রাখে।
খাওয়া শোয়া পরা নিয়ে কেন ঘুষো ঘুষি?
সেটা কর বাড়ী গিয়ে যার যেমন খুসী।
জাতি রাখ্‌তে চাও—থাকো এই সত্য ধরি,
ভুলো নাক মনুষ্যত্ব সমাজ ও হরি।

(২) তেজস্বিতা, সরলতা এবং উদারতা যাঁহার হাসির মূলে, তাঁহার হাসির কবিতা এবং হাসির গানে দেশের লোক মুগ্ধ হইবেই হইবে। সরল ভাবে সত্য কথা বলিলে এবং সত্য কথা বলিয়া হাসিলে, হাসির উদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রাণে একটু ব্যথা লাগিতে পারে। কিন্তু কবির হাসি টুকুর প্রতি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেই বেদনা ভুলিতে পারা যায়। কবির ব্যঙ্গ যে লোক বিশেষের প্রতি প্রযুক্ত নহে কিম্বা কুৎসা রটনার ঘৃণা কার্য্যে উন্মুখ নহে, সে কথা পরে বলিতেছি।

স্বীকার করি, যে এদেশের (একালের) পণ্ডিত সমাজের প্রতি কবির দু চারিটি ব্যঙ্গশর নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাহাতে যে বিদ্বেষ ভাব নাই তাহা দেখাইবার প্রয়োজন আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে একালের টোলে বিদ্যার প্রগাঢ়তা তেমন নাই। স্পষ্টবাদী কবির সমালোচনায় সে কথাটাও স্পষ্ট করিয়া বলাই ভাল। একালের পণ্ডিতেরা ব্যাকরণে কিম্বা ন্যায়শাস্ত্রের অংশ বিশেষে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন বটে, কিন্তু বিদ্যালাভে বড় প্রয়াসী নহেন। বাঙ্গালাদেশের নূতনত্বের মহিমার কথা বলিয়াছি, দোষের কথাও একটা বলিব। বহুকাল হইতে এদেশে নব্য ন্যায়, নব্য স্মৃতি প্রভৃতির আলোচনা হইয়া আসিতেছিল বটে, কিন্তু প্রাচীন ন্যায় স্মৃতির আলোচনা আদৌ ছিল না। সংস্কৃত বিদ্যা অতি সঙ্কীর্ণ ভাবেই ছিল। সোসাইটি হইতে যখন প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ আরম্ভ হয়, তখন বেদগ্রন্থের ত কথাই নাই, প্রাচীনকালের বিখ্যাত স্মৃতির গ্রন্থও বঙ্গদেশে পাওয়া যায় নাই। বেদ যে কি জিনিস, বাঙ্গালায় পণ্ডিত তাহা কদাপি জানিতেন না; কিন্তু মুখে বেদের দোহাই দিয়া যে কোন সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইতেন। কবি নির্ভীকতার সহিত বলিয়াছেন, যে কল্কী অবতারের দরবারে তর্কালঙ্কারের দল, খনার বচন আবৃত্তি করিয়া বৈদিক বিদ্যা জাহির করিয়াছিলেন। যাঁহারা সংস্কৃত ভিন্ন অন্য কোন সাহিত্য পড়েন না, আশ্চর্য্যের কথা এই যে তাঁহারা কোন একখানা কাব্য গ্রন্থও আগাগোড়া ভাল করিয়া পড়েন না। জিজ্ঞাসা করিলেই বলেন, যে আমরা অনায়াসে পাঠ লাগাইতে পারি এবং ব্যাখ্যা করিয়া দিতে পারি। ব্যাকরণের জোরে অপঠিত গ্রন্থ বুঝিবার ক্ষমতা আছে, তাহা না হয় স্বীকার করিলাম; কিন্তু বিদ্যার অর্থ কি কেবল তাই? পণ্ডিতবর্গের মধ্যে যাঁহারা একালের ভাবের সংস্পর্শে আসেন নাই, তাঁহাদের অনেকেই আমূল মহাভারতখানা যত্ন করিয়া পড়েন নাই; ক্ষুদ্রতর রামায়ণ খানিও নহে। কবির বিদ্রূপের ফলে যদি পণ্ডিতেরা আত্মসম্মান রক্ষার জন্য প্রাচীন শাস্ত্রাদি পাঠে মনোযোগী হয়েন, তবে হয় ভাল। তাহা না করিয়া যদি কেবল বলেন, যে "কলিকালের মহাঘোরে এবার আমরা গেলাম," তাহা হইলে ফল কেবল "ক্রন্দন করিতে করিতে নিস্ক্রান্ত হওয়া।"

(৩) ধর্ম্মভণ্ডদিগের বিদ্রূপের দৃষ্টান্তে কবির হাসির গানের মূলে যে সকল বিদ্বেষ-বিহীন উচ্চ ভাব আছে সাধারণতঃ তাহাই বলিয়াছি। এখন কবির হাসির গানের ও হাস্যরসের প্রকৃতি এবং বিচিত্রতা আলোচনা করিব। হাসি, আনন্দের হউক, ঘৃণার হউক, বিদ্রূপের হউক, উহার দুইটি সাধারণ বিভাগ আছে; যথা, নৃশংস হাসি এবং হৃদ্য হাসি। আমাদের দুর্ভাগ্য এই, যে একালের বঙ্গসাহিত্যে নৃশংস হাসির অভাব নাই। নৃশংস নির্ম্মম নীচ প্রকৃতির লেখকেরা পরশ্রীকাতরতায় যদি কেবল উচ্চপদকে অপদস্থ হইতে দেখিয়া একটু হাসিয়া মনের জ্বালা জুড়াইয়া লইত ক্ষতি ছিল না; কিন্তু ভগবান বুদ্ধদেব যাহাকে মহাপাপ বলিয়াছেন, এবং পরবর্ত্তী স্মৃতি গ্রন্থেও যাহা পাতক বলিয়া উক্ত, নরাধমেরা সে পাপ কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত নহে। কুলকামিনীর কলঙ্ক রটনা করিয়া, অথবা কলঙ্কের একটা মিথ্যা কথা পেঁচালো ভাষায় ধ্বনিত করিয়া, যাহারা রসিকতা করিবার প্রয়াস করে, সেরূপ মহাপাপিষ্ঠেরাও বঙ্গসাহিত্যে সুরসিক লেখক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতেছে। ঐ পিশাচ-

গুলির উপদ্রবে এক সময়ে ভারতী পত্রিকায় হেঁয়ালি-নাট্য প্রকাশ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গেটের মত উহাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন:—"How the Devil jests"। কাজেই পিশাচগুলি এখন ভয়ে নসীরাম পালের আঁস্তাকুড়ে আপনার নরকে আপনি মুখ লুকাইয়া আছে। কবির সুপ্রসন্ন হাস্যমুখের প্রকাশে পাঠকদিগকে এখন আর তাহাদের মুখ-বিকৃতি দেখিতে হয় না। এখন হৃদ্য হাসিতেই দেশ ভরিয়া গিয়াছে।

(৪) হৃদ্য রসেরও প্রকার ভেদ আছে। যে হাসি স্বাস্থ্যের নির্য্যাস, যাহা বর্ষার রসপুষ্ট পত্রাবলীর সতেজ শ্যামলতায় প্রতিফলিত শরদিন্দুর মত ভাস্বর, যাহা প্রিয়জন সম্মিলনের আনন্দে স্বতঃ-অভিব্যক্ত, পরিহাস কথার রচনায়ও কবি সেই চিন্ময় হাসির সৃষ্টি করিয়াছেন। যে স্থূলতা-বর্জ্জিত রস—

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ড স্বপ্রকাশানন্দ চিন্ময়:
বেদ্যান্তর স্পর্শ শূন্যো ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ

তাহা নাটক এবং কাব্য গ্রন্থেই ফোটে ভাল। তাই, আহ্বরী—সরলা সহবাসে, কমলমণির চুম্বন যুদ্ধে, জীবানন্দের ভোজন বাহুল্যে, মেহের-উন্নিসার সজল হাস্তে, এবং রাজিয়ার গানে, তাহা বেশি প্রস্ফুট। কবি দীনবন্ধু মিত্র, 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষের' কথায়, পুরাতন বঙ্গদর্শনের প্রায় ১৬টি পৃষ্ঠা ভরিয়া, এই জ্যোৎস্নাময় হাসি, ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। স্বীকার করি, যে ব্যাকরণের হিসাবে সকল হাসিরই উৎপত্তি, হস্ ধাতু হইতে; কিন্তু এ শ্রেণীর হাসিকে "হাসস্" (চন্দ্র) হইতে উৎপন্ন বলিতে ইচ্ছা করে। ব্যাকরণের খাতিরে ধাতু বদ্‌লাইতে না পারে; কিন্তু এ হাসি স্বতন্ত্র "ধাতের", তাহা স্বীকার করিতে হইবে। (১)

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের তানসান, কৃষ্ণ-রাধিকা, কালরূপ, প্রাণান্ত, বিষ্যুৎবারের বারবেলা, প্রভৃতি গানগুলি ঐ শ্রেণীর নিরবচ্ছিন্ন জ্যোৎস্নায় রচিত। একটা কিছু-না কথায় হাসি সৃষ্টি করা, বড় শক্ত; কেবল অমিল ও বিসম্বাদী কথার যোজনা করিলেই হয় না। শুধুই যদি এঁড়ে গরু পিঁজ্‌রা ভেঙ্গে খেজুর গাছে ওঠে, তাহাতে হয় মাতলামি, না হয় গ্রাম্য রকমের ভাঁড়ামির সৃষ্টি হয়। তান্‌সান-বিক্রমাদিত্য সংবাদের বিসম্বাদী কথা যোজনায় কাব্যকৌশল আছে। উহার সহজ সময়বিভ্রাট টুকুতে বেশি আশ্চর্য্য কিছু নাই। কিন্তু তানসানের শ্রাদ্ধের কথা বলিয়াই কবি যখন লিখিলেন, "অর্থাৎ তাঁর গানের শ্রাদ্ধ, তাঁর ত হয়ে গেছে কবে; আর তানসান মুসলমান, তাঁর শ্রাদ্ধ কেমন করেই হবে", তখন গানের আগাগোড়া সব কথাগুলি একটা হাসির মন্ত্র-বলে উড়িয়া গেল; আর কিছুই রহিল না। রহিল কেবল, —কোরসের "তা-ধিন্ তা কি" টুকু। বিষ্যুৎ বেলার বারবেলার প্রতিছত্রে যে নূতনত্ব এবং পরিহাসবৈচিত্র আছে, তাহা অতি দুর্লভ।

(৫) কবির যে সকল পরিহাস, তীব্রতার জন্য প্রসিদ্ধ, তাহাতেও দাহের জ্বালা অপেক্ষা জ্যোৎস্নার শীতলতাই অধিক। স্বীকার করি, যে চণ্ডীচরণের দল গীতার আশীর্ব্বাদে অনেক ঘুষি ও কাম্‌ড়ি ভোগ করিয়াছে এবং নন্দলাল বেচারাকে কবি বিলক্ষণ গলাটিপুনির চোটে নাকে খৎ দিয়া লওয়াইয়াছেন; কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, যে উহারা গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া, কাঁদিয়া হাসিয়া "আর মেরোনা" বলিয়া কবির সহিত ভাব করিয়া বাড়ি ফিরিয়াছে। একেলে হিন্দুর টিকিটি গোপনে পিছনে ঝুলিয়াছিল এবং বিলাত ফেরত পরমানন্দে পা ফাঁক করিয়া সিগারেট টানিতেছিলেন, কবি সেই টিকিটি ধরিয়া টানিয়া এবং ফুৎকারে সিগারেটের ছাইটুকু ডে, রে ও মিটারের মুখে ছড়াইয়া দিয়া যখন হাসিয়া বলিতেছেন,—

শুধু লুটিব একটু মজা শুধু করিব একটু পেয়ার,
শুধু নাচিব একটু, গাহিব একটু,———

তখন কি কেহ রাগ করিতে পারে? রাগ করে না; বরং ভণ্ডেরা ভণ্ডামি ছাড়ে, বাঁদরেরা বাঁদরামি পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ কিনা "অমন অবস্থায় পড়লে সবারি মত বদলায়।"

---

(১) একালের পাঠকদিগকে (অবান্তর হইলেও) প্রাচীন অলঙ্কারের হাসি-বিভাগের একটি তালিকা উপহার দিতেছি,—

১—স্মিত—অধরে ঈষৎ প্রকাশিত হাস্যের নাম।

২—হসিত—কিঞ্চিৎ লক্ষ্য হইলে হসিত হয়; পুনরপি:—

হসিতন্তু বুধা হাস্যো যৌবনোত্তেদ সম্ভবঃ

৩—বিহসিত—"মধুরস্বরং বিহসিতং"

৪—অবহসিত—"সাংসশিরঃ কম্পং" অবহসিতং"

৫—অপহসিত—"অপহসিতং সাস্রাক্ষং"

৬—অতিহসিত—"বিক্ষিপ্তাঙ্গং ভবতি—অতিহসিতং"।

পরিহাস অর্থ তামাসা, এবং উপহাস অর্থ ঠাট্টা।

(৬) যখন সুরেন্দ্রনাথ এবং আনন্দমোহন ভারতসভা স্থাপন করিয়া দেশের মধ্যে একটা নূতন শক্তি জাগাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, সে সময়ে ঐ চেষ্টার উপহাসে "ভারত উদ্ধার" রচিত হইয়াছিল। ঐ শ্রেণীর সরস, সতেজ ও তীব্র ব্যঙ্গ, বঙ্গভাষায় হয় ত সেই প্রথম। আমাদের সাহিত্য-সমাজে উহার রচয়িতার প্রতিভা এবং ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। নির্ম্মাণকৌশল এবং হাস্যরসে গ্রন্থখানির সাহিত্যিক মূল্য আছে; কিন্তু ঐ উপহাসের ফলে যে স্বদেশসেবকের নব উদ্যমে বাধা পড়িয়াছিল, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। দেশব্যাপী উদাসীনতা এবং স্বার্থপরতায় যাহারা কোন কাজে অগ্রসর হইত না, তাহারা উল্টা তাহাদের বিজ্ঞতা দেখাইয়া ঐ ব্যঙ্গ কবিতা আওড়াইত। বিধাতার কৃপায় আজিকালিকার দিনে কেহ ঐরূপ গ্রন্থ লিখিলে তাহা পঠিত হইবে কি না সন্দেহ। এ সংসারে এমন জিনিষ নাই যাহার একটা উপহাসের দিক্ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই বলিয়া যে খুঁজিয়া পাতিয়া উপহাস করিতে হইবে; কিম্বা একটা "সরস" কথা জোগাইলেই, সেই সরস কথাটার খাতিরে তাহা প্রকাশ করিতে হইবে, তাহা নয়। সাহিত্যেও সংযমের একটা দিক্ আছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে "পেয়েছে দণ্ড, যতেক ভণ্ড, চণ্ডী নন্দ ইত্যাদি;" কিন্তু স্বদেশপ্রেম তাঁহার কাছে উপহাসের বিষয় নহে। যাঁহারা আলস্যকে উপহাসের হাসির আবরণে লুকাইয়া সহজে বিজ্ঞ নাম পাইতে চাহেন, কবি সে শ্রেণীর লোক নহেন। বরং এই "হোতে পাত্তাম" দল তাঁহার কাছে উপহসিত। কবি স্পষ্ট দেখাইয়া দিয়াছেন, যে, আপনাদের অসারতা ঢাকিবার জন্য অকর্ম্মণ্য অলসেরা—

> * * বোঝাতে চান্ হিন্দু ধর্ম্মের অতি সূক্ষ্ম মর্ম্ম—
> ভীরুতাটা আধ্যাত্মিক ও কুড়েমিটা ধর্ম্ম।"

(৭) কবির এক শ্রেণীর গানে হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিতে হয়। ইরান দেশের কাজির ক্ষমতাজ্ঞাপক নির্ম্মম অবজ্ঞায়, খুস্‌রোজের উৎসবরঙ্গের নিরুপায় অভিনয়ে, 'আমি যদি' ও 'জিজিয়াকরে'র পাদুকা তাড়নায়, না হাসিয়া নিস্তার নাই বলিয়া হাসি; নহিলে মোগলের আদর মোগ্‌লাই কোর্ম্মার মত মিষ্ট নয়। কাঁদা আমাদের স্থাকামি বই কি? কারণ অশ্রুজলে পদাঘাতকারীর চরণরেণুও সিক্ত হয় না। চাচাজির উক্তি মনুষ্যত্বহীনের প্রতি যথার্থ প্রযুক্ত:—

> লাথি খেয়ে ওরে চাষা, বরংরে তোর উচিত হাসা;—
> যে তোর কথাও মাঝে মাঝে তবু আমার মনে জাগে।

এই মর্ম্মান্তিক হাসি চোখের জলে মিশিয়া যুগপৎ রৌদ্র এবং করুণরসের সৃষ্টি করিয়া, "আমার দেশ" ফুটাইয়া তুলিয়াছে, এবং আশা করি সে গীতি বঙ্গের গৃহে গৃহে সুধা বৃষ্টি করিতেছে। কবির কর্ণবিমর্দ্দনকাহিনী প্রভৃতি যদি বহু পূর্ব্বে রচিত না থাকিত, তাহা হইলে 'আমি যদি' রচনায় সাময়িক উত্তেজনার প্রভাব কল্পিত হইতে পারিত। শিলরের 'ডন্ কার্লস্' সমালোচনায় কার্লাইল্ বলিয়াছিলেন, "Had the character of Posa been drawn 10 years later, it would have been imputed to the French Revolution, and Schiller himself might have been called a Jacobin." খাঁটি বাঙ্গালা পাঠকের জন্য এ ইংরাজিটুকুর অনুবাদের প্রয়োজন নাই।

(৮) দেশের অধিকাংশ লোকের মতে সায় দিয়া, বাহবা লইবার জন্য, অনেক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হিতকর অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে উপহাস অস্ত্র ধরিয়া থাকেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল লোকশিক্ষক, তিনি অসার যশের জন্য লালায়িত নহেন। দেশের সব ভাল, একথা শত্রুতে বলে, এবং পাগলে বলে, স্বদেশপ্রেমিক বলে না। শত্রুর ইচ্ছা রোগী ঔষধ না খাইয়া মরুক; অথবা কুভূষণে ভূষিত হইয়া সমাজে দশজনের কাছে গিয়া উপহাসাস্পদ হউক। স্বদেশপ্রেমিক সাগর ছেঁচিয়া মানিক আনিয়া প্রেমের পাত্রকে ভূষিত করিতে চায়, তাহার দুঃখদুর্গতি নাশ করিতে চায়। অলস স্বদেশদ্রোহীরা সহজলভ্য বাহাবা লইয়া ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য যখন অগ্রসর হয়, এবং উপহাসের নামে মুখ খিঁচায়, তখন কবির—"তা, সে হবে কেন?" শুনিয়াই পলায়ন করে।

রমণীর উপস্থিতিতে যে সামাজিক পবিত্রতা বৃদ্ধি পায়, তাহা সম্ভবতঃ শীলের (১) অভাবে আমাদের মুখসর্ব্বস্ব ব্রহ্মচর্য্য ওয়ালারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। যেখানে মনে থাকে যে পাঠক কেবল পুরুষ, সেখানে ভাষায় সংযম থাকে না। এই জন্যই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় ভারত-

চন্দ্রের রসিকতা শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। দাশুরায়ের বারোয়ারি সভায় পাঁচালি, এবং গৃহস্থের ঘরে গীত পাঁচালির চেহারা দেখিলেই চিনিতে পারা যায়।

শ্লীলতার কথা উপহাস করিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিলেই সুরসিক বলিয়া আপনাকে প্রচার করা যায় না। প্রাচীন কালের অলঙ্কারে ব্রীড়া জুগুপ্সাদি ব্যঞ্জক কথার উপর এত কড়াকড়ি ছিল, যে একালে আমরা তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাই। যে সকল নগণ্য লেখক, অবনতির দিনের জঘন্য সাহিত্যের দোহাই দিয়া হাসাইবার ক্ষমতার অভাবে বীভৎসতার অবতারণা করে, তাহাদের কথা লইয়া সময় নষ্ট করিব না। কবির হাসির গানের 'স্ত্রীর উমেদার'; 'নয়নে নয়নে রাখি', 'চাষার প্রেম', প্রভৃতিতে গ্রাম্যতা, অবাচকত্ব, প্রভৃতি দোষ আদৌ নাই,—অথচ ঐগুলি প্রেমবিকৃতির কথা লইয়া পরিহাস। অন্যান্য হাসির গানের কথা দূরে থাকুক, এ সকল গানও যে কোন ভদ্রসমাজে মহিলাদের সমক্ষে গাহিয়া হাসিতে পারা যায়। হাসির সাহিত্যের সার্ব্বজন প্রসার, দ্বিজেন্দ্রলালের হাতেই হইয়াছে।

কুচরিত্র বেহায়ারাই প্রায়শঃ স্ত্রীজাতির শীলতার প্রহরী হইয়া দাঁড়ায়, এবং নদেরচাঁদের মত, স্ত্রীলোকের মুখে একটু হাসি পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না। ইহারাই যে স্ত্রীজাতির উন্নতির বিরোধী, সকল সৎকার্য্যের বিরোধী, তাহা নসীরাম পাল প্রভৃতির বক্তৃতায় এবং কল্কী অবতারের গোঁড়াদের চিত্রে বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে।

(১) আনন্দ সম্ভোগ আছে, অপবিত্রতা নাই; সুশিক্ষা আছে—অথচ নীরস কথা নাই; উচ্চ হাস্য আছে—কিন্তু গ্রাম্যতা নাই; এমন রচনা বঙ্গসাহিত্যের গৌরবের সামগ্রী। হাসির পবিত্রতা এবং বিচিত্রতায়, মানবচরিত্র বিশ্লেষণের দক্ষতায়, এবং রচনার চতুরতা ও সৌন্দর্য্যে, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির কবিতা ও গান, সাহিত্যে চিরস্থায়ী হইবে। সাময়িক কথার রঙ্গরসের মত, ইহা দুদিনে নীরস হইবার সামগ্রী নহে; সাহিত্যে এই হাস্যের রস অক্ষয়, এবং ইহার উপভোগ অফুরন্ত। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

(১) Moral cultureকে আমরা নৈতিক সাধনা প্রভৃতি নাম দিয়া থাকি। পবিত্র পিটকে নির্দিষ্ট "শীল" যখন ঠিক moral culture, তখন সেই প্রাচীন শব্দই ব্যবহৃত হউক; ইহাতে ভাব প্রকাশ অতি সুন্দর হয়।

বৈদিক শারদোৎসব।

গ্রীষ্মো হেমন্ত উত নো বসন্তঃ
শরদ্ বর্ষা সুচিতং নঃ অস্তু।
তেষামৃতূনাং শত শারদানাং॥
নিবাতে এষামভয়ে স্যাম॥

তৈ-স-৫-৭-২-৯

কিছু দিন হইতে আমাদের আশ্রমে ঋতুৎসব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; এবং তদুপলক্ষে আশ্রমবাসী বালকবৃন্দ প্রতি ঋতুতে কালোচিত অনুষ্ঠানের দ্বারা কিছুক্ষণ বিমল আনন্দ উপভোগ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে, পুরাকালে ভারতে কোনরূপ ঋতুৎসব প্রচলিত ছিল কি না, এবং থাকিলেই বা তাহা কিরূপ ছিল—ইহা জানিবার জন্য কাহারো কাহারো হৃদয়ে কৌতূহল উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের সেই কৌতূহলকে কথঞ্চিৎ চরিতার্থ করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। জানি না ইহার দ্বারা কতদূর অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।

সম্প্রতি শারদোৎসবের সময় উপস্থিত হইয়াছে, এজন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধেই বিশেষ ভাবে আলোচনা করা যাইবে। অন্যান্য ঋতুর উৎসব সেই সেই ঋতুতেই আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

পৌরাণিক সময়ে আমাদের দেশে যে শারদোৎসব প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা আজও চলিয়া আসিতেছে; এবং বঙ্গদেশে তাহার যেরূপ প্রভাব আজও দেখা যায়, তাহাতে ইহা আরও শত শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিবে বলিয়া আমরা অনায়াসেই মনে করিতে পারি। আমি ইহা দুর্গোৎসবের সম্বন্ধে বলিতেছি। শারোদৎসব বলিলেই আমরা দুর্গোৎসব ভিন্ন আর কিছুই মনে করি না; দুর্গোৎসবের প্রভাবে অন্যান্য পৌরাণিক শারদ উৎসব হীনপ্রভ হইয়া গিয়াছে।

দুর্গোৎসবকে ছাড়িয়া দিলেও অন্যান্য আলোচনাযোগ্য পৌরাণিক শারদ উৎসব আছে, কিন্তু তৎসমুদয়ের আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া সম্প্রতি আমরা বৈদিক কালেরই শারদ চিত্র উদ্‌ঘাটন করিতে চেষ্টা করিব।

এস্থানে ঋতু সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া লইতে হইবে। আমরা আজকাল যে হিসাবে ঋতু গণনা করিয়া থাকি, বৈদিককালে সেরূপ ছিল না। আমরা বৈশাখ ও

জ্যৈষ্ঠ মাসকে গ্রীষ্ম ঋতু বলিয়া ব্যবহার করি, কিন্তু বৈদিক ঋষিরা জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসকে গ্রীষ্মঋতু বলিয়া গণ্য করিতেন। অন্যান্য ঋতু সম্বন্ধেও এইরূপ। কৃষ্ণ-যজুর্বেদে উক্ত হইয়াছে:—

> "মধুশ্চ মাধবশ্চ বাসন্তিকাবৃতু,
> শুক্রশ্চ শুচিশ্চ গ্রীষ্মাবৃতু,
> নভশ্চ নভস্যশ্চ বার্ষিকাবৃতু,
> ইষশ্চোর্জ্জশ্চ শারদাবৃতু,
> সহশ্চ সহস্যশ্চ হৈমন্তিকাবৃতু,
> তপশ্চ তপস্যশ্চ শৈশিরাবৃতু।"
>
> তৈ-স-৪-৪-১১০.

মধু ও মাধব (অর্থাৎ চৈত্র ও বৈশাখ) বসন্ত ঋতু, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম ঋতু, শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা ঋতু, আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরৎ ঋতু, অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত ঋতু, এবং মাঘ ও ফাল্গুন শিশির ঋতু।

অতএব বৈদিককালের শারদ উৎসবের কথা বলিতে হইলে আমাদিগকে সেই সময়ের আশ্বিন ও কার্ত্তিকেরই উৎসব সমূহের উল্লেখ করিতে হইবে।

প্রত্যেক ঋতুরই এমন একটি বিশেষ বৈচিত্র ও অলৌকিক প্রভাব আছে, যাহাতে মানব হৃদয় আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। মানবসমাজ তাহার সেই সৌন্দর্য্য-লহরীতে নিমগ্ন হইয়া ও মাধুর্য্যধারায় প্রবাহিত হইয়া বিবিধ বিধানে আনন্দ অনুভবের জন্য প্রস্তুত হয়। আনন্দ না হইলে উৎসব হয় না; প্রতি ঋতুতেই প্রকৃতির সুবিশাল চিত্রফলকে এমন সুন্দর এমন মধুর—এমন হৃদয়স্পর্শী চিত্রসমুদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, এবং তাহার প্রভাবে ভুবনের প্রত্যেক পরমাণু হইতে এমনই এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দধারা প্রস্রুত হইতে আরম্ভ করে যে, নয়ন-হৃদয়-শালী মানবসমাজ সঙ্গে সঙ্গেই সেই আনন্দ অনুভব করিবার জন্য উৎসবের অনুষ্ঠান না করিয়া নিবৃত্ত হইতে পারে না।

আমরা দেখিতে পাই শারদলক্ষ্মী যখন নিজ পরিবারে পরিবৃত হইয়া প্রকৃতির বিমল সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার সেই রূপচ্ছটায় আকৃষ্ট হইয়া আনন্দোদ্বেলহৃদয়ে বৈদিক ঋষিগণ গাহিয়া উঠিয়াছিলেন:—

> "অক্ষিদুঃখোত্থিতস্যৈব বিপ্রসন্নে কনীনিকে।
> আঙ্‌ক্তে চাদ্গণং নাস্তি ঋভূনাং তন্নিবোধত।
> কনকাভানি বাসাংসি অহতানি নিবোধত।
> অন্নমশ্নীত মৃজ্মীত অহং বো জীবনপ্রদঃ॥"
> এতা বাচঃ প্রযুজ্যন্তে শরদ্ যত্রোপদৃশ্যতে॥"
>
> তৈ, আ, ১-৪-১২।

নয়নরোগ হইতে মুক্তিলাভকারী লোকের ন্যায় আজ শরৎ-ঋতুর নয়নতারকাদ্বয় বিশেষরূপে প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তিনি যেন নয়ন যুগলে অঞ্জন প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আর কোনরূপ মলিনতা নাই। (হে শ্রোতৃগণ,) তোমরা অবগত হও, সমস্তই ঋতু-(অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মি) সমূহের শক্তিতে সম্পন্ন হইয়াছে। তোমরা দেখ, শরৎ ঋতুর বসনসমূহ নবীন ও কনকসদৃশ! (ঐ দেখ, শরৎ বলিতেছেন—) "তোমরা অন্ন ভোজন কর, (গৃহ) মার্জ্জনা কর, আমি তোমাদের জীবনদাতা, আমি আসিয়াছি!" শরৎকে যেখানে দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে এইরূপ বাক্যই প্রচুর হইয়া থাকে।

বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, বৈদিক ঋষিগণের নিকট অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা শরৎ ঋতুই সমধিক প্রিয় বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। এই জন্যই দেবতাদির নিকটে কোন অভীষ্ট সম্ভোগ দীর্ঘকালের জন্য প্রার্থনা করিতে হইলে, তাঁহারা সাধারণত শরতের উল্লেখ করিয়াই প্রার্থনা করিতেন, যেমন "জীবেম শরদঃ শতম্"—আমরা যেন শত শরৎকাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকি! শত বৎসর না হইলে শত শরৎ হয় না, এই জন্য এতাদৃশ স্থলে কালক্রমে শরৎ শব্দ বৎসরবাচী হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু প্রথমাবস্থায় শরৎ শব্দ স্পষ্টত ঋতুকেই বুঝাইত।

রমণীয়তম বলিয়া শরৎ শব্দ সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন বৎসর অর্থে ব্যবহৃত হয়, ইংরাজী সাহিত্যে Summer প্রভৃতি শব্দও সেইরূপ স্থলবিশেষে গৌণভাবে বৎসরকে বুঝাইয়া থাকে।

শরতের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আর অধিক কিছু আলোচনা না করিয়া এখন দেখা যাউক যে, প্রাচীন সময়ে সেই ঋতুতে কিরূপ উৎসব প্রচলিত ছিল।

আশ্বযুজী কর্ম্ম।

শারদ লক্ষ্মীর সমাগমে আর্য্যগণ প্রথমে যে উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন, তাহার নাম "আশ্বযুজী কর্ম্ম"—অর্থাৎ যে কার্য্যকে আশ্বিন মাসের পূর্ণিমার দিন অনুষ্ঠান করিতে

হয়।[১] আশ্বযুজী কর্ম্মের জন্য তাঁহারা পুরাতন গৃহকে পুনর্ব্বার আচ্ছাদন করিয়া, লেপন করিয়া, সমান করিয়া নূতন করিতেন ও অলঙ্কৃত করিতেন। সেই দিন গৃহস্থিত সকলেরই বিশেষভাবে স্নান করিবার নিয়ম ছিল। এবং সকলেই শুক্লবসন পরিধান করিতেন। পরিবারবর্গ স্নানান্তে শুক্লবসন পরিধান করিয়া সমবেত হইলে গৃহপতি একটি হোম করিতেন। হোমশেষে গৃহপতি 'পৃষাতক' অর্থাৎ একত্র মিশ্রিত ঘৃত ও দুগ্ধের দ্বারা আর একটি হোম করিতেন। হোম সময়ে তিনি বলিতেন:—"যাহা আমার ঊন রহিয়াছে, তাহা যেন পূর্ণ হয়, এবং যাহা পূর্ণ আছে, তাহা যেন বিশীর্ণ হইয়া না যায়।[২]

পৃষাতকা।

পূর্ব্বে পৃষাতক (একত্র মিশ্রিত ঘৃত-দুগ্ধ) দ্বারা যে হোমের কথা বলা গিয়াছে, তাহা আশ্বিনের পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হইলেও কোন কোন সূত্রকার ইহাকে আশ্বযুজী কর্ম্মের অন্তর্গত না করিয়া পৃষাতকা নামে পৃথক্ কর্ম্ম বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, এবং তাহার প্রণালীও পূর্ব্বোক্ত হইতে বিভিন্ন।[৩] পারস্কর গৃহ্যসূত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে তদনুসারে জানা যায়, গৃহপতি আশ্বিন পৌর্ণমাসীতে দুগ্ধ দ্বারা চরু প্রস্তুত করিয়া ও তাহাতে দধি মধু ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তাহা দ্বারা, ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী, অশ্বিদ্বয়, আশ্বিন পৌর্ণমাসী ও শরৎ এই সকলের হোম করিতেন; এবং তাহার পর পূর্ব্বের ন্যায় পৃষাতক দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আহুতি প্রদান করিতেন। অনন্তর গৃহপতির অমাত্যগণ অর্থাৎ ভ্রাতা, পুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গ দধি মধু ঘৃত মিশ্রিত হুতশেষ সেই পায়স চরুকে কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অবলোকন করিতেন।[৪] তাহার পর ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া সেই কার্য্য সম্পন্ন করা হইত। সেদিন রাত্রিতে বাছুরগুলিকে পৃথক্ না বাঁধিয়া গাভীগণের সহিতই রাখিবার নিয়ম ছিল।

আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা 'কৌমুদী পূর্ণিমা' বা কোজাগরী পূর্ণিমা নামে আমাদের দেশে সুপ্রসিদ্ধ। আজ কাল কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রিতে আমরা লক্ষ্মীপূজা করিয়া অক্ষক্রীড়া করিতে করিতে জাগরণ করি, কিন্তু পুরাকালে ইহার স্থানে অন্য উৎসব প্রচলিত ছিল।

সীতাযজ্ঞ।

শরৎকালে অনুষ্ঠেয় অপর কার্য্যের নাম 'সীতাযজ্ঞ'। সীতা শব্দের অর্থ লাঙ্গল-পদ্ধতি। লাঙ্গল-পদ্ধতিতে অনুষ্ঠেয় যজ্ঞের নাম 'সীতাযজ্ঞ'। পুরাকালে ব্রীহি ও যব এই দুই শস্যই অতি প্রধানভাবে পরিগণিত হইত। ব্রীহি শরৎকালে[১] ও যব বসন্তকালে নিষ্পন্ন হয় বলিয়া সীতাযজ্ঞ বৎসরে দুইবার অনুষ্ঠান করিবার নিয়ম ছিল। ইহার অনুকরণে ক্রমশঃ আরও কতকগুলি কৃষিঘটিত উৎসবানুষ্ঠান সমাজমধ্যে প্রচলিত হইয়া পড়ে, যথা 'হলাভিযোগ' অর্থাৎ প্রথম কৃষি আরম্ভ করিবার সময় যে যজ্ঞ করা হয়; 'প্রবপন যজ্ঞ'—অর্থাৎ ক্ষেত্রে সমস্ত বীজ বপন করা হইয়া গেলে যে যজ্ঞ করা হয়; 'প্রলবন যজ্ঞ'—অর্থাৎ শস্য ছেদনের সময় অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ; 'খল যজ্ঞ'—অর্থাৎ শস্য কর্ত্তন করার পর যে স্থানে শস্য রাখা হয় (খামার), সে স্থানে অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ, ও 'পর্য্যয়ণ যজ্ঞ'—অর্থাৎ খামার হইতে সর্ব্বতোভাবে শস্য লইয়া যাইবার পর অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ।[২]

সীতাযজ্ঞ ক্ষেত্রের পূর্ব্ব বা উত্তর দিকে চাষ করা পবিত্র স্থানে অনুষ্ঠিত হইত। ক্ষেত্রের মধ্যেই এই যজ্ঞ করিতে হইত বলিয়া যজ্ঞকারিগণ লক্ষ্য রাখিতেন যে, যাহাতে শস্যের কোন অনিষ্ট না হয়। কখন কখন বা গ্রামের বহির্ভাগে লাঙ্গলচষা জমির উপরেই সেই যজ্ঞ সম্পাদন করা যাইত। যে স্থানেই সেই যজ্ঞ করা হউক না কেন, তাহাকেই লেপন ও জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া লইতে হইত। এইরূপে যজ্ঞস্থান প্রস্তুত হইলে তদুপরি ব্রীহিমিশ্রিত (বসন্তকালে যবমিশ্রিত) কুশখণ্ডসমূহ বিছাইয়া দিয়া অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক সীতা প্রভৃতির উদ্দেশে হোম করা হইত। সীতার উদ্দেশে যে যে মন্ত্রে আহুতি প্রদান করা যাইত, তাহার অনুবাদ এইরূপ:—

---

১ আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র-২-২-১।

২ „ ২-২-২—৩; ২-৩-৩ গার্গ্য বৃত্তি দ্রষ্টব্য।

৩ পারস্কর গৃহ্যসূত্র ২-১৬।

৪ ঋগ্বেদ ৪-২১-১।

১ আজকাল হেমন্ত ঋতুতেই প্রচুর পরিমাণে ধান হইয়া থাকে দেখা যায়, কিন্তু পূর্ব্বে তাহা শরৎকালেই যে প্রচুর হইত তাহা বক্ষ্যমান 'আগ্রয়ণ' বিধির দ্বারাই সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে।

২ গোভিল গৃহ্যসূত্র ৪-৪-২৭-৩০।

"যাহার সদ্ভাবে বৈদিক এবং লৌকিক কর্ম্মসমূহ সম্পন্ন হইয়া থাকে, আমি সেই ইন্দ্রপত্নী সীতাকে আহ্বান করিতেছি; তিনি আমার প্রত্যেক কার্য্যেই অন্ন প্রভৃতির বর্দ্ধনকারিণী হউন। তিনি জনগণের গো ও অশ্ব সম্পাদন করিয়া থাকেন; সত্যমধুরভাষিণী সীতা অনলসভাবে জীবগণকে পোষণ করেন। তিনি ধান্যরাশিশালিনী, উর্ব্বরা ও স্থিরা; আমি তাঁহাকে এই কার্য্যে আহ্বান করিতেছি, তিনি আমার দুঃখ বিনাশ করুন।"

হোম সমাপ্ত হইলে যজ্ঞকারী স্বয়ং ও পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণ চতুর্দ্দিকে অবস্থিত সীতারক্ষকগণকে নমস্কার করিয়া বলিপ্রদান করিতেন, এবং এইরূপে সীতাযজ্ঞের পরিসমাপ্তি হইত।১

এ পর্য্যন্ত যে কয়টি শারদ অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা হইল, তৎসমুদয়ই সূত্রকালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সূত্রের মধ্যেও কেবল গৃহ্যসূত্র সমূহেই ইহাদের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রৌতসূত্রে ইহাদের উল্লেখ নাই, এবং থাকিবার কথাও নহে। কেন না শ্রৌতসূত্রসকল হবির্যজ্ঞ ও সোমযজ্ঞ সমূহেরই বিধিব্যবস্থার জন্য প্রবৃত্ত। মন্ত্র বা ব্রাহ্মণ ভাগে ঐ সকল যজ্ঞের কোন সূচনা দেখা যায় না। সীতাযজ্ঞ প্রভৃতিতে এরূপ কতকগুলি মন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহা সংহিতার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হয় সেই সেই কর্ম্মের উৎপত্তির সহিত ঐ সকল অভিনব মন্ত্রও রচিত হইয়া থাকিবে।

আগ্রয়ণ।

বেদের সংহিতা সময়ের শারদ অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি মাত্র আমরা জানিতে পারি। ইহার নাম 'আগ্রয়ণ'। সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক সপ্তবিধ হবির্যজ্ঞের মধ্যে 'আগ্রয়ণ', অন্যতম। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, শ্রৌতসূত্রে, গৃহ্যসূত্রে, ধর্ম্মসূত্র প্রভৃতি সর্ব্বত্রই ইহার বিবরণ পাওয়া যায়।

আজকাল অগ্রহায়ণ মাসে আমরা যেমন 'নবান্ন' নামক উৎসব করিয়া নব অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকি, পুরাকালে 'আগ্রয়ণও' তাহাই ছিল। 'আগ্রয়ণ' বিধি অনুষ্ঠান করিয়া আর্য্যগণ নব শস্য ভোজন করিতেন। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের গার্গ্যনারায়ণীয় বৃত্তিতে 'আগ্রয়ণ' শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে:—"অগ্রে অয়নং ভক্ষণং যেন কর্ম্মণা তদাগ্রয়ণম্। প্রথম দ্বিতীয়য়োঃ হ্রস্বদীর্ঘত্বব্যত্যয়ঃ (২-৯-১)।" যে কর্ম্মের দ্বারা প্রথমে ভক্ষণ করা যায়, তাহার নাম 'আগ্রয়ণ'। পারস্কর গৃহ্য সূত্রকার এই আগ্রয়ণকে স্পষ্টত 'নবপ্রাশন' শব্দেই উল্লেখ করিয়াছেন (পা-গৃ-সূ-৩-১-১)। ১

ভারতে এখনও একটি নিয়ম কোন কোন স্থানে প্রচলিত দেখা যায় যে, কোন উপাদেয় শস্যাদি উৎপন্ন হইলে প্রথমে তাহা দ্বারা শ্রাদ্ধাদি না করিয়া নিষ্ঠাবান্ হিন্দু তাহা ব্যবহার করেন না। অগ্রহায়ণ মাসের নবান্ন-শ্রাদ্ধ ইহার একটি দৃষ্টান্ত। আম একটি উপাদেয় ফল। আম পাকিয়া উঠিলে এখনও পিতৃলোককে উৎসর্গ না করিয়া নিষ্ঠাবান্ হিন্দুরা গ্রহণ করেন না। ইহা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যে কোন উপাদেয় অভিনব শস্য উৎপন্ন হইলেই, দেবলোককে প্রথমে উৎসর্গ করা হিন্দুগণের স্বভাব।

'আগ্রয়ণ' সম্বন্ধেও তাহাই; নবশস্য উৎপন্ন হইয়াছে, দেবলোককে তাহা প্রদান না করিয়া ভোজন করিতে পারা যায় না, তাই তাঁহারা তৎকালের উপাদেয় যব, ব্রীহি ও শ্যামাক দ্বারা বৎসরে তিনবার আগ্রয়ণ অনুষ্ঠান করিতেন।

এখানে আর একটি কথা আছে। বৎসরের মধ্যে কেবল যব, ব্রীহি ও শ্যামাক এই তিনটি শস্যই হইত না আরও বহুবিধ শস্য জন্মিত? সংহিতাগণের মধ্যেই অনেক শস্যের নাম দেখা যায়। তবে কিজন্য আর্য্যগণ কেবল ঐ তিনটি শস্যের দ্বারা আগ্রয়ণ করিতেন? এ সম্বন্ধে তাঁহারা উত্তর করেন:—

নব শস্যের যজ্ঞে শ্যামাক, ব্রীহি ও যবই অধিকৃত হইয়া থাকে, হোম না করিয়া এই সকল ভোজন করা বিধেয় নহে; আর সমস্ত শস্যের কোন নিয়ম নাই। আগ্রয়ণ না করিলেও তিল-চণক-নীবারাদি ভোজন করিতে পারা যায়। কেন না ইহাদের হবিঃসম্পাদনোচিত গুণ আছে বলিয়া উক্ত হয় নাই। ২

১ পারস্কর গৃহ্যসূত্রে ২-১৭।

১ পারস্কর গৃহ্য সূত্রের অন্যতম ভাষ্যকার কর্কাচার্য্য বলেন যে, আগ্রয়ণ হইতে "নবপ্রাশন" ভিন্ন, এই জন্যই ইহার অমাবস্যা বা পূর্ণিমা বলিয়া কোন কালের নিয়ম নাই, সাধারণতঃ শরৎ ও বসন্ত কালে করিলেই চলে।

২ পারস্কর গৃহ্যসূত্রে ৩, ১, ১।

যাহাই কেন হউক না, সমস্ত শস্যের মধ্যে শ্যামাক, ব্রীহি, ও যব এই তিনটির দ্বারাই আর্য্যগণ 'আগ্রয়ণ' অনুষ্ঠান করিতেন। তাহার মধ্যে বর্ষাকালে শ্যামাক দ্বারা, শরৎকালে ব্রীহির দ্বারা, এবং বসন্তকালে যবের দ্বারা আগ্রয়ণ হইত।

এই আগ্রয়ণ যাগের উৎপত্তি সম্বন্ধে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে নানাবিধ আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় সংহিতায় এ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই:—পুরাকালে যাঁহারা নবোৎপন্ন ব্রীহি প্রভৃতি ওষধি দ্বারা দেবগণের যাগ না করিয়াই ঐ সমস্ত বস্তু ভোজন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই পরাভব প্রাপ্ত হন। তাহার পর হইতে দেবগণের প্রীতির ও যজমানের অপরাজয়ের জন্য এই আগ্রয়ণ নামক ইষ্টির উৎপত্তি হইল।

শতপথ ব্রাহ্মণে (১-৩-৫) ইহার উৎপত্তি দুই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে:—

প্রথমতঃ, কুষীতকপুত্র কহোন বলেন যে, ব্রীহি যব প্রভৃতি ওষধিরূপ রস এই দ্যুলোক ও পৃথিবীর দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। অতএব এই রসের দ্বারা আমরা দেবগণের হোম করিয়া তাহার পর ইহাকে ভোজন করিব—এইরূপ চিন্তা করা হেতুই লোকে আগ্রয়ণ-ইষ্টির দ্বারা যাগ করে।

দ্বিতীয়তঃ, কোন সময়ে প্রজাপতিপুত্র দেব ও অসুরগণ পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া উঠেন। তখন অসুরসমূহ মানব ও পশুগণের উপভোগ্য ওষধিসমূহে বিষ লেপন করিয়া দেবগণকে অভিভব করিবার জন্য ইচ্ছা করিলেন। মনুষ্য ও পশু সমূহ তাহা জানিতে পারিয়া ওষধি ভক্ষণ হইতে বিরত হইল, ও অনশন হেতু ক্রমশই অভিভূত হইতে লাগিল।

দেবগণ জানিতে পাইলেন যে, প্রজাসমূহ অনশন হেতু পরাভূত হইয়া পড়িতেছে। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যে, কোন্ উপায়ে এই অসুরকৃত উপদ্রবকে নিরস্ত করিতে পারা যায়; পরিশেষে স্থির হইল, যজ্ঞের দ্বারাই তাহা সম্পাদন করিতে হইবে।

কিন্তু সেই যজ্ঞ কাহার হইবে ইহা লইয়া দেবগণের মধ্যে এক গোলমাল উৎপন্ন হইল। সকলেই বলিতে লাগিলেন—"আমার হইবে! আমার হইবে!" কিন্তু কিছুই নিষ্পত্তি হইল না। অবশেষে তাঁহারা একটি লক্ষ্য স্থির করিয়া দৌড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন, এবং ঠিক হইল যে, আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইহাতে জয় লাভ করিবেন, যজ্ঞ তাঁহারই হইবে।

বাজিতে ইন্দ্র ও অগ্নির জয় লাভ হইল, যজ্ঞের অধিকারী তাঁহারাই হইলেন। এমন সময়ে বিশ্বদেবগণ তাঁহাদের অনুগমন করিয়া সেই যজ্ঞের একাংশ লাভ করেন, এবং অন্যান্য দেবতারও কিছু কিছু ব্যবস্থা হয়।

অনন্তর দেবগণ সেই যজ্ঞের দ্বারা ঐ সমস্ত ওষধির দোষ নিরস্ত করিয়া দিলে মানব ও পশু সমূহ পুনর্ব্বার ভোজন করিতে লাগিল।

যে ব্যক্তি এই (আগ্রয়ণ) যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে কোন লোকই তাহার ওষধি সমূহকে বিষের দ্বারা লিপ্ত করিতে পারে না। তাহার মনুষ্যভোজ্য ও পশুভোজ্য উভয়বিধ ওষধিই নীরোগ নিষ্পাপ হইয়া থাকে, প্রজাগণ তাহা উপভোগ করিতে পারে।

শতপথ ব্রাহ্মণের এই শেষোক্ত বিবরণটি আলোচনা করিলে বুঝা যায় পুরাকালে আগ্রয়ণ-ইষ্টির অনুষ্ঠানকারীরা মনে করিতেন যে তাহার দ্বারা উপভোজ্য শস্য সমূহের দোষ সকল নিবারিত হইয়া যায়, এবং তাহা হইলে তাহাদের ভোজনে কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ইন্দ্র ও অগ্নি যজ্ঞকে জয় করিয়াছিলেন, এবং বিশ্বদেব প্রভৃতি দেবতাগণও তাহার অংশ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য সেই আগ্রয়ণ-যজ্ঞে ঐ দেবতাগণেরই যাগ করা হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় সংহিতায় উক্ত হইয়াছে:—

"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি—যদর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসর ওষধীঃ পঞ্চত্যথ কস্মাদন্যাভ্যো দেবতাভ্য আগ্রয়ণং নিরূপ্যত ইতি।" তৈ-স-৫-৭-২-৫।

ব্রহ্মবাদিগণ পরস্পর বিচার করিয়া বলিতেছিলেন—যখন অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতু ও সংবৎসরই ওষধিসমূহকে পরিপক্ব করে, তবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতাগণকে আগ্রয়ণ-ইষ্টিতে হবিঃ প্রদান করা হয় কেন?

ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে :— ১

কেন না ঐ দেবতাগণই তাহা জয় করিয়াছেন। ২ তাঁহাদিগকে না দিয়া যদি ঋতুগণকে দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেবতাগণের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হয়। অতএব দেবতাগণকে আগ্রয়ণ প্রদান করিয়া অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতু ও সংবৎসরকে আহুতি প্রদান করিবে। তাহা হইলে অর্দ্ধমাস প্রভৃতির প্রীতি সম্পাদন করা হইবে, অথচ দেবতাগণের কলহ হইবে না।

শারদ লক্ষ্মীর আগমনে চতুর্দ্দিক্‌ ধান্যমঞ্জরীতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলে আর্য্যগণ এই আগ্রয়ণ নামক যজ্ঞের বিধান করিয়া, সর্ব্ব প্রথমে দেবগণকে নব শস্যের নৈবেদ্য প্রদান করিতেন, ও তাহার পরে স্বয়ং তাহা উপভোগ করিতেন। তাঁহাদের শারদ উৎসব এইরূপেই পরিসমাপ্ত হইত।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য,
বোলপুর।

য়ুরোপীয় রাজার অত্যাচার।

বেলজিয়মের রাজা লিয়োপোল্ড কঙ্গো "স্বাধীন" রাজ্যে রবার সংগ্রহের জন্য তদ্দেশীয় কৃষ্ণকায় মনুষ্যদিগের প্রতি যে কিরূপ অমানুষিক অত্যাচার করেন তাহাই সাধারণের গোচর করিবার জন্য আমেরিকার প্রসিদ্ধ লেখক মার্ক টোয়েন একখানি ব্যঙ্গ-পুস্তক রচনা করিয়াছেন।* এই পুস্তকে রাজার যে সকল রোমহর্ষণ অত্যাচারকাহিনী বিবৃত হইয়াছে তদপেক্ষা নৃশংসতা জগতে কোনো দেশে কোনো কালে অনুষ্ঠিত হইয়াছে কি না সন্দেহ।

কঙ্গো রাজ্যে লিয়োপোল্ডের ক্ষমতা অবাধ; সুতরাং যথেচ্ছাচারিতার ইয়ত্তা নাই। তিনি ইচ্ছা করিলেই রাজ্যে কোনো নিয়ম প্রবর্ত্তিত বা প্রত্যাহার করিতে পারেন। এমন কি তাঁহার ইচ্ছা মাত্রেই মানবের অতি সামান্য অধিকার পর্য্যন্ত অপহৃত হইতে পারে। তিনি সভ্যতালব্ধ সাম্যভাব ও দয়াধর্ম্মকে উপহাস করেন, লোকনিন্দাকে অগ্রাহ্য করেন, তিনি একগুঁয়ে অদম্য। তাঁহার কুড়ি বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে কঙ্গোরাজ্যের লোকসংখ্যা ২ কোটি ৫০ লক্ষ হইতে কমিয়া ১ কোটি ৫০ লক্ষ হইয়াছে। এই এক কোটি জীবননাশের কারণ রাজারই অমানুষিক অত্যাচার।

তিনি কৃষ্ণকায়দিগের নিকট হইতে নানা রকমে এত অধিক কর আদায় করেন যে প্রজাবৃন্দ অনাহারে মরিতে বাধ্য হয়। এই কর প্রদান করিতে তাহাদিগকে অতি কঠিন নিয়মে বাধ্য হইয়া রবার সংগ্রহ করিয়া দিতে হয়, এবং সরকারি কর্ম্মচারীদিগের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দিতে হয়। এবং ইহার ফলে এই হয় যে যখন অনাহার, পীড়া, হতাশা, এবং অবিশ্রাম অত্যধিক কঠিন শ্রম তাহাদিগকে নিরুৎসাহ ও শ্রান্ত করে, তখন তাহারা শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য গৃহ ছাড়িয়া বনে পলায়ন করে; কিন্তু তাহাতেও তাহাদের নিষ্কৃতি নাই, সৈন্যদল তাহাদিগকে তাড়া করিয়া বধ করে, গ্রামকে গ্রাম জ্বালাইয়া দেয়, যুবতীদিগকে অপহরণ করিয়া আনে। রাজার পকেটের প্রত্যেকটি টাকা এইরূপ অনাবশ্যক নৃশংস রক্তপাত ও নারী-সতীত্বনাশে অর্জ্জিত কৃষ্ণতম কলঙ্কখণ্ড। অনেকের ধারণা কঙ্গো রাজ্যে নির্দ্দোষী প্রজার যত অনাবশ্যক রক্তপাত হইয়াছে তাহা বালতি ভরিয়া সারি দিলে ২০০০ মাইল লম্বা হইতে পারে; এক কোটি হত নরনারীর কঙ্কাল যদি লিয়োপোল্ডের সম্মুখ দিয়া সারি বাঁধিয়া যাত্রা করে, তবে সে সারি শেষ হইতে সাত মাস চারি দিন সময় লাগে।

প্রচুর রবার সংগ্রহ করিতে না পারিলে হতভাগাদের হাত পা কাটিয়া শাস্তি দেওয়া হয়। একজন ধর্ম্মপ্রচারক একস্থানে একাশিটা কাটা হাত আগুনের উপর শুকাইতে দেখিয়াছিলেন; কাটা হাত আগুনে শুকাইয়া রাজ-কর্ম্মচারীদিগকে রাজ্যসুশাসনের নিদর্শন স্বরূপ ভেট দেওয়া হয়।

কখনো কখনো নরহত্যা করিয়া নরখাদক সৈন্যদল সেই হত ব্যক্তিকে খাইয়া ফেলে। নর-কপাল লইয়া এই রাক্ষসেরা তামাক মলিবার পাত্র করে।

১ তৈ-স-৫-৭-২।
২ তৈ-ব্রা-১-৬-১-১০—"দেবা বা ওষধীষাজিমযুঃ, তা ইন্দ্রাগ্নী উদজয়তাম্।"

* King Leopold's Soliloquy: a Satire by Mark Twain. With illustrations. T. Fisher Unwin. 1s. net.

যথেষ্ট রবার না আনায় ইহার পা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে।

যথেষ্ট রবার না আনার জন্য হাত কাটা আরও কয়েকজনের ছবি

এই লোকটির পাঁচ বছরের কন্যাকে বেলজিয়ম রাজের নরমাংসভোজী সান্ত্রীরা খাইয়া ফেলিয়াছে। হাতপায়ের অল্প অংশ অবশিষ্ট আছে।

যথেষ্ট রবার না আনায় ইহার হাত পা কর্ত্তিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট একটি স্ত্রীলোকের শিশুগুলিকে তাহার চোখের সামনে অনাহারে রাখিয়া হত্যাকরে এবং তাহার পুত্রদিগকে কসাইয়ের মত বধ করে।

একটি বন্দিনীকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহার আত্মীয়গণ নিষ্ক্রয় অর্থ লইয়া উপস্থিত হইয়া যখন সেই বন্দিনীর মুক্তি প্রার্থনা করিল, তখন সান্ত্রী তাহাকে মুক্তি দিতে অস্বীকার করিয়া বলিল যে বন্দিনী যুবতী—শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীর তাহাকে দরকার আছে।

একবার ষাট জন স্ত্রীলোককে ক্রুশে বিঁধিয়া হত্যা করা হয়।

এই সমস্ত ভীষণ অবিশ্বাস্য ঘটনা প্রমাণ সহ লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থকার ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন যে, ভারতের দুর্ভিক্ষ লজ্জিত হইয়া লিয়োপোল্ডের পদলুণ্ঠিত হইয়া বলিতেছে—"হে বিচিত্রকর্ম্মা প্রভু, আমি বৎসরে ২০ লক্ষ মারিয়া থাকি, কিন্তু তোমার হত্যাকাণ্ড দেখিয়া আমি বুঝিয়াছি আমি হত্যাকার্য্যে শিক্ষানবিশ মাত্র। হে গুরু, আমাকে শিক্ষা দাও, যেন আমি তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারতের ভার লঘু করিতে পারি।" তারপর স্বয়ং যম আসিয়া লিয়োপোল্ডকে আপনার কন্যাসম্প্রদান করিয়া জামাতৃপদে বরণ করিতেছে এবং ধ্বংসকার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করিবার উপায় ও পরামর্শ বলিয়া দিতেছে।

খৃষ্টান রাজ্যের এই বীভৎস অত্যাচার খৃষ্টীয়সমাজকে, সভ্যতাগর্ব্বকে ধিক্কার দিতেছে, লজ্জা দিতেছে। ইহার শতাংশ অত্যাচার এসিয়ার কোনো রাজ্যে অনুষ্ঠিত হইলে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের করুণা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত—সেই রাজ্যকে অত্যাচারের কবলমুক্ত করিবার ছলে আত্মসাৎ করিবার কত উপায়ই হইত। কিন্তু এই নৃশংস রাজার বিরুদ্ধে কেহ তদ্রূপ আচরণ করা আবশ্যক মনে করে না। ইহাই কি খৃষ্টের আদর্শ!

রাজা লিয়োপোল্ড গরু মারিয়া জুতা দান করিয়া য়ুরোপের মুখ বন্ধ করিয়াছেন। তাঁহার পাপলব্ধ অর্থে কত ধর্ম্মমন্দির, বিদ্যা ও শিল্পশালা, কত আতুর-আশ্রম ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, আর তিনি উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিতেছেন যে কঙ্গোরাজ্যের নৈতিক ও আর্থিক উন্নতির জন্যই তিনি সতত সচেষ্ট! এই মিথ্যাবাক্যে স্বার্থান্ধ য়ুরোপ চুপ করিয়া থাকিতে পারে কিন্তু জগতের মনুষ্যত্ব চিরকাল মনুষ্যত্বের প্রতি অত্যাচার কখনো সহ্য করিবে না। অত্যাচারীর পতন নিশ্চয়, আজ বা কাল!

অত্যাচরিত নরনারীর দুর্দশার করুণ নিদর্শন কয়েকটি পাঠককে চিত্রে দেখান হইল। এই সকল সন্তপ্ত নরনারীর মর্ম্মবেদনা অত্যাচারীর বলদর্পিতের চিত্তকে জ্বালাময় করিয়া তুলিবেই—ভগবানের ইহা অমোঘ বিধান!*

জাগরণ।

যশোধরা! বিশ্বভরা একি আর্ত্তনাদ?
পর্ণের কুটীর কিম্বা স্বর্ণের প্রাসাদ
বাসনা-অনল-তাপে, যাতনার ধূমে—
কৃষ্ণকান্তি, শান্তিহীন। তবু ভ্রান্তি ঘুমে
মুদিছে নয়ন নর শয়ন পাতিয়া;
ভীষণ দুঃস্বপ্নে পুনঃ শ্বসিছে কাঁদিয়া।

মথিয়া আনন্দ-গীতি, রোধিয়া শ্রবণ—
সে ভীম রোদনধ্বনি, অসীম গগন
ব্যাপিয়া কাঁপিয়া ভ্রমে অশনি সমান;
স্ফুরিছে বিদ্যুত ক্রুৎ ঝলসি বিমান।
বেদনা-জলদ-জাল—নিবিড় ধূসর,
ঢাকে আসি রবি শশী নক্ষত্র ভাস্বর।
যন্ত্রণার অন্ধকার উজলিয়া তাপে,
বজ্রনাদে আর্ত্তনাদ গরজিয়া কাঁপে।

ভ্রমিতে জীবন-পথে যৌবনের রথে—
সারথি দেখাল, সতি, চরিছে মরতে
জরা, ব্যাধি, মৃত্যু আদি গৌরবের দ্বারে।
কে দিবে মানবে শান্তি কে তারে উদ্ধারে?

---

* এতদিন কঙ্গো দেশ লিয়োপোল্ডের খাস্ সম্পত্তি ছিল। সম্প্রতি উহা বেল্‌জিয়ম্ রাজ্যের সম্পত্তি হইয়াছে। কিন্তু কঙ্গোর দাসত্বপ্রথা উচ্ছিন্ন হয় নাই; কঙ্গোবাসীদের জমী যে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল, তাহাও রদ্ হয় নাই। সুতরাং তাহাদের অবস্থার কিছু উন্নতি হইবে কিনা বলা যায় না।

মানবের আনন্দের ক্ষেত্র মধু-বনে
হেরিয়াছি মার আর মার-বধূ গণে।
নহেক সুন্দর তারা; ভূষণে বসনে
প্রচ্ছন্ন করেরে অঙ্গ শীর্ণ অনশনে।
বিবসনা বাসনার হাসি নাই মুখে,
নয়নেতে দীপ্তি নাই তৃপ্তি নাই বুকে।
অবশা লালসা তথা অনবগুণ্ঠিতা,
গলায় বাঁধিয়া ফাঁস ধূলায় লুণ্ঠিতা।
মারপূজ্যা লজ্জাহীনা হেরিলাম রতি,
অলঙ্কারহীন তনু কঙ্কালমূরতি।
বীভৎস উৎসব শব ছিঁড়ে সবে খায়,
গৃধিনী প্রেতিনী সম ক্ষুধার জ্বালায়।

মার-দত্ত-বিত্ত ত্যজি শুদ্ধ নিত্য মণি
কোথা পাব? কহ মোরে হে রমণী-মণি।
রোগ শোক জরা মৃত্যু উতরিতে চাই;
কহ কান্তে কোথা পন্থা! দেখিতে না পাই।
খুঁজিয়া কাঁদিয়া সারা হতেছে অন্তর।
নব জাত শিশু সম অসহায় নর।

* * *

ইঙ্গিতে সঙ্কেত বুঝি পেয়েছি এবার
তব প্রেমে প্রিয়তমে সেবাব্রত ভার
বহিয়ে ফিরিব প্রিয়ে সংসারের দ্বারে;
লভিব অতুল শান্তি, সংহারিব মারে।

*

শুনিতে শুনিতে কথা অমৃত-নিচিত,
বক্ষেতে শয়ন পাতি—প্রেম-বিরচিত—,
রাখি তথা দেব-তনু দেবী যশোধরা
চিন্তিল, "করুণা ধারে ধন্য হবে ধরা।"
"ধন্য আমি পুণ্যফলে পেয়েছি এ পতি,
জীবনে মরণে যিনি জগতের গতি।"

* * * *

নিশায় সেথায় দেবী যশোধরা
স্বপ্নে শুনিল বাণী:—
"কষায় বসনে সাজ তুমি ত্বরা
হবে যদি রাজরাণী!
"নির্ঘোষে দূরে ধর্ম্মচক্র,
রথেতে তোমার পতি;
"জ্বালাও আলোক, সাজাও কক্ষ;
কেন বিলম্ব সতি?
"নব উৎবাহে মিলিবে দুজনা,
পতি আসিছেন রথে;
"স্বর্গে মর্ত্তে বাজিছে বাজনা
আলোক জ্বলিছে পথে।"

কহে যশোধরা, "বিবাহ আবার?
কেননা শুনিনু আগে?
অলস অঙ্গ ঘুমে যে আমার,
পরাণ যে নাহি জাগে।
বাজনা বাজায়ে ঐ আসে বর?
প্রদীপ হয়নি জ্বালা;
সাজাব কখন ধূলাভরা ঘর?
গাঁথা হয় নাই মালা।
বিনয়-খচিত কোথা নীলাম্বরী,
কোথা ত্রিরতন হার?
শীলের সূত্রে বাঁধিনি কবরী,
লুটিছে কেশের ভার।
হৃদয়-আলয়ে আসিছেন হেসে
দুর্লভ নব সাজে;
পদধ্বনি ওই শুনি দ্বারদেশে,
সঘনে বাজনা বাজে।

* * * *

নিশীথে জাগিলা দেবী হেরিয়া স্বপন।
কোথা চক্রবর্ত্তী পতি? নিষ্প্রভ ভবন।
শয্যায় নিদ্রিত পুত্র না জানে বিষাদ,—
পতিদেবতার সেই মূর্ত্ত আশীর্ব্বাদ।
কবে গো আসিবে পতি ফিরিয়া ভবনে?
অপেক্ষিয়া জাগে সতী নব জাগরণে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সংক্ষিপ্ত পুস্তকপরিচয়।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা—(বাঙ্গালা পদ্য)—শ্রীহরিদাস ঘোষ প্রণীত। গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত, ফুলস্ক্যাপ অষ্টাংশিত ১১৮ পৃষ্ঠা, পাইকা অক্ষরে মুদ্রিত। মূল্য রাজ সংস্করণের ৷৶৹ ও সাধারণ সংস্করণের ৷৹ আনা। ইহা ঠিক গীতার অনুবাদ নহে। মধ্যে মধ্যে শ্লোকের সমিল পংক্তি পর্য্যায়ে অনুবাদ আছে, তাহার পরে তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, পাণ্ডব, কৌরব কেহই আধ্যাত্মিকতার হাত হইতে নিস্তার পান নাই। বর্ত্তমানে গীতা এক শ্রেণীর লোককে শত্রু-নাশে উত্তেজিত করিতেছে বলিয়া গ্রন্থকার এক ইংরাজি নিবেদন পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, গীতোক্ত শত্রু বহিঃশত্রু নহে, সে শত্রু অন্তরের। এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হাস্যোদ্দীপক হইলেও আমাদের দেশে নূতন নহে। সঙ্গে সঙ্গে গীতার তত্ত্ব গ্রন্থকার নিজে যেরূপ বুঝিয়াছেন তাহাও টীকায় ও গ্রন্থমধ্যে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মোটের উপর বইখানা আমাদের ভালো লাগে নাই।

মহামতি রানাড়ে—ভারতগৌরব গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত। শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত। সিটি বুক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত। ফুলস্ক্যাপ অষ্টাংশিত ১১০ পৃষ্ঠা। মূল্য ।৶৹ আনা। যে সকল মহাত্মা আধুনিক ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রভৃতি সকল বিভাগের সংস্কারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তন্মধ্যে রানাড়ে অন্যতম। তাঁহার মহৎ ও বলিষ্ঠ চরিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইহার মধ্যে আছে। পুস্তকের ভাষা কিঞ্চিৎ নীরস ও রচনা তাড়াতাড়িতে সমাপ্ত বলিয়া বোধ হইল। তথাপিও এ পুস্তক পাঠে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই উপকৃত হইবেন। এই মহাত্মার জীবনচরিত বাংলায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল।

মোহসেন চরিত—শ্রীহামেদ আলী প্রণীত। বগুড়া নিউ স্কুল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। ডবল ফুলস্ক্যাপ ষোড়শাংশিত ৬৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ৶৹ আনা। এই পুণ্যশ্লোক শিক্ষাবন্ধু, দীনবৎসল সাধু মহাত্মার জীবনচরিত পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। জীবনচরিত লিখিবার ঠিক ধারাটি এ পুস্তকে নাই; কি অবস্থা বা ঘটনার বশে এই মহৎ চরিত্র গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই মনস্তত্ত্বের অনুসরণও ইহাতে পরিস্ফুট দেখিলাম না। কিন্তু তথাপি ইহা সুখপাঠ্য হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা ও রচনাভঙ্গী সুন্দর ও মার্জ্জিত। মুসলমান লেখকগণ যে বাংলাকে আপনার ভাষা বলিয়া ক্রমশ স্বীকার করিতেছেন এবং তাঁহারা রচনায় কৃতিত্বও দেখাইতেছেন, ইহা বাস্তবিকই আনন্দদায়ক ও শুভকর। যে মানবপ্রেম মোহসেনের জীবনকে ধন্য করিয়াছিল, তাহারই সদৃষ্টান্ত আমাদের ঈর্ষাকলুষিত চিত্তকে বিরোধ হইতে মিলনের দিকে আকর্ষণ করিবে আশা করি।

শুভবিবাহ-তত্ত্ব—শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। ডবল ফুলস্ক্যাপ ষোড়শাংশিত ২৮২ পৃষ্ঠা, বাঁধাই মলাট। মূল্য ২৲ টাকা। ইহাতে সাধারণত বিবাহের উদ্দেশ্য ও বিবাহকে শুভ করিয়া তুলিবার উপায় নিয়মাবলী বর্ণিত হইয়াছে, তৎপরে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে হিন্দুবিবাহের নিয়ম ও পদ্ধতি; রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক ব্রাহ্মণের কুল ও মেল; বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির বিবাহ নিয়ম; বিবাহ সম্বন্ধে জ্যোতিষ ও নানা শাস্ত্রের মতামত, বর ও কন্যা নিরূপণের লক্ষণ বিচার; এবং হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত আচার ও অনুষ্ঠান। এই গ্রন্থে হিন্দুদিগের বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে দুষ্কর্ম্মান্বিত কুলীন অপেক্ষা সচ্চরিত্র নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ পাত্র ইহা শাস্ত্রের মত। শাস্ত্রবচন যত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে শাস্ত্রপ্রণয়ন-কালে এদেশে বালিকাবিবাহ প্রচলিত ছিল না। বাল্যবিবাহের অসংযমের বহুবিধ দোষ গ্রন্থকার বহুস্থলে বেশ করিয়া বুঝাইয়াছেন। পণ বা শুল্ক গ্রহণ যে পাপ ও গৃহীতা যে সমাজে ঘৃণ্য হওয়ার উপযুক্ত তাহাও শাস্ত্র প্রমাণে দেখানো হইয়াছে। দম্পতির স্বাস্থ্য ও গার্হস্থ্য ব্যবস্থারও একটা বেশ সুন্দর আভাস দেওয়া আছে। প্রাচীন সমাজে নারীর কিরূপ সম্মান ও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তাহাও গ্রন্থকার জোর করিয়া দেখাইয়াছেন। মোটের উপর গ্রন্থখানি অবহিত হইয়া পাঠ করিয়া শাস্ত্রের সকল অনুশাসন প্রকৃতভাবে মানিয়া চলিলে গৃহ ও সমাজ পবিত্রতর কল্যাণময় হইবে আশা করা যায়। যে সকল লোক শাস্ত্রের দোহাই দিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য উল্লঙ্ঘন করেন, তাঁহারা ইহা একবার পাঠ করিয়া দেখিলে আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। গ্রন্থকার একজন হিন্দু।

বন্দনা—শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার দ্বারা প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—প্রকাশকের নিকট ও ৭৩।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। দুই খণ্ডে মূল্য ৷৶৹ আনা। প্রথম খণ্ড কুন্তলীন প্রেসে ও দ্বিতীয় খণ্ড কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। ছাপা কাগজ বহির্দৃশ্য দৃষ্টিরঞ্জক ও সুন্দর হইয়াছে। ইহাতে বহু স্বদেশী সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে। বহু নূতন ভালো গান ইহাতে আছে। ঐ সকল গান অন্য কোনো পুস্তকে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। গ্রাম্য ভাষায় রচিত কতকগুলি স্বদেশী সঙ্গীতও ইহাতে আছে। এই বন্দনা জনসাধারণকে মায়ের বন্দনায় প্রণোদিত করিবে আশা করি।

ভুতুড়ে কাণ্ড—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ৭৩।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ২৪ পেজি ১৭৩ পৃষ্ঠা। মূল্য ।৶৹ আনা মাত্র। দেশী এণ্টিক কাগজে সুন্দর সুদৃশ্য ছাপা। মলাটের উপর ভুতুড়ে পরিকল্পনা কৌতুকপ্রদ হইয়াছে। ইহাতে সহজ অনাড়ম্বর ভাষায় সম্মোহন বিদ্যার দেশবিদেশের অভিজ্ঞতার ফল বর্ণিত হইয়াছে। লেখকের নিজ অভিজ্ঞতার তত্ত্বগুলি খুব আমোদ ও কৌতুকপ্রদ। ইহাতে আশ্চর্য্যজনক বহু

ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। পরলোক বা ভৌতিক রাজ্যের বহু বিষয় সম্মোহিত ব্যক্তির মুখে যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। লেখক নিজের কোনো মতামত না দিয়া বুদ্ধিমানের মত পাঠককে কোনো তত্ত্ব গ্রহণ বা বর্জ্জনের সম্পূর্ণ অধিকার দিয়াছেন। ইহা উপন্যাস অপেক্ষাও কৌতূহল উদ্দীপক। গ্রন্থের আকার ও সৌষ্ঠব অনুপাতে মূল্য সুলভ হইয়াছে। মুদ্রারাক্ষস।

চিত্রপরিচয়।

এ মাসের প্রবাসীর গোড়ায় যে ছবি দেওয়া হইয়াছে, তাহা জগদ্বিখ্যাত ইতালীয় চিত্রকর লেনার্দো দা ভিন্সি কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি হইতে গৃহীত। ছবির মুখে যে ভাব ব্যঞ্জিত হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর।

উড়িষ্যার চারিখানি চিত্রের মধ্যে পাঠশালার চিত্রটি আমাদের বাল্যের গ্রাম্য বঙ্গীয় পাঠশালার কথা মনে পড়াইয়া দিবে।

বৈতাল দেউলের বিশেষত্ব, ইহার আকৃতি এবং খোদিত অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য। উড়িষ্যার অন্যান্য মন্দিরের সহিত ইহার চূড়ার পার্থক্য আছে; ইহা চতুরস্র। ইহা সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে নির্ম্মিত।

যাজপুরের সভাস্তম্ভ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়। ইহা মাটি হইতে শীর্ষ ভাগ পর্য্যন্ত ৩৬ ফুট ১০ ইঞ্চি লম্বা। ফার্গুসন বলেন:—"Its proportions are beautiful and its details in excellent taste."

৬১, ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
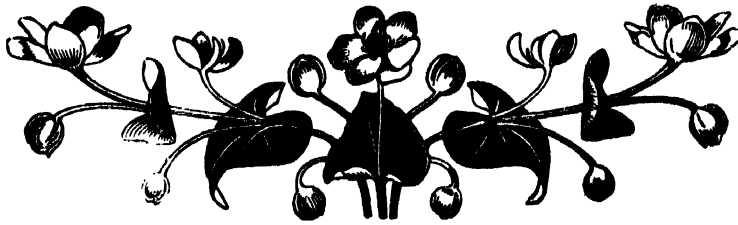
যাজপুরের সপ্তমাতৃকা-মন্দির।

উড়িষ্যার গ্রাম্য পাঠশালার ছাত্রবৃন্দ।

ভোজরাজা ও পুত্তলিকা।
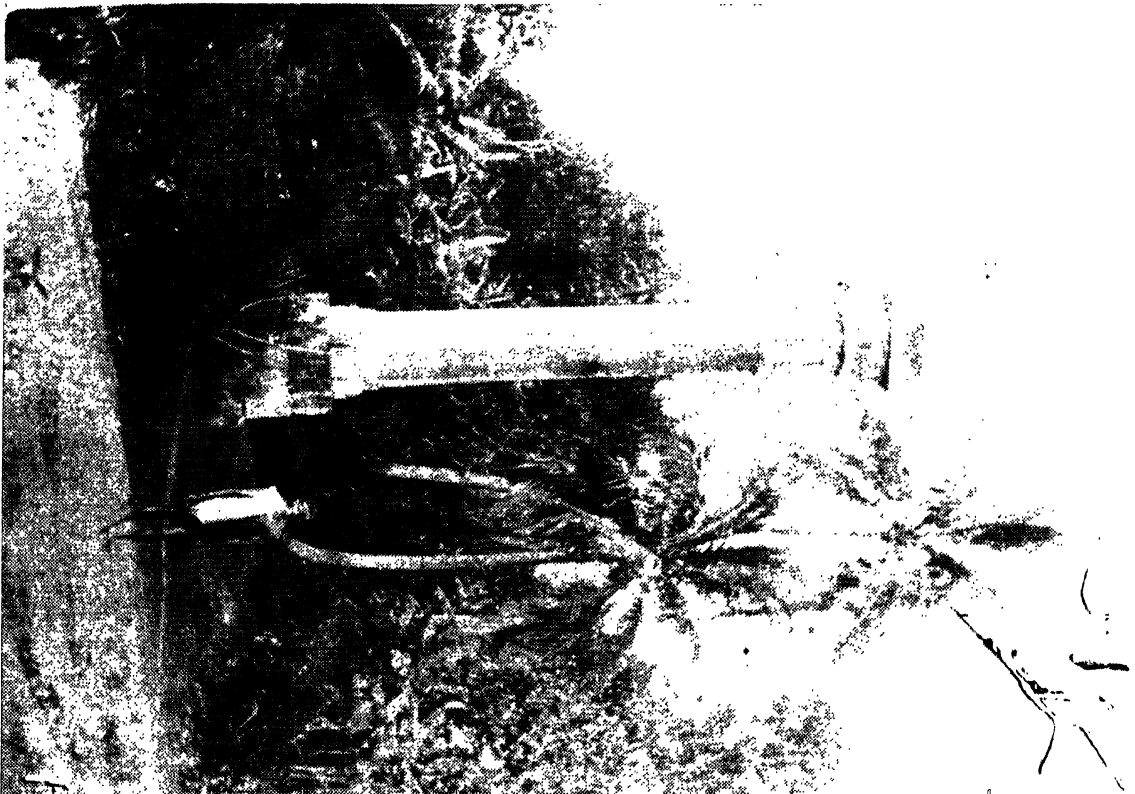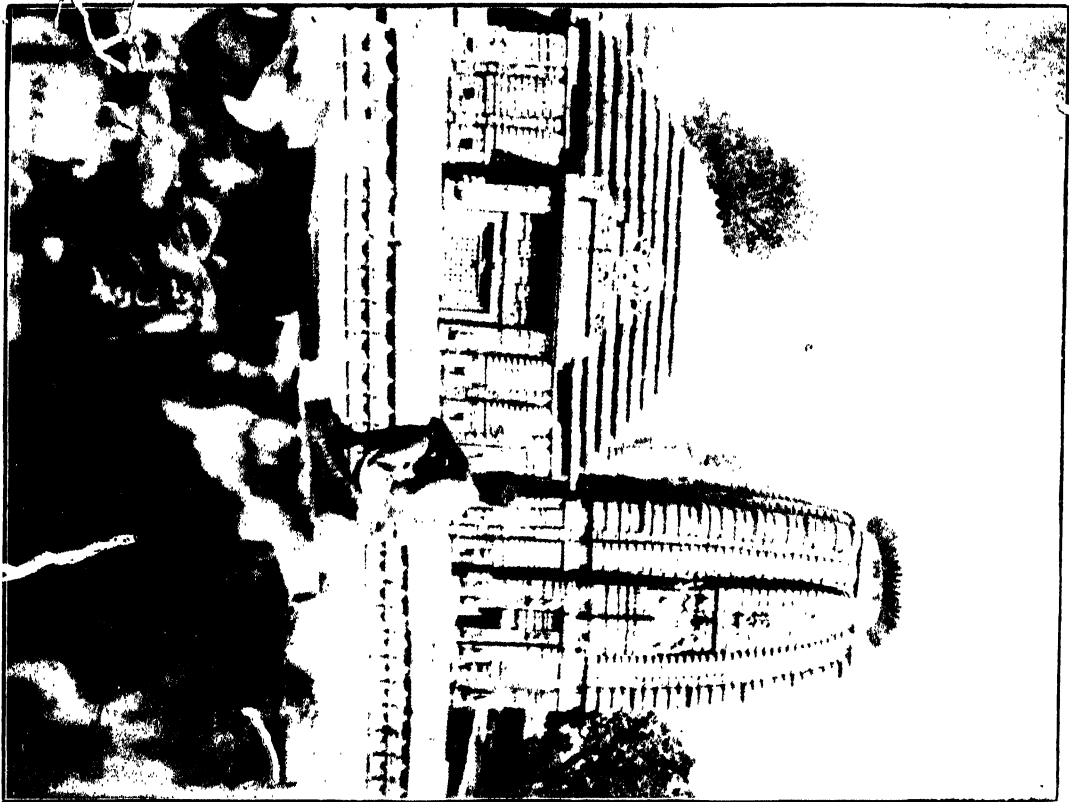
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

৮ম ভাগ। | অগ্রহায়ণ, ১৩১৫। | ৮ম সংখ্যা।

গোরা।

৩৭

শশিমুখীর সঙ্গে বিনয়ের বিবাহ যেন একপ্রকার স্থির হইয়া গেছে এইভাবে মহিম এবং তাঁহার ঘরের লোকেরা চলিতেছিলেন। শশিমুখী ত বিনয়ের কাছেও আসিত না। শশিমুখীর মার সঙ্গে বিনয়ের পরিচয় ছিল না বলিলেই হয়। তিনি যে ঠিক লাজুক ছিলেন তাহা নহে কিন্তু অস্বাভাবিক রকমের গোপনচারিণী ছিলেন। তাঁহার ঘরের দরজা প্রায়ই বন্ধ। স্বামী ছাড়া তাঁহার আর সমস্তই তালাচাবির মধ্যে। স্বামীও যে যথেষ্ট খোলা পাইতেন তাহা নহে—স্ত্রীর শাসনে তাঁহার গতিবিধি অত্যন্ত সুনির্দ্দিষ্ট এবং তাঁহার সঞ্চরণক্ষেত্রের পরিধি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ছিল। এইরূপ ঘের দিয়া লওয়ার স্বভাব বশত শশিমুখীর মা লক্ষ্মীমণির জগৎটি সম্পূর্ণ তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল—সেখানে বাহিরের লোকের ভিতরে এবং ভিতরের লোকের বাহিরে যাওয়ার পথ অবারিত ছিল না। এমন কি, গোরাও লক্ষ্মীমণির মহলে তেমন করিয়া আমল পাইত না। এই রাজ্যের বিধিব্যবস্থার মধ্যে কোনো দ্বৈধ ছিল না। কারণ, এখানকার বিধানকর্ত্তাও লক্ষ্মীমণি এবং নিম্ন আদালত হইতে আপিল আদালত পর্য্যন্ত সমস্তই লক্ষ্মীমণি—একজিক্যুটিভ এবং জুডিশিয়ালে ত ভেদ ছিলই না, লেজিস্লেটিভ্ও তাহার সহিত জোড়া ছিল। বাহিরের লোকের সঙ্গে ব্যবহারে মহিমকে খুব শক্ত লোক বলিয়াই মনে হইত কিন্তু লক্ষ্মীমণির এলাকার মধ্যে তাঁহার নিজের ইচ্ছা খাটাইবার কোনো পথ ছিল না। সামান্য বিষয়েও না।

লক্ষ্মীমণি বিনয়কে আড়াল হইতে দেখিয়াছিলেন, পছন্দও করিয়াছিলেন। মহিম বিনয়ের বাল্যকাল হইতে গোরার বন্ধুরূপে তাহাকে এমন নিয়ত দেখিয়া আসিয়াছে যে অতিপরিচয়বশতই তিনি বিনয়কে নিজের কন্যার পাত্র বলিয়া দেখিতেই পান নাই। লক্ষ্মীমণি যখন বিনয়ের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন তখন সহধর্ম্মিণীর বুদ্ধির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। লক্ষ্মীমণি পাকা করিয়াই স্থির করিয়া দিলেন যে বিনয়ের সঙ্গেই তাঁহার কন্যার বিবাহ হইবে; এই প্রস্তাবের একটা মস্ত সুবিধার কথা তিনি তাঁহার স্বামীর মনে মুদ্রিত করিয়া দিলেন যে, বিনয় তাঁহাদের কাছ হইতে কোনো পণ দাবী করিতে পারিবেন না।

বিনয়কে বাড়িতে পাইয়াও দুই একদিন মহিম তাহাকে

বিবাহের কথা বলিতে পারেন নাই। গোরার কারাবাস-সম্বন্ধে তাহার মন বিষণ্ণ ছিল বলিয়া তিনি নিরস্ত ছিলেন।

আজ রবিবার ছিল। গৃহিণী মহিমের সাপ্তাহিক দিবানিদ্রাটি সম্পূর্ণ হইতে দিলেন না। বিনয় নূতন প্রকাশিত বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন লইয়া আনন্দময়ীকে শুনাইতেছিল—পানের ডিবা হাতে লইয়া সেইখানে আসিয়া মহিম তক্তপোষের উপরে ধীরে ধীরে বসিলেন।

প্রথমত বিনয়কে একটা পান দিয়া গোরার উচ্ছৃঙ্খল নির্ব্বুদ্ধিতা লইয়া বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। তাহার পরে তাহার খালাস হইতে আর কয়দিন বাকি তাহা আলোচনা করিতে গিয়া অত্যন্ত অকস্মাৎ মনে পড়িয়া গেল যে, অগ্রান মাসের প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া আসিয়াছে।

কহিলেন "বিনয়, তুমি যে বলেছিলে, অগ্রান মাসে তোমাদের বংশে বিবাহ নিষেধ আছে সেটা কোনো কাজের কথা নয়। একেত পাঁজি পুঁথিতে নিষেধ ছাড়া কথাই নেই তার উপরে যদি ঘরের শাস্ত্র বানাতে থাক তাহলে বংশ রক্ষা হবে কি করে?"

বিনয়ের সঙ্কট দেখিয়া আনন্দময়ী কহিলেন "শশিমুখীকে এতটুকু বেলা থেকে বিনয় দেখে আস্‌চে—ওকে বিয়ে করার কথা ওর মনে লাগ্‌চে না; সেই জন্যেই অগ্রান মাসের ছুতো করে বসে আছে।"

মহিম কহিলেন—"সে কথা ত গোড়ায় বল্লেই হত।"

আনন্দময়ী কহিলেন "নিজের মন বুঝ্‌তেও যে সময় লাগে। পাত্রের অভাব কি আছে মহিম! গোরা ফিরে আসুক—সে ত অনেক ভাল ছেলেকে জানে—সে একটা ঠিক করে দিতে পারবে।"

মহিম মুখ অন্ধকার করিয়া কহিলেন—"হুঁ!" খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পরে কহিলেন—"মা, তুমি যদি বিনয়ের মন ভাঙ্গিয়ে না দিতে তাহলে ও একাজে আপত্তি করত না।"

বিনয় ব্যস্ত হইয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল, আনন্দময়ী বাধা দিয়া কহিলেন—"তা সত্য কথা বল্‌চি মহিম, আমি ওকে উৎসাহ দিতে পারি নি। বিনয় ছেলেমানুষ, ও হয়ত না বুঝে একটা কাজ করে বস্‌তেও পারত, কিন্তু শেষকালে ভাল হত না।"

আনন্দময়ী বিনয়কে আড়ালে রাখিয়া নিজের পরেই মহিমের রাগের ধাক্কাটা গ্রহণ করিলেন। বিনয় তাহা বুঝিতে পারিয়া নিজের দুর্ব্বলতায় লজ্জিত হইয়া উঠিল। সে নিজের অসম্মতি স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলে মহিম আর অপেক্ষা না করিয়া মনে মনে এই বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেল যে, বিমাতা কখনো আপন হয় না।

মহিম যে একথা মনে করিতে পারেন এবং বিমাতা বলিয়া তিনি যে সংসারের বিচারক্ষেত্রে বরাবর আসামী শ্রেণীতেই ভুক্ত আছেন আনন্দময়ী তাহা জানিতেন। কিন্তু লোকে কি মনে করিবে একথা ভাবিয়া চলা তাঁহার অভ্যাসই ছিল না। যেদিন তিনি গোরাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছেন সেইদিন হইতেই লোকের আচার লোকের বিচার হইতে তাঁহার প্রকৃতি একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া গেছে। সেদিন হইতে তিনি এমন সকল আচরণ করিয়া আসিয়াছেন যাহাতে লোকে তাঁহার নিন্দাই করে। তাঁহার জীবনের মর্ম্মস্থানে যে একটি সত্যগোপন তাঁহাকে সর্ব্বদা পীড়া দিতেছে, লোকনিন্দায় তাঁহাকে সেই পীড়া হইতে কতকটা পরিমাণে মুক্তিদান করে। লোকে যখন তাঁহাকে খৃষ্টান বলিত তিনি গোরাকে কোলে চাপিয়া ধরিয়া বলিতেন—ভগবান জানেন খৃষ্টান বলিলে আমার নিন্দা হয় না।—এমনি করিয়া ক্রমে সকল বিষয়েই লোকের কথা হইতে নিজের ব্যবহারকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছিল। এই জন্য মহিম তাঁহাকে মনে মনে বা প্রকাশ্যে বিমাতা বলিয়া লাঞ্ছিত করিলেও তিনি নিজের পথ হইতে বিচলিত হইতেন না।

আনন্দময়ী কহিলেন, "বিনু, তুমি পরেশ বাবুদের বাড়ি অনেক দিন যাও নি।"

বিনয় কহিল, "অনেক দিন আর কই হল?"

আনন্দময়ী। ষ্টীমার থেকে আসার পরদিন থেকে ত একবারও যাও নি।

সেও ত বেশিদিন নহে। কিন্তু বিনয় জানিত মাঝে পরেশ বাবুর বাড়ী তাহার যাতায়াত এত বাড়িয়াছিল যে আনন্দময়ীর পক্ষেও তাহার দর্শন দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছিল। সে হিসাবে পরেশ বাবুর বাড়ি অনেক দিন যাওয়া

হয় নাই ওর লোকের তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় হইয়াছে বটে!

বিনয় নিজের ধুতির প্রান্ত হইতে একটা সুতা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে চুপ করিয়া রহিল।

এমন সময় বেহারা আসিয়া খবর দিল, "মাজি, কাঁহাসে মায়ীলোক আয়া।"

বিনয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। কে আসিল, কোথা হইতে আসিল, খবর লইতে লইতেই সুচরিতা ও ললিতা ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। বিনয়ের ঘর ছাড়িয়া বাহিরে যাওয়া ঘটিল না; সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দুজনে আনন্দময়ীর পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। ললিতা বিনয়কে বিশেষ লক্ষ্য করিল না; সুচরিতা তাহাকে নমস্কার করিয়া কহিল, "ভাল আছেন?" আনন্দময়ীর দিকে চাহিয়া কহিল—"আমরা পরেশ বাবুর বাড়ি থেকে আসচি।"

আনন্দময়ী তাহাদিগকে আদর করিয়া বসাইয়া কহিলেন, "আমাকে সে পরিচয় দিতে হবে না। তোমাদের দেখি নি, মা, কিন্তু তোমাদের আপনার ঘরের বলেই জানি।"

দেখিতে দেখিতে কথা জমিয়া উঠিল। বিনয় চুপ করিয়া বসিয়া আছে দেখিয়া সুচরিতা তাহাকে আলাপের মধ্যে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল;—মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি অনেক দিন আমাদের ওখানে যান নি যে।"

বিনয় ললিতার দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া লইয়া কহিল,—"ঘন ঘন বিরক্ত করলে পাছে আপনাদের স্নেহ হারাই মনে এই ভয় হয়।"

সুচরিতা একটু হাসিয়া কহিল—"স্নেহও যে ঘন ঘন বিরক্তির অপেক্ষা রাখে সে আপনি জানেন না বুঝি?"

আনন্দময়ী কহিলেন, "তা ও খুব জানে মা! কি বল্‌ব তোমাদের—সমস্ত দিন ওর ফরমাসে আর আব্দারে আমার যদি একটু অবসর থাকে!" এই বলিয়া স্নিগ্ধদৃষ্টি দ্বারা বিনয়কে নিরীক্ষণ করিলেন।

বিনয় কহিল, "ঈশ্বর তোমাকে ধৈর্য্য দিয়েছেন, আমাকে দিয়ে তারই পরীক্ষা করিয়ে নিচ্চেন।"

সুচরিতা ললিতাকে একটু ঠেলা দিয়া কহিল, "শুনচিস্ ভাই ললিতা, আমাদের পরীক্ষাটা বুঝি শেষ হয়ে গেল! পাস করতে পারি নি বুঝি?"

ললিতা এ কথায় কিছুমাত্র যোগ দিল না দেখিয়া আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন,—"এবার আমাদের বিনু নিজের ধৈর্য্যের পরীক্ষা করচেন। তোমাদের ওযে কি চক্ষে দেখেচে সে ত তোমরা জান না। সন্ধেবেলায় তোমাদের কথা ছাড়া কথা নেই। আর পরেশ বাবুর কথা উঠ্‌লে ও ত একেবারে গলে যায়।"

আনন্দময়ী ললিতার মুখের দিকে চাহিলেন, সে খুব জোর করিয়া চোখ তুলিয়া রাখিল বটে, কিন্তু বৃথা লাল হইয়া উঠিল।

আনন্দময়ী কহিলেন, "তোমার বাবার জন্যে ও কত লোকের সঙ্গে ঝগড়া করেচে! ওর দলের লোকেরা ত ওকে ব্রাহ্ম বলে জাতে ঠেলবার জো করেচে। বিনু, অমন অস্থির হয়ে উঠ্‌লে চল্‌বে না বাছা—সত্যি কথাই বলচি। এতে লজ্জা করবারও ত কোনো কারণ দেখিনে। কি বল মা!"

এবার ললিতার মুখের দিকে চাহিতেই তাহার চোখ নামিয়া পড়িল। সুচরিতা কহিল, "বিনয় বাবু যে আমাদের আপনার লোক বলে জানেন সে আমরা খুব জানি—কিন্তু সে যে কেবল আমাদেরই গুণে তা নয়, সে ওঁর নিজের ক্ষমতা।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "তা ঠিক বল্‌তে পারিনে মা। ওকে ত এতটুকুবেলা থেকে দেখ্‌চি, এত দিন ওর বন্ধুর মধ্যে এক আমার গোরাই ছিল; এমন কি, আমি দেখেছি ওদের নিজের দলের লোকের সঙ্গেও বিনয় মিল্‌তে পারে না। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে ওর দু'দিনের আলাপে এমন হয়েছে যে আমরাও ওর আর নাগাল পাইনে। ভেবেছিলুম এই নিয়ে তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করব কিন্তু এখন দেখ্‌তে পাচ্চি আমাকেও ওরই দলে ভিড়তে হবে। তোমরা সকলকেই হার মানাবে।"

এই বলিয়া আনন্দময়ী একবার ললিতার ও একবার সুচরিতার চিবুক স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা চুম্বন গ্রহণ করিলেন।

সুচরিতা বিনয়ের দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া সদয়চিত্তে

কহিল, "বিনয় বাবু, বাবা এসেচেন; তিনি বাইরে কৃষ্ণদয়াল বাবুর সঙ্গে কথা কচ্চেন।"

শুনিয়া বিনয় তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল। তখন গোরা ও বিনয়ের অসামান্য বন্ধুত্ব লইয়া আনন্দময়ী আলোচনা করিতে লাগিলেন। শ্রোতা দুই জনে যে উদাসীন নহে তাহা বুঝিতে তাঁহার বাকি ছিল না। আনন্দময়ী জীবনে এই দুটি ছেলেকেই তাঁহার মাতৃস্নেহের পরিপূর্ণ অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছেন, সংসারে ইহাদের চেয়ে বড় তাঁহার আর কেহ ছিল না। বালিকার পূজার শিবের মত ইহাদিগকে তিনি নিজের হাতেই গড়িয়াছেন বটে কিন্তু ইহারাই তাঁহার সমস্ত আরাধনা গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার মুখে তাঁহার এই দুটি ক্রোড়দেবতার কাহিনী স্নেহরসে এমন মধুর এমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল যে সুচরিতা এবং ললিতা অতৃপ্তহৃদয়ে শুনিতে লাগিল। গোরা এবং বিনয়ের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধার অভাব ছিল না কিন্তু আনন্দময়ীর মত এমন মায়ের এমন স্নেহের ভিতর দিয়া তাহাদের সঙ্গে যেন আর একটু বিশেষ করিয়া নূতন করিয়া পরিচয় হইল।

আনন্দময়ীর সঙ্গে আজ জানাশুনা হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি ললিতার রাগ আরও যেন বাড়িয়া উঠিল। ললিতার মুখে উষ্ণবাক্য শুনিয়া আনন্দময়ী হাসিলেন। কহিলেন, "মা, গোরা আজ জেলখানায় এ দুঃখ যে আমাকে কি রকম বেজেছে তা অন্তর্যামীই জানেন। কিন্তু সাহেবের উপর আমি রাগ করতে পারিনি। আমি ত গোরাকে জানি, সে যেটাকে ভাল বোঝে তার কাছে আইন কানুন কিছুই মানে না; যদি না মানে তবে যারা বিচারকর্ত্তা তারা ত জেলে পাঠাবেই—তাতে তাদের দোষ দিতে যাব কেন? গোরার কাজ গোরা করেচে—ওদেরও কর্ত্তব্য ওরা করেছে—এতে যাদের দুঃখ পাবার তারা দুঃখ পাবেই। আমার গোরার চিঠি যদি পড়ে দেখ, মা, তা'হলে বুঝতে পারবে ও দুঃখকে ভয় করে নি, কারো উপর মিথ্যে রাগও করে নি—যাতে যা ফল হয় তা সমস্ত নিশ্চয় জেনেই কাজ করেছে।" এই বলিয়া গোরার সযত্নরক্ষিত চিঠিখানি বাক্স হইতে বাহির করিয়া সুচরিতার হাতে দিলেন। কহিলেন, "মা, তুমি চেঁচিয়ে পড় আমি আর একবার শুনি।"

গোরার সেই আশ্চর্য্য চিঠিখানি পড়া হইয়া গেলে পর তিন জনেই কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আনন্দময়ী তাঁহার চোখের প্রান্ত আঁচল দিয়া মুছিলেন। সে যে চোখের জল তাহাতে শুধু মাতৃহৃদয়ের ব্যথা নহে, তাহার সঙ্গে আনন্দ এবং গৌরব মিশিয়াছিল। তাঁহার গোরা কি যে-সে গোরা! ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার কসুর মাপ করিয়া তাহাকে দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিবেন সে কি তেমনি গোরা! সে যে অপরাধ সমস্ত স্বীকার করিয়া জেলের দুঃখ ইচ্ছা করিয়া নিজের কাঁধে তুলিয়া লইয়াছে! তাহার সে দুঃখের জন্য কাহারো সহিত কোনো কলহ করিবার নাই। গোরা তাহা অকাতরে বহন করিতেছে এবং আনন্দময়ীও ইহা সহ্য করিতে পারিবেন।

ললিতা আশ্চর্য্য হইয়া আনন্দময়ীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ব্রাহ্মপরিবারের সংস্কার ললিতার মনে খুব দৃঢ় ছিল; যে মেয়েরা আধুনিক প্রথায় শিক্ষা পায় নাই এবং যাহাদিগকে সে "হিঁদুবাড়ির মেয়ে" বলিয়া জানিত তাহাদের প্রতি ললিতার শ্রদ্ধা ছিল না। শিশুকালে বরদাসুন্দরী তাহাদের যে অপরাধের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, "হিঁদুবাড়ির মেয়েরাও এমন কাজ করে না" সে অপরাধের জন্য ললিতা বরাবর একটু বিশেষ করিয়াই মাথা হেঁট করিয়াছে। আজ আনন্দময়ীর মুখের কয়টি কথা শুনিয়া তাহার অন্তঃকরণ বার বার করিয়া বিস্ময় অনুভব করিতেছে। যেমন বল, তেমনি শান্তি, তেমনি আশ্চর্য্য সদ্বিবেচনা! অসংযত হৃদয়াবেগের জন্য ললিতা নিজেকে এই রমণীর কাছে খুবই খর্ব্ব করিয়া অনুভব করিল। তাহার মনের ভিতরে আজ ভারি একটা ক্ষুব্ধতা ছিল, সেই জন্য সে বিনয়ের মুখের দিকে চায় নাই, তাহার সঙ্গে কথাও কয় নাই। কিন্তু আনন্দময়ীর স্নেহে করুণায় ও শান্তিতে মণ্ডিত মুখখানির দিকে চাহিয়া তাহার বুকের ভিতরকার সমস্ত বিদ্রোহের তাপ যেন জুড়াইয়া গেল—চারিদিকের সকলের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ সহজ হইয়া আসিল। ললিতা আনন্দময়ীকে কহিল, "গৌর বাবু যে এত শক্তি কোথা থেকে পেয়েচেন তা আপনাকে দেখে আজ বুঝতে পারলুম।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "ঠিক বোঝ নি। গোরা যদি

আমার সাধারণ ছেলের মত হত তা'হলে আমি কোথা থেকে বল পেতুম! তা'হলে কি তার দুঃখ আমি এমন করে সহ্য করতে পারতুম!"

ললিতার মনটা আজ কেন যে এতটা বিকল হইয়া উঠিয়াছিল তাহার একটু ইতিহাস বলা আবশ্যক।

এ কয়দিন প্রত্যহ সকালে বিছানা হইতে উঠিয়াই প্রথম কথা ললিতার মনে এই জাগিয়াছে যে, আজ বিনয় বাবু আসিবেন না। অথচ সমস্ত দিনই তাহার মন একমুহূর্ত্তের জন্যও বিনয়ের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে ছাড়ে নাই। ক্ষণে ক্ষণে কেবলি সে মনে করিয়াছে বিনয় হয়ত আসিয়াছে; হয়ত সে উপরে না আসিয়া নীচের ঘরে পরেশবাবুর সঙ্গে কথা কহিতেছে। এই জন্য দিনের মধ্যে কতবার সে অকারণে এঘরে ওঘরে ঘুরিয়াছে তাহার ঠিক নাই। অবশেষে দিন যখন অবসান হয়, রাত্রে যখন সে বিছানায় শুইতে যায় তখন সে নিজের মনখানা লইয়া কি যে করিবে ভাবিয়া পায় না। বুক ফাটিয়া কান্না আসে;—সঙ্গে সঙ্গে রাগ হইতে থাকে; কাহার উপরে রাগ বুঝিয়া উঠাই শক্ত। রাগ বুঝি নিজের উপরেই! কেবলি মনে হয়, একি হইল! আমি বাঁচিব কি করিয়া! কোনো দিকে তাকাইয়া যে কোনো রাস্তা দেখিতে পাই না! এমন করিয়া কতদিন চলিবে!

ললিতা জানে, বিনয় হিন্দু; কোনোমতেই বিনয়ের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতে পারে না। অথচ নিজের হৃদয়কে কোনোমতেই বশ মানাইতে না পারিয়া লজ্জায় ভয়ে তাহার প্রাণ শুকাইয়া গেছে। বিনয়ের হৃদয় যে তাহার প্রতি বিমুখ নহে একথা সে বুঝিয়াছে; বুঝিয়াছে বলিয়াই নিজেকে সম্বরণ করা তাহার পক্ষে আজ এত কঠিন হইয়াছে। সেই জন্যই সে যখন উতলা হইয়া বিনয়ের আশাপথ চাহিয়া থাকে সেই সঙ্গেই তাহার মনের ভিতরে একটা ভয় হইতে থাকে পাছে বিনয় আসিয়া পড়ে। এমনি করিয়া নিজের সঙ্গে টানাটানি করিতে করিতে আজ সকালে তাহার ধৈর্য্য আর বাঁধ মানিল না। তাহার মনে হইল বিনয় না আসাতেই তাহার প্রাণের ভিতরটা কেবলি অশান্ত হইয়া উঠিতেছে; একবার দেখা হইলেই এই অস্থিরতা দূর হইয়া যাইবে।

সকালবেলা সে সতীশকে নিজের ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিল। সতীশ আজকাল মাসিকে পাইয়া বিনয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বচর্চ্চার কথা একরকম ভুলিয়াই ছিল। ললিতা তাহাকে কহিল—"বিনয় বাবুর সঙ্গে তোর বুঝি ঝগড়া হয়ে গেছে!"

সে এই অপবাদ সতেজে অস্বীকার করিল। ললিতা কহিল—"ভারিত তোর বন্ধু! তুইই কেবল বিনয় বাবু বিনয় বাবু করিস্ তিনি ত ফিরেও তাকান্ না!"

সতীশ কহিল, "ইস্! তাইত! কখ্‌খনো না।"

পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্রতম সতীশকে নিজের গৌরব সপ্রমাণ করিবার জন্য এমনি করিয়া বারম্বার গলার জোর প্রয়োগ করিতে হয়। আজ প্রমাণকে তাহার চেয়েও দৃঢ়তর করিবার জন্য সে তখনি বিনয়ের বাসায় ছুটিয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া কহিল "তিনি যে বাড়িতে নেই, তাই জন্যে আস্‌তে পারেন নি!"

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল—"এ ক'দিন আসেন নি কেন?"

সতীশ কহিল, "ক'দিনই যে ছিলেন না।"

তখন ললিতা সুচরিতার কাছে গিয়া কহিল, "দিদি ভাই, গৌর বাবুর মায়ের কাছে আমাদের কিন্তু একবার যাওয়া উচিত।"

সুচরিতা কহিল "তাঁদের সঙ্গে যে পরিচয় নেই।"

ললিতা কহিল—"বাঃ, গৌর বাবুর বাপ যে বাবার ছেলেবেলাকার বন্ধু ছিলেন।"

সুচরিতার মনে পড়িয়া গেল—কহিল, "হাঁ তা বটে!"

সুচরিতাও অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল। কহিল—"ললিতা ভাই, তুমি যাও, বাবার কাছে বল গে!"

ললিতা কহিল, "না, আমি বল্‌তে পারব না, তুমি বলগে!"

শেষকালে সুচরিতাই পরেশ বাবুর কাছে গিয়া কথাটা পাড়িতেই তিনি বলিলেন, "ঠিক বটে, এতদিন আমাদের যাওয়া উচিত ছিল"

আহারের পর যাওয়ার কথাটা যখনি স্থির হইয়া গেল তখনি ললিতার মন বাঁকিয়া উঠিল। তখন আবার কোথা হইতে অভিমান এবং সংশয় আসিয়া তাহাকে উল্টাদিকে

টানিতে লাগিল। সুচরিতাকে গিয়া সে কহিল—"দিদি, তুমি বাবার সঙ্গে যাও। আমি যাব না।"

সুচরিতা কহিল, "সে কি হয়! তুই না গেলে আমি একলা যেতে পারব না। লক্ষী আমার, ভাই আমার—চল্ ভাই, গোল করিস্ নে!"

অনেক অনুনয়ে ললিতা গেল। কিন্তু বিনয়ের কাছে সে যে পরাস্ত হইয়াছে; বিনয় অনায়াসেই তাহাদের বাড়ি না আসিয়া পারিল, আর, সে আজ বিনয়কে দেখিতে ছুটিয়াছে এই পরাভবের অপমানে তাহার বিষম একটা রাগ হইতে লাগিল। বিনয়কে এখানে দেখিতে পাইবার আশাতেই আনন্দময়ীর বাড়ি আসিবার জন্য যে তাহার এতটা আগ্রহ জন্মিয়াছিল, এই কথাটা সে মনে মনে একেবারে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং নিজের সেই জিদ বজায় রাখিবার জন্য, না বিনয়ের দিকে তাকাইল, না তাহার নমস্কার ফিরাইয়া দিল, না তাহার সঙ্গে একটা কথা কহিল। বিনয় মনে করিল, ললিতার কাছে তাহার মনের গোপন কথাটা ধরা পড়িয়াছে বলিয়াই সে অবজ্ঞার দ্বারা তাহাকে এমন করিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছে। ললিতা যে তাহাকে ভালবাসিতেও পারে একথা অনুমান করিবার উপযুক্ত আত্মাভিমান বিনয়ের ছিল না।

বিনয় আসিয়া সঙ্কোচে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কহিল, "পরেশ বাবু এখন বাড়ি যেতে চাচ্চেন, এঁদের সকলকে খবর দিতে বল্লেন।" ললিতা যাহাতে তাহাকে না দেখিতে পায় এমন করিয়াই বিনয় দাঁড়াইয়াছিল।

আনন্দময়ী কহিলেন "সে কি হয়! কিছু মিষ্টিমুখ না করে বুঝি যেতে পাবেন! আর বেশি দেরি হবে না। তুমি এখানে একটু বোস বিনয়, আমি একবার দেখে আসি। বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ঘরের মধ্যে এসে বোস।"

বিনয় ললিতার দিকে আড় করিয়া কোনোমতে দূরে এক জায়গায় বসিল। যেন বিনয়ের প্রতি তাহার ব্যবহারের কোনো বৈলক্ষণ্য হয় নাই এমনি সহজভাবে ললিতা কহিল "বিনয় বাবু, আপনার বন্ধু সতীশকে আপনি একেবারে ত্যাগ করেচেন কি না জান্‌বার জন্যে সে আজ সকালে আপনার বাড়ি গিয়েছিল যে!"

হঠাৎ দৈববাণী হইলে মানুষ যেমন আশ্চর্য্য হইয়া যায় সেইরূপ বিস্ময়ে বিনয় চমকিয়া উঠিল। তাহার সেই চমকটা দেখা গেল বলিয়া সে অত্যন্ত লজ্জিত হইল। তাহার স্বভাবসিদ্ধ নৈপুণ্যের সঙ্গে কোনো জবাব করিতে পারিল না; মুখ ও কর্ণমূল লাল করিয়া কহিল—"সতীশ গিয়েছিল না কি! আমিত বাড়িতে ছিলুম না।"

ললিতার এই সামান্য একটা কথায় বিনয়ের মনে একটা অপরিমিত আনন্দ জন্মিল। একমুহূর্ত্তে বিশ্বজগতের উপর হইতে একটা প্রকাণ্ড সংশয় যেন নিশ্বাসরোধকর দুঃস্বপ্নের মত দূর হইয়া গেল। যেন এইটুকু ছাড়া পৃথিবীতে তাহার কাছে প্রার্থনীয় আর কিছু ছিল না। তাহার মন বলিতে লাগিল, "বাঁচিলাম," "বাঁচিলাম!" ললিতা রাগ করে নাই, ললিতা তাহার প্রতি কোনো সন্দেহ করিতেছে না।

দেখিতে সমস্ত বাধা কাটিয়া গেল। সুচরিতা হাসিয়া কহিল—"বিনয় বাবু হঠাৎ আমাদের নখী দন্তী শৃঙ্গী অস্ত্রপাণি কিম্বা ঐরকম একটা কিছু বলে সন্দেহ করে বসেচেন।"

বিনয় কহিল—"পৃথিবীতে যারা মুখ ফুটে নালিশ করতে পারে না, চুপ করে থাকে তারাই উল্টে আসামী হয়। দিদি, তোমার মুখে একথা শোভা পায় না,—তুমি নিজে কতদূরে চলে গিয়েছ এখন অন্যকে দূর বলে মনে করচ।"

বিনয় আজ প্রথম সুচরিতাকে দিদি বলিল। সুচরিতার কানে তাহা মিষ্ট লাগিল। বিনয়ের প্রতি প্রথম পরিচয় হইতেই সুচরিতার যে একটি সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল এই দিদি সম্বোধনমাত্রেই তাহা যেন একটি স্নেহপূর্ণ বিশেষ আকার ধারণ করিল।

পরেশ বাবু তাঁহার মেয়েদের লইয়া যখন বিদায় হইয়া গেলেন তখন দিন প্রায় শেষ হইয়া গেছে। বিনয় আনন্দময়ীকে কহিল, "মা, আজ তোমাকে কোনো কাজ করতে দেব না। চল উপরের ঘরে।"

বিনয় তাহার চিত্তের উদ্বেলতা সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। আনন্দময়ীকে উপরের ঘরে লইয়া গিয়া মেঝের উপরে নিজের হাতে মাদুর পাতিয়া তাঁহাকে বসাইল। আনন্দময়ী বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিনু, কি, তোর কথাটা কি?"

বিনয় কহিল, "আমার কোনো কথা নেই, তুমি কথা বল।" পরেশ বাবুর মেয়েদিগকে আনন্দময়ীর কেমন লাগিল সেই কথা শুনিবার জন্যই বিনয়ের মন ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল।

আনন্দময়ী কহিলেন, "বেশ, এই জন্যে তুই বুঝি আমাকে ডেকে আন্‌লি! আমি বলি, বুঝি কোনো কথা আছে।"

বিনয় কহিল, "না ডেকে আন্‌লে এমন সূর্য্যাস্তটিত দেখ্‌তে পেতে না।"

সেদিন কলিকাতার ছাদগুলির উপরে অগ্রহায়ণের সূর্য্য মলিনভাবেই অস্ত যাইতেছিল—বর্ণচ্ছটার কোনো বৈচিত্র্য ছিল না—আকাশের প্রান্তে ধূমলবর্ণের বাষ্পের মধ্যে সোনার আভা অস্পষ্ট হইয়া জড়াইয়াছিল। কিন্তু এই ম্লান সন্ধ্যার ধূসরতাও আজ বিনয়ের মনকে রাঙাইয়া তুলিয়াছে। তাহার মনে হইতে লাগিল, চারিদিক তাহাকে যেন নিবিড় করিয়া ঘিরিয়াছে, আকাশ তাহাকে যেন স্পর্শ করিতেছে।

আনন্দময়ী কহিলেন, "মেয়ে দুটি বড় লক্ষ্মী!"

বিনয় এই কথাটাকে থামিতে দিল না। নানা দিক্‌ দিয়া এই আলোচনাকে জাগ্রত করিয়া রাখিল। পরেশ বাবুর মেয়েদের সম্বন্ধে কত দিনকার কত ছোটখাট ঘটনার কথা উঠিয়া পড়িল—তাহার অনেকগুলিই অকিঞ্চিৎকর কিন্তু সেই অগ্রহায়ণের ম্লায়মান নিভৃত সন্ধ্যায় নিরালাঘরে বিনয়ের উৎসাহ এবং আনন্দময়ীর ঔৎসুক্য দ্বারা এই সকল ক্ষুদ্র গৃহকোণের অখ্যাত ইতিহাসখণ্ড একটি গম্ভীর মহিমায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

আনন্দময়ী হঠাৎ এক সময়ে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সুচরিতার সঙ্গে যদি গোরার বিয়ে হতে পারে ত বড় খুসি হই।"

বিনয় লাফাইয়া উঠিল, কহিল, "মা, এ কথা আমি অনেক বার ভেবেছি। ঠিক গোরার উপযুক্ত সঙ্গিনী!"

আনন্দময়ী। কিন্তু হবে কি?

বিনয়। কেন হবে না? আমার মনে হয় গোরা যে সুচরিতাকে পছন্দ করে না তা নয়।

গোরার মন যে কোনো একজায়গায় আকৃষ্ট হইয়াছে আনন্দময়ীর কাছে তাহা অগোচর ছিল না। সে মেয়েটি যে সুচরিতা তাহাও তিনি বিনয়ের নানা কথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আনন্দময়ী কহিলেন, "কিন্তু সুচরিতা কি হিন্দুর ঘরে বিয়ে করবে?"

বিনয় কহিল, "আচ্ছা মা, গোরা কি ব্রাহ্মর ঘরে বিয়ে করতে পারে না? তোমার কি তাতে মত নেই?"

আনন্দময়ী। আমার খুব মত আছে।

বিনয় পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, "আছে?"

আনন্দময়ী কহিলেন, "আছে বৈ কি বিনু! মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের মিল নিয়েই বিয়ে,—সে সময়ে কোন্‌ মন্তরটা পড়া হল তা নিয়ে কি আসে যায় বাবা! যেমন করে হোক্‌ ভগবানের নামটা নিলেই হল!"

বিনয়ের মনের ভিতর হইতে একটা ভার নামিয়া গেল। সে উৎসাহিত হইয়া কহিল, "মা, তোমার মুখে যখন এ সব কথা শুনি আমার ভারি আশ্চর্য্য বোধ হয়! এমন ঔদার্য্য তুমি পেলে কোথা থেকে।"

আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন, "গোরার কাছ থেকে পেয়েছি।"

বিনয় কহিল, "গোরা ত এর উল্টো কথাই বলে!"

আনন্দময়ী। বল্লে কি হবে! আমার যা কিছু শিক্ষা সব গোরা থেকেই হয়েচে। মানুষ বস্তুটি যে কত সত্য আর মানুষ যা নিয়ে দলাদলি করে, ঝগড়া করে' মরে, তা যে কত মিথ্যে, সে কথা, ভগবান গোরাকে যে দিন দিয়েচেন সেই দিনই বুঝিয়ে দিয়েচেন। বাবা, ব্রাহ্মই বা কে, আর হিন্দুই বা কে! মানুষের হৃদয়ের ত কোনো জাত নেই—সেই খানেই ভগবান সকলকে মেলান এবং নিজে এসেও মেলেন;—তাঁকে ঠেলে দিয়ে মন্তর আর মতের উপরেই মেলাবার ভার দিলে চলে কি?"

বিনয় আনন্দময়ীর পায়ের ধূলা লইয়া কহিল, "মা, তোমার কথা আমার বড় মিষ্টি লাগ্‌ল! আমার দিনটা আজ সার্থক হয়েচে!"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম।

(জি-দে-লাফোঁর-ফরাসী হইতে)

ধর্ম্মও দর্শনের দিক্ দিয়া দেখিলে—ক্লীবলিঙ্গ ব্রহ্ম সম্বন্ধে অতীন্দ্রিয় ধারণা, এবং সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির দিক্ দিয়া দেখিলে—বর্ণভেদপ্রথা—এই দুই লইয়াই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম। ভারতের এই গৌরবোজ্জ্বল যুগে, সভ্যতার যেরূপ বিকাশ ও উন্নতি হইয়াছিল তাহা বাস্তবিকই অত্যদ্ভুত। এই প্রবন্ধের সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে, সবিস্তারে আমি কিছুই বলিতে পারিব না; এই যুগ সম্বন্ধে শুধু একটা আভাস দিবার জন্য, আমি ঐ যুগের কতকগুলি সাহিত্যিক কীর্ত্তির উল্লেখ করিব মাত্র। মহাকাব্য-বিভাগে, মহাভারত ও রামায়ণ—এই দুইটি প্রধান গ্রন্থ; মহাভারতে ২৫০,০০০ শ্লোক আছে। তাহার পর পুরাণ। নাট্য-বিভাগে, কালিদাস ও ভবভূতির নাটকাবলী, মৃচ্ছকটিক বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। তাহার পর গীতি কাব্য—মেঘদূত ও গীত গোবিন্দ; আখ্যায়িকা—পঞ্চতন্ত্র। পাণিনীয় ব্যাকরণ ও তাহার অনেকগুলি ভাষ্য; তাছাড়া অলঙ্কার, ছন্দ ও ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধেও অসংখ্য গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিজ্ঞান-বিভাগে, জ্যোতিষের অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। পাটীগণিত, দাশমিক সংখ্যাঙ্ক, ও বীজগণিতের উদ্ভাবনার জন্য আমরা হিন্দুদিগের নিকট ঋণী। আরবেরা আমাদের জন্য আর কিছুই করে নাই, কেবল ঐ সকল বিদ্যা হিন্দুদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া, আমাদের নিকট প্রচার করিয়াছে মাত্র। সর্ব্বশেষে, মনুসংহিতা কিংবা মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র এবং যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি অন্যান্য ব্যবস্থা-গ্রন্থ; (ভারতবর্ষে এইরূপ ৫৬টি কিংবা ততোধিক গ্রন্থ পাওয়া যায়),—এই সকল গ্রন্থ হইতে, ভারতবর্ষের সভ্যতা যে চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হইয়াছিল এবং উহা যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন—ইহাই সপ্রমাণ হয়। যে জষ্টিনিয়ানের সংহিতা আমরা এক্ষণে অনুসরণ করি, উহার কিয়দংশ মনুসংহিতার আক্ষরিক অনুবাদ মাত্র; এক্ষণে এই পরমাশ্চর্য্য সংহিতাখানি, ব্রাহ্মণ্য-মহিমার সাক্ষীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। মনুসংহিতার বিশোধিত সংস্করণ—William Jones, Chezy, Loeseleur-Delonchamps কর্ত্তৃক, আমাদের যুগের পূর্ব্বে, ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যে বেদের উপর এই সংহিতা প্রতিষ্ঠিত সেই বেদেরই ন্যায় ইহা ভারতে পূজিত হইয়া আসিতেছে এবং আজিকার দিনেও এই সংহিতাটি একটি পরম পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত। এই সংহিতা ১২ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ইহার মধ্যে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, রাষ্ট্রসম্বন্ধীয়, সমাজসম্বন্ধীয় তাবৎ বিষয়ের আলোচনা সন্নিবিষ্ট আছে।

আমার বিবেচনায়, এরূপ গুরুতর ও প্রামাণিক গ্রন্থকে শুধু বিশ্লেষণ করিয়া দেখান অপেক্ষা, উহা হইতে বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া দিলে আরও সমুচিত হইবে। আমি যে অনুবাদ অবলম্বন করিয়া বচন সকল উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা Loiseleur-Deslonchamps-র অনুবাদ; William-Jones-র অনুবাদের সহিত ইহার মিল আছে এবং ইহা মূলের যথাযথ অনুবাদ।

প্রথম অধ্যায়ে (প্রকৃত হিন্দু সৃষ্টি প্রকরণ) ব্রহ্মের অতীন্দ্রিয় স্বরূপ এই বচনে পরিব্যক্ত হইয়াছে:—"এই বিশ্বজগৎ এককালে তমসাচ্ছন্ন ছিল—অচিন্ত্য অবিজ্ঞেয় রূপে—প্রসুপ্ত রূপে সর্ব্বত্র প্রসারিত ছিল। অনন্তর স্বয়ম্ভু অব্যক্ত ভগবান্ মহাভূতাদিতে শক্তি প্রয়োগ করিয়া, এই বিশ্বসংসারকে প্রকাশ করিলেন এবং অন্ধকার বিনাশ করিয়া স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন। যিনি অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, সনাতন, সর্ব্বভূতময়, অচিন্ত্য, তিনি স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি স্বকীয় শরীর হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া, ধ্যান মাত্রে জলের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতে বীজ অর্পণ করিলেন।"

তিন সহস্র বৎসর পরে, জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে Darwin যে মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নলিখিত বচনে তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়:—(১৯, শ্লোক) "মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব এবং পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটি মহাবীর্য্য পুরুষশক্তিবিশিষ্ট পদার্থের সূক্ষ্ম মাত্রা হইতে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে—অব্যয় ও অদ্বয় কারণ হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন।" (২০ শ্লোক)—"এই সকল মহাভূতের মধ্যে প্রত্যেকে পর-পর পূর্ব্ব-পূর্ব্বের গুণ গ্রহণ করে—পর্য্যায়ের মধ্যে যে যত দূর, তাহার গুণ সেই পরিমাণে অধিক।"

মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে, দ্বিজদিগের সংস্কার ও

দীক্ষার কথা আলোচিত হইয়াছে। দ্বিজ শব্দের অর্থ— দুইবার জাত। পূত জলে স্নান করাইয়া, মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে, মধু ও ঘৃত শিশুর ওষ্ঠে স্থাপন করিয়া, প্রথম তিন বর্ণের দ্বিজত্ব অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। তাহার পর, তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে, শিশুর চূড়াকরণ, পরে ১৬ হইতে ২৪ বৎসর বয়সে, দ্বিজ জাতির নিয়মানুসারে উপনয়ন হইয়া থাকে। এই তিনটি অনুষ্ঠান কিংবা সংস্কার দীক্ষার জন্য নিতান্তই আবশ্যক।

বচনগুলি এই:—(২৯ শ্লোক) "বালক জন্মিবামাত্র নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে তাহার জাত কর্ম্ম নামক সংস্কার করা বিধেয়; তৎকালে স্বগৃহ্যোক্ত মন্ত্রে তাহাকে স্বর্ণ, মধু ও ঘৃত ভোজন করাইতে হয়।" (২৭ শ্লোক)—"গর্ভ-কালীন গর্ভাধানাদি সংস্কার, জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ ও উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা দ্বিজাতিগণের বীজ ও গর্ভজন্য পাপসমূহ ক্ষয় হইয়া থাকে।" (৬৬ শ্লোক)—স্ত্রীলোক-দের দেহশুদ্ধির জন্য সমুদায় সংস্কারই যথাকালে এবং যথাক্রমে বিধেয়—পরন্তু ঐ সকল অনুষ্ঠান অমন্ত্রক হইবে। (৬৭ শ্লোক)—"বিবাহ সংস্কারই স্ত্রীলোকের বৈদিক উপনয়ন-সংস্কার।"

এইরূপে, জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ, ও বিশেষত উপনয়ন— এই তিনটি দ্বিজ জাতির দ্বিজত্বের চিহ্ন—এবং এই সকল অনুষ্ঠানের দ্বারাই দ্বিজের দেহশুদ্ধি হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারীর পক্ষে অর্থাৎ "থিয়লজির" ছাত্রের পক্ষে যে সকল কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত আছে তন্মধ্যে চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ সর্ব্বপ্রধান। (৯৫ শ্লোক)—"যে জন সমস্ত কামনার বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, আর যে জন সমস্ত কাম্য বিষয় ত্যাগ করিয়াছেন,—এই উভয়ের মধ্যে ত্যাগবান্ পুরুষকেই শ্রেষ্ঠ বলা যায়।" (৯৩)—"ইন্দ্রিয়গণের বিষয়প্রসক্তি হইতেই মনুষ্য দূষিত হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই; তাহাদিগকে সংযম করিতে পারিলেই সিদ্ধিলাভ করা যায়।" (৯৭)—"বেদ বল, দান বল; যজ্ঞ নিয়ম তপস্যাদি যে কোন পুণ্য কার্য্য বল; এ সকল স্বভাব-দুষ্ট ব্যক্তিকে কখনই সিদ্ধি প্রদানে সমর্থ হয় না।"

হিন্দুদের চক্ষে, একমাত্র জ্ঞানই (জ্ঞান অর্থে প্রধানত বেদবেদাঙ্গের জ্ঞানকেই বুঝায়) মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করে। (১৫৩)—"কারণ, অজ্ঞ ব্যক্তি বৃদ্ধ হইলেও বালক। যিনি জ্ঞানোপদেষ্টা তিনি বালক হইলেও পিতৃবৎ পূজনীয়। অজ্ঞ ব্যক্তিকে যে বালক বলা যায় এবং দেবতাদিগকে যে পিতা বলা যায়, ইহা অতি পূর্ব্বকাল হইতেই প্রসিদ্ধ আছে।" (১৫৪)—"বয়সে, শুক্ল কেশে, ধনে কিংবা বন্ধু বান্ধবে বড় হওয়া যায় না। যিনি বেদ বেদাঙ্গে অভিজ্ঞ, ঋষিরা তাঁহাকেই মহৎ বলিয়াছেন।" ব্রাহ্মণদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতার নিয়ম জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। (১৫৬)—"মস্তকের কেশ পাকিলেই যে বৃদ্ধ হয় এমন নহে, কিন্তু যিনি যুবা হইয়াও বিদ্বান্, দেবতারা তাঁহাকেই বৃদ্ধ বলেন।" (১৫৭) "যেমন কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তী, যেমন চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগ, সেইরূপ বেদহীন ব্রাহ্মণ।" (১৪৫)—"দশজন উপাধ্যায় অপেক্ষা, একজন আচার্য্যের গৌরব অধিক। একশত আচার্য্য অপেক্ষা পিতার গৌরব অধিক এবং সহস্র পিতা অপেক্ষা মাতার গৌরব অধিক।" (১৪৬)—"যিনি সংস্কারাদি করেন নাই, কেবল মাত্র জন্মদাতা, এবং যিনি সাঙ্গ বেদ প্রদান করেন—এই উভয়েই পিতা বটেন, কিন্তু তন্মধ্যে বেদপ্রদ পিতাই শ্রেষ্ঠ। কারণ দ্বিজগণের দ্বিতীয় জন্ম বা ব্রহ্মজন্মই ইহ-পরকাল সর্ব্বত্রই শাশ্বত।" (১৫০)—"যিনি বেদ-অধ্যাপনাদি দ্বারা ব্রহ্মজন্মের কারণ হন, যিনি বেদাদি-ব্যাখ্যান দ্বারা স্বধর্ম্মের উপদেশ করেন,—বালক হইলেও, তিনি ধর্ম্মতঃ বৃদ্ধের পিতা।" নিম্নলিখিত উপদেশ গুলিতে অতীব উচ্চভাব মুদ্রিত রহিয়াছে। (১৬২)—"ব্রাহ্মণ ঐহিক সম্মানকে যাবজ্জীবন বিষের ন্যায় জ্ঞান করিবেন এবং অবমাননাকে সর্ব্বদা অমৃতের ন্যায় আকাঙ্ক্ষা করিবেন।" (১৬১)—"একান্ত পীড়িত হইলেও অন্যের মর্ম্মপীড়ন করা উচিত নয়; যাহাতে পরের অনিষ্ট হয়, এমন কোন কর্ম্ম বা চিন্তা করিতে নাই এবং যে কথা বলিলে লোকের উদ্বেগ জন্মে, পরলোক-বিরোধী এমন বাক্য উচ্চারণ করিতে নাই।" (২২৭)—"পিতা মাতা যে ক্লেশ সহ্য করেন, পুত্র শত বৎসরেও তাহা পরিশোধ করিতে সমর্থ হয় না।" এই অধ্যায়ে, দুইটি খুব উচ্চভাবের শ্লোক আছে:—মাতা পিতা অপেক্ষা সহস্রগুণে পূজনীয় এবং শত শত বৎসর সেবা করিলেও, সন্তান সে ধার শুধিতে

পারে না। স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ পয়ে আছে, এই দুইটি উপদেশ তাহারই কতকটা কাছাকাছি।

এই বিষয়টি বিশেষ আলোচনার যোগ্য: সকল আর্য্য-জাতির ন্যায়, বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্যিক প্রাচীন ভারতের আর্য্যদিগের মধ্যেও নারীজাতি সম্মানিত হইত; বর্ত্তমানে, ভারতে নারীজাতির যে দুর্গতি দেখিতে পাওয়া যায়, মুসলমানের ভারত-বিজয় তাহার মূলীভূত কারণ। সে সময়ে নারীজাতির অবস্থা কিরূপ ছিল, তৃতীয় অধ্যায়ে তাহা অবগত হওয়া যায়। ঐ অধ্যায়ে, বিবাহের বিষয় ও পিতার কর্ত্তব্য আলোচিত হইয়াছে; বিবিধ বর্ণের মধ্যে বিবাহসংক্রান্ত নিষেধের নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যাঁহাদের বিশ্বাস, খৃষ্টধর্ম্মের যুগ হইতে ভারতীয় সভ্যতার আরম্ভ এবং স্বকীয় অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির জন্য ভারতের রমণী খৃষ্টধর্ম্মের নিকট ঋণী, তাঁহারা নিম্নলিখিত বচনগুলি দেখুন: (৩২ শ্লোক)—"কন্যা এবং বর—উভয়ের পরস্পরের ইচ্ছায় যে মিলন হয় তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে, উহা মৈথুন্য ও কাম-সম্ভূত।" (৪৩)—"সবর্ণা স্ত্রীর পক্ষেই পাণিগ্রহণ সংস্কার উপদিষ্ট হইয়াছে।" এই পাণিগ্রহণ বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ।

(৫১)—"ধনগ্রহণ-দোষজ্ঞ পিতা কন্যাদান নিমিত্ত অল্প মাত্র শুল্কও গ্রহণ করিবেন না; কারণ লোভ বশতঃ শুল্ক গ্রহণ করিলে অপত্য-বিক্রয়ী হইতে হয়।" (৫৫)—"স্ত্রী-লোককে বহুমান পূর্ব্বক ভোজনাদি প্রদান ও ভূষণাদি দ্বারা সদাই ভূষিত করা বহুকল্যাণকামী পিতা, ভ্রাতা, পতি এবং দেবরগণের কর্ত্তব্য।" (৫৬)—"যে কুলে নারীগণ পূজিত, দেবতারা সেখানে আনন্দিত হয়েন। আর যে পরিবারে, স্ত্রীলোক পূজিত না হয় সেই পরিবারের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্ম নিষ্ফল হয়।" (৫৭)—"যে পরিবারে স্ত্রীলোকেরা সদাই দুঃখিত থাকেন, সেই কুল আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়; যেখানে স্ত্রীলোকের কোন দুঃখ নাই, সেই পরিবারের নিয়ত শ্রীবৃদ্ধি হয়।" (৫৮)—"অপূজিত থাকা প্রযুক্ত স্ত্রীলোকগণ যে গৃহে অভিসম্পাত করেন, সেই গৃহ অভিচার-হতের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।" (৫৯)—"অতএব যাঁহারা শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন, বিবিধ সৎকার্য্যকালে এবং উৎসবকালে নিত্যই অশন-বসন-ভূষণাদি দ্বারা স্ত্রীলোকের সমাদর করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য।" (৬০)—"যে পরিবারের মধ্যে ভর্ত্তা ও ভার্য্যা পরস্পরের উপর নিত্য সন্তুষ্ট, সেই পরিবারে ধ্রুব কল্যাণ।" (৬২)—"স্ত্রী যদি ভূষণাদির দ্বারা শোভমানা হন, তবেই গৃহের শোভা হয়, আর যদি স্ত্রী শোভমানা না হন, তবে সমস্ত গৃহই শোভাহীন হইয়া পড়ে।"

আতিথ্য সৎকারও পুণ্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত: (১০৫)—"সূর্য্যদেব কর্ত্তৃক আনীত সায়ংকালে অতিথি কোন ক্রমেই প্রত্যাখ্যেয় নহে। যথাকালেই আসুন, আর অকালেই বা আসুন, অতিথিকে গৃহে কখন উপবাসী রাখিবে না।" (১০৬)—"যে দ্রব্য অতিথিকে ভোজন করাইতে পারিবে না, তাহা স্বয়ং ভোজন করিবে না। অতিথির প্রসন্নতা-বলে গৃহস্থ,—ধন, যশ, আয়ু ও স্বর্গ লাভ করেন।" (১১৪)—"নববিবাহিতা স্ত্রী, পুত্রবধূ বা দুহিতা প্রভৃতিকে, বালকদিগকে, রোগীদিগকে এবং গর্ভবতীদিগকে কোন বিচার না করিয়া অতিথির অগ্রেই ভোজন করাইবে।" শেষোক্ত শ্লোকটী হইতে জানা যায়, অতিথি অপেক্ষাও স্ত্রীলোকের সম্মান অধিক। আমরা যে সকল শ্লোক পরে উদ্ধৃত করিব, তাহার মধ্যে এই ভাবের কথা অনেক পাওয়া যাইবে। (১১৮)—"যে ব্যক্তি আপনাকে উদ্দেশ করিয়া অন্ন পাক করে, সে কেবল পাপ ভোজন করে। যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্নই সাধুদিগের জন্য বিহিত হইয়াছে।" (২৫৯)—"গৃহস্থ পিতৃলোকের নিকট এই সকল বর প্রার্থনা করিবে যে 'হে পিতৃগণ! আমাদের কুলে যেন দাতা লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়; অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ও যাগাদির অনুষ্ঠান দ্বারা বেদশাস্ত্রের যেন সম্যক আলোচনা হয়; আমাদের পুত্র পৌত্রাদি বংশ পরম্পরা যেন চিরকাল বিস্তৃত থাকে; বেদের উপর অটল শ্রদ্ধা যেন আমাদের কুল হইতে তিরোহিত না হয় এবং দান করিবার জন্য দেয় দ্রব্যেরও যেন কখন অসদ্ভাব না থাকে।"

চতুর্থ অধ্যায়ে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও সাধারণ উপদেশের কথা আছে। (৩২ শ্লোক)—"যাঁহারা পাক করেন না—এমন ব্রহ্মচারী প্রভৃতিকে গৃহস্থ যথাশক্তি অন্নাদি প্রদান করিবেন এবং যাহাতে আত্মকুটুম্বের পীড়া না জন্মে, এই কারণ তাঁহাদিগের জন্য পর্য্যাপ্ত রাখিয়া সমুদায় প্রাণিগণকে

খাদ্যাদি বিভাগ করিয়া দিবেন।" (১৩৪)—"পরস্ত্রী গমনে যেমন আয়ুঃক্ষয় হয়, ইহ সংসারে অন্য কোন ব্যাপারে পুরুষের তেমন আয়ুঃক্ষয় হয় না।" (১৩৮)—"সত্য বলিবে, প্রিয় বলিবে, অপ্রিয় সত্য বলিবে না, প্রিয় মিথ্যাও বলিবে না, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।" (১৭১) "ধর্ম্মপথে থাকিয়া অবসন্ন হইলেও কখন অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে না।" (১৬৮)—"ভূমিপতিত ব্রহ্মরক্তে যতকাল ধূলিকণা মিশ্রিত হয়, শোণিতোৎপাদক ব্রহ্মঘাতীকে তত বৎসর পরলোকে শৃগাল কুক্কুরাদি ভক্ষণ করিতে থাকে।" (১৮৪)—"বালক, বৃদ্ধ, দরিদ্র ও আতুর লোক—ইঁহাদিগকে আকাশের ঈশ্বর বলিয়া বিবেচনা করিবে; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতার সমান ও আপনার স্ত্রী পুত্রকে স্বকীয় দেহ বলিয়া বিবেচনা করিবে।" (১৮৫)—"দাসবর্গকে আপনার ছায়া ও দুহিতাকে পরম স্নেহের পাত্র বলিয়া বিবেচনা করিবে। এ কারণ ইহাদের দ্বারা উৎপীড়িত হইলেও অক্ষুন্ন মনে সর্ব্বদা সহ্য করিবে।"

(২০৪)—"ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ক্ষমা, ধ্যান, সত্যকথন, নিষ্পাপ অন্তঃকরণ, হিংসা ও অপহরণ না করা এবং মধুর ভাব—ইহাদিগকে যম বলা যায়। স্নান, মৌনাবলম্বন, উপবাস, যজ্ঞকার্য্য ও বেদাধ্যয়নাদিকে ধর্ম্মনিয়ম বলা যায়। সর্ব্বদা যমেরই সেবা করিবে, কেবল নিয়ম লইয়া থাকিবে না। যমাচরণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিয়মাচরণ করিলে পতিত হইতে হয়।" ধর্ম্মকর্ম্মের আগে নৈতিক কর্ত্তব্য—ইহা একটা গভীর তত্ত্বকথা! ব্যবস্থাকর্ত্তা যাজ্ঞবল্ক্যের মতানুসারে, নৈতিক কর্ত্তব্য দশটি: জিতেন্দ্রিয়তা, দয়া, ধৈর্য্য, ধ্যান ধারণা, সত্যপরায়ণতা, ঋজুতা, ক্ষমা, অস্তেয়, মাধুর্য্য ও মিতাচার।

নিম্নলিখিত দুইটি উপদেশে খুব একটা উচ্চ ভাব আছে: (২৩৪)—"যে যে ভাবে যে যে দান করা যায়, প্রতিপূজিত হইয়া সেই সেই ভাবে সেই সেই দান জন্মান্তরে পাওয়া যায়।" (২৩৭)—"স্বীয় যজ্ঞানুষ্ঠান সম্বন্ধে মিথ্যাকথনে যজ্ঞফল নষ্ট হইয়া যায়, স্বীয় তপস্যা সম্বন্ধে বিস্ময়াপন্ন হইলে তপস্যা ক্ষয় হয়, ব্রাহ্মণনিন্দায় আয়ুঃক্ষয় হয় এবং দান করিয়া তাহার কীর্ত্তন করিলে দানের ফল নষ্ট হইয়া যায়।"

পঞ্চম অধ্যায়ে, অশৌচ, অশৌচের প্রায়শ্চিত্ত ও স্ত্রীলোকদিগের কর্ত্তব্য আলোচিত হইয়াছে।

এই অধ্যায়ে, যে সকল অন্ন স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হয়, তাহার একটা দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হইয়াছে। এই অনুসারে, তরকারীর মধ্যে রসুন, পেয়াজ, বেঙের ছাতা আহার করা নিষিদ্ধ; মেষদুগ্ধ উষ্ট্রদুগ্ধ, হিংস্র পশুদের দুগ্ধ, পাখীর মাংস, চতুষ্পদ পশুর মাংস, এমন কি পুঁটি ও রুই মৎস্য ছাড়া অন্য মৎস্য আহার করাও নিষিদ্ধ। এবং কোন দ্বিজ যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক এই সকল নিষিদ্ধ দ্রব্য আহার করে ত সে তৎক্ষণাৎ পতিত হয়।

(৪৮ শ্লোক)—"প্রাণিহিংসা না করিলে কখন মাংস উৎপন্ন হয় না; প্রাণিবধ কিছুতেই স্বর্গজনক নহে; অতএব মাংস ভোজন পরিবর্জ্জন করিবে।" (৪৫)—"যে ব্যক্তি আত্মসুখেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া, হিংসাশূন্য নিরীহ জীবগণকে হত্যা করেন, তিনি কি জীবিতাবস্থায়, কি মৃত্যুর পর কদাপি সুখলাভ করিতে পারেন না।" (৪৬)—"যে ব্যক্তি প্রাণীদিগকে বধ বন্ধনাদি ক্লেশ দিতে ইচ্ছা না করেন, সকলের হিতাকাঙ্ক্ষী সেই ব্যক্তি, অত্যন্ত সুখ ভোগ করেন।"

অশুদ্ধ দ্রব্যাদির আলোচনা করিয়া এবং বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, অগ্নি, শুদ্ধ অন্ন, জল, ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি শুদ্ধিকর উপায় সকল নির্দ্ধারিত করিয়া তাহার পর মনু এই কথা বলিতেছেন। (১০৬)—"দেহ-মন-আদি শুদ্ধিকর সমুদায় পদার্থ মধ্যে অর্থশৌচ অর্থাৎ অর্থার্জ্জন বিষয়ে অন্যায় বা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ না করাকে ঋষিরা পরম শৌচ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি অর্থার্জ্জনে শুচি তিনিই প্রকৃত শুচি; অর্থশুদ্ধি না থাকিলে কেবল মৃত্তিকা বা জল দ্বারা দেহ শুদ্ধ করিলে শুচি হয় না।" (১০৭)—"বিদ্বান্ জনেরা ক্ষমা দ্বারা শুদ্ধ হন; অকার্য্যকারীরা দান দ্বারা, প্রচ্ছন্ন পাপীরা জপদ্বারা এবং বেদবিদ্ ব্রাহ্মণেরা তপস্যা দ্বারা পাপ হইতে শুদ্ধ হন।" (১৩০)—"স্ত্রীলোকের মুখ সর্ব্বদাই শুচি।" (১৬০)—"অনেক সহস্র কৌমার ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণগণ সন্তান উৎপাদন না করিয়াও স্বীয় ব্রহ্মচর্য্য বলে অক্ষয় স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন, ঐ সকল ব্রহ্মচারীর ন্যায় অপুত্রা হইলেও সাধ্বী স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য বলে স্বর্গে গমন করেন।" (১৬৩)—"নিজের পতি অপকৃষ্ট বলিয়া যে স্ত্রীলোক তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অপর কোন উৎকৃষ্ট পুরুষের আশ্রিত হয়, লোকে তাহাকে

পরপূর্ব্বা বলিয়া থাকে।” (১৬৬)—“যে স্ত্রীলোক এইরূপে মনোবাগ্দেহ সংযতা হইয়া নারীধর্ম্মে জীবন যাপন করেন, তিনি ইহলোকে পরমাকীর্ত্তি লাভ করেন ও পরকালে পতিলোকে গমন করেন।”

ষষ্ঠ অধ্যায়ে, সন্ন্যাস-জীবন সম্বন্ধে উপদেশ আছে। ফলত ব্রাহ্মণের জীবন চার কালবিভাগে বিভক্ত। এই চার কালবিভাগের সহিত চতুরাশ্রমের মিল আছে। প্রথম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। এই সময়ে ব্রাহ্মণযুবক গুরুর নিকট বেদাধ্যয়ন করেন। দ্বিতীয় গৃহস্থাশ্রম। এই সময়ে ব্রহ্মচারী বেদাদির অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া বিবাহ করেন ও বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হয়েন। তৃতীয় বানপ্রস্থাশ্রম। গৃহী সাংসারিক সমস্ত সুখ সম্ভোগ করিয়া অবশেষে সংসার ত্যাগ করিবার জন্য বনে গিয়া তাপসের ন্যায় জীবন যাপন করেন; তখন তিনি শুধু ভিক্ষান্নের দ্বারা জীবন ধারণ করেন। তাহার পর যখন তিনি বার্দ্ধক্যে উপনীত হন এবং পার্থিব বস্তু হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হন, তখন তিনি ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করেন এবং সন্ন্যাসী হয়েন। এই উচ্চ অবস্থায় উপনীত হইলে পর তিনি ভৌতিক জীবনের খুটিনাটি লইয়া আর ব্যাপৃত থাকেন না, পরন্তু চরম লক্ষ্যের দিকে চিত্তকে স্থির রাখিয়া কঠোর আত্মনিগ্রহে প্রবৃত্ত হন।

(২১ শ্লোক)—“অথবা বানপ্রস্থ ধর্ম্মবিধি প্রতিপালন করিয়া কেবল পুষ্প-মূল-ফল দ্বারা সর্ব্বদা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, কিংবা স্বয়ংপতিত কালপক্ক ফলদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন।” (২২)—“ভূমিতে গড়াগড়ি দিবেন, অথবা সারাদিন একপদে দণ্ডায়মান থাকিবেন, কিংবা কখন আসনস্থ, কখন বা আসন হইতে উত্থান করিয়া কাল কাটাইবেন। প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে স্নান করিবেন।” (২৪)—“ত্রৈকালিক স্নান করিয়া পিতৃ ও দেবলোকের তর্পণ করিবেন এবং উগ্রতর তপস্যা করিয়া দেহকে শোষণ করিবেন।” (২৬)—“সুখকর বিষয়ে যত্নশীল হইবেন না, স্ত্রীসম্ভোগাদি করিবেন না; ভূমিশয্যায় শয়ন করিবেন, বাসস্থানে মমতাশূন্য হইবেন এবং বৃক্ষমূলে বসতি করিবেন।” (২৯)—“বানপ্রস্থাবলম্বী ব্রাহ্মণ এই সমুদায় ও অপরাপর নিয়ম প্রতিপালন করিবেন এবং আত্ম-সাধনার জন্য উপনিষদাদি বিবিধ শ্রুতি অভ্যাস করিবেন।” (৩৪)—“আশ্রম হইতে আশ্রমান্তর গমন করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তত্তৎ আশ্রমে অগ্নিহোত্রাদি হোম সমাধান করিয়া জিতেন্দ্রিয়ত্ব লাভ করিয়া ভিক্ষাদান বা বলিদানাদি কর্ম্মে শ্রান্ত হইলে পর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলে পরলোকে পরম অভ্যুদয় লাভ করা যায়।” (৪২)—“সর্ব্বসঙ্গ রহিত হইলে সিদ্ধিলাভ হয় জানিয়া আত্মসিদ্ধির জন্য তখন অসহায় অবস্থায় নিত্য একাকী বিচরণ করিবেন।” (৪৭)—“দুরুক্তি বা অপমান-জনক বাক্য সকল সহ্য করিয়া থাকিবে, কাহাকেও অপমান দ্বারা পরাভব করিবে না; এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবে না।” (৪৮)—“কেহ ক্রোধ করিলে তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিবে না; কেহ আক্রোশের কথা কহিলে তাহার প্রতি কুশলবাক্য প্রয়োগ করিবে। সপ্তদ্বার বিষয়ক যে বাক্য, তাহাকে মিথ্যাতে নিয়োগ করিবে না।” (৪৯)—“সর্ব্বদা ব্রহ্ম-ধ্যানপর হইয়া আসীন থাকিবে; কোন বিষয়ের অপেক্ষা রাখিবে না—সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহ হইবে; কেবল আত্মসহায়েই একাকী মোক্ষার্থী হইয়া ইহসংসারে বিচরণ করিবে।” (৬০)—“ইন্দ্রিয়গণের নিরোধ, রাগদ্বেষাদির ক্ষয় এবং সর্ব্বভূতে অহিংসা—এই সকল উপায় দ্বারা মনুষ্য মুক্তিলাভে অধিকারী হন।” (৭২)—“প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয় বিকারাদি দোষ সকল দগ্ধ করিবে; স্থান বিশেষে চিত্তবন্ধনরূপ ধারণা দ্বারা পাপ সকল নষ্ট করিবে; স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় আকর্ষণরূপ প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়সংসর্গরূপ পাপ সকল হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবে এবং পরব্রহ্মের ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া কামক্রোধাদি অনীশ্বর গুণ সকলকে জয় করিবে।” (৭৬)—“এই দেহ অস্থিরূপ স্তম্ভে বিধৃত, স্নায়ুরূপ রজ্জুদ্বারা বদ্ধ, রক্ত ও মাংসদ্বারা প্রলিপ্ত, চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত, মূত্র ও বিষ্ঠার দুর্গন্ধে পূর্ণ।” (৭৭)—“এই দেহ জরাশোকে আক্রান্ত, নানাপ্রকার ব্যাধি-মন্দির, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, প্রায়ই রজোগুণযুক্ত, অনিত্য এবং পঞ্চভূতের আবাস স্বরূপ —ইহা জানিয়া ইহার মায়া পরিত্যাগ করিবে।” (৮২)—“যে কিছু কর্ম্মফল পূর্ব্বে পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সকলই ধ্যানপরায়ণ জনের প্রাপ্য; কিন্তু ধ্যানহীন, সুতরাং

আত্মজ্ঞান বিরহিত ব্যক্তি কোন ক্রিয়ারই ফল লাভ করিতে পারে না।"

উপরে যে সকল বচন উদ্ধৃত করা হইল, উহা সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট ব্রাহ্মণের প্রতি প্রযুজ্য। উহা তাহাদের কর্ত্তব্যের মুখ্য অংশ মাত্র; সমস্ত কর্ত্তব্য বিবৃত করিতে হইল, সমস্ত অধ্যায়ই উদ্ধৃত করিতে হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষভাগে, দ্বিজ ও দ্বিজদের ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর উপদেশ আর কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিবে, যে অসাধু ব্যবহার করে তাহার প্রতি সাধু ব্যবহার করিবে,—এই যে খৃষ্টমতবাদের মূলভিত্তি—এই সকল উপদেশ খৃষ্ট আবির্ভাবের ত্রয়োদশ শতাব্দি পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছিল। (৯১)—"এই চারি আশ্রমবাসী দ্বিজাতিগণের বক্ষ্যমান দশপ্রকার কর্ম্ম নিত্য যত্নসহকারে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ—এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ।' (৯৩)—"ধর্ম্মের এই দশ লক্ষণ যে ব্রাহ্মণ সম্যক্ অধ্যয়ন করেন এবং অধ্যয়ন করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করেন, তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন।"

সপ্তম অধ্যায়টি রাজাদের জন্য। এই অধ্যায়টি পাঠ করিলে জানা যায়, সভ্যতার কতটা উচ্চ ধাপে ভারত এক সময়ে উপনীত হইয়াছিল;—এই হিসাবে আমাদের নিকট এই অধ্যায়ের সমধিক গুরুত্ব। এই সংহিতার প্রতিপত্তি ও প্রামাণিকতার প্রভাব এতটা বেশী ছিল যে রাজারা বাধ্য হইয়া উহা হইতে রাজধর্ম্ম শিক্ষা করিতেন। "রাজার দেবদত্ত অধিকার" এই বীজমন্ত্রটি এই অধ্যায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়; বহুকাল পরে এই মন্ত্রটি এবং রাজার অভিষেক-অনুষ্ঠান পাশ্চাত্যখণ্ডের আর্য্যেরা গ্রহণ করে। (২ শ্লোক)—"যথাবিহিত উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া যথান্যায় আপন আপন প্রজাপুঞ্জের রক্ষণাবেক্ষণ করা রাজার কর্ত্তব্য।" (৩)—"ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও কুবের—এই অষ্ট দিক্‌পালের সারভূত অংশ গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।" (১৪)—"রাজার হিতার্থেই ঈশ্বর পূর্ব্বকালে, সর্ব্বপ্রাণীর রক্ষাকর্ত্তা ধর্ম্মস্বরূপ আত্মজ ব্রহ্মতেজোময় দণ্ডকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।" (১৯)—"সেই দণ্ড যদি সম্যক্ বিবেচিত হইয়া ধৃত হয়, তবে প্রজাসমুদয় সুখে থাকে; পরন্তু অন্যথা হইলে, অর্থাৎ অবিচার পূর্ব্বক সেই দণ্ড বিহিত হইলে, সকলকেই বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হয়।" (২০)—"যদি রাজা অনলস থাকিয়া দণ্ডনীয়ের প্রতি দণ্ডবিধান না করিতেন, তাহা হইলে জলস্থিত মৎস্যের ন্যায়, দুর্ব্বল জনেরা বলবানের বধ্য হইত।" (২৫)—"যে স্থলে শ্যামবর্ণ আরক্ত-লোচন দণ্ড, পাপবিনাশার্থ বিচরণ করে এবং দণ্ডবিধাতা সর্ব্ববিষয়ে ন্যায়দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন, প্রজারা তথায় কদাচ কাতর হয় না।" (৩০)—"মূর্খ, লোভপর, শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন মন্ত্রিপুরোহিতাদিসহায়শূন্য এবং ভোগাসক্ত নরপতি কদাচ যথানিয়মে দণ্ডবিধান করিতে পারেন না।" (৩১)—"পবিত্রপ্রকৃতি বিশুদ্ধাত্মা, সত্য-প্রতিজ্ঞ, বেদাদিশাস্ত্রানুষ্ঠায়ী এবং সুবুদ্ধি নরপতি সুমন্ত্রিসহ যথানিয়মে দণ্ডবিধান করিতে সমর্থ হন।" (৩৮)—"যাঁহাদের দেহ-মন অতি পবিত্র, এবম্ভূত বেদজ্ঞ ধর্ম্মবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বদা সেবা করা রাজার কর্ত্তব্য। কারণ, যে রাজা বৃদ্ধসেবায় সদা নিরত;—তিনি রাক্ষসদিগের দ্বারাও পূজিত হইয়া থাকেন।" (৩৯)—"স্বভাবসিদ্ধ নিজ সুবুদ্ধিগুণে এবং শাস্ত্রাধ্যয়নগুণে রাজা বিনীত হইলেও সর্ব্বদা ঐ বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণগণসমীপে বিনয় শিক্ষা করা তাঁহার কর্ত্তব্য; কারণ, বিনীত রাজা কখন বিনাশ প্রাপ্ত হন না।" (৪৪)—"চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিবার নিমিত্ত রাজার দৃঢ়রূপে যত্নবান হওয়া আবশ্যক; কারণ, সম্পূর্ণ জিতেন্দ্রিয় রাজাই কেবল প্রজাগণকে নিজ কর্ত্তব্যাসক্ত রাখিতে পারেন।" (৫০)—"দশবিধ কামজ দোষের মধ্যে সুরাপান, পাশক্রীড়া, স্ত্রীলোকে আসক্তি এবং মৃগয়া—এই চারিটি যৎপরোনাস্তি কষ্টজনক বলিয়া রাজার জানা উচিত।" (৫)—"ক্রোধজ অষ্টবিধ দোষের মধ্যে নিষ্ঠুর কথন, প্রাপ্য ধনে প্রবঞ্চনা করা এবং নির্ঘাত প্রহার—এই তিনটি রাজার নিতান্ত অনর্থকর বলিয়া জানা উচিত।" (৫৩)—"ক্রোধজ কিংবা কামজ দোষ মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ঙ্কর কষ্টজনক; কারণ দেহান্তে, কাম-ক্রোধজ-দোষাসক্ত পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ক্রমে নিরয়গামী হয়; কিন্তু নির্দোষ নর, দেহান্তে স্বর্গগামী হইয়া থাকে।"

(৮০)—"শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে বৎসরান্তে রাজা প্রজাবর্গের নিকট হইতে বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দ্বারা কর সংগ্রহ করিবেন। অধীনস্থ সমস্ত প্রজাবর্গের উপর পিতৃবৎ ব্যবহার করিবেন।" যে যুগে, রাজা ও ক্ষত্রিয়বর্গকে এই সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, পণ্ডিতবর Deguigne সেই যুগকে, "বর্ব্বর ও দস্যুর যুগ" বলিয়া কি না অভিহিত করিয়াছেন! (৯০)—"পরস্পর যুদ্ধকালে কূটাস্ত্র অর্থাৎ গুপ্ত বিষাক্ত বাণ, কর্ণ্যাকার ফলকযুক্ত বাণ অগ্নিপ্রদীপ্তাস্ত্র কাহাকেও প্রহার করা বিধেয় নহে।" (৯১)—"রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থলারূঢ়, নপুংসক, প্রাণভয়ে কৃতাঞ্জলি, মুক্তকেশে পলায়মান, যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া আসনোপবিষ্ট, অথবা যে 'আমি তোমার' এই কথা বলে—এরূপ শত্রু কদাপি বধ্য নহে।" (৯২)—"বর্ম্মহীন, নিরস্ত্র, নিদ্রিত, উলঙ্গ, যুদ্ধবিমুখ, কেবলমাত্র দর্শনার্থ সমাগত এবং অন্যের সহিত যুদ্ধে আসক্ত—এ কয়েক ব্যক্তিও যোদ্ধার অবধ্য।" (৯৩)—"ভগ্নাস্ত্র, পুত্রশোকে কাতর, শত্রুবাণে জর্জ্জর কলেবর, যুদ্ধভয়ে ভীত এবং রণপরাঙ্মুখ—ইহারা সদাশয় রাজার নিতান্ত অবধ্য।"

আমরা বিশ্বমানবের উচ্ছেদকল্পে যতপ্রকার ভীষণ সাংঘাতিক উপায় আবিষ্কার করিতে পারি, আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির সমস্ত উদ্যম সেইদিকেই উন্মুখ হইয়া আছে,—সেই আমরা কি সরল-অন্তঃকরণে বলিতে পারি, আমাদের যুগের সভ্যতা, পুরাতন সভ্যতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট? শেষাশেষি যে সব য়ুরোপীয় যুদ্ধ হইয়াছিল সেই সব যুদ্ধ—রুসসৈন্য ধ্বংস করিবার জন্য প্রথম নেপোলিয়ান যখন বরফের উপর দিয়া কামান টানিয়া লইয়া যান সেই সময়ের যুদ্ধ, স্পেনের 'গেরিলা'-যুদ্ধ, তুর্ক-রুসের যুদ্ধ, অ্যালেক্‌জান্দ্রিয়া নগরের উপর গোলাবর্ষণ,—এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে, যাহার দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হয় যে আমরা আবার বর্ব্বর-অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছি।

নিম্নলিখিত স্বতঃসিদ্ধ নীতিসূত্রটি সর্ব্বকালের জন্য সত্য। (১২৩)—"রক্ষণার্থ নিয়োজিত রাজভৃত্যগণ প্রায় অধিকাংশই পরস্বাপহারী এবং প্রবঞ্চক হইয়া থাকে; অতএব সবিশেষ যত্নসহকারে তাহাদের উপদ্রব হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।" (১৩৭)—"সামান্য বস্তু ক্রয় বিক্রয় দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহকারী, অতি সামান্যাবস্থ প্রজাদের নিকট হইতেও বাৎসরিক কর-স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ রাজার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।" (১৩৮)—"কারু-কর্ম্মকারী, শিল্পকর, দাস, দাসী, অথবা যাহারা কেবলমাত্র শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদিগের দ্বারা রাজা মাসিক একদিন করিয়া নিজ কার্য্য করাইয়া লইবেন।" ইহাই দ্রব্যবিনিময় পদ্ধতির গোড়া—আজিকার দিনেও যাহার প্রয়োগ দেখা যায়। (১৪৪)—"সর্ব্বধর্ম্মাপেক্ষা প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; শাস্ত্রোক্ত-করাদিভোক্তা রাজা সর্ব্বতোভাবে তৎপ্রতিপালনে বাধ্য।" (২০৩)—"বিজিত-রাজ্যবাসীদিগের দেশাচার ও গুরুপরম্পরাগত শাসনপ্রণালী, নিজদেশাচার বিরুদ্ধ হইলেও যদি ধর্ম্মসঙ্গত হয়, তবে তাহাই তথায় প্রচলিত রাখা আবশ্যক এবং রত্নাদি উৎকৃষ্ট দ্রব্য দান দ্বারা তত্রত্য অভিষিক্ত রাজা ও তদমাত্যবর্গের পরিতোষ সাধন করা রাজার কর্ত্তব্য।" (২১১)—"আর্য্যতা, পুরুষজ্ঞান, শৌর্য্য, করুণবেদিতা, দানশৌণ্ডতা—এই সকল ধর্ম্ম রাজাদের অলঙ্কার।"

অষ্টম অধ্যায়টি বিচারকর্ত্তাদিগের জন্য। নিম্নলিখিত সুন্দর নীতিসূত্রটি এই অধ্যায়ের আরম্ভ ভাগেই আছে। (১৭)—"ধর্ম্মই জীবের একমাত্র সুহৃৎ—মৃত্যুর পরেও ধর্ম্ম আমাদের অনুগামী হয়, আর সমস্তই দেহের সহিত বিনাশ-প্রাপ্ত হয়।" ইহাতে যে সকল অসংখ্য স্বত্বাধিকারের মূলসূত্র আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি এখনও আমাদের ব্যবস্থাসংহিতার মধ্যে বলবৎ রহিয়াছে।

(২৭)—"পিতৃমাতৃবিহীন অনাথ বালকের ধন, রাজা নিজে তাবৎকালের জন্য রক্ষা করিবেন, যাবৎ বালক গুরুকুল হইতে গৃহস্থাশ্রমে সমাবৃত না হয়, অথবা যে পর্য্যন্ত না সে অতীতশৈশব হয়।" (২৮)—"বন্ধ্যা স্ত্রী, যাহার স্বামী দারান্তর পরিগ্রহ করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন-নির্ব্বাহোপযোগী ধন দিয়া তাহাকে ক্ষান্ত করিয়াছে; পুত্ররহিত প্রোষিত-ভর্তৃকা; যে স্ত্রীর সপিণ্ডাদি অভিভাবক কেহ নাই এবং সাধ্বী; বিধবা ও রোগিণী স্ত্রী—ইহাদের ধন, অনাথ-বালকের ধনের ন্যায় রাজা রক্ষা করিবেন।" (৩০)—"অজ্ঞাত-স্বামীক ধন পাইলে, রাজা সর্ব্বত্র উহা প্রকাশ্য ঘোষণা

করিয়া তিন বৎসর পর্য্যন্ত আত্মকোষে স্থাপিত রাখিবেন। তিন বৎসরের মধ্যে ধনস্বামী আগত হইলে ঐ ধন সে পাইবে। ঐ সময় অতীত হইলে, রাজা নিজ কার্য্যে ঐধনের নিয়োগ করিবেন।" (৬৪)—"যাহাদের সহিত অর্থসম্বন্ধ আছে, যাহারা মিত্র, যাহারা সাহায্যকারী ভৃত্যাদি, যাহারা শত্রু, যাহাদের কূটসাক্ষিত্ব পূর্ব্বে জানা গিয়াছে এবং যাহারা ব্যাধিগ্রস্ত বা মহাপাতকাদি দোষে দূষিত —ইহাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য নয়।" (৬৫)—"রাজাকে সাক্ষী করিবে না। (৬৬)—"একমাত্র ব্যক্তিকে সাক্ষী করিবে না।"

মিথ্যা সাক্ষ্য, মহাপাতকের সামিল। (৯০)—"হে ভদ্র! জন্মাবধি তুমি যে কিছু পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছ, সে সমুদয় পুণ্য কুক্কুরে গমন করিবে—যদি তুমি সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যা বল। (৯১)—"তুমি মনে করিতেছ যে, তুমি একাকী আছ, কিন্তু তাহা নহে—পাপপুণ্যের দ্রষ্টা সর্ব্বজ্ঞ মুনি এই পরমাত্মা নিত্য তোমার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন।" (৯২)—"এই বৈবস্বত দেব তোমার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, তুমি সত্য করিলে তাঁহার সহিত তোমার কোন বিবাদ থাকিবে না এবং তাঁহার সহিত নির্ব্বিবাদে অবস্থান করিলে গঙ্গা বা কুরুক্ষেত্রগমনে কোন প্রয়োজন হয় না।"

(৮৪)—"আত্মাই আত্মার সাক্ষী এবং আত্মাই আত্মার গতি, মনুষ্যদিগের এমন যে উত্তম সাক্ষী স্বকীয় আত্মা, তাহাকে অবমাননা করিবে না।" (১৫২)—"শাস্ত্রানুসারে অধিক হারে সুদ লওয়া সিদ্ধ নহে; এরূপ অধিক হারে সুদ গ্রহণকে পণ্ডিতেরা কুসীদপথ বলিয়া নিন্দা করেন। উত্তমর্ণ এরূপ সুদ শতকরা পাঁচের ঊর্দ্ধ লইতে পারে না।" (১৬৮)—"বলপূর্ব্বক যাহা কিছু দত্ত হয়, বলপূর্ব্বক যাহা কিছু ভুক্ত হয়, বলপূর্ব্বক যাহা কিছু লেখিত হয়, বলপূর্ব্বক যাহা কিছু কৃত হয়, সকলই অকৃত বা অসিদ্ধ, এই কথা মনু বলিয়াছেন।"

(২২৬)—"বিবাহ বিষয়ে যে সকল মন্ত্র আছে, উহা কেবল কন্যার প্রতিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে—কুত্রাপি অকন্যা স্ত্রীলোকের প্রতি বিহিত নহে;—কারণ তাহারা ধর্ম্ম-ক্রিয়ার বহির্ভূত।" (২২৭)—"বৈবাহিক মন্ত্র সকলই ভার্য্যাত্বের নিশ্চয় কারণ এবং ঐ সকল মন্ত্র দ্বারা কন্যার সপ্তপদী গমন হইলে ভার্য্যাত্বের সমাপ্তি হয় বলিয়া পণ্ডিতেরা জানেন।" (৩১২)—"যিনি আত্মহিত কামনা করেন সেই রাজা অর্থীপ্রত্যর্থীদিগের এবং বালক, বৃদ্ধ ও আতুরদিগের আক্ষেপোক্তি কটূক্তি ক্ষমা করিবেন।" (৩১৩)—"পীড়িত অবস্থায়, লোকে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করে যে রাজা অম্লান ভাবে তাহা সহ্য করেন, তিনি স্বর্গেও পূজা প্রাপ্ত হন; পরন্তু যিনি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ক্লিষ্টের কটূক্তি ক্ষমা না করেন, তিনি নরকগামী হন।" নিম্নলিখিত নীতিসূত্রটির দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, কোন অপরাধী, সামাজিক সোপানে যত উন্নত স্থান অধিকার করে, ততই কঠোররূপে সে দণ্ডনীয়। (৩৩৭)—"চৌর্য্যের গুণদোষজ্ঞ শূদ্র চুরি করিলে সে বিহিত দণ্ডের অষ্টগুণ দণ্ডনীয়, তাদৃশ বৈশ্য চোর ষোড়শগুণ দণ্ডনীয় এবং ঐরূপ ক্ষত্রিয় চোরের বত্রিশগুণ দণ্ড হইবে।" (৩৩৬)—"যে অপরাধে অন্য প্রাকৃত জনের একপণ দণ্ড হইবে, রাজা স্বয়ং যদি সেই অপরাধ করেন, তবে তাঁহার সহস্রপণ দণ্ড হইবে—ইহাই ধর্ম্ম ব্যবস্থা।"

নিম্নলিখিত বচনে, আত্মরক্ষার অধিকার সমর্থিত হইয়াছে (৩৫০)—"গুরু, বালক, বৃদ্ধ বা বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ—যে কেহ হউক না কেন, বধ করিবার জন্য আগত হইলে এবং অন্য কোন আত্মরক্ষার উপায় না থাকিলে, কোন বিচার না করিয়াই উহাদিগকে বধ করিতে পারে।" (৩৪৯)—"আত্মরক্ষার্থে, ন্যায়যুদ্ধে, স্ত্রীলোক ও ব্রাহ্মণের রক্ষার্থে, ধর্ম্মত লোকহিংসা করিলে দোষভাগী হইতে হয় না।" (৩৫১)—"প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবেই হউক আততায়ী-বধে হন্তার কিছুই দোষ হয় না; মন্যু মন্যুতেই গমন করে।" (৩৫২)—"পরদার-সম্ভোগে প্রবৃত্ত মনুষ্য-দিগকে রাজা নানাবিধ উদ্বেগজনক নাসাকর্ণচ্ছেদাদি দণ্ড দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন। (৩৫৩)—"পরদার-সম্ভোগে লোকমধ্যে বর্ণসঙ্কর উপস্থিত হয় এবং তাহা হইতে অধর্ম্ম ও তাহা হইতে সর্ব্বনাশ ঘটে।"

(৩৯৪)—"অন্ধ, জড়, ভগ্নপীঠ, সপ্ততিবর্ষ-বয়স্ক বৃদ্ধ এবং ধনধান্যাদি দ্বারা যে ব্যক্তি শ্রোত্রিয়ের সর্ব্বদা উপকার

করেন—ইহাদের নিকট হইতে রাজা কোন কর লইবেন না।

(৩৯২)—"বিদ্যাচারসম্পন্ন, ব্যাধিত, আর্ত্ত, বালক, বৃদ্ধ, অকিঞ্চন, মহাকুলীন, আর্য্য—ইহাদিগকে রাজা দান-মানাদি সম্মাননা করিবেন।"—দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন, বৈশ্য ও শূদ্রজাতির ধর্ম্মাদি নবম অধ্যায়ের বিষয়। ইহার মধ্যে অনেকগুলি নীতিসূত্র স্ত্রীলোকের প্রতি প্রযুজ্য এবং ইহার দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে, হিন্দুরা স্ত্রীলোককে সম্মান করিত, নিষ্ঠুরাচরণ হইতে স্ত্রীলোককে রক্ষা করিত, এবং যাবৎ সাধ্বী ও শুদ্ধচরিত্রা থাকিত, তাবৎ তাহাদিগকে শ্রদ্ধাভক্তি করিত। তা ছাড়া, পরে আমরা দেখাইব, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকালে, স্ত্রীলোক নিজে প্রকাশ্যভাবে কাজকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত, ধর্ম্মসঙ্ঘ গঠন করিত, প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিত, দরিদ্র ও আর্ত্তদিগের সেবা করিত।

(১০ শ্লোক)—"কেহ কখন বলপূর্ব্বক কোন স্ত্রীকে সৎপথে রক্ষা করিতে পারে না।" এবং ইহার পরেই মনু ইহার সহিত একটি তাত্ত্বিক ভাষ্য যোগ করিয়া দিয়াছেন (১২) "আপ্ত পুরুষদিগের দ্বারা গৃহে রুদ্ধা হইলেও রমণীরা অরক্ষিতা। যে আপনাকে আপনি রক্ষা করে সেই সুরক্ষিতা।" (২৬)—"গৃহদীপ্তিকারিণী নারীগণ, সন্তান উৎপাদনার্থ বহুকল্যাণভাজন ও পূজার্হ; একারণ, গৃহমধ্যে স্ত্রীতে ও শ্রীতে কোন বিশেষ নাই।" (৪৫)—"মনুষ্য, পুত্রকলত্রসহযোগে সম্পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। বিপ্রেরা বলেন, যে ভর্ত্তা সেই ভার্য্যা; তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।" (৮৯)—"ঋতুবতী হইয়াও কন্যা বরং যাবজ্জীবন গৃহে থাকিবে—ইহাও শ্রেয় তথাপি তাহাকে নির্গুণ পাত্রে সমর্পণ করিবে না।"

(১০১)—"সংক্ষেপতঃ, মরণাবধি পরস্পর অব্যভিচারাবস্থায় অবস্থান করাই স্ত্রীপুরুষের পরম ধর্ম্ম।" (১০২) "বিবাহিত স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর কোন মতে বিযুক্ত না হইয়া যাহাতে কোনরূপে ব্যভিচার না করেন, তদ্বিষয়ে সতত সাবধান থাকা কর্ত্তব্য।"

সাধারণতঃ, উত্তরাধিকারের নিয়ম অনুসারে, পরিবারের অন্তর্ভূত সকল সন্তানের মধ্যেই ধনসম্পত্তি সমানরূপে বিভাগ করা বিধেয়। কিন্তু (২০১)—"ক্লীব, পতিত, জন্মান্ধ, জন্মবধির, উন্মত্ত, জড়, মূক এবং কাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়শূন্য ব্যক্তিগণ পিত্রাদি ধনে অধিকারী নহে।" (২০২)—"ধনাধিকারীরা ঐ সকল ক্লীব প্রভৃতিকে ন্যায্য গ্রাসাচ্ছাদন দিবে; যদি না দেয়, তবে তাহারা পাপী হইবে।" (২১৩)—"যে জ্যেষ্ঠ লোভ বশতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে বঞ্চনা করে, সে জ্যেষ্ঠোচিত মানার্হ নহে—পরন্তু রাজগণ কর্ত্তৃক সে দণ্ডনীয়।" (২০০)—"ভর্ত্তার জীবদ্দশায় স্ত্রীলোক যে অলঙ্কার ধারণ করে, ভর্ত্তার মরণোত্তর পুত্রাদি দায়াদেরা স্ত্রীলোক জীবিত থাকিতে তাহা ভাগ করিতে পারিবে না; যদি করে, তবে পাপী হয়।"

এই দেখ, দ্যূতক্রীড়া সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা আছে। পাশা, বাজির খেলা, বাজি রাখিয়া মেষ কুক্কুটাদির লড়াই, এই সমস্ত নিষিদ্ধ। কি প্রকাশ্যে, কি গোপনে যাহারা জুয়া খেলে, তাহাদিগের প্রতি শারীরিক দণ্ড বিধান করা হয়; যে হেতু জুয়াখেলায় দ্বেষ, ক্রোধাদি উত্তেজিত হয়, অতএব ঐ সকল খেলা আমোদ করিয়াও খেলিতে নাই।

(২২১)—"রাজা, রাজ্য হইতে দ্যূতক্রীড়া ও সমাহ্বয় নিবারণ করিবেন। এই দুই দোষ রাজাদিগের রাজ্যনাশক।" (২২২)—"দ্যূত ও সমাহ্বয় প্রকাশ্য চৌর্য্যমাত্র; এজন্য ইহাদের নিবারণে রাজা নিত্য যত্নবান্ থাকিবেন।" (২২৫)—"কিতব অর্থাৎ দ্যূত-সমাহ্বয় কর্ত্তা, নটবৃত্তিজীবী, ক্রূরচেষ্ট, চৌরাদি, বেদবিদ্বেষী, পরধর্ম্মরত এবং শৌণ্ডিকাদিকে পুরের ভিতর বাস করিতে দিবে না।" যে সকল আধুনিক সভ্যদেশ পুরাতন সভ্যদেশের আইনাদি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কিংবা অবজ্ঞাকারী, সেই সকল আধুনিক সভ্যদেশের আইনাদির সহিত পুরাতন সভ্যদেশের আইনাদির যদি তুলনা করি এবং তাহা হইতে একটা সিদ্ধান্ত নির্ণয় করি, তাহা হইলে সে সিদ্ধান্তটি আধুনিক সভ্যদেশসমূহের পক্ষে একটু মর্ম্মভেদী হইবে সন্দেহ নাই।

নিম্নলিখিত কতকগুলি বিধিব্যবস্থা যেন বর্ত্তমান কালের বিধিব্যবস্থা বলিয়া মনে হয়। (২৩১)—"প্রাড়্বিবাকাদি রাজনিযুক্ত পুরুষেরা ধনলোভে বিকৃত হইয়া উৎকোচ গ্রহণ পূর্ব্বক যদি অর্থী-প্রত্যর্থীর কার্য্য নষ্ট করে, তবে

রাজা উহাদিগকে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত করিবেন।" এই বচনটিতে বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে ব্যক্ত হইয়াছে :—(২৩৩)—"ব্যবহার সম্বন্ধে কোন পক্ষকে সৎ বা অসৎ বলিয়া সভ্যেরা যাহাকে একবার ধার্য্য করিয়াছেন, অথবা যে দণ্ড ধার্য্য হইয়াছে তাহা ধর্ম্মতই করা হইয়াছে—এই বোধে তদ্বিষয়ের আর পুনর্ব্বার আলোচনা করিবে না।" (২৪৩)—"সাধু রাজা, মহাপাতকীর ধন কদাচ গ্রহণ করিবেন না; লোভ বশতঃ এইরূপ করিলে, ঐ মহাপাতক সংযুক্ত হইতে হয়।" (২৫৬)—"রাজা চার-পুরুষ দ্বারা প্রকাশ এবং অপ্রকাশ—পরদ্রব্যাপহারক দুই প্রকার চোর অবগত হইবেন।" (২৫৮-৬০)—"উৎকোচগ্রহণকারী, মিথ্যা ভয় প্রদর্শন করাইয়া পরধনহারী, বঞ্চনাকারী, দ্যূতক্রীড়াকারী কিতব, 'তোমার ধনপুত্র লক্ষ্মীলাভ হইবে'—এইরূপ মিথ্যাবাক্যে তোষামোদকারী—মঙ্গলাদেশবৃত্ত, ভিতরে পাপ গোপন করিয়া বাহ্যে ভদ্রবেশে পরধনহারী, যাহারা ঈক্ষণিক অর্থাৎ হস্তের রেখা দেখিয়া শুভাশুভ ফল বলিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, অশিক্ষিত মহামাত্র অর্থাৎ মাহুত ও চিকিৎসক, যাহারা শিল্পোপায়ে উৎসাহ দিয়া লোকের ধন হরণ করে, বশীকরণাদি কার্য্যনিপুণ এবং বেশ্যা-স্ত্রীলোক—ইহারা প্রকাশ্য লোককণ্টক জানিবে; ইহাদিগের এবং দ্বিজবেশ-ধারী শূদ্র প্রভৃতির বিষয় রাজা চার দ্বারা অবগত হইবেন।" নিম্নলিখিত বচনটি একটি বিবেচ্য বিষয় :—(২৮৪)—"চিকিৎসকেরা যদি মিথ্যা চিকিৎসা করে, তবে গবাদি পশু-চিকিৎসা সম্বন্ধে তাহাদের প্রথম সাহস দণ্ড এবং মানুষ-চিকিৎসা সম্বন্ধে মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে।" (৩২৪)—"রাজা এইরূপে সদা রাজধর্ম্মে যুক্ত হইয়া সমুদয় ভৃত্যদিগকে লোকের হিতার্থে নিয়োগ করিবেন।"

দুঃখ দুর্দ্দশার সময়ে প্রত্যেক বর্ণের কিরূপ কর্ত্তব্য তাহা দশম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। যে দুর্ভিক্ষে ভারত উৎসন্ন হইতেছে সেই দুর্ভিক্ষের কথা ভাবিলে, এই সকল কর্ত্তব্যের গুরুত্ব উপলব্ধি হয়। বর্ণসঙ্কর-জাত সন্তানের অবস্থা সম্বন্ধেও এই অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। (৬২)—"পুরস্কার প্রত্যাশা না করিয়া গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী এবং বালক—ইহাদের মধ্যে কাহারও বিপৎ পরিত্রাণের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করা, প্রতিলোমজ জাতির স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে।" (৬৩)—"অহিংসা, সত্যবাক্যকথন, শুচিত্ব এবং ইন্দ্রিয়সংযম—এই কয়েকটি ধর্ম্ম সর্ব্ব-সাধারণের—চাতুর্ব্বর্ণ্যের ও সংকীর্ণজাতির অনুষ্ঠেয় বলিয়া মহাত্মা মনু নির্দ্দেশ করিয়াছেন।"

(১১৭)—"ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের কদাচিৎ সুদ গ্রহণ পূর্ব্বক ঋণদান কর্ত্তব্য নহে।" ইহার টীকা করা বাহুল্য!

একাদশ অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্তাদির কথা আছে।

(৯)—"নিজের পিতা মাতা প্রভৃতি স্বজনবর্গ গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট পাইতেছে, অথচ পরকে দান করিবার বেলা যাঁহার শক্তির ত্রুটি নাই,—তাঁহার সেই দানধর্ম্ম ধর্ম্মের ছায়ামাত্র, উহা আপাতত মধুর বটে, কিন্তু উহার পরিণাম বিষময়।" (১০)—"ভরণীয়গণকে বঞ্চিত করিয়া যিনি পারলৌকিক ধর্ম্মবুদ্ধিতে যে দান করেন, তাহার অসুখকর পরিণাম তিনি জীবিতাবস্থায় এবং মৃত্যুর পরেও ভোগ করেন।"

কতকগুলি পাপকে মনু মহাপাপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সকলের উপর—ব্রহ্মহত্যা, মদ্যপান, ব্রাহ্মণের ধনাপহরণ মহাপাপ। গুরুপত্নী প্রভৃতির সহিত ব্যভিচারও মহাপাপ। অন্যায় পূর্ব্বক গুরুর অপবাদ করা, বেদের অবমাননা, মিথ্যাসাক্ষী দেওয়া, মিত্রকে বধ করা, সহোদরা গমন, অসবর্ণা স্ত্রীতে গমন, মিত্রপত্নী গমন—এই সকলও মহাপাপ। গোহত্যা, আত্মবিক্রয়, ব্যভিচার, গুরু পরিত্যাগ, পিতৃমাতৃ পরিত্যাগ, পুত্রের প্রতি অবহেলা, বালিকার ধর্ম্মনাশ, কুসীদগ্রহণ, বেতন লইয়া বেদাধ্যাপন, স্বজন পরিত্যাগ, ঋণ পরিশোধ না করা, অধর্ম্মজনক গ্রন্থাদি পাঠ করা, পরকালে অবিশ্বাস, মৃত্যুর পর দণ্ড পুরস্কারে অবিশ্বাস—এই সকল মধ্যম শ্রেণীর মহাপাপ।

গর্দ্দভ, অশ্ব, উষ্ট্র, হরিণ, হস্তী, ছাগ, মেষ, মৎস্য, সর্প ও মহিষ হত্যা করিলে অসবর্ণজাত লোকের ন্যায় পতিত হইতে হয়। কীট, পতঙ্গ, পক্ষী হত্যা করিলে, বনের ফল অপহরণ করিলে, ভীরুতা প্রদর্শন করিলে অশুচি হইতে হয়।

সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ জাতিচ্যুতি দণ্ডে দণ্ডনীয়। (৯৭)—"ব্রাহ্মণ মদ্যপানে মত্ত হইয়া অশুচি স্থানেই পড়ে—গোপনীয় বেদবাক্যই বলিয়া ফেলে, অথবা অপরাপর অকার্য্যই বা

করে,—ইহার কিছুই বলা যায় না; অতএব ব্রাহ্মণের মদ্যপান কদাপি উচিত হয় না। যাঁহার কায়গত ব্রহ্ম একবারও মদ্য দ্বারা আপ্লাবিত হয়, তাঁহার ব্রহ্মণ্য দূরীভূত হয় এবং তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।"

এই দেখ নিম্নলিখিত বচনে আত্মদোষ স্বীকার ও অনুতাপের কথা আছে। (২৩৯)—"লোক সমাজে নিজের পাপ জ্ঞাপন, পাপের জন্য অনুতাপ, তপস্যা ও অধ্যয়ন দ্বারা পাপকারী পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে এবং আপদ পক্ষে দানের দ্বারাও পাপের নিষ্কৃতি হয়।" (২৩৯)—"যাহা কিছু দুষ্কর, যাহা কিছু দুষ্প্রাপ্য, সমুদায়ই তপস্যাসাধ্য; তপস্যাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।" (২৪০)—"ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতকীরা এবং অপরাপর অকার্য্যকারীরা সুতপ্ত তপস্যা দ্বারাই সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়।" (২৪২)—"লোক সকল কায়মনোবাক্যে যে কিছু পাপ করে, তপোধনেরা তপোবলে তাহা শীঘ্র দগ্ধ করিয়া থাকেন।

দ্বাদশ অধ্যায়টি মনুসংহিতার মাথার মুকুট। এই অধ্যায়ে, আত্মার অমরত্ব, মনুষ্য পাপকর্ম্মফলে যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এবং অন্তিম মোক্ষ—এই সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি থাকা প্রযুক্ত মানুষ, আপন আপন শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ করে। ফলতঃ মনই জীবগণের সমস্ত কার্য্যের প্রবর্ত্তক—কায়মনোবাক্যের দ্বারা সেই কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। (৫)—"পরের দ্রব্য অন্যায়রূপে কি প্রকারে লইব এই চিন্তা, মনদ্বারা অনিষ্ট চিন্তা, পরলোক নাই—দেহই আত্মা,—এইরূপ বিতথ অভিনিবেশ,—এই ত্রিবিধ অশুভদায়ক মানস কর্ম্ম।" (৬)—"পরুষবাক্য; মিথ্যাবাক্য; পরোক্ষে পরের দোষ কথন; রাজার, দেশের বা পুরাদি সম্বন্ধীয় নিষ্প্রয়োজন অসম্বদ্ধ প্রলাপ—এই চতুর্ব্বিধ অশুভকর বাচিক কর্ম্ম।" (৭)—"অদত্ত-ধন গ্রহণ, অবৈধ হিংসা, পরদারসেবা—এই ত্রিবিধ শারীরিক অশুভ কর্ম্ম।" (৮)—"দেহী মানস-শুভাশুভ কর্ম্মের ফল মনদ্বারাই ভোগ করে, বাচিক কর্ম্মের ফল বাক্যের দ্বারা, এবং শরীর-কৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল, শরীর দ্বারাই ভোগ করে।" (২৪)—"সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি মহত্তত্ত্ব নামক আত্মার গুণ জানিবে। এই তিন গুণ ব্যাপ্ত থাকিয়া স্থাবর জঙ্গমরূপ তাবৎ পদার্থে অবস্থান করিতেছে।" (২৬)—"সত্ত্বে জ্ঞান লক্ষিত হয়।"

(৮৩)—"বেদাভ্যাস, তপস্যা, জ্ঞান, ইন্দ্রিয়-সংযম, অহিংসা ও গুরুসেবা—এই সকল কর্ম্ম মোক্ষসাধন। এই সকল মোক্ষসাধন কর্ম্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ; উহা সকল বিদ্যার মধ্যে প্রধান এবং উহা হইতেই মোক্ষ লাভ হয়।" (১০৩)—"অজ্ঞ লোক অপেক্ষা, গ্রন্থের অধ্যেতা শ্রেষ্ঠ, গ্রন্থের কেবলমাত্র অধ্যেতা অপেক্ষা যিনি গ্রন্থোক্ত বিষয় ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ; ধারণকারীর অপেক্ষা যাঁহার তাহাতে জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানী অপেক্ষা যিনি সেই জ্ঞানানুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ।"

(১০৪)—"তপস্যা ও আত্মজ্ঞান ব্রাহ্মণের প্রথম মোক্ষসাধন। তপস্যাদ্বারা পাপ নষ্ট হয় এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা অমৃত লাভ করা যায়।"

(১১৪)—"যাহাদের কোন ব্রত নাই—যাহাদের বেদাধ্যয়ন নাই, যাহারা জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ—এমন সহস্র সহস্র ব্যক্তি সমবেত হইলেও তাহাতে পরিষত্ব নাই জানিবে। সেই পরিষদের উপদেশ গ্রাহ্য হইতে পারে না।"

(১১৮)—"সমুদয় সদসন্ময় জগৎ—ধ্যানস্থ হইয়া—পরমাত্মাতে অবস্থিত দেখিবে। যিনি আত্মাতে সমুদয় দর্শন করেন, তাঁহার মন অধর্ম্মে কখন ধাবিত হয় না।"

(১২২)—"পশ্চাৎ সকলের শাস্তা, অণু হইতেও অণু, প্রকাশস্বরূপ, স্বপ্নধীগম্য সেই পরম পুরুষকে ধ্যান করিবে।" (১২৪)—"এই পরমাত্মাই পৃথিব্যাদি পঞ্চমূর্ত্তি দ্বারা সমুদয় প্রাণী ব্যাপিয়া, বৃদ্ধি ও নাশ দ্বারা এই সংসার প্রবর্ত্তিত করিতেছেন।" (১২৫)—"এইরূপে যিনি আত্মা দ্বারা সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করেন, তিনি সর্ব্বসমতা প্রাপ্ত হইয়া পরমপদ ব্রহ্মকে লাভ করেন।"

ইহাই মানবধর্ম্মশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত সার। এই চমৎকারজনক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ব্রাহ্মণ্যিক ভারতের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছে এবং এই গ্রন্থখানি এখনও ব্রাহ্মণ্যিক ধর্ম্মের ভিত্তিরূপে বিরাজমান। বিশ্বমানব এযাবৎ ইহা অপেক্ষা সুন্দর স্বপ্নের পূর্ণ আদর্শ কল্পনা করিতে পারে নাই। মনস্তত্ত্বের দিক্

দিয়া দেখিতে গেলে,—মনুসংহিতার ঈশ্বরের যে সুন্দর স্বরূপ লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায় সেরূপ আর কোথাও নাই; নীতির দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে,—তপস্যা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, আত্মসংযম, চিত্তশুদ্ধি, ন্যায়ধর্ম্ম, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, অনিষ্টকারীর প্রতি সাধু আচরণ, অতি অধম জীবের প্রতিও অহিংসা—এই সকল উপদেশ অতীব শ্লাঘ্য; বুদ্ধির দিক দিয়া দেখিতে গেলে, উহাতে জ্ঞানবিজ্ঞানেরই সর্ব্বপ্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। জষ্টিনিয়ানের ব্যবস্থাসংহিতা এবং যে দেওয়ানি আইনের সংহিতা অধুনা আমাদের মধ্যে প্রচলিত, উভয়ই যে "মানব-ধর্ম্মের" বচন সমূহ হইতে গৃহীত, তাহা তুলনার দ্বারা অনায়াসে সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। আমার এই গ্রন্থের যেরূপ সংকীর্ণ পরিসর, তাহাতে ঐরূপ তুলনা করিয়া দেখান আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি এখন কেবল (Burnouf) বুর্নুফ হইতে একটা অংশ উদ্ধৃত করিয়াই এই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার পরিসমাপ্তি করিব। ইহা অপেক্ষা ভাল উপসংহার আর কিছুই হইতে পারে না। বুর্নুফ্ লিখিয়াছেন:—"মনুর ব্যবস্থাগুলি যেভাবে অনুপ্রাণিত, তাহা দুইটি কথায় সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে:—দেহ শুদ্ধি ও মনঃ শুদ্ধি এবং মানুষের মধ্যে উচ্চনীচ শ্রেণী বিভাগ…মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিল, কিন্তু বর্ণভেদ প্রথা কিংবা আর্য্যধর্ম্মকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হয় নাই। ব্রাহ্মণ্যিক জাতি, মুসলমানজাতির সহিত যদি কিছু মিশিয়া থাকে—সে নিতান্তই অণুপরিমাণে। বহুকাল পূর্ব্বে, ভারতবর্ষেই সমাজসংস্কারক বৌদ্ধ ধর্ম্মের জন্ম হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম, ভারতে সাম্যবাদ প্রচার করিয়া বর্ণভেদ প্রথাকে আক্রমণ করে; লোকের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসার লাভ করিলেও, শেষ পর্য্যন্ত আপনাকে রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহার অনেক পরে, খৃষ্টধর্ম্মের একটি প্রসিদ্ধ সম্প্রদায় ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হয়। ব্রাহ্মণ্যিক ধর্ম্মের খাতিরে কতকটা নিজ মত ত্যাগ করিয়া তবে সেই সম্প্রদায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে কতকটা সফলতা লাভ করে। খৃষ্টধর্ম্ম লোকের মনঃপূত না হওয়ায়, মনুর ধর্ম্মব্যবস্থা আবার পূর্ণপ্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখনও প্রাচ্যজাতি সম্বন্ধীয় যে সকল বাধা য়ুরোপীয়দিগের পথের অন্তরায়—মনুসংহিতার প্রভূত নৈতিক বল তাহার মধ্যে একটি।"

ব্রাহ্মণ্যিক যুগের দার্শনিক সম্প্রদায় দুই বৃহৎ শ্রেণীতে বিভক্ত:—মীমাংসা ও সাংখ্য। বেদান্ত কিংবা মীমাংসাও আবার দুই উপশ্রেণীতে বিভক্ত:—উত্তর মীমাংসা ও পূর্ব্ব মীমাংসা। নামের দ্বারাই সূচিত হইতেছে—বেদান্ত এমন একটি ধর্ম্মসিদ্ধান্ত যাহা বেদ বচনের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদান্তের মতবাদ আধ্যাত্মিক।

এসিয়াটিক্ রিসার্চ গ্রন্থে, কোল্‌ব্রুক্ বলেন:—"বেদে যে সকল উপদেশ আছে, সেই সকল উপদেশের প্রামাণিকতা ও বলবত্তা স্থাপন ও বেদব্যাখ্যার নিয়ম নির্দ্ধারণ এবং সেই সকল নিয়ম হইতে যাহাতে একটা যুক্তিশাস্ত্র গঠিত হইতে পারে তাহার চেষ্টা—ইহাই মীমাংসা দর্শনের লক্ষ্য। বেদ যে গুহ্য ধর্ম্মের শিক্ষা দেয় সেই গুহ্য ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করা, একটা অসম্ভব পূর্ণ রকমের অবস্থায় উপনীত হইবার জন্য সেই ধর্ম্মের সাধনা করা, ঈশ্বরের সহিত যোগ নিবদ্ধ করা—ইহাই বেদান্ত দর্শনের চরম লক্ষ্য।

পরব্রহ্মের অতীন্দ্রিয় একতা হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া বেদান্ত, ক্লীবলিঙ্গ শব্দবাচক ব্রহ্মের কল্পনায় উপনীত হইয়াছে। এই ব্রহ্ম পরিপূর্ণ, নির্ব্বিকার, নিত্য, নিরুপাধি,—সুতরাং সৃষ্ট জীবদিগের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। বৈদান্তিকেরা ব্রহ্মের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে:—"তিনি একমাত্র আত্মা, স্বয়ম্ভূ, জ্ঞান স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ; তিনি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, তুমি আমি, তিনি—এইরূপ আমিত্ববিহীন,—নির্ব্বিশেষ।"

এইরূপ অবস্থায়, ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশে আত্মপ্রকাশার্থ আপনাকে সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইলেন; তখন তিনি অনন্ত সত্তা হইতে নিঃসৃত হইয়া, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মারূপে আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু ক্লীবলিঙ্গ ব্রহ্ম হইতে পুংলিঙ্গ ব্রহ্মা কিরূপে উৎপন্ন হইল? বৈদান্তিক সম্প্রদায়, মায়াতত্ত্বের অবতারণা করিয়া এই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন। মায়া, অথবা জড়প্রকৃতি; মায়া অর্থে পরিমাণ বুঝায়—আকাশ বুঝায়। তাহার অনেক পরে, প্লেটো এই মতবাদকেই পরিপুষ্ট করিয়া ইহাকে Topos নামে অভিহিত করিলেন, Topos, কিনা—বিশ্ব-জননী, হ্রাসবৃদ্ধির মহতী সম্ভাবনা। বিশ্বের আত্মা পরব্রহ্মই জীবনের মূল-উৎস;—সেই একমাত্র উৎস যাহা হইতে

সমস্ত নিঃসৃত হয় এবং যাঁহাতে সমস্ত পুনর্ব্বার প্রবেশ করে; তিনি সেই জ্ঞান স্বরূপ, যাহার কণামাত্র জ্ঞান জ্ঞানবিশিষ্ট জীবের "আমি" কিংবা অহঙ্কার। সেই জ্ঞান হইতেই, জীবের নিজত্ব, জীবের আমিত্ব; সুতরাং এই আমিত্ব হইতেই জীবশ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছে। ফলত, মায়ার দ্বারাই—মায়াময় জড়প্রকৃতির দ্বারাই—পুংলিঙ্গ ব্রহ্মা, অসীমসত্তা ক্লীবলিঙ্গ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। পরমাত্মা, ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন; জ্ঞানতত্ত্বের বিষয়ীভূত মনঃ পরমাত্মারই একটা বিশেষ আকার এবং এই মন হইতেই জ্ঞানবিশিষ্ট জীবের আমিত্ব উৎপন্ন;—সুতরাং সমস্ত জীব ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন। জীবে যে পরিমাণে জ্ঞানের বিকাশ হয়, জীব যে পরিমাণে স্বীয় বুদ্ধির প্রয়োগ করিতে পারে, সেই পরিমাণে জীব ব্রহ্মার নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে। এই জীব শ্রেণীর মতবাদ হইতেই জাতির উৎপত্তিবাদ প্রসূত; মনুর প্রথম অধ্যায়ে এই উৎপত্তিবাদের কথা আছে, ইহার অনেক পরে ডারুইন আবার সেই তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। মনুতে আছে:—"প্রত্যেক জীব পূর্ব্ববর্ত্তী জীব হইতে গুণ প্রাপ্ত হয়; এবং জীব-পর্য্যায়ে যে জীব যে পরিমাণে পরবর্ত্তী, সে তত অধিক গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

বেদের ভাষ্য সমূহে যে সকল বচন আছে সেই সকলের সমন্বয় বিধান করা এবং তাহাদের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা ইহাই পূর্ব্ব-মীমাংসার উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু মীমাংসা প্রধানত, কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের সংগ্রহ মাত্র; ইহাতে বিশুদ্ধ ও ব্যবহারিক যুক্তিশাস্ত্রের আলোচনা, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের আলোচনা, ভাষার উৎপত্তি ও চিন্তার সহিত তাহার সম্বন্ধ বিষয়ক আলোচনা থাকা সত্ত্বেও, যে সকল ভ্রম কূটধর্ম্মবিচারের স্বাভাবিক সহচর, মীমাংসা সেইরূপ ভ্রমের ভূরি ভূরি অবতারণা করিয়া একটা কৃত্রিম শাস্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছিল। ইহার ফলে একটা প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়।

এই প্রতিক্রিয়া—কপিলের সাংখ্যে, অর্থাৎ যুক্তিবিচার-মূলক ও জড়বাদমূলক দর্শনশাস্ত্রে প্রকটিত হইয়াছে। যাহাই হউক, বাণীর (logos) নিত্যতা অর্থাৎ চিন্তার ব্যঞ্জনার নিত্যতা প্রতিপাদন করিয়া মীমাংসা আপনাকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। কপিল মুনি, বেদ ঈশ্বরের মুখ-নিঃসৃত বাক্য এই সিদ্ধান্তটি যুক্তিসিদ্ধ নহে বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া, ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তা হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। সাংখ্যের মতে, প্রকৃতি নিত্য; এই আদিম মূল-বস্তু হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; এবং এই প্রকৃতির মধ্যে যে একটি অতীন্দ্রিয় মূলতত্ত্ব আছে সেই মূলতত্ত্ব হইতে আত্মার উৎপত্তি। সাংখ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন এবং অস্তিত্ববাদকে নিম্নলিখিত উভয়সঙ্কট-সমস্যার মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছেন:—"ঈশ্বরের যদি বাসনা না থাকিত তাহা হইলে তিনি কখনই জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিতেন না, সুতরাং জগৎ সৃষ্টি করিবার তাঁহার সামর্থ্য থাকিত না; পক্ষান্তরে যদি তাঁহার বাসনা ছিল এরূপ হয় তবে তাঁহার সামর্থ্য ছিল না; আবার, যদি তাঁহার সামর্থ্য ছিল এরূপ হয়, তবে তাঁহার বাসনা ছিল না।" সাংখ্য বলেন,—যাহা নাস্তি তাহা অস্তি হইতে পারে না, এবং যাহা অস্তি তাহার অস্তিত্বের কখনই অবসান হইতে পারে না। অতএব, এমন একটি অপরিবর্ত্তনীয় নির্ব্বিকার মূলতত্ত্ব আছে যাহা হইতে সমুদয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহা স্বয়ং ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। এই তত্ত্বটিই—সেই "মূলহীন মূল" প্রকৃতি। এই প্রকৃতিই সকল পদার্থের নিত্য কারণ, এবং এই প্রকৃতির মধ্যেই "সমস্ত পদার্থের সম্ভাবিতা ও সমস্ত শক্তি" অবরুদ্ধ। ইহার প্রতিযোগী—সজ্ঞান ও সচেতন মূলতত্ত্ব—পুরুষ। কপিলের মতে, পুরুষই বিজ্ঞানের প্রকৃত বিষয়; এবং জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ আত্মজ্ঞানে উপনীত হইতে পারে; এবং স্বকীয় উৎপত্তি ও নিয়তির বিষয় অবগত হইতে পারে। পুণ্য অনুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়নের দ্বারাই পুনর্জ্জন্ম হইতে নিষ্কৃতি এবং ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চিরশান্তি লাভ করা যাইতে পারে,—ইহাই বেদান্তের শিক্ষা।

ইহার বিপরীতে কপিল বলেন,—যিনি আত্মাকে জানেন, যিনি আপনার উৎপত্তি ও নিয়তির বিষয় অবগত আছেন, একমাত্র তিনিই জ্ঞানী ও ধর্ম্মিষ্ঠ। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগেই অশুভের উৎপত্তি, এবং পুরুষ জ্ঞানের দ্বারাই প্রকৃতির দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। পরীক্ষার দ্বারা জানা যায়—মানসিক ব্যাপার সকল যে পুরুষের উপর প্রকটিত হয়—সেই পুরুষ অবিনশ্বর

এবং তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন; অতএব, পুরুষ ও প্রকৃতি—দুইটি স্বতন্ত্র তত্ব একই অধিকার-সূত্রে জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে। সার কথা—কপিলের দর্শন, সমস্ত আপ্ত বাক্য পরিত্যাগ করিয়া, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়বোধের বিষয় সমূহ হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে। যাহা নাস্তি তাহা অস্তি হইতে পারে না, এবং যাহা অস্তি তাহা কখনই নাস্তি হইতে পারে না—এই স্বতঃসিদ্ধ মূলসূত্রটি হইতে সাংখ্যদর্শন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, প্রকৃতিও নিত্য, পুরুষও নিত্য; এই পুরুষ হইতেই জীবাত্মা উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং জীবাত্মা অমর। আমরা পরে দেখাইব,—সাংখ্য দর্শনের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ যোগ। Lassen ও Burnouf-এর মতে, কপিলের সাংখ্য হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে; কেবল প্রভেদ এই—কপিলের মতটি দার্শনিক সিদ্ধান্ত,—কেবল পণ্ডিতদিগেরই অধিগম্য; পক্ষান্তরে, শাক্যমুনির মতবাদটি সকল মনুষ্যেরই বোধগম্য, এবং এই জন্যই উহা ধর্ম্মনামে অভিহিত হইয়াছে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কপিলের পরবর্ত্তী দার্শনিক পাতঞ্জল, কপিলের দর্শন অবলম্বন করিয়া তাঁহারই সিদ্ধান্তকে আরও একটু বেশী দূর লইয়া গিয়া, যুক্তি পরম্পরাক্রমে, একজন অদ্বিতীয় নিত্য ক্লীবলিঙ্গ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ইহাই দ্বিতীয় সাংখ্য দর্শন। ফলত, যদি একটি বিশ্বজনীন মূল সত্তারূপ প্রকৃতিকে স্বীকার করা যায়, যাহা হইতে এই সমস্ত জড়জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয়,—একটি বিশ্বজনীন আত্মাও আছে যাহা হইতে এই সমস্ত জীবাত্মা প্রসূত হইয়াছে এবং এই সকল জীবাত্মা সেই পরমাত্মারই বিশেষ বিশেষ রূপ মাত্র। পুরুষ ও প্রকৃতির যোগেই জীবাত্মা উৎপন্ন হয়, এবং প্রকৃতি—সমস্ত সত্তার একটা সূক্ষ্ম অবস্থা মাত্র। কেবল জীবাত্মাই জগতের সার উপাদান এবং সেই জীবাত্মাতেই সত্য ও পূর্ণতা বিদ্যমান। পক্ষান্তরে, জীবাত্মা,—পরমাত্মারই একটা বিশেষ রূপ মাত্র; অতএব, সেই পরম-পুরুষ পরমাত্মার একটি সর্ব্বাদিম রূপ অবশ্যই আছে—যাহা ক্লীবলিঙ্গবাচক, যাহা নিত্য, যাহা একমাত্র;—তিনিই ঈশ্বর।

এই সাংখ্যদর্শনের সহিত যোগবাদ যুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই যোগবাদ—আধ্যাত্মিক ও গুহ্যধর্ম্মাশ্রিত। এই যোগ-শব্দের দ্বারাই যোগবাদের তাৎপর্য্য স্পষ্টরূপে সূচিত হইতেছে। ঈশ্বরের সহিত সম্মিলনই আধ্যাত্মিক যোগ। হিন্দু দর্শন ও হিন্দু নীতিবাদের ইহাই উচ্চতম অভিব্যক্তি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবদ্গীতাতে এই দর্শনেরই শিক্ষা দিয়াছেন। ভগবদ্গীতা,—মহাকাব্য মহাভারতেরই একটি অঙ্গ। ভারতবর্ষে ভগবদ্গীতার এতই আদর ও গৌরব—এই ভগবদ্গীতার মতবাদটি এক প্রকার ধর্ম্মমতে পরিণত হইয়াছে; ইহাই কৃষ্ণধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের শিষ্যেরা যোগী নামে খ্যাত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মরণজয়ী প্রেম।

(বর্ম্মা গল্প)

আমি আজ পাঠকদিগকে ব্রহ্মদেশের একটি গল্প উপহার দিব। গল্পটি অতিপ্রাকৃত হইলেও মূল্যহীন নহে। ব্রহ্মদেশে ইহা বড় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

কোথাও ইহা কাষ্ঠফলকে খোদিত—কোথায়ও প্রস্তরে। ব্রহ্মের যে সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান—রেঙ্গুনের কণ্ঠলগ্ন "সোয়ে ডা গৌন্" বৌদ্ধমঠ, তাহাতেও ইহা রক্ষিত হইয়াছে। আবার নাট্যশালায়ও ইহা অভিনীত হইয়া থাকে। আমি যতদূর জানি তাহাতে দেখিয়াছি গল্পটি সমস্ত ব্রহ্মবাসীই অবগত। তবে কোন কোন জেলায় ইহার আকারের কিছু পরিবর্ত্তন আশ্চর্য্য নহে।

গল্পটি ব্রহ্মকুমারীর ভাবী বিবাহিত জীবনের আদর্শ—তাই ইহার এত আদর।

ব্রহ্মবালিকা তাহার দশ বৎসর বয়সে "কর্ণবেধ" উৎসব সম্পন্ন করিয়া বসিয়াছে—মাথার চুল আর নিয়ম করিয়া কাটা হয় না—বাড়িতে দেওয়া হইয়াছে। অবশেষে যখন তাহার বয়স চৌদ্দ বৎসর, তখন হঠাৎ একদিন দেখা গেল—তাহার সেই অনতিদীর্ঘ ঘনকৃষ্ণকুন্তলদাম বেণীবদ্ধ হইয়া কুণ্ডলাকারে শিরোপরি রক্ষিত!—বুঝিলাম তখন তাহার—

"শৈশব যৌবন দুঁহু মিলি গেল।"

এই সময়ে তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিল, এবং নানারূপ সুখকল্পনায় একটি প্রস্ফুট কদম্বকুসুমের মত সে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন তাহার প্রেম-জীবনের আদর্শ—গল্পটির কেন্দ্রস্থল—পবিত্র ভালবাসা।

অবশ্য ব্যাবহারিক জীবনে ব্রহ্মবাসিনীর বিবাহিত জীবন যে ঠিক এই আদর্শেই সব স্থানে চলিয়া থাকে—তাহা নহে। কিন্তু তাই বলিয়া আদর্শের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় কি?

তা যা হৌক. এখন গল্প বলি। চাউছে গ্রামের (এখন সহর) একটি বালিকা "মা সোয়ে-উ" প্রতিবাসী বালক "কো সোয়ে-মং"কে বড় ভালবাসে। অবশ্য বালকও তাহাকে তাহা অপেক্ষা কম ভালবাসে না। এমন কি তাহাদের হৃদয়ের ব্রতই হইল এই যে, জীবনে মরণে দুই জনের প্রেমকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে।

যৌবনে দাঁড়াইয়া দুই জনের বিবাহের কথা আসিল। কিন্তু অর্থ না হইলে জীবন চলিবে কিরূপে? তাই বিবাহের পূর্ব্বেই অর্থোপার্জ্জনের জন্য কো সোয়ে-মং নিম্ন ব্রহ্মে কাঠের ব্যবসা করিতে গেলেন। বৎসরের মধ্যে তাঁহার ফিরিবার কথা রহিল। কিন্তু যখন ব্রহ্মের পীযূষরূপা "ইরাবতী" প্রাণপ্রিয়কে লইয়া দ্রুত সাগরের দিকে ছুটিল, তখন মা সোয়ে-উর মনে কেমন যেন একটু অসহায়ের মত ভাব আসিল—যেন মনে হইতে লাগিল প্রিয়ের দৈহিক ছবি দেখার এই বুঝি শেষ। তাহার বক্ষপিঞ্জর ভিন্ন করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ইরাবতীর তটতরু-আন্দোলিত বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া গেল। চোখের পতনোন্মুখ অশ্রুবিন্দু সান্ধ্য অন্ধকারে কেহ দেখিতে পাইল না!

এক বৎসর কাটিল। দুই বৎসরও যায়। কো সোয়ে মংএর ফিরিবার কোন লক্ষণ নাই। মা সোয়ে-উ সারাদিন চরকায় নিযুক্ত থাকে। আর প্রত্যেক দিন প্রভাতে মনে করে—তাহার প্রাণপ্রিয় সেই দিন আসিবে। কিন্তু দিন চলিয়া যায়, প্রাণপ্রিয় ত আসে না!

এদিকে সমস্ত ব্রহ্মের উপরে মাসোয়ে-উর সৌন্দর্য্যখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যৌবনের রূপ-লাবণ্যে তাহার স্বভাব-সুন্দর দেহটুকু ভরপূর। কত দেশ দেশান্তর হইতে তাহার পাণিগ্রহণের নিমিত্ত লোক আসিল। কিন্তু মা সোয়ে-উর হৃদয়ব্রত অটল। কেহ তাহা টলাইতে পারিল না।

চাউছে পাহাড়ের দেশ। কত ছোট বড় পাহাড়ে চাউছেকে রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। সন্ধ্যা হইয়া আসে;—সেই সব পাহাড়ের উপরে দিনান্তের মধুর হাসি দেবশিশুর মত নৃত্য করিয়া চলিয়া যায়। মা সোয়ে-উ আপনার অন্তরে কেমন একটু ভীতিবিভীষিকা লইয়া সেই সব দেখিতে দেখিতে তাহাদের উপরে ঘুরিয়া বেড়ায়।

একদিন একটি পাহাড়ের দেবতা (নাট্=নাথ (?)=প্রভু =দেবতা, অপদেবতা প্রভৃতি) মা সোয়ে-উর সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া সুন্দর যুবকের বেশে চাউছে আসিয়া উপস্থিত। অন্যান্য বিবাহার্থীর মত তিনিও মাসোয়েউকে টলাইতে পারিলেন না। তাঁহার সমস্ত প্রণয়বাণী, মূল্যবান দান-সামগ্রী এবং এমন কি তাঁহার দৈবী মায়াও বিফল হইয়া গেল। একদিন দেবতাটি আপনার মানসিক বলে ঠিক পাইলেন—কো সোয়ে মং বাড়ী ফিরিতেছেন, কিন্তু দেবতাটি তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবেন না। কারণ কোসোয়ে মংএর কর্ম্মফল তাঁহার জীবনচক্র অন্যভাবে ঘুরাইয়া দিয়াছে, কোন দেবতার বলই তাহার নিজের মতে ফিরাইতে পারে না!

ভাবিয়া চিন্তিয়া পাগলের মত আবার তিনি মা সোয়ে-উর কাছে উপস্থিত। রমণী যে তাঁহার হইবে না—একথা কিন্তু দেবতার মানসিক বল একবারও পরীক্ষা করিল না। মা সোয়ে-উর কর্ম্মফল যেমন ছিল—কার্য্যও তেমনি হইতে লাগিল। দেবতাটি এবারও কত অনুনয় বিনয় করিলেন, মা সোয়ে-উ অটল। কতরূপ ভয় দেখান হইল, কিন্তু ভয় কিসের?—মৃত্যুর? সে ত অবশ্যম্ভাবী। মা সোয়ে-উ সেজন্য ভীত নহে। তাই সে নিতান্ত নির্ব্বিকার চিত্তে চরকার কাযে নিযুক্ত রহিল। দেবতাটি আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। সহসা তিনি ক্রোধে ব্যাঘ্রের মূর্ত্তি ধরিলেন এবং শেষে মা সোয়ে-উকে মুখে লইয়া সুদূর পাহাড়ে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থান সময়ে মৃতের বুক স্থানে স্থানে প্রস্তরে ঘর্ষিত হইয়া রক্ত পড়িতে পড়িতে গেল। প্রেমের কি আশ্চর্য্য শক্তি! সেই সব রক্তবিন্দু হইতে সুগন্ধি-পীত "ইয়েন্‌গা" (ইয়েন্—বুক, গা—আঘাত) কুসুম উৎপন্ন হইয়া উঠিল। আজও চাউছের কত পাহাড় পর্ব্বত সেই ইয়েন্‌গা কুসুমে পরিপূর্ণ!

সেই মৃত্যু-রাত্রেই আবার কো সোয়ে মং অনেক দিন পরে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। তাঁহার নৌকার পাল বাতাস পাইয়া আনন্দে ফুলিয়া উঠিতেছিল। অপরাহ্নের বাতাস সূর্য্যের ম্লানায়মান তরল কিরণ-মাখা আকাশের উপর দিয়া ছুটিয়া আসিতেছিল—সে কি মধুর! নৌকা-প্রতিহত তরঙ্গবীচির কল-কোলাহলে কত রকম হর্ষচিন্তা কো সোয়ে মংএর মনে আনিয়া দিতেছিল। তাঁহার দৃষ্টি বাহিরে আবদ্ধ থাকিলেও মন কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া অন্যত্র উড়িয়া গিয়াছে! কোথায়? ঐ যে পাহাড়ের কোলে নিদ্রিত শিশুর মত চাউছে গ্রাম শোভা পাইতেছে, ঐখানে কো সোয়ে মংএর মন উপস্থিত। তিনি দেখিতেছেন—গ্রামবৃদ্ধেরা একটি বাড়ীতে মিলিয়াছেন। চারিদিকে দীপের আলো রাত্রিকে মধুর করিয়া তুলিয়াছে। "তানেখা"র (একরকম গন্ধদ্রব্য—বৃক্ষবল্কল বিশেষ) গন্ধ, ফুলের গন্ধ, চুরুটের গন্ধ মিশিয়া এক অপূর্ব্ব গন্ধপুরী সৃষ্টি করিয়াছে। সেইখানে কো সোয়ে মংএর করতল আর একখানি গৌর সুগোল করতলের উপরে ন্যস্ত—বিবাহের জল পড়িবে পড়িবে!—এমন সময় ঐযে মঙ্গল-বাঁশী বাজিয়া উঠিল!—বাঁশী? কই, বাঁশী ত নহে। যেন কতকগুলি রৌপ্যঘণ্টানিনাদ জল-কোলাহলের সঙ্গে মিশিয়া আসিল। কো সোয়ে মং চমকিয়া উঠিলেন। কই, সে মধুর স্বপ্নদৃশ্য কই? সব ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল! তিনি দেখিলেন, তাঁহার নৌকা পূর্ব্বমত তীরবেগে ছুটিতেছে। দুই তটের সান্ধ্য অন্ধকার হাত বাড়াইয়া নদীটাকে জড়াইয়া ধরিতেছে! আকাশে তারা ফুটিতেছে, দূরে কোলাহল থামিয়া যাইতেছে!

কিন্তু ও আবার কি? শূন্যে সঙ্গীত হয় কোথায়? পাখীরা বুঝি ডাকিয়া যাইতেছে! কিন্তু না, এ সঙ্গীত যে একস্থান হইতেই উত্থিত! ঢালু আকাশের উপর দিয়া তবে কি ইহা তারকার মুখ হইতে গড়াইয়া পড়িতেছে? কি আশ্চর্য্য! শুনিতে শুনিতে নদীর শাদা জল অন্ধকারে মিশিয়া গেল—তটতরুশ্রেণী অন্ধকারে একটা বৃহৎ কালো রজ্জুর মত দেখাইতে লাগিল।

আবার ওকি আশ্চর্য্য! একটা জমাট কুজ্ঝটিকা রাত্রির অন্ধকারে নৌকার উপরে আসিয়া বসিল। কুজ্ঝটিকা? না, না,—এযে মূর্ত্তি! কো সোয়ে মং ধরিতে গেলেন, শূন্য মুষ্টির মধ্যে হা-হা করিয়া উঠিল! কিন্তু মূর্ত্তি ত অপহৃত হয় নাই।—এ কি রকম? আবার তাহার চারিদিকে জোনাকীর মত কতকগুলা জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি!

তারপর কুজ্ঝটিকাবৎ মূর্ত্তিটা হাত উঠাইল—তাহার মুখখানা যে মা সোয়ে-উর মত!—বলিল, "এস"। আর নাই। সে জোনাকীর মত—সে কুজ্ঝটিকার মত মূর্ত্তি কোথায়? সব অন্তর্হিত। শুধু অভিনব একটা গন্ধে সে স্থানটি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।—সেটা ইয়েন্‌গা কুসুমের গন্ধ।

কো সোয়ে মং বুঝিলেন—মা সোয়ে-উ আর মর্ত্ত্যজীবনে নাই। তাঁহার মুখের একটি কথা "প্রিয়ে যাই" আর দীর্ঘনিশ্বাস নৌকার অন্যান্য আরোহীরা শুনিতে পাইল—তারপর সহসা তাহারা দেখিল তাঁহার জীবনশূন্য দেহটি নৌকার উপরে লুণ্ঠিত হইতেছে।

*　　*　　*　　*　　*

সেই দিন হইতে কত পথভ্রান্ত পথিক দেখিতে পাইয়াছে—রাত্রির অন্ধকারে, চাউছের পাহাড়ে, ইয়েন্‌গা-পুষ্পবিকীর্ণ পথে দেবদেহী দুইটি যুবক ও যুবতী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! এবং তখনি মা সোয়ে-উ ও কো সোয়ে মংএর মরণজয়ী প্রেমের কথা তাহাদের মনে পড়িয়াছে।

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী।

জাপানে স্ত্রী-শিক্ষা।

অপরাপর প্রাচ্য দেশসমূহের রমণীগণের অবস্থা হইতে জাপানের নারী-সমাজের অবস্থার গুরুতর পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। জাপানের সহস্র বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাসেও, ভারতবর্ষের গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতির ন্যায় তীক্ষ্ণধীশক্তিসম্পন্না সুবিখ্যাতা রমণীর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। জাপানী বীরের পার্শ্বে জাপানী রমণীকেও সমর-ক্রীড়ানিরতা দেখা গিয়াছে। বহুতর স্ত্রী-কবি, ঔপন্যাসিক ও শিল্পী জাপানের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়া আছেন। জাপানের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিপ্রবর লিখিয়া গিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী

মধ্যে যখন জাপান দেশে চীন ভাষা পঠিত এবং জনসাধারণে প্রচারিত হইত, তখন জাপানের জাতীয় নবীন সাহিত্য প্রকৃত পক্ষে নারীহস্তেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেই সময়েই "জেন্‌জি-মনোগাতারি" (Genji-monogatari)-গ্রন্থকর্ত্রী মুরাসকি শিকিবু (Murasaki Shikibu), "মাকুরা-নো-শশি" (Makura-no-soshi)-রচয়িত্রী শিসোনাগোন (Shishonagon) প্রভৃতি লেখিকা দেশীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিতা হইয়াছিলেন। টোকুগাওয়া—(Tokugawa)—শাসন কালের শেষভাগে কামাই সোকিন, হারা সাইহিন্, ইয়েমা সাইবেন, চো কোরান প্রভৃতি বহুতর জাপানী রমণী চীন ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করতঃ সুপ্রসিদ্ধা হইয়া উঠেন। এই সময়ে রেন্‌জেতমু, সিও, বোটানি প্রভৃতি স্ত্রী-কবিরও আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং এই সময় হইতে জাপ-সম্রাটের হস্তে দেশের শাসন-ক্ষমতা পুনঃ ন্যস্ত হওয়ায় পূর্ব্ব সময় মধ্যে অনেকানেক জাপানীরমণী স্বদেশপ্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

পাশ্চাত্য জাতিসমূহের রমণীগণের অনুরূপ স্বাধীনতা না থাকিলেও জাপ-রমণীগণ সামাজিক নানা স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া আসিতেছেন। এবং তদ্ধেতু জাপানের ইতিহাসে সময় সময় সর্ব্বগুণসম্পন্না রমণীমূর্ত্তির আবির্ভাব দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; বর্ত্তমান সময়েও এরূপ দৃশ্য একেবারে বিরল নহে। চীন ও শ্যাম দেশের বিদ্যালয় সমূহে জাপরমণী শিক্ষয়িত্রী নিযুক্তা হইয়া থাকেন এবং অপর একজন জাপানী বিদুষী মঙ্গোলিয়ার জনৈক দেশীয় সরদার কর্ত্তৃক গৃহ-শিক্ষয়িত্রীরূপে অভ্যর্থিতা হইয়াছেন।

যাহা হোক্ জাপানে স্ত্রী-শিক্ষা সর্ব্বদাই এক কঠিন সমস্যারূপে বিবেচিত হয়। স্বভাবতই বিষয়টি অতি গুরুতর এবং সহসা কোনরূপ সন্তোষ-জনক মীমাংসায় উপনীত হওয়া সুদুষ্কর। তথাপি ইয়ুরোপীয়দিগের ন্যায় জাপানীরাও বিষয়টিকে অত্যধিক প্রাধান্য দিয়া থাকেন এবং বর্ত্তমান শাসনপ্রথার প্রারম্ভ সময় হইতে একাল পর্য্যন্ত তাঁহারা এবিষয়ের উৎকৃষ্টতর সাধন-প্রণালী উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কতিপয় জাপ-বালিকা বিদ্যাশিক্ষার্থে আমেরিকায় প্রেরিতা হন; তাহাদের একজন এক্ষণে য়্যাড্‌মিরাল উরিউর (Admiral Uriu) পত্নী। ইঁহার নাম বিগত রুষ-জাপান যুদ্ধের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত প্রেরিতা বালিকাদের আর একজন—বর্ত্তমান মারশিয়নেস্ ওয়্যামা;—জাপানের সাধারণ বিভাগের সর্ব্বে সর্ব্বা মারশাল মারকুইস্ ওয়ামার ভার্য্যা। যাহা হোক্ আমরা এক্ষণে জাপানের সরকারী বিবরণ অবলম্বনে তথাকার স্ত্রী-শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় আলোচনা করিতেছি।

জাপানে প্রাথমিক শিক্ষা বহুবিস্তৃত; এমন একটী পল্লীও দেখা যায় না, যথায় সরকারী ব্যয়ে চালিত অন্ততঃ একটী বিদ্যালয় নাই। কারণাধীনে কথঞ্চিৎ অব্যাহতি পাইলেও প্রধানতঃ প্রত্যেক শিশুই নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে যাইতে বাধ্য। প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ দুইভাগে বিভক্ত;—সাধারণ বা নিম্নপ্রাথমিক এবং উচ্চপ্রাথমিক স্কুল। চারি বৎসর ও তদূর্দ্ধকালের শিশুকে নিম্ন প্রাথমিক স্কুলে চারি বৎসর এবং নয় বৎসরের বালিকাদিগকে উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে অধ্যয়ন করিতে হয়। শেষোক্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের কাল নির্দ্দিষ্ট নাই; কারণ তথায় কএক বৎসর অধ্যয়ন করার পর বালিকাগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর বিভাগে প্রবেশের অধিকারিণী হইতে পারে। কিন্তু নিম্নপ্রাথমিক স্কুলে শিশু বালক বালিকার চারি বৎসর অধ্যয়ন করাই রাজ-বিধি-নির্দ্দিষ্ট।

এই সকল প্রাথমিক স্কুলসমূহে প্রবেশ সময়ে বিভিন্ন বালকবালিকাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য আচরিত না হইলেও শিক্ষাবিতরণের সৌকর্য্যার্থে তাহাদিগকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। ১৯০১-০২ অব্দে কেবল জাপানী সহরের প্রাথমিক স্কুলসমূহে ৩,৮৭৬,৪৯৫টী বালক; ৩, ৫৯০, ৩৯১টী বালিকা, মোট ৭,৪৬৬, ৮৮৬টী শিশু অধ্যয়ন করে। এতন্মধ্যে নিম্নপ্রাথমিক শ্রেণীতে ১,৭১৪,৫০৯টী বালক এবং ১,৬৩২,০১৮টী বালিকা, মোট ৩,৩৪৬,৫২৭টী ছিল; এবং ১,৪৬২,৯৭৭টি বালক ও ৯১১,-৪২২টী বালিকা, মোট ২,৩৭৪,৩৯৯টী বালকবালিকা এই শ্রেণীর শিক্ষা সমাপ্ত করে। পক্ষান্তরে সরকারী উচ্চ প্রাথমিক স্কুলসমূহে ৭০৫,২৩৮টী বালক; ২৩,৯৫৫টী বালিকা, মোট ৯৩৬,১৯৩টী এবং বে-সরকারী বিদ্যালয়

সমূহে ৪,২৬৮টী বালক ও ৩,৪৩৭টী বালিকা, মোট ৭,৭০৫টী ছাত্র বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং উচ্চশ্রেণীতে সর্ব্বসুদ্ধ ৭০৯,৫০৬টী বালক এবং ২৩৪,৩৯২টী বালিকা, মোট ৯৪৩,-৮৯৮টী ছাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বড় বড় সহরে কিণ্ডার গার্টেন ধরণের বহুতর বিদ্যালয় আছে; এবং দেশের জনসাধারণ উহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করায় দিন দিনই উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এই সকল বিদ্যালয়ে নিম্ন প্রাথমিক স্কুলের অনুরূপ তিন-বৎসর বয়সের বালক বালিকা হইতে বেশি বয়সের ছাত্র ছাত্রী গৃহীত হয় এবং অন্যান্য বিষয়ের সহিত ব্যায়াম, সংগীত, কথোপকথন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্ত-শিল্প বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

আলোচ্য বর্ষে জাপানে ১৮২টী সরকারী এবং ৭২টী বে-সরকারী কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয় ছিল; সরকারী স্কুল সমূহে ১০,৩২৭টী বালক ও ৮,৯৭২টী বালিকা মোট ১৯,২৯৯ জন এবং বে-সরকারী বিদ্যালয় সমূহে ২,২৩৫টী বালক, ২,১৩৭টী বালিকা মোট ৪,৩৭২ জন ছাত্র ছাত্রী শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর বালকবালিকাদের বিভিন্নতর শিক্ষাকার্য্য আরব্ধ হয়। বালিকাদিগের নিমিত্ত পৃথক উচ্চ বিদ্যালয় এবং উচ্চ নর্ম্যাল স্কুলসমূহ বিদ্যমান আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে পাঠার্থী বালিকাদিগের সংখ্যা বালকদিগের তুলনায় কম বটে, কিন্তু তাহার প্রথম কারণ রমণীগণের স্বাভাবিক প্রকৃতি ও সামাজিক অবস্থা এবং দ্বিতীয় কারণ বিদ্যালয়সমূহে অধিকতর পাঠার্থিনীর স্থানাভাব। বালক বালিকাদের পাঠ্য এবং শিক্ষাদান-প্রণালীও এক নহে। এতৎ বিষয়ের প্রত্যেক বিবরণ প্রদান করিতে হইলে পাঠকবৃন্দের ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা বিধায় সাধারণতঃ জাপানে কি ভাবে রমণীদিগের শিক্ষা-ব্যাপার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহারই স্থূল বিবরণ প্রদান করিতে চেষ্টা পাইব। জাপানের শিক্ষা-বিভাগের মন্ত্রী স্বীয় রিপোর্টে লিখিয়াছেন,—

"রমণীগণের উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের পূর্ণকাল চারি বৎসর, কিন্তু স্থানীয় অবস্থানুসারে ইহার এক বৎসর কমানোও যাইতে পারে, আবার স্থলবিশেষে বাড়ানোও যাইতে পারে। সাধারণ পাঠ্য ছাড়া, আরো দুই বৎসর কাল শিক্ষার্থিনীর প্রবৃত্তি অনুযায়ী কোন বিশেষ শিল্প-কার্য্য শিক্ষার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে; সাধারণ শ্রেণী ব্যতীত বিশেষ শিল্পশ্রেণী প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে। এই শ্রেণীতে দুই বৎসর হইতে চারি বৎসর কাল শিক্ষা করিতে হইবে। যে সকল গ্রাজুয়েট কোনো বিশেষ বিভাগে ব্যুৎপন্ন হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের উপকারের নিমিত্ত দুই তিন বৎসরের 'বিশেষ বিভাগও খোলা যাইতে পারে।"

উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হইলে,—বয়স অন্যূন দ্বাদশবর্ষ এবং তৎপূর্ব্বে প্রাথমিক স্কুলের উচ্চ বিভাগের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর শিক্ষা শেষ করা চাই। ১৯০১-২ অব্দে জাপানে রমণীগণের নিমিত্ত ৬১টী সরকারী এবং ৮টী বে-সরকারী মোট ৬৯টী উচ্চ বিদ্যালয় ছিল; সরকারী স্কুলে ১৪,৯৭৫ জন, বে-সরকারী স্কুলে ২,২৪০ জন, মোট ১৭,২১৫ জন রমণী শিক্ষাপ্রাপ্ত হইত। ঐ বৎসর রমণী গ্রাজুয়েটের সংখ্যা;—সরকারী স্কুলের ২,৭৭৮টী, বে-সরকারী বিদ্যালয় সমূহের ৮১২টী, মোট ৩,৫৯০টী ছিল।

রমণী-উচ্চ-বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা এই;—নীতি শিক্ষা, জাপানী-ভাষা শিক্ষা, বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা; ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্র, বিজ্ঞান, চিত্রাঙ্কণ, গৃহস্থালীর কার্য্য-শিক্ষা, দরজির কার্য্য-শিক্ষা; সংগীত এবং ব্যায়ামচর্চ্চা করিতে হয়। যে স্থলে পাঠের নির্দ্দিষ্টকাল কথঞ্চিৎ কম করা হয়, সে স্থলে বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা পরিত্যক্ত হয়। বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা অর্থে জাপানে কেবল ইংরেজি বা ফরাসী ভাষা শিক্ষাই বুঝায়। প্রত্যেক স্কুলেই বৈদেশিক ভাষা-শিক্ষা—ইচ্ছাধীন পাঠ্য (optional course) রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে এবং যে সকল রমণীর স্বভাব কলাশিক্ষার অনুপযোগী বোধ হইবে, তাহাদিগের পক্ষে সংগীত-শাস্ত্রের আলোচনাও নিষিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত 'পণ্ডিতী' এবং 'শিল্পী' শ্রেণী আছে;—তাহাও ইচ্ছাধীন রূপে পরিগণিত।

টোকিও সহরে বালিকাদের নিমিত্ত একটী (Higher Normal School for women) কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। এই কলেজে উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবং প্রাদেশিক নর্ম্যাল

স্কুলসমূহের নিমিত্ত শিক্ষয়িত্রী তৈয়ারি করা হয়। কলেজে তিনটী শ্রেণী আছে; সাহিত্যশ্রেণী, বিজ্ঞানশ্রেণী এবং শিল্প-শ্রেণী। প্রথম শ্রেণীতে নিম্নলিখিত বিষয় শিক্ষা করিতে হয়;—নীতি-শাস্ত্র (Ethics), শিক্ষাদানবিদ্যা, জাপানী সাহিত্য, চীনভাষা, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল, সংগীত এবং ব্যায়াম। দ্বিতীয় বিভাগে, জাপানী ও চীন সাহিত্য এবং ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষা করিতে হয় না। তৎপরিবর্ত্তে অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, এবং জীব-বিদ্যা প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতে হয়। তৃতীয় শ্রেণীতে অঙ্কশাস্ত্র এবং জীব-বিজ্ঞান ব্যতীত দ্বিতীয় শ্রেণীর সকল বিষয়ই শিক্ষা করিতে হয়, অধিকন্তু দুইটীর পরিবর্ত্তে সাতটী নূতন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ আবশ্যক হয়, যথা,—গৃহস্থালীর সুবন্দোবস্তপ্রণালী, কাপড় কাটা ও সেলাই, হস্ত দ্বারা ছোট ছোট শিল্পকর্ম্ম, চিত্র অঙ্কন ও উদ্ভাবন (drawings এবং designs) প্রণালী। জাপানী-ভাষার সহিত চীন-সাহিত্য শিক্ষার উদ্দেশ্য—লিপি-চাতুর্য্য লাভ করা। গৃহস্থালীর সুবন্দোবস্ত প্রণালী দুই বিভাগে বিভক্ত;—এক বিভাগে শুদ্ধ গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয় এবং অপর বিভাগে 'পারিবারিক-শিক্ষা-দানের' বিষয় উপদিষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত কলেজে আরো কতিপয় স্বতন্ত্র বিভাগ আছে;—যথা পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শ্রেণী; ইহাতে দুই বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়। স্বমনোনীত পাঠ্যশ্রেণী;—উচ্চ বিদ্যালয়ের নিরূপিত পাঠ্য শেষের পর প্রত্যেক ছাত্রীই স্ব স্ব ইচ্ছামত পাঠ্যশ্রেণী নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে পারে। এই বিভাগে চারি বৎসরেরও অধিককাল অধ্যয়ন করিতে হয়। কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের উপযোগী শিক্ষয়িত্রী তৈয়ারি শ্রেণী এবং বিশেষ শ্রেণী নামে অপর দুইটী বিভাগ আছে, ইহার প্রতিবিভাগে একবৎসর কাল পাঠ করিতে হয়। কলেজের প্রত্যেক প্রধান তিন শ্রেণীর শিক্ষাদান কার্য্য সমাপ্ত করিতে চারি বৎসরেরও ঊর্দ্ধকাল করিয়া প্রয়োজন হয়। আলোচ্য বর্ষে উক্ত কলেজে ৩১১টী ছাত্রী এবং ৮৬ জন গ্রাজুয়েট ছিল। মিস্ ইয়াসুই এই কলেজের একজন উত্তীর্ণ শিক্ষয়িত্রী; তিনি ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। অল্প দিন হইল শ্যাম দেশের রাণীর আহ্বানে তথাকার বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীরূপে ইয়াসুই শ্যামদেশে গমন করিয়াছেন। এই স্কুলের সহিত উচ্চ-বালিকা-বিদ্যালয়ও সংযুক্ত আছে এবং তথাকার শিক্ষায় কাল অন্যান্য বালিকা-বিদ্যালয় অপেক্ষা এক বৎসর বেশী অর্থাৎ পাঁচ বৎসর।

পূর্ব্বোক্ত কলেজের অধীনে একটী উচ্চ বালিকা-বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত আছে। স্ত্রী-শিক্ষার সাধারণপ্রণালী শিক্ষা এবং অপরাপর ব্যবহারিক শিক্ষাদানই এই বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। আলোচ্য বর্ষে স্কুলে ৪১৬টী ছাত্রী ছিল। এতদ্ব্যতীত একটী প্রাথমিকস্কুলও কলেজের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। ইহাও ঐ একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়া থাকে। এই স্কুলে তিনটী বিভাগ আছে, এবং প্রত্যেক বিভাগে দুই হইতে চারি বৎসর অধ্যয়নকালরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ৪৯২টী, তন্মধ্যে ১০৮টী ছাত্র এবং ৩৮২টী ছাত্রী। কলেজের অধীন অপর একটী কিণ্ডারগার্টেন স্কুলও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

জাপানের নানাস্থানে রমণী-শিক্ষয়িত্রী তৈয়ারীর নিমিত্ত বিশেষ নর্ম্ম্যাল স্কুলসমূহ বর্ত্তমান আছে। বালকদিগের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত নর্ম্মাল স্কুলেও বালিকাদিগের নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র বিভাগ থাকে। জাপ-সাম্রাজ্ঞীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একটী বালিকা-বিদ্যালয় আছে; ইহা রাজপরিবারের মন্ত্রী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে; রাজ্যের শিক্ষাবিভাগের সাধারণ মন্ত্রীর এই বিদ্যালয়ে কোনরূপ ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার নাই। এই স্কুলের নাম—পিয়ারেস্ স্কুল (Peeress School); অপরাপর সম্ভ্রান্ত পরিবারের বালিকাদিগের প্রবেশাধিকার সঙ্কুচিত না হইলেও সর্ব্বপ্রথম উচ্চ পরিবারের (noble family) বালিকাদিগকেই স্থান দান করা হয়। শেষোক্ত শ্রেণীর বালিকাদের স্থান সংকুলান হওয়ার পরও যদি অতিরিক্ত স্থান থাকে, তবেই প্রথমোক্ত শ্রেণীর বালিকারা এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে। ইহার অধীনেও একটী কিণ্ডার গার্টেন শ্রেণী আছে।

শিক্ষা-বিভাগের মন্ত্রীর অধীনে টোকিওতে একটী সংগীতসমিতি (Music Academy) আছে। ইহার পাঁচটী শ্রেণী বিভাগ আছে;—(১) প্রাথমিক, (২) মূল, (৩) পোষ্ট গ্রাজুয়েট, (৪) নর্ম্মাল এবং (৫) মনোনীত। বালক বালিকা উভয় শ্রেণীর ছাত্রই ইহাতে প্রবেশের

অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জাপানী-শিক্ষক ব্যতীত সমিতিতে পাঁচটী বৈদেশিক শিক্ষক নিযুক্ত আছেন; তাহার দুইজন জর্ম্মান দেশীয়, একজন আমেরিকা-বাসী, একজন রুশীয় এবং একজন ফরাসী।

জাপানে বে-সরকারী ব্যক্তিদের স্থাপিত যত প্রকার বালিকা বিদ্যালয় আছে, তাহার সকল গুলির বিবরণ প্রদান করা অসম্ভব। তাহাদের সংখ্যাও যেমন বিপুল, প্রত্যেকের কার্য্যপ্রণালীও তেমনই স্বতন্ত্র। নিম্নে এই শ্রেণীর প্রধান কতিপয় বিদ্যালয়ের পরিচয় প্রদত্ত হইল।

টোকিওর Jiogakkwan বিদ্যালয়ের কার্য্যকারিতা অতি প্রশংসনীয়। বৈদেশিক উদার 'মিশন' বিভাগের কতিপয় সদাশয় বৈদেশিকের চেষ্টায় এই বিদ্যালয় প্রথম উৎপত্তি লাভ করিলেও তথায় ধর্ম্ম শিক্ষা বিষয়ে কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম ছিল না; কেবল উচ্চশ্রেণীর জাপ-বালিকাগণের এগ্লো-স্যাক্সন্ শিক্ষা দীক্ষায় অভ্যস্ত করাই বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। প্রখ্যাতনামা বহুতর ব্যক্তি দ্বারা এই প্রণালী সমর্থিত হইয়াছে এবং দেশীয় ও বিদেশীয় অসংখ্য ব্যক্তি শিক্ষা-ফণ্ডে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। রাজপরিবার হইতেও বিশেষ সাহায্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। ১৯০৩ অব্দের অক্টোবর মাসে এই বিদ্যালয়ে ছাত্রীর সংখ্যা ২৩০ জন ছিল।

টোকিওনগরে 'রমণী বিশ্ববিদ্যালয়' নামে (Women's University) একটী রমণী কলেজও প্রতিষ্ঠিত আছে। পুরুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় এই বিদ্যালয়ের নামকরণ অনুপযুক্ত হইলেও ইহাতে অসংখ্য রমণী শিক্ষার্থীর সমাবেশ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে ইহার ছাত্রীর সংখ্যা এক সহস্রেরও অধিক।

এতদ্ব্যতীত জাপানের নানা স্থানে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন, চিত্র-শিক্ষা, শিল্প-শিক্ষা, এমন কি ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য শিক্ষার নিমিত্তও রমণীগণের পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। জাপানে রমণীচিকিৎসকের—যাহারা সাধারণ ভাবে ডাক্তারী ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে, সংখ্যা প্রচুর না হইলেও জাপানের সরকারী পরীক্ষাতেও রমণী উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

বৈদেশিক 'মিশন' হইতে টোকিও, ইয়োকোহামা, নাগোয়া, ওসাকা, কোবা, কিওটো প্রভৃতি স্থানে বহুতর বে-সরকারী বালিকা বিদ্যালয় আছে, এবং উহাদের অনেকের দ্বারাই দেশের রমণীসমাজের প্রভূত উপকার সাধন হইয়া থাকে। এক টোকিও নগরে সর্ব্বশ্রেণীর মোট ৭৩টী বালিকাবিদ্যালয় আছে। পূর্ব্বের উল্লিখিত স্কুলসমূহও এই গণনায় অন্তর্ভুক্ত এবং ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার ও 'সেবিকা' (nursing) তৈয়ারির স্কুলগুলিও এই তালিকায় মধ্যে গণিত হইয়াছে।

রমণীগণের কার্য্য সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলা প্রয়োজন। জাপানে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই। জাপ-বালিকারা বিবাহের পর স্বামী গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া প্রধানতঃ গৃহকার্য্যেই মনোনিবেশ করে এবং সৎস্ত্রী এবং জননী হইবার নিমিত্ত একান্ত চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু এতৎসত্বেও তুলার কাপড়ের কল, রেশমী কাপড়ের কল, কাগজের কল, প্রভৃতি কারখানায় বহুতর জাপ-রমণী শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। সরকারী কার্য্যালয়সমূহে নিযুক্তা রমণীর সংখ্যা অধিক নহে। তবে তাহারা প্রভূত পরিমাণে বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। যাহারা কম সৌভাগ্যশালিনী এবং উচ্চশিক্ষা হইতে বঞ্চিতা তাহারা ডাক ও টেলিফোন বিভাগ এবং রেলওয়ের নানা বিভাগে নিযুক্তা হইয়া থাকে। নানা বেসরকারী কোম্পানীর কার্য্যালয়ে পরীক্ষাধীনভাবে রমণী কেরাণী নিযুক্ত করা হইতেছে; সুখের বিষয় তাহাদের দ্বারা কায উত্তমরূপেই নির্ব্বাহিত হইতেছে। ইহা হইতে আশা করা যায়, জাপ-রমণীরা নিজেদের ধী-শক্তির পরিচয় দিয়া ক্রমে ক্রমে প্রশস্ততর ক্ষেত্রে উপনীতা হইবেন।

এ স্থলে রমণীদের দ্বারা চালিত ও তাহাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত কতিপয় কার্য্যের উল্লেখ না করিয়া নিরস্ত হইতে পারিলাম না। টোকিওতে এরূপ কুড়িটী সমিতি আছে। তথাকার দাতব্য হাঁসপাতাল জাপ-সাম্রাজ্ঞীর প্রত্যক্ষ যত্নাধীন এবং জাপ-রাজকুমারী আরিসুগাওয়া (Princess Arisugawa) হাঁসপাতালকমিটীর প্রধান সভ্য; 'জাপান রমণী-শিক্ষা সমিতির' (Japanese Ladies' Educational Society) সভাপতি জাপ-রাজকুমারী কানিন্ (Prieess Kanin);

'পীড়িত শুশ্রূষার বিশেষ সমিতি' (Special socicty for Nursing the sick) স্বয়ং সাম্রাজ্ঞীর আজ্ঞাধীন; এতদ্ব্যতীত রেড্ ক্রস্ সোসাইটী, জাপানী রমণীদের 'স্বাস্থ্য বিষয়ক সমিতি,' পিতৃমাতৃহীনা বালিকা সমিতি,' রাজ বিচারে দণ্ড প্রাপ্তা 'রমণী অপরাধিনীগণের শিশুসন্তান রক্ষা সমিতি' এবম্প্রকার অপর কতিপয় সাধারণ সমিতির কার্য্য জাপানের সুপ্রসিদ্ধ বংশসম্ভূতা রমণীবৃন্দের অধিনায়কত্বে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ সমিতির অবস্থাই প্রশংসনীয়। ইংলণ্ডের মিস্ পার্কারের তত্বাবধানে একটী 'রমণী দাতব্য-শিল্প-সমিতি' বর্ত্তমান আছে। এতদ্ব্যতীত এবংপ্রকার বহুতর জনহিতকর সমিতি জাপানের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত জাপ-রমণীকুলের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া আসিতেছে।

পাশ্চাত্য প্রদেশ সমুহের ভগিনীদের মানসিক শক্তির সহিত তুলনা করিলে জাপ-রমণীরা নিকৃষ্টা হইবে না, সমান স্থানই অধিকার করিবে বলিয়া বিশ্বাস। অবশ্য এখনই বলা যায় না, ভবিষ্যতে জাপ-রমণী সমাজের কোন্ স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু একটা বিষয় ঠিক যে বালকদের শিক্ষালয় বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বালিকাদের শিক্ষালয় সমূহও এমনি বহুবিস্তৃতি লাভ করিয়াছে যে, জাপানের প্রাচীন ইতিহাসে কুত্রাপি তাহার তুল্য দৃষ্টান্ত পাওয়া ভার। জাপ-রমণীগণের বিদ্যার্জ্জন-স্পৃহা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা সকল দিন দিন এতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে যে, তাহার তুলনায় তাহাদের স্পৃহা ও আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির উপায়সমূহ অতি অল্পই বিবেচিত হইয়া থাকে।*

স্ত্রী-শিক্ষা ব্যতীত সমাজ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবার আশা নাই—ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই জাপানে স্ত্রী-শিক্ষার এই বিপুল আয়োজন আরব্ধ হইয়াছে। জাপান-সম্বন্ধে যাহা প্রযোজ্য সকল দেশ সম্বন্ধেই একরূপ সেই ব্যবস্থাই অনুসৃত হইতে পারে। কেবল বালকদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই, দেশের প্রতি—তথা সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য শেষ হইল না। সুখের বিষয় আমাদের দেশেও এক্ষণে অনেকের নিকট স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ হইয়াছে, কিন্তু এখনও তদুদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কোনরূপ প্রকৃষ্টতর পন্থা অবলম্বিত হয় নাই। জাপান যেমন নিজের সত্তা বজায় রাখিয়া—নিজের যাহা ভাল তাহা রক্ষা করিয়া, পাশ্চাত্য দেশবাসীর মহৎ গুণের অনুসরণ করিয়াছিল, আমরাও যদি তদ্রূপ করিতে পারি, তবেই আমাদের দেশের কল্যাণ হইবে, নচেৎ নহে।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

* Japan by the Japanese দ্রষ্টব্য।

বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা।

বিগত মাঘমাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত "বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা" প্রবন্ধ সম্বন্ধে কোটচাঁদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপদ দাস, গত আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে যাহা প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতেছি। আমি উক্ত প্রবন্ধে যে সকল বিষয় লিখিয়াছি, তাহার কয়েকটী বিষয়ে আমার সহিত তাঁহার মতৈক্য হয় নাই। সন ১৩১৪ সালের ২০শে ও ২৩শে কার্ত্তিকের দৈনিক হিতবাদীতে প্রথমে আমি উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। গত ৩রা অগ্রহায়ণের হিতবাদীতে কালীপদ বাবু প্রথম প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদর্শিত ভ্রমগুলির প্রতিবাদ গত ২৪শে ফাল্গুনের বসুমতীতে প্রকাশ করিয়াছিলাম। বোধ করি তাহা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। সে কারণ তিনি গত আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে পুনরায় প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার অবগতির জন্য পুনরায় উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে আরও কিছু লিখিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি ইহা পাঠ করিয়া কালীপদ বাবু আমার সহিত সহজে একমত হইতে পারিবেন।

কালীপদ বাবু লিখিয়াছেন, "১ একবিঘা জমিতে ৮০০/০ আট শত মণ ইক্ষু হওয়া আমরা সম্ভবপর মনে করি না।" আমার প্রবন্ধে পশ্চিমাঞ্চলের মাপের বিষয় লেখা আছে। বোধ করি, তিনি ত্রিহুতাঞ্চলের জমির মাপের বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত না থাকায় প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রবন্ধে স্পষ্ট লেখা আছে, "পশ্চিমাঞ্চলের মাপের ৪০০/০ চারিশত বিঘা জমি আবশ্যক।" উক্ত চারিশত বিঘা জমি আমাদের অর্থাৎ বঙ্গদেশের ১ একহাজার ৫৬১/২ বিঘা জমির সমান। অর্থাৎ পশ্চিমাঞ্চলের ১ বিঘা জমি আমাদের দেশের ২৷৷১৮/০ জমির সমান। কারণ আমাদের দেশে চারি হাতের মাপ; (৪ হাত×৮০ হাত=১ এক কাঠা)। পশ্চিমাঞ্চলে ৬১/২ হাতের মাপ; (৬১/২ হাত×১৩০ হাত=১ এক কাঠা)। সামান্য দৃষ্টিতে কেবল দুই অঞ্চলের মাপ দেখিয়া, হিসাবানভিজ্ঞ সাধারণ লোকে অনুমান করিতে পারেন যে পশ্চিমাঞ্চলের ৪০০/০ চারিশত বিঘা জমি আমাদের দেশের ৬৫০/০ বিঘা জমির সমান। কিন্তু যাঁহাদের জমির ক্ষেত্রফল সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, তাঁহারা পশ্চিমাঞ্চলের ৪০০/০ চারিশত বিঘা জমি বঙ্গদেশের ১ একহাজার ৫৬১/২ বিঘা জমির সমান—ইহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সাধারণের অবগতির জন্য দুই অঞ্চলের জমির ক্ষেত্রফল নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

পশ্চিমাঞ্চলে ৬১/২ হাতে কাঠা।

∴ ,, ১ বিঘা জমি=(৬১/২×২০)(৬১/২×২০)=১৩০×১৩০ =১৬৯০০ বর্গ হাত।

বঙ্গদেশে ৪ হাতে কাঠা।

∴ „ ১ বিঘা জমি $=(৪\times২০)(৪\times২০)=৮০\times৮০$
$=৬৪০০$ বর্গহাত।

∴ পশ্চিমাঞ্চলের ১ বিঘা জমি $=\frac{১৬৯০০}{৬৪০০}=২\frac{৪১}{৬৪}=২৷২৶০$
বঙ্গদেশের জমির সমান।

∴ „ ৪০০ চারিশত বিঘা জমি $=\frac{১৬৯০০}{৬৪০০}\times৪০০=১০৫৬\frac{১}{৪}$
বঙ্গদেশের বিঘা।

আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইক্ষু আবাদ করিলে কালীপদ বাবুর হিসাবানুযায়ী যদ্যপি বিঘাপ্রতি ৩৫০/০ মণ ইক্ষু হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে পশ্চিমাঞ্চলের বিঘা প্রতি ৯২০/০ মণ ইক্ষু হওয়ার আশা করা যায়। কিন্তু বিঘাপ্রতি ৩৫০/০ মণ ইক্ষু উৎপন্ন না হইয়া ৩০০/০ মণ হিসাবে উৎপন্ন হইলেও পশ্চিমাঞ্চলের ১ বিঘা জমিতে ৭৯২/০ মণ ইক্ষু হওয়া অসম্ভব মনে করি না। আমি বিশ্বস্তসূত্রে ইহাও অবগত আছি যে, পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকেরা সাধারণ নিয়মে চাষ করিয়াও কখন কখন বিঘাপ্রতি ৮০০/০ আট শত মণ ইক্ষু পাইয়া থাকে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবাদ করিলে উহারা আরও বেশী ফল লাভ করিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? এবং যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত হিসাবে বিঘাপ্রতি ৮০০/০ আট শত মণ ইক্ষু হওয়া অসম্ভব না হয় তাহা হইলে তৎতৎ বিঘাপ্রতি ৫০/০ মণ চিনি (ও ৫০/মণ সিরা বা ছোয়া) উৎপন্ন হওয়া কোন ক্রমেই আশ্চর্য্য নহে। এবং উৎপন্ন চিনি যদি ৭৲ সাত টাকা মণ দরে বিক্রয় হয় তাহা হইলে আমার আয় ব্যয়ের তালিকায় যেরূপ লাভের বিষয় লেখা আছে—তাহা অত্যধিক বলিয়া অনুমিত হইবে না।

আমি প্রবন্ধে যেরূপ কলকারখানার প্রস্তাব করিয়াছি তাহার আনুমানিক মূল্যতালিকা পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

যন্ত্রের নাম	আনুমানিক মূল্য।
১। ভ্যাকুয়াম প্যান	১৫০০৲
২। ইঞ্জিন ১৬ হর্ষপাওয়ার (কেবল প্যান চালাইবার জন্য)	২৫০০৲
৩। ইঞ্জিন ৩০ বা ৪০ হর্ষপাওয়ার তুরপিন, মাড়াই কল, ও জুসপাম্প চালাইবার জন্য	৩৫০০৲
৪। বড় বয়েলার দুইটা (উপরি উক্ত দুইটী ইঞ্জিন ও প্যানের ষ্টীমের জন্য)	১২০০০৲
৫। Multiple Effect Evaporator রস মোটা করিবার কল	৩৫০০৲
৬। তুরপিন ৩টা প্রত্যেক ২০০০৲ হিঃ ...	৬০০০৲
৭। Crushing Plant (মাড়াইকল) ...	২৫০০৲
৮। Tanks (ট্যাঙ্কি) রসের জন্য ১০টা, মোলাসেসের জন্য ৫টা, জলের জন্য ৩টা — একুনে ১৮টা ...	১৫০০৲
৯। ব্যাগফিলটার (ছাকনি কল)	২০০০৲
১০। Water Pump...	১০০০৲
	৩৬০০০৲

উপরি উক্ত মূল্যের যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যহ ১০০/০ একশত মণ আন্দাজ চিনি তৈয়ারি হইতে পারে। অবশ্য একটা ফ্যাক্টরী স্থাপন করিতে হইলে, কারখানার ঘর তৈয়ারি করিবার খরচ, যন্ত্রাদি আনাইবার ও বসাইবার খরচ ও যোড়তাড় করিবার জন্য পাইপ কর্ক, রবার ইত্যাদির খরচ ইক্ষু চাষের উপযোগী নবাবিষ্কৃত যন্ত্রাদির খরচ এবং চাষের উপযোগী বলদ ও জমির মূল্য ইত্যাদি আনুষঙ্গিক ব্যয় অপরিহার্য্য। সুতরাং আমি যে ক্ষুদ্র ফ্যাক্টরীর কথা লিখিয়াছি তাহা স্থাপন করিতে হইলেও অন্ততঃ দেড় লক্ষ টাকা মূলধন আবশ্যক। অতএব যে ফ্যাক্টরীর কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য আমাদের দেশের মাপের এক হাজার সওয়া হাজার বিঘা জমি আবাদ করিতে হইবে এবং পূর্ব্বোক্ত মূলধন ব্যয় করিতে হইবে তাহা হইতে বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা আয়—তত দুরাশা বলিয়া বোধ হয় না। বরং সুচারু বন্দোবস্তে উহা অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক হইবার সম্ভাবনা।

কালীপদ বাবু লিখিয়াছেন, "আমরা যতদূর অবগত আছি তাহাতে বলিতে পারি যে, রস হইতে ভ্যাকুয়াম্ প্যানে চিনি তৈয়ারি করিলে তাহা স্বতঃই সাদা হয়; কোন জিনিষ দিয়া পরিষ্কার করিতে হয় না।" তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু ইক্ষুরস ভ্যাকুয়াম্ প্যানে পাকান হইবার পূর্ব্বেই হাড়ের কয়লার ফিল্‌টার দ্বারা পরিষ্কৃত হয়। ঐ রস ফিল্‌টারের গুণেই সাদা হয় উহাতে লালচে রং কিছুমাত্র থাকে না। পরে ঐ পরিষ্কৃত রস ভ্যাকুয়াম্ প্যানে পাকান হইলে স্বভাবতঃই শুভ্রতর চিনিতে পরিণত হয়। অতএব হাড়ের কয়লার ফিল্‌টার ও ভ্যাকুয়াম্ প্যান উভয়ের গুণেই ইক্ষুরস হইতে সাদা চিনি পাওয়া যায়। কিন্তু ইক্ষুরস হাড়ের কয়লার ফিল্‌টার দ্বারা পরিষ্কৃত না হইয়া কেবলমাত্র ভ্যাকুয়াম্ প্যানে পাকান হইলেই কালী বাবুর মতানুসারে শুভ্র চিনি পাওয়া যাইবে—ইহা আমি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। দ্বিতীয় কথা—বিশুদ্ধ ভাবে চিনি প্রস্তুত করিতে হইলে হাড়ের কয়লার ফিল্‌টারের ন্যায় অস্পৃশ্য পদার্থ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য সুতরাং তাহার অভাব মোচনের জন্য আমাদের দেশীয় প্রথামতে শেওলা দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

আমি শেওলা দ্বারা চিনি রিফাইন করা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, সম্ভবতঃ কালীপদ বাবু তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় উক্ত প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছেন। শেওলা রসে দিলে কোন কার্য্য হয় না। ভ্যাকুয়াম্ প্যানে পাকান হইয়া তুরপিন হইতে যে চিনি বাহির হইবে তাহাতেই আমাদের দেশীয় প্রথা মতে শেওলা ব্যবহার করিতে হইবে। তাহা হইলে হাড়ের কয়লার ফিল্‌টারের পরিবর্ত্তে শেওলার সাহায্যেই সুন্দর পরিষ্কৃত চিনি পাওয়া যাইবে। তুরপিন হইতে যে চিনি বাহির হয় তাহা তৎকালে দেখিতে শুভ্র হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহার স্থায়িত্বগুণ কম। উহাকে স্থায়িত্বগুণবিশিষ্ট বা পাকা চিনি করিবার উদ্দেশ্যেই শেওলা ব্যবহার করিবার আবশ্যকতা।

শ্রীকেদারনাথ দাস।
গুসকরা, বর্দ্ধমান।

একডালা-দুর্গ।

যে যুগ বাঙ্গালার ইতিহাসের "স্বাধীন পাঠান শাসন-যুগ" নামে কথিত হইয়া আসিতেছে, তাহার অনেক ঐতিহাসিক তথ্য এখনও তমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তজ্জন্য কত কাল্পনিক কাহিনী ইতিহাস বলিয়া পরিচিত হইতেছে, তাহার আলোচনা করিতে বসিলে, বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

বঙ্গভূমি রত্নপ্রসবিনী বলিয়া জগদ্বিখ্যাত ছিল। তাহার জন্যই বক্তিয়ার খিলিজি এদেশে খিলিজিদিগের উপনিবেশ সংস্থাপনের আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা স্বাধীন চেষ্টা। তাহা দিল্লীর বাদশাহের দিগ্বিজয় বলিয়া কথিত হইতে পারে না। শিষ্টাচার রক্ষার্থ বক্তিয়ার খিলিজি সময়ে সময়ে দিল্লীর বাদশাহের নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করিলেও তাঁহাকে লক্ষণাবতীরাজ্যের রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিতেন কি না, তাহাতে সংশয়ের অভাব নাই। কিন্তু বক্তিয়ার খিলিজির আকস্মিক অকাল মৃত্যুর অব্যবহিত পরে খিলিজিদিগের মধ্যে প্রাধান্য লাভের জন্য যে গৃহকলহের সূত্রপাত হয়, তাহাতেই দিল্লীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠালাভ করে। স্বার্থান্ধ হইয়া কেহ কেহ দিল্লীর বাদশাহের শরণাপন্ন হইয়া, তাঁহার প্রতিনিধিরূপে লক্ষণাবতীরাজ্যে প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করেন। প্রজা সাধারণ,—কি হিন্দু, কি মুসলমান,—তাহাতে সম্মত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তখন এ দেশে সামন্তপ্রথা পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। সামন্তগণ স্বাধীন নরপতির ন্যায় স্বাধিকার মধ্যে স্বাধীন ভাবেই শাসনক্ষমতা পরিচালিত করিতেন। বক্তিয়ার খিলিজি সেই সামন্তপ্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কোন কোন স্থলে হিন্দুসামন্তের পরিবর্ত্তে মুসলমান জায়গীরদার সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি সকল স্থান জয় করিতে না পারিয়া, যতদূর জয় করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা লইয়াই রাজ্য গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। উত্তর বঙ্গের সামন্তগণ স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ছিলেন,—তাঁহারা শক্তিশালী বলিয়াও পরিচিত ছিলেন। বক্তিয়ার খিলিজির সময় হইতে তাঁহারা পুনঃপুনঃ আক্রমণবেগ সহ্য করিয়া প্রকারান্তরে স্বাধীন ভাবেই রাজ্য শাসন করিতেন।* তাঁহাদের জন্যই বক্তিয়ার খিলিজিকে নিয়ত দেবকোটের সেনা নিবাসে কাল যাপন করিতে হইত। এই স্বাতন্ত্র্যলিপ্সা হিন্দু সামন্তগণের ন্যায় মুসলমান জায়গীরদারগণকেও অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহারা লক্ষণাবতীরাজ্যের সুলতান হইবার জন্য চেষ্টা করিলেও, দিল্লীর বাদশাহের অধীন বলিয়া পরিচয় দিতে স্বীকৃত হইতেন না। কালে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে স্বার্থসমন্বয় সংস্থাপিত হইলে, এই স্বাতন্ত্র্যলিপ্সা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তখন গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য বাঙ্গালী মাত্রেই বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। অবশেষে ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে হাজি সামসুদ্দীন ইলিয়াসের চেষ্টায় গৌড়ীয় সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা লাভ করে। তাহা সহজে সাধিত হয় নাই। দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ পাণ্ডুয়ার রাজধানী আক্রমণ করিয়া, হাজি ইলিয়াসের পুত্রকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন;—হাজি ইলিয়াসকে একডালার দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন;—অবশেষে একডালার নিকটবর্ত্তী উন্মুক্ত প্রান্তরে এক লক্ষ বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান জীবন বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিল! *

একডালার যুদ্ধক্ষেত্র বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের চিরস্মরণীয় বিজয় ক্ষেত্র। বাঙ্গালী মাত্রেই স্বাধীন পাঠান শাসনের কথা অবগত আছেন, কোন কোন গৌড়ীয় বাদশাহের নাম এখনও অনেকের নিকট সুপরিচিত। কিন্তু যে বিজয়ক্ষেত্রে এই স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তাহার নাম পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর নিকট অপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে!

একডালা-দুর্গ কোথায় ছিল, বাঙ্গালী তাহার তথ্য নির্ণয়ের জন্য যথাযোগ্য আগ্রহ প্রকাশিত করে নাই। ইংরাজ লেখকগণ তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া, নানা তর্ক বিতর্কের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। তাহা যেরূপ বিস্ময়াবহ, সেইরূপ হাস্যোদ্দীপক! অথচ তাহাই ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া পরিচিত হইয়া রহিয়াছে।

দিনাজপুরের কালেক্টর মিষ্টার ওয়েষ্টমেকট লিখিয়াছিলেন—একডালা দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত।†

* The Rajas of Northern Bengal were powerful enough to preserve a semi-independence, in spite of the numerous invasions from the time of Bakhtyar Khilji. —Professor Blochmann, J. A. S. B., 1873.

* বারণী-বিরচিত "তারিখ-ই-ফিরোজশাহী" গ্রন্থে লিখিত আছে Firuz Shah laid seige to the Fort of Ekdala for several days, and nothing decisive occurring, made a feint retreating movement westward seven *kosh* from Ekdala when Ilyas Shah, thinking Firuz Shah was retreating, came out of the fort Ekdala, advanced and attacked the Imperialists, who defeated and killed one *lak* of the Bengal army.

† J. A. S. B., Vol. XLIII, p. 244.

উত্তর বঙ্গের অনেক স্থানেই পুরাতন সামন্তগণের এবং জায়গীরদারগণের রাজদুর্গের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারই একটি স্থান লক্ষ্য করিয়া,—সে স্থান স্বয়ং পরিদর্শন না করিয়াই,—মিষ্টার ওয়েষ্টমেকট একডালা দুর্গের স্থান নির্ণয় করিয়া গিয়াছিলেন। তাহাই কিছু দিন পর্য্যন্ত একডালা দুর্গের প্রকৃত স্থান বলিয়া ইংরাজ লেখক-সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছিল।

প্রসিদ্ধ মুদ্রাতত্ত্ববিৎ মিষ্টার টমাস্ পুনর্ভবানদীতীরবর্ত্তী জগদলা নামক স্থানকে একডালা বলিয়া ইঙ্গিত করিয়া যে তর্কবিতর্কের সূত্রপাত করিয়া যান, অধ্যাপক ব্লকম্যান তাহার অলীকত্ব প্রতিপাদিত করিয়া লিখিয়াছিলেন,—একডালা দুর্গ পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী বলিয়া মুসলমানলিখিত ইতিহাসে সুস্পষ্ট উল্লিখিত থাকিলেও, অদ্যাপি তাহার স্থান নির্ণয়ে সংশয় রহিয়া গিয়াছে।* অতঃপর মিষ্টার ওয়েষ্টমেকট পাণ্ডুয়ার ২৩ মাইল দূরে একডালার স্থান নির্ণয় করায়, ইংরাজলেখকগণ তাহাকেই প্রকৃত স্থান বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরে মিষ্টার বিভারিজ এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তাহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—একডালা ঢাকাজেলার অন্তর্গত।† এপর্য্যন্ত ইহার অধিক আর কোনও আলোচনা মুদ্রিত হয় নাই। কিরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া মিষ্টার বিভারিজ এই সিদ্ধান্ত প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল। বলা বাহুল্য, একডালাদুর্গ পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী বলিয়া মুসলমান লিখিত ইতিহাসে যে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সহিত মিষ্টার বিভারিজের সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য রক্ষা করা অসম্ভব। তিনি নিজেও তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বলেন,—এ বিষয়ের প্রথম লেখক দিল্লী নিবাসী জিয়াউদ্দীন বারণী; তিনি বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না; বৃদ্ধ বয়সে দিল্লীতে বসিয়া ইতিহাস লিখিতে গিয়া বারণী ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়া থাকিবেন।‡ এরূপ অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে, মিষ্টার বিভারিজের সকল তর্কই বারণীর এক কথায় খণ্ডিত হইয়া যায়।

মিষ্টার বিভারিজ যেরূপ তর্কপ্রণালীর অবতারণা করিয়া গিয়াছেন তাহা হাস্যোদ্দীপক। তিনি বলেন,—"ঢাকার উত্তর-উত্তর-পূর্ব্বকোণে ২৫ মাইল দূরে নদীতীরে একডালা নামে একটি স্থান রেনেলের মানচিত্রে অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার একদিকে নদী, অপর দিকে ভাওয়ালের জঙ্গল। এই প্রাকৃতিক সংস্থান ইতিহাস-বর্ণিত একডালার প্রাকৃতিক সংস্থানের অনুরূপ। ইহার ৮ মাইল দূরে দুরদুড়িয়া নামক স্থানে দুর্গটি সংস্থাপিত ছিল বলিয়া বোধ হয়।" এখানেও মিষ্টার বিভারিজের অনুমান অসঙ্গত হইয়া পড়িতেছে। কারণ মুসলমান লিখিত ইতিহাসে একডালা গ্রামেই দুর্গ থাকা দেখিতে পাওয়া যায়। মিষ্টার বিভারিজের একডালা এবং দুরদুড়িয়ার মধ্যস্থলে নদীস্রোত;—একপারে একডালা, অপর পারে দুরদুড়িয়া। হাজি ইলিয়াস পাণ্ডুয়া পরিত্যাগ করিয়া নদী পার হইয়া একডালাদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিবার কথা মুসলমান লিখিত ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। মিষ্টার বিভারিজ এস্থলে যে প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ:—"ডাক্তার টেলর ঢাকাবিবরণী নামক যে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে সেই গ্রন্থে একডালার বিশেষ বিবরণ সন্নিবিষ্ট আছে।"

ডাক্তার টেলর লিখিয়া গিয়াছেন,—"একডালার অপর পারে দুরদুড়িয়া নামক স্থানে একটি পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। একডালার নিকটেও একটি পুরাতন রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। লোকে বলে,—তাহা বুনিয়া রাজাদিগের রাজবাটী ছিল; তাঁহারাই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দুর্গটি এখন রাণীবাড়ী নামে পরিচিত, এক সময়ে রাণী ভবানীর অধিকারভুক্ত ছিল।

* J. A. S. B., Vol. LXIV, p. 227.

† The actual site of this fort is still a matter of doubt.—J. A. S. B., Vol. XLII, p 212.

‡ The only objection to the Dacca Ekdala is that Ziyah-uddin Barani speaks of Ekdala as being near Pandua. But he wrote in his old age at Delhi, and apparently he had never visited Bengal and had no local knowledge. বারণী সমসাময়িক ইতিহাস লেখক। তাঁহার ভ্রম হইয়া থাকিবে বলিয়া অনুমান করিবার কারণ নাই। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন:—Ekdala is the name of a mouza close to Pandua, on one side of it is a river, and on another a jungle. সামস্-ই-সিরাজের "তারিখ ফিরোজ শাহী" গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় উত্তর কালে একডালা "আজাদপুর" নামে কথিত হইয়াছিল।

বোধ হয় এই দুর্গেই হাজি সামসুদ্দীন ইলিয়াস ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া থাকিবেন। তৎকালে সামসুদ্দীন একবার ছদ্মবেশে দুর্গত্যাগ করিয়া "রাজা বিয়াবাণী" নামক মুসলমান সাধুপুরুষের অন্তেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিবার কথা মুসলমান লিখিত ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। ইহাতে বোধ হয় রাজা বিয়াবাণী রাণী ভবানীর বংশধর হইবেন।"

মিষ্টার বিভারিজ যাঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়াছেন, তাঁহার কথা কিরূপ হাস্যোদ্দীপক তাহা বাঙ্গালী মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। মিষ্টার বিভারিজ আবার তাহাকে অধিক হাস্যোদ্দীপক করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,— "ডাক্তার টেলরের এই উক্তি বড়ই সারগর্ভ,—মুসলমান সাধুর নাম রাজা হইতে পারে না,—তিনি পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়,—বিয়াবাণী এবং রাণী ভবানী হয়ত একই শব্দ!" *

"বিয়াবাণী" একটি পারসিক শব্দ; তাহার অর্থ— আরণ্যক। যে সাধুপুরুষ মালদহ প্রদেশে "রাজা বিয়াবাণী" নামে কথিত হইতেন, তিনি লোকালয় ছাড়িয়া নিয়ত অরণ্য মধ্যেই বাস করিতেন। তজ্জন্য লোকে তাঁহাকে অরণ্যের রাজা (রাজা বিয়াবাণী) বলিত। অদ্যাপি তাঁহার সম্বন্ধে কত অলৌকিক জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। মালদহের ইতিহাসলেখক গোলাম হোসেন এবং ইলাহিবক্স উভয়েই তাঁহার কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কোন্ স্থানে বাস করিতেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য ইলাহিবক্স স্বরচিত হস্তলিখিত পারস্যভাষানিবদ্ধ "খুরশেদর্জাহানামা" নামক ইতিহাসে অলিখিত স্থান রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি "রাজা বিয়াবাণীকে" মালদহনিবাসী বলিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী স্থানে একালের ন্যায় সেকালেও অরণ্যের অভাব ছিল না। লোকালয় ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া, "রাজা বিয়াবাণী"র সমাধিক্ষেত্রে কোনও সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হয় নাই। তাহাতেই সে স্থান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাকে পূর্ব্ববঙ্গে নির্দ্দেশ করিবার কারণ নাই। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রাণী ভবানী বর্ত্তমান থাকিতে পারেন না; উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই তিনি স্বর্গারোহণ করেন। মিষ্টার বিভারিজ বা ডাক্তার টেলর তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলেও, এই সকল হাস্যোদ্দীপক তর্ক এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় স্থান লাভ করিতে পারিত না।

একডালা কোথায় ছিল? সমসাময়িক মুসলমান লেখকের কথাই তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ। সে প্রমাণের অভাব নাই। সকলেই লিখিয়া গিয়াছেন,— তাহা পাণ্ডুয়ার নিকটে—নদীপারে—মহাবনের নিকটে। কেহ কেহ লিখিয়া গিয়াছেন,—ফিরোজশাহ দুর্গজয়ে অসমর্থ হইয়া, গঙ্গাতীরে শিবিরসন্নিবেশ করিয়াছিলেন; তাঁহার সেনাদল মশকদংশনে বিব্রত হইয়াছিল। উত্তরকালে গৌড়েশ্বর হোসেনশাহের একডালা দুর্গে বাস করিবার কথাও লিখিত আছে।† তৎকালে তিনি বর্ষে বর্ষে একডালা হইতে পাণ্ডুয়ায় আসিয়া নুর কুতব নামক স্বনামখ্যাত সাধুপুরুষের সমাধিক্ষেত্রে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। †

এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়াও, মিষ্টার বিভারিজ ভ্রম পরিহারের চেষ্টা না করিয়া, লিখিয়া গিয়াছেন— "ইহার সকল কথাই পূর্ব্ববঙ্গের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে। ফিরোজশাহ গঙ্গাতীরে শিবিরসন্নিবেশ করিয়াছিলেন। গঙ্গা না বলিয়া বুড়ীগঙ্গা বলিলেই হইল। ঢাকার অন্তর্গত

* He then tells the story of Ilyas Shah's coming out of the fort to attend the funeral of Rajah Biyabani, and suggests that this saint was a descendant of Rani Bhabani. This seems a valuable suggestion. The title of Rajah is a curious one for a Mahomedan saint, and in all probability points to the fact that he was a converted Hindu. Biyabani means wild or desert in Persian, but it closely resembles the name of the Rani, and it is likely that the two words are identical. —J. A. S. B., Vol. LXIV., p. 228.

† Sultan Alauddin Husain Shah, girding up the waist of justice, unlike other Kings of Bengal, removed his seat of Government to Ekdala, which adjoins the city of Gour. And excepting Husain Shah, no one amongst the Kings of Bengal, made his seat of Government anywhere except at Pandua and the City of Gour.—Riaz-us-Salateen.

একডালার নিকটেও এক মুসলমান সাধুর সমাধিমন্দির আছে; তাহাই হয়ত নূর কুতবের সমাধিমন্দির। হোসেনশাহ অনেক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গেও বাস করিতেন; তদ্দেশে তাঁহার নির্ম্মিত মসজেদ অদ্যাপি দেদীপ্যমান। গৌড়েশ্বরগণ যে বিপদে পড়িলে পূর্ব্ববঙ্গে পলায়ন করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, লক্ষ্মণ সেনের আমল হইতেই তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মশকদংশনের কথা ঢাকার পক্ষেই সর্ব্বতোভাবে সুসঙ্গত।”

বলা বাহুল্য এরূপ তর্কপ্রণালী কেবল এদেশের ঐতিহাসিক তথ্যালোচনায় এবং বিচারশালায় সময়ে সময়ে ইংরাজেরাই অবলম্বন করিয়া থাকেন। ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গ কাহার অধিকারভুক্ত ছিল, মিষ্টার বিভারিজ তৎপ্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করেন নাই। ফিরোজশাহ পরাভূত হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পরে পূর্ব্ববঙ্গ হাজি সামসুদ্দীনের করতলগত হয়। তৎপূর্ব্বে তাঁহার পক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিবার আদৌ সম্ভাবনা ছিল না। নূর কুতব একজন সুবিখ্যাত সাধুপুরুষ, তাঁহার সমাধিমন্দির পাণ্ডুয়া নগরেই অবস্থিত;—জিজ্ঞাসা করিলে যে কোনও বাঙ্গালী মুসলমান মিষ্টার বিভারিজকে তাহা বলিয়া দিতে পারিতেন।

একডালা যে পাণ্ডুয়ার নিকটে, নদীর অপর পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানে একবার বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান অসাধারণ আত্মত্যাগে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল। এখানেই আবার হিন্দু মুসলমানের প্রিয়পাত্র হোসেন শাহের রাজধানী ছিল,—এখানেই পুণ্যশ্লোক রূপসনাতন, সাকর মল্লিক এবং দবিরখাস রূপে বাদশাহের প্রধান পার্শ্বচর হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন;—এখানেই বঙ্গসাহিত্য মুসলমান বাদশাহের নিকট উৎসাহ লাভ করিয়াছিল। সুতরাং বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে একডালার স্থাননির্ণয়ে আগ্রহ প্রকাশিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

যাঁহারা ইংরাজ লেখকগণের পদাঙ্কানুসরণ না করিয়া, স্বাধীনভাবে গৌড়মণ্ডল পরিদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারা সহজেই একডালার স্থান নির্ণয় করিতে পারিবেন। রাভেনসার গ্রন্থে তাহার উল্লেখ না থাকায়, কেহ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। কিন্তু গৌড় পরিদর্শকগণ অনেকেই দেখিয়াছেন,—সাগরদীঘির অনতিদূরে এক দুর্গাকার বিজন বন পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার একদিকের পরিখা এবং মৃৎপ্রাচীর এখনও বর্ত্তমান আছে। তাহাই একডালা-দুর্গের পুরাতন স্থান,—এখন জনসমাজের নিকট অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে!

হোসেন শাহ যে পথে একডালা হইতে পাণ্ডুয়া গমন করিতেন, সে পুরাতন রাজপথের চিহ্ন এখনও স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহা বাদশাহী রাজপথের ন্যায় ইষ্টকমণ্ডিত ছিল। এই পথে অগ্রসর হইয়া যেখানে নদীপার হইতে হইত, সেখানে অল্পকাল পূর্ব্বেও লোকে সেতুর চিহ্ন দর্শন করিয়াছে বলিয়া এখনও গল্প করিয়া থাকে। একডালার অনতিদূরে নূরকুতবের পিতৃগুরু মকদুম আখি সিরাজুদ্দীন নামক সাধুপুরুষের পুরাতন সমাধিমন্দির। হোসেন শাহ তাহার একটি তোরণদ্বার নির্ম্মিত করাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে এখনও হোসেন শাহের কীর্ত্তি প্রস্তরফলকে খোদিত আছে। অল্পকাল পূর্ব্বে এই দুর্গাভ্যন্তরে কৃষকগণ পুরাতন রৌপ্যমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার একটি মুদ্রা মালদহ-ইংরেজাবাদের জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী মহাশয়ের নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়। সে মুদ্রা হাজি সামসুদ্দীন ইলিয়াসের মুদ্রা। এই সকল কারণে, পুরাতন লক্ষ্মণাবতী নগরের চতুঃসীমার মধ্যে সাগরদীঘির অনতিদূরবর্ত্তী পুরাতন দুর্গস্থানকেই একডালা দুর্গ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহার সহিত সমসাময়িক মুসলমান লেখকের সকল কথারই সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি যাঁহারা একডালাকে বগুড়া জেলায় টানিয়া লইতে চাহিতেছেন, তাঁহারা এই সকল কথার আলোচনা করিলে আত্মভ্রম পরিহার করিতে পারিবেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

‡ And for the maintenance of the rest-house in connection with the eminent Saint Nur Qutub-ul-Alam, he endowed several villages, and every year from Ekdala, which was the seat of his Government, he used to come to Pandua, for pilgrimage to the bright Shrine of the holy Saint. —*Ibid.*

বোধ হয় এই দুর্গেই হাজি সামসুদ্দীন ইলিয়াস ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া থাকিবেন। তৎকালে সামসুদ্দীন একবার ছদ্মবেশে দুর্গত্যাগ করিয়া "রাজা বিয়াবাণী" নামক মুসলমান সাধুপুরুষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিবার কথা মুসলমান লিখিত ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। ইহাতে বোধ হয় রাজা বিয়াবাণী রাণী ভবানীর বংশধর হইবেন।"

মিষ্টার বিভারিজ যাঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়াছেন, তাঁহার কথা কিরূপ হাস্যোদ্দীপক তাহা বাঙ্গালী মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। মিষ্টার বিভারিজ আবার তাহাকে অধিক হাস্যোদ্দীপক করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—"ডাক্তার টেলরের এই উক্তি বড়ই সারগর্ভ,—মুসলমান সাধুর নাম রাজা হইতে পারে না,—তিনি পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়,—বিয়াবাণী এবং রাণী ভবানী হয়ত একই শব্দ!" *

"বিয়াবাণী" একটি পারসিক শব্দ; তাহার অর্থ—আরণ্যক। যে সাধুপুরুষ মালদহ প্রদেশে "রাজা বিয়াবাণী" নামে কথিত হইতেন, তিনি লোকালয় ছাড়িয়া নিয়ত অরণ্য মধ্যেই বাস করিতেন। তজ্জন্য লোকে তাঁহাকে অরণ্যের রাজা (রাজা বিয়াবাণী) বলিত। অদ্যাপি তাঁহার সম্বন্ধে কত অলৌকিক জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। মালদহের ইতিহাসলেখক গোলাম হোসেন এবং ইলাহিবক্স উভয়েই তাঁহার কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কোন্ স্থানে বাস করিতেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য ইলাহিবক্স স্বরচিত হস্তলিখিত পারস্যভাষানিবদ্ধ "খুরশেদর্জাহানামা" নামক ইতিহাসে অলিখিত স্থান রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি "রাজা বিয়াবাণীকে" মালদহনিবাসী বলিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী স্থানে একালের ন্যায় সেকালেও অরণ্যের অভাব ছিল না। লোকালয় ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া, "রাজা বিয়াবাণী"র সমাধিক্ষেত্রে কোনও সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হয় নাই। তাহাতেই সে স্থান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাকে পূর্ব্ববঙ্গে নির্দ্দেশ করিবার কারণ নাই। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রাণী ভবানী বর্ত্তমান থাকিতে পারেন না; উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই তিনি স্বর্গারোহণ করেন। মিষ্টার বিভারিজ বা ডাক্তার টেলর তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলেও, এই সকল হাস্যোদ্দীপক তর্ক এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় স্থান লাভ করিতে পারিত না।

একডালা কোথায় ছিল? সমসাময়িক মুসলমান লেখকের কথাই তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ। সে প্রমাণের অভাব নাই। সকলেই লিখিয়া গিয়াছেন,—তাহা পাণ্ডুয়ার নিকটে—নদীপারে—মহাবনের নিকটে। কেহ কেহ লিখিয়া গিয়াছেন,—ফিরোজশাহ দুর্গজয়ে অসমর্থ হইয়া, গঙ্গাতীরে শিবিরসন্নিবেশ করিয়াছিলেন; তাঁহার সেনাদল মশকদংশনে বিব্রত হইয়াছিল। উত্তরকালে গৌড়েশ্বর হোসেনশাহের একডালা দুর্গে বাস করিবার কথাও লিখিত আছে।* তৎকালে তিনি বর্ষে বর্ষে একডালা হইতে পাণ্ডুয়ায় আসিয়া নুর কুতব নামক স্বনামখ্যাত সাধুপুরুষের সমাধিক্ষেত্রে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। †

এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়াও, মিষ্টার বিভারিজ ভ্রম পরিহারের চেষ্টা না করিয়া, লিখিয়া গিয়াছেন—"ইহার সকল কথাই পূর্ব্ববঙ্গের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে। ফিরোজশাহ গঙ্গাতীরে শিবিরসন্নিবেশ করিয়াছিলেন। গঙ্গা না বলিয়া বুড়ীগঙ্গা বলিলেই হইল। ঢাকার অন্তর্গত

* He then tells the story of Ilyas Shah's coming out of the fort to attend the funeral of Rajah Biyabani, and suggests that this saint was a descendant of Rani Bhabani. This seems a valuable suggestion. The title of Rajah is a curious one for a Mahomedan saint, and in all probability points to the fact that he was a converted Hindu. Biyabani means wild or desert in Persian, but it closely resembles the name of the Rani, and it is likely that the two words are identical. —J. A. S. B., Vol. LXIV., p. 228.

† Sultan Alauddin Husain Shah, girding up the waist of justice, unlike other Kings of Bengal, removed his seat of Government to Ekdala, which adjoins the city of Gour. And excepting Husain Shah, no one amongst the Kings of Bengal, made his seat of Government anywhere except at Pandua and the City of Gour.—Riaz-us-Salateen.

একডালার নিকটেও এক মুসলমান সাধুর সমাধিমন্দির আছে; তাহাই হয়ত নুর কুতবের সমাধিমন্দির। হোসেনশাহ অনেক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গেও বাস করিতেন; তদ্দেশে তাঁহার নির্ম্মিত মসজেদ অদ্যাপি দেদীপ্যমান। গৌড়েশ্বরগণ যে বিপদে পড়িলে পূর্ব্ববঙ্গে পলায়ন করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, লক্ষ্মণ সেনের আমল হইতেই তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মশকদংশনের কথা তাকার পক্ষেই সর্ব্বতোভাবে সুসঙ্গত।"

বলা বাহুল্য এরূপ তর্কপ্রণালী কেবল এদেশের ঐতিহাসিক তথ্যালোচনায় এবং বিচারশালায় সময়ে সময়ে ইংরাজেরাই অবলম্বন করিয়া থাকেন। ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গ কাহার অধিকারভুক্ত ছিল, মিষ্টার বিভারিজ তৎপ্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করেন নাই। ফিরোজশাহ পরাভূত হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পরে পূর্ব্ববঙ্গ হাজি সামসুদ্দীনের করতলগত হয়। তৎপূর্ব্বে তাঁহার পক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিবার আদৌ সম্ভাবনা ছিল না। নুর কুতব একজন সুবিখ্যাত সাধুপুরুষ, তাঁহার সমাধিমন্দির পাণ্ডুয়া নগরেই অবস্থিত;—জিজ্ঞাসা করিলে যে কোনও বাঙ্গালী মুসলমান মিষ্টাব বিভাবিজকে তাহা বলিয়া দিতে পারিতেন।

একডালা যে পাণ্ডুয়ার নিকটে, নদীর অপর পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানে একবার বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান অসাধারণ আত্মত্যাগে স্বদেশের স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। এখানেই আবার হিন্দু মুসলমানের চির প্রিয়পাত্র হোসেন শাহের রাজধানী ছিল,—এখানেই পুণ্যশ্লোক রূপসনাতন, সাকর মল্লিক এবং দবিরখাস রূপে বাদশাহের প্রধান পার্শ্বচর হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন;—এখানেই বঙ্গসাহিত্য মুসলমান বাদশাহের নিকট উৎসাহ লাভ করিয়াছিল। সুতরাং বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে একডালার স্থাননির্ণয়ে আগ্রহ প্রকাশিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

‡ And for the maintenance of the rest-house in connection with the eminent Saint Nur Qutub-ul-Alam, he endowed several villages, and every year from Ekdala, which was the seat of his Government, he used to come to Pandua, for pilgrimage to the bright Shrine of the holy Saint. —*Ibid.*

যাঁহারা ইংরাজ লেখকগণের পদাঙ্কানুসরণ না করিয়া, স্বাধীনভাবে গৌড়মণ্ডল পরিদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারা সহজেই একডালার স্থান নির্ণয় করিতে পারিবেন। রাভেনসার গ্রন্থে তাহার উল্লেখ না থাকায়, কেহ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। কিন্তু গৌড় পরিদর্শকগণ অনেকেই দেখিয়াছেন,—সাগরদীঘির অনতিদূরে এক দুর্গাকার বিজন বন পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার একদিকের পরিখা এবং মৃৎপ্রাচীর এখনও বর্ত্তমান আছে। তাহাই একডালা-দুর্গের পুরাতন স্থান,—এখন জনসমাজের নিকট অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে!

হোসেন শাহ যে পথে একডালা হইতে পাণ্ডুয়া গমন করিতেন, সে পুরাতন রাজপথের চিহ্ন এখনও স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহা বাদশাহী রাজপথের ন্যায় ইষ্টকমণ্ডিত ছিল। এই পথে অগ্রসর হইয়া যেখানে নদীপার হইতে হইত, সেখানে অল্পকাল পূর্ব্বেও লোকে সেতুর চিহ্ন দর্শন করিয়াছে বলিয়া এখনও গল্প করিয়া থাকে। একডালার অনতিদূরে নুরকুতবের পিতৃগুরু মকদুম আখি সিরাজুদ্দীন নামক সাধুপুরুষের পুরাতন সমাধিমন্দির। হোসেন শাহ তাহার একটি তোরণদ্বার নির্ম্মিত করাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে এখনও হোসেন শাহের কীর্ত্তি প্রস্তরফলকে খোদিত আছে। অল্পকাল পূর্ব্বে এই দুর্গাভ্যন্তরে কৃষকগণ পুরাতন রৌপ্যমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার একটি মুদ্রা মালদহ-ইংরেজাবাদের জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী মহাশয়ের নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়। সে মুদ্রা হাজি সামসুদ্দীন ইলিয়াসের মুদ্রা। এই সকল কারণে, পুরাতন লক্ষ্মণাবতী নগরের চতুঃসীমার মধ্যে সাগরদীঘির অনতিদূরবর্ত্তী পুরাতন দুর্গস্থানকেই একডালা দুর্গ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহার সহিত সমসাময়িক মুসলমান লেখকের সকল কথারই সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি যাঁহারা একডালাকে বগুড়া জেলায় টানিয়া লইতে চাহিতেছেন, তাঁহারা এই সকল কথার আলোচনা করিলে আত্মভ্রম পরিহার করিতে পারিবেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

সুপরি শব্দ দেশজ কি?

ভাদ্র মাসের 'প্রবাসীতে' 'চক্ষু পদার্থ কি' এই নামের প্রবন্ধের পাদটীকায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সুপারি শব্দ বাংগলা বলিয়াছেন। তাঁহার ভাষায়, গুবাক—ডাহা সংস্কৃত, গুয়া—ভাঙা সংস্কৃত, সুপারি—ডাহা বাঙ্‌লা। 'ডাহা বাঙ্‌লা' অর্থে বোধ করি বংগদেশজ শব্দ।

কিন্তু বাংগলাভাষায় সুপরি শব্দ অধিক দিন প্রবেশ করে নাই। কৃত্তিবাসে (লংকাকাংডে,) 'বাটা ভরিয়া গুয়া দিব,' কবিকংকণে, 'তাম্বুলিতে দেয় গুয়া পান'। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেও 'গুয়া'। ভারত চন্দ্রে, এমন কি প্রায় এক শত বৎসর পূর্বের মাণিক গাংগলীর ধর্মমংগলেও সুপরি বা সুপারি শব্দ পাই না, পাই গুয়া। পূর্ববংগে (যেমন ঢাকা ও ফরিদপুরে) নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অদ্যাপি গুআ বলে। ওড়িয়াতে গুআ; সুপরি বা সুপারি শব্দ অজ্ঞাত। তেলেগুতে বাকলু। বাক শব্দ সংস্কৃত গুবাক শব্দের সংক্ষেপ বোধ হয়। 'লু'টা বিভক্তি মাত্র। হিন্দী ও মরাঠীতে সুপারী শব্দ চলিত। উর্দুতে সুপারী। বাংগলায় সুপরি বলে। পান সুপরি গুনি।

সুপারী শব্দ উর্দুতে আছে বটে, কিন্তু আর্বী কিংবা ফার্সীতে নাই। অতএব যাবনিক বলিতে পারা যায় না। তবে উৎপত্তি কি? 'দেশজ'? কোন্ দেশজ? বংগদেশজ নহে।

দুই অনুমান হয়। হয়ত সংস্কৃত খপুর শব্দ হইতে সপুর, সপুরী, সুপরী, সুপারী আসিয়াছে। শব্দকল্পদ্রুমে খপুর শব্দের এক অর্থ গুবাক আছে। খপুর শব্দটি অর্বাচীন সংস্কৃত বোধ হয়। সংস্কৃত শব্দের শ ষ স স্থানে হিন্দীতে খ হইতে দেখি। সংস্কৃত শব্দের খ স্থানে হিন্দীতে স হইতে দেখি না। কিন্তু সংস্কৃত কদুষ্ণ হইতে বাংগলা কুসুম কুসুম (গরম), হিন্দীতে সুসুম। এখানে সংস্কৃত শব্দের ক স্থানে হিন্দীতে স হইয়াছে।

এমনও হইতে পারে, হিংদী সুপারী সংস্কৃতে খপুর আকার পাইয়াছে। তাহা হইলে মূল শব্দ সপুরী বা সপরী হইতে পারে। সকলেই জানেন, সুপরি গাছ উত্তর ভারতে জন্মে না। ভারতের সমুদ্রতটবর্ত্তী স্থান হইতে বণিকেরা উত্তর ভারতে সুপরি লইয়া যায়। সফর করিয়া যায় বলিয়া সফরী, সপরী, সুপারী, সুপরি? এই অনুমান সত্য হইলে সুপরি শব্দের মূল, যাবনিক সফর।

ইহার সহিত বাংগলা সপরী কুমড়া নাম তুলনা করা যাইতে পারে। বিলাতী কুমড়াকে কোন কোন স্থানে সপরী কুমড়া বলে। ইংরেজী আনানস শব্দ হইতে বাংগলা আনারস নাম হইয়াছে। বিদেশ হইতে আগত বলিয়া আনারসকে ওড়িয়াতে সপুরী বলে। অতএব যাবনিক সফর হইতে সফরী, সুপারী, সুপরি শব্দ আসা অসম্ভব নহে।

ঠাকুর মহাশয় বাংগলা ভাষায় অদ্বিতীয় পংডিত। এই হেতু তাঁহার অনুমানের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে গেলে ভয়ে ভয়ে বলিতে হয়। আশা করি, তিনি সন্দেহ ভাংগিয়া দিবেন।

কটক। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

অশরীরীর আবির্ভাব।

গত চৈত্রের ও আষাঢ় মাসের "প্রবাসী"তে "ভূত নামানো" শীর্ষক দুইটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে "অঞ্জলি"র কবি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহোদয়, তাঁহাদের পরিবারে যে অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া আমার নিকট গল্প করেন, তাহা নিম্নে যথাযথ বিবৃত হইতেছে।

"আমি গত ১৩১৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রাঙ্গামাটীতে বেড়াইতে যাই; সেখানেই ত্রিপাদবিশিষ্ট মেজে অশরীরীর আবির্ভাব প্রথমে দেখিতে পাই; একদিন সন্ধ্যা বেলা আমাদের রাঙ্গামাটীর বৈঠকখানায় প্রভাত বাবুর বর্ণনানুযায়ী প্রণালীতে প্রেতাত্মাকে আকর্ষণ করা হইয়াছিল। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে প্রেতাত্মা সঙ্কেতে জানায় সে সুখেই আছে; কিন্তু তাহার ভাত খাইবার ইচ্ছা করে, আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই, তৃপ্তিহীন সুখ কিরূপ।

আমাদিগের অনুরোধে পূর্ব্বোক্ত প্রেতাত্মাটি চিব একঘণ্টা পরে অল্পদিন পূর্ব্বে মৃত স্থানীয় একজন ভদ্রলোককে

মেজে আনয়ন করে। তিনি সঙ্কেতে উত্তর দেন, তিনি অত্যন্ত কষ্টে আছেন এবং এখনও তিনি তাঁহার বসতবাটীতেই অল্পবয়স্কা ভার্য্যা এবং শিশু পুত্র দ্বয়ের নিকটে অবস্থান করিতেছেন। আমি পূর্ব্বোক্ত প্রেতাত্মাকে আমার বয়স কত—এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সমস্ত মেজটী হঠাৎ আমার দিকে ছুটিয়া আসিতে থাকে, তখন আমার জেঠা মহাশয় (রাঙ্গামাটীর বর্ত্তমান সিভিল সার্জ্জন) বলেন যে, "এরূপ প্রশ্ন করা সঙ্গত নহে, জীবিতাবস্থায় যাহা লোকে জানিতে পারে না, মৃত্যুর পরেও সে তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতালাভে সক্ষম নহে।" আমি ঐ প্রেতাত্মাটীর সম্পূর্ণ অপরিচিত, সুতরাং প্রেতাত্মার প্রতি অবিশ্বাস হেতু তাহার পরীক্ষার্থ—অকস্মাৎ এরূপ প্রশ্ন করাতে সে হয়ত কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। যাহা হউক, চক্রস্থিত একজন ভদ্রলোক "জীবেন্দ্র বাবু তাঁহার প্রশ্ন প্রত্যাখ্যান করিলেন" এরূপ বলাতে মেজ শান্ত ভাব ধারণ করিল।

তারপর স্থানীয় একজন ভদ্রলোক সেই প্রেতাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সেখানকার পুলিস আফিসের হেড ক্লার্ক মহাশয়ের উপরে তাহার কোন বিদ্বেষ ভাব আছে কি না? সে সঙ্কেতে উত্তর দেয়, "আছে।" স্থূলকায় হেড ক্লার্ক মহাশয় আমার পার্শ্বেই বসিয়া ছিলেন। তাঁহার প্রফুল্ল বদন শুষ্ক হইয়া গেল এবং তিনি ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেলেন! তখন আমার জেঠামহাশয়ের আদেশে প্রেতাত্মাকে প্রশ্ন করা হয় যে, সে তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে কি না? উত্তর পাওয়া গেল, "না।" তখন হেড ক্লার্ক মহাশয় অকস্মাৎ এক লম্ফ প্রদান করিয়া বলিলেন "তবে রে বেটা শালা ভূত, তোকে কে ডরায়?" হেড ক্লার্ক মহাশয় সিভিল সার্জ্জন মহোদয়ের নিকট নিতান্ত নম্র ভাবে অবস্থান করিতেন; অকস্মাৎ তাঁহার এই প্রকার ভাবোচ্ছ্বাস দেখিয়া আমরা সকলেই যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলাম।

ইহার কিছুদিন পরে আমি চট্টগ্রাম ফিরিয়া আসি। আমাদের নিকটে অশরীরীর আবির্ভাবের গল্প শুনিয়া অনেকে প্রেতাত্মাকে আকর্ষণ করিতে উৎসুক হন। কোন গ্রামস্থিতা আমার জনৈক আত্মীয়াও অশরীরী আত্মাকে আকর্ষণ করিয়া তিনি নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া আনন্দানুভব করিতে থাকেন। গত অগ্রহায়ণ মাসে তিনি আমাদের বাড়ীতে আইসেন। সেই সময়ে আমরা তাঁহাকে লইয়া অশরীরী আত্মাকে আকর্ষণ করি। প্রথমতঃ স্থানীয় পরলোকগত প্রসিদ্ধ উকীল কমলাকান্ত সেন মহাশয়কে আহ্বান করা হয়।

সেই দিনই রাত্রে পরীক্ষার্থ আমার খুল্লতাত এবং পিতৃদেব মহাশয় উক্ত আত্মীয়াকে লইয়া মেজ ধারণ করেন, আমার মাতামহ মহোশয়ও সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। ২।১ মিনিটের মধ্যেই প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইলে পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "যদি বাস্তবিকই ভূত হও, তাহা হইলে মেজখানি শূন্যে উত্তোলন করিতে পারিবে কি না।" উত্তর হইল "পারিব না।" আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম "কয়জন প্রেতাত্মা হইলে মেজ খানি তুলিতে পারিবে" উত্তর হইল "১৪ জন"! অচিরকালমধ্যেই আমার অনুরোধে ১৪ জন প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইল। তখন আমাদিগের সুবিস্তৃত বৈঠক খানা গৃহের চারিদিকে সেই ক্ষুদ্র মেজ খানি ছুটিতে আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে আমার উক্ত আত্মীয়াও ছুটিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর মেজখানি গৃহের মেঝের উপরে উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। এইখানে একটী কথা বলিতে ভুলিয়াছি। প্রেতাত্মাদের নাম জিজ্ঞাসা করিলে আমাদিগের বহুকাল পূর্ব্বে মৃত আত্মীয়গণের নাম সঙ্কেতে জানিতে পারা গিয়াছিল। বলা বাহুল্য, আমরা ইংরেজী বর্ণমালানুসারে এই নাম সংগ্রহ করিয়াছিলাম (মনিলাল বাবুর লিখিত উপায় হইতে এই উপায়ই সহজ)।

প্রেতাত্মার এত গোলযোগসত্ত্বেও আমার মাতামহ প্রেতাত্মার উপস্থিতিতে সন্দেহ প্রকাশ করায় পুনর্ব্বার তখনই মেজ ধরা হয়। সেইবার আমার আত্মীয়া মহোদয়া একলাই একটী অঙ্গুলি দ্বারা মেজ ধারণ করেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই "আমি আর হাত রাখিতে পারি না" বলিয়া হাতখানি তুলিয়া লইলেন, কিন্তু আমি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলাম, আমার আত্মীয়ার মস্তকটী যেন একটা তীব্র আঘাত লাগিয়া বাম দিকে ঈষৎ হেলিয়া পড়িল এবং তাঁহার দক্ষিণ হাতখানি তীরবেগে তির্য্যকগতিতে মেজ হইতে টানিয়া লইলেন, যেন অকস্মাৎ বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তার পর তিনি হঠাৎ চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেলেন, এবং কয়েক

মুহূর্ত্ত পরেই আমার মৃতা পিশিমার আত্মা তাঁহার শরীরে আবির্ভূতা হইলেন। তৎপরেই আমার আত্মীয়া উন্মাদিনীর ন্যায় জোরে বলিতে লাগিলেন, "আর সহ্য হয় না; তোরা বিশ্বাস করিস্ না, কোথায় বড় দাদা, কোথায় বাবা, কোথায় প্রিয় কেশব (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন), কোথায় রাম-মোহন? নব বিধান, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম" এরূপ কত সুসংলগ্ন অসংলগ্ন কথা! শেষে সস্নেহ স্বরে বলিলেন, "জীবেন্, জীবেন, তুইও বিশ্বাস করলি না—" এ রূপ আরও কত কি। এমতাবস্থায় প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তারপর নানা ঔষধ পত্রাদি ব্যবস্থার পরে আমার আত্মীয়া প্রকৃতিস্থা হইলেন; কিন্তু প্রাগুক্ত ঘটনার কিছুই তখন তাঁহার স্মরণ ছিল না।

আমরা জাগ্রত অবস্থায় সেই রাত্রি কাটাইতে লাগিলাম, আমার আত্মীয়া প্রথম রাত্রে প্রগাঢ় নিদ্রায় ছিলেন; তাহার পর রাত্রি যখন ১২ ঘটিকা, তখন তিনি হঠাৎ জাগিয়া উঠিলেন এবং বলিতে লাগিলেন "আমার হাত পা অবশ হইয়া পড়িতেছে, আমার ডানহাতের মধ্য দিয়া যেন কি একটী শক্তি আমার শরীরে প্রবেশ করিতেছে"। অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার শরীরে আমার পিসীমার প্রেতাত্মাটী পুনরায় আবির্ভূত হইলেন, এবং আমাদের পারিবারিক অনেক কথা বলিতে লাগিলেন, যাহা এখানে উল্লেখ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। কিন্তু এইটুকু বলা আবশ্যক যে, সেই অশরীরী আত্মাটী কয়েকটী ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া প্রভূত তৃপ্তিলাভ করেন, তারপর তিনি আমাদের সকলের নিকট যথাযোগ্য অভিবাদনাদি করিয়া বিদায় লন। বলা বাহুল্য, এ কার্য্যটী আমার আত্মীয়ার দেহদ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি আমারও মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। * * * * তারপর আমার কনিষ্ঠ ভাই শ্রীমান স্বর্ণকুমারকে বলিলেন "সংসার দুঃখময়, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি সুখী হইবে, ভবিষ্যতে তুমি একজন সুগায়ক হইবে, এবং তোমার দ্বারা দেশের অনেক কাজ সাধিত হইবে।" সে আনন্দে উৎফুল্ল হইল।

আমার পিসীমার প্রেতাত্মার পরে আমার পিতামহ, পিতামহী এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ সহোদরের প্রেতাত্মা একে একে উক্ত আত্মীয়ার শরীরে আবির্ভূত হইলেন, এবং তাঁহাদিগের অভিলষিত গুটীকতক কথা বলিয়া প্রস্থান করেন। তাঁহাদিগের নিকট হইতেও আমি পূর্ব্বোক্ত প্রকার আশীর্ব্বাদ বা ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করিয়াছিলাম!

যাহা হউক তাহার পর হঠাৎ আর একটী প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়। আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কে?" সে বলিল "আমাকে চিনিতে পারিবে না, আমি একজন মহা পাপী।"

আমি—তথাপি নাম জানিতে চাই।

সে—প্যারী। (আমাদের অতি বিশ্বস্ত পুরাতন মৃত ভৃত্য)

আমি এই উত্তরে মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কেমন আছ?"

সে—অহো! কোথায় শান্তি, কোথায় তৃপ্তি, চারিদিকে ধূ-ধূ-চিতা জ্বলিতেছে। আমি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলাম, কত আশা করিয়াছিলাম, কত সাধ হইয়াছিল, কিছুই পূর্ণ হইল না। আমি কতবার চেষ্টা করিয়াছি, তোমাদিগের এই আত্মীয়ার শরীরে প্রবেশ করিব, কিন্তু ইনি শুদ্ধচরিত্রা বলিয়া আমি এতদিন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারি নাই। আজ দেখিলাম সকলেই একে একে আসিতেছে, আমিও আসিলাম, আমি আর কিছুতেই যাইব না!—

আমি—(বাধাদিয়া) যাইতেই হইবে।

সে—(সজোরে) যাইব না; আমার শসা খাইতে ইচ্ছা করে, মিঠা কুমড়া খাইতে ইচ্ছা করে, থিয়েটার দেখিতে ইচ্ছা করে, সার্কাস দেখিতে ইচ্ছা করে, অহো কি জ্বালা, কি পিপাসা, আমায় একটু চিনি কিম্বা মিশ্রীর সরবৎ দাও।"

অচিরে আমার আদেশে উভয় সরবতই প্রদত্ত হইল!

সে—(পান করিয়া) অহো। কি তৃপ্তি! কি তৃপ্তি!!

তখন আমার আত্মীয়া হঠাৎ প্রকৃতিস্থা হইয়া বলিলেন "কি দুর্গন্ধ, কি দুর্গন্ধ!" কিন্তু পর মুহূর্ত্তে আবার ঐ প্রেতাত্মাটী আসিয়া বলিল—"তোমরা ভূত বিশ্বাস কর কি না বল; নচেৎ আমি যাইব না। এই তোমাদের আত্মীয়ার দাঁত ভাঙ্গিয়া দিতেছি।"

আমি—সাধ্য থাকে ভাঙ্গ।

দেখিলাম দাঁত গভীররূপে নিষ্পেষিত হইতেছে; কিন্তু

প্রেতাত্মার চেষ্টা সফল হইল না। তারপর সে পুনরায় বলিতে লাগিল—"আমি তোমাদের কাছে ঋণী, বল তাহা মাপ করিয়াছ কিনা?" আমি আমাদের পরিবারের প্রতিনিধি স্বরূপে বলিলাম "তোমার সমস্ত ঋণ, সমস্ত অপরাধ, ক্ষমা করিতেছি, তুমি শান্তিলাভ কর।"

সে—কি শান্তি! কি শান্তি! আমি চলিলাম।

রাত্রি তখন প্রায় প্রভাত হইয়া আসিয়াছে, আমার আত্মীয়া জ্ঞানলাভ করিলেন; কিন্তু তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বলা হইয়া পড়িয়াছেন।

এস্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক। আমার আত্মীয়াটি আমার মাতৃদেবীর সহিত এক শয্যাতেই শুইয়াছিলেন। প্রেতাত্মার প্রথম আবির্ভাবেই মাতৃদেবী অভিভূতা হইয়া পড়েন। আমরা তাঁহার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলে, প্রেতাত্মা আমাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলেন, "তোমাদের কোন ভয় নাই, আমি চলিয়া গেলেই ইনি সংজ্ঞা লাভ করিবেন। এক্ষণে প্রিয় আত্মীয়াটীর এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার কষ্ট হইবে বলিয়া আমিই তাঁহাকে মূর্চ্ছিতা করিয়া রাখিয়াছি। তোমরা তাঁহাকে একটু বাতাস কর।" তার পর যথাসময়ে সেই প্রেতাত্মাটী প্রস্থান কালে আমার মাতৃদেবীর বক্ষে হাত দিয়া "ঈশ্বর, ঈশ্বর, বৌদী, বৌদী, উঠ, জাগ" বলিয়া জ্ঞান-দান করিয়া গিয়াছিলেন। অপর প্রেতাত্মাগুলির কার্য্য-কলাপ সময়ে তিনি বেশ সজ্ঞানেই অবস্থিতি করিতেছিলেন।

ইহার কিছুদিন পর আমার উক্ত আত্মীয়া স্বগৃহে ফিরিয়া যান। হঠাৎ একদিন তাঁহার পত্রে জানিলাম তিনি কিছুই আহার করিতে পারিতেছেন না, সকল স্থানে, সকল খাদ্য দ্রব্যে বিষ্ঠার দুর্গন্ধ অনুভব করিতেছেন। আমার পিতা ও পিতৃব্য পত্রোত্তরে উপদেশ দিলেন "একান্ত হৃদয়ে পরমেশ্বরে প্রার্থনাশীলা হও।" আমি লিখিলাম "আত্মশক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন কর।"

কিছুদিন পরে তাঁহার আর এক পত্রে অবগত হইলাম তিনি এখন বেশ স্বচ্ছন্দে আছেন, তাঁহার আর কোন কষ্ট নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছে। তিনি একদিন দেবার্চ্চনার্থ পুষ্প আহরণে অনুজ্ঞা করিয়া অতি সামান্য ফুলই প্রাপ্ত হন। ইহাতে তিনি মনে মনে কিছু অসন্তুষ্ট হইয়া গৃহান্তরে গমন করেন। সেখানে দেখিলেন, একখানা ক্ষুদ্র কাগজে লেখা আছে; "তোমার জন্য ফুল অমুক ঘরে আছে।" তৎপর সেখানে যাইয়া দেখিলেন, যথার্থই কতকগুলি গোলাপফুল সুন্দর ভাবে সাজানো রহিয়াছে; তৎপর অনুসন্ধানে জানিলেন, এ ফুল-গুলি ৩।৪ মাইল দূরস্থ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছেন! সেই দিন প্রাতে উক্ত ব্রাহ্মণের হঠাৎ যেন মনে হইল, অমুক জমিদারের পুত্রবধূর ফুলের আবশ্যক। তারপর তিনি কোন দৈবশক্তির বশীভূত হইয়া তাঁহার সাধের বাগান খানি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও শূন্য করিয়া বৃষ্টির মধ্যেও, এত দূরে ফুলগুলি স্বয়ং আনয়ন করিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস, ইহা দৈবশক্তির অভিব্যক্তি, কোন সৎ প্রেতাত্মারই প্রেরণা।"

প্রবাসীতে "ভূত নামানো" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখিয়া জীবেন্দ্র বাবু আরও বলেন—"এই সকল প্রবন্ধকে 'ভূত নামানো' আখ্যায় অভিহিত করা কর্ত্তব্য নহে; কেননা আমরা 'ভূত' শব্দটী কতকটা বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্যের ভাবেই সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকি; সুতরাং এই সকল ব্যাপারকে 'অশরীরীর আবির্ভাব' নামেই প্রকাশ করা সঙ্গত।"

আমার দ্বারাও ত্রিপাদ টেবিলে অশরীরী আত্মা আকৃষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে তেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা না ঘটায় তাহা এ স্থলে লিখিত হইল না!

আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ এই, যেন কোন মহিলা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কোনরূপে অশরীরী আত্মাকে আকর্ষণ না করেন; কেন না তাহাতে ভবিষ্যতে তাঁহার সমূহ অনিষ্টেরই বিশেষ সম্ভাবনা।

শ্রীকালীশঙ্কর সেন।

অদ্ভুত শরীর-সাধন।

আমাদের একটী প্রবাদবাক্য আছে, "শরীরের নাম মহাশয়, যাহা সহাও তাহাই সয়।" অভ্যাস ও অনুশীলনের দ্বারা শারীর প্রকৃতির যে কি অভাবিতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে পারে তাহা আমরা প্রসিদ্ধ ইংরেজী মাসিক পত্র Strand Magazineএর দুইটী প্রবন্ধের সার সঙ্কলন করিয়া প্রদর্শন করিব।

যন্ত্রপ্রকৃতিক বালিকা।

১৯০৫ ইং সনের মে মাসের ষ্ট্র্যাণ্ড মেগেজিনে এই অদ্ভুত বালিকার কথা লিখিত হইয়াছে। ইহাকে "যন্ত্রপ্রকৃতিক" (automaton) নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহার প্রকৃতি বিজ্ঞানরাজ্যে একটী নূতন আলোচ্য বিষয় হইতে পারে।

আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে সেণ্ট্রেল্ পার্ক নামক স্থানের অনতিদুরে ইহার জন্ম হয়। ইহার নাম কুমারী ডরিস্ চার্টনি (Miss Doris Chertney)। ইহার পিতামাতা সমৃদ্ধ অবস্থাপন্ন ছিলেন। সামাজিক ও চতুর বলিয়া ইঁহারা পরিচিত ছিলেন। কুমারী ডরিস্ বাল্যকালেই অসাধারণত্ব প্রকাশ করে।

বালিকা বয়স হইতেই কুমারী ডরিস্ ইহার বয়স্যদিগকে যান্ত্রিক পুতুলদিগের অভিনয় দ্বারা আমোদিত ও চমৎকৃত করিয়া আনন্দলাভ করিত। মুখভঙ্গীর পরিবর্ত্তনে তাহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। সে ইচ্ছামত যান্ত্রিক পুতুলের নিশ্চলতা বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের ভাব পরিগ্রহ করিতে পারিত। এই অভিনয় এরূপ জীবন্তভাবে প্রদর্শিত হইত যে ইহাতে ইহার সহচরগণ আমোদিত না হইয়া বরঞ্চ ভীতই হইত।

আমেরিকায় ইহার জন্ম হইলেও, বার্লিন্ ইহার মাতার জন্মস্থান ছিল্; এবং জার্ম্মান্ কলেজে ইহার শিক্ষা হইয়াছিল।

তাহার পিতামাতার মৃত্যুরপর, সে, মেলভিল্ ও তৎপত্নী কর্ত্তৃক দত্তকপুত্রীরূপে গৃহীত হয় ও তাহাদের হেভানা স্থিত বাটীতে বাস করিতে থাকে। সেখানে অবস্থানকালে একটী কৌতুকাবহ ঘটনায় সর্ব্বসাধারণের নিকট তাহার প্রথম প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণ হয়।

হেভানাতে তৎকালে দারুময় অশ্বচক্রের তামাসা হইতে-ছিল; তাহাতে কৃষ্ণবর্ণের একটী কলের বালক তৎসংলগ্ন বাদ্যযন্ত্রের বাদকরূপে কার্য্য করিত। তাহাকে নূতন পোষাকে সজ্জিত করা আবশ্যক হয়। কিন্তু ২।৩ দিবসের মধ্যে দরজি পোষাক প্রস্তুত করিয়া উঠিতে পারিল না, সুতরাং ঐ কলের বালককে উপস্থিত করা যাইতে পারিল না। এদিকে ঐ বালক ব্যতীত তামাসাই পণ্ড হইবার কথা। এরূপ স্থলে কুমারী ডরিস্ বাজি রাখিয়া ঐ পুতুলের স্থান আবশ্যক মাত্রই পূরণ করিবার জন্য স্বীকৃত হইল। তখন কুমারী ডরিস্‌কে কালরঙে চিত্রিত ও সজ্জিত করিয়া ঐ কলের পুতুলের মত করা হইল; এবং তাহাকে নিয়ন্ত্রিত বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া হইল। বালিকার অঙ্গভঙ্গী— এইরূপই যন্ত্রের ন্যায় ও দৃঢ়তার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল যে যাহারা রহস্য জানিত তাহারা ব্যতীত আর কেহই, সে যে কলের পুতুল নয়, ইহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিল না।

এই ঘটনায় তাহার আত্মসংযম ও সম্পূর্ণ তন্ময়তার অদ্ভুত শক্তির কথা তথায় সকলেরই মুখে শ্রুত হইতে লাগিল। এই প্রকারে তাহার খ্যাতি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইলে—সে, তিনবৎসর পুতুলরূপে পৃথিবীর নানাস্থানে তামাসা দেখাইয়া পুনঃ আমেরিকাতে ফিরিয়া আসিবে এবং ইহার জন্য ত্রিশ হাজার টাকা পাইবে এইরূপ আর একটী চুক্তির প্রস্তাব উপস্থিত হইল। এই প্রস্তাব তাহার প্রতিপালক পিতামাতা কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ গৃহীত হইল। কিন্তু ইহাতে পুতুলপ্রকৃতি বালিকার গুরুতর শ্রমের প্রয়োজন হইল। বালিকা প্রতিদিন ১০ দশ ঘণ্টা করিয়া প্রায় একবৎসরের জন্য যান্ত্রিক পুতুলের অভিনয়ের অনু-শীলন করিল। অবশেষে সে ইহাতে এরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়িল যে তাহার মনুষ্যবালিকাত্ব ও পুতুলরূপ দ্বৈতভাব তাহার নিকট ধাঁধাঁর মত বোধ হইতে লাগিল; কখন যে পুতুলের প্রকৃতি নিবৃত্ত হইয়া বালিকা ভাবের স্ফূর্ত্তি হইত বা বালিকার ভাব নিবৃত্ত হইয়া পুতুলভাবের আবেশ হইত তাহা বুঝিতে তাহার কষ্ট হইত।

তাহার অভিনয়ের বিবরণ এই:—"রঙ্গমঞ্চে তাহার অধ্যক্ষ বা অধ্যক্ষের মত লইয়া অন্য কেহ, তাহার পৃষ্ঠের কল্‌টী টিপিয়া দেয়, তখন সেই বালিকাপুতুল, পুতুলেরই ন্যায় অঙ্গবিক্ষেপাদি করিয়া নড়িতে থাকে; এবং পরিশেষে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে নীত হয়; তখন ইহাকে স্পর্শ ও উত্তোলন করিবার জন্য তাহাদিগকে অনুরোধ করা হয়। ইহারা সকলেই একবাক্যে ইহাকে অদ্ভুত যান্ত্রিক পুতুল বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। "ভদ্র মহোদয় ও ভদ্র মহিলাগণ! ধন্যবাদ! অদ্য রাত্রির জন্য বিদায়!" সস্মিত বদনে এইকথা বলিয়া পুতুলবেশধারিণী বালিকা অভিনয়ের উপসংহার করিলেও, তাঁহাদের পূর্ব্বোক্তমত পরিবর্ত্তিত হয় না। তাঁহাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে কলোৎপন্ন

(স্বরমুদ্রণ যন্ত্র) বা এবম্বিধ অন্যকোন কৌশলের দ্বারাই পূর্ব্বোল্লিখিত কথা বলা হইয়া থাকে।"

জার্ম্মেনিতে ইহার অনুকরণ হইলে অনুকৃতির বিরুদ্ধে একটী অভিযোগ উপস্থিত হয়, তাহাতে এই যান্ত্রিক বালিকাই অভিযোগকারিণী রূপে দাঁড়ায়। বিচারকগণের নির্জ্জন পরামর্শ করিবার সময় হইলে, যখন উপস্থিত সকলকেই বিচারালয় হইতে সরাইয়া দেওয়া হয় তখন এইটীকে নির্জ্জীবপুতুল মাত্রবোধে দ্বারবান্ সরাইবার প্রয়োজন মনে করে নাই। দুইঘণ্টা ব্যাপিয়া তর্কবিতর্কের মধ্যে বিচারকগণের তীক্ষ্ণদৃষ্টির সম্মুখে ইহার স্ফটিকবৎ নিশ্চল চক্ষুর একটী পলকও পড়িতে দেখা গেল না। তথাপি সেই পুতুলবৎ প্রতীয়মান বালিকা তাহার জার্ম্মেন-ভাষাজ্ঞান দ্বারা বিচারকদিগের তর্কের সম্পূর্ণ মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মোকদ্দমা ইহার বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হইলেও, ইহার পুতুলভাবের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম লক্ষিত হইল না; আকৃতি প্রকৃতি অণুমাত্রও বিচলিত হইল না। কিন্তু বিচারালয়ে পরাজিত হইলেও অনধিক এক সপ্তাহের মধ্যেই সাধারণ্যে নিম্নোক্ত মর্ম্মে তাহার বিজয় ঘোষিত হইল:—"একটী ক্ষুদ্র ক্ষীণ চতুর মার্কিন বালিকা কেবল যে অর্দ্ধ পৃথিবীকেই তাহার বিস্ময়জনক পুতুলাভিনয় দ্বারা স্তম্ভিত করিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু সুধীর বিচারপতিগণও, তাহা দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়াছেন। বিচারপতিদিগের নির্জ্জন পরামর্শের সময় অর্থী প্রত্যর্থী বা অপর কাহারও তাঁহাদের সহিত অবস্থান অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার হইলেও, এই বালিকাদ্বারা তাহা সঙ্ঘটিত হওয়ায় তাহার গর্ব্ব করিবার বিশেষ কারণ আছে।"

কোন সময়ে এই বালিকা গুপ্তানুসন্ধানকারী পুলিসের কার্য্যও করিয়াছিল। নিউইয়র্ক সহরে কোন গোদাম হইতে প্রভূত মালপত্র ক্রমান্বয়ে চুরি যাইতে থাকে। এরূপ ধূর্ত্ততার সহিত চৌর্য্যকার্য্য সম্পাদিত হয় যে তাহার কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না। গুপ্তানুসন্ধানকারী পুলিস কুমারী ডরিসের অদ্ভুত ক্ষমতার কথা জানিয়া তাহারই সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। স্থির হয় যে ডরিস্ খেলার পুতুলের বেশে অন্যান্য মোমের পুতুলের সঙ্গে গোদামে রক্ষিত হইবে।

এইরূপে রক্ষিত হইয়া ডরিস্ নিতান্ত স্ফূর্ত্তিহীন বোধ করিতে লাগিল, এমন সময় চৌকীদার তাড়াতাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাক হইতে জিনিসপত্র নামাইয়া লইয়া দ্রুত পদক্ষেপে তথা হইতে প্রস্থান করিল। আরও জিনিস লইবার জন্য পুনর্ব্বার তথায় এমনই বেগের সহিত প্রবেশ করিল যে, ডরিস্ ও আরও তিনটী পুতুল তাহার পায়ের ধাক্কাতে পড়িয়া গেল। তখন একটী পুতুলকে সজোরে উঠাইয়া রাখিতে রাখিতে সে অনুচ্চস্বরে বলিতে লাগিল 'এ সমস্ত বোবা পুতুল নিপাত যাউক।' এবং বোবা জ্ঞানে ডরিস্ ও অপর কয়েকটী পুতুলকে পতিত অবস্থায় রাখিয়াই সে দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সে বুঝিতে পারিল না যে ইহাদেরই মধ্যে তাহার কুকার্য্যের কথা প্রকাশ করিবার জন্য একটী বালিকা অচেতন বোবা পুতুলবেশে লুক্কায়িত রহিয়াছে। তখন বালিকা সাবধানে উঠিয়া বাহিরে আসিল, এবং মালসহ চৌকীদারকে ধৃত করাইয়া দিল। ইহাতে পুরস্কার স্বরূপ সে ২০০০৲ টাকা প্রাপ্ত হইল। তাহার এরূপ আশ্চর্য্য কৃতকার্য্যতা দর্শনে গুপ্তানুসন্ধানকারী পুলিস তাহাকে বিশেষ আর্থিক উন্নতির আশা দিয়া তাহাদের বিভাগে প্রবিষ্ট হইবার জন্য অনুরোধ করিল, কিন্তু বালিকা, পুতুলের অভিনয় করিয়া যশ উপার্জ্জন করাই অধিকতর ভাল বোধ করিয়া অনুরোধ উপেক্ষা করিল।

তাহার পুতুল প্রকৃতির নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটী আরও বিস্ময়কর। মেকসিকোতে বৃষযুদ্ধের চক্রের একস্থানে বালিকাটীকে রাখিয়া মদোদ্ধত একটী বৃষকে তাহার দিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। শিঙা-নাদের সহিত উন্মুক্ত বৃষটি অকস্মাৎ প্রবল আলোক ও উত্তালতরঙ্গবৎ দর্শকগণের জনতায় স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া পরক্ষণেই উন্মত্তবেগে, অবনত মস্তকে, কর্ণবধিরকারী গর্জ্জনের সহিত অগ্রপাদের আঘাতে মৃত্তিকা উৎখনন করিতে করিতে ধাবিত হইল। সম্মুখে একটী উচ্চস্থানের উপর স্মিতমুখী বালিকাকে দেখিয়া তাহার নিকটবর্ত্তী হইল। বালিকার মুখের উপর তাহার উষ্ণশ্বাস আসিয়া পড়িতে লাগিল। বালিকা পলক ফেলিলেই তাহার মৃত্যু অবধারিত ছিল। বৃষ সেখানে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। কিন্তু বালিকা

এরূপই নিশ্চল নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল যে বৃষ জীবনের কোন চিহ্ন তাহার মধ্যে লক্ষ্য করিতে না পারিয়া সজীব প্রতিপক্ষ মল্লের সন্ধানে ধাবিত হইল।

এই প্রকারের অদ্ভুত কার্য্য সকল করিবার জন্যই যেন তাহার শরীরের গঠনও, আশ্চর্য্য রকমের হইয়াছে। তাহার শরীরের উচ্চতা ৫ ফুট হইলেও, ২৩ ইঞ্চ দীর্ঘ, ১৩ ইঞ্চ প্রশস্ত ও ১৩ ইঞ্চ উচ্চ পেটিকার ভিতর তাহাকে পুরিয়া রাখা হয়—ইহাতে তাহার শরীরে অস্থি আছে বলিয়াই বোধ হয় না। কোন সময়ে জার্ম্মেনী হইতে ইহাকে ফ্রান্সে লইয়া যাইবার কালে সীমান্তে পরীক্ষার সময় ইহাকে এরূপ সঙ্কীর্ণভাবে জড়াইয়া দেখান হয় যে কোন মতেই ইহাকে পুতুল বলিয়া মাশুল আদায়কারীদিগের ভ্রম না হইয়া পারে নাই। ইহাতে তাহার দলের প্রচুর মাশুলের পয়সাও বাঁচিয়া যায়। তাহার গায়ে আলপিন্ বিদ্ধ করিলেও তাহার বেদনা বোধ হয় না। ইহাতে তাহার শরীরে স্নায়ু নাই বলিয়াই মনে হইবে।

একবার তাহার পুতুলত্ব পরীক্ষার জন্য তাহার মুখে জোরে চপেটাঘাত করা হয়, অন্যবার মস্তকে যেন আঘাত লাগে এজন্য তাহাকে উলটাইয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু তাহাতেও তাহার পুতুল প্রকৃতির কিঞ্চিন্মাত্রও অন্যথা দৃষ্ট হয় নাই।

যখন শরীরের সংলগ্ন কল্ টিপিয়া দেওয়া হয় তখন সে এরূপই দৃঢ় হয় যে পড়িয়া গেলেও ব্যথা পায় না।

এক রাত্রিতে যখন অধ্যক্ষ ও বালিকা সঙ্কীর্ণ মঞ্চের উপর দিয়া দর্শকমণ্ডলীর নিকট যাইতেছিল, তখন তাহারা পদস্খলিত হইয়া ৬ ফুট নিম্নে পড়িয়া যায় কিন্তু সেই পুতুলপ্রকৃতিক বালিকার একটী কেশও নড়ে নাই, পরন্তু পূর্ব্ববৎ স্ফটিকনিভ নিশ্চল দৃষ্টি ও দৃঢ় দেহে বালিকা উত্তোলিত হইল।

পুতুলের অভিনয়কালে তাহার শরীর আশ্চর্য্যরূপে স্থিতিস্থাপকতা গুণবিশিষ্ট হয়—তখন ঠিক পুতুলের ন্যায় যেরূপভাবে ইচ্ছা সেরূপভাবে রাখিলেও, সে পড়িয়া যায় না—শরীর অসম্ভবরূপ বক্রভাবে দোলাইলেও, তাহার ভারকেন্দ্রচ্যুতি হয় না।

এই সমস্ত সম্বন্ধে বালিকার নিজের উক্তি নিম্নে দেওয়া গেল:—"যখন আমার শরীরের যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করা হয়, তখন আমার গ্রন্থি সকল দৃঢ় হয় এবং আমি বিশেষরূপে দুলিতে পারি। আমার অভিনয়ের মধ্যে সময় সময় আমি সম্মুখস্থ মঞ্চের সমতলবর্ত্তী দীপাবলীর দিকে অসম্ভবরূপ হেলানভাবে দুলিয়া পুনঃ সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারি—আমি এরূপ করিতে থাকিলে দর্শকগণের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা ভারকেন্দ্রচ্যুত হইয়া সঙ্গীত স্থানের মধ্যে আমার উল্‌টিয়া পড়িবার আশঙ্কায় চীৎকার করিতে থাকে। কোন সময়ে আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য দর্শকমণ্ডলীর জনৈক ব্যক্তি আমার গণ্ডদেশে সজোরে চপেটাঘাত করে, অন্য সময়ে কোনও সন্দিহান আমেরিকাবাসী আমি ভঙ্গুর কি না দেখিবার জন্য আমাকে মস্তকে আঘাত লাগে এরূপভাবে উলটাইয়া ফেলিয়া দেয়।"

মানব-সর্প (Man-Serpent)।

গত মে মাসের Strand magazineএ "মানব-সর্প" শীর্ষক প্রবন্ধে কয়েকটী অত্যাশ্চর্য্য অঙ্গ-বিক্ষেপ (contortion) ব্যাপারের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল:—

কয়েক সপ্তাহ মাত্র গত হইল বার্লিন্ রঙ্গমঞ্চে একটী বিস্ময়াবহ কাণ্ড সঙ্ঘটিত হইয়াছে—যাহাতে দর্শকবৃন্দকে আবেগভরে বিলোড়িত হইতে হইয়াছে।

একটী ভদ্রলোক ভোজনকালোচিত অঙ্গরক্ষা ও দীর্ঘ মস্তকাবরণে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইলেন। তিনি পশ্চাদ্দিকে পদক্ষেপ করিয়া দর্শকদিগের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন—কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার মস্তক দর্শকদিগেরই দিকে পরাবর্ত্তিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। যখন তিনি মঞ্চের পাদ-আলোর প্রায় সন্নিকট আসিলেন, তখন মস্তক তদবস্থায় রাখিয়াই পৃষ্ঠদেশ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় স্থাপন করিলেন। অতঃপর দর্শকদিগকে অভিবাদন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই ব্যাপারে যে কিরূপ বিস্ময় উৎপাদিত হইয়াছিল, তাহা কল্পনা করা সম্ভবপর নহে।

বিখ্যাত ব্লণ্ডিন যেমন পাশ্চাত্য জগতে সটান রজ্জুর উপর দিয়া পাদচারণকারীদিগের অগ্রগণ্য বলিয়া স্বীকৃত হন, তদ্রূপ সুপ্রসিদ্ধ মানব-সর্প Marinelli (ম্যারিনেলি),

অঙ্গবিক্ষেপকারীদিগের আদর্শরূপে গৃহীত হইয়া থাকেন। তিনি কেবল সর্ব্বসাধারণেরই সমক্ষে আত্মগুণের পরিচয় দিয়াছেন তাহা নহে কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার্থ তিনি Paris (প্যারী) নগরীর চিকিৎসাসমিতির নিকটেও আপনার কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। তথায় চারিশত চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। ইহাঁরা প্রকাশ করিয়াছেন যে শরীরবিজ্ঞান ও অস্থিবিজ্ঞানের মূল-নিয়ম ইহার সম্বন্ধে প্রযুজ্য নহে।

ভারতীয় যোগিগণ হঠযোগের অভ্যাস দ্বারা ৪৮ প্রকার অঙ্গন্যাস শিক্ষা করিয়া থাকে। বাবা লক্ষ্মণ দাস মধ্য-ভারতের কৃষ্ণগহ্বরের (Black Caves) ধর্ম্মযাজকদিগের নিকট ১৪ বৎসর হঠযোগ শিক্ষা লাভ করিয়া অঙ্গন্যাস-প্রদর্শনীর ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কাশীতে ইহাঁর পূর্ব্বোক্ত কৌশল দর্শনে চমৎকৃত হইয়া বোম্বাইর একজন ইংরেজবণিক্ ইহাকে ইউরোপে যাইয়া কৌশল প্রদর্শন করিবার পরামর্শ প্রদান করেন। অঙ্গুলির অগ্রভাগের উপর ভর দিয়া সমস্ত শরীর শূন্যে বিলম্বিত রাখাই সম্ভবতঃ ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৃতকার্য্যতা। শিক্ষা সময়ে এই কৌশল আয়ত্ত করিবার জন্য ক্রমাগত ৭দিন ৭রাত্রি অবিচ্ছেদে ইহাকে অঙ্গুলির অগ্রভাগের উপর ভরদিয়া গুরুদিগের চক্ষুর সম্মুখে থাকিতে হইত।

উপরি বিবৃত দৃষ্টান্ত সকলের দ্বারা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত যে অসম্পূর্ণ ও শারীরবিকাশের যে অচিন্তনীয় প্রদেশ এখনও অননুশীলিত ও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে তাহা আমাদের সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে। তৎপ্রতি আমাদের গভীর চিন্তা ও অনুসন্ধান নিয়োজিত হইলে যে আরও অদ্ভুত সত্য প্রকাশিত হইতে পারে ইহা আমরা আশা করিতে পারি।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, (এম্, এ,)।
হেড্ মাষ্টার
আগরতলা হাইস্কুল
পোঃ আগরতলা ত্রিপুরা।

ধর্ম্ম।*

"সাধুদিগের রক্ষা এবং পাপীদিগের বিনাশের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।"

ভগবান সত্য সত্যই অবতীর্ণ হয়েন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ এবং মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু আবশ্যক বোধে তিনি যে, কোথা হইতে এরূপ সূক্ষ্ম কলকাটি নাড়িয়া দেন যাহাতে সম্ভব অসম্ভব হয় এবং অসম্ভবও সম্ভব হয়,—সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ এবং মতভেদ থাকিতে পারে না।

জগতের ইতিহাসে স্পষ্ট দেখা যায়, দেশে যখনই অধর্ম্ম এবং পাপের বোঝা অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠে, তখন কোথা হইতে যেন একটা রাক্ষসী ঝড় আসিয়া সমস্ত তোলপাড় করিতে থাকে,—নাড়িয়া চাড়িয়া, ভাঙ্গিয়া, কাটিয়া কুটিয়া, উড়াইয়া ছড়াইয়া মুহূর্ত্তে সমস্ত ছার খার করিয়া দেয়, চোখে মুখে দেখিবারও অবসর দেয় না,—ফলে কিন্তু দুর্গন্ধ-ময় দূষিত বায়ু সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যায়, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য স্বাস্থ্য পুনরুজ্জীবিত হয়, বহুকাল সঞ্চিত অপ্রকৃতিস্থতা দূর হইয়া সমগ্র দেশ সমগ্র জাতি প্রকৃতিস্থতা লাভ করে।

দেশের দুরবস্থার যে সকল কারণ বর্ত্তমান রহে তন্মধ্যে প্রধান কারণগুলি অন্তর্নিহিত, এবং সেই জন্য আমাদিগের নিকট অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্ট ভাবে দেখা দেয়। তাহারা মূল কারণ হইলেও বৃক্ষমূলের ন্যায় তাহাদের গতি সর্ব্বত্র আমাদের চর্ম্মচক্ষের গোচর নহে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার যো নাই---তাহারা অতিপ্রকাণ্ড অতিবৃহৎ সত্য। ভূমিকম্পে বাহিরে ঘর দোর বাড়ি ভূমিসাৎ হয়, কিন্তু তাহা ভূমধ্যস্থ অন্তর্বিপ্লবের বহির্বিকাশ মাত্র।

স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে এই অন্তর্বিপ্লব, ভিতরকার এই অসামঞ্জস্যই সমস্ত দুঃখ দৈন্যের মূল। কি সামাজিক কি রাজনৈতিক কি দৈব দেশের সকল দুরবস্থায় সকল বিপৎপাতে আমরা কেবল মাত্র বাহিরে কারণ অন্বেষণ করি, কিন্তু মূল কারণ যে অন্তরে অন্তরে শিকড় গাড়িয়া

* দেরাডুনে স্বামী বোঁওকা-তেঁও-এর আশ্রমে পঠিত।—লেখক।
এই প্রবন্ধ প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে আমাদের হস্তগত হইয়াছিল।
—প্রবাসী-সম্পাদক।

কোথায় কোন্ দূরে অধিষ্ঠিত তাহা দেখিতে পাই না। একটু যদি প্রণিধান করিয়া দেখি, দেখিতে পাইব, সকল দুঃখ, সকল দারিদ্র্য সকল অমঙ্গলের মূল—সেই এক কালবৃক্ষ "অধর্ম্ম।"

অনেকে হয় ত বলিবেন, কোন্‌টা ধর্ম্ম কোন্‌টা অধর্ম্ম কেমন করিয়া বুঝিব? মাপকাঠি কোথায়?—তুমি যাহা ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া মনে করিতেছ আমি তাহা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ অধর্ম্ম বলিয়া মনে করি, তুমি যাহা অধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেছ আমি তাহা ধর্ম্মানুগত মনে করি,—দাঁড়াইব কোথায়?—কথাটা কি সত্যসত্যই এইরূপ? সত্যসত্যই কি আমি মনে করি বা তুমি মনে করার উপর ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ভর করে; না ধর্ম্মাধর্ম্মেরই উপর তোমার আমার মনে করা, তোমার আমার অস্তিত্ব, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব নির্ভর করে? —ঈশ্বর যেমন এক, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, নিরবচ্ছিন্ন পরিপূর্ণ সত্য, তাঁহার মঙ্গল নিয়ম ধর্ম্মও কি সেইরূপ নহে? স্বয়ম্ভু স্বপ্রকাশ ঈশ্বরের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কি ধর্ম্মের প্রকাশ নহে? ঈশ্বরের সত্তা যেমন একইরূপে একই ভাবে সকলের নিকট প্রকাশমান, ধর্ম্মও কি সেইরূপ একইরূপে একই ভাবে চরাচরে বিদ্যমান নহে?—ধর্ম্ম এক বই দুই নহে,—ধর্ম্ম তোমার নিকট একরূপ অন্যের নিকট বিভিন্নরূপ হইতেই পারে না।

পুস্তকে পাঠ করা যায় চীনজাতির মধ্যে পূর্ব্বে এক প্রথা ছিল যে, পিতা অতিরিক্ত বৃদ্ধ হইলে তাহারা বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করিয়া ভবযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি দান করিবার চেষ্টা করিত। তাহারা মনে করিত অনেক বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিয়া অনর্থক কেবল যন্ত্রণা ভোগ করিতে দেওয়া অপেক্ষা বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করাই শ্রেয়। চীনজাতি এই পিতৃহত্যাকে হয়ত মনে মনে ঠিক ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিত, কিন্তু তাহাদের এই মনে করা, এই বিশ্বাস, এই ধারণা সত্যসত্যই কি ধর্ম্মপদবাচ্য! জ্ঞান বিচার ও বিবেকের মুখ বন্ধ করিয়া অন্ধসংস্কার বশতঃ কাজ করার নাম কি ধর্ম্ম?—হত্যা যদি অধর্ম্ম হয়, তাহা কথনও কোন সময়ে কোন জাতির নিকট ধর্ম্ম হইতে পারে না,—ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস হইতে পারে, ধারণা হইতে পারে, সংস্কার হইতে পারে, কিন্তু তাহা ধর্ম্ম নহে।

ঘড়িতে অতিরিক্ত দম দিলে প্রথমটা যেমন খট্ করিয়া একটা শব্দ হয় এবং তাহা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আরও দম চালাইতে লাগিলে শেষে যেমন সমস্ত স্প্রিংসুদ্ধ খুলিয়া আসিয়া ঘড়িকে নষ্ট করিয়া ফেলে, সেইরূপ ধর্ম্মের অনুশাসন অতিক্রম করিয়া চলিতে গেলে প্রথমে বুকের মধ্যে একটা "ধড়াস" করিয়া উঠে এবং তথাপি সাবধান না হইয়া না মানিয়া চলিতে থাকিলে অবশেষে নিশ্চিত একেবারে বিনাশের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়। বুকের মধ্যে এই "ধড়াস" করাকে বিবেকের "ইসারা" বা "তাড়না" বলা যাইতে পারে।—স্থাননির্ব্বিশেষে, কালনির্ব্বিশেষে, জাতিনির্ব্বিশেষে লোকনির্ব্বিশেষে কাহারও ইহার হাত হইতে এড়াইবার যো নাই। পিতৃবধকালে পিতৃহন্তৃ চীনজাতির বুকের মধ্যে কোথাও না কোথাও এইরূপ একটু ধড়াস্ করিয়া উঠিত না কি? নিশ্চয়ই! তাহারই ফলে আজ তাহারা এই বর্ব্বর প্রথা উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে।

বিচার ও তর্ক দ্বারা ধর্ম্মের যে অর্থ প্রতিপন্ন হয় সহজ জ্ঞানেও তাহাই হয়। যাহা শুভ, যাহা শ্রেয়স্কর, যাহা মঙ্গলময় তাহাই ধর্ম্ম,—ধর্ম্ম মঙ্গলের নামান্তর মাত্র। "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা"—এই সূত্রের ব্যাখ্যায় শবর স্বামী লিখিয়াছেন, "য এব শ্রেয়স্করঃ স এব ধর্ম্মশব্দেনোচ্যতে"—. তিনি আরও বলিয়াছেন "যঃ পুরুষং নিঃশ্রেয়সেন সংযুনক্তি স ধর্ম্মশব্দেনোচ্যতে।"—অমর লিখিয়াছেন—"স্যাদ্ধর্ম্মম স্ত্রিয়াং পুণ্য শ্রেয়সী সুকৃতং বৃষঃ।"—ভবিষ্যপুরাণে আছে—"ধর্ম্মঃ শ্রেয়ঃ সমুদ্দিষ্টং শ্রেয়োঽভ্যুদয় সাধনম্।"—তর্কশাস্ত্রে "অধর্ম্ম" শব্দের অর্থ আছে—"প্রতিষিদ্ধক্রিয়াসাধ্যঃ স গুণোঽ ধর্ম্ম উচ্যতে।"

তবে দাঁড়াইতেছে যাহা শুভ, যাহা বিহিত, যাহা সঙ্গত তাহাই ধর্ম্ম,—যাহা অশুভ, অবিহিত, অসঙ্গত তাহাই অধর্ম্ম।

ইংরাজি Religion শব্দ আমাদের ধর্ম্ম শব্দের ভাববাচক প্রতিশব্দ নহে। ধর্ম্ম শব্দ আমাদের শাস্ত্রে বহু ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। যাহা দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধৃত, বা যাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাই ধর্ম্ম। সকল বস্তুই ইহার অন্তর্গত। ইহকাল পরকাল অনাদিকাল লইয়া ইহার স্থিতি,—পরমানন্দরূপে ইহার প্রতিষ্ঠা,—ইহার

অনুশাসন জীবনের প্রত্যেক পৃষ্ঠা, প্রত্যেক পংক্তি প্রত্যেক অক্ষরে সংযুক্ত।

লৌকিক, ব্যবহারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ধর্ম্ম প্রভৃতি নামে কেবল প্রভেদ মাত্র—সকলই সেই এক চক্রবর্ত্তী সম্রাট বৃহদ্ধর্ম্মেরই ছায়ামাত্র,—জল একই, কেবল আধার বিভিন্ন। ইহা আমাদের দেশ যেরূপ বুঝিয়াছিল অন্য কোন দেশ সেরূপ ভাবে বুঝে নাই। এই জন্য আমাদের দেশে আচারে ব্যবহারে, ক্রিয়াকর্ম্মে জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটিতে ধর্ম্মের এত অনুশাসন। ধর্ম্মের নামে যে সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সকলই যে, প্রকৃত ধর্ম্ম তাহা নহে, ধর্ম্মের নামে সংযুক্ত হওয়াতেই তাহারা সর্ব্বথা পালনীয় হইয়াছে। ইহাতে ধর্ম্মেরই মাহাত্ম্য বাড়ান হইয়াছে—নিয়মের দুষ্টতায় ধর্ম্মের মূল্য হ্রাস হয় নাই।

ধর্ম্ম শব্দে যাহা বুঝায় তাহা সাংসারিক সুখদুঃখের বহু ঊর্দ্ধে স্থিত। আপাত ভাল লাগা বা না লাগা, আপাত মধুর বোধ হওয়া বা না হওয়া, আপাত সুখোৎপাদন বা দুঃখোৎপাদনের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই। উষর ক্ষেত্রে বীজ উপ্ত হওয়া এবং শাখাগ্রভাগে ফল বিলম্বিত হওয়ার মধ্যে যে সকল বহিরুৎপাত, যে কালবিলম্ব বর্ত্তমান রহে, তাহা অবশ্যম্ভাবী ফলের সহিত বীজের সম্বন্ধ কখনই বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। যখন একবার ফল ধরিয়াছে, ফল পাকিয়াছে, বীজশক্তি ফলরূপে পরিণত হইয়াছে—তখন অন্তর্বর্ত্তী ঝঞ্ঝাবাত, শিলাঘাত কীটানুদংশন প্রভৃতি সহস্র উৎপাত বহিরাবরণ মাত্র,—ফল কিম্বা বীজের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। কোথা হইতে যে, রসপ্রবাহ সঞ্চারিত হইয়া শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হয় তাহা কে বলিতে পারে!—ধর্ম্ম বীজ একবার রোপিত হইলে অবিলম্বে হৌক, বা কালবিলম্বে হৌক, তাহা হইতে সুমিষ্ট ফল ফলিবেই ফলিবে,—সুখ দুঃখ তাহাকে কিছুতেই নষ্ট করিতে পারে না।

বুদ্ধদেব তাঁহার উপদেশে ধর্ম্মের যে আটটি চরমপন্থার উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে আত্মার নির্ম্মল নিস্পৃহ স্বাধীন অবস্থাকে অন্যতম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অবস্থায় সত্য স্বীয় যথার্থ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়। এই অবস্থাপন্ন ভিক্ষু, কিম্বা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর ও চীরবল্কলধারী ভিক্ষুকের কোনই প্রভেদ নাই। এই অবস্থা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলিতেছেন,—"সংসারাসক্ত ব্যক্তি ইহাকে একেবারে হাল ছাড়িয়া দেওয়া—'নৈরাশ্য' বলিবে, কিন্তু যিনি বুদ্ধ তিনি ইহাকে নির্ম্মল পরিপূর্ণ 'আনন্দ' বলিবেন,—সংসারাসক্ত ব্যক্তি ইহাকে 'বিধ্বংস' বলিবে, কিন্তু যিনি বিশুদ্ধ তিনি ইহাকে 'অমরতা' আখ্যা দিবেন,—সংসারাসক্ত ব্যক্তি ইহাকে 'মৃত্যু' বলিবে, কিন্তু যিনি আত্মজয়ী তিনি ইহাকে 'অনন্ত জীবন' বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন।"

এই আত্মজয়ীর নিকট সকলেই পরাস্ত। যাহার স্পৃহা নাই, কামনা নাই, সুখ দুঃখ ভেদ নাই, তাহার নিকট পৃথিবীপতিও বিজিত,—তাহার নিকট হইতে কিই বা কাড়িয়া লইবে, তাহাকে কিই বা দিবে! নেপোলিয়ন বিশ্বজয়ী হইয়াও আপনাকে জয় করিতে পারেন নাই, সেই-জন্য তাঁহার এত দুঃখ, জীবনের শেষ অঙ্ক এত নিরানন্দময়! নেপোলিয়নের মানসিক ক্লেশই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল ;—তাঁহার তখনকার অবস্থার তুলনায় পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা পরাধীন জাতির অতি নিকৃষ্ট দীনহীন প্রজারও অবস্থা স্পৃহনীয় বলিয়া বোধ হয়। নেপোলিয়নের দুরাকাঙ্ক্ষা, নেপোলিয়নের বর্ব্বরতা, নেপোলিয়নের অকারণে নিরপরাধিনী লক্ষ্মী স্ত্রী যোসেফাইনকে পরিত্যাগ,—এই সকল অধর্ম্মের ফল যাইবে কোথায়!—বাইবেলে ধর্ম্মহীনের এই ক্ষণিক অভ্যুত্থান সম্বন্ধে লেখা আছে—

"They are exalted for a little while, but are gone and brought low; they are taken out of the way as all other, and cut off as the tops of the ears of corn."

আত্মার স্বাধীনতা হারাইয়া বাহিরের অধীনতায় কি আসে যায়!—যাহার আত্মা স্বাধীন, তাহাকে বাহিরের সহস্রনিগড়ে আবদ্ধ রাখিলেও নিষ্প্রভ নিস্তেজ হতশ্রী করিতে পারে না। যাঁহারা বলেন, সংসারে থাকিয়া এইরূপ নিষ্কাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে সংসার কখনই চলিতে পারে না, তাঁহারা অতিশয় ভ্রান্ত। নিষ্কাম ধর্ম্ম অর্থে নিশ্চেষ্টতা নহে, জড়তা নহে, আলস্য নহে,—নিষ্কাম ধর্ম্ম অর্থে আত্মবশে থাকিয়া ভগবদ্দত্ত শক্তির যথার্থ প্রয়োগ, সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার। সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মপথে চলিলে কি হইতে পারে বা না পারে আমাদের পুরাণে তাহার ভুরি

ভূরি দৃষ্টান্ত আছে,—বাইবেলে "যোবে"র আখ্যায়িকায় ইহার একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত।

অধুনাতন আমরা "বৈরাগ্য" শব্দ যেরূপ অসদর্থে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছি, প্রকৃতই উহার অর্থ সেরূপ নহে। "রাগ" অর্থে যাহা রঙ করে, যাহা মনকে অন্তরকে সুখ দুঃখে অনুরঞ্জিত করে, যাহা আত্মার স্বাভাবিক নির্ম্মল অবস্থাকে ষড়রিপুর প্রকাশে কলুষিত করে। "বিরাগ" বা "বৈরাগ্য" অর্থে যাহাতে বাহিরের কোন রঙ ফলান নাই যাহাতে আর কিছুরই ছাপ নাই, যাহা আত্মার সহজ শুভ্র নির্ম্মল অবস্থা। "রাগ" হইতেই সকল প্রকার ক্লেশের উৎপত্তি। ইংরাজি Passion শব্দ এবং আমাদের "রাগ" শব্দ একই ভাববাচক। ইংরাজি Passion শব্দ লাটিন Passio, from Patior to suffer হইতে উৎপন্ন। নানা কারণে অন্তরে ক্লেশানুভূতির নামই Passion। এই জন্য ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীষ্টের শেষ যন্ত্রণাকালকে ইংরাজিতে Passion কহে। এই রাগ বা Passionকে পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক সংসারে থাকিয়া "বৈরাগ্য" অবলম্বন করিলে সংসার কখনই অচল হয় না,—বরঞ্চ সংসারের, সমাজের, সমস্ত দেশের মুখশ্রী ফিরিয়া যায়। এই নিমিত্তই আমাদের শাস্ত্র সংসারে থাকিয়া বৈরাগ্য অভ্যাস করিবার পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন, বৈরাগ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বৈরাগ্যকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়াছেন। বৈরাগ্য অর্থে আত্মার সহজ স্বাভাবিক অবস্থানুযায়ী কর্ম্ম,— আত্মার কর্ম্মের নাশ নহে।

সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে কি একটা আশ্চর্য্য ঐক্য দেখা যায়। এই যে জগতে সৎ এবং অসতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব এবং পরিশেষে সৎ-এরই জয়লাভ, ইহাই পরিস্ফুট করা সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেরই মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের শাস্ত্র বল, খ্রীষ্টিয়ানদের বাইবেল বল, বৌদ্ধদের ধর্ম্মপদ, শিখদের গ্রন্থসাহেব, জৈনদের কল্পসূত্র, পারসীদের আবেস্তা—সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই এই "সৎ," "শ্রেয়," "ধর্ম্মের"ই জয়ঘোষণা করিতেছে। "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" ইহা একটি মহাসত্য না হইলে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে এই বিষয়ে এইরূপ একটা সুন্দর ঐক্যবন্ধন থাকিত না। ধর্ম্মের শুভ ফল এবং অধর্ম্মের অশুভ ফল আমরা সাংসারিক হিসাবে হাতে হাতে পাইলাম না বলিয়া মনে করিতে পারি, কিন্তু কালোহয়ং নিরবধিঃ,— কালেরও ত সীমা নাই!

আমরা আজ সহসা অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছি,— বিকারগ্রস্ত রোগীর আক্ষেপের ন্যায় হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছি;—আমরা গৃহদ্বারে পাপ-আবর্জ্জনা রাখিয়া পরের মলিনতায় নাসিকা কুঞ্চিত করিতেছি,—অন্তরে অধীনতার শৃঙ্খল বহন করিয়া বাহিরের স্বাধীনতার জন্য লোলুপ হইয়াছি,—ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিতেছি না, স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোন উপায় হোক্ না কেন অবলম্বন করিতে বসিয়াছি,—ভাবিতেছি না যে, শুধু পরের দোষ দেখাইয়া নিজের দোষ ক্ষালন হয় না—নিজ সুকৃতি দ্বারাই একমাত্র পরের দুষ্কৃতিকে জয় করা যায়। সত্যসত্যই যদি আমরা ভগবৎকৃপার অধিকারী হইতে চাহি, তবে ধর্ম্মকে সহায় করিয়া আমাদিগকে ধীরে ধীরে উঠিতে হইবে,—ধর্ম্মের নামে যে সকল পাপাচার ঢুকিয়াছে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিতে হইবে—অন্তরের বাহিরের সমস্ত জঞ্জাল পরিষ্কৃত করিয়া আমাদিগকে বিশুদ্ধ হইতে হইবে। যে অধর্ম্ম করে সে তাহার ফলভোগ ত করিবেই, তাই বলিয়া আমরা কেন অধর্ম্মের দ্বারা আমাদের পাপের ভার আরও বর্দ্ধিত করি! একটি সামান্য ফুল ফুটাইতে ভগবানের কি অসীম ধৈর্য্য!—তিনি আপন মঙ্গল-নিয়মকে কখনও লঙ্ঘন করেন না,—আর আমরা আজ ধৈর্য্য হারাইয়া রাতারাতি দেশকে যেমন তেমন করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চাহি!—তাহাও কি সম্ভব!—ধৈর্য্য ভিন্ন আর আমাদের উপায় নাই, ধর্ম্ম ভিন্ন আর আমাদের গতি নাই,—

"ধর্ম্মং চর,—
ধর্ম্মানুষ্ঠান কর,
"ধর্ম্মাৎপরং নাস্তি,—
ধর্ম্মের পর আর নাই,
"ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ মধু।
ধর্ম্মই সমস্ত জীবের মধুস্বরূপ।

শিশুকে যেমন সহস্রব্যঞ্জনসংযুক্ত দিব্য রাজভোগ দিলেও তাহার মুখে রুচে না, কিন্তু মাতা যদি সামান্য অন্নটুকুও স্বহস্তে মুখে তুলিয়া দেন তাহা তাহারই নিকট

কি সুমিষ্ট কি অমৃতময় বলিয়া বোধ হয়!—সেইরূপ যিনি প্রকৃত ধার্ম্মিক তাঁহার নিকট পৃথিবীর আর যাবতীয় ভোগ-বিলাস সুখৈশ্বর্য্য সমস্তই তুচ্ছ নগণ্য, কেবল ধর্ম্ম-মাতার স্বহস্তপরিবেশিত সামান্য সামগ্রীটুকুও মধুস্বরূপ, অমৃতময়।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ধর্ম্মের বলবত্তা।

পরম সম্মানাস্পদ লেখকপ্রধান শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীতে আমার "দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব" প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়টির সম্বন্ধে যেরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমার মনে হইল যে লেখকের সহিত পাঠকের সাধারণ-ভাবের একটা বোঝা পড়া না থাকিলে, লিখিত প্রবন্ধের সমালোচনা কখনই ঠিক্ হইতে পারে না। সমালোচক পাছে মূলের ভাবার্থ এক বুঝিতে আর বুঝিয়া তাহার ভুল ধরেন, এই ভয়ে প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে টীকা টিপ্পনী এবং ভাষ্য জুড়িয়া দিতে হইলে লেখকের পক্ষে তাহা যে কিরূপ কষ্টকর ব্যাপার তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। তাহা হইলে,—হয় একটা বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড ভয়ঙ্কর! পথ চলিবার সময় তীর্থযাত্রীকে ঘটি বাটি থালা পাথর চা'ল ডা'ল লবণ প্রভৃতি নানাবিধ উপকরণ সামগ্রী অদ্ভুত গোচের গণ্ডাছুই প্রকাণ্ড পকেটের মধ্যে পুরিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিতে হইলে সে-বেচারীর যেরূপ দশা হয়, টিপ্পনীভারগ্রস্ত প্রবন্ধের অবিকল সেইরূপ দশা হয়। তাহা হইলে পথিকের পক্ষেও যেমন—প্রবন্ধের পক্ষেও তেম্নি—ছয় দিনের পথ ছয় মাসেও অতিবাহন করা দুর্ঘট হইয়া ওঠে। আমার ঐ ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে আমি যে, কি ভাবে কোন্ কথা বলিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারা কিছুই কঠিন নহে:—অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসীস্ স্বারাজ্যপন্থীদিগের রীতি পদ্ধতির সঙ্গে মার্কিন দেশীয় স্বারাজ্যপন্থীদিগের কার্য্যকলাপের রীতিপদ্ধতির তুলনা প্রসঙ্গে বলিয়াছি "ওয়াশিঙ্‌টন্ ধর্ম্মের অবতার ছিলেন বলিলেই হয়," আর বলিয়াছি যে, উঁহার ধর্ম্মপ্রধান অধ্যবসায়ের ফল "নিষ্কণ্টক স্বারাজ্য-লাভ"। আমার ঐ সকল কথার সঙ্গে আমি অনায়াসে এইরূপ একটা টীকা বা টিপ্পনী সংলগ্ন করিয়া দিতে পারিতাম:—

"আমার কথার ভাবার্থ এ নহে যে, ওয়াশিঙ্‌টন্ দ্বিতীয় যীশুখ্রীষ্ট ছিলেন বা দ্বিতীয় শুকদেব গোস্বামী ছিলেন। আমার কথার ভাবার্থ এই মাত্র যে, রবস্‌পিয়র্ প্রভৃতি ফরাসীস্ স্বারাজ্যপন্থীদিগের এবং ঐ শ্রেণীর আর আর বিপ্লবকারীদিগের তুলনায় ওয়াশিঙ্‌টন্ দেবতা ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই ভাবার্থটি এক কথায় ব্যক্ত করিতে হইলে অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, ওয়াশিঙ্‌টন্ যথাসম্ভব ধর্ম্মের অবতার ছিলেন। তেম্নি, যে জায়গাটিতে আমি বলিয়াছি "নিষ্কণ্টক স্বারাজ্য-লাভ," সে জায়গায় নিষ্কণ্টক শব্দের ভাবার্থ—যথাসম্ভব নিষ্কণ্টক।

যাহা আমি অনায়াসে করিতে পারিতাম তাহা যে আমি করি নাই—আমার ঐ ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির ছত্রে ছত্রে ঐ রকমের টীকা এবং টিপ্পনী যোজনা করিয়া আমি যে, সময়ের, পুঁথির পাতা'র, এবং পরিশ্রমের অপব্যয় করি নাই, সমালোচক মহাশয় যদি ভাবিয়া দেখেন তবে তিনি আপনিই বলিবেন যে, তাহা না করিয়া তাঁহাকে আমি বহুতর বৃথা-পরিশ্রমের দায় হইতে বাঁচাইয়াছি।

ফল কথা এই যে, আমার ঐ ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে আমি যে বিষয়টা'র প্রতি সহৃদয় সজ্জনমণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য আয়াস পাইয়াছি, বাদ-প্রতিবাদের তরঙ্গ-কোলাহলে তাহা টলিবার বস্তু নহে। "যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ" এটা যদি আমরা ব্যালা থাকিতে দেখিয়া না শিখি, তবে যথাকালে আমাদিগকে তাহা ঠেকিয়া শিখিতে হইবেই হইবে, ইহা অভ্রান্ত বেদবাক্য।

কিন্তু দেখিয়া শিখিবার প্রণালী পদ্ধতি আছে। আমার ঐ প্রবন্ধটির মন্তব্য কথা ইহা নহে যে, যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ের প্রামাণিক দৃষ্টান্ত পথে ঘাটে ছড়াছড়ি যাইতেছে—দর্শক কেবল চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেই তাহা সম্মুখে বিরাজমান দেখিতে পাইতে পারে। "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" এ কথাটি মনে বোঝা যদিচ খুবই সহজ, কিন্তু উহা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রত্যক্ষবৎ মূর্ত্তিমান্ দেখিতে হইলে বিধিমতে বুদ্ধি-বিবেচনা খাটাইয়া মুখ্য মুখ্য দেশ কাল পাত্রে অনুসন্ধান চালনা ব্যতিরেকে উহা সহজে দেখিতে পাইবার বিষয়

নহে। প্রবাদই আছে "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।" ধর্ম্মের তত্ত্ব অ্যাকা কেবল না—ধরিতে গেলে বিজ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব সকলও 'নিহিতং গুহায়াং'; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিজ্ঞানতত্ত্বও যেমন—ধর্ম্মতত্ত্বও তেমি—দুইই—গুহার মধ্য হইতে মাথা তুলিয়া যথাকালে, যথাদেশে, যথাপাত্রে, যথা-পরিমাণে দেখা দিতে কার্পণ্য করে না। "যতোধর্ম্মস্ততো-জয়ঃ" এটা যেমন একটা সোজা কথা, এটাও তেমি একটা সোজা কথা যে, সকল বস্তুর যেমন গুরুত্ব আছে বায়ুরও তেমি গুরুত্ব আছে। কিন্তু একটি অনভিজ্ঞ বালককে শিক্ষক যখন বলেন যে, পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তুরই এক হাত পরিমাণ চৌকা অংশের উপরে অন্যূন পঞ্চাশ মণ বায়ুভার চাপানো রহিয়াছে, তখন বালকটি সে কথার অর্থ ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে না পারিয়া শিক্ষকের মুখের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে। শিক্ষক বালকটিকে ঐ বিজ্ঞানতত্ত্বটা অনেক করিয়া বুঝাইলেও, বায়ুমণ্ডল যে লোহার সিন্দুকের ন্যায় ভারি বস্তু, এ কথায় ক্ষুদ্র বেচারীটির মন কিছুতেই সায় দিতে পারিয়া ওঠে না। শেষে যখন বালকটি শিক্ষকের নিকটে বায়ুভারের একটি দৃষ্টান্ত দেখাইবার প্রার্থনা জানায়, তখন শিক্ষক একটা বায়ুমান যন্ত্র তাহার চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া তাহাকে বলেন "এই দেখ বায়ুভারের চাপে চোঙের ভিতরে পারা'র দাঁড়িটা কত উচ্চে উঠিয়াছে।" বায়ুভারের দৃষ্টান্ত শিক্ষক এ যাহা দেখাইলেন, বালকটি তাহা চক্ষে দেখিল বটে; কিন্তু শুধু কেবল চক্ষে দেখিলে—কি হইবে? তাহার মন বোঝে কই? সে ভাবিল—বায়ুভারের চাপে পারা তো নীচে নাবিবারই কথা—উপরে উঠিবে কেমন করিয়া? এরূপ সংশয়ের অবস্থায় বালকের উচিত—আপনার কথা পাঁচ কাহন না করিয়া, শিক্ষককে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার কথার প্রকৃত তাৎপর্য্যটি ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা। "বায়ুর আবার ভার আছে"-এ কথাটি যেমন অনভিজ্ঞ বালকের বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া মনে হয় না; "ধর্ম্মের আবার জয় হয়" এ কথাটিও তেমি অধুনাতন কালের আপাতদর্শী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। "যেখানে বায়ু, সেই খানেই বায়ুভার" এ কথা যেমন অজ্ঞ লোকের সংস্কার বিরুদ্ধ; "যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই জয়" এ কথাও তেমি আপাতদর্শী পণ্ডিত লোকের সংস্কারবিরুদ্ধ। অজ্ঞ লোকের ঐরূপ কুসংস্কারের কারণ যেমন বায়ুর সূক্ষ্মতা; আপাতদর্শী পণ্ডিত লোকের কুসংস্কারের কারণ তেমি ধর্ম্মের সূক্ষ্মতা। কথাই আছে—"ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতিঃ।" পুনশ্চ, বায়ুর ভার যেমন সব স্থানে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাহার প্রত্যক্ষ ফল সকল স্থানে সকল ভাবে দর্শকের চক্ষে ধরা দ্যায় না;—বায়ুমান যন্ত্রের পারদ-কোষে এক ভাবে ধরা দ্যায়—উচ্চ পর্ব্বতশিখরে আর এক ভাবে ধরা দ্যায়—বায়ুনিষ্কাশনী যন্ত্রের (air pumpএর) বায়ুশূন্য কাচঘরে কারাবরুদ্ধ জল-চয়ের বাষ্পোদগীরণে তৃতীয় আর এক ভাবে ধরা দ্যায়, তা বই সকল স্থানে সকল ভাবে ধরা দ্যায় না; সেইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলাফল জনসমাজের সর্ব্বত্রই তলে তলে কার্য্য করা সত্ত্বেও, তাহা সকল স্থানে সকল ভাবে দর্শকের চক্ষে ধরা দ্যায় না। যতোধর্ম্মস্ততোজয়ের বিশিষ্টরূপ পরিচয় লাভ করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনায় বিধিমত বুদ্ধি বিবেচনা সহকারে অনুসন্ধান চালনা করা নিতান্তই আবশ্যক। রব্‌স্‌পিয়রের আমলে রব্‌স্‌পিয়রের খুবই জয় হইয়াছিল, কিন্তু সেরূপ বেতালা এবং বেসুরা জয় যে, সর্ব্বনাশের পূর্ব্ব-সূচনা ইহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির চক্ষে ধরা পড়িতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় না। আবার তাও বলি—অপরে যে যাহা বোঝে বুঝুক্—কিন্তু আমরা এটা বেশ বুঝিতে পারি যে, ইংরাজ রাজপুরুষেরা দায়ে পড়িয়া যখন মার্কিনদিগের সহিত বিবাদ মিটাইবার ভান করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের সেই কুইন্‌স্ প্রোক্লেমেষণ-গতিকের ক্ষণিক সদয়ভাবের বালির বাঁধের উপরে বিশ্বাস স্থাপন না করা'তে মার্কিন দেশীয় স্বারাজ্যপন্থীরা আপনাদের সুবুদ্ধিমত্তা'র বিশিষ্টরূপে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ-মাত্র নাই; বাক্য দ্বারা নহে—পরন্তু কার্য্য দ্বারা—তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে অদূরদর্শী লোকদিগের মতো, তাঁহারা একটুতেই নাচিয়া উঠিবার পাত্র ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা আমার বক্তব্য এই যে, ওয়াশিংটন্ এবং তাঁহার দলস্থ ব্যক্তিরা স্পেনের দুর্ব্বৃত্ত সেনাপতিদিগের ন্যায় নিষ্ঠুরাচারীও ছিলেন না, আর, এলিজাবেথের আমলের জাহাজের কাপ্তেনদিগের ন্যায় বোম্বেটেও ছিলেন না;

তাঁহারা স্বাধীনতাপ্রিয় বীরপুরুষ ছিলেন, আর, সেইমতো কার্য্য করিয়াছিলেন—উচ্চ অঙ্গের ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম এবং রাজ-ধর্ম্মের প্রতি যথাসম্ভব দৃষ্টি স্থির রাখিয়া ন্যায়যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা সকলেরই জানা কথা।

পুরাণের যে জায়গাটিতে লেখা আছে "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং" সেই জায়গায় উহার সঙ্গে আর একটি কথা জোড়া লাগানো আছে এই যে, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।" এ কথাটির ভিতরের ভাব এই যে, ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বের ঠিকানা পাওয়া জনসাধারণের পক্ষে দুরূহ হইলেও মহাপুরুষদিগের প্রবর্ত্তিত কার্য্যকলাপে তাহা প্রত্যক্ষবৎ মূর্ত্তিমান্ হয়। খ্রীষ্টান লোকেরা যে বলেন "যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশে নিহত হইয়াও বিশ্ববিজয়ী" তাঁহাদের এ কথা একটুও মিথ্যা নহে। এটাও তেম্নি বলা যাইতে পারে যে, বুদ্ধদেব রাজ্যৈশ্বর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া পথের ভিখারী হইয়াও বিশ্ববিজয়ী। এ সকল কথা হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় মহা প্রকাণ্ড, তাই আমার ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি ও-সকল অলোকসামান্য বিষয়ের আলোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া আমার মনে হয় নাই। আত্মার গভীর অন্তস্তলস্পর্শী সার্ব্বভৌমিক এবং সনাতন ধর্ম্মের চিরন্তন জয় স্বতন্ত্র, আর, সময়োচিত ধর্ম্মের সময়োচিত জয় স্বতন্ত্র। ওয়াশিংটন্ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপরায়ণ বীরপুরুষদিগের দৃষ্টান্তে সময়োচিত ধর্ম্মের সময়োচিত জয়ই দেখিয়া শিখিবার বিষয়, ইহা বলা বাহুল্য। "সময়োচিত ধর্ম্ম আবার কি? সব ধর্ম্মই তো সনাতন ধর্ম্ম!" কথাটা খুবই ঠিক্! কিন্তু হায়—বিশুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের আধিপত্য পৃথিবী-মধ্যে যেরূপ হওয়া উচিত—হইয়াছে তাহা কথায় এবং পুঁথির পাতা'র যতটা-দূর পর্য্যন্ত, কার্য্যে (বিশেষতঃ বড় বড় রাজা এবং রাজপুরুষদিগের বড় বড় কার্য্যে) তাহার সিকির সিকিও হইতে পারিবার পক্ষে বাধাবিঘ্ন এতাধিক প্রবল যে, তাহার উন্মত্ত তরঙ্গকোলাহলের ভিড় ঠেলিয়া বিশুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের সারগর্ভ উপদেশ লোকের কর্ণকুহরে পৌঁছিতে-না পৌঁছিতেই মাঝপথে লোপ পাইয়া যায়। এক্ষণকার কালে তাই রাজ্যসুদ্ধ লোকের ধারণা এইরূপ যে, বিশুদ্ধ ধর্ম্মের ভাব কার্য্যে পরিণত করিতে যাওয়া একপ্রকার বৃথা চেষ্টা, অতএব তাহাতে ক্ষান্ত থাকাই পরামর্শসিদ্ধ। কিন্তু যাহাই হোক্ না কেন—সনাতন ধর্ম্মের পবিত্র আদর্শ সভ্যজাতি মাত্রেরই পরম পূজ্য সামগ্রী তাহাতে আর ভুল নাই। ফলেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেশ বিদেশের সমস্ত সভ্য জাতিই ঐ পরম পবিত্র আদর্শটিকে—সভ্যতাই বলো—মনুষ্যত্বই বলো—আর মনুষ্যের দেবত্বই বলো—এম্নিতরো যত প্রকার মহদ্‌গুণ মনুষ্যজাতির মস্তকের ভূষণ, সমস্তেরই মূল আকর বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন, আর, সেই জন্য কোনো সভ্যজাতিই উহার প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে পারৎপক্ষে ক্রটি করেন না। তবে কেন সুসভ্য জনসমাজের ভদ্রলোকেরা বিশেষত কর্ত্তৃপক্ষীয় ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরা বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে প্রবৃত্ত না হ'ন। কেন যে তাঁহারা তাহাতে প্রবৃত্ত হ'ন না, তাহার কারণ ইচ্ছার অভাব তত নহে—যত শক্তির অভাব। মনুষ্যের সে বল কই—সে স্বর্গীয় প্রভাব কই—মুখ চক্ষুর জ্যোতি কই? তেজোময় ঐশী শক্তিকে আশ্রয় করিয়া যে-মঙ্গলশক্তি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে পারে—সে শক্তিতে কাহার স্বত্বাধিকার? মনুষ্যের—না আর কোনো জীবের? কিন্তু সে শক্তি কোথায়? ন্যায় সত্য ক্ষমা দয়া কোথায়? ঈশ্বরানুরাগ কোথায়? মনুষ্যত্ব কোথায়? আমি তাই বলি যে মানুষ এখনো মানুষ হয় নাই। মনুষ্যসমাজে ব্যাঘ্র ভল্লুক আছে লক্ষ লক্ষ, ছাগ-মেষ আছে লক্ষ লক্ষ, ভূত পিশাচ আছে লক্ষ লক্ষ; কিন্তু যাহাকে মানুষ বলা যাইতে পারে, সেরূপ মনুষ্য যদি কোটির মধ্যে একটি আধটিও খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব হয়, তবে তাহা মনুষ্যমণ্ডলীর আশাতীত পরম সৌভাগ্যের বিষয়। ফল কথা এই যে পৃথিবীর মস্তক-স্থানীয় ক্ষমতাশালী পুরুষেরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত মনুষ্যত্বের উচ্চ শিখরে অধিরূঢ় না হইতেছেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত মনুষ্যের কিছুতেই নিস্তার নাই; আর, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে হইলে সনাতন ধর্ম্মের বিশুদ্ধ আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করা ব্যতিরেকে অন্য কোনো উপায়েই তাহা সম্ভাবনীয় নহে। অধুনাতনকালে, যেখানে যে পরিমাণে বাহুবল এবং মস্তিষ্ক-বল গর্ব্বে স্ফীত হইয়া ধরা'কে সরা জ্ঞান করিতেছে দেখিতে

পাওয়া যায়, সেখানে সেই পরিমাণে আসল বলের শোচনীয় হীনাবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। আর, সেই দেবস্পৃহনীয় মনুষ্যোচিত মঙ্গল-শক্তির অভাবে পৃথিবীস্থ সমস্ত সুসভ্য জাতিগণের মধ্য হইতে ক্রন্দন এবং হাহাকার ধ্বনি উঠিতেছে গগন ভেদ করিয়া দিবারাত্র, ইহাও আমরা চক্ষে দেখিতেছি। এ কথা সত্য যে, সুসভ্য জাতিগণের কর্ত্তৃপক্ষীয় মহাত্মারা বিশুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের আদর্শকে লোকসমাজে মূর্ত্তিমান করিয়া স্ব স্ব দেশীয় জনসাধারণকে উচ্চ অঙ্গের সভ্যতার বা মনুষ্যত্বের ব্রহ্মডাঙার টানিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন খুবই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া; আর একেবারেই তাঁহারা অভিলষিত বিষয়ে সিদ্ধি লাভ না করিতেছেন তাহাও নহে; ষোলো আনার জায়গায় অন্ততঃ এক আনা সিদ্ধি লাভ করিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কোনো সুসভ্য জাতিই "ধর্ম্মোন্নতিতে কাজ নাই" বলিয়া মনুষ্যসমাজের প্রধানতম কার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া—চারিদিকের তুফানের মাঝখানে হাল ছাড়িয়া দিয়া—নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নাই। সুসভ্য জাতিদিগের মাথালো মাথালো বিজ্ঞ এবং কর্ম্মী লোকেরা সাধারণ লোকসমাজকে ধর্ম্মসোপানের আর এক ধাপ উচ্চে উঠাইয়া দিবার জন্য চেষ্টারও ত্রুটি করিতেছেন না—অনুষ্ঠানেরও ত্রুটি করিতেছেন না;—সম্মুখের বাধা-বিঘ্নের সঙ্গে যুদ্ধও করিতেছেন কম না;—পারিয়া উঠিতেছেন না কিন্তু কিছুতেই! এ যাহা আমি বলিতেছি ইহার একটা জাজ্বল্যমান প্রমাণ—

অধুনাতন সুসভ্য জাতিগণের মধ্যে সার্ব্বলৌকিক রাজসভার (International Parliamentএর) গোড়া-পত্তনের প্রস্তাবনা। কিন্তু ঐ সুমহৎ মঙ্গল কার্য্যটির উদ্যোগকর্ত্তারা এখনো পর্য্যন্ত এটা জানেন না যে, তাঁহাদের জাতির বহির্মুখী সভ্যতা যেরূপ দুর্দমনীয় প্রচণ্ড বেগে স্বার্থের পথে দৌড়িয়া চলিয়াছে, সেই দানবী সভ্যতাটাকে যত দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা মানবী সভ্যতার পথে অর্থাৎ পরমপরিশুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের পথে বাগাইয়া আনিতে না পারিবেন ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা সকলে মিলিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া সহস্র চেষ্টা করিলেও আশানুরূপ ফল-লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। এটা তাঁহাদের জানা উচিত যে, কোনো এক জাতি ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিশূন্য স্বার্থান্ধ বাণিজ্যব্যবসায়ের সাধনপটুতায় অপরাপর জাতিকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া আত্মগরিমায় স্ফীত হইয়া উঠিলে পার্শ্ববর্ত্তী বলবান্ জাতিরা কখনই তেমনতরো বিষাক্ত জাতির সহিত সদ্ভাবে মিলিতে পারিবেনও না—সদ্ভাবে মিলিতে চাহিবেনও না। এটা যেমন উঁহাদের জানা উচিত, আর-একটি কথা তেমনি দেশীয় স্বারাজ্য-পন্থীদিগের জানা উচিত; সে কথা এই যে, বিভিন্ন পাশ্চাত্য জাতিদিগের মধ্যে স্বার্থমূলক প্রতিদ্বন্দিতা যেরূপ মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, আমাদের দেশের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে তেমনতর কোনো দুরপনেয় প্রতিবন্ধক বিদ্যমান নাই। এই জন্য সনাতন ধর্ম্মকে আদর্শরূপে মাঝখানে দাঁড় করাইয়া আমাদের দেশের চতুঃসীমার অন্তর্ব্বর্ত্তী বিভিন্ন জাতিগণের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের উপায় চেষ্টা ওরূপ একটা অসাধ্যসাধন ব্যাপার নহে। আমি তাই বলি যে, ঐ সময়োচিত ঐক্যসাধন কার্য্যটির উপরে আমাদের স্বদেশের মঙ্গল তো বটেই তা ছাড়া সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গল প্রধানত নির্ভর করিতেছে জানিয়া কায়মনোবাক্যে সেইটি ঘটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করা দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই প্রধানতম কর্ত্তব্য কার্য্য।* আর পুঁথি বাড়াইব না;—দুই জাতির দুইতরো বিভিন্ন ধাঁচার স্বভাব চরিত্র পর্য্যালোচনা

* লক্ষ্মীর বরপুত্র আকবর শা সনাতন ধর্ম্মের আধিপত্য যথাসম্ভব মানিয়া চলিয়া হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কেবল, তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের দৌরাত্ম্যে তাঁহার সে চেষ্টা রীতিমত ফলবতী হইতে পারিল না। অলক্ষ্মীর বরপুত্র ঔরঙ্জীব সেই ঐক্যের পথে কণ্টক আরোপ করিয়া আপনার এবং মোগল-সাম্রাজ্যের রসাতল-প্রয়াণের পথ প্রস্তুত করিবার কেমন ওস্তাদ্ ছিলেন তাহা কাহারো অবিদিত নাই। আমার এইরূপ মনে হয় যে, মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে আর্য্য এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী-দিগের মধ্যে বিরোধ এবং বৈরিতা'র পরিবর্ত্তে ঐক্য এবং সদ্ভাব থাকিলে আমাদের দেশের এরূপ দুর্গতি হইত না। কোনো চীনদেশীয় বিজ্ঞ লোক যদি বলেন যে, ভাল মন্দ নির্ব্বিশেষে বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগের আবালবৃদ্ধবনিতার উপরে যেরূপ মর্ম্মবিদারক নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া তাহাদিগকে আবর্জ্জনার ন্যায় ভারতবর্ষ হইতে সমূলে ঝাঁটাইয়া ফ্যালা হইয়াছিল, সেই পাপের ফলে তাহার অনতিপরে ভারতবর্ষ পরহস্তগত হইল, তবে তাঁহার সে কথা আমরা যে হাসিয়া উড়াইয়া দিব, তাহার জো নাই। কেননা, পৃথ্বীরাজের আমলে যদি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব দেশ হইতে সমূলে লোপ পাইয়া না যাইত, তাহা হইলে অশ্বমেধের অলীক আড়ম্বর মৃত্যুশয্যা হইতে কুক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়া দেশীয় রাজাদিগের আপনা আপনির মধ্যে বৈরিতানল প্রজ্বলিত করিয়া তুলিত না; আর তাহার উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া ভারতলক্ষ্মী লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া মুসলমান সেনাপতির আশ্রয় বাঞ্ছা করিতে যাইতেন না।

করিয়া যেরূপ প্রণালী পদ্ধতি অবলম্বন করা আমাদের দেশের পক্ষে শ্রেয়স্কর বলিয়া আমার মনে হয়, তাহা যতদূর পারা যায় সংক্ষেপে (অর্থাৎ ইঙ্গিত ইসারার কোনোমত প্রকারে) বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করি।

আমাদের দেশের প্রতি প্রকৃতি যেরূপ সদয়, পাশ্চাত্য ভূগোল-খণ্ডের প্রতি তাহার সিকির সিকিও নহে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্যে প্রকৃতির কার্য্য-প্রণালী প্রভূত যত্ন এবং অধ্যবসায়ের সহিত দেখিয়া শেখা গতিকে পাশ্চাত্য জাতিরা জিতিয়া গিয়াছে, এবং এ দেশের লোকেরা এক্ষণে ঠেকিয়া শিখিতে বাধ্য হইতেছে। পাশ্চাত্য জাতিদিগকে প্রকৃতিমাতা যাহা দ্যান নাই, তাহারা বৈজ্ঞানিক কলকৌশল প্রভৃতির সাহায্যে তাহার খাঁক্তি পূরণ করিয়া মস্ত বড়লোক হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগকে প্রকৃতিমাতা অপর্য্যাপ্ত ধনধান্য দিয়াছেন; আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা তাই বৈজ্ঞানিক কলকৌশলের দিকে না গিয়া, অধ্যাত্ম যোগের সাধন দ্বারা আত্মার অভাব পূরণ করিবার জন্য কষ্ট স্বীকার যত দূর করিতে হয় তাহা করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য দেশের সাধন বিজ্ঞান-প্রধান; আমাদের দেশের পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগের সাধন নিঃশ্রেয়সপ্রধান। পাশ্চাত্য-প্রদেশীয় বৈজ্ঞানিক সাধন দ্বারা জনসমাজে মঙ্গলফল যতটা ফলানো যাইতে পারে, তাহা অনেকদূর পর্য্যন্ত ফলিত হইয়া চুকিয়াছে; তাহা হইতে তাহা অপেক্ষা আর বেশী ফলের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। আমরা চক্ষে দেখিতে পাই বা না পাই, তাহাতে বড় একটা আইসে যায় না—কিন্তু কথা এটা খুবই সত্য যে, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের তপস্যার ফল কোথাও যায় নাই; এই খানেই —এই দুঃখভারপ্রপীড়িত ভারতভূমিতেই—তাহা সরস্বতী-নদীর ন্যায় অন্তর্নিগূঢ় রহিয়াছে। যাঁহার চক্ষু আছে তিনি দেখিতে পাইতেছেন যে, স্বার্থপ্রধান দানবীসভ্যতার অন্তিম দশা ক্রমে ঘুণাইয়া আসিতেছে; ধর্ম্মপ্রধান মানবী-সভ্যতা গুহাগহ্বরের মধ্য হইতে আলোকে মস্তক উত্তোলন করিবে, তাহার জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতেছে। ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রথমে অরাজকতার গর্ব্ভে একপ্রকার ক্ষত্রিয়-প্রধান (chivalric) সভ্যতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; তাহার পরে সেই ক্ষত্রিয়প্রধান সভ্যতার গর্ব্ভে এক্ষণকার কালের এই বৈশ্যপ্রধান (industrial) সভ্যতা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহার পরে বৈশ্যপ্রধান সভ্যতার গর্ব্ভে যে প্রতিলোম-ক্রমে অর্থাৎ উল্টা পদ্ধতিক্রমে ধর্ম্মপ্রধান সভ্যতা জন্মগ্রহণ করিবে, তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ধর্ম্মপ্রধান সভ্যতা মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ, আর সেই জন্য মঙ্গল শক্তির সবিশেষ কার্য্যকারিতা ব্যতিরেকে তাহা ঘটিয়া উঠিতে পারে না। দানবীসভ্যতা বিরোধমূলক, মানবী-সভ্যতা ঐক্যমূলক। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, ধর্ম্মপ্রধান মানবীসভ্যতা আমাদের এই পুণ্য ভারতভূমিতেই গোকুলে বাড়িতেছে। সমস্ত ভারতবর্ষ যদি আজ ঐক্যে ভর করিয়া দাঁড়ায়, তবে সেই ঐক্যের মধ্য হইতেই মনুষ্যজাতির চিরাভিলষিত মানবীসভ্যতা হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইবে ইহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। আমরা এখন বেঘোরে পড়িয়া প্রাণের দায়ে শক্তি শক্তি করিয়া সারা হইতেছি, এবং পাশ্চাত্য জাতিদিগের দেখাদেখি বিরোধশক্তি উদ্বোধনের পন্থা অবলম্বন করিতেছি; জানি না যে ঐক্যশক্তির কিরূপ অপরাজিত বল। পৃথিবীতে যে, বিরোধের পালা সাঙ্গ হইয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—পাশ্চাত্য জাতিগণের মধ্যে সার্ব্বলৌকিক রাজসভা সংস্থাপনের প্রস্তাবনা। এখনকার এই নূতন যুগের প্রত্যেক নূতন ঘটনা আমাদিগকে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেছে যে, কালের গতি নূতন আর একদিকে ফিরিয়াছে। অতএব, আর এখন ঠেকিয়া শিখিতে না গিয়া ব্যালা থাকিতে দেখিয়া-শেখাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। নচেৎ, সব'তাতেই আমরা পাশ্চাত্য জাতিগণের ধামা ধরিয়া চলিলে তৃণাচ্ছাদিত কূপে পড়িয়া প্রাণ হারাইব। এখন যে, পৃথিবীতে দানবীশক্তির পালা সাঙ্গ হইবার এবং সেই সঙ্গে মানবীশক্তির পালা আরম্ভ হইবার উপক্রম হইয়াছে—এটা আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না; তাই মঙ্গল বা স্বাধীনতা লাভের উপায় ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম, এ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে প্রশ্ন উঠিতে পারিতেছে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"উপনিষদের উপদেশ।"

'উপনিষদের উপদেশ" ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম, এ, মহাশয়, সমালোচনার জন্য আমাদিগকে এক খণ্ড গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন। গ্রন্থখানি ৩৬৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, ইহার মধ্যে অবতরণিকাটি ১৮৩ পৃষ্ঠা ব্যাপিনী। এই অবতরণিকাতে গ্রন্থকার শঙ্করের মতামত বিষয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

১। ব্রহ্ম নিত্য জ্ঞান স্বরূপ।

ব্রহ্ম যে নিত্য জ্ঞান স্বরূপ এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ হইতে পারে না। তবে একটী কথা মনে রাখা উচিত যে ব্রহ্মকে জ্ঞাতা বলা যাইতে পারে না—ব্রহ্ম 'জ্ঞানম্' ইহাই সত্য (তৈঃ ভাঃ ২।১)। গ্রন্থকারের মতে "শব্দ স্পর্শাদি বিজ্ঞানগুলি আত্মার জ্ঞেয়।" এই কথাগুলি ব্যবহারিক ভাবেই সত্য, পারমার্থিক ভাবে নহে। গীতাভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন "অবিক্রিয় বিজ্ঞান-স্বরূপে বিজ্ঞাতৃত্ব উপচার করা হইয়াছে"—"বিজ্ঞাতৃত্বোপচারাৎ" (১৩।৩)। 'উপচারাৎ' (figuratively) শব্দটীর প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আত্মার জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব, দ্রষ্টৃত্বাদি সমুদয়ই উপচার বশতঃ "কর্তৃত্ব মুপচর্য্যাত আত্মনঃ" (বৃঃ ভাঃ ৪।৩।১১) তেন কর্তৃত্বম্ উপচর্য্যতে, ন স্বতঃ কর্তৃত্বম (৪।৩।১৭) ; তেন উপচর্য্যতে দ্রষ্টা ইত্যাদি (৩।৪।২)।

২। ব্রহ্ম নিত্য শক্তি স্বরূপ।

গ্রন্থকারের এই সিদ্ধান্তটী অতি গুরুতর। তাঁহার যুক্তি এই ব্রহ্ম যখন সমস্ত বস্তুর প্রেরক, তখন বলিতেই হইবে ব্রহ্মে কর্তৃত্ব আছে সুতরাং ব্রহ্ম শক্তিশালী। গ্রন্থকার ইহাও বলিয়াছেন "ব্রহ্ম, সন্নিধি মাত্রেই ইন্দ্রিয়াদির প্রেরক" পৃ ৩৪। শঙ্কর ব্রহ্মকে প্রেরক বলিয়াছেন ইহা সত্য কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মের প্রেরকত্ব ব্যবহারিক ভাবেই সত্য, পারমার্থিক ভাবে ব্রহ্মের প্রেরকত্ব স্বীকার করা যায় না। গীতাভাষ্যে শঙ্কর লিখিয়াছেন—"সন্নিধি মাত্রেণাপি কর্তৃত্বম্ গৌণমেব ১৮।৬৭। অর্থাৎ সন্নিধি বশতঃ ব্রহ্মের যে কর্তৃত্ব তাহা গৌণ (figurative)। "ন গৌণেন মুখ্যং কার্য্য নির্ব্বর্ত্ত্যতে" অর্থাৎ এই কর্তৃত্বে কোন মুখ্য কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। 'এ অবস্থায় আত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার করা যায় না, কারণ কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে বলা হয় যে কার্য্য না করিলেও কারক হওয়া যায়'—"তৎ অসৎ অকুর্ব্বতঃ কারকত্ব প্রসঙ্গাৎ।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্মের প্রেরকত্ব লৌকিক ভাবেই সত্য। পারমার্থিক ভাবে ইহা সত্য নহে। সুতরাং কল্পিত কর্তৃত্ব বশতঃ ব্রহ্মকে কর্তা, শক্তিশালী বা শক্তি স্বরূপ বলা যাইতে পারে না।

ব্রহ্মের প্রেরকত্ব প্রমাণ করিবার জন্য গ্রন্থকার কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(ক) তিনি বলেন কেনোপনিষদ্ ভাষ্যে (১।২) ব্রহ্মকে 'তৎ সামর্থ্যম্' অর্থাৎ "সামর্থ্যস্বরূপ" বলা হইয়াছে। দুই একখানা বাজে সংস্করণে (যেমন শ্রীমহেশচন্দ্র পাল বা ভুবনমোহন বসাকের) এইরূপ পাঠই আছে, কিন্তু এ সমুদয় সংস্করণের কোন মূল্যই নাই। পুণা 'আনন্দাশ্রম' সংস্করণে "তৎসামর্থ্য নিমিত্তম্' এইরূপ পাঠ আছে। এই পাঠই যে ঠিক পাঠ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। (১) নারায়ণ কৃত 'দীপিকাতে' এস্থলে শঙ্করের ভাষ্যই অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে এবং এই দীপিকায় পাঠ 'তৎসামর্থ্য নিমিত্তম্'। (২) পূর্ব্বোক্ত স্থলে 'শ্রোত্র' বিষয়ে 'তৎসামর্থ্য নিমিত্তম্' বলা হইয়াছে। মন আদি ইন্দ্রিয় বিষয়েও দীপিকাতে 'নিমিত্ত' শব্দের ব্যবহার রহিয়াছে। (৩) ঐ অংশের দীপিকাতে—'শঙ্করানন্দ' বহুবার 'সামর্থ্যকারণম্' ব্যবহার করিয়াছেন। 'কারণম্' এবং 'নিমিত্তম্' সমপর্য্যায়ের কথা। সুতরাং দেখা যাইতেছে ভাষ্যের পাঠ 'তৎ সামর্থ্য নিমিত্তম্';—'তৎসামর্থ্যম্' নহে। ইহার অর্থ ব্রহ্ম "শ্রোত্রাদির সামর্থ্যের কারণ।" ইহা যে ব্যবহারিক ভাবে সত্য তাহা আমরা গীতাভাষ্যেই (১৮।৬৭) দেখিয়াছি এবং পরেও দেখিব ('খ' অংশ দ্রষ্টব্য)। আর এস্থলে যদি 'তৎসামর্থ্যম্' এইরূপ পাঠই থাকিত তা হইলেও নির্গুণ ব্রহ্মবাদের' কোন হানি হইত না। ক[illegible] লৌকিকভাবে ব্রহ্মকে অনেক অনুচিত বিষয়ও আরোপ করা হ[illegible] থাকে। (বৃঃ ভাঃ ১।২।১৪)।

এই অংশের টীকাতে আনন্দ গিরি বলিয়াছেন "রজ্জু যেমন সর্পাদি অধ্যাসের অধিষ্ঠান, তেমনি চৈতন্য ও শ্রোত্রাদি অধ্যাসের অধিষ্ঠান।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শ্রোত্রাদি সর্পাদির ন্যায় মিথ্যা কল্পনা।

(খ) উক্ত উপনিষদের ভাষ্য হইতে (১।৪) গ্রন্থকার আরও একটী অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। অংশটী এইরূপ অনুবাদ করা হইয়াছে, "বাগিন্দ্রিয় ব্রহ্ম জ্যোতি দ্বারা প্রেরিত হইয়াই বক্তব্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়।" পৃ২২।

পাদটীকায় (foot note) লিখিয়াছেন "স্পষ্টতঃই এ সকল স্থলে পূর্ণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকেই 'সামর্থ্য স্বরূপ' বলা হইয়াছে।" পৃ ২২।

আনন্দগিরির ব্যাখ্যা যদি ঠিক হয় তাহা হইলে বাগিন্দ্রিয়াদি রজ্জু-সর্পের ন্যায় মিথ্যা। মিথ্যা কল্পনা বিষয়ে ব্রহ্মকে 'সামর্থ্য স্বরূপ' প্রমাণ করিয়া কোন লাভ নাই।

আর আমরা এখানেও ভাষ্যে "সামর্থ্য স্বরূপ" বা অনুরূপ কোন কথাই খুঁজিয়া পাইলাম না। বরং ভাষ্যে যাহা লিখিত আছে তাহাতে গ্রন্থকারের বিরোধী মতই প্রতিপন্ন হয়। ভাষ্যকার এই স্থলে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হইতে এই অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন "যো বাচমন্তরো যময়তীতি বাজসনেয়কে।" এখানে "অন্তর্যামী"র কথাই বলা হইয়াছে। শঙ্করের মতে এই অন্তর্যামী—সগুণ ব্রহ্ম, ইনি অবিদ্যা-মূলক (বৃ হঃ ভাঃ ৩।৮ ভাষ্য শেষ)।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "আত্মচৈতন্যই ইন্দ্রিয়াদির প্রেরক।...এই জন্যই শ্রুতিতে আত্মচৈতন্যকে শ্রোত্রের শ্রোত্র, প্রাণের প্রাণ, মনের মন বলা হইয়াছে।—পাঠক এ সকল অপেক্ষা স্পষ্টতর উক্তি আর কি হইতে পারে?" পৃ ২১—২২। কেনোপনিষদে ব্রহ্মকে শ্রোত্রের শ্রোত্রাদি বলা হইয়াছে সত্য কথা কিন্তু কি অর্থে এই কথাগুলি বলা হইয়াছে, শঙ্কর ত কেনোপনিষদের পূর্ব্বোল্লিখিত অংশেই তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যে অংশ উদ্ধৃত করিলে নিজের মত আপাতঃ সমর্থিত হয় গ্রন্থকার সেই অংশই উদ্ধৃত করিয়াছেন আর সেই ভাষ্যেরই যে অংশ নিজ মতের সম্পূর্ণ বিরোধী গ্রন্থকার সে অংশ গোপন করিলেন। ইহাতে কি সত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে? ঐ ভাষ্যেরই (১।৪) শেষ অংশে শঙ্কর বলিতেছেন "তিনি বাক্যের বাক্য, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, কর্তা, ভোক্তা, বিজ্ঞাতা, নিয়ন্তা, প্রশাসিতা; ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ ইত্যাদি কথা ব্যবহারিক ভাবেই বলা হইয়াছে; কিন্তু ব্রহ্ম অব্যবহার্য্য, নির্ব্বিশেষ, পরম ও সাম্য। ব্যবহারিক ভাবে যাহা বলা হইয়াছে তাহা ত্যাগ করিয়া আত্মাকেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া জান ইহাই শব্দার্থ। ঈশ্বরাদি অনাত্মবস্তু এবং উপাধি ভেদ বিশিষ্ট। লোকে ঈশ্বরাদিকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে কিন্তু ঈশ্বরাদি ব্রহ্ম নহে।"

পাঠকগণ দেখিলেন যে লৌকিক ভাষায় ব্রহ্মকে শ্রোত্রের শ্রোত্র, কর্তা, জ্ঞাতা, নিয়ন্তাদি বলা যাইতে পারে কিন্তু প্রকৃত অর্থে তাঁহাকে

প্রকারে বর্ণনা করা যায় না। আরও একটী বিষয় লক্ষ্য করা উচিত—এখানে ঈশ্বরকে 'অনাত্মা' বলা হইয়াছে।

(গ) ঐতরেয় উপনিষদ্ হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে "নিষ্ক্রিয় শান্ত সর্ব্বপ্রকার উপাধিবর্জ্জিত ব্রহ্মই জগতের বীজ স্বরূপ অব্যক্ত শক্তি বা মায়া শক্তির প্রবর্ত্তক" পৃঃ ২৬।

গ্রন্থকার একটী মারাত্মক কথা গোপন করিয়াছেন। কথাটী এই—"উপাধি সম্বন্ধেন।" উপাধি বশতঃই ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞাদি সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। এই "উপাধি" শব্দের অর্থ কি? মনে কর স্ফটিকের নিকট জবাকুসুম রহিয়াছে; এই জন্য স্বচ্ছ স্ফটিককে রক্তবর্ণ বলিয়া মনে হইতেছে। এই স্থলে জবাকুসুমকে স্ফটিকের উপাধি বলা হয়। স্ফটিক যেমন কখন রক্তবর্ণ হয় না তেমনি ব্রহ্মও কখন শ্রোতা, মন্তা জ্ঞাতা অন্তর্যামী ইত্যাদি হইতে পারেন না। স্ফটিককে যেমন রক্তবর্ণ বলিয়া ভ্রম হয় তেমনি উপাধি বশতঃই ব্রহ্মকে অন্তর্যাম্যাদি বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। বিদ্যারত্ন মহাশয় যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন সে অংশে এই উপাধির কথাই বলা হইয়াছে।

(ঘ) গীতা ভাষ্য দ্বারাও গ্রন্থকার নিজ মত সমর্থনের প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলেন "শঙ্করাচার্য্য এই নির্ব্বিশেষ শক্তিকে গীতায় 'বল শক্তি' নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহারই পূর্ব্ব শ্লোকের ভাষ্যে মায়াশক্তির উল্লেখ আছে। এই স্বরূপভূত বলশক্তি—মায়াশক্তি হইতে ভিন্ন, ইহাও সে স্থলে দেখাইয়াছেন। পৃ ৩৪—৩৫।

"বলশক্তি' মায়াশক্তি হইতে ভিন্ন" শঙ্কর পূর্ব্ব শ্লোকের ভাষ্যে এরূপ কোন কথা বলেন নাই। পরন্তু আনন্দ গিরি ইহার বিপরীত কথাই বলিয়াছেন। ভাষ্যে আছে "বল শক্ত্যা"। আনন্দ গিরি বলেন "শক্তির্মায়া তয়া" অর্থাৎ 'শক্তি' অর্থ "মায়া"।

সুতরাং নিগুর্ণ ব্রহ্ম যে শক্তি স্বরূপ তাহা প্রমাণিত হইল না।

কোকিলেশ্বর বাবু ব্রহ্মকে "শক্তি স্বরূপ" বলিতে চাহেন। তাঁহার মতে "শক্তি"ই ব্রহ্মের "স্বরূপ" অর্থাৎ 'শক্তি' ও 'ব্রহ্মসত্তা' একই বস্তু। এখন দেখা যাউক গ্রন্থকারের মতে এই শক্তির প্রকৃতি কি। তিনি এ বিষয়ে এই মত প্রকাশ করিতেছেন :—

"শক্তির অবস্থান্তর ঘটে মাত্র কিন্তু তদ্বারা শক্তির ধ্বংস হয় না। শক্তির রূপান্তর হইলেও শক্তি ঠিকই থাকে। কেবল রূপ বা আকার গুলি মাত্র নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে।" পৃ ১১৮—১১৯। গ্রন্থকার নিজেই বলিতেছেন শক্তি 'নিয়ত' পরিবর্ত্তনশীল। শক্তিই যখন ব্রহ্মের স্বরূপ তখন ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে "ব্রহ্ম নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল"। ব্রহ্মকে 'শক্তি স্বরূপ' বলিলে এই প্রকার সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হইবে।

গ্রন্থকার বহু স্থলে "নির্ব্বিশেষ শক্তি" এইরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। বলা হইতেছে 'শক্তি' অথচ সেই সঙ্গে সঙ্গে বলা হইতেছে ইহা "নির্ব্বিশেষ"। ইহাকেই বলে "সোনার পাথর বাটী"। গ্রন্থকার কি ইতিপূর্ব্বেই এই শক্তির অশেষ গুণ বর্ণনা করেন নাই? যে শক্তি (গ্রন্থকারের মতে) এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে সে শক্তি কি "নির্ব্বিশেষ"?

উপনিষদাদি গ্রন্থের অনেক স্থলে এবং শঙ্করের গ্রন্থেও ব্রহ্মকে শক্তিশালী বলা হইয়াছে আবার বহু স্থলে ইহাও বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মে কোন প্রকার শক্তি নাই। এখন ইহার মীমাংসা কি? শঙ্কর নিজেই ইহার মীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম 'শক্তি রহিত' কেবল অবিদ্যাবশতঃই তাঁহাকে শক্তিশালী বলিয়া ভ্রম হয়। পারমার্থিক ভাবে তিনি নিগুর্ণ, লৌকিক ভাবে তিনি সগুণ। জ্ঞানচক্ষে তিনি নির্ব্বিশেষ অজ্ঞানতার চক্ষে তিনি সবিশেষ।*

৩। নিগুর্ণ ব্রহ্মের বিকার!

গ্রন্থকার আর একটী মারাত্মক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন "সগুণ ব্রহ্মও নিগুর্ণ ব্রহ্মের অবস্থান্তর মাত্র"। শঙ্করের কোন শিষ্য শঙ্করের নামে এই মত চালাইতে পারেন তাহা আমাদের ধারণা ছিল না। বৃহদারণ্যক ভাষ্যে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে যে সগুণ ব্রহ্ম বা জীবাত্মাকে কিম্বা অপর কোন বস্তুকে নিগুর্ণ ব্রহ্মের অবস্থা কিম্বা শক্তি বলা যাইতে পারে কি না। শঙ্কর নানাপ্রকার যুক্তি তর্ক দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ইহাদিগকে ব্রহ্মের অবস্থা বা শক্তি বলা যাইতে পারে না। "অবস্থা-শক্তী তাবৎ ন উপপদ্যেতে" বৃঃ ভাঃ ৩।৮। গীতা ভাষ্যেও বলা হইয়াছে যে আত্মার অবস্থা ভেদ স্বীকার করা যায় না "আত্মনোঽবস্থাভেদানুপপত্তেঃ" ১৩।৩।

সগুণ ব্রহ্মকে যে শঙ্কর 'অনাত্মা' বলিয়াছেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি।

আত্মা কখন অনাত্মা রূপে পরিণত হইতে পারেন না এবং অনাত্মাও কখনও আত্মা হইতে পারে না। বেদান্ত ভাষ্যের প্রারম্ভেই শঙ্করাচার্য্য ইহার সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন।

৪। মায়া ব্রহ্মসত্তারই বিকার!

গ্রন্থকার বলেন শঙ্করের মতে "মায়া ব্রহ্ম সত্তারই রূপান্তরিত অবস্থা" "উহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তারই একটা বিশেষ অবস্থা—একটা রূপান্তর মাত্র"। পৃঃ ৭৮। "উহা ব্রহ্মসত্তারই অবস্থা বিশেষ মাত্র" পৃঃ ৯৩। "ব্রহ্ম অনন্ত শক্তি স্বরূপ। সৃষ্টির প্রাক্কালে এই অনন্তশক্তি জগদাকারে অভিব্যক্ত হইবার উপক্রম করিয়াছিল, শক্তির এই পরিণাম বা আগন্তুক অবস্থা বিশেষকে লক্ষ্য করিয়াই ইহাকে একটী পৃথক নাম দ্বারা নির্দেশ করা হইয়া থাকে। পরিণামোন্মুখিনী এই শক্তির নাম মায়াশক্তি।" পৃঃ ৩৬। তত্ত্বদর্শী জানেন "উহাকে মায়াশক্তিই বল, আর যাহাই বল না কেন, উহা একটী অবস্থান্তর মাত্র, উহা ঐ পূর্ণ শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে।" পৃঃ ৫৬।

গ্রন্থকার বলিতেছেন যে মায়া ব্রহ্ম "সত্তা"র রূপান্তর, ব্রহ্ম "স্বরূপের" রূপান্তর। ইনিই অন্যত্র (পৃঃ ৭৩) আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন যে "ব্রহ্মের কোন রূপান্তর হয় না" "অবস্থান্তর প্রতীত হয় মাত্র"। কোন্ কথাটী সত্য?

আমরা পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি যে ব্রহ্মের কখনও অবস্থান্তর হয় না।

'মায়া ব্রহ্মসত্তাতে সত্তাবান' এই প্রকার ভাষা শঙ্কর বহু স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু কি ভাবে এই মায়া, এই মায়াময় জগৎ, ব্রহ্মসত্তাতে সত্তাবান তাহা জানা আবশ্যক। সর্পভ্রম যেমন রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া থাকে, রজতভ্রম যেমন শুক্তিকাকে আশ্রয় করে তেমনি মায়া এবং মায়াময় এই জগৎ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে (গীঃ ভাঃ ১৩।১৬)। রজ্জু কিম্বা শুক্তিকা না থাকিলে যেমন সর্প বা রজত ভ্রম থাকিত না, তেমনি ব্রহ্ম না থাকিলেও মায়া কিম্বা মায়াময় এই জগৎ সম্ভব হইত না। এই অর্থেই কোন কোন স্থলে মায়াকে ব্রহ্মের 'আত্মভূত' বলা হইয়াছে (তৈঃ ভাষ্য ২।৬)।

* "শাঙ্কর দর্শন" (প্রবাসী, মাঘ ১৩১৪) ও "ভারতীয় ব্রহ্মবাদ" (প্রবাসী শ্রাবণ, ১৩১৫) এই দুইটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা গিয়াছে।

আবার কোন কোন স্থলে এই 'আত্মভূত' কথার সঙ্গে 'ইব' শব্দেরও ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় (বেঃ ভাঃ ২।১।১৪)। 'ইব' শব্দ ব্যবহারের অর্থ এই যে প্রকৃতপক্ষে মায়া ব্রহ্মের আত্মভূত নহে কিন্তু ভ্রম হয় যেন ইহা ব্রহ্মের আত্মভূত। "মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি" এ কথাও বহুবার উক্ত হইয়াছে কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখা উচিত যে এ সমুদয় কথা লৌকিক ভাবেই বলা হইয়াছে।

গ্রন্থকার স্বীকার করিয়াছেন "মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান এ সকল নাম একার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে।" পৃ ৩৮।

শঙ্করাচার্য্য এই মায়াকে মোহ, অবিবেক, ভ্রম, সমুদয় অনর্থের প্রসব বীজ, ইত্যাদি নামেও অভিহিত করিয়াছেন (বৃঃ ভাঃ ৫।৩।১)। আমাদের গ্রন্থকার মহাশয়ও এ কথা অস্বীকার করেন নাই। পৃঃ ৪৩।

কোকিলেশ্বর বাবু বলিতেছেন "ব্রহ্মসত্তাই মায়ারূপে পরিণত হইয়াছে।" আমরা এখন জিজ্ঞাসা করি ব্রহ্ম কি কখন অজ্ঞানতা, অবিদ্যা, মোহ, অবিবেক, ভ্রম ইত্যাদি রূপে পরিণত হইতে পারেন? যিনি জ্ঞান স্বরূপ, তাঁহার পক্ষে কি অজ্ঞানতাদি রূপে পরিণত হওয়া সম্ভব? প্রথমতঃ ব্রহ্মের বিকারই সম্ভব নহে (বৃঃ উঃ ভাঃ ১।২।২০) তাহার উপর মোহাদি রূপে বিকার। অসম্ভবের উপর অসম্ভব। বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যাকে ধ্বংস করিতে হইবে ইহা বেদান্তেরই মত। গ্রন্থকারের মতে অবিদ্যা ব্রহ্মসত্তারই পরিণাম। সুতরাং অবিদ্যাকে ধ্বংস করা আর ব্রহ্ম সত্তাকে ধ্বংস করা কি একই কথা হইতেছে না? বৃহদারণ্যক ভাষ্যে আছে "গো দাঁড়াইয়া থাকিলে কিংবা গমন করিলে তাহাকে গো বলা হইবে এবং শয়ন করিয়া থাকিলে অশ্বাদি জাত্যন্তর প্রাপ্ত হইবে এমন নহে ২।১।২০।

বিদ্যারত্ন মহাশয়ও 'তৃতীয় পুরুষ' স্থলে 'প্রথম পুরুষ' ব্যবহার করিয়া ঠিক ঐ একই দৃষ্টান্ত দিতেছেন:—"আমি এখন বসিয়া লেখিতেছি, আবার আমিই যখন কিছুকাল পরে ভ্রমণে বহির্গত হইব, সেই ভ্রমণের সময় কি আমি স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইয়া উঠিব? তাহা কদাপি হইতে পারে না। এই নির্ব্বিশেষ সত্তারও যখন আগন্তুক অবস্থা বিশেষ মার্গোন্মুখ পরিণাম উপস্থিত হয়, তখন কি তাঁহার স্বতন্ত্রতার হানি হয়? কখনই না।" পৃঃ ৯৫—৯৬। অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তা অবিদ্যারূপে পরিণত হইলেও তিনি ব্রহ্মই থাকিবেন। পূর্ব্বোক্ত গরুটীর কথা মনে করা যাউক। গরুটী নিদ্রিত অবস্থায় আছে। হঠাৎ তাহার অবস্থান্তর হইল। সে এখন ভ্রমণ করিতেছে। এই অবস্থায় যদি গরুটী মারা যায়, তবে কি নিদ্রিত গরুটী জীবিত থাকিবে? 'কখনই নহে'। ব্রহ্ম সত্তাই যখন অবিদ্যারূপে পরিণত হইয়াছেন, তখন অবিদ্যা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে কি ব্রহ্মও গরুটীর ন্যায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইবেন না? অবিদ্যা ত বিনষ্ট হইয়াই থাকে এবং প্রতিনিয়তই বিনষ্ট হইতেছে; সুতরাং বলিতে হইতেছে ব্রহ্মও নিয়তই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছেন। ইহাকেই বলে "ব্রহ্ম হত্যা"। বিদ্যারত্ন মহাশয় কি এই 'ব্রহ্ম হত্যা'র দায়িত্ব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন?

প্রকৃত কথা এই মায়া ব্রহ্মের পরিণতি নহে। ভগবান শঙ্করাচার্য্য মায়াবাদ প্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকেও বলিতে হইয়াছে যে বিচারের চক্ষে এই মায়া অনির্ব্বচনীয়। ইহা বস্তু কি অবস্তু তাহা বিচার করিয়া বলা অসম্ভব (বেঃ ভাঃ ১।৪।৩)। ইহাকে বস্তু বলা যায় না, কারণ ব্রহ্ম অদ্বিতীয়; ইহাকে অবস্তুও বলা যায় না, কারণ অবস্তু কখন এত অনর্থের মূল হইতে পারে না। এই জন্যই পঞ্চদশীতে বলা হইয়াছে যে 'জ্ঞান চক্ষুতে ইহা তুচ্ছময়, যুক্তি দৃষ্টিতে ইহা অনির্ব্বচনীয় এবং লৌকিক দৃষ্টিতে ইহা বাস্তব' ৬।১২৯-১৩০। বিদ্যার দৃষ্টিতে এই মায়া "নিত্য নিবৃত্তা", পঞ্চদশীকার এই মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং এমত নৃসিংহ-উত্তর-তাপনীয় উপনিষদেরই প্রতিধ্বনি। এই উপনিষদের 'দীপিকা'তে বিদ্যারণ্য (সায়ণ) বলিয়াছেন "যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি ঘৃতপিণ্ডকে দগ্ধ করে, আত্মাও তেমনি অবিদ্যাকে দগ্ধ করিতে পারে। তবে কি অবিদ্যা অস্তিত্ব বিহীন? হাঁ এই অবিদ্যার অস্তিত্ব নাই।" (৯ম খণ্ড)। বেদান্ত ভাষ্যে ও (২।১।৯) অবিদ্যাকে 'অবস্তু' বলা হইয়াছে। মাণ্ডুক্যকারিকার মতে এই মায়ার অস্তিত্ব নাই "সা চ মায়া ন বিদ্যতে" ৪।৫৮ ইহার ভাষ্যে আচার্য্যদেব বলিয়াছেন "এই মায়ার অস্তিত্ব নাই, যাহা অবিদ্যমান, তাহারই নাম মায়া। সা চ মায়া ন বিদ্যতে, মায়া ইতি অবিদ্যমানস্য আখ্যা ইতি অভিপ্রায়:" ৪।৫৮।

যাহা অবিদ্যমান তাহাই মায়া; মায়া—অবস্তু; আত্মা কখন অবস্তুরূপে পরিণত হইতে পারেন না, সুতরাং আত্মা কখন মায়ারূপেও পরিণত হইতে পারেন না।

বৃহদারণ্যক ভাষ্যে এই অবিদ্যাকে 'অনাত্মা' বলা হইয়াছে (১।৬।১)। শঙ্করের মতে 'আত্মা' এবং 'অনাত্মা' পরস্পর বিরোধী, ইহাদিগের মধ্যে এক অপরের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না (বেঃ ভাঃ প্রারম্ভ)। সুতরাং আত্মা কখন অবিদ্যারূপে পরিণত হন নাই।

এই অবিদ্যাই জগৎরূপে প্রকাশিত (বৃঃ ভাঃ ১।৬।১)। গীতাশাস্ত্রে এই অবিদ্যাই 'ক্ষেত্র' এবং আত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ। আত্মার সহিত মায়ার, ক্ষেত্রজ্ঞের সহিত ক্ষেত্রের কি সম্বন্ধ তাহা গীতাভাষ্যে বর্ণিত হইয়াছে। "ঘটের অবয়ব রজ্জুকর্তৃক সংশ্লিষ্ট হইলে যে প্রকার সংযোগ হয়, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ সে প্রকার নহে। তন্তু ও পটের ন্যায় ইহা সমবায় লক্ষণও নহে। ইহাদিগের সংযোগ অধ্যাসমূলক। রজ্জুশুক্তিকাদি বিষয়ে বিবেক না থাকিলে যেমন এই সমুদয়ে সর্পরজতাদির অধ্যাসরূপে সংযোগ হয় তেমনি ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বিষয়ে বিবেক না থাকিলে উভয়ের মধ্যে অধ্যাস হইয়া থাকে। এই অধ্যাসমূলক সংযোগ মিথ্যা-জ্ঞানপ্রসূত।" ইহাই শঙ্করাচার্য্যের মত। গীঃ ভাঃ ১৩।২।

এস্থলে মায়াতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। অন্যত্র আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করিব। বিদ্যারত্ন মহাশয় যে মায়াকে ব্রহ্মসত্তার অবস্থা বিশেষ বলিয়াছেন; আমরা কেবল তাহারই অসারতা দেখাইলাম। সর্পের সহিত রজ্জুর যে প্রকার সম্বন্ধ মায়ার সহিত ব্রহ্মেরও ঠিক সেই সম্বন্ধ। 'মায়া ব্রহ্মের শক্তি'—ইহা লৌকিক ভাবে বলা যাইতে পারে কিন্তু দার্শনিকের চক্ষে ইহা নিতান্তই অসত্য।

৫। ঈশ্বর ও জগৎ।

বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন "বেদান্ত ভাষ্যে একটী শঙ্করোক্তি দেখিয়া অনেকে আবার ইহাও মনে করেন যে শঙ্কর সৃষ্টিতত্ত্ব ও ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত মায়াময় ও অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। আমাদের কিন্তু দৃঢ়বিশ্বাস এই যে ইহাও নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা" পৃ ১৩৫। আচ্ছা একটী স্থলেই যদি শঙ্কর, ঈশ্বর ও সৃষ্টি ব্যাপারকে মায়াময় ও অসত্য বলিয়া থাকেন, তাহা হইলেই কি যথেষ্ট হইল না? "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মহা সত্যটী একটী স্থলে রহিয়াছে বলিয়াই কি ইহার মূল্য চলিয়া গেল?

বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন "একটী শঙ্করোক্তি" কিন্তু দৃষ্টান্ত দিয়াছেন "দুইটী"। এই দুইটী অংশ গ্রন্থকারের মনঃপূত নহে, এই জন্যই বোধ হয় তিনি ইহার অনুবাদ দেন নাই। অনুবাদ এই:—

(১) "উপাধিবশতঃই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্ব—পরমার্থতঃ এ সমুদয় সত্য নহে" বেঃ ভাঃ ২।১।১৪।

(২) যখন "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি অভেদ সূচক উপদেশ দ্বারা অভেদ

জ্ঞান জাগ্রত হয় তখন জীবের সংসারিত্ব ও ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব—উভয়ই অপগত হয়। তখন কোথায় সৃষ্টি? বেঃ ভাঃ ২।১।২২।

এই দুইটী স্থলে শঙ্কর কি ঈশ্বর ও সৃষ্টিকে মায়াময় ও অসত্য বলেন নাই?

কেবল দুইটী স্থলে কেন, বহু স্থলে শঙ্কর ঐ কথাই আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। নিম্নে ইহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

(৩) বেদান্তভাষ্য ৩।২।১১। এখানে বলা হইয়াছে ব্রহ্মের সগুণত্ব অবিদ্যামূলক।

(৪) বেঃ ভাঃ ৪।৩।১৪—সগুণ ব্রহ্মাদি অবিদ্যামূলক।

(৫) বেঃ ভাঃ ৪।৩।১৪—ইহারই অপর স্থলে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্যই সৃষ্টি শ্রুতি। সৃষ্ট্যাদি বর্ণনা করা ইহার উদ্দেশ্য নহে।

(৬) বেঃ ভাঃ ২।১।২৭—পরিণাম শ্রুতি সমূহ সৃষ্টি প্রতিপাদক নহে।

(৭) বেঃ ভাঃ ২।১।৩৩—সৃষ্টি শ্রুতি ও ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতাদিমূলক শ্রুতি পরমার্থ বিষয়িণী নহে।

(৮) বৃহঃ উঃ ভাঃ ২।১।২০ আনন্দাশ্রম সংস্করণ পৃঃ ২৯৬।

(৯) বৃঃ ভাঃ ২।১।২০, পৃঃ ২৯৭।

(১০) বৃঃ ভাঃ ২।১।২০, পৃঃ ২৯৮।

(১১) বৃঃ ভাঃ ২।১।২০ পৃঃ ২৯৯।

(১২) বৃঃ ভাঃ ১।৪।৭ পৃঃ ১২৬।

(১৩) বৃঃ ভাঃ ১।৪।৭ পৃঃ ১২৭।

এই শেষোক্ত ছয়টী স্থলেই বলা হইয়াছে যে সৃষ্টি শ্রুতি সৃষ্টি প্রতিপাদনপর নহে, ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদনই এ সমুদয়ের উদ্দেশ্য।

(১৪) বৃঃ ভাঃ ৪।৪।২৫। লোক শিক্ষার জন্যই সৃষ্ট্যাদি কল্পনা করা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে সৃষ্ট্যাদি কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

(১৫) বৃঃ ভাঃ ৩।৮—শেষাংশ। সগুণ ব্রহ্মাদি সমুদয়ই অবিদ্যা-মূলক এবং অধ্যাসপ্রসূত।

(১৬) প্রশ্নঃ উঃ ভাষ্য ৬।৪। চক্ষুর প্রান্তভাগে অঙ্গুলি দ্বারা নিপীড়ন করিলে যেমন দ্বিচন্দ্র, মশক, মক্ষিকাদি দৃষ্ট হয় এবং স্বপ্ন দ্রষ্টা যেমন নানা বস্তু সৃষ্টি করে, অবিদ্যা রচিত এই সৃষ্টিও ঠিক সেই প্রকার।

(১৭) প্রঃ উঃ ভাঃ ৬।২ নির্গুণ ব্রহ্মকে বর্ণনা করা অসম্ভব সেইজন্য প্রথমে তাঁহাতে সগুণত্ব আরোপ করা হয়। তৎপর এই দোষ সংশোধনের জন্য বলা হয় ব্রহ্মে এ সমুদয় কিছুই নাই।

(১৮) প্রঃ ভাঃ ৬।৩ ব্রহ্মের সগুণত্ব অবিদ্যামূলক।

(১৯) ঐতরেয় উপনিষদের ভাষ্যে চতুর্থ অধ্যায়ের আরম্ভেই শঙ্কর বলিয়াছেন যে "সৃষ্ট্যাদি অর্থবাদ, কিম্বা ইহা বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত যে লোক শিক্ষার জন্য যেমন আখ্যায়িকা রচনা করা হয় তেমনি সেই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টির গল্প রচনা করা হইয়াছে।"

(২০) মুণ্ডক ভাষ্য ২।১।৩ অপুত্রকের পুত্র যেমন, ব্রহ্ম হইতে প্রাণাদির উৎপত্তিও তদ্রূপ।

(২১) বেঃ ভাঃ ৪।৩।১৩ সগুণ ব্রহ্ম বিনাশশীল।

(২২) গীতাঃ ভাঃ ৮।২০ সগুণ ব্রহ্মের বিনাশ আছে।

(২৩) গীঃ ভাঃ ১৩।১৪ ব্রহ্ম নির্গুণ। প্রথমে তাঁহাতে গুণ "অধ্যারোপ" করা হয়, তৎপর ঐ সমুদয়ের "অপবাদ" দ্বারা তাঁহাকে বর্ণনা করা হয়।

(২৪) মাণ্ডুক্যকারিকা ভাষ্য ৪।৪০ কার্য্য করণাদি সবই মিথ্যা।

(২৫) মাঃ কাঃ ভাঃ ৪।২২ উৎপত্তি বলিয়া কিছুই নাই।

(২৬) ঐ ২।৪ জাগ্রতাবস্থায় দৃষ্ট বস্তু স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় মিথ্যা।

(২৭) ঐ ২।৩১ এই বিশ্ব আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক।*

(২৮) ঐ ২।৩২ উৎপত্তি প্রলয়াদি অসম্ভব। এ জগৎ "মানস বিকল্পিত"।

(২৯) ঐ ১।১৭ এই বিশ্বপ্রপঞ্চ অস্তিত্ববিহীন।

(৩০) ঐ ৪।৪২ মূর্খদিগকে প্রবোধ দিবার জন্যই সৃষ্টি বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্ট্যাদি কিছুই নাই।

(৩১) ঐ ৪।৫৯ সমুদয়ই মায়াময়—জন্মনাশাদি কিছুই নাই।

(৩২) ঐ ৪।৩৬ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় জাগ্রতাবস্থায় দৃষ্ট বস্তুও অসৎ।

(৩৩) ঐ ৪।৬৮—৭০। মনুষ্যাদিও অস্তিত্ববিহীন, সমুদয়ই চিত্তের 'বিকল্পনা'।

(৩৪) ঐ ৩।১৫ সৃষ্ট্যাদি কিছুই নাই; ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্যই সৃষ্টি কল্পনা।

(৩৫) ঐ ৩।৪৮ উৎপত্ত্যাদি কিছুই নাই।

(৩৬) ঐ ৩।২৩ সৃষ্টি অপ্রসিদ্ধ ও নিষ্প্রয়োজন।

(৩৭) ঐ ৩।২৪ আত্মার একত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য সৃষ্টি কল্পনা।

(৩৮) ঐ ২।৬ এই জগৎ মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় মিথ্যা।

(৩৯) ঐ ৪।৫৮ উৎপত্ত্যাদি মায়াময়, এই মায়ার অস্তিত্ব নাই।

(৪০) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ভাষ্যের আরম্ভেই শঙ্কর পুরাণ বচন উদ্ধৃত করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন যে রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম তেমনি জগৎ ভ্রম। এ জগৎ অস্তিত্ববিহীন। ইহার উৎপত্তিও নাই, নাশও নাই এবং ইহার কারণও নাই। অধিক দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক।

৬। ব্রহ্মজ্ঞান ও জগৎ।

বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন "পরমার্থ দৃষ্টি জন্মিলেও এই সসাগরা-বন-শৈলা মেদিনী অন্তর্হিত হইয়া যায় না। জগৎ বা জগতের উপাদান শক্তি অলীক হইয়া উড়িয়া যায় না। জগৎ জগৎই থাকে, শক্তি শক্তিই থাকে। ইহাই শঙ্করের মত"। পৃঃ ১৩০।

মহোমহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়ের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। আমরা কিন্তু জানিতে চাই শঙ্কর কোন্ পুঁথির কোন স্থলে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।* যে পর্য্যন্ত এই পুঁথির আবিষ্কার না হইতেছে সে পর্য্যন্ত আমাদিগকে বাধ্য হইয়া প্রাচীন শাস্ত্রেরই অনুসরণ করিতে হইতেছে।

বেদান্তভাষ্যে শঙ্কর এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন:—"বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যাজনিত জগৎ প্রপঞ্চকে লয় কর, লয় করিয়া সেই আয়তনভূত এক আত্মাকে একরস বলিয়া অবগত হও" ১।৩।১।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানীর শিরোমণি, তিনি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এ বিষয়ে অনেক মহাপণ্ডিতও মহাভ্রমে পতিত হইবেন। ইহা জানিয়া শুনিয়াই তিনি ইহার একটা স্পষ্ট মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। মীমাংসাটী এই:—

"জিজ্ঞাস্য প্রপঞ্চ বিলয় কাহাকে বলে? অগ্নির উত্তাপে ঘৃতের কাঠিন্য যেমন বিলীন হয়, তেমনি কি এই প্রপঞ্চকে বিলীন করিতে হইবে? অথবা নেত্রের তিমির দোষে একচন্দ্রকে বহুচন্দ্র বলিয়া দৃষ্টি হইলে যেমন সেই দোষ নিবারণ করিতে হয়, সেই প্রকার অবিদ্যা-বশতঃ ব্রহ্মে যে নাম রূপাদি আরোপ করা হয় তাহা বিদ্যা দ্বারা বিলীন করিতে হইবে? এই বিদ্যমান দেহাদি লক্ষণ আধ্যাত্মিক প্রপঞ্চ এবং পৃথিব্যাদি লক্ষণ বাহ্যিক প্রপঞ্চকে বিলীন করিতে হইবে—ইহাই যদি বলিবার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এরূপ বিলাপন পুরুষ মাত্রেরই

অশক্য সুতরাং এরূপ বিলাপনের উপদেশও অসম্ভব বিষয়ের উপদেশ। আর (এই প্রকার বিষয় সম্ভব বলিয়া কল্পনা করিলেও স্বীকার করিতে হইবে যে) প্রথম মুক্ত পুরুষই পৃথিব্যাদি প্রপঞ্চ বিলীন করিয়াছেন সুতরাং জগৎ এখন পৃথিব্যাদি শূন্য। আর যদি বল যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মে এই প্রপঞ্চ অবিদ্যা কর্ত্তৃক অধ্যস্ত হইয়াছে এবং বিদ্যাদ্বারা ইহাই বিলোপ করিতে হইবে ইহাই উপদেশের অর্থ—তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য এই যে "ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, তিনিই সত্য, তিনি আত্মা, তিনিই তুমি ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অবিদ্যাধ্যস্ত প্রপঞ্চ প্রত্যাখ্যান করিয়া ব্রহ্মোপদেশ দিতে হইবে। এই ভাবে ব্রহ্মকে জ্ঞানগোচর করাইলে বিদ্যা আপনা আপনিই উৎপন্ন হইবে এবং সেই বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা বিদূরিত হইবে। তখন অবিদ্যাধ্যস্ত এই নাম-রূপ-প্রপঞ্চ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় বিলীন হইয়া যাইবে। বেঃ ভাঃ ৩।২।২১।

জ্ঞানোদয় হইলে কেবল যে এই জগৎই বিলীন হইয়া যায় তাহা নহে, যিনি জগদাত্মা (অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম) তিনি পর্য্যন্ত বিলীন হইয়া যান। বৃহঃ উপঃ ভাষ্যে লিখিত আছে যে যেমন রজ্জুতে সর্প, উষরভূমিতে উদক, শুক্তিকাতে রজত এবং গগনে মলিনত্বাদি আরোপ করা হয়, তেমনি ভ্রম বশতঃ নিরুপাধি ব্রহ্মেও উপাধি আরোপ করা হয়। আবার যেমন জ্ঞান জন্মিলে রজ্জুতে সর্প বিলীন হইয়া যায়, উষরে উদক, শুক্তিকাতে রজত এবং গগনে মলিনত্বাদিও বিলীন হইয়া থাকে তেমনি জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপাধিভূত সগুণ ব্রহ্মও নির্গুণ ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যান। যাজ্ঞবল্ক্য জনক রাজাকে এই উপদেশই দিয়াছিলেন। বৃহঃ ভাঃ ৪।৩।১।

রজ্জুতে সর্পকে বিলীন করিবার অর্থ কি ? জ্ঞানোদয়ও হইবে অথচ রজ্জু সর্পও বর্ত্তমান থাকিবে ইহা কি কখন সম্ভব হয় ? জগৎ ও সগুণ ব্রহ্মকে বিলীন করিবার অর্থও ঠিক ইহাই। সর্প যেমন অস্তিত্ববিহীন হইয়া যায়, জ্ঞানোদয় হইলে সগুণ ব্রহ্মও তেমনি বিনাশ প্রাপ্ত হন; ইঁহার অস্তিত্ব আর থাকে না। আসল কথা এই, সর্পাদি যেমন প্রথম হইতে অস্তিত্ববিহীন, সগুণ ব্রহ্মাদিও তেমনি প্রথম হইতেই অবিদ্যমান।

৭। উপনিষদের অনুবাদ।

গ্রন্থকার অবতরণিকাতে লিখিয়াছেন যে শঙ্করভাষ্যের সম্পূর্ণ অনুবাদের সহিত এই উপনিষদ দুইখানি (কঠ ও মুণ্ডক) এই গ্রন্থে অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উপনিষদ্ দুইখানির কোন অংশ বা ভাষ্যেরও কোন স্থল পরিত্যক্ত হয় নাই।" পৃঃ ৩।

আমরা গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করিয়া দেখিলাম গ্রন্থকার এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই। শঙ্করাচার্য্য যে সমুদয় স্থলে জগদাদিকে অস্তিত্ববিহীন বলিয়াছেন বিদ্যারত্ন মহাশয় তাহার অধিকাংশ স্থলে বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট স্থল একবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহার দুই একটী অংশ নিম্নে অনূদিত হইল :—

"দেবদত্তের যদি পুত্র উৎপন্ন না হয় তবে বলা হয় দেবদত্ত অপুত্রক। ঠিক এই মর্ম্মেই বলা হইয়াছে যে পুরুষে প্রাণাদি অবর্ত্তমান। (তবে কেন বলা হইল সেই পুরুষ হইতে প্রাণাদি উৎপন্ন হয় ?—ইহার উত্তর এই—) নাম ও রূপ বীজস্বরূপ, এই বীজরূপ উপাধি বশতঃই পুরুষ হইতে প্রাণাদি উৎপন্ন হয়। এই প্রাণ অবিদ্যামূলক বিকার, ইহা নাম মাত্র এবং অনৃতাত্মক। অপুত্রক ব্যক্তি স্বপ্নে পুত্র দর্শন করিয়া যেমন পুত্রবান হয় না, তেমনি অবিদ্যামূলক অনৃতাত্মক প্রাণ আছে বলিয়া পুরুষকে প্রাণবান বলা যায় না।" মুণ্ডক ভাষ্য ২।১।৩।

বিদ্যারত্ন মহাশয় এই প্রাণকে হিরণ্যগর্ভ বলিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে স্বপ্নলব্ধ পুত্র যে অর্থে অস্তিত্ববান্ হিরণ্যগর্ভাদি সগুণ ব্রহ্মও ঠিক সেই অর্থে অস্তিত্ববান। গ্রন্থকার পূর্ব্বোক্ত অংশের এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিয়াছেন (পৃঃ ৩১৬—৩১৭)। স্বপ্নলব্ধ পুত্রের সঙ্গে যে প্রাণাদির তুলনা দেওয়া হইয়াছে তাহা কোকিলেশ্বর বাবু একবার উল্লেখও করেন নাই। স্থানাভাবে গ্রন্থকারের অনুবাদ উদ্ধৃত করা সম্ভব হইল না।

নিম্নে আরও একটী স্থল অনূদিত হইল :—

"শূন্যস্থিত গন্ধর্ব্বনগরীর ন্যায়, মরীচিস্থিত জল ও মায়ার ন্যায় এই সমুদয় জগৎ সেই পরমার্থ সত্যে—সেই ব্রহ্মে—উৎপত্তি স্থিতি ও লয়কালে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে; পরমার্থ দর্শন না হইলেই এই সমুদয় জগতের অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয়" কঠঃ ভাঃ ৬।১।

গ্রন্থকার এ অংশ একবারেই অনুবাদ করেন নাই। কেন করেন নাই, তাহা বুঝাও কঠিন নহে।

৮। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য।

বিদ্যারত্ন মহাশয় যাহাকে শঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদ বলেন প্রকৃতপক্ষে তাহা গ্রন্থকারের নিজেরই মতামত। নিজের মতই গ্রন্থকার শঙ্করের নামে চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন। ইনি একজন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। শঙ্করের মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অনুযায়ী করিয়া ব্যাখ্যা করিলে যাহা হয় এ গ্রন্থও তাহাই হইয়াছে। গ্রন্থ হইতে 'শঙ্কর' কথাটী তুলিয়া দিয়া সেই সেই স্থলে 'রামানুজ' কথাটী বসাইয়া দিলেই সত্যের মর্য্যাদা কথঞ্চিৎ রক্ষা হইত।

অবতরণিকা খানা পড়িয়া মনে হয় ব্যক্তিবিশেষের মতামত খণ্ডন করিবার জন্যই ইহার অবতারণা করা হইয়াছে। এই ভাব দ্বারা তিনি এতই প্রণোদিত হইয়াছেন যে গ্রন্থ অনুবাদ করিবার সময়েও কথাটা ভুলিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহাতে গ্রন্থের সৌন্দর্য্য অনেক নষ্ট হইয়াছে।

সমালোচনা অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িল। এই স্থানেই বিদায় লওয়া যাউক।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল।

নাট্য রচনা—(১) ভূমিকা।

অভিনেয় কাব্য বা দৃশ্যকাব্যের প্রাচীন সাধারণ নাম ছিল রূপক। রূপক কথার সার্থকতার ব্যাখ্যায় পাই,—রূপারোপাৎ-তু রূপকম্। "নটে রামাদিস্বরূপারোপ," নাটকে আছে; কিন্তু রূপ আরোপ করার প্রধান অর্থ এই, যে যাহা কেবল গুণমাত্রে অনুভূত, তাহার রূপ আরোপ করার বিশেষত্বেই দৃশ্যকাব্যের নাম রূপক। শ্রব্যকাব্যে যাহা নানা কথায় এবং নানা বর্ণনায় বুঝাইতে পারা যায়, দৃশ্যকাব্যে তাহা কেবল নায়ক বা নায়িকা-নিষ্ঠ বর্ণনা বা কথায় ফুটাইয়া তুলিতে হয়। অন্যান্য কৌশল এবং প্রয়োগ বিজ্ঞানের কথার মধ্যে এই চরিত্র-চিত্রই নাট্য-রচনার প্রধান কথা।

এই ক্ষমতা দ্বিজেন্দ্রলালের যে কত অধিক, তাহা তাঁহার কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতার দৃষ্টান্তে দেখাইতেছি। "আষাঢ়ে"র 'কেরাণী' কবিতাটি পাঠকেরা প্রায়শঃ পরিহাস-কবিতা বলিয়া মনে করেন। ইহাতে কবিরও দোষ আছে; তিনি এমন কবিতার গায়ে 'আষাঢ়ে' ছাপ দিয়াছেন। এই অতি ক্ষুদ্র কবিতাটিতে একালকার বঙ্গদেশের চাকুরে পরিবারের চিত্র অতি পরিস্ফুট হইয়াছে। বাবুর অনুপস্থিতিতে চাকর এক পা কাদা লইয়া ফরাসে শুইয়া ঘুমাইতেছে,—এবং পরিশ্রান্ত বাবু কাচারি ফেরৎ ঘরে আসিয়া দেখিলেন—

ধুতি গেছে উড়ে,
দিয়েছে কে ছুঁড়ে
একপাট্ চটি বিছানায়, আর একপাট্ আঁস্তাকুড়ে।
বিশু গেছে বাজারেতে, ঘুমোয় রামা কুঁড়ে;
বামুন দিয়েছে ঝির সঙ্গে মহা তর্ক জুড়ে।

তাহার পর আবার বসিবার স্থানের দুর্দ্দশা!

ফরাসের সতরঞ্চে একটি কোমর মাটি।
পুত্ররত্ন গিয়ে
হুঁকো পাছটি নিয়ে
ঘুনসি পোরে তাকিয়েতে কচ্চেন বসে নৃত্য;
ঘুমোচ্চেন তাঁর পার্শ্বে প্রিয় শ্রীরামকান্ত ভৃত্য।

এরপরে যখন বাবুর মেজাজ খারাপ হইয়া গেল, এবং ঘরে চ্যাঁ, ভ্যাঁ শব্দ উঠিল, তখন প্রণয়িনীও বাদ গেলেন না; কেন না, "সকল সময় জ্ঞান থাকে না তবলা কি অবলা।" তুলির একটি টানে এত বড় একটা ছবি উজ্জ্বল করিয়া তোলা সহজ ক্ষমতার কথা নয়।

"আলেখ্যে"র ষষ্ঠ চিত্রটির দিকে চাহিতে গেলেই চোখে জল গড়ায়; অমন করুণরসাত্মক কবিতা সকল দেশের ভাষায়ই দুর্লভ। কবির করুণ রসের কবিতা আরো অনেক আছে, কিন্তু এ চিত্রে সমগ্র অসহায় মাতৃহারা জগতের যে ছবিটি পাই তাহা দক্ষ নাটককারের তুলিকায়ই সম্ভব। আলেখ্য গ্রন্থের অধিকাংশ চিত্রেই এই বিশেষত্ব। ক্ষুদ্র চিত্রে যিনি বিশ্বব্যাপী ভাব ফুটাইতে পারেন, নাট্য-রচনায় তাঁহার চিত্রশিল্পের ক্রমবিকাশের পরিচয় লইতেছি।

নাট্যরচনা—(২) কবির পূর্ব্ববর্ত্তী সময়।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আর যাহাই থাকুক, নাটক ছিল না। পাল রাজাদের সময়ে, যে বেণীসংহার নাটক রচিত হয়, তাহা ত সংস্কৃতে; ঐ নাটকের উপর বাঙ্গালীর কোন দাবি চলে কিনা, তাহা স্থির করিতে পারি নাই। ঐ সময় হইতে নিমাই ঠাকুরের চৈতন্যলীলার সময় পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভিন্ন অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষায় রচিত নাটক পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ সংস্কৃত অনর্ঘরাঘব বাঙ্গালী পণ্ডিতের রচনা।

মধুসূদনের অভ্যুদয়কালে যখন ইংরেজিশিক্ষিতদের প্রভাবে বঙ্গসাহিত্যের নবজীবন সঞ্চারের আরম্ভ, তখন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতির উদ্যোগে নাটক অভিনয়ের সূত্রপাত হয়। যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সমালোচনায় ইহার বিশেষ বিবরণ আছে। কবি তাঁহার পদ্মাবতী এবং শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে প্রাচীন নাটকের ধরণ অনেকটা বজায় রাখিয়াছিলেন, এবং চরিত্র চিত্রেও তাদৃশ মনোযোগী হইয়াছিলেন বোধ হয় না। লৌকিক কথার নাটক কৃষ্ণকুমারীতে ও মেঘনাদবধ এবং ব্রজাঙ্গনা রচয়িতার প্রতিভার পরিচয় নাই।

মধুসূদনের "একেই কি বলে সভ্যতা" নামক সংকীর্ণ প্রহসনে নূতন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবের সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার একটা দিক বেশ পরিস্ফুট। একদিকে সেই সময়কার প্রাচীন সমাজের অযৌক্তিক এবং অহিতকর বন্ধন, অন্যদিকে নব্যসম্প্রদায়ের বিলাতী ছাঁচের বিলাস-প্রিয়তা; এই দুইটি জিনিষই প্রহসনের সামগ্রী বটে। কবির "বুড়াশালিকের ঘাড়ে রোঁ" এই সামাজিক নক্সা সুন্দর 'ভাণ।' অলঙ্কারের লক্ষণে ওখানি প্রহসন নহে, ভাণ; সেই জন্য 'ভাণ' নামই দিলাম।

উক্তবিধ সামাজিক অবস্থা যে সকল কবিরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, তাহা নিশ্চিত। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্কালঙ্কারও তাঁহার কুলীনকুলসর্ব্বস্ব এবং নব নাটক নামক প্রকরণ কাব্যে (১) বহুবিবাহাদি কুপ্রথার কথাই লিখিয়াছেন। সে সময়ে সামাজিক কথা ছাড়িয়া কেবল নাট্যকলার বিকাশের জন্য নাটক বড় লিখিত হয় নাই; যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাও তেমন ভাল হয় নাই।

যে সময়ে মেঘনাদবধ প্রভৃতি কাব্যে মধুসূদনের

(১) নাটক হইল দৃশ্যকাব্য বা রূপকের সাধারণ নাম; কিন্তু যাহাকে Historical Drama বলে নাটক তাহাই। নাটকের লক্ষণযুক্ত কাব্য কবিকল্পিত ঘটনায় রচিত হইলে তাহাকে প্রকরণ বলে। ধূর্ত্ত চরিত যে ক্ষুদ্র নাটকে প্রধানতঃ বর্ণিত, তাহার নাম ভাণ।

সুখ্যাতি দেশব্যাপী হইতেছিল, সেই সময়ে আর একজন প্রতিভাসম্পন্ন লেখক দৃশ্যকাব্য রচনায় যশস্বী হইতেছিলেন; ইনি খ্যাতনামা দীনবন্ধু মিত্র। তিনি কোন প্রকারে একখানি দৃশ্যকাব্য রচনার জন্য "শর্ম্মিষ্ঠা" কিম্বা "রামাভিষেক" রচনা করেন নাই। কবি দীনবন্ধু, প্রয়োগ-বিজ্ঞানপটু, মানবচরিত্রদর্শী এবং ক্ষমতাসম্পন্ন। প্রাচীনতার অথবা নিয়মের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া, হাস্য, করুণ এবং রৌদ্র রসের অবতারণা করিয়া তিনি যে সকল দৃশ্যকাব্য রচনা করিয়াছেন, দৃশ্যকাব্যে বঙ্গের স্থায়ী সাহিত্যে তাহাই প্রথম।

দ্রবিড়জাতির এবং হিমারণ্যের আর্য্যেতর জাতির যে সকল জঘন্যতা তান্ত্রিক ধর্ম্মের নামে সম্মান লাভ করিয়া পরাধীনতাপীড়িত আর্য্যসমাজকে মলিন করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে নারীজাতির মাহাত্ম্যের কথা সাহিত্যে গীত হওয়া অসম্ভব হইয়াছিল। কেবল লালসা এবং উপভোগের উপযোগী করিয়াই নায়িকার বর্ণনা হইত। যেখানে সতী নারীর বর্ণনা ছিল, সেখানেও কেবল অবরুদ্ধার অভাব-পক্ষের একটা গুণের (negative virtue) কথাই ছিল। যে সতীত্ব স্বাতন্ত্র্যে পরিস্ফুট, যে মাহাত্ম্য স্বাধীনতায় পরিপুষ্ট, যে মাধুর্য্য পারিবারিক ঘটনাচক্রে পরীক্ষিত, তাহার বর্ণনা দীনবন্ধুর হস্তেই প্রথম। কবির গ্রন্থসমালোচনা এখানে অসম্ভব; কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ব্ববর্ত্তী যে গ্রন্থকার যথার্থ দৃশ্যকাব্যের রচয়িতা এ সমালোচনায় তাঁহার উল্লেখ উপযোগী বলিয়া এই অল্প কয়েকটি কথা লিখিলাম।

কবি দীনবন্ধুর স্বর্গারোহণের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত সুপাঠ্য স্থায়ী দৃশ্যকাব্য রচিত হয় নাই। রাজস্থানের অমর কাহিনী আখ্যানবস্তু করিয়া সম্ভবতঃ সর্ব্বপ্রথম শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সরোজিনী নাটক লিখিয়াছিলেন। উহাতে ইফিজিনিয়ার ফরাসীকবিবিবৃত একটা ঘটনার ছায়া আছে। থাকুক; কিন্তু ঐ প্রকার অনুকরণে সাহিত্যের বিকাশ ভিন্ন ক্ষয় হয় না; উহার কোন বর্ণনাতেই বিদেশীয় ভাবের কিঞ্চিৎমাত্র গন্ধও নাই। একালে প্রায় এমন লেখক নাই, যিনি ইউরোপীয় ভাব সংকলনে পরাঙ্মুখ। এই নাটক খানি সম্ভবতঃ এখন আর পাওয়া যায় না; আমি যখন বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম, তখন খুব মুগ্ধ হইয়াছিলাম মনে আছে। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু প্রায় সকলগুলি নামজাদা সংস্কৃত নাটকেরই অনুবাদ করিয়াছেন; কিন্তু সরোজিনী রচনার পর দৃশ্যকাব্যের মৌলিক রচনায় অধিক মনোনিবেশ করেন নাই, (২) করিলে ভাল হইত।

রঙ্গালয় গুলির পুষ্টির জন্য অনেক নাটক, প্রহসন, হল্লীশ, ভাণ প্রভৃতি রচিত হইয়াছে; সেগুলি সংগ্রহ করিলে হয় ত একটা বড় পুস্তকাগার ভরিয়া যায়। কিন্তু তাহার মধ্যে নাম করিবার মত গ্রন্থ বড় খুঁজিয়া পাই নাই। কোন কোন লেখকের ব্যঙ্গরস রচনার ক্ষমতা দেখিয়া প্রশংসা করিতে হয়, কিন্তু যে সকল সামাজিক নক্সায় ঐ রঙ্গ-লীলা, সেগুলি সাহিত্যের হিসাবে নাম করিবার মত নয়। একে ত অতিরঞ্জিত চিত্র বা অত্যুক্তিতে সামাজিক ছবির যথার্থতা থাকে না, দ্বিতীয়তঃ উহা অনেক স্থলে সুশিক্ষার বিরোধী।

কবির প্রথম রচিত নাটক।

(১)—কল্কি-অবতার। হাস্যরসের অবতারণায়, এখন দ্বিজেন্দ্রলালের সমকক্ষ কেহ নাই। তাঁহার প্রথম রচিত নাটক (প্রহসন) 'কল্কি অবতার' আগাগোড়া হাস্যরসে ভরা। প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রহসনের প্রধান লক্ষণগুলি লইয়া বিচার কর, হাস্যরসের অভিনবত্ব লইয়া সমালোচনা কর, কিম্বা সমষ্টিভাবে পণ্ডিত, গোঁড়া, বিলাতফেরৎ ও নব্যহিন্দুদলের চিত্রের যথার্থতার অনুশীলন কর, যেরূপভাবে বা যেদিক্ দিয়াই দেখ, এই প্রহসন খানিকে প্রশংসা করিতে হইবে। কেন যে বঙ্গের রঙ্গালয়ে উহা অভিনীত হয় নাই, তাহা বুঝিতে পারি; কিন্তু যদি একবার উহার অভিনয় হইত, তবে নিশ্চয়ই উত্তরোত্তর দর্শকদলে উহার আদর বাড়িত।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যে কপট ও ভণ্ড গোঁড়াদের কথা যাহাই হউক, পণ্ডিত সমাজকে লইয়া ঠাট্টা তামাসা করা ভাল হয় নাই। কথাটা স্বীকার করি না। পণ্ডিত সমাজের এখন যে অবস্থা, স্বতন্ত্রভাবে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। পরিহাসের ফলেই কেবল তাঁহারা

(২) এই সমালোচনায় কবি রবীন্দ্রনাথের কোন গ্রন্থেরই নাম উল্লেখ বা সমালোচনা করিব না; তাঁহার কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিব।

আপনার দোষ দেখিয়া লজ্জিত হইবেন, অন্য উপায়ে নহে; কারণ তাঁহারা লোকশিক্ষক বলিয়া অভিমান করিয়া দূরে বসিয়া আছেন, এবং কাহারো সদুপদেশ শুনিলে তাঁহাদের মান-হানি হয়।

তাহা ছাড়া কবির চক্ষে এ দৃশ্য একটা বিপুল প্রহসন, যে কতকগুলি বুদ্ধিমান মানুষ, গম্ভীরভাবে বিচার করিতে বসিয়া গিয়াছেন, যে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা পার হইয়া গেলে মানুষের জাতি-ধর্ম্ম থাকে কি না! কবি যদি ঐরূপ হাস্যকর গবেষণার যুক্তিযুক্ত প্রতিবাদ উপস্থিত করিতেন, তবে সেটাও একটা প্রহসনে দাঁড়াইত। যে কথার অসারতা বালকেরও বুঝা উচিত, তাহা লইয়া যদি কেহ একটা বৈদ্যুতিক (বিদ্যুৎ কি তাহা একেবারে না জানিয়া) শক্তির ভেলকি গড়িয়া তোলে, কিম্বা তাহার গায়ে একটা আধ্যাত্মিকতার ছাপ মারিয়া দেয়, তবে হাসি ছাড়া গতি নাই। মুর্গী না খাইতে চাও খাইও না; কিন্তু উহার ঝোলটুকু লইয়া আকর্ষণী বিকর্ষণী শক্তির টানা-হেঁচ্‌ড়া কর কেন?

গোঁড়া দলের কথা, অতি সহজ। ইংরেজের আমলে আমাদের যখন দেশরক্ষার দায়িত্ব নাই, তখন সকল উৎসাহ পণ্ডশ্রম বলিয়া ঘরে বসিয়া বিজ্ঞতা দেখান অতি সহজ। উদরপূর্ত্তির সময়ে, ও সালসাবিক্রির সময়ে, "কৈবর্ত্ত" পুরাণের দোহাই দিয়া ইঁহারা ধর্ম্ম ও সাল্‌সা একত্রে বিলি করেন। ইহা দেখিয়া যদি শিক্ষিত নব্যহিন্দু এবং বিলাতফেরতেরা চটিয়া যায়, তবে দোষ কার? এই সামাজিক অবস্থার নক্সাখানি পণ্ডিত এবং গোঁড়াসমাজে যাহাতে পঠিত হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত।

এ ত গেল গ্রন্থের সুশিক্ষার দিক্; এই সুশিক্ষার বিষয়ে (শেষ দৃশ্যের কথায়) পূর্ব্বেও কিছু বলিয়াছি। নাট্য-কৌশলে শেষ চিত্রটি অতি চমৎকার হইয়াছে। কিন্তু আর একটু সংক্ষিপ্ত হইলে ভাল হইত। সমাজের বিভিন্ন দলের চিত্র, সমষ্টিভাবেই হইয়াছে; এবং উহা সমষ্টিভাবেই সুন্দর। কেবল বিদ্যানিধিটি কবির একটি পৃথক মনোহর চিত্র। পণ্ডিত, গোঁড়া এবং নব্য-সাগর ছেঁচিয়া কবি এই অপূর্ব্ব নিধিটি তুলিয়াছেন।

(২) বিরহ। কবির নাট্যরচনায় দ্বিতীয় গ্রন্থ বিরহ। এখানি অলঙ্কার শাস্ত্রের লক্ষণ অনুসারে প্রস্থান-শ্রেণীর উপরূপক বা ক্ষুদ্র নাটক। (১) দুটি অঙ্কের বাঁধা নিয়ম প্রধান লক্ষণের মধ্যে ধরা যাইতে পারে না। ইহাতে গীত-বাদ্য-বিলাস যথেষ্ট আছে, এবং যাহাকে কৌশিকী বৃত্তি বলে তাহাই ইহাতে অধিক। কৌশিকীর লক্ষণ এই:—

> যা শ্লক্ষ নেপথ্য বিশেষ চিত্রা
> স্ত্রী সঙ্কুলা পুষ্কল নৃত্য গীতা,
> কামোপ ভোগ প্রভবোপচারা
> সা কৌশিকী চারু বিলাস যুক্তা।

রামকান্ত এবং গোলাপীকে যখন বিরহের প্রধান নায়ক-নায়িকার মধ্যে গণনা করিতে পারি, তখন এই ক্ষুদ্র নাটকখানিকে 'প্রস্থান' সংজ্ঞা দেওয়াই সঙ্গত।

চিত্রাঙ্কনে, সুশিক্ষায় এবং নাট্যকৌশলে, কল্কি অবতার বিরহের অনেক উপরে। বিরহে চরিত্রচিত্র অপেক্ষা তামাসার সমাবেশ অধিক। পড়িলে যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করা যায়; কিন্তু নাটকত্বের কোন বিশেষ গুণে মুগ্ধ হইবার বড় কিছু নাই। গোবিন্দ এবং নির্ম্মলের প্রেম ও বিরহ অত্যধিক মাত্রায় প্রহসন-ঘেঁষা, কাজেই উহাতে খানিকটা মজা ভিন্ন আর কিছুই নাই। নাটকের হিসাবে যতটুকু যা কিছু আছে, তাহা গোলাপী এবং রমাকান্তেই পাওয়া যায়।

কলিকাতার রঙ্গালয়ের ইতিহাসে বিরহের অভিনয় একটা বিশেষ কথা। পূর্ব্বে অনেক শ্লীলতাবিরোধী উচ্ছৃঙ্খল ধরণের আমোদ উপভোগের উপলক্ষ্যে যে সকল হল্লীশ (farce) এবং নাট্যরাসক (Opera) অভিনীত হইত, বিরহের আবির্ভাবে সেগুলি বহুপরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। প্রতিভাশালী কবি যদি হল্লীশ এবং নাট্যরাসক রচনা করেন, তবে রঙ্গমঞ্চের দর্শকেরা হাসি তামাসায় বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করিতে শিখিবে।

(৩) ত্র্যহস্পর্শ হল্লীশ শ্রেণীর কাব্য বটে; কিন্তু কবির এখনকার পাকাহাতে একবার উহাকে মাজিয়া ঘসিয়া

(১) প্রস্থানের লক্ষণ এই:—

> প্রস্থানে নায়কো দাসো হীনঃস্যাদুপনায়কঃ
> দাসী চ নায়িকা, বৃত্তিঃ কৌশিকী ভারতী তথা।
> সুরাপানসমাযোগাদুদ্দিষ্টার্থস্য সংহৃতিঃ
> অঙ্কৌ দ্বৌ, লয়তালাদিবিলাসো বহুল তথা।

তুলিলে ভাল হয়। এ গ্রন্থের হাসির গানগুলি গ্রন্থ সৃষ্টির অনেক পূর্ব্বে রচিত। তাহাতেও ক্ষতি ছিল না; কিন্তু সেগুলি স্বাভাবিক ডাল পালার মত বসে নাই। পড়িলে বরং মনে হয়, যে ভাল ভাল গোটা কতক হাসির গান যেন একসঙ্গে গাঁথিয়া দিবার জন্যই একটা চলন্‌সই গল্পের সুতাপাকানো হইয়াছে। হল্লীশে গল্পের ভাগের সামঞ্জস্য অপেক্ষা, নাচ গান ও তামাসাই অধিক থাকে; ইহাতেও তাহাই আছে।

(৪) প্রায়শ্চিত্তখানিও খুব 'বহুৎ আচ্ছা' হইয়াছে মনে হইল না। অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মে এখানি দুর্ম্মল্লিকা। বিটক্রীড়াময়, কৌশিকীবৃত্তিযুক্ত দুর্ম্মল্লিকা, একালের সমাজচিত্রের পক্ষে খুব উপযোগী। কয়েকটি চিত্র ফুটিয়াছে বেশ; কিন্তু কবি ইচ্ছাপূর্ব্বক যেন ব্রাহ্মস্পর্শের মত এখানিও পূর্ব্বরচিত কতকগুলি গান জুড়িয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

আমাদের সমাজ এখন মৃতের সমাজ। দায়িত্বহীনতা, কর্ম্মশূন্যতা, এবং কর্ম্মের নামে কেবল নিজের জীবন ধারণের চেষ্টায় ক্ষুদ্রতা এবং স্বার্থপরতা; এবং এই সকলের সমবেত ফলে দাঁড়াইয়াছে—একটা জড়তা। এ অবস্থায়, যাহারা জীবন্ত, কর্ম্মঠ এবং নিত্য উন্নতিশীল, তাহাদের সাহিত্য এবং সমাজের সহিত আমাদের পরিচয় হইলে প্রভূত উপকার হয়। ইউরোপ ভ্রমণে এই পরিচয় বেশি হয় বলিয়া এ কালে ইউরোপ ভ্রমণ আমাদের পক্ষে হিতকর। কিন্তু কেহ কেহ, ইউরোপ ভ্রমণের ফলে, নানা কারণে তাঁহাদের পবিত্রতা ও সংযম হারাইয়া ফেলিয়াছেন। যে বয়সে সাজান কাঠের পুতুল দেখিয়াও ভ্রান্তি জন্মে, সে বয়সে যদি বিদেশ প্রবাসের সময়ে ত্বকের গৌরতা মাত্রেই নীচ শ্রেণীর রমণী দেখিয়া মতি ভ্রান্তি জন্মে, তবে আশ্চর্য্যের কথা নয়। ভাবিলেও কষ্ট হয় যে শিক্ষার অভাবে এদেশের রমণীরা যে অবস্থায় আছেন, তাহা নূতন শিক্ষিতদিগের কাছে "জড় ভরত" বলিয়া মনে হয়। তাই অনেক স্থলেই নাকি অনেক "রেবেকার" আমদানি হইতেছে। সকল চপলমতি বালক বুদ্ধিমান হইল না কেন, না ভাবিয়া, আমরাই কেন গৃহসংস্কার করিতেছি না? এই সংসারটাকে সকলের বাসের উপযোগী করিয়া তোলাই ত বাহাদুরি; নহিলে "এক ঘরে" করিতে বসিলে নিজেরই ক্ষীণতা জন্মে। কবি বিদেশ-প্রবাসের মন্দ দিকটা দেখিতেও ভুলেন নাই। চপলের চাঞ্চল্য যথেষ্ট দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ের পরিহাস তাঁহার দু' তিনটি গানে যাহা ফুটিয়াছে, সমগ্র প্রায়শ্চিত্তে তাহা ফুটে নাই।

সমষ্টি ভাবের চিত্রের বিচারেও যাহা কল্কি-অবতারে বিকশিত, এ গ্রন্থের চিত্রে তাহার উপর অধিক কিছুই নাই। রেবেকা যখন স্বামীর সঙ্গে ধূয়া ধরিয়া গান গায়, তখন সব্‌টা একেবারে হল্লীশে (farce) দাঁড়ায়; উদ্দিষ্ট শিক্ষার পথে বাধা জন্মে। নাট্যরচনার হিসাবে যাহাই হউক, কিন্তু এই শেষোক্ত গ্রন্থ দুখানি পড়িলে বুঝিতে পারা যায়, যে সামাজিক সকল অবস্থার সহিত কবির যথেষ্ট পরিচয় হইয়াছে; এবং সকল প্রকার লোকচরিত্রই কবি সযত্নে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। এই বহু বিস্তৃত অভিজ্ঞতার ফল, তাঁহার পরবর্ত্তী নাটক গুলিতে দেখিব।

(৫) পাষাণী। এই নাটক খানি প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বে লিখিত; কিন্তু এই দৃশ্যকাব্যেই কবি একখানি যথার্থ নাটক রচনা করিবার প্রয়াস, সর্ব্বপ্রথমে করিয়াছেন।

পাষাণীর আখ্যানবস্তু অহল্যার বিবরণ, একটি প্রসিদ্ধ পৌরাণিক কথা। এ দেশের প্রায় সকল পৌরাণিক কথারই নানা সংস্করণ পাওয়া যায়; কবি রামায়ণে বর্ণিত পুরাণ অনুসরণ করিয়া অহল্যাকে 'স্বেচ্ছায় পাপিনী' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 'মন্দ্রের' ভূমিকা পড়িয়া বুঝিলাম, যে এইপ্রকার বর্ণনায় হিন্দুধর্ম্মের কোন কোন প্রহরী চটিয়া গিয়াছিলেন। কবির আক্ষেপ, তাঁহারা রামায়ণ পড়েন নাই; আমার আক্ষেপ যে অহল্যাকে প্রাচীনেরা পাষাণী করিয়াছিলেন কেন, তাহার সার্থকতা উহাঁরা বুঝেন নাই। এ শ্রেণীর লোকের পক্ষে নাটক পড়া বিড়ম্বনা।

জ্ঞানকৃত পাপভিন্ন নারী পাষাণী হয় না; এবং পাষাণীর দেবীত্ব লাভের ইতিহাসই মানব চরিত্রে পুণ্য অর্জ্জনের যথার্থ ইতিহাস। ভগবান বুদ্ধদেবের পবিত্র প্রসাদে কত পাষাণী যে দেবী হইয়া প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়াছেন, ভারতনারীর মাহাত্ম্যের জরামরণাতীত সাক্ষী 'থেরী-গাথায়' তাহা পাই। যাহা পাপ, উহাই যে স্বর্গের সিঁড়ি, এ তত্ত্ব-সকলের পক্ষে বুঝিয়া উঠা একটু শক্ত; কারণ ধর্ম্মটা অনেকের কাছেই বাহ্য অনুষ্ঠান মাত্র। এই কাব্য খানিতে কবি, রূপ আরোপ

করিয়া, সাধু অগষ্টিন্ অথবা লংফেলোর কথাই যেন প্রত্যক্ষ ভাবে বুঝাইয়াছেন :—

Saint Augustine! well hast thou said
That of our vices we can frame
A ladder, if we will but tread
Beneath our feet each deed of shame.

তথাগত বুদ্ধ যজ্ঞের—ক্রিয়াকলাপ-ভ্রান্তদিগকে সর্ব্বপ্রথমে বুঝাইয়াছিলেন, যে যথার্থ মনুষ্যত্বের নামই ব্রাহ্মণত্ব। পরে অনেক পুরাণে অনেক স্মৃতিতে উহা প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। কবি এই মনুষ্যত্ব বা ব্রাহ্মণত্বের যে আদর্শ রচনা করিয়াছেন, ইংলণ্ডের হালের কবি টেনিসনের আর্থারে তাহা নাই। মাংসপিণ্ডের ধ্বংসের পূর্ব্বে মাংস-বর্দ্ধিত পাপ যায় না বলিয়া গুইনিভিয়র পরিত্যক্তা। আমাদের যদি ভগবানের দিকে চাহিয়া, একথা বলিবার অধিকার থাকে,—"আর একবার ভালবাস", তবে মানুষের দিকে চাহিয়া মানুষ তাহা বলিতে পারিবে না কেন? এ অধিকার গুইনিভিয়রের থাকিবে না কেন, পাষাণীর থাকিবে না কেন? যে তাহার তীব্র যন্ত্রণায় বুঝিয়াছে, যে "পাষাণী হইয়া গেছি অন্তরে অন্তরে," সে যে দেবী, তাহা গৌতমের মত ব্রাহ্মণেই বুঝিতে পারেন। গৌতমের মাহাত্ম্য, এবং পাষাণীর দেবীত্ব, শূদ্রতা পরিহার না করিলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

সংসারে সাধুতা আছে, ইহার প্রত্যক্ষ জ্ঞানই পাপীর পুণ্যলাভের প্রথম সোপান। অনুতপ্তা পাষাণী রাম নামে একেবারে মুক্তি লাভ না করিয়া সাধুতার প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে নবজীবন লাভ করিতে আরম্ভ করিল। এ স্থানে কবি ধর্ম্মতত্ত্ববিদের সূক্ষ্ম অনুভূতি ফুটাইয়া তুলিয়া পুরাণের উপর নূতনত্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। পাষাণীর যথার্থ মুক্তি গৌতমের আহ্বানে। প্রিয়তমের আহ্বানের অনুভূতি ভিন্ন যে পাপীর মুক্তি নাই, এ কথা ধর্ম্মসাধকের গ্রন্থে পড়িয়াছি বটে; কিন্তু কবির চিত্রে ইহা প্রত্যক্ষ হইয়াছে। কবি, গৌতমচরিত্রে যে দেবত্ব আরোপ করিয়াছেন, তাহারই ফলে যে পাপীর মুক্তি, কেবল রাম নামে নহে, এ কথা শেষ দৃশ্যে জনকের কথায় সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কবির এই নূতনত্ব, মনস্তত্ত্বের বিচারে সুসঙ্গত। পাপী যখন প্রিয়তমস্পর্শে নবজীবন লাভ করে, তখন যে সে নবজাত অসহায় শিশুর মত, অন্ধের মত, নবপ্রসারিত করুণা অবলম্বন করিয়া থাকিতে চাহে, অহল্যার শেষ কথায় তাহাই পাই :—

নাথ, তব পুণ্যতেজে আজি অন্ধ আমি,
কোথা তুমি? কতদূর? সঙ্গে করে লও।

জটিল মনস্তত্ত্বের এমন সুন্দর ব্যাখ্যা, সহসা দেখা যায় না। গেটের ফষ্ট বড় উচ্চ দরের জিনিস, সমগ্র ইউরোপের কাব্য-ভাণ্ডারে অমন গ্রন্থ আর আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু বঙ্গভাষায় গেটের মত মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া এমন নাটক রচিত হইতে দেখিলে বাঙ্গালী সমালোচক যদি আনন্দে অধীর হইয়া উহা গেটের অনুপযুক্ত নয় বলিয়া ঘোষণা করেন, তবে আমি সেই অত্যুক্তিটি দোষজনক মনে করি না। কাব্যশিল্পে 'পাষাণী' বঙ্গভাষায় অতি নূতন সামগ্রী।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বিদেশে বাঙ্গালী ছাত্র।

শ্রীযুক্ত অবনীমোহন ঘোষ আড়াই বৎসর পূর্ব্বে শিল্পবিজ্ঞান-সমিতি কর্ত্তৃক আমেরিকায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি তথায় প্রাট্ টেক্নোলজিক্যাল কলেজ নামক সুবিখ্যাত ব্যাবহারিক রসায়নের (applied chemistry) কলেজে ভর্ত্তি হন, এবং যশের সহিত তথাকার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজের প্রশংসাপত্র পাইবামাত্রই তিনি কলগেট্ সোপ্ ওয়ার্ক্‌স্ নামক জগদ্বিখ্যাত সাবানের কারখানায় কার্য্যে নিযুক্ত হন। সাবান সম্বন্ধে তাঁহারা মৌলিক গবেষণায় ঐ কারখানার ডাক্তার রজারস, পিএইচ্. ডি., এরূপ প্রীত হন, যে তাঁহার সুপারিসে শ্রীমান্ অবনীমোহন শীঘ্রই আমেরিক রাসায়নিক সমিতির (American Chemical Society) সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথমে এই সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। সম্ভবতঃ তিনি দেশে ফিরিলে ভারতে সাবান প্রস্তুতকরণ বিদ্যায় তাঁহার সমকক্ষ কেহ থাকিবে না। তিনি জাপান হইয়া ভূপ্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছেন। তাঁহার "Chemical Technology of Oils, Fats and Manufactured Products" নামক পুস্তক শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পূর্ব্বে সন্তোষের জমীদার বাবু প্রমথনাথ রায় চৌধুরী কৃষিবিদ্যা শিখিবার জন্য শ্রীযুক্ত

যতুনাথ সরকারকে জাপানে পাঠান। তিনি সেখানে কৃষি কলেজে ভর্ত্তি হন, এবং টোকিও ইম্পীরিয়্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিষয়ক শেষ পরীক্ষায় এই বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্র ব্যতিরেকে তিনি নিজ অধ্যাপকগণের নিকট হইতেও তাঁহার ক্ষমতা ও গুণের পরিচায়ক অনেক প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন। "Elements of Practical and Scientific Agriculture" নামক কৃষিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বহি তিনি সম্প্রতি লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। জাপানের অধ্যাপক ও সংবাদপত্র সমূহ এই বহির প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন। ইম্পীরিয়্যাল কৃষিকলেজের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এস্ হাট্টা পুস্তক সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে যদি পুস্তকে আরও কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে আরও কয়েক পৃষ্ঠা লেখা থাকিত তাহা হইলে মিঃ সরকার জাপান সাম্রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর নিকট হইতে কৃষিবিজ্ঞানাচার্য্য উপাধি পাইতে পারিতেন। সম্প্রতি শ্রীমান্ যতুনাথ সরকার জাপান কৃষিসভা (Dai Nippon Nokai)র সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

কলিকাতার শিল্পবিজ্ঞান সমিতি প্রথমে যে একদল ছাত্রকে বিদেশে প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে শ্রীমান্ শান্তিপদ গুপ্ত একজন। শ্রীমান্ শান্তিপদ এক সময়ে এলাহাবাদে মিওর কলেজে পড়িতেন। তখন আমরা তাঁহাকে একজন অতি শান্তশিষ্ট ধর্ম্মানুরাগী যুবক বলিয়া জানিতাম। তিনি জাপানে গিয়া টোকিওর হাইয়ার পলিটেক্‌নিক্ ইন্‌ষ্টিটিউশ্যনে ভর্ত্তি হন। তাঁহার শিক্ষার বিষয় ছিল, মাটির বাসন নির্ম্মাণ ও সীমেণ্ট (বিলাতী মাটি) প্রস্তুত করণ। তিন বৎসরের শিক্ষিতব্য বিষয় শিখিয়া তিনি ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে প্রথমে এই শিক্ষালয় হইতে শেষ প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি কলেজের অধ্যাপকদেরও অনেক গুলি উচ্চ প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন। তিনি জাপানের কয়েকটি কারখানা ও পরীক্ষাকেন্দ্রে (Experimental Stations) অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া পরে শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিবার জন্য আমেরিকা যাইতে ইচ্ছা করেন। পূর্ব্বোক্ত শিক্ষালয়ে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে তিনি পেন্সিল প্রস্তুত করিতে শিখেন। জাপানে বসিয়া ভারতীয় কাষ্ঠ হইতে পেন্সিল তৈয়ার করিয়া তিনি কাশী শিল্পপ্রদর্শনীতে পাঠান ও তজ্জন্য একটি প্রথম শ্রেণীর প্রশংসাপত্র পান।

শ্রীযুক্ত জে, সি, দাস আমেরিকায় বাণিজ্য শিখিতে গিয়াছেন। সেখানকার "উচ্চতর হিসাব-রক্ষা" (Higher accounting) বিষয়ে একটি প্রধান কলেজ হইতে তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন। তিনি পরীক্ষায় শতকরা ৯৯ নম্বর পাইয়াছেন। কলেজের অধ্যক্ষ প্রশংসাপত্রদান-সভায় বলেন যে কলেজ যত দিন চলিতেছে, তাহার মধ্যে মিঃ দাসের পূর্ব্বে কেহই এরূপ অধিক নম্বর পান নাই। কলেজের ৬০০ ছাত্রের উচ্চ করতালি ও "হুররে" ধ্বনির মধ্যে তিনি প্রশংসাপত্র লাভ করেন ও সকলের অনুরোধে ভারতবর্ষে শিক্ষার দুরবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলেন।

স্বর্গগত শ্রীমান্ শশধর হালদারকে আমরা তাঁহার বাল্যকাল হইতে জানিতাম। তিনি বড় ধর্ম্মপিপাসু ও সচ্চরিত্র ছিলেন। তিনি বিলাতে অক্স্‌ফর্ডের মাঞ্চেষ্টর কলেজে দর্শন ও ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিতে যান। তথাকার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি কোন জর্ম্মান্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুসারে হিন্দুদর্শন সম্বন্ধীয় গবেষণা প্রণালী শিক্ষা করিবার জন্য জর্ম্মানী যান। তথায় প্রথমে ড্রেস্‌ডেন সহরে যান। তথা হইতে বার্লিন যাইবার জন্য যখন তাঁহার জিনিষ এবং বিছানাপত্র বান্ধা হইয়াছে, এমন সময় তাঁহার একজন সঙ্গী তাঁহার জ্বর হইয়াছে বুঝিতে পারেন। সে দিন ৯ই অক্টোবর। পাঁচ দিনের জ্বরে ১৩ই অক্টোবর তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার শিক্ষক মাঞ্চেষ্টর কলেজের সুপণ্ডিত ও সুবিখ্যাত প্রিন্সিপ্যাল আচার্য্য জে, ঈ, কার্পেণ্টার লণ্ডনের ইন্‌কোয়ারার্ এবং কৃশ্চিয়ান্ লাইফ নামক দু'খানি সাপ্তাহিক পত্রে তাঁহার জীবনচরিত লিখিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার দীনতা, ধর্ম্মভাব, জ্ঞানলিপ্সা, ধর্ম্মোপদেশদানক্ষমতা, স্বদেশপ্রেম, প্রভৃতি গুণের প্রশংসা করিয়াছেন। কৃশ্চিয়ান্ লাইফে তাঁহার ছবিও বাহির হইয়াছে। নীচে আমরা আচার্য্য কার্পেণ্টারের কোন কোন কথা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"In occasional preaching he found an opportunity

of expressing some of his strong religious emotion, and those who heard his first sermon in an English chapel, one December day at Southend, were deeply moved by the fervour of his utterance. He visited different parts of England to gain an insight into the varying phases of its life, urban and rural. He gave addresses on the work of the Brahmo Samaj, and knew how to interest the young men in a Lancashire manufacturing centre, or a Leicestershire country town. He made a pilgrimage into Dorsetshire to visit the veteran Alred Russell Wallace, and he was at home among the agencies of a domestic mission.

"He had an insatiable curiosity,' writes one of his fellow students, 'and the question 'What does it mean?' was never off his lips. It is not surprising, therefore, that he very soon acquired a fair knowledge of English life, and his opinion of it was far from favourable." In the little circle of the College he excited a warm affection, and some of his comrades recognised in him the most beautiful character they had ever seen. He appeared to them to combine in a singular way a saintly meekness and a lofty pride. The sufferings of his native land moved him profoundly, and were the object of his constant thought. The attitude of most Englishmen whom he met wounded him deeply, and at times he betrayed to his intimates a passion of extraordinary intensity. "He repaid any sympathy displayed to his beloved mother country with a devotion quite pathetic," says the friend already quoted, "and, though all loved him, only those knew him well who could enter into his feelings on this subject."

ক্রিশ্চিয়ান্ লাইফের সম্পাদক লিখিয়াছেন:—

"His piety was deep, tender, and true; his enthusiasm for the spread of the free faith was unbounded; his thirst for knowledge unquenchable; while his outlook upon life as a whole was broad and optimistic."

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসী।

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতীয়দিগকে তাড়াইবার জন্য তাহাদের উপর নানা প্রকার উৎপীড়ন হইতেছে। নানা প্রকার মিথ্যা কারণের সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু সত্য কথা এই যে তথাকার ভারতীয় শ্রমজীবী, কারিকর, ব্যবসাদার প্রভৃতি মিতাচারী,—নেশাখোর নহে, এবং পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী। সুতরাং তাহাদের সঙ্গে শ্বেতকায়েরা শ্রমের ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারিয়া উঠিতেছে না। তজ্জন্য বলা হইতেছে যে, দাগী বদ্‌মায়েসের মত অঙ্গুলের ছাপ দিয়া প্রত্যেককে নিজেকে রেজিষ্টরি করিতে হইবে, সহরে যেখানে সেখানে থাকিতে বা দোকান করিতে দেওয়া হইবে না, নির্দ্দিষ্ট অপকৃষ্ট স্থানে থাকিতে হইবে, বিনা অনুমতিতে কেহ ফেরিওয়ালার কাজ করিতে পারিবে না, ফুটপাথ দিয়া চলিতে পারিবে না, রেল গাড়ী বা ট্রাম গাড়ীতে তৃতীয় শ্রেণী ভিন্ন অন্য শ্রেণীতে যাতায়াত করিতে পারিবে না, ইত্যাদি। সুতরাং সেখানকার মুসলমান, হিন্দু, জৈন ও পার্সিগণ একমত হইয়া এই সকল অন্যায় আইন অমান্য করিতেছেন। শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও মান্যগণ্য লোক গরীব স্বদেশীয়দের সঙ্গে সমদুঃখভাগী হইবার জন্য রাস্তায় বিনা লাইসেন্সে জিনিস ফেরী করিয়া জেলে যাইতেছেন। আঙ্গুলের ছাপ দিয়া রেজিষ্টারী না করায় শত শত লোক কারারুদ্ধ ও ট্রান্সভাল হইতে নির্ব্বাসিত হইতেছেন, এবং কারামুক্ত হইয়া বা নির্ব্বাসিত হইয়া আবার ট্রান্সভালে আসিতেছেন ও জেলে যাইতেছেন। শিশু, অশীতিপর বৃদ্ধা স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত বাদ যাইতেছেন না। সম্প্রতি তথাকার অতি সম্ভ্রান্ত মুসলমান সওদাগর ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সভাপতি ইসুফ মিঞার শ্বশ্রু ঠাকুরাণী (আশীর অধিক বয়স), তাঁহার ছোট ভাই প্রভৃতি, ৫০।৬০ জন শিশু, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ কারারুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে তিন দিন অনাহারে থাকিতে হইয়াছিল। ইসুফ মিঞার শ্বশ্রু প্রভৃতি মক্কা হইতে হজ্ (তীর্থ) করিয়া ফিরিতেছিলেন। তাঁহাদিগকে, জাহাজ হইতে নামিবার পর, দুপর রাত্রে একটা বিষ্ঠাময় সংকীর্ণ চালাতে অনেকক্ষণ থাকিতে হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধি এই ভারতবাসীদের নেতা। তিনি কয়েকবার কারারুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাকে এখন ভক্সরাষ্ট নগরে রাস্তায় পাথর ভাঙ্গিতে হইতেছে। রাস্তা সাফ্ করার কার্য্য, যাহা আমাদের দেশে ধাঙ্গড় ও মেথরেরা করে, তাহাও তাঁহাকে করান হইতেছে। *

* এই মহাপ্রাণ কর্ম্মবীরের ছবি গত বৎসরের ফাল্গুনের প্রবাসীতে ছাপা হইয়াছে। ঐ সংখ্যার মূল্য পাঁচ আনা।

জেলে হিন্দু মুসলমান ভারতবাসীকে এক রকম চর্ব্বি-মিশ্রিত ময়দা বা চালগুঁড়া ঘাঁটা খাইতে দেওয়া হয়। অনেকে অনাহারে থাকিতেছেন। অনেকের জাতি যাই-তেছে। কারণ গরু ও শূকরের চর্ব্বি হিন্দুর অস্পৃশ্য ও অখাদ্য, এবং শূকরের চর্ব্বি মুসলমানের অস্পৃশ্য ও অখাদ্য। মুসলমানের খাদ্য অন্য জন্তুও যদি তাঁহাদের ধর্ম্মমতানুসারে জবাই করা না হয়, তাহা হইলে তাহার চর্ব্বিও অস্পৃশ্য ও অখাদ্য।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতনারীগণও খুব সাহস ও স্বজাতিপ্রেমের পরিচয় দিতেছেন। একটি স্ত্রীলোকের স্বামী জেল যাইবার ভয়ে সঙ্গীদের পরিত্যাগ করিয়া গৃহে আশ্রয় লন। তাহাতে তাঁহার স্ত্রী বলেন, "তুমি আমার সাড়ী পরিয়া ঘরে থাক, আমি তোমার পোষাক পরিয়া জেলে যাই।" এই ধিক্কারে স্বামী আবার কার্য্যক্ষেত্রে গিয়া সঙ্গীদের সহিত মিশিয়া জেলে যান। এইরূপ কত ঘটনা ঘটিতেছে।

আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় কয়েকজন দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয় কারারুদ্ধ বীরের ছবি দিলাম। নাম দেখিলেই বুঝা যায় যে ইঁহারা ভারতীয় নানা ধর্ম্মাবলম্বী; ভাইয়ের মত একত্র কাজ করিতেছেন। আর আমরা মূর্খ; তাই ভারতে বসিয়া ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করিতেছি।

চাপকান চোগা পরিহিত ভদ্রলোকটি মুসলমানদিগের একজন ভক্তিভাজন ইমাম বা ধর্ম্মোপদেষ্টা।

হত্যাপ্রবৃত্তি।

বঙ্গের লাট সাহেব সার্ এণ্ড্রু ফ্রেজারকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া একজন যুবক ধৃত হইয়া বিচারাধীন আছে। বিচারাধীন বিষয়ে কিছু বলা নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু সাধারণতঃ হত্যাপ্রবৃত্তি বিষয়ে কিছু বলা যাইতে পারে।

যদি বাস্তবিক রাজপুরুষদিগকে হত্যা করিতে ইচ্ছুক কোন ক্ষুদ্র দল থাকে, তাহা হইলে আমাদের বিবেচনায় এই দলের লোকদের কার্য্য সমর্থনযোগ্য নহে। যদি ইহা মানিয়াও লওয়া যায় যে কোনও রাজপুরুষ আমাদের দেশের বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা অনিষ্টের প্রকৃত প্রতিকারচেষ্টা নহে; কিন্তু ইহা প্রতিহিংসামূলক মাত্র। ইহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ; এবং যদি কেহ মনে করেন যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইলেও ইহাতে দেশের মঙ্গল হইবে, তাহা হইলে বলি, যে, (১) অধর্ম্মের দ্বারা মঙ্গল হয় না, ইহাই বিশ্বের নিয়ম; (২) ইহাতে আমাদের দেশের শাসনপ্রণালী উন্নততর হইবে না; (৩) ইহাতে ইংরাজেরা ভয় পাইয়া আমাদের দেশ ছাড়িয়া পলাইবে না; (৪) যদিই তাহারা পলাইয়া যাইত, তাহা হইলেও তদ্দ্বারাই আমাদের দেশের অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, রোগ, দুর্নীতি, সামাজিক কুপ্রথাদি দূর হইত না। অথচ এই সকল দূর না হইলে দেশের মঙ্গল হইবে না। এই সকল দূর করা বিদেশীবিদ্বেষ দ্বারা সম্পন্ন হইবে না; স্বদেশ-বাসীকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিয়া তাহাদের মঙ্গলের জন্য আজীবন পরিশ্রম করিলে সম্পন্ন হইবে। যদি কেহ দেশের জন্য জীবনোৎসর্গ করিতে চান, সেবায় প্রাণ দান করুন, প্রতিহিংসায় নহে। যদি কেহ সাহস দেখাইতে চান, দেশের প্রতি প্রেমমূলক সেবায় সাহস দেখান, কাহাকেও হত্যা করিয়া নহে।

এইরূপ হত্যা দ্বারা কোন দেশের মঙ্গল হয় নাই। আমাদের দেশেরও হইবে না। পক্ষান্তরে ইহার দরুন দেশে কঠোরতর শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা। তাহাতে অনেক নিরপরাধ ব্যক্তি উৎপীড়িত ও দণ্ডিত হইবে। দেশে শিক্ষাবিস্তার, স্বদেশীর প্রসারবৃদ্ধি প্রভৃতি কার্য্যে বাধা পড়িবে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভায় বক্তৃতা করিবার স্বাধীনতা সামান্য যাহা আছে, তাহাও লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। অবশ্য এরূপ অবস্থাতেও আমরা যদি সাহসের সহিত ধর্ম্ম ও অহিংসার পথে থাকি, তাহা হইলে ভগবান্ আমাদের মঙ্গল করিতে পারেন। কিন্তু, তাহা হইলে প্রথম হইতেই ধর্ম্ম ও অহিংসার পথে থাকি না কেন?

স্থলবিশেষে প্রাণরক্ষার জন্য আততায়ীর প্রাণবধ পর্য্যন্ত আইনানুমোদিত। সভ্যজগতে স্বাধীনতা রক্ষা বা লাভের জন্য যুদ্ধে নরহত্যা বৈধ বলিয়া পরিগণিত। (ইহা অপেক্ষাও উচ্চতর আদর্শ, সম্পূর্ণ অহিংসামূলক আদর্শ, ভবিষ্যতে মানবসমাজে গৃহীত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।) কিন্তু

শ্রীযদুনাথ সরকার।

স্বর্গীয় শশধর হালদার।

শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ।

শ্রীশান্তিপদ গুপ্ত।

শ্রী জে. সী. দাস।

ইমাম আব্দুল কাদির বাওয়াজীর।

পার্সী রুস্তমজী, এম্ সি আঙ্গ্লিয়া, দাউদ মহম্মদ

সোরাবজী শাপুরজী।

সি. কে. থাম্বি নায়ুডু।

যে সকল হত্যা বা হত্যার চেষ্টার কথা হইতেছে, তাহা প্রাণরক্ষার জন্য নয়; এবং স্বাধীনতাযুদ্ধ যে নয়, তাহা পাগল ভিন্ন আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে, ইহা কেহ মনে করে কিনা, জানি না; আমরা করি না।

আমরা স্বীকার করি যে কিছুদিন হইতে দেশের লোকদের উত্তেজিত, বিক্ষিপ্তচিত্ত ও ক্রুদ্ধ হইবার অনেক কারণ ঘটিতেছে। কিন্তু উত্তেজিত অবস্থায় মানুষ কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারে না। ধীরেরাই পারেন। কালিদাস কুমারসম্ভবে বলিয়াছেন—"বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাম্ ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।"—"বিকারের হেতু থাকা সত্ত্বেও যাঁহাদের চিত্ত বিকৃত হয় না, তাঁহারাই ধীর।" আমাদের সকলের ধীর হওয়া উচিত, কিন্তু কাপুরুষ হওয়া উচিত নয়। নরহত্যা ও বীরত্ব সমার্থবাচক নহে।

পরিশেষে সত্যের অনুরোধে ইহা বলা দরকার যে এখন ভারতে ইংরাজ ও ভারতবাসী উভয়দলেরই মন দ্বেষে পূর্ণ। (প্রত্যেক ইংরাজ বা প্রত্যেক ভারতবাসীর মন এরূপ, তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।) সুতরাং এই সকল হত্যা বা হত্যার চেষ্টার জন্য উভয় দলই দোষী। হন্তা বা হননেচ্ছু যে দেশীয়ই হউক, তাহার ভিতর দিয়া এই তীব্র দ্বেষ প্রকাশ পায় মাত্র। এই দ্বেষের নাশ প্রকৃত পন্থা।

রাজনৈতিক হিসাবে একজন শাসনকর্ত্তার জীবনের মূল্য একজন কুলির বা গাড়োয়ানের জীবনের মূল্য অপেক্ষা অধিক। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে উভয়েই সমান। ইংরাজের পাগল অবস্থায় বা ইংরাজের আকস্মিক পদাঘাত বা গুলিতে নির্দোষ অনেক ভারতবাসী মারা যায়। ইংরাজের নিজের দেশে এরূপ আকস্মিক মৃত্যু এত হয় না। সুতরাং ভারতবর্ষে ইংরাজ ইচ্ছা করিয়া ভারতীয় কুলির প্রাণবধ না করিলেও, এদেশেই এরূপ মৃত্যু এত কেন হয়, তাহা জিজ্ঞাস্য, এবং ইহা, ইংরাজ রাজপুরুষের হত্যাচেষ্টা অপেক্ষা কম গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যা নয়। উভয় সমস্যার সমাধান-চেষ্টা যুগপৎ করা উচিত। নতুবা সুফল হইবে না।

ইংরাজেরা অবশ্য কঠোর শাসনের জন্য চীৎকার করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে দ্বেষ ও উত্তেজনা আরও বাড়িবে। প্রকৃত উপায় হইতেছে—ইংরাজ ও ভারতবাসী উভয় দলেরই ন্যায় ও ধর্ম্মানুমোদিত ব্যবহার। কাহার দোষ বেশী, বা কে আগে দোষ করিয়াছে, তাহার বিচার এখন স্থগিত থাক্।

আমরা এবং আমাদের ছেলেরাও যে মানুষ, ইংরেজেরা তাহা কার্য্যতঃ মানিলে সুফল হইবে। ইংরাজেরা নিজেদের ছেলেরা কিছু হঠকারিতা বা বাঁদরামি করিলে তাহাদিগকে যেরূপ দণ্ড দেন বা তিরস্কার করেন বা কখন কখন ছেলেমানুষী বলিয়া দেখিয়াও দেখেন না, আমাদের ছেলেদের সম্বন্ধে সেরূপ ব্যবহার না করায় অনেক কুফল ফলিয়াছে। (অবশ্য হত্যা বা হত্যার চেষ্টাকে আমরা এই শ্রেণীর দোষ বলিতেছি না।) ইংরাজ যুবকদের মত আমাদের যুবকেরাও স্বদেশসেবক হইতে ও মাথা উঁচু করিতে ইচ্ছুক। ইহা স্বাভাবিক বলিয়া ইংরাজেরা কার্য্যতঃ মানিলে সুফল হইবে।

শরীরের রক্ত দুষ্ট হইলে ব্রণ, ফোড়া আদি হয়। তৎসমুদয় কেবল কাটিয়া চাঁচিয়া দেওয়াই সুচিকিৎসা নয়। রক্তদুষ্টির কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা সংশোধন সুচিকিৎসকের কাজ। যে দ্বেষের হাওয়া বহিতেছে, তাহার বাহ্য উপসর্গগুলাকে নির্ম্মূল করিবার চেষ্টাই প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞতা নহে। দ্বেষের ও উত্তেজনার প্রকৃত কারণ আবিষ্কার করিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টাই প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞের কাজ।

চিত্র-পরিচয়।

বর্ত্তমান সংখ্যার প্রথম চিত্রের বিষয় বোধ হয় অনেকেরই পরিচিত। এই সুন্দর ছবিখানির বিষয় দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা নামক প্রাচীন গল্প হইতে গৃহীত। কথিত আছে যে রাজা বিক্রমাদিত্যের বত্রিশটি পুত্তলিকা ধৃত এক সিংহাসন ছিল। বিক্রমাদিত্যের পর কোন সময়ে ভোজ রাজা উহাতে আরোহণ করিতে যান। তাহাতে একটি পুত্তলিকা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে যে, মহারাজ, আপনি কি বিক্রমাদিত্যের মত শৌর্য্যবীর্য্যশালী, উদার, ধার্ম্মিক ও বিদ্যোৎসাহী? ভোজও তাহার উত্তর দেন।

গত সংখ্যায় প্রকাশিত উড়িষ্যার চিত্রগুলি অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের গৃহীত ফোটোগ্রাফের প্রতিলিপি। তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। গত সংখ্যায় বৈতাল দেউলের ছবি ছাপা হয় নাই, অথচ ভ্রমক্রমে তৎসম্বন্ধে মন্তব্য ছাপা হইয়াছে। ঐ ছবি প্রস্তুত ছিল। স্থানাভাবে যায় নাই। পরে সুযোগ হইলে ছাপিব।

প্রেম।

প্রেম শুধু ব্যর্থ অন্বেষণ।
প্রেমে পূর্ণ এ বিশ্ব-সংসার ;
প্রাণে প্রাণে উঠি'ছে ক্রন্দন—
'কোথা তুমি হে আমি আমার' !

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

পারস্য-প্রসূন।

(হাফেজ হইতে *)

নির্ভর।

গৌরব মম হরণ তুমি
করেছ সকলি যদিও,
দুয়ারে তব লুটায়ে রব
ফিরিয়ে না যাব তবুও !
অরির দয়া চাহে না হিয়া
বারেক ভুলিয়া জগতে—
মিতার শত নিঠুরাচার
ভাল যে হাজার তা'হতে !

গৌরব।

হৃদয়ে মোর দিও গো মান,
করিও না হেলা তাহারে ;—
যে দিন তোমা বেসেছে ভালো
ছোট সে দীপ জ্বেলেছে আলো
হরিতে বিশ্ব-আঁধারে।

আশা।

সুন্দরতর বদন তব
করিয়া নিতে আপনা,
সুন্দরতর প্রকৃতি মম
নিয়ত করি কামনা,
তা' হলে আর মন আমার
তোমারে হারা হবে না !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

প্রাপ্তপুস্তক পরীক্ষা।

তীর্থসলিল—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। সংস্কৃতপ্রেস ডিপজিটারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মেটকাফ প্রেসে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ১৭৫ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা মাত্র। এখানি কবিতা-পুস্তক, জগতের সকল দেশের সকল কালের শ্রেষ্ঠ কবিদিগের সকল ভাবের রচনার কাব্যানুবাদ এই পুস্তকে একত্র করিয়া একটি মনোজ্ঞ সংগ্রহ হইয়াছে। অনুবাদগুলি এমন সরস সুন্দর স্বচ্ছন্দ প্রবাহে প্রাণময় হইয়াছে যে কবিতাগুলি মৌলিক রচনার সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত। পরের ভাবকে আশ্রয় করিয়া নিজের কবিত্বরসধারা এমনভাবে উৎসারিত হইতে অল্পই দেখা যায়। আমরা বহু কবিতার মূলের সহিত পরিচিত আছি, তাহাদের নিজস্ব আন্তর রসটুকু অনুবাদেও অক্ষুণ্ণ থাকিতে দেখিয়া কবির ক্ষমতায় আশ্চর্য্য হইয়াছি। এই গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ হইয়াছে। বাঙ্গালী পাঠক এই পুস্তকের ভিতর দিয়া বিশ্বমানবের হৃৎস্পন্দন অনুভব করিয়া প্রীত ও পুলকিত হইবেন। গ্রন্থারম্ভে ও গ্রন্থশেষে কবির দুইটি মৌলিক কবিতা বিষয়োপযোগী ও মধুর হইয়াছে। পরিশিষ্টে সকল কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়াতে পাঠকের বিশেষ সাহায্য হইবে। কাব্যরসপিপাসু বা মানবচরিত্রজিজ্ঞাসু পাঠক এই গ্রন্থে আনন্দের উপাদান পুঞ্জীকৃত দেখিবেন। জাপান চীন হইতে আমেরিকা অবধি, বৈদিক কাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ভগবদ্ভক্তি, নরপ্রেম ও দেশপ্রীতি বিষয়ে যতভাবের কবিতা বিশ্বমানবের অন্তর হইতে ক্ষরিত হইয়াছে তাহাই সংগৃহীত হইয়া বঙ্গবাসীর মন্দিরে আনীত হইয়াছে। তীর্থসলিল নামটি যেমন অন্বর্থ তেমনি কবিত্বময়। তীর্থসলিল-সংগ্রহ-কর্ত্তা নবীন কবিকে আমরা সাদরে অভিনন্দন করিতেছি।

উষা—শ্রীমহেন্দ্রনাথ তালুকদার প্রণীত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত ও তথা হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ২০৭ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা মাত্র। এখানি নাটক। ইহাতে দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে যে, রাজা উদাসীন হইয়া অমাত্যের উপর নির্ভর করিয়া রহিলে রাজ্যে অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ হয়; নিরীহ প্রজাও উৎপীড়িত হইলে শুধু আত্মরক্ষার জন্য বিদ্রোহী হইয়া উঠে; তখন দেশে তিন দল লোক দেখা যায়—বিপ্লবকারী চরমপন্থী, রাজভক্ত সামঞ্জস্যপ্রয়াসী ও দেশবৈরী। স্বার্থলুব্ধ দেশবৈরীর কোথাও প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি নাই, অন্যান্য দলেরও সাফল্য ক্ষণিক বা আপাতঃপ্রতীত হইতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না রাজা প্রজা মিলিত স্বার্থে সংস্কার-ব্রত গ্রহণ করেন ততক্ষণ দেশের কল্যাণ নাই; ব্রাহ্মণ কুলে জন্মিলেই ব্রাহ্মণ হয় না, ব্রাহ্মণের গুণ যাহার আছে সেই দেশনায়ক হইবার উপযুক্ত। এই গেল মোটামুটি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। গ্রন্থকার আপনার বক্তব্য প্রকাশ করিতে কৃতকার্য্য হইলেও সাধারণ পাঠকের সহজবোধ্য করিতে পারেন নাই, সকল ঘটনাই কেমন একটা প্রচ্ছন্ন প্রহেলিকা হইয়া আছে। নাটকত্বও এ গ্রন্থে পরিণত নহে—কোনো চরিত্রই স্বীয় ব্যক্তিত্বে পরিষ্কার পুষ্ট বা পরিস্ফুট হয় নাই। নাটকীয় ঘটনার দৃশ্য বা অঙ্কভাগের মধ্যে একটা লাগ্নিকতার অভাব দৃষ্ট হয়, অনেক কথা চিন্তার দ্বারা পূর্ণ করিয়া লইতে হয়, তাহাতে মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, রসাভাব হেতু পাঠ বিরক্তিকর হইয়া উঠে। নাটকখানি আদ্যোপান্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ইমার্সন বলেন—Cultivated men often attain a good degree of skill in writing verses; but the sense remains prosaic. It is a caterpillar with wings, and not yet a butterfly. এই নাটকখানিও তেমনি কবিত্বশূন্য অপরিণত রচনা। গ্রন্থকারের প্রথম প্রয়াস বলিয়া মনে হয়। যাহাই হউক বর্ণিত ঘটনার খাতিরে ইহা পাঠক-সমাজে আদৃত হওয়া সম্ভব।

* মর্ম্মানুবাদ।

৬১, ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
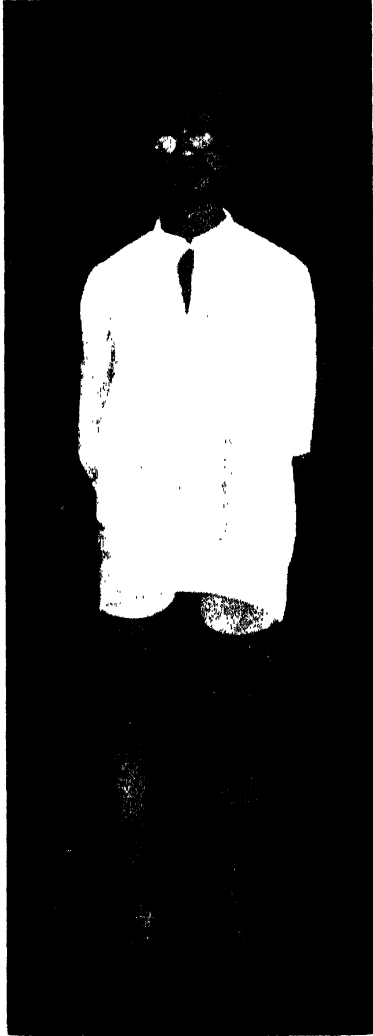
৺কানাইলাল দত্ত।
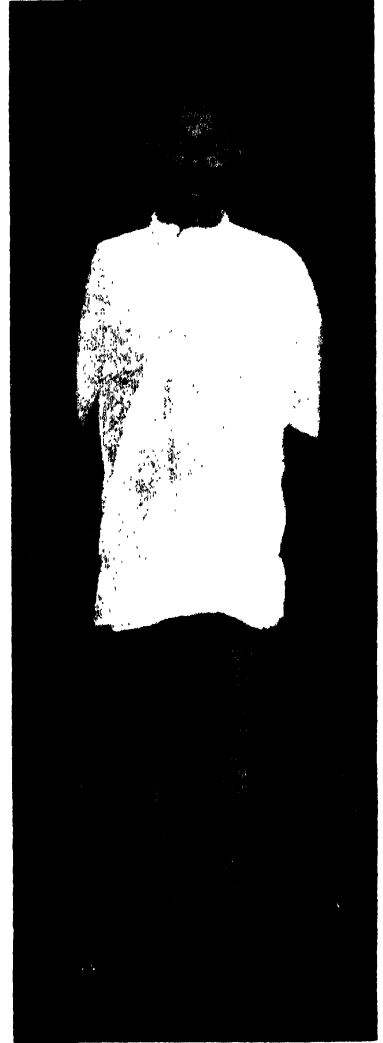
(কয়েদীর বেশে)

সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

(কয়েদীর বেশে)

স্বদেশসেবক কর্ম্মযোগী

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

৮ম ভাগ। পৌষ, ১৩১৫। ৯ম সংখ্যা।

গোরা।

৩৮

সুচরিতার মাসী হরিমোহিনীকে লইয়া পরেশের পরিবারে একটা গুরুতর অশান্তি উপস্থিত হইল। তাহা বিবৃত করিয়া বলিবার পূর্ব্বে, হরিমোহিনী সুচরিতার কাছে নিজের যে পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাই কিছু সংক্ষেপ করিয়া নীচে লেখা গেল।

আমি তোমার মায়ের চেয়ে দুই বছরের বড় ছিলাম। বাপের বাড়িতে আমাদের দুই জনের আদরের সীমা ছিল না। কেননা, তখন আমাদের ঘরে কেবল আমরা দুই কন্যাই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম—বাড়িতে আর শিশু কেহ ছিল না। কাকাদের আদরে আমাদের মাটিতে পা ফেলিবার অবকাশ ঘটিত না।

আমার বয়স যখন আট, তখন পাল্সার বিখ্যাত রায়চৌধুরীদের ঘরে আমার বিবাহ হয়। তাঁহারা কুলেও যেমন ধনেও তেমন। কিন্তু আমার ভাগ্যে সুখ ঘটিল না। বিবাহের সময় খরচপত্র লইয়া আমার শ্বশুরের সঙ্গে পিতার বিবাদ বাধিয়াছিল। আমার পিতৃগৃহের সেই অপরাধ আমার শ্বশুরবংশ অনেকদিন পর্য্যন্ত ক্ষমা করিতে পারেন নাই। সকলেই বলিত, আমাদের ছেলের আবার বিয়ে দেব, দেখি ও মেয়েটার কি দশা হয়। আমার দুর্দ্দশা দেখিয়াই বাবা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কখনো ধনীর ঘরে মেয়ে দিবেন না। তাই তোমার মাকে গরীবের ঘরেই দিয়াছিলেন।

বহু পরিবারের ঘর ছিল, আমাকে আট নয় বৎসর বয়সের সময়েই রান্না করিতে হইত। প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন লোকে খাইত। সকলের পরিবেষণের পরে কোনো দিন শুধু ভাত, কোনো দিন বা ডাল ভাত খাইয়াই কাটাইতে হইত। কোনো দিন বেলা দুইটার সময় কোনো দিন বা একেবারে বেলা গেলে আহার করিতাম। আহার করিয়াই বৈকালের রান্না চড়াইতে যাইতে হইত। রাত এগারোটা বারোটার সময় খাইবার অবকাশ ঘটিত। শুইবার কোনো নির্দ্দিষ্ট জায়গা ছিল না। অন্তঃপুরে যাহার সঙ্গে যেদিন সুবিধা হইত তাহার সঙ্গেই শুইয়া পড়িতাম। কোনো দিন বা পিড়ি পাতিয়া নিদ্রা দিতে হইত।

বাড়িতে আমার প্রতি সকলের যে অনাদর ছিল আমার স্বামীর মনও তাহাতে বিকৃত না হইয়া থাকিতে পারে নাই। অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি আমাকে দূরে দূরেই রাখিয়াছিলেন।

এমন সময়ে আমার বয়স যখন সতেরো তখন আমার কন্যা মনোরমা জন্মগ্রহণ করে। মেয়েকে জন্ম দেওয়াতে শ্বশুরকুলে আমার গঞ্জনা আরো বাড়িয়া গিয়াছিল। আমার সকল অনাদর সকল লাঞ্ছনার মধ্যে এই মেয়েটিই আমার একমাত্র সান্ত্বনা ও আনন্দ ছিল। মনোরমাকে তাহার বাপ এবং আর কেহ তেমন করিয়া আদর করে নাই বলিয়াই সে আমার প্রাণপণ আদরের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল।

তিন বৎসর পরে যখন আমার একটি ছেলে হইল তখন হইতে আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তখন আমি বাড়ির গৃহিণী বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য হইলাম। আমার শাশুড়ী ছিলেন না—আমার শ্বশুরও মনোরমা জন্মিবার দুই বৎসর পরেই মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর পরেই বিষয় লইয়া দেবরদের সঙ্গে মকদ্দমা বাধিয়া গেল। অবশেষে মামলায় অনেক সম্পত্তি নষ্ট করিয়া আমরা পৃথক হইলাম।

মনোরমার বিবাহের সময় আসিল। পাছে তাহাকে দূরে লইয়া যায়, পাছে তাহাকে আর দেখিতে না পাই এই ভয়ে পালসা হইতে ৫।৬ ক্রোশ তফাতে সিমুলে গ্রামে তাহার বিবাহ দিলাম। ছেলেটিকে কার্ত্তিকের মত দেখিতে। যেমন রং তেমনি চেহারা—খাওয়া পরার সঙ্গতিও তাহাদের ছিল।

একদিন আমার যেমন অনাদর ও কষ্ট গিয়াছে, কপাল ভাঙিবার পূর্ব্বে বিধাতা কিছুদিনের জন্য আমাকে তেমনি সুখ দিয়াছিলেন। শেষাশেষি আমার স্বামী আমাকে বড়ই আদর ও শ্রদ্ধা করিতেন, আমার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কোনো কাজই করিতেন না। এত সৌভাগ্য আমার সহিবে কেন? কলেরা হইয়া চারিদিনের ব্যবধানে আমার ছেলে এবং স্বামী মারা গেলেন। যে দুঃখ কল্পনা করিলেও অসহ্য বোধ হয় তাহাও যে মানুষের সয় ইহাই জানাইবার জন্য ঈশ্বর আমাকে বাঁচাইয়া রাখিলেন।

ক্রমেই জামাইয়ের পরিচয় পাইতে লাগিলাম। সুন্দর ফুলের মধ্যে যে এমন কাল সাপ লুকাইয়া থাকে তাহা কে মনে করিতে পারে? সে যে কুসংসর্গে পড়িয়া নেশা ধরিয়াছিল তাহা আমার মেয়েও কোন দিন আমাকে বলে নাই। জামাই যখন তখন আসিয়া নানা অভাব জানাইয়া আমার কাছে টাকা চাহিয়া লইয়া যাইত। সংসারে আমার ত আর কাহারও জন্য টাকা জমাইবার কোনো প্রয়োজন ছিল না তাই জামাই যখন আবদার করিয়া আমার কাছ হইতে কিছু চাহিত সে আমার ভালই লাগিত। মাঝে মাঝে আমার মেয়ে আমাকে বারণ করিত—আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিত, তুমি অমনি করিয়া উঁহাকে টাকা দিয়া উঁহার অভ্যাস খারাপ করিয়া দিতেছ—টাকা হাতে পাইলেই উনি কোথায় যে কেমন করিয়া উড়াইয়া দেন তাহার ঠিকানা নাই।—আমি ভাবিতাম তাহার স্বামী আমার কাছে এমন করিয়া টাকা লইলে তাহার শ্বশুরকুলের অগৌরব হইবে এই ভয়েই বুঝি মনোরমা আমাকে টাকা দিতে নিষেধ করে।

তখন আমার এমন বুদ্ধি হইল আমি আমার মেয়েকে লুকাইয়া জামাইকে নেশার কড়ি জোগাইতে লাগিলাম। মনোরমা যখন তাহা জানিতে পারিল তখন সে একদিন আমার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া তাহার স্বামীর কলঙ্কের কথা সমস্ত জানাইয়া দিল। তখন আমি কপাল চাপড়াইয়া মরি! দুঃখের কথা কি আর বলিব আমার একজন দেওরই কুসঙ্গ এবং কুবুদ্ধি দিয়া আমার জামাইয়ের মাথা খাইয়াছে!

টাকা দেওয়া যখন বন্ধ করিলাম এবং জামাই যখন সন্দেহ করিল যে, আমার মেয়েই আমাকে নিষেধ করিয়াছে তখন তাহার আর কোনো আবরণ রহিল না। তখন সে এত অত্যাচার আরম্ভ করিল, আমার মেয়েকে পৃথিবীর লোকের সামনে এমন করিয়া অপমান করিতে লাগিল যে তাহাই নিবারণ করিবার জন্য আবার আমি আমার মেয়েকে লুকাইয়া তাহাকে টাকা দিতে লাগিলাম। জানিতাম আমি তাহাকে রসাতলে দিতেছি কিন্তু মনোরমাকে সে অসহ্য পীড়ন করিতেছে এ সংবাদ পাইলে আমি কোনোমতে স্থির থাকিতে পারিতাম না।

অবশেষে একদিন—সে দিনটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। মাঘ মাসের শেষাশেষি, সে বছর সকাল সকাল গরম পড়িয়াছে; আমরা বলাবলি করিতেছিলাম এরি মধ্যে আমাদের খিড়কির বাগানের গাছগুলো আমের বোলে ভরিয়া গেছে! সেই মাঘের অপরাহ্নে আমাদের দরজায়

কাছে পাল্কী আসিয়া থামিল। দেখি, মনোরমা হাসিতে হাসিতে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল। আমি বলিলাম, "কি মনু, তোদের খবর কি?" মনোরমা হাসি মুখে বলিল, "খবর না থাক্‌লে বুঝি মার বাড়ীতে শুধু শুধু আস্‌তে নেই!"

আমার বেয়ান মন্দলোক ছিলেন না। তিনি আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন, বউমা পুত্রসম্ভাবিতা, সন্তান প্রসব হওয়া পর্য্যন্ত তাহার মার কাছে থাকিলেই ভাল। আমি ভাবিলাম সেই কথাটাই বুঝি সত্য। কিন্তু জামাই যে এই অবস্থাতেও মনোরমাকে মারধোর করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং বিপৎপাতের আশঙ্কাতেই বেয়ান তাঁহার পুত্রবধূকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন তাহা আমি জানিতেও পারি নাই। মনু এবং তাহার শাশুড়ীতে মিলিয়া আমাকে এমনি করিয়াই ভুলাইয়া রাখিল। মেয়েকে আমি নিজের হাতে তেল মাখাইয়া স্নান করাইতে চাহিলে মনোরমা নানা ছুতায় কাটাইয়া দিত;—তাহার কোমল অঙ্গে যে সব আঘাতের দাগ পড়িয়াছিল সে তাহা তাহার মায়ের দৃষ্টির কাছেও প্রকাশ করিতে চাহে নাই।

জামাই মাঝে মাঝে আসিয়া মনোরমাকে বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য গোলমাল করিত। মেয়ে আমার কাছে থাকাতে টাকার আবদার করিতে তাহার ব্যাঘাত ঘটিত। ক্রমে সে বাধাও আর সে মানিল না। টাকার জন্য মনোরমার সাম্‌নেই আমার প্রতি উপদ্রব করিতে লাগিল। মনোরমা জেদ করিয়া বলিত-কোনোমতেই টাকা দিতে পারিবে না—কিন্তু আমার বড় দুর্ব্বল মন, পাছে জামাই আমার মেয়ের উপর অত্যন্ত বেশি বিরক্ত হইয়া উঠে এই ভয়ে আমি তাহাকে কিছু না দিয়া থাকিতে পারিতাম না।

মনোরমা একদিন বলিল, মা, তোমার টাকা কড়ি সমস্ত আমিই রাখিব। বলিয়া আমার চাবি ও বাক্স সব দখল করিয়া বসিল। জামাই আসিয়া যখন আমার কাছে আর টাকা পাইবার সুবিধা দেখিল না এবং যখন মনোরমাকে কিছুতেই নরম করিতে পারিল না—তখন সুর ধরিল মেজবৌকে বাড়িতে লইয়া যাইব। আমি মনোরমাকে বলিতাম, দে, মা, ওকে কিছু টাকা দিয়েই বিদায় করে দে, —নইলে ও কি করে বসে কে জানে। কিন্তু আমার মনোরমা একদিকে যেমন নরম আর একদিকে তেমনি শক্ত ছিল। সে বলিত, না, টাকা কোনোমতেই দেওয়া হবে না।

জামাই একদিন আসিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল—কাল আমি বিকাল বেলা পাল্কি পাঠাইয়া দেব। বৌকে যদি ছেড়ে না দাও তবে ভাল হবে না, বলে রাখছি।

পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে পাল্কী আসিলে আমি মনোরমাকে বলিলাম, "মা, আর দেরি করে কাজ নেই, আবার আস্‌চে হপ্তায় তোমাকে আনবার জন্য লোক পাঠাব।"

মনোরমা কহিল, আজ থাক্‌, আজ আমার যেতে ইচ্ছা হচ্চে না মা, আর দুদিন বাদে আস্‌তে বোলো।

আমি বলিলাম, "মা, পাল্কি ফিরিয়ে দিলে কি আমার ক্ষেপা জামাই রক্ষা রাখ্‌বে? কাজ নেই, মনু, তুমি আজই যাও।"

মনু বলিল, না, মা, আজ নয়; আমার শ্বশুর কলকাতায় গিয়েছেন ফাল্গুনের মাঝামাঝি তিনি ফিরে আস্‌বেন তখন আমি যাব।

আমি তবু বলিলাম, না, কাজ নাই মা।

তখন মনোরমা প্রস্তুত হইতে গেল। আমি তাহার শ্বশুর বাড়ীর চাকর ও পাল্কীর বেহারাদিগকে খাওয়াইবার আয়োজনেই ব্যস্ত রহিলাম। যাইবার আগে একটু যে তাহার কাছে থাকিব, সে দিন যে তাহাকে একটু বিশেষ করিয়া যত্ন করিয়া লইব, নিজের হাতে তাহাকে সাজাইয়া দিব, সে যে খাবার ভালবাসে তাহাই তাহাকে খাওয়াইয়া দিয়া বিদায় দিব, এমন অবকাশ পাইলাম না। ঠিক পাল্কীতে উঠিবার আগে আমাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া কহিল "মা আমি তবে চলিলাম।"

সে যে সত্যই চলিল সে কি আমি জানিতাম! সে যাইতে চাহে নাই আমি জোর করিয়া তাহাকে বিদায় করিয়াছি—এই দুঃখে বুক আজ পর্য্যন্ত পুড়িতেছে; সে আর কিছুতেই শীতল হইল না!

সেই রাত্রেই গর্ভপাত হইয়া মনোরমার মৃত্যু হইল এই খবর যখন পাইলাম তাহার পূর্ব্বেই গোপনে তাড়াতাড়ি তাহার সৎকার শেষ হইয়া গেছে।

যাহার কিছু বলিবার নাই, করিবার নাই, ভাবিয়া যাহার কিনারা পাওয়া যায় না, কাঁদিয়া যাহার অন্ত হয় না, সেই দুঃখ যে কি দুঃখ, তাহা তোমরা বুঝিবে না—সে বুঝিয়া কাজ নাই।

আমারত সবই গেল কিন্তু তবু আপদ চুকিল না। আমার স্বামীপুত্রের মৃত্যুর পর হইতেই দেবররা আমার বিষয়ের প্রতি লোভ দিতেছিল। তাহারা জানিত আমার মৃত্যুর পরে বিষয়সম্পত্তি সমুদয় তাহাদেরই হইবে কিন্তু ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের সবুর সহিতেছিল না। ইহাতে কাহারো দোষ দেওয়া চলে না; সত্যই আমার মত অভাগিনীর বাঁচিয়া থাকাই যে একটা অপরাধ। সংসারে যাহাদের নানা প্রয়োজন আছে, আমার মত প্রয়োজনহীন লোক বিনাহেতুতে তাহাদের জায়গা জুড়িয়া বাঁচিয়া থাকিলে লোকে সহ্য করে কেমন করিয়া!

মনোরমা যত দিন বাঁচিয়াছিল ততদিন আমি দেবরদের কোনো কথায় ভুলি নাই। আমার বিষয়ের অধিকার লইয়া যতদূর সাধ্য তাহাদের সঙ্গে লড়িয়াছি। আমি যতদিন বাঁচি মনোরমার জন্য টাকা সঞ্চয় করিয়া তাহাকে দিয়া যাইব এই আমার পণ ছিল। আমি আমার কন্যার জন্য টাকা জমাইবার চেষ্টা করিতেছি ইহাই আমার দেবরদের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল—তাহাদের মনে হইত আমি তাহাদেরই ধন চুরি করিতেছি। নীলকান্ত বলিয়া কর্ত্তার একজন পুরাতন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ছিল সেই আমার সহায় ছিল। আমি যদি বা আমার প্রাপ্য কিছু ছাড়িয়া দিয়া আপসে নিষ্পত্তির চেষ্টা করিতাম সে কোনোমতেই রাজি হইত না—সে বলিত আমাদের হকের এক পয়সা কে লয় দেখিব! এই হকের লড়াইয়ের মাঝখানেই আমার কন্যার মৃত্যু হইল। তাহার পরদিনেই আমার মেঝদেবর আসিয়া আমাকে বৈরাগ্যের উপদেশ দিলেন। বলিলেন, বৌদিদি ঈশ্বর তোমার যা অবস্থা করিলেন তাহাতে তোমার আর সংসারে থাকা উচিত হয় না। যে কয়দিন বাঁচিয়া থাক তীর্থে গিয়া ধর্ম্মকর্ম্মে মন দাও আমরা তোমার খাওয়া পরার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

আমি আমাদের গুরুঠাকুরকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। বলিলাম ঠাকুর, অসহ্য দুঃখের হাত হইতে কি করিয়া বাঁচিব আমাকে বলিয়া দাও—উঠিতে বসিতে আমার কোথাও কোনো সান্ত্বনা নাই—আমি যেন বেড়া-আগুনের মধ্যে পড়িয়াছি, যেখানেই যাই, যেদিকেই ফিরি, কোথাও আমার যন্ত্রণার এতটুকু অবসানের পথ দেখিতে পাই না।

গুরু আমাকে আমাদের ঠাকুর ঘরে লইয়া গিয়া কহিলেন, এই গোপীবল্লভই তোমার স্বামী পুত্র কন্যা সবই। ইঁহার সেবা করিয়াই তোমার সমস্ত শূন্য পূর্ণ হইবে।

আমি দিনরাত ঠাকুরঘরেই পড়িয়া রহিলাম। ঠাকুরকেই সমস্ত মন দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম—কিন্তু তিনি নিজে না লইলে আমি দিব কেমন করিয়া? তিনি লইলেন কই?

নীলকান্তকে ডাকিয়া কহিলাম, নীলুদাদা, আমার জীবনস্বত্ব আমি দেবরদেরই লিখিয়া দিব স্থির করিয়াছি। তাহারা খোরাকীবাবদ মাসে মাসে কিছু করিয়া টাকা দিবে।

নীলকান্ত কহিল, সে কখনো হইতেই পারে না। তুমি মেয়েমানুষ এ সব কথায় থাকিয়ো না।

আমি বলিলাম, আমার আর সম্পত্তিতে প্রয়োজন কি?

নীলকান্ত কহিল, তা বলিলে কি হয়! আমাদের যা হক্ তাহা ছাড়িব কেন? এমন পাগ্‌লামি করিয়ো না।

নীলকান্ত হকের চেয়ে বড় আর কিছুই দেখিতে পায় না। আমি বড় মুস্কিলেই পড়িলাম। বিষয় কর্ম্ম আমার কাছে বিষের মত ঠেকিতেছে;—কিন্তু জগতে আমার ঐ একমাত্র বিশ্বাসী নীলকান্তই আছে তাহার মনে আমি কষ্ট দিই কি করিয়া! সে যে বহু দুঃখে আমার ঐ এক 'হক্' বাঁচাইয়া আসিয়াছে।

শেষকালে একদিন নীলকান্তকে গোপন করিয়া একখানা কাগজে সহি দিলাম। তাহাতে কি যে লেখা ছিল তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখি নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, আমার সই করিতে ভয় কি—আমি এমন কি রাখিতে চাই যাহা আর কেহ ঠকাইয়া লইলে সহ্য হইবে না। সবইত আমার শ্বশুরের, তাঁহার ছেলেরা পাইবে পাক্।

লেখাপড়া রেজেষ্ট্রী হইয়া গেলে আমি নীলকান্তকে

ডাকিয়া কহিলাম, নীলুদাদা, রাগ করিয়ো না, আমার যাহা কিছু ছিল লিখিয়া পড়িয়া দিয়াছি, আমার কিছুতেই প্রয়োজন নাই।

নীলকান্ত অস্থির হইয়া উঠিয়া কহিল, অ্যাঁ, করিয়াছ কি!

যখন দলিলের খস্‌ড়া পড়িয়া দেখিল সত্যই আমি আমার সমস্ত স্বত্বত্যাগ করিয়াছি তখন নীলকান্তের ক্রোধের সীমা রহিল না। তাহার প্রভুর মৃত্যুর পর হইতে আমার ঐ 'হক্‌' বাঁচানোই তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল। তাহার সমস্ত বুদ্ধি সমস্ত শক্তি ইহাতেই অবিশ্রাম নিযুক্ত ছিল। এ লইয়া মাম্‌লা মকদ্দমা, উকীল-বাড়ি হাঁটাহাঁটি, আইন খুঁজিয়া বাহির করা ইহাতেই সে সুখ পাইয়াছে—এমন কি, তাহার নিজের ঘরের কাজ দেখিবারও সময় ছিল না। সেই হক্‌ যখন নির্ব্বোধ মেয়েমানুষের কলমের এক আঁচড়েই উড়িয়া গেল তখন নীলকান্তকে শান্ত করা অসম্ভব হইয়া উঠিল।

সে কহিল, যাক্‌ এখানকার সঙ্গে আমার সমস্ত সম্বন্ধ চুকিল, আমি চলিলাম।

অবশেষে নীলুদাদা এমন করিয়া রাগ করিয়া আমার কাছ হইতে বিদায় হইয়া যাইবে শ্বশুরবাড়ির ভাগ্যে এই কি আমার শেষ লিখন ছিল! আমি তাহাকে অনেক মিনতি করিয়া ডাকিয়া বলিলাম, দাদা, আমার উপর রাগ করিও না। আমার কিছু জমানো টাকা আছে তাহা হইতে তোমাকে এই পাঁচশো টাকা দিতেছি—তোমার ছেলের বৌ যেদিন আসিবে সেইদিন আমার আশীর্ব্বাদ জানাইয়া এই টাকা হইতে তাহার গহনা গড়াইয়া দিয়ো।

নীলকান্ত কহিল, আমার আর টাকায় প্রয়োজন নাই। আমার মনিবের সবই যখন গেল তখন ও পাঁচশো টাকা লইয়া আমার সুখ হইবে না। ও থাক্‌!

এই বলিয়া আমার স্বামীর শেষ অকৃত্রিম বন্ধু আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

আমি ঠাকুরঘরে আশ্রয় লইলাম। আমার দেবররা বলিল, তুমি তীর্থবাসে যাও।

আমি কহিলাম আমার শ্বশুরের ভিটাই আমার তীর্থ, আর আমার ঠাকুর যেখানে আছে সেখানেই আমার আশ্রয়।

কিন্তু আমি যে বাড়ীর কোনো অংশ অধিকার করিয়া থাকি তাহাও তাহাদের পক্ষে অসহ্য হইতে লাগিল। তাহারা ইতিমধ্যেই আমাদের বাড়ীতে জিনিষপত্র আনিয়া কোন্‌ ঘর কে কিভাবে ব্যবহার করিবে তাহা সমস্তই ঠিক করিয়া লইয়াছিল। শেষকালে তাহারা বলিল তোমার ঠাকুর তুমি লইয়া যাইতে পার আমরা তাহাতে আপত্তি করিব না।

যখন তাহাতেও আমি সঙ্কোচ করিতে লাগিলাম তখন তাহারা কহিল, এখানে তোমার খাওয়া পরা চলিবে কি করিয়া?

আমি বলিলাম—কেন, তোমরা যা খোরাকী বরাদ্দ করিয়াছ তাহাতেই আমার যথেষ্ট হইবে।

তাহারা কহিল, কই খোরাকির ত কোনো কথা নাই!

তাহার পর আমার ঠাকুর লইয়া আমার বিবাহের ঠিক চউত্রিশ বৎসর পরে একদিন শ্বশুর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। নীলুদাদার সন্ধান লইতে গিয়া শুনিলাম তিনি আমার পূর্ব্বেই বৃন্দাবনে চলিয়া গেছেন।

গ্রামের তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে আমি কাশীতে গেলাম। কিন্তু পাপমনে কোথাও শান্তি পাইলাম না। ঠাকুরকে প্রতিদিন ডাকিয়া বলি, ঠাকুর, আমার স্বামী আমার ছেলে-মেয়ে আমার কাছে যেমন সত্য ছিল তুমি আমার কাছে তেমনি সত্য হয়ে ওঠ!—কিন্তু কই, তিনি ত আমার প্রার্থনা শুনিলেন না! আমার বুক যে জুড়োয় না, আমার সমস্ত শরীর মন যে কাঁদিতে থাকে! বাপ্‌রে বাপ! মানুষের প্রাণ কি কঠিন!

সেই আটবৎসর বয়সে শ্বশুর বাড়ী গিয়াছি তাহার পরে একদিনের জন্যও বাপের বাড়ী আসিতে পাই নাই। তোমার মায়ের বিবাহে উপস্থিত থাকিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কোনো ফল হয় নাই। তাহার পর বাবার চিঠিতে তোমাদের জন্মের সংবাদ পাইলাম, আমার বোনের মৃত্যুসংবাদও পাইয়াছি। মায়ের কোলছাড়া তোদের যে আমার কোলে টানিব ঈশ্বর এপর্য্যন্ত এমন সুযোগ ঘটান নাই।

তীর্থে ঘুরিয়া যখন দেখিলাম মায়া এখনো মন ভরিয়া আছে, কোনো একটা বুকের জিনিষকে পাইবার জন্য

বুকের তৃষ্ণা এখনো মরে নাই—তখন তোদের খোঁজ করিতে লাগিলাম। শুনিয়াছিলাম তোদের বাপ ধর্ম্ম ছাড়িয়া সমাজ ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তা কি করিব! তোদের মা যে আমার এক মায়ের পেটের বোন্।

কাশীতে এক ভদ্রলোকের কাছে তোমাদের খোঁজ পাইয়া এখানে আসিয়াছি। পরেশ বাবু শুনিয়াছি ঠাকুর দেবতা মানেন না, কিন্তু ঠাকুর যে উঁহার প্রতি প্রসন্ন সে উঁহার মুখ দেখিলেই বোঝা যায়। ঠাকুর পূজা পাইলেই ভোলেন না, সে আমি খুব জানি—পরেশ বাবু কেমন করিয়া তাঁহাকে বশ করিলেন সেই খবর আমি লইব। যাই হোক্ বাছা, একলা থাকিবার সময় এখনো আমার হয় নাই—সে আমি পারি না—ঠাকুর যেদিন দয়া করেন করিবেন, কিন্তু তোমাদের কোলের কাছে না রাখিয়া আমি বাঁচিব না।

৩৯

পরেশ বরদাসুন্দরীর অনুপস্থিতিকালে হরিমোহিনীকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ছাতের উপরকার নিভৃত ঘরে তাঁহাকে স্থান দিয়া যাহাতে তাঁহার আচার রক্ষা করিয়া চলার কোনো বিঘ্ন না ঘটে তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

বরদাসুন্দরী ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার ঘর কন্নার মধ্যে এই একটি অভাবনীয় প্রাদুর্ভাব দেখিয়া একেবারে হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেলেন। তিনি পরেশকে খুব তীব্র স্বরেই কহিলেন, এ আমি পারব না।

পরেশ কহিলেন, তুমি আমাদের সকলকেই সহ্য করতে পারচ আর ঐ একটি বিধবা অনাথাকে সইতে পারবে না?

বরদাসুন্দরী জানিতেন পরেশের কাণ্ডজ্ঞান কিছুমাত্র নাই, সংসারে কিসে সুবিধা ঘটে বা অসুবিধা ঘটে সে সম্বন্ধে তিনি কোনো দিন বিবেচনা মাত্র করেন না; হঠাৎ এক একটা কাণ্ড করিয়া বসেন। তাহার পরে রাগই করো, বকো আর কাঁদো একেবারে পাষাণের মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া থাকেন। এমন লোকের সঙ্গে কে পারিয়া উঠিবে বল! প্রয়োজন হইলে যাহার সঙ্গে ঝগড়া করাও অসম্ভব তাহার সঙ্গে ঘর করিতে কোন্ স্ত্রীলোকে পারে!

সুচরিতা মনোরমার প্রায় একবয়সী ছিল। হরিমোহিনীর মনে হইতে লাগিল সুচরিতাকে দেখিতেও যেন অনেকটা সেই মনোরমারই মত; আর স্বভাবটিও তাহার সঙ্গে মিলিয়াছে। তেমনি শান্ত অথচ তেমনি দৃঢ়। হঠাৎ পিছন হইতে তাহাকে দেখিয়া এক এক সময়ে হরিমোহিনীর বুকের ভিতরটা যেন চমকিয়া উঠে। এক এক দিন সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকারে তিনি একলা বসিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছেন এমন সময় সুচরিতা কাছে আসিলে চোখ বুজিয়া তাহাকে দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিতেন "আহা আমার মনে হচ্চে যেন আমি তাকেই বুকের মধ্যে পেয়েছি। সে যেতে চায়নি আমি তাকে জোর করে বিদায় করে দিয়েছি, জগৎ সংসারে কি কোনো দিন কোনো মতেই আমার সে শাস্তির অবসান হবে না! দণ্ড যা পাবার তা পেয়েছি—এবার সে এসেছে; এই যে ফিরে এসেছে; তেমনি হাসিমুখ করে ফিরে এসেছে; এই যে আমার মা, এই যে আমার মণি, আমার ধন!" এই বলিয়া সুচরিতার সমস্ত মুখে হাত বুলাইয়া তাহার চুমো খাইয়া চোখের জলে ভাসিতে থাকিতেন; সুচরিতারও দুই চক্ষু দিয়া জল ঝরিয়া পড়িত। সে তাঁহার গলা জড়াইয়া বলিত, "মাসি, আমিও ত মায়ের আদর বেশি দিন ভোগ করতে পারিনি; আজ আমার সেই হারানো মা ফিরে এসেচেন! কতদিন কত দুঃখের সময় যখন ঈশ্বরকে ডাকবার শক্তি ছিল না, যখন মনের ভিতরটা শুকিয়ে গিয়াছিল, তখন আমার মাকে ডেকেছি। সেই মা আজ আমার ডাক শুনে এসেচেন।"

হরিমোহিনী বলিতেন "অমন করে বলিস্‌নে, বলিস্‌নে! তোর কথা শুন্‌লে আমার এত আনন্দ হয় যে আমার ভয় করতে থাকে! হে ঠাকুর, দৃষ্টি দিয়ো না ঠাকুর। আর মায়া করব না মনে করি—মনটাকে পাষাণ করেই থাকতে চাই কিন্তু পারি নে যে! আমি বড় দুর্ব্বল, আমাকে দয়া কর, আমাকে আর মেরো না! ওরে রাধারাণী, যা, যা, আমার কাছ থেকে ছেড়ে যা! আমাকে আর জড়াস্‌নেরে জড়াস্‌নে! ও আমার গোপীবল্লভ, আমার জীবননাথ, আমার গোপাল, আমার নীলমণি, আমাকে এ আবার কি বিপদে ফেল্‌চ!"

সুচরিতা কহিত, "আমাকে তুমি জোর করে বিদায়

করতে পারবে না মাসি! আমি তোমাকে কখনো ছাড়ব না—আমি বরাবর তোমার এই কাছেই রইলুম্!" বলিয়া তাঁহার বুকের মধ্যে মাথা রাখিয়া শিশুর মত চুপ করিয়া থাকিত।

দুই দিনের মধ্যেই সুচরিতার সঙ্গে তাহার মাসির এমন একটা গভীর সম্বন্ধ বাঁধিয়া গেল যে ক্ষুদ্র কালের দ্বারা তাহার পরিমাপ হইতে পারে না।

বরদাসুন্দরী ইহাতেও বিরক্ত হইয়া গেলেন। "মেয়েটার রকম দেখ! যেন আমরা কোনো দিন উহার কোনো আদর যত্ন করি নাই! বলি, এত দিন মাসি ছিলেন কোথায়! ছোটো বেলা হইতে আমরা যে এত করিয়া মানুষ করিলাম আর আজ মাসি বলিতেই একেবারে অজ্ঞান। আমি কর্ত্তাকে বরাবর বলিয়া আসিয়াছি ঐ যে সুচরিতাকে তোমরা সবাই ভাল ভাল কর ও কেবল বাহিরে ভাল মানুষী করে কিন্তু উহার মন পাবার জো নাই। আমরা এতদিন উহার যা করিয়াছি সব বৃথাই হইয়াছে!"

পরেশ যে বরদাসুন্দরীর দরদ বুঝিবেন না তাহা তিনি জানিতেন। শুধু তাই নহে হরিমোহিনীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিলে তিনি যে পরেশের কাছে খাটো হইয়া যাইবেন ইহাতেও তাঁহার সন্দেহ ছিল না। সেই জন্যই তাঁর রাগ আরো বাড়িয়া উঠিল। পরেশ যাহাই বলুন কিন্তু অধিকাংশ বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গেই যে বরদাসুন্দরীর মত মেলে ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য তিনি দল বাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সমাজের প্রধান অপ্রধান সকল লোকের কাছেই হরিমোহিনীর ব্যাপার লইয়া সমালোচনা যুড়িয়া দিলেন। হরিমোহিনীর হিঁদুয়ানি, তাঁহার ঠাকুর পূজা, বাড়িতে ছেলে মেয়ের কাছে তাঁহার কুদৃষ্টান্ত, ইহা লইয়া তাঁহার আক্ষেপ অভিযোগের অন্ত রহিল না।

শুধু লোকের কাছে অভিযোগ নহে, বরদাসুন্দরী সকল প্রকারে হরিমোহিনীর অসুবিধা ঘটাইতে লাগিলেন। হরিমোহিনীর রন্ধনাদির জল তুলিয়া দিবার জন্য যে একজন গোয়ালা বেহারা ছিল তাহাকে তিনি ঠিক সময় বুঝিয়া অন্য কাজে নিযুক্ত করিয়া দিতেন। সে সম্বন্ধে কোনো কথা উঠিলে বলিতেন, "কেন, রামদীন আছে ত?" রামদীন জাতে দোসাদ; তিনি জানিতেন তাহার হাতের জল হরিমোহিনী ব্যবহার করিবেন না। সে কথা কেহ বলিলে বলিতেন—"অত বামনাই করতে চান ত আমাদের ব্রাহ্ম বাড়িতে এলেন কেন? আমাদের এখানে ও সমস্ত জাতের বিচার করা চলবে না। আমি কোন মতেই এতে প্রশ্রয় দেব না।" এইরূপ উপলক্ষ্যে তাঁহার কর্ত্তব্যবোধ অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিত। তিনি বলিতেন ব্রাহ্মসমাজে ক্রমে সামাজিক শৈথিল্য অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিতেছে; এই জন্যই ব্রাহ্মসমাজ যথেষ্ট পরিমাণে কাজ করিতে পারিতেছে না। তাঁহার সাধ্যমত তিনি এরূপ শৈথিল্যে যোগ দিতে পারিবেন না। না কিছুতেই না! ইহাতে যদি কেহ তাঁহাকে ভুল বোঝে তবে সেও স্বীকার, যদি আত্মীয়েরাও বিরুদ্ধ হইয়া উঠে তবে সেও তিনি মাথা পাতিয়া লইবেন। পৃথিবীতে মহাপুরুষেরা যাঁহারা কোনো মহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই যে নিন্দা ও বিরোধ সহ্য করিতে হইয়াছে সেই কথাই তিনি সকলকে স্মরণ করাইতে লাগিলেন।

কোনো অসুবিধায় হরিমোহিনীকে পরাস্ত করিতে পারিত না। তিনি কৃচ্ছ্রসাধনের চূড়ান্ত সীমায় উঠিবেন বলিয়াই যেন পণ করিয়াছিলেন। তিনি অন্তরে যে অসহ্য দুঃখ পাইয়াছেন বাহিরেও যেন তাহার সহিত ছন্দরক্ষা করিবার জন্য কঠোর আচারের দ্বারা অহরহ কষ্ট সৃজন করিয়া চলিতেছিলেন। এইরূপে দুঃখকে নিজের ইচ্ছার দ্বারা বরণ করিয়া তাহাকে আত্মীয় করিয়া লইয়া তাহাকে বশ করিবার এই সাধনা।

হরিমোহিনী যখন দেখিলেন জলের অসুবিধা হইতেছে তখন তিনি রন্ধন একেবারে ছাড়িয়াই দিলেন। তাঁহার ঠাকুরের কাছে নিবেদন করিয়া প্রসাদ স্বরূপে দুধ এবং ফল খাইয়া কাটাইতে লাগিলেন। সুচরিতা ইহাতে অত্যন্ত কষ্ট পাইল। মাসি তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন "মা, এ আমার বড় ভাল হয়েছে। এই আমার প্রয়োজন ছিল। এতে আমার কোনো কষ্ট নেই, আমার আনন্দই হয়!"

সুচরিতা কহিল, "মাসি আমি যদি অন্যজাতের হাতে জল বা খাবার না খাই তাহলে তুমি আমাকে তোমার কাজ করতে দেবে?"

হরিমোহিনী কহিলেন—"কেন মা, তুমি যে ধর্ম্ম মান সেই মতেই তুমি চল—আমার জন্যে তোমাকে অন্য পথে যেতে হবে না। আমি তোমাকে কাছে পেয়েছি, বুকে রাখচি, প্রতিদিন দেখতে পাই এই আমার আনন্দ। পরেশ বাবু তোমার গুরু তোমার বাপের মত, তিনি তোমাকে যে শিক্ষা দিয়েচেন তুমি সেই মেনে চল, তাতেই ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।"

হরিমোহিনী বরদাসুন্দরীর সমস্ত উপদ্রব এমন করিয়া সহিতে লাগিলেন যেন তিনি তাহা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। পরেশবাবু যখন প্রত্যহ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন কেমন আছেন, কোনো অসুবিধা হইতেছে না ত,—তিনি বলিতেন আমি খুব সুখে আছি।

কিন্তু বরদাসুন্দরীর সমস্ত অন্যায় সুচরিতাকে প্রতি-মুহূর্ত্তে জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। সে ত নালিশ করিবার মেয়ে নয়; বিশেষত পরেশবাবুর কাছে বরদাসুন্দরীর ব্যবহারের কথা বলা তাহার দ্বারা কোনোমতেই ঘটিতে পারে না। সে নিঃশব্দে সমস্ত সহ্য করিতে লাগিল—এসম্বন্ধে কোনোপ্রকার আক্ষেপ প্রকাশ করিতেও তাহার অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হইত।

ইহার ফল হইল এই যে, সুচরিতা ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ-ভাবেই তাহার মাসির কাছে আসিয়া পড়িল। মাসির বারম্বার নিষেধ সত্ত্বেও আহার পান সম্বন্ধে সে তাহারই সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে লাগিল। শেষকালে সুচরিতার কষ্ট হইতেছে দেখিয়া দায়ে পড়িয়া হরি-মোহিনীকে পুনরায় রন্ধনাদিতে মন দিতে হইল। সুচরিতা কহিল, "মাসি, তুমি আমাকে যেমন করে থাকতে বল আমি তেমনি করেই থাকব কিন্তু তোমার জল আমি নিজে তুলে দেব, সে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।"

হরিমোহিনী কহিলেন, "মা তুমি কিছু মনে কোরোনা কিন্তু ঐ জলে যে আমার ঠাকুরের ভোগ হয়!"

সুচরিতা কহিল—"মাসি, তোমার ঠাকুরও কি জাত মানেন, তাঁকেও কি পাপ লাগে? তাঁরও কি সমাজ আছে না কি?"

অবশেষে একদিন সুচরিতার নিষ্ঠার কাছে হরি-মোহিনীকে হার মানিতে হইল। সুচরিতার সেবা তিনি সম্পূর্ণভাবেই গ্রহণ করিলেন। সতীশও দিদির অনুকরণে মাসির রান্না খাইব বলিয়া ধরিয়া পড়িল। এমনি করিয়া এই তিনটিতে মিলিয়া পরেশবাবুর ঘরের কোণে আর একটি ছোট সংসার জমিয়া উঠিল। কেবল ললিতা এই দুটি সংসারের মাঝখানে সেতুস্বরূপে বিরাজ করিতে লাগিল। বরদাসুন্দরী তাঁহার আর কোনো মেয়েকে এদিকে ঘেঁসিতে দিতেন না—কিন্তু ললিতাকে নিষেধ করিয়া পারিয়া উঠিবার শক্তি তাঁহার ছিল না।

ব্রাইটন্।

"এবার গ্রীষ্মে কোথায় যাইতেছ?"

"সমুদ্রতীরে।"

"কোথা?"

"ব্রাইটন্।"

"ব্রাইটন্? ছি! গ্রীষ্মকালে ব্রাইটন্? গ্রীষ্মকালে টম্ ব্রাইটনে যায়, ডিক্ যায়, হ্যারি যায়;—যাইও না। শীতকালে যাইও। শীতকালেই ব্রাইটন্ ফেশানেবল। বোর্ণমাউথ্ যাইতে পার,—টর্-কী যাইতে পার;—ব্রাইটনে যাইও না।"

একদিন অপরাহ্নে, টেম্প্লে, ফাউণ্টেন কোর্টের নিকট দাঁড়াইয়া একজন সহপাঠীর সহিত আমার পূর্ব্বোক্ত প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছিল। বন্ধু যাহাই বলুন, মাস দুই ব্রাইটনে গিয়া অবস্থিতি করিব স্থির করিয়াছি। তাহার বিশিষ্ট কারণও আছে।

আগষ্ট মাস,—অসহ্য গরম পড়িয়াছে। রাত্রে দুই-খানার বেশী কম্বল আর গায়ে সহে না। এমন কি, কোন কোন রাত্রিতে, শয়ন কক্ষের জানালা একইঞ্চি ফাঁক করিয়া রাখিতে হয়। প্রসিদ্ধ হাস্যরসিক মার্ক টোয়েন ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি আমাদের শীত ও গ্রীষ্মের তুলনায় সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষে শীত ও গ্রীষ্মের তফাৎ এই যে, গৃহদ্বারলগ্ন পিতলের হাণ্ডেলগুলা গ্রীষ্মকালে গলিয়া যায়, শীতকালে গলে না।"—আমি কিন্তু বিলাতী গ্রীষ্মের বর্ণনায় অত্যুক্তি প্রয়োগ করি নাই। জুন জুলাই মাসেও রাত্রে অন্ততঃ

দুইখানা কম্বল গায়ে দিতে হয়। ফ্ল্যানেলটা সে দেশে গ্রীষ্মকালের পোষাক বলিয়াই গণ্য। শাদা জিনের পোষাক প্রভৃতি সেখানে কেহ চক্ষেও দেখে নাই। তবে ভরপূর গ্রীষ্মের সময় দুই চারিদিন দিবাভাগে মনে হয় বটে টানাপাখার বন্দোবস্ত থাকিলে মন্দ হইত না। মোটা গরম কাপড়ে আবৃত দুইচারি জন অতি সাবধানী লোকের কোন কোন বৎসর সর্দ্দিগর্ম্মিও উপস্থিত হয়। তখন রয়টার পৃথিবীময় সে দুঃসংবাদ ব্যাপ্ত করিয়া ফেলেন।

অনেক দিন ধরিয়া লণ্ডনে বাস করিলে, প্রাণটা মুক্ত বায়ুর জন্য হাঁফাইয়া উঠে। লণ্ডনের বায়ুর অবিশুদ্ধতাই বোধ করি ইহার প্রধান কারণ। এত জনাকীর্ণ নগর ত আর পৃথিবীতে নাই। মনে আছে, বাল্যকালে যাত্রায় একটা প্রহসন দেখিয়াছিলাম,—"একেই কি বলে বাঙ্গালী সাহেব।"—সাহেব সদ্য প্রত্যাগত। একজন জিজ্ঞাসা করিল,—"লণ্ডন কি কলিকাতার মত এত বড় সহর হইবে?" সাহেব অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন—"এরূপ ডশটা বারোটা কলিকাটা সহর একটি টো করিলে যট বড় হয়, লণ্ডন সহর টট বড়।"—দশটা বারোটা না হউক, চারি পাঁচটা বটে। ষাট লক্ষ মানুষের নিশ্বাস, আর না জানি কত লক্ষ চিমনীর ধূম,—ইহাতেই বায়ু ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। তবে ইহাও বলিতে হইবে যে আমাদের দেশে জনাকীর্ণ বড় বড় নগরে স্থানে স্থানে যেরূপ দুর্গন্ধ হয়, সেরূপ কিন্তু লণ্ডনে কোথাও দেখা যায় না—পরিচ্ছন্নতার বন্দোবস্ত এতই চমৎকার।

শুধু শারীরিক অবসাদ নহে, লণ্ডনে অধিক দিন থাকিলে মানসিক অবসাদও উপস্থিত হয়। পথে বাহির হইলেই বিনা প্রয়োজনে নানা কারণে অনিচ্ছায় মস্তিষ্ক চালিত হইতে থাকে। একটা মাত্র উদাহরণ দিতেছি। মনে করুন প্রতিদিন সহরময় ভিত্তিগাত্রে যত নূতন নূতন বিজ্ঞাপনের প্ল্যাকার্ড নয়নপথে পতিত হয়, বিনা আগ্রহেও তাহার যতগুলি শব্দ মস্তিষ্কমধ্যে প্রবেশ করে, দিনান্তে তাহার যোগফল হিসাব করিবার উপায় থাকিলে দেখা যাইত যেন একখানি ছোটখাট গ্রন্থ পাঠ হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক অনেক সময় লণ্ডনে আমার এরূপ মনে হইয়াছে, যদি এমন স্থানে যাইতে পারি যেখানে দেওয়ালের গায়ে বিজ্ঞাপন নাই, তবে প্রকৃত বিশ্রামলাভ হয়।

কিছু দিন সমুদ্রতীরে যাপন করিতে হইবে, অথচ অধিক ব্যয় হইবে না, এই প্রকার একটি স্থানের অন্বেষণে ব্যাপৃত ছিলাম। স্থানটি ভাল হইবে, ব্যয় অল্প হইবে, অথচ সস্তা বোর্ডিং হাউসে টম-ডিক-হ্যারির সহবাস করিতে হইবে না, শিক্ষিত ভদ্র সমাজের লোকের সহিত থাকিব,—এমন একটি ব্রাহ্মণের গোরু পাই কোথায়? ইহা শুনিয়া বন্ধুবর প্রা— মহাশয় সন্ধান বলিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন—"ব্যাপ্টিষ্ট সম্প্রদায়, বিখ্যাত ধর্ম্মযাজক ডাক্তার স্পার্জ্জ্যনের স্মৃতি রক্ষার্থ, ব্রাইটনে ঠিক সমুদ্রের উপর একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য, তাঁহাদের ধর্ম্মযাজকগণ সেখানে গিয়া অবসর সময়ে বিশ্রাম লাভ করিবেন। প্রথম প্রথম ধর্ম্মযাজক ও তাঁহাদের পরিজন ভিন্ন সেখানে অন্য কেহ স্থান পাইত না। ক্রমে তাঁহারা দেখিলেন, যথেষ্ট লোক না হওয়াতে ঘর খানি পড়িয়া থাকে এবং শরঞ্জামী খরচ পোষায় না। সেই অবধি তাঁহারা নিয়ম করিয়াছেন, স্থান থাকিলে, বন্ধুবান্ধব কর্ত্তৃক পরিচিত বাহিরের ভদ্রলোককেও লওয়া যাইতে পারে। আমি সে স্থানে কিছু দিন ছিলাম। উত্তম বন্দোবস্ত—সপ্তাহে পঁচিশ শিলিং মাত্র (১৮৸০) লাগিবে। আমি পত্র লিখিয়া আপনার জন্য ঠিক করিতেছি।"

বন্ধুবর পত্র লিখিয়া সমস্ত ঠিক করিয়া দিলেন। তথাকার Lady Superintendent এর নিকট হইতেও পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, ষ্টেশনে নামিয়া Kemp Town অঙ্কিত সবুজ রঙের 'অমনিবসে' আরোহণ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত আসিলে, বাড়ীর অল্প দূরেই নামা যাইবে। পত্র মধ্যে তিনি একখানি 'পাস' পাঠাইয়া দিয়াছেন; টিকেট কিনিবার সময় সেখানি দেখাইলে, "কন্‌সেসন" মূল্যে যাতায়াতের তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট পাওয়া যাইবে।

এমন সুযোগ কে পরিত্যাগ করে? তাই গ্রীষ্মকালে ব্রাইটন "ফেশানেবল্" না হইলেও আগষ্ট মাসের শেষ ভাগে একদিন আমার বৃহৎ গ্ল্যাড্‌ষ্টোন ব্যাগটিতে দ্রব্যাদি বোঝাই করিয়া ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিলাম। ব্রাইটন, লণ্ডনের ৫০ মাইল দক্ষিণে। ট্রেন খানি "ব্রাইটন এক্সপ্রেস"

—কোথাও না দাঁড়াইয়া একেবারে ব্রাইটনে গিয়া উপস্থিত হইল। বিলাতে দূরগামী তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলি বেশ আরামদায়ক। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বড় বড় কামরা, সুশ্রী গদী মোড়া। সে দেশের প্রথম শ্রেণীর ভাড়া এ দেশের প্রথম শ্রেণীর ভাড়ারই তুল্য। কিন্তু সে দেশের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া এ দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর সমান।

ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া নানাবর্ণের অম্নিবস্ দেখিলাম। সবুজ একখানিতে আরোহণ করিয়া, দুই পেনি মূল্যে শেষ অবধি টিকিট কিনিলাম।

ব্রাইটনের ভিতর দিয়া দেখিতে দেখিতে গেলাম। যেন লণ্ডনেরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। ব্রাইটনকে London-Super-mare অর্থাৎ সমুদ্রতীরস্থ লণ্ডন বলে। সেই লণ্ডনের Salmon and Gluckstein এখানে আসিয়াও তামাকের দোকান খুলিয়াছে। সেই Hope Brothers এর পোষাকের দোকান। লণ্ডনে তাহাদের অসংখ্য শাখা-গুলির বহির্দ্দেশ যেমন হুবহু একই ছাঁচে ঢালা,—এখানেও তাহাই। মাঝে মাঝে পান ও ভোজনশালা। তবে সুখের বিষয় দোকান পশারের অংশ বহুবিস্তৃত নহে, শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল।

অর্দ্ধঘণ্টা কাল পরে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। সেখানে একটি পোষ্ট আপিস। পথচারী লোককে পথ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে Baptist's Homeএ গিয়া উপস্থিত হইলাম।

দেখিলাম বাড়ীটির নাম Arundel House। দক্ষিণ দিকে একটি, পূর্ব্বদিকে একটি প্রবেশ দ্বার। দক্ষিণ দিকের দরজার নিম্নেই রাজপথ—তাহার নিম্নেই সমুদ্র। রাজপথের সমুদ্রের দিকটা রেলিং দেওয়া। রেলিং নীচে হইতে খানিকদূর অবধি বেলাভূমি (beach) চলিয়া গিয়াছে—তাহার পরে নীলাম্বুরাশি। বাড়ীটি ব্রাইটনের একবারে শেষ ভাগে অবস্থিত। বাড়ীর পূর্ব্বে আর দুই চারি খানি মাত্র বাড়ী—তাহার পরেই বিস্তীর্ণ ময়দান। এই ময়দানের নাম The Downs—ইহার বর্ণনা William Blackএর কয়েকখানি উপন্যাসে দেখা যায়। সমুদ্রের তীরে তীরে এই মাঠ অনেক দূর অবধি চলিয়া গিয়াছে। মাঠের শেষে একটি গ্রাম—সেই গ্রামে একটি বাড়ীতে কিছু দিন রাডিয়ার্ড কিপ্লিং বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার দর্শনলালসায় ব্রাইটন ভ্রমণকারী বহুলোক তাঁহার বাড়ীর কাছে গিয়া জানালা দিয়া উঁকি মারিত, এই কারণে কিপ্লিং "স্থানত্যাগেন" অন্যত্র চলিয়া যান।

ব্যাপ্টিষ্ট্‌স্ হোমের যিনি পরিচালয়িত্রী, তাঁহার নাম মিস্ বুশ। ইহাঁর কনিষ্ঠা ভগিনী মিসেস্ ক্লিফর্ড ইহাঁর সহকারিণী। শেষোক্ত মহিলা, ওয়েষ্টবোর্ণ পার্ক চ্যাপেলের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক ভারতবন্ধু ডাক্তার ক্লিফর্ডের বিধবা পুত্রবধূ। দুই বোনে ইহাঁরা অনায়াসে এত বড় গৃহস্থালীটি সুশৃঙ্খলায় পরিচালনা করিতেছেন। একটি দাসী ও দুইটি ভৃত্য আছে। ইহা ছাড়া পাকশালার পাতালে* কয়জন ছিল অনুসন্ধান করি নাই—সেও দুই তিন জন হইবে।

বাড়ী খানি তিনতালা। নীচের তালায় ভোজনকক্ষ, পাঠাগার, পুরুষগণের স্নানাগার ও দালান। দ্বিতলে ড্রয়িং-রুম ও মহিলাগণের স্নানাগার ছাড়া কতকগুলি শয়নকক্ষ আছে। ত্রিতলের সকলগুলিই শয়নকক্ষ। সর্ব্বসুদ্ধ পঁচিশ ত্রিশ জনের স্থান আছে। কতকগুলি single-bed room—অবিবাহিত ব্যক্তিগণের জন্য। বাকীগুলি double-bed room—বিবাহিত ব্যক্তিগণের জন্য। শেষোক্ত কক্ষ-গুলি অপেক্ষাকৃত পরিসর, বৃহত্তর পালঙ্কযুক্ত। সে দেশে, (স্বামী স্ত্রী ভিন্ন) এক বিছানায় দুই জন শয়ন করা দূরের কথা, এক কক্ষে দুই জন শয়ন করার প্রথা নাই। এ দেশে Anglo-Indian সমাজ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখি বটে—"একটি বড় শয়নকক্ষ খালি আছে—বিদ্যুতের আলো ও পাখা—দুই জন বন্ধুর শয়নের উপযুক্ত—ট্রাম হইতে এক মিনিট" ইত্যাদি—কিন্তু বিলাতী কাগজের বিজ্ঞাপনে এরূপ দেখা যায় না। এই স্থানে, সে দেশের শয়নকক্ষ সম্বন্ধে একটা বিশেষ নিয়মের উল্লেখ করি। কোনও পুরুষের শয়নকক্ষে স্ত্রীলোক অথবা স্ত্রীলোকের শয়নকক্ষে পুরুষ

* পাতাল বলিলাম ইহার কারণ এই যে বিলাতে অধিকাংশ গৃহের পাকশালা, একতালার নিম্নে হইয়া থাকে। তথায় রাজপথগুলি পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি হইতে উচ্চ। বাড়ীর একতালা অর্থাৎ ground floor রাজপথেরই সমতল। রাজপথ হইতে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া, পাক-শালায় যাইতে হইলে, সোপান অবতরণ করিতে হয়। বাড়ীর দরজার বাহিরে, দক্ষিণে বা বামেও সিঁড়ি থাকে, বাহিরের লোক তাহা দিয়া নামিয়া পাকশালার দ্বারে যাইতে পারে। রুটিওয়ালা, দুধওয়ালা, মাংস-ওয়ালা যোগান দিবার সময় এই পথ ব্যবহার করে।

প্রবেশ করে না।—আমাদের দেশে, সকলের শয়নকক্ষে বাড়ীর অপর সকলের অবাধ গতি। বউদিদি হয়ত নিজের শয়নঘরে বসিয়া পান সাজিতেছেন, আমি অনায়াসে সেখানে প্রবেশ করিয়া দুইটা পান খাইয়া কিঞ্চিৎ গল্প গুজব করিয়া আসিলাম। কিন্তু সেখানে ইহা নিয়মবিরুদ্ধ। ভাই বোনেও পরস্পরের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে না। ভাই হয়ত নিজের শয়নকক্ষে বসিয়া দিবা ভাগে একখানি পত্র লিখিতেছে, সে সময় বোনের যদি কিছু বলিবার কথা থাকিল, সে দ্বারে আসিয়া আঘাত করিবে, ভাই বাহির হইয়া আসিবে, বোন্ আপনার বক্তব্য বলিয়া চলিয়া যাইবে। কোনও পুরুষ শয়নকক্ষে থাকিলে, বাড়ীর ঝি মুখ ধুইবার জল অথবা চিঠি অথবা টেলিগ্রাম দ্বারের বাহিরে রাখিয়া, দ্বারে করাঘাত করিয়া প্রস্থান করে।

সাধারণতঃ বিলাতী শয়নকক্ষের আসবাব এই। একটি বস্ত্রাদি রাখিবার আলমারি অর্থাৎ ওয়ার্ড-রোব্—একটি wash-hand stand তাহার উপর মুখ ধুইবার জলের চিলিমচী প্রভৃতি দ্রব্য। পাশে একটি দর্পণসংযুক্ত ড্রেসিং টেবিল। একটি ছোট লিখিবার টেবিল, খান দুই চেয়ার, বিছানার কাছে রাখিবার জন্য একটি ক্ষুদ্র টীপয়। ভিত্তিগাত্র সুচিত্রিত কাগজে আবৃত। মেঝেটি কার্পেট মোড়া। মশাও নাই, মশারিও অজ্ঞাত। এই হইল শয়নকক্ষের বর্ণনা। ভারতবর্ষে য়ুরোপীয় ধরণের গৃহে, প্রত্যেক শয়নকক্ষের সহিত যেমন একটি স্বতন্ত্র স্নানাগার সংযুক্ত থাকে, এ সুখ টুকু য়ুরোপে নাই—অন্ততঃ আমি কোথাও দেখি নাই।

এই ব্যাপ্টিষ্টস্ হোমে আমি দুই মাস কাল অবস্থান করিয়াছিলাম—কেবল মাঝে একটি সপ্তাহ ভিন্ন। আমি যখন পৌঁছিলাম তখন অনেকগুলি পুরুষ ও মহিলা তথায় বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি রোম্যান্ ক্যাথলিক্?" আমি মোটে খৃষ্টানই নহি শুনিয়া তাঁহারা বোধ হয় কিছু নিরাশ হইয়াছিলেন। আমার অখৃষ্টানত্ব সত্বেও তাঁহারা সকলেই আমার সহিত বেশ ভাল ব্যবহার করিতেন,—এবং আমার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিবার জন্য তাঁহারা কোনও দিন বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই—ইহাও আমি তাঁহাদের প্রশংসা স্বরূপ বলিতে বাধ্য।

পৌঁছিয়া, জিনিষপত্র গুছাইয়া, চা পান করা গেল। বৈকালে সমুদ্রতীরে একটু বেড়াইয়া আসিলাম। সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময় ডিনার। ভোজন কক্ষে দুইখানি লম্বা টেবিল আছে। একখানির শিরোভাগে মিস্ বুশ্, অপর খানিতে তাঁহার ভগ্নী মিসেস্ ক্লিফর্ড, "প্রিজাইড" করেন। আমি বিদেশী বলিয়া, মিস্ বুশ স্বীয় টেবিলে নিজ দক্ষিণ হস্তে আমাকে আসন দান করিলেন। গৃহকর্ত্রীর দক্ষিণ-হস্তের যে আসন, তাহাই হইল সীট্ অব্ অনার অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত আসন। যতদিন ছিলাম, আমার জন্য এই আসনই নির্দ্দিষ্ট ছিল।

ভোজনের পর, ড্রয়িং রুমে বসিয়া মহিলা ও পুরুষগণ গল্প গুজব করেন। কেহ কেহ বা লাইব্রেরীতে বসিয়া পাঠ অথবা ক্রীড়াদি করেন। সে সময়টা পিং পং অথবা টেবিল্ টেনিস্ খেলিবার ভারি ধুম। লাইব্রেরী কক্ষে পিং পং খেলিবার উপযোগী একখানি টেবিল ছিল ;—অনেকে সে খেলায় মত্ত হইতেন। ধূমপায়ী, বাটীর দরজার বাহিরে বারান্দায় চেয়ার টানিয়া ধূমপান করিতেন। গৃহাভ্যন্তরে ধূমপান অথবা অন্য "কিছু" পান একেবারেই নিষিদ্ধ। এই ব্যাপ্টিষ্টস্ হোমে আমি এমন অনেক ধর্ম্মযাজক দেখিয়াছি যাঁহারা মাদক সেবন বা থিয়েটার দর্শন করাকে পাপ বলিয়া মনে করিতেন।

রাত্রি নয়টা বাজিলে আবার সকলে ভোজন কক্ষে গিয়া বসেন,—দুই এক পেয়ালা কফি পান করা হয়। এইটি একটু বড়মানুষীর পরিচায়ক। বড়লোকের গৃহে এবং ভাল হোটেলে এই প্রথাটি আছে। সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত গৃহস্থশ্রেণীর লোক 'ঘরযোগে' রাত্রে কফিপান করেন না। বাহিরের লোক নিমন্ত্রিত হইলে, সেদিন ডিনারের ঘণ্টা-খানেক পরে কফি পানের আয়োজন হয়।

কফি পানের পর সকলে সান্ধ্য-উপাসনার জন্য আবার ড্রয়িং রুমে সমবেত হন। প্রত্যেক কক্ষে মুদ্রিত নিয়মা-বলীতে লেখা আছে—"Visitors are expected to join in the morning and evening prayers"—অর্থাৎ আগন্তুকগণ প্রভাতে ও সন্ধ্যার উপাসনায় যোগ দিবেন ইহা আমরা আশা করি। প্রাতরাশের পূর্ব্বে প্রাভাতিক উপাসনা অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। সান্ধ্যোপাসনায় ধর্ম্মপুস্তক

হইতে কোনও অংশ পাঠ, একটু প্রার্থনা, তাঁহার পর দুই একটি সঙ্গীত হইত। মিসেস্ ক্লিফর্ড প্রায়ই হার্ম্মোনিয়মে বসিতেন। মনে আছে, একদিন রাত্রে বড় দুর্য্যোগ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঝড় বহিতেছে। রহিয়া রহিয়া প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়িতেছে। ঘন ঘন মেঘ গর্জ্জন। অদূরে উন্মত্ত সিন্ধু ভীমকল্লোলে প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্যে যোগ দিয়াছে। সে রাত্রে উপাসনার পর একটি ধর্ম্মসঙ্গীত হইল। তাহার ভাবার্থ এই,—হে প্রভু, অন্ধ রজনীতে সমুদ্রবক্ষে অর্ণবপোতে তোমার যে সকল সন্তান অবস্থান করিতেছে, তুমি তাহাদিগকে সর্ব্ব বিপদ হইতে রক্ষা করিও।—আমি ধার্ম্মিক ব্যক্তি না হইলেও সে রজনীর সে প্রার্থনাটি আমার মনে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া আছে।

সান্ধ্যোপাসনা শেষ হইতে রাত্রি দশটা বাজিয়া যায়। তখন সকলে পরস্পরকে শুভরাত্রি অভিবাদন করিয়া নিজ নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন।

যে রাত্রে ঐ প্রকার দুর্য্যোগ গিয়াছিল, তাহার পরদিন প্রভাতে প্রাতরাশের পর আমরা কয়েকজন সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে গেলাম। দেখিলাম আশ্চর্য্য কাণ্ড! সমুদ্রতীরে ইলেক্‌ট্রিক রেলওয়ের যে লাইন পাতা ছিল, তাহা বাঁকিয়া, চুরিয়া, ভাঙ্গিয়া, ছিঁড়িয়া সমস্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রস্তরাকীর্ণ তটভূমির উপর বিলক্ষণ মজবুদ ভাবে লোহার রেল বসানো ছিল। কেবল মাত্র জলের ঢেউ আসিয়া তাহাতে লাগিয়াছে—তাহার উপর দিয়া জল চলিয়া গিয়াছে। তাহারই বলে লোহার রেল ছিন্ন ভিন্ন! না জানি কি প্রচণ্ডবেগেই জল আসিয়া সে গুলির উপর আঘাত করিয়াছিল!

আমাদের বাড়ী হইতে এক মাইল দূরে, পশ্চিম দিকে, Palace Pier অবস্থিত। সেই পিয়র হইতে, সমুদ্রের কূলে কূলে, লাইন পাতা আছে। তাহারই উপর দিয়া কয়েকখানি ইলেক্‌ট্রিক্ কার্ যাতায়াত করে। এই লাইনটির কিয়দংশ বা তটভূমির উপর স্থাপিত, কিয়দংশ বা কাষ্ঠনির্ম্মিত মঞ্চের উপর দিয়া গিয়াছে। তটভূমি ত সর্ব্বত্র সমতল নহে,—যেখানে নিম্নভূমি, সেইখানেই এই প্রকার মঞ্চ নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইয়াছে। এই প্রবন্ধ সংলগ্ন ছবিতে পাঠক এইরূপ একটি অংশ দেখিবেন। মঞ্চের নিম্নে সমুদ্রের জলরাশি সময়ে সময়ে আসিয়া মহোল্লাসে নৃত্য করিয়া যায়। সে সময় বাঁধে প্রতিহত হইয়া উচ্চে জলকণা সমূহ (sprays) উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। আমরা অনেক সময় এই ট্রামে আসিতে আসিতে, এই প্রকার জলকণা-সমূহের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছি। কণাগুলি এত সূক্ষ্ম ও ক্ষণস্থায়ী যে তাহাতে বস্ত্রাদি আর্দ্র হয় না,—একটু নরম হয় মাত্র।

পিয়ার হইতে শেষ সীমা অবধি এই ইলেক্‌ট্রিক্ রেলওয়েতে আসা এবং সেই কারেই ফিরিয়া যাওয়া অনেকে অত্যন্ত আমোদের বিষয় মনে করে। আমরা যেদিন এই কারে দুই একবার ভ্রমণ না করিতাম সেদিন যেন দিবসের কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। রেলওয়ের শেষ সীমা ঠিক আমাদের বাড়ীর সম্মুখেই ছিল।

সকল সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগরে দুই একটি করিয়া পিয়র থাকে। অন্য নগরে যেমন সাধারণের বায়ুসেবনার্থ উদ্যানাদি থাকে, সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগরে তেমনি পিয়র। ব্রাইটনে দুইটি পিয়র আছে—একটির নাম প্যালেস্ পিয়র,—অপরটির নাম ওয়েষ্ট পিয়র। প্রথমোক্তটি অপেক্ষাকৃত নূতন এবং লোক সমাগম তাহাতেই অধিক। নদীর উপর যেমন করিয়া সেতু বাঁধা হয়, তীরস্থ রাজপথ হইতে সমুদ্র-জলের কিয়দ্দূর অবধি সেইরূপ বাঁধিয়া, শেষাংশ বিস্তীর্ণ চত্বরাকার করিয়া তদুপরি প্রমোদভবনাদি নির্ম্মাণ করা হয়। এই সেতুবৎ মঞ্চ রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া কিয়দ্দূর বেলাভূমির উপর দিয়া যায়,—তাহার পর জল। চত্বরাকৃত শেষাংশ গভীর জলের উপর অবস্থিত। প্যালেস্ পিয়রের মধ্যস্থলে একটি নাট্যশালা আছে, তথায় প্রতিরাত্রে অভিনয় হইয়া থাকে। নাট্যশালার বাহিরে চারিদিক ঘিরিয়া নানাবিধ দোকান পাট। খবরের কাগজ হইতে আরম্ভ করিয়া পানাহারের দ্রব্য পর্য্যন্ত সবই পাওয়া যায়। আমরা প্রাতরাশের পর, একটি দল প্যালেস্ পিয়রে গিয়া আশ্রয় লইতাম—বেলা ১২টা ১টা অবধি থাকিতাম। কখনও বেড়াইয়া বেড়াইতাম, কখনও বসিয়া গল্প গুজব করিতাম। মাঝে মাঝে ব্যাণ্ড বাজিত। কত তামাসা দেখা যাইত। এক স্থানে একটি ক্ষুদ্র ঘর নির্ম্মাণ করিয়া ডুবারি তামাসা দেখাইতেছে। বাহির হইতেই দেখা যায়, এক ব্যক্তি

ব্রাইটনের সমুদ্রতট

ব্রাইটনের রয়াল প্যাভীলিয়ন।

ব্রাইটনের ওল্ড ষ্টাইন উদ্যান।
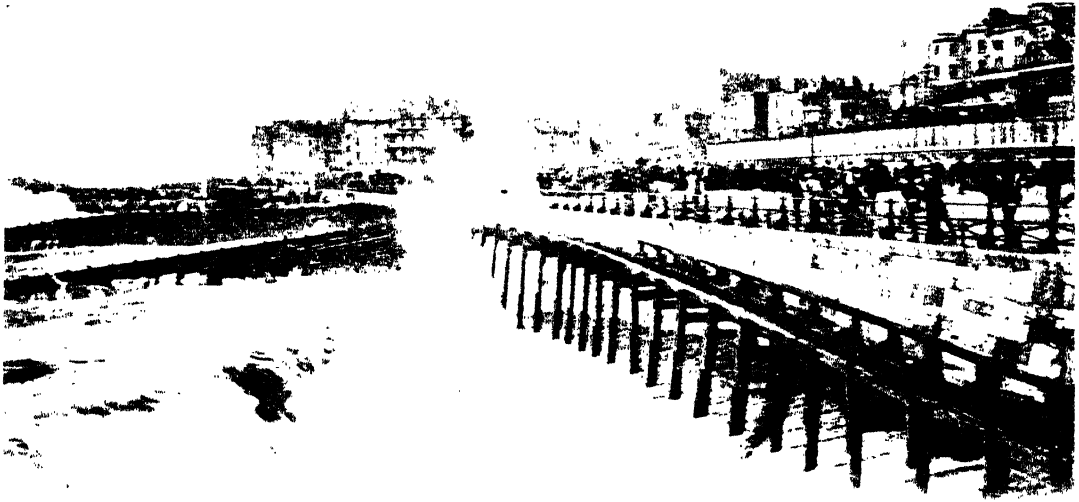
ঝড়ের সময় ব্রাইটনের সমুদ্রতীরস্থ বৈদ্যুতিক রেলওয়ে।
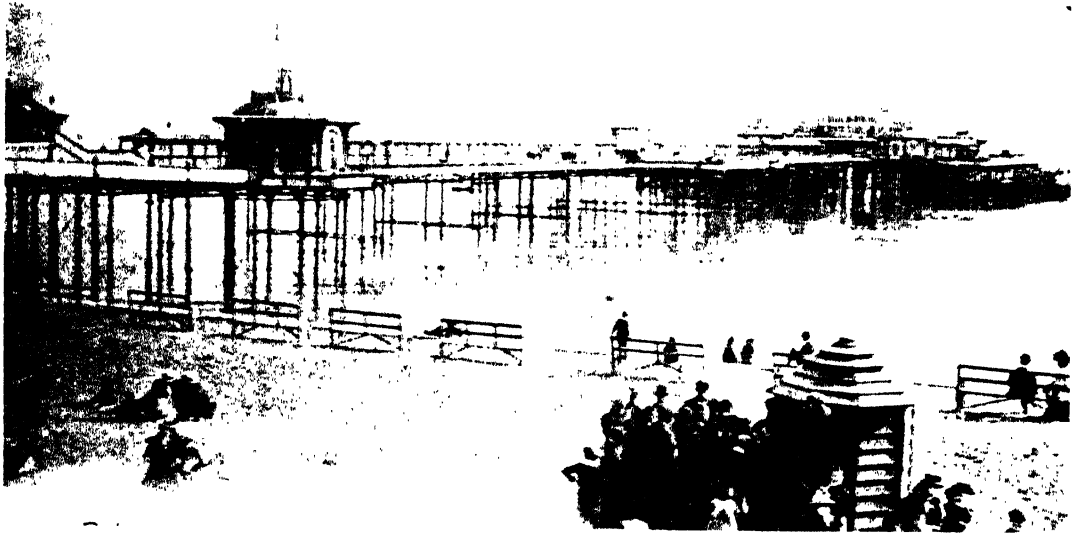
ব্রাইটনের পিয়ার।

ডুবারির সাজে সজ্জিত হইয়া লোক আকর্ষণ করিবার জন্য উচ্চস্থানে বসিয়া আছে। তাহার গাত্র রবরের জামায় আবৃত। মুখে একটা কিম্ভুতকিমাকার রবরের মুখস, তাহার যথাস্থানে কাচের চক্ষু বসানো আছে। ডুবারির নাসিকা হইতে দুই রবরের নল বাহির হইয়াছে। লোকে দর্শনী দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। যথেষ্ট লোক হইলে ডুবারি খেলা দেখায়। সে স্থানে পিয়রের মেঝে কাটা, নিম্নে সমুদ্র। ডুবারি জলে নামিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার সহকারী আবার তাহাকে উঠাইয়া লয়। পিয়রের অন্য স্থানে প্রতিদিন এক ব্যক্তি বাইসিক্ল খেলা দেখাইত। বাইসিক্লে নানা রকম কসরৎ দেখাইয়া, অবশেষে যাহা দেখাইত তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য। পিয়রের প্রান্তভাগের রেলিং খুলিয়া দিত। তাহার পর, অনেকটা দূরে পিছাইয়া গিয়া, সেইখান হইতে বাইসিক্ল চড়িয়া, বায়ুবেগে আসিয়া একেবারে পিয়র হইতে সমুদ্রে পড়িত। জল হইতে পিয়র অন্ততঃ একটা দ্বিতল বাড়ীর মত উচ্চ। কিয়ৎক্ষণ পরেই অবশ্য ভাসিয়া উঠিত—কিন্তু তাহার বাহাদুরী এই যে সে বাইসিক্লটি ছাড়ে নাই হাতে ধরিয়া আছে। তাহার সহকারী উপর হইতে একটি দড়ি জলে ফেলিয়া দিত। সে সেই দড়িতে বাইসিক্লটি বাঁধিয়া দিয়া, সন্তরণ করিয়া অন্যত্র হইতে উঠিয়া আসিত। সজীব তামাসাওয়ালা ছাড়া কলের তামাসাওয়ালাও বিস্তর আছে—সেগুলি penny-in-the-slot যন্ত্র। কলটির একস্থানে একটি ছিদ্র (slot) আছে, তাহার ভিতরে একটি পেনি ফেলিয়া দিয়া হ্যাণ্ডেল ঘুরাইতে হয়। কোনও কল হইতে বা এক প্যাকেট সিগারেট বাহির হইয়া আসে, কোনটা হইতে একখানি চকলেটের বিস্কুট ;—কোনও কল বা একটা গৎ বাজাইয়া শুনাইয়া দেয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। কোনটাতে লেখা আছে—"ইহাতে একটি পেনি ফেলিলে তোমার ভবিষ্যৎ স্বামীর ফোটোগ্রাফ বাহির হইবে।"—মেয়েরা ক্রমাগত তাহাতে পেনি ফেলিতেছে—আর নূতন নূতন একখানি করিয়া ক্লাউনের অপেক্ষাও সুন্দর পুরুষের ছবি বাহির হইয়া আসিতেছে। মেয়েদের হাসির ফোয়ারা আর বন্ধ হয় না। একটা কল আছে তাহাতে পেনি ফেলিলে "তোমার প্রিয়তমের নিকট হইতে প্রেমপত্র বাহির হইবে।" এইরূপ নানা প্রকার হাস্য কৌতুকের কল।

আমরা কোন কোনও দিন ডিনারের পর সন্ধ্যাকালেও প্যালেস্ পিয়রে যাইতাম। দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রে আমরা যেমন করিয়া গৃহাদি আলোকিত করি, এই প্যালেস্ পিয়রটি রাজপথোপরি তোরণদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বশেষ সীমা পর্য্যন্ত প্রতিরাত্রে সেইরূপ বিদ্যুৎ আলোকে আলোকিত হয়। দূর হইতে সে এক রমণীয় দৃশ্য। শত শত নরনারী সুন্দর বসনে আবৃত হইয়া, পিয়রের সর্ব্বত্র আনন্দ করিয়া বেড়াইতেছে। মাঝে মাঝে ব্যাণ্ড বাজিতেছে। যেন ধরাতলে নন্দন-কানন অবতীর্ণ। রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত পিয়র খোলা থাকে। আমাদের ধর্ম্মের সংসার —রাত্রি ১০টার সময় দরজা বন্ধ হয়, তাই শীঘ্র শীঘ্র ফিরিতে হইত। শেষ মুহূর্ত্ত অবধি সেখানে থাকিয়া, ডবল্-কুইক্-মার্চ্চ করিয়া আমরা বাড়ী আসিতাম। তখন হয়ত সান্ধ্যোপাসনা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। দৈব দুর্ঘটনা বশতঃ মিসেস্ ক্রফর্ড্রের সম্মুখে পড়িয়া গেলে তিনি বলিতেন—"You wicked men!"—তাঁহার ভ্রূযুগল কৃত্রিম ক্রোধে কুঞ্চিত,—মুখে অকৃত্রিম হাসি।

ব্যাপ্টিষ্টস্ হোমে আমার উপস্থিতিকালে বহুলোক আসিল এবং বহুলোক চলিয়া গেল। আমার মত দুই মাস ত কেহ থাকে নাই। কেহ বা এক সপ্তাহ, কেহ বা দুই সপ্তাহ কেহ বা দুই চারি দিন থাকিয়া চলিয়া যান। ইহাঁরা যে সকলেই ধর্ম্মযাজক, তাহা নয়,—ব্যাপ্টিষ্ট সম্প্রদায়ের মান্য গণ্য লোকও আসিতেন। সদাম্‌টন হইতে একজন সলিসিটর ও তাঁহার স্ত্রী এবং ইহাঁদের লণ্ডনস্থ কন্যা ও জামাতা আসিয়া কিছু দিন ছিলেন। জামাতাটি একজন রসায়নবিৎ, কোনও ঔষধ প্রস্তুতের কারখানায় কর্ম্ম করেন। ইহাঁদের সঙ্গেই আমার বেশী ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। এই চারিজন লোক বেশ আমুদে। সে সময় আমি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি কিন্তু তখনও "বারে কল্ড" হই নাই। তাঁহারা আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, কলিকাতায় আইন ব্যবসায়ীর সুযোগ কিরূপ। আমি বলিলাম, তেমন সুবিধা নয়, তবে একজন ভাল সলিসিটরের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিলে বেশ চলে। সলিসিটর মহাশয়ের কন্যার প্রতি

চাহিয়া বলিলাম—"Here is a solicitor's daughter thrown away on a chemist. You ought to have married a barrister, madam."—অর্থাৎ—"এই দেখুন, একটি সলিসিটরের মেয়ে রসায়ন বৎকে বিবাহ করিয়া লোকসান হইয়া গিয়াছে। মহাশয়া, আপনার উচিত ছিল একজন ব্যারিষ্টারকে বিবাহ করা।"—মহিলাটি কৃত্রিম রোষে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিলেন—"তা বই কি! সেই জন্যই আমরা জন্মিয়াছি কি না!"—বড় হাসি পড়িয়া গেল। —আর একজন বৃদ্ধ ছিলেন, তিনি ধর্ম্মযাজক। তাঁহার নাম Rev. Mr. W.—লোকটি এমন হাসিতে মজবুদ!—সামান্য সামান্য তুচ্ছ কথায় হাসিয়া অজ্ঞান। একদিন আমরা চারি পাঁচজনে বেড়াইতে যাইতেছিলাম। একজন গল্প করিতেছিলেন, একটি অত্যন্ত স্থূলকায়া রমণী, অমনিবসে আরোহণ করিয়াছিল। কিন্তু সে এমন স্থূল যে অমনিবসের দরজার ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না। তখন কণ্ডক্টর বলিল—"মহাশয়া, পাশ ফিরিয়া ঢুকুন, পাশ ফিরিয়া ঢুকুন।"—হাসির কথা ত এই টুকু। ইহা শুনিয়া শ্রীযুক্ত W—মহাশয় থমকিয়া রাস্তার ফুটপাথে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া কোমরে দুইটি হাত দিয়া, হো হো শব্দে মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া হাস্য। সে হাসি আর থামে না। প্রশস্ত দিবালোকে প্রকাশ্য রাজপথ—শত শত লোক চলিতেছে। একেই W—মহাশয়ের চেহারাটি Pickwickএর মত স্থূল,—তাহার উপর ঐ হাসির তুফান। পথচারী লোক দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে আমরা ত অপ্রতিভের শেষ। কোনও ক্রমে তাঁহাকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া লইয়া চলিলাম। W—মহাশয় কিছু অতিরিক্ত ধূমপানপ্রিয় ছিলেন। নিজের সাফাই স্বরূপ, ভাল ভাল সাধুলোকগণ কিরূপ ধূমপানাসক্ত ছিলেন, তাহারই গল্প মাঝে মাঝে করিতেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, যে Dr. Spurgeonএর স্মৃতিরক্ষার্থ এই বাড়ী হইয়াছে—তিনিও নাকি একজন পাকা ধূমপায়ী ছিলেন। একদিন Dr. Spurgeon যাই একটি চুরট মুখে করিয়াছেন, অমনি তাঁহার একজন বন্ধু বলিল—"ah, your idol!"—তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"Yes, going to burn it"—এই গল্প শুনিয়া ওমর খৈয়ামের উক্তি স্মরণ হয়—"মদিরা মনুষ্যের শত্রু—অতএব আমরা শত্রুর রক্তপান করি এস।" ডাক্তার স্পর্জ্জনের একটি পৌত্র অক্সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। পৌত্র অবকাশ সময়ে বাড়ী আসলে ডাক্তার একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন—"শুনিলাম, তুমি না কি ধূমপান করিতে শিখিয়াছ?" পৌত্রটি কিছু বিপন্ন হইল—ভাবিল, বুড়া কেমন করিয়া টের পাইয়াছে! বলিল—"হাঁ দাদা মহাশয়, আমি ধূমপান আরম্ভ করিয়াছি বটে, কিন্তু আপনি যদি ইচ্ছা করেন তবে আমি উহা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি।"—ইহাতে ঠাকুর্দ্দা যাহা উত্তর দিলেন, তাহা যুবকের অপ্রত্যাশিত ছিল। তিনি পৌত্রের পিঠ ঠুকিয়া বলিলেন—"My boy, stick to your pipe. Next to God and your Grand-mother, my pipe is the greatest blessing of my life"—অর্থাৎ—"বৎস, পাইপটি ছাড়িও না। ঈশ্বর এবং তোমার ঠান্‌দির পরেই, আমার পাইপটিই আমার জীবনের চরম সুখ।" এইরূপ আরও কত গল্প W—মহাশয় বলিতেন; লোকটি বেশ মজলিসি।

সে বাড়ীতে আমি বহুলোকের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও অনেক তর্ক বিতর্ক হইত। দেখিলাম, ধর্ম্মযাজকগণের মধ্যে অনেকে বাইবেলের কথা literally গ্রহণ করেন না। এমন লোক আছেন যাঁহারা বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্বাস করেন না। এমন লোক আছেন যাঁহারা খৃষ্টধর্ম্মের একটা প্রধান বিষয়—অনন্ত-নরক-বাদ পর্য্যন্ত উড়াইয়া দেন। আমি একদিন একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কবি শেলি তাঁহার "কুঈন ম্যাব" কাব্যের পরিশিষ্টে যে প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়াছেন তাহার উত্তর কি? প্রশ্নটি এই "খৃষ্টকে যে পরিত্রাতা বলিয়া স্বীকার করিল না তাহার পক্ষে অনন্ত নরক বাইবেলের বিধান। তবে খৃষ্টজন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে সমস্ত মনুষ্য জন্মিয়াছে ও মরিয়াছে তাহাদের আত্মা—এবং বর্ত্তমান সময়ে অসভ্যদেশের লোক যাহাদের কাছে খৃষ্টধর্ম্ম কখনও প্রচারিত হয় নাই, তাহাদের আত্মা—সমস্তই অনন্তনরকযোগ্য। ইহা কি রকম বিচার?" বন্ধু বলিলেন—ইহাদের পক্ষে বাইবেলের ও বিধান প্রযুজ্য নহে। যাহারা খৃষ্টকে গ্রহণ করিবার কোনও অবসর পায় নাই,—তাহারা কখনই দণ্ডযোগ্য নহে। অপর

একজন ধর্ম্মযাজকের সহিত একদিন আমার এই বিষয়ে কথা হইতেছিল। আমি বলিতেছিলাম—"খৃষ্ট যে ঈশ্বরপ্রেরিত পরিত্রাতা তাহা আমার জ্ঞানবুদ্ধিতে আমি বুঝিতে পারি না। সেই জন্য আমার পক্ষে অনন্ত নরক বিধান। তবে ঈশ্বর আমাকে এ রূপ জ্ঞানবুদ্ধি কেন দিলেন ?"

বন্ধু বলিলেন—"আপনার জ্ঞানবুদ্ধি যে চিরকাল এইরূপ থাকিবে, একথা কে বলিল ?"

আমি বলিলাম—"ঐ দেখুন, আমাদের বাড়ীর অনতি-দূরে জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষিতুল্য হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বাস করিতেছেন। উনি অজ্ঞেয়বাদী—খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না। এই অবস্থায় যদি উনি দেহত্যাগ করেন, তবে কি আপনি বলেন যে উনিও অনন্ত নরক ভোগ করিবেন ?"

বন্ধু বলিলেন—"না,—তাহা নহে। অনন্ত জীবনের মধ্যে কোন না কোন সময়ে প্রত্যেক আত্মার নিকট খৃষ্টধর্ম্ম সফলভাবে প্রচারিত হইবে। নশ্বর জীবনে যে যীশুখৃষ্টকে গ্রহণ করে নাই, মৃত্যুর পর তাহার আত্মা নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবে। আমার বিশ্বাস, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার মৃত্যুর পর যেখানে অবস্থান করিবেন, সেখানে তাঁহার নিকট দেবদূতগণ পুনরায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবেন।—তখন স্পেন্সারের জ্ঞানচক্ষু হইতে মোহান্ধকার কাটিয়া গিয়াছে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ খৃষ্টকে গ্রহণ করিবেন।"

আমি বলিলাম—"তবে আর অনন্ত নরক কাহার জন্য ?"

একজন বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন, তাঁহার কাছে পরে আমি উক্ত থিওরির বিষয় বলাতে তিনি বলিলেন—"ও সব একেলে মত টত ভুল। হার্ব্বার্ট স্পেন্সারকে নিশ্চয়ই অনন্ত নরক ভোগ করিতে হইবে।"

স্পেন্সার যে ব্রাইটনে বাস করেন তাহা আমি পূর্ব্বা-বধিই জানিতাম; তাই আমি লণ্ডন পরিত্যাগের সময় "Who's Who" নামক প্রতিবৎসর প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে স্পেন্সারের ঠিকানাটি টুকিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাতাদি করিব এ স্পর্দ্ধা আমার ছিল না। তবে অলক্ষ্যে থাকিয়া তাঁহার গৃহখানি দেখিব, হয়ত বা কোনও দিন তাঁহাকে গৃহ হইতে বাহির হইতে দেখিব, এ আশা আমার মনে ছিল। ব্রাইটনে গিয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, পূর্ব্বে তিনি ব্যাপ্টিষ্টস্ হোমের সম্মুখ দিয়া একখানি টমটমে করিয়া Downs মাঠে প্রায়ই বেড়াইতে যাইতেন। এখন তাঁহার শরীর অসুস্থ বলিয়া আর বাহির হন না। ক্রমে আমি আবিষ্কার করিলাম, আমাদের বাড়ী হইতে অল্পদূরেই প্যালেস্ পিয়র যাইবার পথের মাঝামাঝি একটি বাড়ীতে স্পেন্সার থাকেন। যাইতে আসিতে অনেক সময় আমি উৎসুক নেত্রে বাড়ীখানির প্রতি চাহিয়া থাকিতাম—যদি কোনও সুযোগে মহাপুরুষ দর্শনলাভ ঘটে। চিত্রাদি হইতে তাঁহার মূর্ত্তি আমার নিকট সুপরিচিত ছিল, দেখিলেই বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু একদিনও তাঁহাকে দেখিলাম না। অবশেষে একদিন আমার একখানি কার্ড লইয়া, তাহার উপরিভাগে লিখিলাম—"To the Grand old man of the West from one of his humblest admirers from the East." নিম্নে বর্ত্তমান ঠিকানা লিখিয়া কার্ডখানি তাঁহার বহির্দ্বার সংলগ্ন

Mr Herbert Spencer regrets that by inadvertence he has failed to acknowledge before this the card left by Mr Mukerji. He also regrets that being now a confirmed invalid and confined to his room he is unable to acknowledge Mr Mukerji's courtesy otherwise than in writing.

5 Percival Terrace,
Brighton. 15 Sept. 1903

হার্বার্ট স্পেন্সারের হস্তলিপি।

'চিঠির বাক্সে' ফেলিয়া চলিয়া আসিলাম। আমি মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিও নাই যে তিনি উক্ত কার্ডের উত্তরে কিছু করিবেন। পাঁচ সাত দিন পরে একদিন হঠাৎ একখানি অপরিচিত হস্তাক্ষরে শিরোনামা লেখা পত্র পাইলাম। সাধারণ গ্রে-গ্র্যানিট্ কাগজের লেফাফা-খানি—কে লিখিল?—খুলিয়া দেখিলাম—হার্ব্বার্ট স্পেন্সার লিখিয়াছেন!

পত্রখানি এই:—

Mr. Herbert Spencer regrets that by inadvertence he has failed to acknowledged (sic) before this the card left by Mr. Mukerji. He also regrets that being now a confirmed invalid and confined to his room, he is unable to acknowledge Mr. Mukerji's courtesy otherwise than in writing.

5 Percival Terrace
Brighton

15 Sept. 1903.

প্রথম পুরুষে লিখিত হইলেও, হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের স্বহস্তাক্ষর। যদি তাঁহার শরীর অসুস্থ না হইত, তবে হয়ত তিনি আমায় সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করিতেন। কিন্তু আমি প্রাচ্যের প্রতিনিধি হইয়া তাঁহার সহিত কথা কহিবার কি যোগ্য? কি জানি আমি প্রাচ্য দর্শনের, কি জানি আমি প্রাচ্য বিজ্ঞানের, কি জানি আমি প্রাচ্য ধর্ম্মতত্ত্বের!—পত্রখানি যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছি—বিজ্ঞানপ্রেমিক বন্ধুবান্ধব আসিলে দেখাইয়া থাকি। আমার পাঠকগণের তৃপ্ত্যর্থে পত্রখানির একটি প্রতিলিপি (fac simile) প্রকাশিত হইল।

সমুদ্রতীরে দুইমাস রহিলাম বটে, কিন্তু সমুদ্রস্নান একদিনও হয় নাই। সঙ্গী পাই নাই বলিয়া হয় নাই।—আর ক্রমে একটু ঠাণ্ডাও পড়িয়া আসিল। একস্থানে একটা বৃহৎ বাড়ীতে swimming bath (সন্তরণ করিবার চৌবাচ্চা) ছিল—নলের দ্বারা সমুদ্র জল আনিয়া, ঈষদুষ্ণ করিয়া এক বৃহৎ চৌবাচ্চায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে কয়েকবার স্নান করিতে গিয়াছিলাম। একজন ধর্ম্মযাজক আসিয়াছিলেন—তাঁহার নাম সেক্সপিয়র। তিনি ব্যাপ্টিষ্ট সমাজের সম্পাদক। তিনি দুইটি পুত্র সঙ্গে আনিয়াছিলেন—দশ বারো বৎসর বয়স—বড়টিকে প্রথম দিন জিজ্ঞাসা করিলাম "কিহে বাবাজী! তোমার নাম কি?"—সে বলিল—"Will Shakespeare"—বলিলাম—"তুমিই হ্যামলেট্ লিখিয়াছ না কি?" সে গম্ভীরভাবে বলিল—"আমি নয়।"—ইহাদের পিতাকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে আসল সেক্সপিয়রের সঙ্গে তাঁহাদের কোনও সম্পর্ক আছে কি না—কিন্তু তিনি কিছুই বলিতে পারেন নাই।—ইহাঁর অনুরোধে, পুত্র দুইটিকে লইয়া আমি মাঝে মাঝে swimming bathএ স্নান করাইতে লইয়া যাইতাম। পুরুষ এবং স্ত্রীলোকগণের স্নানের দিন ভিন্ন ভিন্ন। চৌবাচ্চাটি ঘিরিয়া ছোট ছোট কাঠের কামরা আছে। তাহার মধ্যে স্নানের বস্ত্র, তোয়ালে প্রভৃতি আছে। কামরায় প্রবেশ করিয়া বেশ পরিবর্ত্তনের পর জলে নামিয়া খুব সন্তরণ করা যাইত। অনেকে স্নান করিতে আসিত। এক একজনের প্রাবেশিক এক শিলিং করিয়া।

সমুদ্রে যাঁহারা স্নান করেন, তাঁহাদের জন্য জলের ধারে বহুসংখ্যক bathing machines আছে। নামটা machine হইলেও, কল-কব্জা কিছুই নহে—একটি একটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠগৃহ মাত্র। কাষ্ঠগৃহের নিম্নে চাকা বসানো আছে। জোয়ার ভাঁটায় জল যেমন বাড়ে কমে, কামরাগুলি সেইরূপ সরানো হয়। প্রত্যেক কামরার ভাড়া ছয় পেনি, তাহার মধ্যে স্নানবস্ত্র (bathing drawers), তোয়ালে, আর্সি, চিরুণী প্রভৃতি দ্রব্য আছে। সম্মুখে ও পশ্চাতে দ্বার। সম্মুখ দ্বার দিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, বস্ত্র পরিবর্ত্তনের পর, পশ্চাতের দ্বারটি খুলিয়া জলে নামা। স্নান বস্ত্র একটা কালো চটের মত কাপড়ের তৈরি। নিম্নে হাঁটু পর্য্যন্ত এবং উর্দ্ধে কনুই পর্য্যন্ত পৌঁছে—বেশ আঁটো সাঁটো। স্নানান্তে কামরায় প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ববেশ ধারণ করিয়া, সভ্যভব্যটি হইয়া বাহির হওয়া যায়। পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের স্নানের স্থান স্বতন্ত্র। কোথাও কোথাও নাকি একত্র আছে—তাহাকে mixed bathing বলে। বলা বাহুল্য ভদ্রগৃহের স্ত্রীলোকেরা কদাপি সেখানে স্নান করিতে যান না। কোন কোন বাঙ্গালা লেখক বিলাতী সমুদ্র স্নানের বর্ণনা লিখিতে গিয়া য়ুরোপীয় জাতির রুচিদোষ ধরিয়া নিন্দা করিয়াছেন—বলিয়াছেন, স্নানের পোষাক ত

একপ্রকার উলঙ্গাবস্থা। বঙ্গমহিলারা গঙ্গার ঘাটে স্নানান্তে উঠিলে কখনও কখনও যে দৃশ্য দেখা যায়, য়ুরোপীয় মহিলার স্নানবেশ তাহার অপেক্ষা অনেক আব্রুদার, তাহার সন্দেহ মাত্র নাই। তবে য়ুরোপীয় হিসাবে, পুরুষের কোট গায়ে না থাকিলে, শুধু কামিজের উপর ওয়েষ্টকোট থাকিলে, সে উলঙ্গ। স্ত্রীলোকের পায়ের কব্জি দেখিতে পাওয়া বড়ই নিন্দার কথা। সে conventionএর হিসাবে যাহাই বলুন। তবে, য়ুরোপীয় আবরণ-নীতি বড়ই অদ্ভুত ইহাও বলিতে হইবে। টেনিসকোর্টে মহিলারা, কোটশূন্য পুরুষগণের সহিত স্বচ্ছন্দে খেলিয়া আসিলেন; কিন্তু গৃহে যদি কোটশূন্য কোনও পুরুষ দৈবাৎ তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইল, তৎক্ষণাৎ পতন ও মূর্চ্ছা। স্ত্রীলোকের পা দেখিতে পাওয়া লজ্জার কথা কিন্তু নৃত্যবসন রুচিসঙ্গত বলিয়া গণ্য, ইহাও বিদেশীর পক্ষে একটা প্রহেলিকা। স্নানবস্ত্রে আবৃত স্ত্রীলোকের পা দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াই বোধ হয় উপরোক্ত লেখকগণ মূর্চ্ছা গিয়াছেন।

ব্রাইটনে থাকিতে একবার একটা টার্কিশ বাথেও গিয়াছিলাম। সঙ্গে ছিলেন একটি ধর্ম্মযাজক বন্ধু। এই বাথটি তথাকার একটি প্রধান হোটেলের অন্তর্গত। প্রাবেশিক চারি শিলিং করিয়া। বস্ত্র পরিবর্ত্তনানন্তর প্রথম যে কক্ষে প্রবেশ করিলাম, তাহার বায়ু, বাহিরের বায়ু অপেক্ষা উষ্ণ। ধরুন যেন আমাদের বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাস। ছোট ঘর খানি, দুই একটি লোহার বেঞ্চি পাতা আছে। বেঞ্চিতে কিয়ৎক্ষণ দুইজনে বসিয়া রহিলাম। একটু একটু ঘাম হইতে লাগিল। সেই কামরার একটি কোণে দ্বার আছে, তাহা দিয়া দ্বিতীয় কামরায় প্রবেশ করা গেল। তাহার হাওয়াটি আর একটু গরম, যেন আমাদের ভরপূর গ্রীষ্ম। সে কামরায় কিছুক্ষণ বসিয়া, তৃতীয় কামরায় প্রবেশ করা গেল তাহার বায়ু উষ্ণতর। বেশ ঘাম বহিতে লাগিল। তাহার পর একটি কি দুইটি কামরায় আমি প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম মাত্র। বন্ধু রহিলেন, আমি রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলাম। শেষ কামরায় যখন আমি সিদ্ধ হইতেছিলাম,—আমার মাথা পর্য্যন্ত ঝন্ ঝন্ করিতেছিল,—বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়, আপনাদের খৃষ্টীয় নরক কি ইহা অপেক্ষাও গরম? —তাহা যদি হয় তবে এইবেলা আমায় দীক্ষিত করিয়া ফেলুন।" বন্ধু হাসিয়া উষ্ণতর কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম একজন খানসামা খাবানাদি হস্তে অপেক্ষা করিতেছে। দুর্ব্বলতা বশতঃ আমার পা তখন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। কল-তলায় আমায় দাঁড় করাইয়া, আমার গাত্রচর্ম্ম সাবান ও বুরুষ দিয়া রগড়াইয়া দলিয়া মলিয়া খুব করিয়া আমায় স্নান করাইয়া দিল। আমার স্নান শেষ হইতে হইতে বন্ধুও বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে আর একজন স্নান করাইতে লাগিল। সেখানেও একটা ঈষদুষ্ণ swimming bath ছিল। স্নানান্তে তিনি বলিলেন—"আসুন এইটেতে একটু সাঁতার কাটিয়া লওয়া যাউক। আমার তখন অবস্থা শোচনীয়, দাঁড়াইতে পারিতেছি না। বলিলাম—"আমি আর পারি না।" বন্ধু swimming bathএ নামিলেন। টার্কিশ্ বাথের পর এক পেয়ালা কফি খাইয়া আধ ঘণ্টা কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া থাকিতে হয়। আমি ত গিয়া কফি পান করিয়া শুইলাম। ক্রমে বন্ধুও আসিয়া তাহাই করিলেন। শেষে যখন পোষাক পরিয়া বাহির হইলাম, পথে চলিতে লাগিলাম, তখন মনে হইতেছিল যেন শরীরের অর্দ্ধেক ভার কমিয়া গিয়াছে।

বড় আনন্দে দুই মাস ব্রাইটনে কাটাইয়াছিলাম। মাঝে মাঝে ১০।১৫ জন দল বাঁধিয়া একখানি বৃহৎ গাড়ী (Char-a-banc) ভাড়া করিয়া কোনও দূর পল্লীগ্রামে বেড়াইয়া আসা যাইত। দুইটি পিয়র হইতে প্রতিদিন দুই একখানি করিয়া জাহাজ ছাড়ে, তাহাতে আরোহণ করিলে অর্দ্ধ দিন সমুদ্রবক্ষে বেড়াইয়া আসা যায়। একদিন আমরা কয়েকজনে এইরূপ একখানি জাহাজে সদাম্টন বেড়াইতে গিয়াছিলাম। যেখানে এই বাড়ী, তাহার নিকটেই একটি সুরম্য উদ্যান—নাম Sussex Gardens—এই বাগানটি নিকটবর্ত্তী বাড়ী গুলির চাঁদায় রক্ষিত হইত। বাগানের চারি পাঁচটি ফটক, —একই চাবিতে সকল গুলি খোলা যায়। ব্যাপ্টিষ্টস্ হোমের ব্যবহারার্থ একটি চাবি ছিল। বাগানের চতুর্দ্দিক প্রাচীরিত, সাধারণ লোক তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিত না। বাগানের ভিতর টেনিস্, ক্রোকে, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি খেলিবার স্থান ছিল। মিস্ বুশ্ ও তাঁহার ভগ্নীর ক্রোকে

খেলার বড় সখ—সেই জন্য আমরা প্রায়ই বৈকালে সেখানে গিয়া ক্রোকে খেলিতাম। আর, এই অলস মাসদ্বয়ে আমি উপন্যাস গলাধঃকরণ করিয়াছিলাম কি কম? স্থানীয় পোষ্ট আফিসটিতে একটি মনোহারীর দোকান এবং পুস্তকালয়ও ছিল। সেখানে পুস্তক ভাড়া পাওয়া যাইত। পুরাতন একখানি উপন্যাসের ভাড়া দুই পেনি, নূতন উপন্যাসের তিন পেনি। ইহা এক সপ্তাহের ভাড়া। লণ্ডনেও নানা স্থানে এইরূপ পুস্তকালয় আছে। আমি একবার লণ্ডনের একটি রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে, একটি লাইব্রেরি দেখিয়া, পুস্তক ভাড়া চাহিলাম। একটু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গ্রন্থরক্ষক আমার নিকট কোনও ডিপজিটও চাহিল না, আমার নাম ঠিকানাও জিজ্ঞাসা করিল না।

এই দুই মাসের মধ্যে কেবল একটি সপ্তাহ আমি ব্যাপ্টিষ্টস্ হোমে ছিলাম না। দুই মাস থাকিব এমন কথা ত আমি পূর্ব্বে ঠিক করিয়া লই নাই। সেই জন্য মিস্ বুশ অপর একজনকে আমার শয়নকক্ষ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। একদিন তিনি আমায় এ কথা বলিলেন। বলিলেন—"আপনি অন্য কোথাও সপ্তাহ খানেক থাকুন, সপ্তাহ পরে আবার আমার অন্য ঘর খালি হইবে, আপনাকে লইতে পারিব।"

কোথায় যাই? এক ছিল Y. M. C. A—সেখানে এক সপ্তাহ থাকা যাইতে পারে। কিন্তু সেখানে খৃষ্টান ব্যতীত অপর কাহাকেও তাহারা সঙ্গে লইতে চাহে না। যে বন্ধুটির সঙ্গে টার্কিশ্ বাথে গিয়াছিলাম সেই ধর্ম্মযাজক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া, স্বয়ং আমাকে Y. M. C. A-র সম্পাদকের নিকট লইয়া গিয়া বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আসিলেন। বন্ধু আমাকে সাবধান করিয়া দিলেন—"আপনি আমাদের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেরূপ তর্ক বিতর্কাদি করেন, ওখানে সেরূপ করিবেন না। উহারা গোঁড়া লোক,—মতভেদ সহ্য করিবে না। হয়ত আপনার সহিত অভদ্র ব্যবহার করিবে।"—আমি ভাবিলাম, পণ্ডিতে এবং মূর্খে, ভদ্রে এবং অভদ্রে ইহাই ত প্রভেদ,—পণ্ডিতের, ভদ্রের উদারতা মূর্খে ও অভদ্রে কোথায় পাইবে?

Y. M. C. A.তে এক সপ্তাহ মাত্র ছিলাম। সারাদিন প্রায় বাহিরেই থাকিতাম, আহারের সময় আসিতাম। Y. M. C. A.র ঠিক সম্মুখেই একটি সুন্দর বাগান ছিল। মধ্যস্থলে জলের একটি ফোয়ারা। ইহা Old Steine Gardens নামে খ্যাত।

সপ্তাহ পরে আবার ব্যাপ্টিষ্টস্ হোমে ফিরিয়া আসিলাম। সমস্ত ইংলণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ব্যাপ্টিষ্ট ধর্ম্মযাজকগণের সহিত আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। অনেকে আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন,—আমি দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে, তাঁহাদের গৃহে গিয়া দুই চারি দিন যেন অবস্থিতি করি। তাঁহারা নিজ নিজ ঠিকানা লেখা কার্ড আমাকে দিয়াছিলেন,—এক গোছা কার্ড জমিয়া গিয়াছিল। আমি যদি সকলের এই সাদর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার সময় পাইতাম,—তাহা হইলে আমার ইংলণ্ডের বহুস্থান দেখা হইয়া যাইত। কিন্তু সেই নভেম্বরে আমি "বারে কল্ড্" হইয়া দেশে ফিরিব—সময় ছিল না। নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলাম কেবল সদাম্টনের সেই সলিসিটর মহাশয়ের। কথা ছিল, তাঁহার লণ্ডনস্থ কন্যা ও জামাতা এবং আমি, তিন জনে একত্র হইয়া যাইব। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহার কন্যা ও জামাতা কার্য্য গতিকে যাইতে পারেন নাই—আমি একাই গিয়াছিলাম। সলিসিটর মহাশয় ও তাঁহার পত্নী আমার বড় যত্ন করিয়াছিলেন।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

কৃষ্ণধর্ম্ম।

(জি-দে লাফোর ফরাসী হইতে)

হিন্দুরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। মানুষকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত একজন ত্রাণকর্ত্তা পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন,—এই বিশ্বাস, পুরাকালের সমস্ত জাতির মধ্যেই বদ্ধমূল।

ইহুদিরা যে মেসায়া কিংবা ত্রাণকর্ত্তার প্রতীক্ষায় ছিল, তিনি ডেভিডের পুত্র,—পার্থিব ত্রাণকর্ত্তা; কিন্তু হিন্দু ও পারসিকদিগের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বর-প্রসূত—"বেদাঙ্গ গ্রন্থাদিতে কথিত আছে,—কোন এক রমণীর গর্ভে, দিব্য জ্যোতির কিরণ প্রবেশ করিয়া মানবের রূপ ধারণ করিবে, এবং সেই রমণী কুমারী অবস্থাতেই একটি পুত্র প্রসব করিবে,

যেহেতু কোন প্রকার অপবিত্র স্পর্শ তাহাকে কলুষিত করিতে পারিবে না।"—"এই কলিযুগের আরম্ভেই সেই কুমারীর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবে।" (বেদান্ত) এই কথা অথর্ব্ব-বেদে আরও সুস্পষ্টঃ—"তিনি জ্যোতির্ম্ময় কিরীটে বিভূষিত হইয়া আসিবেন তাঁহার আগমনে, দ্যুলোক ও ভূলোক আনন্দিত হইবে, তাঁহার আগমনে অমৃত মৃত্যুকে পরাভূত করিবে। প্রলয়-যুগের ভীষণ প্রলয়-কাণ্ড স্তম্ভিত হইবে; সমস্ত জীবের দেহ অভিনব শোণিতে পূর্ণ হইবে, সমস্ত চিত্ত বিশুদ্ধ হইবে... এবং সমস্ত হৃদয় প্রেম-রসে প্লাবিত হইবে। ধন্য সেই গর্ভ যে তাঁহাকে ধারণ করিবে! ধন্য সেই কর্ণযুগল যাহা তাঁহার প্রথম বাণী শ্রবণ করিবে! ধন্য সেই স্তনযুগল যাহা তাঁহার স্বর্গীয় মুখে নিষ্পেষিত হইবে!... উত্তর হইতে দক্ষিণে, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, ঐ দিন উৎসব আনন্দের দিন হইবে; কারণ, ঈশ্বর ঐ দিনে তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিবেন, তাঁহার শক্তি প্রকটিত করিবেন, এবং আপনার সহিত তাঁহার সৃষ্ট জীবসমূহের মিলন ঘটাইবেন।" তাহার পর, মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, ১৫-২০ শ্লোকে, মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন, * "ব্রহ্মার প্রেরিত একজন দূতের মুখ হইতে এমন এক পুরুষ এই দেশে (Madoura) জন্ম গ্রহণ করিবেন, যাঁহার নিকটে পৃথিবীর সমস্ত লোক কর্ত্তব্য শিক্ষা করিবে।"

জেন্দাবেস্তায় পারসিক ভবিষ্যদ্‌বাণী ও ত্রাণকর্ত্তার আবির্ভাব সম্বন্ধে এইরূপ বলেঃ—"জগতের পরিত্রাতা ও সংস্কারক Sosiosch, মৃতদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিবেন। মৃতের এই পুনরুত্থান নিশ্চয়ই দেখিতে পাওয়া যাইবে। মৃত শরীরে শিরাসকল ফিরিয়া আসিবে। জীবসৃষ্টির সময় যেরূপ হইয়াছিল সেইরূপ ভূমি হইতে অস্থি, জল হইতে রক্ত, বৃক্ষাদি হইতে চর্ম্ম, অগ্নি হইতে প্রাণ সমুদ্ভূত হইবে। তাহার পর, পুণ্যবানেরা স্বর্গে ও পাপীরা নরকে গমন করিবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিবে। (৩০)"

ভারতীয় আর্য্যদের জন্য, মনু যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন, ভগবান কৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল করিলেন। বস্তুত তিনি মথুরাতেই (Madoura) জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা, রূপবতী দেবকী (Devanagny) রাজবংশোদ্ভব; এবং যে ধর্ম্মকে মনুষ্যেরা স্বীয় হৃদয় হইতে বিদূরিত করিয়াছিল সেই স্বর্গীয় ধর্ম্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত, বিষ্ণুদেব বাছিয়া বাছিয়া কৃষ্ণকে দেবকীর গর্ভে বদ্ধ করিলেন। নিদ্রাবস্থাতেই দেবকীর গর্ভসঞ্চার হইল। বিষ্ণুর তেজ, দেবকীর গর্ভে নিহিত হইয়াছে; দেবকী এমন এক পুত্র প্রসব করিবে যে, সে রাজার সমস্ত অত্যাচারের জন্য রাজাকে দণ্ডিত করিয়া বিশ্বমানবকে উদ্ধার করিবে—এই কথা একজন ব্রাহ্মণের মুখে শ্রবণ করিয়া, তাঁহার মাতুল কংস-রাজা দেবকীকে কারাগারে বদ্ধ করিলেন। কিন্তু বিষ্ণু জাগ্রত ছিলেন; এবং যে সময়ে কৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হইল, একটা ঝড় আসিয়া নবজাত শিশু ও মাতাকে কুমারিকার পর্ব্বতে উড়াইয়া লইয়া গেল। তখন কংস কোপাবিষ্ট হইয়া, সেই রাত্রে যত পুংশিশু জন্মিয়াছিল সকলকেই নিহত করিলেন,—এই আশায় যে সেই সঙ্গে কৃষ্ণও নিহত হইবে। Pratamany yoga গ্রন্থে এই পৌরাণিকী কথার উল্লেখ আছে।

ভগবদ্‌গীতাই কৃষ্ণধর্ম্মের ভিত্তিভূমি। ভগবদ্‌গীতাতেই ঐ ধর্ম্মমত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক অর্থে এই ধর্ম্মমতকে ধর্ম্মসংস্কার বলা যাইতে পারে; কেন না উহার মূলে নিম্নলিখিত তত্ত্বটি আছেঃ—নর-দেহধারী একজন ঈশ্বর জগৎকে উদ্ধার করিবেন। বৈদান্তিক ধর্ম্ম অপেক্ষা এই ধর্ম্ম এক হিসাবে শ্রেষ্ঠ; উভয়ের একই গন্তব্য স্থান অর্থাৎ মোক্ষ হইলেও বেদান্তের ন্যায় এই ধর্ম্ম আত্মনিগ্রহকারী কঠোর কর্ম্ম সাধন করিতে কাহাকে বাধ্য করে না, পরন্তু সকলকেই স্বাধীনতা প্রদান করে—এই জন্য কৃষ্ণধর্ম্মের যোগ-বাদ ভারতের উচ্চশ্রেণীর লোকের নিকট এত প্রিয়। এই মতানুসারে, চিত্তশুদ্ধির দ্বারাই মনুষ্য অজ্ঞান হইতে—পাপ হইতে মুক্ত হয়; প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা অনুতাপের দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় এবং জ্ঞানের দ্বারাই উহা সম্পূর্ণ হয়। এই জ্ঞান আত্মহারা সমাধির দ্বারা লাভ করা যায় না, পরন্তু সুস্পষ্ট শৃঙ্খলাবদ্ধ তত্ত্বসমূহের আলোচনা ও চিন্তার দ্বারা উপলব্ধ হয়।

কৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্য অর্জ্জুন—এই উভয়ের কথোপ-

* আমরা ত মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের ঐ অংশে এই কথা দেখিতে পাই না।—অনুবাদক।

কথন লইয়াই ভগবদ্গীতা রচিত হইয়াছে। ইহা ১৮ অধ্যায়ে বিভক্ত। আমরা Burnoofএর অনুবাদ হইতে কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিব।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া ভগবদ্গীতা, সাংখ্যের মতানুযায়ী জ্ঞানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—"যাহা নাই তাহার 'হওয়া' হইতে পারে না, এবং যাহা আছে তাহার 'না হওয়া' হইতে পারে না, তত্ত্বদর্শীরা এই উভয়ের অন্ত দেখিয়াছেন।"—"যিনি এই সকল ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহাকে অবিনাশী বলিয়া জানিবে। কেহই সেই অব্যয়ের বিনাশ করিতে পারে না।"—"নিত্য অবিনাশী ও অপরিচ্ছন্ন আত্মার এই দেহ সকল নশ্বর বলিয়া কথিত হয়।"—"ইনি কখনও জন্মেন না বা মরেন না; অথবা উৎপন্ন হইয়া পুনরায় উৎপন্ন হয়েন না; ইনি জন্মরহিত নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ; শরীর হত হইলেও ইনি হত হয়েন না।"... —"জাত মাত্রের মরণ নিশ্চিত এবং মৃতের জন্ম নিশ্চিত।"

ইহার পর ভগবান্ যোগবাদের কথা বলিতেছেন। যে কর্ম্ম একটা শৃঙ্খলের ন্যায়, সেই কর্ম্মপরম্পরার ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করা এবং ধ্যানের দ্বারা যোগে নিমগ্ন হওয়াই এই যোগবাদের চরম লক্ষ্য।—"নিষ্কাম ধর্ম্মেই তোমার অধিকার হউক; কর্ম্মফলে কদাচ যেন না হয়; তুমি কর্ম্মফলার্থী হইও না; সকাম কর্ম্মে যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়। ইন্দ্রিয়-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন হইয়া, যোগে অবস্থিত হইয়া কর্ম্ম কর; সমত্বই যোগ বলিয়া উক্ত হয়। জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কাম্যকর্ম্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট; অতএব তুমি সেই জ্ঞানকে আশ্রয় কর; ফলকামী মানবেরা কৃপাপাত্র। বুদ্ধিযোগে নিরত মনীষীরা কর্ম্মজ ফল ত্যাগ করিয়া জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গহন দুর্গ পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুতার্থের বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে। যখন শ্রুতিতে সুপ্রতিপন্ন তোমার বুদ্ধি অবিচলিত হইয়া ঈশ্বরেতে নিশ্চলা হইবে, তখন তুমি যোগ প্রাপ্ত হইবে।"

ধর্ম্মের জন্যই ধর্ম্ম সাধন করিবে, পুরস্কারের লোভে করিবে না, এই কথাটি সুস্পষ্টরূপে স্থাপন করিবার নিমিত্ত, নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে:—"যোগ-বিরহিত ব্যক্তির বুদ্ধি নাই; যোগ-বিরহিত ব্যক্তির ধ্যানও হয় না; আত্মধ্যানবিহীন ব্যক্তির শান্তি নাই, শান্তিহীনের সুখ কোথায়? যেহেতু বায়ু যেমন নৌকাকে জলে বিক্ষিপ্ত করে, সেইরূপ মন, বিষয়ে ভ্রমণশীল অবশীকৃত ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যে ইন্দ্রিয়ের অনুগমন করে, সেই ইন্দ্রিয়ই পুরুষের প্রজ্ঞাকে হরণ করে।"—জ্ঞানবান্ও স্বীয় প্রকৃতির অনুসরণ করে; প্রাণিগণও প্রকৃতির অনুসরণ করে; অতএব ইন্দ্রিয়নিগ্রহ আর কি করিবে? প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব বিষয়ে অনুরাগ ও দ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। অতএব এই উভয়ের বশীভূত হইবে না। কেন না, তাহারা মুমুক্ষুর প্রতিপক্ষ।" কিন্তু কে মানুষকে পাপপথে বলপূর্ব্বক লইয়া যায়? কৃষ্ণ উত্তর করিলেন:—"ইহা রজোগুণজাত দুষ্পূরণীয় ও অত্যুগ্র কাম ও ক্রোধ; মোক্ষমার্গে এই কামকে বৈরী বলিয়া জানিবে। যেমন অগ্নি ধূম দ্বারা, দর্পণ মলদ্বারা, গর্ভ জরায়ু দ্বারা আবৃত হয়, সেইরূপ জ্ঞানীর চিরশত্রু এই কামরূপ অপূরণীয় অগ্নি দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে। ইন্দ্রিয়সকল, মন ও বুদ্ধি এই কামের অধিষ্ঠান বলিয়া কথিত হয়। এই কাম ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে। অতএব তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান এই উভয়ের বিনাশক পাপরূপ এই কামকে জয় কর। ইন্দ্রিয়গণকে দেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যায়; ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ; মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধি অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি সেই আত্মা। অতএব এইরূপে বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জানিয়া, আত্মার দ্বারা আত্মাকে নিশ্চল করিয়া এই দুর্নিবার শত্রুকে জয় কর।" জ্ঞানযোগে কৃষ্ণ,—ঈশ্বরের সহিত নিত্য যোগ নিবন্ধ করিবার উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহার শরীরধারণের উদ্দেশ্য কি তাহারও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং আপনার স্বরূপ-লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—"জন্মরহিত অবিনশ্বর ও প্রাণিগণের ঈশ্বর হইয়াও আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়া বশতঃ প্রকাশিত হই। যখনই ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের আধিক্য হয় তখনই আমি আবির্ভূত হই। সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কর্ম্মকারীদিগের বিনাশের জন্য, ধর্ম্মস্থাপনের নিমিত্তে আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই। যিনি আমার এই দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম যথার্থরূপে জানেন তিনি দেহত্যাগ করিয়া

পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না; কিন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন। অনুরাগ ভয় ও ক্রোধশূন্য এবং মদেকচিত্ত হইয়া আমাকে আশ্রয় করিয়া, জ্ঞান তপস্যার দ্বারা পূত হইয়া অনেকে আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহারা আমাকে যে ভাবে ভজনা করে তাহাদিগকে আমি সেই ভাবেই ভজন করি। মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথ অনুবর্ত্তন করে।" ইহাই ত্যাগ ও কর্ম্মের মতবাদ। এই মতবাদ ভারতবর্ষে একটা গুরুতর কার্য্য সাধন করিয়াছে; ইহা নিষ্ফল বাহ্য অনুষ্ঠানের প্রবণতা হইতে ভারতের চিন্তা ও ভাবকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মের যোগবাদের সহিত ইহার কতকটা মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

—"যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন, জনগণের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান্ এবং সর্ব্বকর্ম্মকারী হইলেও তিনিই যোগযুক্ত। নিষ্কাম, সর্ব্ববন্ধনমুক্ত, জ্ঞানঅবস্থিত চিত্ত এবং প্রাণ-যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্যক্তির সমুদয় কর্ম্ম বিলয় প্রাপ্ত হয়। তাঁহার অর্পণ ব্রহ্ম, ঘৃত ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মকর্ত্তৃক হোমও ব্রহ্ম, তিনি সেই ব্রহ্মকর্ম্মসমাধি দ্বারা ব্রহ্মকেই পাইয়া থাকেন। দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ; যেহেতু জ্ঞানেতেই সমুদায় কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয়; —যে জ্ঞান অবগত হইলে পুনর্ব্বার এইরূপ মোহ প্রাপ্ত হইবে না এবং যদ্দ্বারা আত্মাতে ও অনন্তর আমাতে ভূতগণকে অশেষরূপে দর্শন করিবে। যদি সমুদায় পাপী হইতেও তুমি অধিক পাপী হও, তথাপি সমুদায় পাপসমুদ্র জ্ঞানপোত দ্বারাই সম্যকরূপে উত্তীর্ণ হইবে। যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠসকলকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি সমুদায় কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করে। ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র কিছুই নাই। যোগসিদ্ধ ব্যক্তি সেই আত্মজ্ঞান আত্মাতে স্বয়ংই লাভ করে। শ্রদ্ধাবান, তৎপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন; জ্ঞানলাভ করিয়া অচিরাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন। অতএব অজ্ঞানোৎপন্ন হৃদয়স্থ এই সংশয়কে জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া যোগকে অবলম্বন কর। হে ভারত উঠ!"

উক্ত বচনগুলির দ্বারা জানা যায় যে, যোগীরা জ্ঞানকেই তাহাদের প্রযত্নের পরম লক্ষ্য, এবং মোক্ষপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া বিবেচনা করিত। ইহা সাংখ্যদর্শনের প্রতিকূল সমালোচকদিগের প্রতিবাদের একপ্রকার উত্তর বলিলেও হয়, যেহেতু, যোগীরা জ্ঞানবাদকে আদৌ পরিবর্জ্জন করে নাই। বস্তুত কৃষ্ণ এই কথা বলেন! "অজ্ঞেরাই জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগকে পৃথক্ বলিয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহা বলেন না। একমাত্র সাধন সম্যকরূপে অবলম্বন করিলে দুয়েরই ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞাননিষ্ঠগণ যে স্থান লাভ করেন, কর্ম্মযোগীরাও তাহাই প্রাপ্ত হন। যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক দেখেন তিনিই সম্যক্ দর্শন করেন।"

কিন্তু যোগমার্গে উপনীত হইতে হইলে, অগ্রে সন্ন্যাস অবলম্বন করা আবশ্যক। "যেহেতু, ফলকামনা ত্যাগ করেন নাই এরূপ কেহই যোগী নহেন। আত্মা দ্বারা আত্মাকে অধঃপতিত করিবে না। যেহেতু আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু। যিনি আত্মাকে বশীভূত করিয়াছেন, তিনিই আত্মার বন্ধু, অবশীভূত আত্মা শত্রুবৎ আচরণ করিয়া থাকে।"

তাহার পর, যোগীর লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে:—"যাঁহার আত্মা জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত, যিনি কূটস্থ, জিতেন্দ্রিয়, লোষ্ট্র পাষাণ কাঞ্চনে যাঁহার সমদৃষ্টি, তিনিই যোগযুক্ত যোগী। যিনি আমাকে সর্ব্বভূতে দেখেন, এবং সর্ব্বভূত আমাতে দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না, তিনিও আমার অদৃশ্য হন না। যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে, একত্বকে আশ্রয় করিয়া ভজনা করেন, বিষয় সকলে থাকিয়াও সেই যোগী আমাতেই অবস্থান করেন। যিনি আত্মতুলনায় সর্ব্বত্র সমান দেখেন,—সুখ দুঃখ সমান দেখেন, সেই যোগীই শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞানযোগের অধ্যায়ে, কৃষ্ণ আপনার স্বরূপের ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আটরূপে তাঁহার অপরা প্রকৃতি বিভক্ত। যে প্রকৃতি এই জগৎকে রক্ষা করিতেছে সেই জীবভূতা প্রকৃতিই তাঁহার পরাপ্রকৃতি। "আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; সূত্রে মনিগণের ন্যায় আমাতে এই সমস্ত জগৎ গাঁথা আছে। আমি যে অদৃশ্য—অজ্ঞজনেরা আমাকে দর্শনের গ্রাহ্য বলিয়া মনে করে; তাহারা আমার নির্ব্বিকার পরাপ্রকৃতিকে জানে না।" সংক্ষেপে বলিতে গেলে,—

তিনি ঈশ্বর, পরমাত্মা, পূর্ণশক্তি, আদি সত্তা, আদি দেব, আদি যজ্ঞ। এই ঈশ্বর কে? ভগবান্ এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিতেছেন:—পরম যে অক্ষর তিনিই ব্রহ্ম; স্বভাবই অধ্যাত্ম বলিয়া উক্ত হয়; ভূত সকলের উৎপত্তি ও উদ্ভবের কারণ,—বিসর্গ ও কর্ম্ম শব্দবাচ্য। বিনশ্বর দেহাদি পদার্থ প্রাণিমাত্রকে অধিকার করিয়া অবস্থান করে এজন্য তাহা অধিভূত; পুরুষ অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী বিরাট পুরুষ বলিয়া অধিদৈবত এবং এই দেহে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আমিই যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া অধিযজ্ঞ। অন্তকালে আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহ ত্যাগ করিয়া যান, তিনি আমারই ভাব প্রাপ্ত হন, ইহাতে সংশয় নাই। অব্যক্তরূপী আমি এই সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া আছি; চরাচর ভূত সমুদায় আমাতে অবস্থিত, আমি সে সকলে অবস্থিত নহি। আমি ভূত-ধারক ও ভূত-পালক, তথাপি ভূতগণে অবস্থিত নহি। আমিই এই জগতের গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, প্রভব, প্রলয়, স্থান, আমিই অব্যয় বীজ। আমিই অমৃত, আমিই মৃত্যু, আমিই সৎ, আমিই অসৎ। আমিই যজ্ঞ, আমিই স্বধা, আমিই ঔষধ, আমিই মন্ত্র, আমিই হোমের ঘৃত, আমিই অগ্নি, আমিই হোম।

যিনি আমাকে ভক্তিসহকারে পত্রপুষ্প ফল ও জল প্রদান করেন, আমি সেই সংযতাত্ম ব্যক্তিকর্ত্তৃক ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত পত্রপুষ্পাদি গ্রহণ করি।” অবশেষে কৃষ্ণ বলিতেছেন: —“দেবগণ আমার উৎপত্তি অবগত নহেন, মহর্ষিগণও অবগত নহেন, যেহেতু আমি দেবগণের ও মহর্ষিগণেরও সর্ব্বতোভাবে আদি। আমি সকলের প্রভব, এবং আমা হইতেই সমস্ত প্রবর্ত্তিত হয়।” ভগবদ্গীতায় ঈশ্বরের একত্ব যেরূপ তন্ন তন্ন করিয়া আলোচিত ও প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা বেশী করিয়া বলা অসম্ভব। ভগবদ্গীতার দর্শন, —আধ্যাত্মিকতত্ত্ব ও নীতিতত্ত্বের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছে। বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্যিক ভারতে যত কিছু দার্শনিক তত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, ভগবদ্গীতা তাহার সংক্ষিপ্তসার,—এবং যেন সেই সকল তত্ত্বের ‘মাথার মুকুট’। ভগবদ্গীতায়, জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই; যে বিজ্ঞান, জড় ও চৈতন্য উভয়কেই এক আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে তাহাই প্রকৃত বিজ্ঞান; কেননা, সমস্ত জড়পদার্থের মধ্যে জড়ের মূলতত্ত্বরূপী যে চৈতন্য বিদ্যমান্ সেই চৈতন্যই কৃষ্ণ-তিনিই ব্রহ্ম। —“মহাভূত সমূহ, অহঙ্কার বুদ্ধি, মূলপ্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, এক মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি মনোবৃত্তিরূপা চেতনা ও ধৈর্য্য—এই ইন্দ্রিয়াদি-বিকার-সহিত ক্ষেত্র সংক্ষেপে উক্ত হইল।” পরমাত্মার নিত্য ধ্যানই বিজ্ঞান, তাহা হইতেই সত্যের জ্ঞান জন্মে। ঈশ্বরকে জানা, আমাদের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ তাহা জানা এবং জগতে যাহা কিছু আছে তাহার কারণ বলিয়া তাঁহাকে জানা—মানুষের ইহাই কর্ত্তব্য। কৃষ্ণ বলেন,—“অনাদি পরব্রহ্ম, তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন সর্ব্বেন্দ্রিয়ের গুণ তাঁহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়, অথচ তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত, সঙ্গশূন্য অথচ সকলের আধারভূত, নির্গুণ অথচ সকল গুণের ভোক্তা। তিনি অবিভক্ত হইয়াও ভূতগণের মধ্যে বিভক্তের ন্যায় অবস্থিত; তিনি ভূতভর্ত্তা, গ্রাসষ্ণু ও প্রভবিষ্ণু, অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা। তিনি জ্যোতির জ্যোতি, অজ্ঞান-অন্ধকারের অতীত; তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য, এবং তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত।”

—“প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি; দেহেন্দ্রিয়াদি বিকার এবং সত্ত্বরজস্তম এই তিন গুণ প্রকৃতি-জাত বলিয়া জানিবে। কার্য্য ও কারণ ইহাদের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু বলিয়া উক্ত হন, আর পুরুষ সুখদুঃখাদির ভোক্তৃত্বের হেতু বলিয়া কথিত হন...হে ভারতর্ষভ, যে কিছু স্থাবর জঙ্গম সত্ত্ব উৎপন্ন হয়, তৎসমুদায় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে হয় জানিবে। কেহ যখন ভূতগণের পৃথক্ ভাবকে একস্থ দর্শন এবং তাহা হইতে ভূতগণের বিস্তার দর্শন করেন তখন তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। যেমন একমাত্র সূর্য্য এই সমস্ত লোককে প্রকাশিত করেন সেইরূপ ক্ষেত্রী অর্থাৎ পরমাত্মা সমুদায় ক্ষেত্র অর্থাৎ সমস্ত জড়জগৎকে প্রকাশিত করেন।” বিশ্বব্রহ্মবাদের সমস্ত মতটি এই বচনগুলির মধ্যে বদ্ধ; কিন্তু যদিও সর্ব্বভূত সেই পরম পুরুষ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু তথাপি উহারা একই প্রকারে উদ্ভূত হয় নাই; এই জন্যই কৃষ্ণ

উপদেশের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, মানুষ কেবল যোগের দ্বারাই স্বকীয় উৎপত্তির মূল কারণের অভিমুখে ক্রমশ অগ্রসর হইয়া অবশেষে তাহাতে পুনঃ প্রবেশ করিতে পারে। বস্তুত,—যেহেতু ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ, অতএব মানুষ বুদ্ধি ও জ্ঞানে যতই উন্নত হইবে ততই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারিবে। সে যাহাই হউক, কৃষ্ণ এ কথা স্বীকার করেন যে, যাহার যেরূপ প্রকৃতি তদনুসারে, বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া মানুষ অমৃতে উপনীত হইতে পারে। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেনঃ—"কেহ বা ধ্যানযোগে আত্মাকে আত্মার দ্বারা আত্মাতে দেখেন, কেহ বা সাংখ্যযোগে, কেহ বা কর্ম্মযোগে আত্মাকে দর্শন করেন। কিন্তু কেহ কেহ এই প্রকারে অর্থাৎ সাংখ্য যোগাদি দ্বারা আত্মাকে সাক্ষাৎ করিতে না জানিয়া আচার্য্যাদির নিকট আত্মকর্ম্মের উপদেশ পাইয়া উপাসনা করেন; তাঁহারাও শ্রুতিপরায়ণ হইয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন।" তিনটি গুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় এবং নির্ব্বিকার দেহীকে দেহের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয়ঃ—এই ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তম।—সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজঃ হইতে অনুরাগ ও তম হইতে জড়তা, ভ্রম ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয়।" যে যোগের দ্বারা পরম পুরুষের নিকবর্ত্তী হওয়া যায়, সেই জ্ঞানযোগ ভগবদ্‌গীতার একটি পরমোৎকৃষ্ট বিষয়; কেন না, জগতের সহিত ব্রহ্মের কিরূপ সম্বন্ধ, উহার দ্বারা তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে; ইহাতে অবতারবাদের কথা আছে, এবং মানুষকে যিনি নিত্য ধামে লইয়া যান সেই ত্রাণকর্ত্তার উল্লেখ আছে।—"জীবলোকে, আমারই অংশ এই যে জীবভূত সনাতন পদার্থ—ইহা প্রকৃতিতে অবস্থিত মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে। দেহী কর্ম্মবশে যে শরীর প্রাপ্ত হন এবং যে শরীর পরিত্যাগ করেন, পূর্ব্ব শরীর হইতে প্রাপ্ত শরীরে এই সকল ইন্দ্রিয়াদি লইয়া যান। যেমন বায়ু আশয় হইতে অর্থাৎ কুসুমাদি হইতে গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্মাংশ সকল গ্রহণ করিয়া গমন করে সেইরূপ দেহান্তরগমনকারী অথবা সেই দেহেই অবস্থিত অথবা বিষয়-ভোগকারী অথবা ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট দেহীকে মূঢ়েরা দেখিতে পায় না; কিন্তু জ্ঞান-চক্ষু ব্যক্তিরা দেখিতে পান। আদিত্যে যে তেজ, চন্দ্রমাতে যে তেজ, অগ্নিতে যে তেজ অখিল জগৎকে প্রকাশিত করিতেছে সেই তেজ আমারই জানিবে। আমি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া ভূত সকলকে বলের দ্বারা ধারণ করি এবং রসময় চন্দ্র হইয়া সমুদয় ওষধি সম্বর্দ্ধিত করি। আমি সমুদায় প্রাণিগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছি—আমা হইতেই স্মৃতি জ্ঞান ও বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে। সমুদায় বেদের আমিই বেদ্য; আমিই বেদান্তকৃৎ ও বেদার্থবেত্তা। ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি পুরুষ, লোকে প্রসিদ্ধ। তাহার মধ্যে সমুদায় ভূতগণ ক্ষর পুরুষ, আর কূটস্থ চৈতন্য অক্ষর পুরুষ বলিয়া উক্ত হন। এই ক্ষর ও অক্ষর হইতে অন্য উত্তম পুরুষ—পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন—যিনি অব্যয় ঈশ্বর এবং যিনি লোকত্রয়ে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ধারণ করিয়া আছেন। যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর অপেক্ষাও উত্তম; এই জন্য আমি লোকে এবং বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছি।"

বৌদ্ধনীতি হইতে যোগ-নীতির শ্রেষ্ঠতা একটি বিষয়ে উপলব্ধি হয়। উভয় নীতিই ত্যাগ ও সন্ন্যাসের উপদেশ দিয়া থাকে, কেবল প্রভেদ এই, বৌদ্ধেরা ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টতায় উপনীত হন; পক্ষান্তরে যোগীরা কর্ম্মফলের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করেন। এই জন্যই বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রাচ্যখণ্ডের অধিকাংশ স্থানের উপর জয় লাভ করিয়াও, একস্থানেই দাঁড়াইয়া আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অধ্যায়ে আমি তাহা বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করিব। কিন্তু এই ভগবদ্‌গীতা একটি অপূর্ব্ব অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। ইহাতে যে উপদেশ আছে তাহা—কি পণ্ডিত কি যোগী, কি ক্ষুদ্রবুদ্ধি সামান্য ব্যক্তি, সকলকেই পরিতৃপ্ত করে। যোগীর যে ত্যাগ তাহা কর্ম্মত্যাগ নহে—তাহা কর্ম্মফলের কামনা ত্যাগ। কৃষ্ণ বলিতেছেনঃ—"যজ্ঞ দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে, নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য; যজ্ঞ দান ও তপস্যা বিবেকিগণের চিত্তশুদ্ধিকর। কিন্তু এই সকল কর্ম্মেও আসক্তি ও ফল ত্যাগ করা কর্ত্তব্য; ইহা আমার নিশ্চিত উত্তম মত… দেহী নিঃশেষরূপে কর্ম্ম সকল ত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু যিনি কর্ম্মফলত্যাগী তিনিই ত্যাগী বলিয়া অভিহিত হয়েন।" "বিভক্ত সর্ব্বভূতের মধ্যে যাহার দ্বারা এক অব্যয় অবিভক্ত সত্তা অবলোকিত হয়, সেই জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান। যে জ্ঞানের দ্বারা পৃথক্‌বিধ নানা সত্তাকে পৃথকরূপে অবগত হওয়া যায়, তাহা রাজসিক জ্ঞান; যে জ্ঞান, সমস্ত মনে

করিয়া এক কার্য্যেই আসক্ত হয় সেই অহেতুক অতত্ত্বার্থবৎ অল্প জ্ঞানই তামসিক জ্ঞান।"

কৃষ্ণ, চতুর্বর্ণের প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের জন্য তিনি যে সকল ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, কেবল জ্ঞান ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা হইতেই ব্রাহ্মণ ভারতে প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়ের জন্য যে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা আমাদের য়ুরোপীয় অভিজাতবর্গের (Aristocracy) পক্ষেও খাটে। আমাদের অভিজাতবর্গ কোন প্রকার জ্ঞানমূলক আন্দোলনের নেতা হয়েন না,—তাঁহাদের নামে এই যে একটা কলঙ্ক আছে তাহা নিতান্ত অমূলক নহে;* কারণ, কোন যুগের কোন অভিজাতবর্গকেই জ্ঞানানুশীলনে প্রাধান্য লাভ করিতে কখনও দেখা যায় নাই।—"শম, দম, তপস্যা, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান বিজ্ঞান, ও আস্তিক্য, এই সকল ব্রাহ্মণদের স্বভাবজ কর্ম্ম। শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দাক্ষ্য, যুদ্ধে অপলায়ন, দান, প্রভুভাব এই গুলি ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক কর্ম্ম। কৃষি, গো-রক্ষা, বাণিজ্য ইহাই বৈশ্যদের কর্ম্ম এবং পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্মই শূদ্রদের পক্ষে স্বাভাবিক।" "স্ব স্ব কর্ম্মে অভিরত মনুষ্য সিদ্ধি লাভ করে। যাঁহা হইতে মানবগণের প্রবৃত্তি অর্থাৎ চেষ্টা হয় এবং যিনি এই সমুদায় বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন, মানবগণ স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করে। সদোষ স্বধর্ম্মও সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। লোকে স্বভাবজ কর্ম্ম করিয়া পাপ প্রাপ্ত হয় না। হে কৌন্তেয়, সদোষ হইলেও সহজ কর্ম্ম ত্যাগ করিবে না, যেহেতু ধূমব্যাপ্ত অগ্নির ন্যায়, সকল কর্ম্মই দোষে আবৃত।"

ভগবদ্‌গীতার শেষ অংশটা সমস্তই উদ্ধৃত করিবার যোগ্য; কেননা, যোগবাদসংক্রান্ত সমস্ত উপদেশ ও বচনের উহাই সংক্ষিপ্তসার; উহাতে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ঈশ্বরের সহিত আধ্যাত্মিক যোগ নিবদ্ধ করিয়াই মনুষ্য ঈশ্বরের প্রসাদে ঈশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং নিত্য শান্তি লাভ করে; এই যোগবাদ মানুষকে নিজ কার্য্যের উপর স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়াছে; প্রথমে তাহাকে সত্যের পথ দেখাইয়া দিয়াছে; যে পথই সে নির্ব্বাচন করুক না—সে তার ইচ্ছাধীন। পরিশেষে এই যোগবাদ, জ্ঞানী ও পণ্ডিতদিগের জন্য যে পুরস্কার, সেই একই পুরস্কার শ্রদ্ধাবান্ অজ্ঞব্যক্তিদিগের জন্যও অঙ্গীকার করিয়াছে।—"সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম করিয়াও মৎপরায়ণ ব্যক্তি আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হয়। তুমি চিত্তদ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া, মৎপরায়ণ হইয়া, বুদ্ধিযোগ আশ্রয় পূর্ব্বক সর্ব্বদা মচ্চিত্ত হও। মচ্চিত্ত হইলে তুমি আমার প্রসাদে সমুদায় বিপদ উত্তীর্ণ হইবে। যদি অহঙ্কার বশত তুমি না শুন তবে বিনষ্ট হইবে। হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর মায়াদ্বারা দেহরূপ যন্ত্রে অবরূঢ় ভূত সকলকে তত্তৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। হে ভারত, সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণ লও; তাঁহারই প্রসাদে পরাশান্তি ও নিত্যস্থান প্রাপ্ত হইবে। এই গুহ্য হইতেও গুহ্যতর জ্ঞান আমি তোমাকে বলিলাম। ইহা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার পরম বাক্য পুনরায় শ্রবণ কর; তুমি আমার অতি প্রিয়, এজন্য তোমার হিত কহিতেছি। তুমি মচ্চিত্ত, মদ্‌ভক্ত ও আমারই উপাসক হও, আমাকেই নমস্কার কর, তাহা হইলে আমাকেই পাইবে। তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি; যেহেতু তুমি আমার প্রিয়। সমুদয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর, আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব; শোক করিও না। তুমি এই গীতার্থতত্ত্ব, ধর্ম্মহীন ভক্তিহীন, গুরুসেবাহীন এবং আমার অসূয়াকারীকে কদাপি বলিও না। এই পরম গুহ্য গীতাশাস্ত্র আমার ভক্ত সকলকে যিনি বলিবেন, তিনি আমাতে পরমাভক্তি অর্পণ করায় সংশয়শূন্য হইয়া আমাকেই পাইবেন। মনুষ্যমধ্যে তাঁহা অপেক্ষা কেহ আমার অধিক প্রিয়কারী নাই এবং কোনকালে তাঁহা অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয় পৃথিবীতে আর কেহ হইবেও না। আর যিনি আমাদের এই ধর্ম্মসংবাদ পাঠ করিবেন, তিনি জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা আমারই অর্চ্চনা করেন;—আমার এইরূপ

* এ কথা আমাদের ক্ষত্রিয়দের সম্বন্ধে খাটে না—উপনিষদের অনেক ঋষিই ক্ষত্রিয় ছিলেন। বেদের কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁহারাই প্রথমে প্রতিবাদ উত্থাপন করেন।—অনুবাদক।

মত। শ্রদ্ধাবান অসূয়াহীন হইয়া যিনি ইহা শ্রবণ করেন, তিনিও পাপমুক্ত হইয়া পুণ্যকারিগণের পবিত্র লোক সকল প্রাপ্ত হন।" গ্রন্থের এই অংশটি কি গুরুগম্ভীর; ইহার যেরূপ সৌন্দর্য্য ও অনুপম মাধুর্য্য তাহাতে পর্ব্বতে প্রদত্ত বাইবেলের উপদেশগুলিকে স্মরণ করাইয়া দেয়; ২৪০০ শতাব্দী পুরাতন হইলেও, উহা এরূপ আধুনিক যে উহার সমস্তটাই কোন খৃষ্টান গির্জ্জায় পঠিত হইতে পারে— ভিন্ন ধর্ম্মের জিনিস বলিয়া কাহারও মনেও হয় না।

ভগবদ্গীতার শেষে, "সর্ব্বজীব সুখী হউক!" এই যে প্রার্থনাটি আছে, ইহা সেই উদার ও মধুরপ্রকৃতি ভারতীয় আর্য্যবংশেরই অনুরূপ।

ভারতের ধর্ম্মমতগুলি যাহা আমি বিবৃত করিলাম, তাহা হইতেই উপলব্ধি হইবে, যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম আবির্ভূত হয় তখন ভারত, সভ্যতা-সোপানের কত উচ্চধাপে আরূঢ় হইয়াছিল। শাক্য মুনি সংস্কারকর্ত্তারূপেই ভারতে আবির্ভূত হয়েন। এই সংস্কার কার্য্যের উদ্দেশ্য কি, তাহা আমি বুদ্ধের জীবনীতে বিবৃত করিব।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল।

(নাট্য রচনা)

প্রতাপসিংহ ও দুর্গাদাস।

"মেবার পাহাড়! উড়িছে যাহার
রক্তপতাকা উচ্চ-শির,—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প
দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।"

সে দৃশ্যে কে না মুগ্ধ হয়? কে না সেই পতাকার দিকে বিস্ময় ও আশ্বাসে চাহিয়া থাকে? কবির প্রতাপসিংহ এবং দুর্গাদাস, রাজস্থানের বীরকীর্ত্তির কথায় রচিত।

সমগ্র প্রকৃতি চঞ্চল বলিয়াই উহার নাম জগৎ। অনিত্যতার ছায়া-কম্পনই বৈচিত্র, এবং সেই বৈচিত্রই সৌন্দর্য্যের প্রাণ। সুন্দরের মধ্যে সুন্দরতম মানব-হৃদয়; এবং সেই সুন্দর ও পুণ্যচরিত্রে কেবলই দেবাসুর-যুদ্ধের ইতিহাস। তাই চিত্রশিল্পের এই সমালোচনা বড় যথার্থ— যে, চিত্রের অসম্পূর্ণতাই যথার্থ পূর্ণতা।

গৌতমের অটল দেবত্ব, আমাদের সাধু আকাঙ্ক্ষার দৈব স্বপ্ন; পাষাণীও মানস প্রতিমা। কিন্তু কবির ঐ চিত্র-যুগলে, নিত্যউপলব্ধ পাপপুণ্যের সংঘর্ষ আছে বলিয়া উহারা সুন্দর; অতিমানুষ হইলে সুন্দর হইত না। কবির প্রতাপসিংহ ও দুর্গাদাসও আদর্শ মাত্র হইলে আদৃত হইত না। অন্ততঃ নাটকে ত নয়।

কবির প্রতাপসিংহ নাটকে দুইটি অতি স্থির ভাস্বর এবং সুন্দর তারকা চিত্রিত আছে; একটি ইরা, আর একটি মেহের উন্নিসা। উহাদের আলোক অপার্থিব বলিয়া মনে হইলেও, পার্থিবতা যথেষ্ট আছে। সত্য বটে, যে ইরা সত্যরাজ্যের পুরোহিতের মত, দুঃখের মোহমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে, এবং শক্তের প্রাণে ভক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়া ডুবিয়া গেল; এবং যে উদীয়মান সূর্য্যের পুরশ্চর হইয়া আসিয়াছিল, তাহার দীপ্তিতে উহার আলোক-মাধুর্য্য কেবল স্বপ্নের মত স্মৃত রহিল। কিন্তু উহার চরিত্রে পার্থিবতা আছে, ক্ষীণতা আছে, অন্ধকার আছে। মেহের উন্নিসা অস্তগামী সূর্য্যের অনুচারিণী বটে; সে প্রেমরাজ্যের সন্ন্যাসিনী সত্য; কিন্তু তাহার সন্ন্যাসে অমানুষিক উদাসীনতা নাই। কেহ কেহ প্রতাপসিংহের অনেক চরিত্রে সম্পূর্ণতা দোষ আরোপ করেন বলিয়া প্রথমেই একথাটার উল্লেখ করিলাম।

যে প্রতিজ্ঞা-পাঠ প্রতাপসিংহ নাটকের আরম্ভ, উহা ঐতিহাসিক। রাণাপ্রতাপের দেশের প্রথম দৃশ্যের চিত্র, ম্যাটসিনির দলের প্রতিজ্ঞাপাঠের অনুকৃতি নহে। প্রতিজ্ঞার সে অটলতা আজ আর নাই; কিন্তু এখনো রাজস্থানের রাজন্যেরা সোণার থালার নীচে একটি পাতা রাখিয়া আহার করে; এবং সুকোমল শয্যাতলে একটি তৃণ রাখিয়া সুখ-সুপ্ত হয়। হায় প্রতাপ, এই তোমার সেই দেশ! কবির প্রতাপসিংহ, পরপদদলিতা, হৃতালঙ্কারা প্রপীড়িতা, দীনা জন্মভূমিকে দেখাইতেছেন; আর শক্তসিংহ বলিতেছেন (শক্তসিংহ কাপুরুষ নহে বলিয়া এস্থলে, "শক্তসিংহের মত আমরাও বলিতেছি" বলিয়া একটু অলঙ্কারের মাত্রা চড়াইতে পারিলাম না):—"জন্মভূমি!

সে আমার কে?" যে গাম্ভীর্য্য এবং উদ্দীপনায় প্রথম দৃশ্যের অভিনয়, যে সাধনা এবং সন্ন্যাস ঐ অভিনয়ে সূচিত, তাহার অন্তরালেও যে অলক্ষ্যে তরলতা, উদাসীনতা এবং স্বার্থপরতা ছিল, কবি তাহা প্রথম দৃশ্যেই দেখাইয়াছেন। আমাদের প্রাচীন অলঙ্কারের বিচারে ইহা অতি সুকৌশল। এতটা উৎসাহের দীপ্তি জাগিয়া না উঠিলে, অন্তের অন্ধকারের গভীরতা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়া লইতে পারা যায় না।

দুর্গাদাস নাটকের প্রথম দৃশ্য সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যাইতে পারিত, কিন্তু উহাতে সূচনা অপেক্ষা পরিপূর্ণতার ভাগ অধিক। প্রথম দৃশ্যেই দুর্গাদাস সমরসিংহ, ঔরংজেব এবং শ্যামসিংহের চরিত্র সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়া ফেলি, শেষ-পর্য্যন্ত তাহাই দেখিতে পাই; ঘটনাচক্রে কাহারো চরিত্রের লুকানো দিক্ বড় বেশী ফুটিয়া উঠিতে দেখি না। স্বীকার করি যে দুর্গাদাসের চরিত্র দেবদুর্লভ—স্বর্ণপটে আঁকিয়া রাখিবার জিনিস; এবং কবি-অঙ্কিত-পট খানিও স্বর্ণপট বটে। কিন্তু প্রথমদৃশ্য হইতে শেষপর্য্যন্ত সে চিত্রপট একই ফ্রেমে বাঁধা দেখিতে পাই। প্রথমচিত্রেই দুর্গাদাসের পরার্থপরতা, বুদ্ধিকৌশল এবং শৌর্য্য, সম্পূর্ণ বিকশিত। সমরসিংহের সরলতা এবং তেজস্বিতা, এবং ঔরংজেবের ছলনা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, একটি ঘটনায়ই প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু প্রতাপসিংহের প্রথম চিত্রে, শক্তসিংহকে ত মোটেই চিনিতে পারি না; প্রতাপকেও নয়। রাজস্থানের প্রদীপ্ত সূর্য্যকে অনেকবার মেঘে ঢাকিয়াছে, অনেকবার তাঁহাকে মেঘমুক্ত নবসূর্য্যের মত দেখিয়াছি। ঐতিহাসিক চরিত্র প্রথম হইতেই একটু গড়া পেটা রকমে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু তবুও প্রতাপের চিত্রে, ঐ চিত্রের সুনির্দ্দিষ্ট বহিঃ-সীমার মধ্যেই ঘটনাপরম্পরায় বর্ণবৈচিত্রে ছবিটির বিভিন্ন রেখাগুলি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শক্তসিংহ-প্রহেলিকার সিদ্ধান্তের জন্য ত প্রায় শেষচিত্র পর্য্যন্ত যাইতে হয়।

গড়াপেটা চরিত্র লইয়া কি নাটক হয় না? আমি সে কথা বলি নাই; দুর্গাদাস এবং প্রতাপসিংহ নাটকের প্রভেদ বুঝাইবার জন্য এত কথা বলিলাম। প্রথম চিত্রের দৃষ্টান্তেই আমি তুলনায় সমালোচনা করিয়া দুর্গাদাসকে প্রতাপসিংহের নীচে ফেলিতে চেষ্টা পাই নাই। দুর্গাদাস নাটকের প্রকৃতি স্বতন্ত্র,—উহার নাট্যকৌশল একটু নূতন ধরণের। কথাটা সুস্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছি।

সমুদ্রের প্রকৃতি চিরদিনের মত যেন গড়াপেটা হইয়া রহিয়াছে; একদিন যদি অল্প আলোকে এবং ঈষৎ চঞ্চল সমীরণের উচ্ছ্বাসে উহার সৌন্দর্য্য অনুধ্যান করি, তাহা হইলে ঐ প্রকৃতিতে যাহা দেখি, দীপ্তালোকে হউক, ঝটিকায় হউক, সেই প্রকৃতিরই আশানুরূপ পরিবর্ত্তিত নববৈচিত্র দেখিতে পাই। ঝড়ে তরঙ্গলীলা বাড়ে, কিন্তু মৃদু সমীরণেও সে লীলার পূর্ণ বিরাম নাই। ফেনিলাম্বুরাশির মাহাত্ম্যের চারিদিকে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত, আকাশের মেঘাচ্ছন্নতা ও প্রসন্নতা, তটভূমির দীপ্তি ও অন্ধকার, পবন প্রবাহের ধীরতা ও প্রবলতা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে যায়। ক্ষুদ্র এবং চঞ্চল দৃশ্যগুলির অভিনবত্ব সমুদ্রস্পর্শে অধিকতর নবগৌরব লাভ করে, এবং সৌন্দর্য্যের ঘাতপ্রতিঘাতে, সমুদ্রের স্ফুট মাহাত্ম্য অধিকতর প্রস্ফুটিত হয়। কবি শিলরের Wilhelm Tell খুব উপযোগী দৃষ্টান্ত। কোন্ মহাসাধনা ক্ষেত্রে তাঁহার গুণাবলীর বিকাশ, তাহা জানি না; কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উহার অভিনয় দেখি। সমালোচক যথার্থই বলিয়াছেন, যে ঐ গুণরাশি যেন স্বতঃই বিকশিত ছিল—"Without the help of education or great occasions to develop them"। টেলের চারিপার্শ্বের চরিত্রগুলি উহারই স্পর্শে ফুটিয়া উঠিয়াছে; এবং সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্রগুলির বৈচিত্রের মধ্য দিয়া টেলের একই মহিমা বিবিধভাবে দর্শন করি। টেলের চরিত্র সমালোচনায় কার্লাইল যাহা বলিয়াছেন, দুর্গাদাস সম্বন্ধে সেই কথাগুলি সম্পূর্ণ প্রযুক্ত। ...a deep, reflective, earnest spirit, thirsting for activity, yet bound in by the wholesome dictates of prudence; a heart benevolent, generous, unconscious alike of boasting or of fear; গভীর চিন্তাশীল, উৎসাহী, কর্ম্ম-পিপাসু, অথচ সৎ বিবেচনার নিয়মিত সীমায় বদ্ধ; উপচিকীর্ষু, বদান্য, দাম্ভিকতা বা ভীতির সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত।

নুরজাহান নাটকখানির সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সমালোচনা

করিয়াছি; কিন্তু একটি কথা এখানে বলিবার প্রয়োজন আছে। প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস এবং নূরজাহান; ইহার যে কোন কাব্যেই হউক, মোগলশাসনকালের রাজস্থানের আভ্যন্তরিক ভাব এবং দিল্লীশ্বরদিগের অন্তঃপুরের অবস্থা অতি পরিষ্কাররূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইতিহাসে যে কথা নানা ঘটনা জুড়িয়া লইয়া বুঝিতে হয়, ঠিক সেই কথাই অতি প্রত্যক্ষভাবে চিত্রিত হইয়াছে। আকবরকে কেহ প্রশংসা করে, কেহ বা নিন্দা করে; কিন্তু সম্রাটদিগের রাজ্যভোগের প্রকৃতি, ইতিহাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই প্রদর্শিত হইয়াছে। রাজ্যশাসন ছিল, কিন্তু রাজ্যভোগ এত অধিক মাত্রায় ছিল, যে কাহারো বেলায় ঐ ভোগের উচ্ছ্বাস শাসনের কূলভূমি উপ্‌ছিয়া উঠিয়াছে, কাহারো বেলায় বা কথঞ্চিত সংযমে কূলে কূলে বহিয়া গিয়াছে। একটু ন্যায়পরতার পথে চলিলেই হিন্দুর দেশে শাসনকার্য্য অতি নির্ব্বিবাদে চলিয়া যায়। রাজকার্য্যের পর বিস্তর অবকাশ; এবং সেই অবকাশে অমিত ধনভাণ্ডারের অধীশ্বরেরা নিত্য নূতনবিধ উপায়ে প্রবল ভোগতৃষ্ণা চরিতার্থের জন্য উন্মুখ হইতেন। সুরা সঙ্গীত ও সুন্দরী প্রতিদিনই মোগলের লালসা বর্দ্ধনের জন্য "তাজা ব তাজা, নও ব নও" ছিল। খোসরোজে যাঁহারা জোর করিয়া অপবিত্রতা অস্বীকার করিবেন, তাঁহাদেরও স্বীকার করিতে হইবে, যে পৃথ্বীরাজ ও তান্‌সান্ প্রতিদিনই নবপ্রশস্তি রচনা করিয়া আকবরের স্নায়ুচক্রটাকে উত্তরোত্তর বুভুক্ষু করিয়া তুলিয়াছিলেন। কোন সুখের উপকরণই যখন যথেষ্ট হয় না, যখন ভোগের স্পৃহা অন্নে সানায় না, তখন নরহত্যা করিয়া নূরজাহান সংগ্রহ করিতে হয়। ঐতিহাসিক চিত্রে যাহার রেখাবয়ব পাই, নাটকের চিত্রে তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া ফুটিয়াছে।

কেবল ঐ চিত্রেই নয়; পারিপার্শ্বিক সকল অবস্থাই চিত্রপটের ভিত্তিরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া চিত্রগুলিকে উজ্জ্বল করিয়াছে। এ গেল দৃশ্যপট এবং রঙ্গভূমির বিচার; এখন একবার প্রযুক্ত পাত্রগণের কথা বলিতেছি।

নাটকখানি ঐতিহাসিক হইলেও শক্ত সিংহ এবং দৌলৎ, কবির দুইটি নূতন মনোহর সৃষ্টি। শক্ত সিংহের চরিত্রে স্বাভাবিকতা খুব বেশি। অতিশয় সদাশয় ব্যক্তিও যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষার বিচলিত হইয়া সীমা অতিক্রম করিয়া ফেলে, এটি তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। তাঁহার উদ্বেলিত আকাঙ্ক্ষার তলায়, যে এত আত্মসম্মানবোধ, আত্মনিগ্রহ এবং আত্মবিসর্জ্জন লুকাইয়াছিল, শক্ত সিংহ তাহা নিজেই জানিতেন না। অবস্থা-বৈচিত্রে এবং ঘটনার তাড়নায় যখন তাঁহার অন্তরের প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হইল, তখন অন্ততঃ একমুহূর্ত্তের জন্যও প্রতাপের দীপ্তি মলিন হইয়া পড়িয়াছিল। চতুর্থ অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যের কথা বলিতেছি না; সেখানে ত প্রতাপের গুণমুগ্ধ স্বদেশপ্রেমিক শক্ত সিংহ পরিশ্রান্ত সিংহকে নববল বিধানের উদ্যোগ করিতেছেন। আমি বলিতেছিলাম সেই স্থানের কথা, যেখানে শক্তসিংহ হৃত-সর্ব্বস্ব। সন্ন্যাসী শক্ত সিংহ চিরদিনই নির্ধন; কিন্তু তবুও বিধাতা তাহাকে 'দৌলৎ' দিয়াছিলেন। যিনি দিয়াছিলেন, তিনিই আবার তাহা কাড়িয়া লইলেন;—যে দিন শক্ত বিশেষভাবে সে দৌলতের মাহাত্ম্য বুঝিয়াছিল, সেই দিন কাড়িয়া লইলেন। যে রত্ন হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহারি কথা বলায় লাভ ছিল না; বিশেষ, উহাতে ভ্রাতৃবিরোধের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বুদ্ধিমানদের সে কথা উদারপ্রেমিক শক্তের মনে স্থান পায় নাই। প্রতাপ বলিলেন,—শক্ত, তুমি আমার ভাই নও; কেননা তুমি যবনী বিবাহ করিয়াছিলে। সেই মুহূর্ত্তে একবার শক্ত সিংহের দিকে চাহিয়া দেখ; দেখিবে, প্রতাপপ্রত্যাখ্যাত শক্ত সিংহ ভ্রাতৃবন্ধনের ক্ষুদ্রতা এড়াইয়া সমগ্র বিশ্বজনের ভাই হইয়া দাঁড়াইল। প্রতাপ শক্তের কাছে ছোট হইয়া পড়িলেন।

আর দৌলৎ-উন্নিসা? কবির ভাষায় বলি,—"প্রতাপ তুমি দেবতা বটে, কিন্তু সেও ছিল দেবী।" যে দেশের "থেরি-গাথা" সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে রমণীরচিত সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম সাক্ষী, যে দেশের ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী আদর্শ পত্নীর প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত, শক্তসিংহ-দৌলৎ-মিলনের চিত্র, সেই দেশের কবির তুলিকার উপযুক্ত হইয়াছে বটে। নীচতার ধুলায় এবং সংকীর্ণতার অন্ধকারে আমরা দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছি, তাই এ মিলনের মহিমাময় সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই না। দুর্গাদাস নাটকেও দেখিতে পাই, যে দিলির খাঁ সম্রাটকে হিন্দুর ভবিষ্যৎ বুঝাইতে গিয়া

বলিয়াছিলেন, "তারা একবার ধর্ম্মভেদ, আচারভেদ, জাতিভেদ ভুলে,—নতজানু হ'য়ে, করযোড়ে ভক্তিবাষ্পগদ্‌গদ-স্বরে, এই শ্যামলা সুজলা ভারতভূমিকে, প্রাণভ'রে, মা বলে ডাকুক দেখি!" সম্রাট বুঝেন নাই; আমরাও বুঝি নাই! তাই এই দুর্দ্দশা!

এই নাটকে কবির আর একটি অভিনব সৃষ্টি মেহের-উন্নিসা। স্বপ্নময়ী মেহের, কবির কল্পনায় চির আরাধ্যা কাব্যসুন্দরীর মত, তাহার লাবণ্য-তরঙ্গের অন্তরালে প্রশান্ততা লুকাইয়া রাখিয়াছে। কবি মেথু আর্ণল্ডের ভাষায়—

Such, poets, is your bride, the Muse! Young, Gay,
Randiant, adorn'd outside; a hidden ground
Of thought and of austerity within.

প্রতাপসিংহ নাটকে ঘটনার বহুল সমাবেশ; এবং চরিত্রও অনেকগুলি চিত্রিত। যে কৌশলে এগুলি সুসম্বদ্ধ হইয়া জমাট বাঁধিয়াছে, তাহা অশেষ প্রশংসার জিনিস। লক্ষ্মীর তিরোধানে, যোশীর মরণে, পৃথ্বীর পরিতাপে—যে আলোক অসীম স্পন্দন ও নিবৃত্তিতে বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহাতেই প্রতাপসিংহ ভাস্বর। সকলি একসূত্রে গাঁথা পড়িয়াছে বলিয়া ঘটনাবাহুল্যে এবং চিত্রাধিক্যে কোন দোষ ঘটে নাই।

দুর্গাদাস নাটকে, দিলির খাঁ, কাশেম্, গুলনেয়ার ও মহামায়া, সযত্নে চিত্রিত। নৈষধকারের অতিমাত্রায় অলঙ্কার-ছড়ছড়ির বর্ণনায় আছে, যে দময়ন্তীকে গড়িয়া ব্রহ্মাঠাকুর যখন হাত ধুইয়াছিলেন, তখন হাতের সেই রংটুকুতে পদ্মের জন্ম হইয়াছিল। আমি শ্রীহর্ষ হইলে বলিতাম,—যে কবি যখন মেহের আঁকিয়া তুলিটি ঝাড়িয়াছিলেন, তখন তাহারি ছিটেফোঁটায় চিত্রপটের উপর রাজিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। রাজিয়ায় মেহেরের ফুল্লতা ও দীপ্তি আছে, কিন্তু বর্ণের গভীরতা নাই। মেহের স্বপ্ন; কেননা স্বপ্ন, সৌন্দর্য্য ও চিন্তাময়। কিন্তু রাজিয়া যেন গোলাপী নেশার একটু খানি খেয়াল। রাজিয়ার গায়ে প্রজাপতির রং, কণ্ঠে পাপিয়ার স্বর, এবং সর্ব্বাঙ্গে হরিণীর চঞ্চলতা। কবি এবং বিজ্ঞানবিৎ গ্রাণ্ট এলেন্ যদি উহাকে পরীক্ষা করিতেন, তবে একটু পাগলের ছিটও পাইতেন। মুমূর্ষু মাতার সংবাদ দিতে আসিয়াও সে নিরুদ্বেগে গান শুনিয়া, রাগিণীর ত্রুটি সমালোচনা করিতেছে। কিন্তু কবির নাট্যকৌশলের হিসাবে, রাজিয়ার চিত্রের প্রয়োজন আছে; নহিলে গুলনেয়ারের কবিত্বশূন্য নিরবচ্ছিন্ন ভোগলালসা, ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যাইত না।

গুলনেয়ার সম্বন্ধে অনেকের মনে খট্‌কা লাগিতে পারে। সে ছায়ানাট বুঝিতে না পারুক, বেলা-মোতিয়া-চম্পায় শব্দাতীত সুরগরিমা বুঝিতে না পারুক, কিন্তু কোন জড়-প্রাণা মহাপাপিষ্ঠাও কি স্বামীর মুখের উপর জোর করিয়া অপরের প্রতি আসক্তির কথা বলিতে পারে? চরিত্রের অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতায় লোক উন্মাদ হয়; কিন্তু অতিমাত্র লালসার উন্মত্ততায়ও অত বড় বাদসাহের মুখের উপর অমন কথা বলা স্বাভাবিক কি? কিন্তু পাতসাহের মুখে শুনিতেছি যে গুলনেয়ার অতিমাত্র মদ্যপান করিয়াছিল।

মহামায়ার চরিত্র অতি সুন্দর অঙ্কিত হইয়াছে। সে যখন গুলনেয়ারকে ক্ষমা করিল, তখনো তাহার প্রাণে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলিতেছিল। ইহাই স্বাভাবিক। তেজস্বিনী মহামায়া নারী,—দেবী নহেন; কিন্তু নারী হইলেও তিনি অসাধারণ নারী। যে দর্পে তিনি শিশু-ক্রোড়ে, অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিয়াছিলেন, স্বয়ং দিলির খাঁ তাহার সাক্ষী। রাজস্থানে যাহা সত্য সত্য ঘটিত, তাহার চিত্র "আদর্শ মাত্র" বলা চলে না।

দিলির খাঁ নির্ভীক বীরপুরুষ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, উদার এবং মহৎ। যোদ্ধার স্নায়ুজালে ও মস্তিষ্কচক্রে, এ গুণসমূহের যুগপৎ বিকাশ বিসম্বাদী নহে কিন্তু দিলিরের মাহাত্ম্য, তাঁহার সকল গুণের অন্তরালস্থিত কবিত্বেই সমধিক উদ্ভাসিত। ঔরংজেব, দিলিরকে কাপুরুষ বলিয়া ব্যঙ্গ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন; কিন্তু উদার ও নির্ভীক দিলির তাহাতে টলিলেন না। দিলির খাঁ ব্যঙ্গ বুঝিয়াই স্বীকার করিলেন, যে সৈন্যেরা মহামায়াকে ধরিতে পারিল না; এবং নিজের কথা কবিত্বের ভাষায় বলিলেন:—"দেখ্‌লাম, সে এক মহিমাময় দৃশ্য। আলুলায়িতকেশা নারী; বুকের উপর ঘুমন্ত শিশু! নির্ম্মেঘ উষার চেয়ে নির্ম্মল, বীণার ঝঙ্কারের চেয়ে সঙ্গীতময়, ঈশ্বরের নামের চেয়ে পবিত্র,—সেই মাতৃমূর্ত্তি।" "ঈশ্বরের নামের চেয়ে পবিত্র", কথাটায়

কাহারো আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু বুঝিতে হইবে যে কবিত্বের ভাষায় ব্যঙ্গকারীকে দিলির ঐ কথা বলিয়া বুঝাইয়াছিলেন। তাঁহার জাঁহাপনা সরলবিশ্বাসী বটে; কিন্তু নিতান্ত সরলবিশ্বাসীর ঈশ্বর, পুতুলের একটু অল্প উপরে। কাজেই একটা জীবন্ত যথার্থতা সেই সংকীর্ণ নাম অপেক্ষা পবিত্র বইকি? ক'জনের কাছে ঈশ্বরের নাম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অসীমতায় এবং বিশ্বপ্রীতির অফুরন্ততায় প্রভাসিত হয়?

আর একটি কথা—ধর্ম্মটা শাস্ত্র নয়, গবেষণা নয়, দর্শন-গ্রন্থের মত নয়। জীবনই ধর্ম্ম,—মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যে পবিত্রতা এবং মহত্বের প্রত্যক্ষ অভিনয় দেখি উহাই ধর্ম্ম। এই জন্যই দিলির খাঁ দুর্গাদাস ও কাশেমকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—"স্বর্গে যাঁরা দেবতা আছেন শুনি, তাঁরা কি এদের চেয়েও বড়?" দিলির খাঁটি সোণা; এবং খাঁটি ভিন্ন কথনো মেকি দেখিয়া ভুলিত না।

দিলির খাঁ মহৎ, দুর্গাদাস মহৎ, দরিদ্র কাশেম মহৎ; এখন কথা এই, যে দিলির খাঁ, দুর্গাদাস ও কাশেমের মধ্যে দেবতা কে? দুর্গাদাস এবং দিলির খাঁ ধর্ম্মপ্রাণ, তেজস্বী, উদারপ্রকৃতি, এবং বীর; কাজেই তাঁহারা সাধক, দেবতা নহেন। কিন্তু উচ্চআকাঙ্ক্ষাহীন, স্বার্থের কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা-শূন্য কাশেম, নিঃস্ব অথচ পরার্থপর কাশেম, কর্ত্তব্যের অবতার, ও করুণার মূর্ত্তি। তিনিই দেবতা। দেবতা কদাপি স্বর্গের সিংহাসনে বসিয়া থাকেন না; তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ফেরেন, নর-সেবা করিয়া ফেরেন।

প্রতাপসিংহ এবং দুর্গাদাস কিয়ৎপরিমাণে তুলনায় সমালোচিত হইয়াছে। তুলনায় আর একটি কথার উল্লেখ করিব। দুখানি নাটকই এক শ্রেণীর আত্মরক্ষা এবং যুদ্ধ ঘটনা লইয়া লিখিত; কিন্তু দুর্গাদাসে কর্ম্মসমারোহের ব্যস্ততা, ক্ষিপ্রকারিতা এবং কাজেই সংক্ষিপ্ততা অধিক;—অন্যদিকে প্রতাপসিংহ নাটকে কর্ম্মের গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর। দুর্গাদাস সদর্পে সম্রাটের সভা হইতে বাহির হইলেন, অমনি দিলিরের সসৈন্য যাত্রা, যশোবন্তের শিশু পুত্র লইয়া কাশেমের পলায়ন, অশ্বপৃষ্ঠে মহামায়ার প্রয়াণ প্রভৃতি দৃশ্যের পর দৃশ্যে নিয়ত উৎসাহের প্রবাহ ছুটিতেছে, কুত্রাপি বিশ্রাম নাই। এই জন্য সম্ভবতঃ দুর্গাদাস নাটক রঙ্গমঞ্চে দর্শকদিগের অধিক তৃপ্তিবিধান করিতে পারে।

কর্ম্মের গতি, উৎসাহের প্রবাহ, বিপদের বাত্যা প্রতাপসিংহেও আছে, কিন্তু যোদ্ধারা রাত্রি দিনই যুদ্ধ করিতেছে না; শক্তের সমস্যা পূরণে, ইরার সূর্য্যাস্ত দর্শনে, আকবরের মন্ত্রণায়, অনেক অবসর আছে। রণক্ষেত্র এবং মন্ত্রণাগারের বাহিরে একটু কবিতা পড়ার সময়ও আছে। পৃথ্বীরাজের 'প্রথম চুম্বনের' কবিতা লইয়া বড় বড় রাজা মহারাজাও একটু সময় কাটাইতে পারেন। সৈন্যের ছাউনিতেও দৌলৎ প্রেমে মজিতে পারে, এবং মেহের তাহার জীবনের স্বপ্ন ঘনাইয়া তুলিতে পারে। রাজিয়ার "চামেলিয়া বেলা চম্পায়" যে অর্থ ধরা যায় না, এ কথা বুঝিবার জন্য দুর্গাদাস নাটকে কেহই বসিয়া নাই; সকলেই আপনার কর্ম্মে, আপীসের বাবুর মত যেন নাকে মুখে দুটি গুঁজিয়া ছুটিতেছে। গতির মন্থরতায় প্রতাপসিংহ ভাবুক পাঠকের বেশি প্রিয়, ঘরে বসিয়া ধীরে ধীরে পড়িলে এই গ্রন্থে কবিত্বরসাস্বাদন করিবার সুবিধা অধিক। ইরা, মেহের, দৌলৎ এবং শক্তসিংহের অনেক উক্তি জমাটবাঁধা গীতি-কবিতা; অনেকগুলি ফিরিয়া ফিরিয়া পড়িতে ইচ্ছা হয়। রাজিয়াতে ঝঙ্কার আছে, কিন্তু সেটা ধরিয়া লইয়া কেহ গীতি গড়ে নাই; কমলার গীতিত বঁড়শির টোপ, এবং যিনি টোপ ফেলিয়াছেন, তিনি স্বামীগ্রাসের ব্যস্ততায় উদ্‌ভ্রান্তা। কর্ম্মক্ষেত্রের জীবন্ত ছবির হিসাবে দুর্গাদাস সুরচিত; এবং এই শ্রেণীর নাটকই, অভিনয়ের পক্ষে বেশী উপযোগী।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ইবনে বতুতার ভারত ভ্রমণ।

(পূর্ব্বভাষ।)

আবদুল্লা অল মহম্মদ লাওয়াতি তানজি ওয়ফে ইবনে বতুতা ৭০৩ হিজিরার (১৩০৩ খৃষ্টাব্দে) ১৭ই রজব সোমবার দিবসে মরক্কো রাজ্যের তানজির নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লা। দ্বাবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে হজব্রত ও দেশ পর্য্যটন উদ্দেশ্যে বৃদ্ধ পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, জীবন সহচর বন্ধুবান্ধবের স্নেহ-মমতা-পাশ ছিন্ন করিয়া, একাকী নিঃসহায় অবস্থায় ৭২৫ হিজিরার ২রা রজব বৃহস্পতিবার দয়াময় অনাথ সহায়ের নাম স্মরণ করিতে

করিতে জন্মভূমি হইতে বিদায়গ্রহণ করেন। তিনি ভূমধ্য সাগরোপকূলস্থ সমুদয় নগর পল্লী একে একে পরিভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে মিশরে আসিয়া উপনীত হন। পুণ্যভূমি মক্কা পরিদর্শন আশা হৃদয় মধ্যে অধিকতর বলবতী হওয়ায়, আদন বন্দরের অনতিদূরে অবস্থিত আয়জাব বন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আশা ছিল, এই স্থানে অর্ণবপোতে আরোহণপূর্ব্বক আদন বন্দরে উপনীত হইবেন কিন্তু তাঁহার সে আশা ফলবতী হইল না। এই স্থানের রাজা মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় তথায় জাহাজ না পাইয়া অগত্যা তাঁহাকে মিসরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। ৭২৬ হিজিরার শাবান মাসে তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে দামস্কে উপনীত হন; তথায় তিনি কিছু দিন অবস্থান করিয়া হাদিস সরিফ শিক্ষা করেন। এ সময়েও মুসলমানগণের মধ্যে বিদ্যার যথেষ্ট সমাদর ছিল, এমন কি, স্ত্রীলোকগণের মধ্যেও বিদুষীর অভাব ছিল না। এই সময়ে বিদ্যালঙ্কারবিভূষিতা সদ্‌গুণশালিনী দুইটী বিদুষী মহিলা তথায় বাস করিতেন। একজন কামালদ্দিনের কন্যা নাম জয়নব, অপর জন মহম্মদের কন্যা আয়শা। ইঁহারাও বতুতার বিদ্যাশিক্ষার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

৭২৬ হিজিরার শওয়াল মাসে তিনি স্থানীয় হজযাত্রিগণ সমভিব্যাহারে মক্কা ও মদিনাভূমে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার বহুদিবসের পোষিত আশা পূর্ণ করেন। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধিত হইলে তিনি আরব-সমাগত আজমবাসিগণের সহিত ইরাক যাত্রা করেন। ইরাকে হজরত আলীর কবর জিয়ারত করিয়া বোগদাদে উপস্থিত হন। অতঃপর তিনি ওয়াছেত হইয়া রওয়াকে আগমন করিয়া শেখ আহাম্মদ রাফায়ির কবর জিয়ারত করেন। তৎপরে বাসারা পথে পুনঃ ইরাকে উপনীত হন। এস্থলে কিছু দিন অবস্থান করিয়া বতুতা ইস্পাহান অতিক্রম পূর্ব্বক প্রসিদ্ধ সিরাজ নগরে আগমন করেন। সিরাজ ভ্রমণকালে তিনি প্রসিদ্ধ তাপস শেখ আবু অবদুল্লা খফিক ও ধর্ম্মাত্মা কবি শেখ সাদির পবিত্র সমাধি দর্শন করতঃ গাজরুন * বন্দরে উপস্থিত হন। তথা হইতে ইরাক, কুফা ও অবশেষে বোগদাদ গমন করেন। বোগদাদ এক সময়ে উম্মিয়া বংশীয় খলিফাদের পরম রমণীয় রাজধানী ছিল, কিন্তু প্রকৃতির চিরন্তন নিয়মে এই বংশের বিলোপ পাইলেও এই নগরের সৌন্দর্য্য তখনও নষ্ট হয় নাই। বোগদাদ হইতে মোসাল ও মারদিন পথে তিনি দ্বিতীয় বার হজ করিতে মক্কায় আগমন করেন। তথায় একবৎসর বাস করেন, পরে চতুর্থ বার হজ শেষ হইলে জেদ্দায় উপস্থিত হইয়া জলপথে লোহিত সাগর হইতে জাঞ্জিবার, মোম্বাসা পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পুনরায় আদন বন্দরে উপস্থিত হন। তথা হইতে আফ্রিকার পূর্ব্বাংশ ভ্রমণ করিয়া আরবের উত্তর ও রুশিয়ার দক্ষিণস্থ স্থান সমূহ একে একে পরিদর্শন করিতে করিতে দৃঢ়ব্রত বতুতা ইস্তাম্বুলে আগমন করেন। এবং তথা হইতে খোরাসান, বোখরা, সমরকন্দ, বাল্‌খ, হিরাত ও নিসাপুর নগরসমূহ পরিদর্শন করিয়া কাবুল রাজ্য পরিভ্রমণ পূর্ব্বক হিন্দুকুশ পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া সিন্ধুনদের তটে উপনীত হন। ভুবনপ্রসিদ্ধ পর্য্যটক ইবনে বতুতা এইরূপে হিন্দুস্থান, মালদ্বীপ, সিংহল, সুমাত্রা, চীন, আরব, ইরান, শ্যাম, মিসর, ইস্পাহান, মরক্কো প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণে ২৫ বৎসরকাল অতিবাহিত করেন। তিনি হিন্দুস্থান ও অন্যান্য স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আরবিভাষায় যে সকল বিষয় ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা সেই মূল গ্রন্থের যথাযথ অনুবাদ প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১। সিন্ধুনদ। ৭৩৪ হিজিরার মহরম মাসের প্রথম দিবসে—সিন্ধুনদোপকূলে * উপনীত হই। সিন্ধুনদ

* পার্শিভাষায় গাজর ঘোপাকে বলে। পারস্যের টাব নদীর তীরে বহু ঘোপা অবস্থান করিত। সেই জন্য লোকে এই স্থানকে গাজরুন বলিয়া থাকে।

* সিন্ধু শব্দের অর্থ বড় নদী। আর্য্যগণ পশ্চিমদিক হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গমনকালে সম্মুখে যে নদীকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় দেখিয়াছিলেন, তাহাকেই সিন্ধু নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। সেই অনুসারে তটবর্ত্তী ভূভাগকে সিন্ধু নামে অভিহিত করা হয়। পারস্যবাসী সিন্ধুপ্রদেশকে হিন্দ ও সিন্ধু নদীকে সিন্ধ নামে অভিহিত করেন। ভ্রমক্রমে কোন কোন ইতিহাসবেত্তা বলেন যে, হজরত নুহ আলায়হেস্সালামের সিন্ধ নামক এক পুত্র সিন্ধুপ্রদেশ অধিকার করেন, সেই জন্য ইহাকে সিন্ধ বলে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

পাঞ্জাব* নামেও অভিহিত। পৃথিবীর অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ নদনদীর মধ্যে ইহাও একটী বৃহৎ জলপ্রবাহ। মিসর প্রবাহিত নীলনদ† মধ্যে মধ্যে স্ফীত হইয়া উহার তটবর্ত্তী ভূভাগ যেমন কৃষি কর্ম্মের উপযোগী করিয়া তুলে, তদ্রূপ সিন্ধুনদও গ্রীষ্মকালে স্ফীত হইয়া তটভূমি প্লাবিত করতঃ ইহার শস্যোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে। এই নদতট হইতে সম্রাট মহাম্মদ তোগলকের রাজ্য আরম্ভ। কোন প্রবাসী এস্থানে উপস্থিত হইলে সম্রাটের স্থানীয় সংবাদদাতা তাহার নিকটে আগমন পূর্ব্বক এদেশে আসার কারণ জ্ঞাত হইয়া—বাদসার নিকটে সংবাদ প্রেরণ করেন। আমি এইস্থানে যে সময়ে পৌঁছিয়াছিলাম, সেই সময় জনৈক সংবাদদাতা আমার নিকটে আগমনপূর্ব্বক আমার আগমনের কারণ ও তাঁহার জ্ঞাতব্য অন্যান্য বিষয় (আমার চেহারা, পোষাক পরিচ্ছদ, লোকজন সঙ্গে আছে কি না ইত্যাদি) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া, সুলতানের বিচারকর্ত্তা কুতবল্ মালেকের সমীপে তৎক্ষণাৎ সংবাদ প্রেরণ করিলেন। এমাদুল মুলুক সেরেতেজ‡ এই সময়ে সিন্ধুর বিচারকর্ত্তা ছিলেন। ইনি প্রথমে সম্রাটের সেবায় নিযুক্ত হন, কিন্তু সৌভাগ্যগুণে কালক্রমে সে পদ হইতে উন্নীত হইয়া সৈন্যগণের বেতন বণ্টনের ভার প্রাপ্ত হন। তথায় আমার উপস্থিতিকালে তিনি সেওস্থানে অবস্থিতি করিতে ছিলেন।

২। ডাকের নিয়ম। সেওস্থান হইতে মুলতান দশ দিবসের পথ ও মুলতান হইতে দিল্লী ৫০ পঞ্চাশ দিবসের পথ। কিন্তু ডাকযোগে সেওস্থান হইতে দিল্লিতে পাঁচ দিবসে সংবাদ পঁহুছে। এদেশে ডাককে বুরিদ* বলে। ডাক দুই প্রকারের, মনুষ্যের ও ঘোড়ার। মনুষ্যের ডাককে "দাওয়া" বলে। একক্রোশের মধ্যে তিনজন মনুষ্যে ডাক লইয়া যায়। প্রত্যেক ক্রোশ† অন্তরে এক একটী গ্রাম স্থাপিত। গ্রামের বাহিরে—হরকরার অবস্থিতির জন্য এক একটী গৃহ নির্দ্দিষ্ট আছে। তথায় এক একজন হরকরা আছে। প্রত্যেক হরকরার নিকট দুইগজ লম্বা একটী লাঠী ও লাঠীর অগ্রভাগে তাম্র নির্ম্মিত ঘুঙুর বান্ধা আছে। হরকরার একহস্তে ঐ লাঠি ও অপর হস্তে লম্বিত ব্যাগ, এই অবস্থায় সে দৌড়িতে আরম্ভ করে। অপর হরকরা দূরে হইতে তাহার ঘুঙুরের শব্দ শুনিয়া প্রস্তুত হয়। এবং ডাক পৌঁহছিবা মাত্র সে তাহার নিকট হইতে ব্যাগ ও লাঠী লইয়া দৌড়িতে আরম্ভ করে। এই প্রকারে অতি অল্প দিবস মধ্যেই বাদসার নিকট সংবাদ পঁহুছান হয়। ঘোড়ার ডাক অপেক্ষা মনুষ্যের ডাকে অল্প সময়ে সংবাদ পৌঁহুছে। এমন কি, সময়ে সময়ে বাদসাহের জন্য খোরাসান হইতে টাটকা টাটকা ফলও এই ডাকে আনীত হইত। ঘোড়ার ডাককে

---

* শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা এই পাঁচটী উপনদী সিন্ধুনদের সহিত মিলিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে পঞ্চনদ বা পঞ্জাব (পঞ্চ-আব) বলা হয়। মোগল অধিকার কালে সিন্ধুনদীকে পঞ্জাব বলা হইত। যে সময়ে নাসিরুদ্দিন কাবাচা সিন্ধুনদে জলমগ্ন হন, সেই সময় বাদায়নি তাঁহার উল্লেখচ্ছলে বলিয়াছেন (নাসিরুদ্দিন দার পঞ্জাব গরিক বাহারে ফানাগাস্ত) অর্থাৎ "নাসির পঞ্জাব জলে পেয়েছে বিলয়।" ইহার দ্বারা প্রতীতি হয় যে, সিন্ধুনদকে পঞ্জাব বলা হইত।

† নীলনদী, ভিক্টোরিয়া নিয়ানজা হ্রদ হইতে বহির্গত হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩০০০ তিন হাজার মাইল। ইহা ১৭ই জুন হইতে স্ফীত হইতে আরম্ভ হইয়া আগষ্ট মাসে এত অধিক স্ফীত হয় যে, ইহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহ একেবারে জলমগ্ন হইয়া যায়। গ্রামবাসী কাঠের মাচা প্রস্তুত করিয়া তথায় আশ্রয় লয়। ইহার প্লাবনে মিসরবাসী প্রভূত উপকার পাইয়া থাকে, যেহেতু মিসরে, কখন বৃষ্টি হয় না। নীলনদের প্লাবনে উভয় পার্শ্বের ভূমি জলমগ্ন হইয়া কৃষি-কর্ম্মোপযোগী হইয়া থাকে।

‡ সেরেতেজ কোন একটী সম্প্রদায়কে বলিয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোক দেখিতে তুর্কেদের মত। এমাদুল মুলুক এই দলভুক্ত ছিলেন। ইনি ভাগ্যবলে মহাম্মদ সাহ তোগলকের জামাতা ও সেনাধ্যক্ষ হন। ৭৪৮ হিজিরায় দাক্ষিণাত্যে হোসেন বাহমনির সহিত যুদ্ধে ইনি প্রাণত্যাগ করেন।

* আরবী ভাষায় বুরিদ শব্দে কাসেদ ও ১২ মাইল দূরত্বকে বুঝায়। তুর্কি ভাষায় ওলাগ ও পারসী ভাষায় চাপার বলে।

† ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারে ক্রোশের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ করা হয়। পশ্চিম ভারতের ক্রোশ ইংরাজী ১¼ মাইল গঙ্গার তীর ভূমে ২½ মাইলে ক্রোশ এবং বুন্দেলখণ্ড ও দাক্ষিণাত্যে ৪ মাইলের ক্রোশ ধরা হইত। বতুতা ও তাঁহার সমসাময়িক ইতিহাসবেত্তা মার্কো পোলো কোন স্থানের দূরত্বের উল্লেখ কালে কেবল "মনজেল" শব্দের সন্নিবেশ করিয়াছেন কিন্তু মনজেলের পরিমাণ কত তাহার সবিশেষ কিছুই উল্লেখ করেন নাই। দিল্লী হইতে দৌলতাবাদের দূরত্ব ৮০০ মাইল কিন্তু ইহাকে চল্লিশ দিনের পথ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে ১০ ক্রোশে এক মনজেল বুঝায়। দিল্লী হইতে মুলতান কোন প্রকারেই ৫০০ শত মাইলের অধিক নহে, কিন্তু বতুতা ইহা ৫০ দিনের পথ বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেওস্থান হইতে মুলতান ৪৮৫ মাইল, কিন্তু তিনি ১০ দিনের পথ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং বতুতা দূরত্ব নির্দ্দেশ করিবার কালে যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

"আওলাক" বলে। প্রত্যেক চারিক্রোশ অন্তর ঘোড়া বদলান হইয়া থাকে। আমি যে সময়ে দৌলতাবাদে ছিলাম, সে সময়ে বাদসার জন্য ডাকযোগে গঙ্গার জল আসিতে দেখিয়াছি। বাদসাহ সেই জল পান করিতেন। গঙ্গাতীর হইতে দৌলতাবাদ ৪০ দিনের পথ।

৩। প্রবাসীর সম্মান। কোন পথিক মুলতানে উপস্থিত হইলে তাহাকে বাদসার হুকুম না আসা পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিতে হইত। যে যে প্রকার লোক, তাহাকে সেই প্রকার সম্মানের সহিত রাখা হইত। হিন্দের বাদসা মহাম্মদ তোগলক বিদেশীদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করেন এবং তাঁহাদিগকে বিবিধ প্রকারের উচ্চ পদ প্রদান করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তাঁহার জামাতা ও মন্ত্রী বিদেশী। বাদসাহ আপনার কর্ম্মচারী ও প্রজাবর্গকে আদেশ দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যেন সাধ্যপক্ষে প্রবাসীর সেবা শুশ্রূষা ও মনোরঞ্জন করিতে ত্রুটী না করেন।

কোন বিদেশী বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক হইলে তৎকালীন প্রথানুযায়ী এবং দর্শনেচ্ছু ব্যক্তির অবস্থানুসারে তাহাকে কোন না কোন প্রকারের উপঢৌকন বাদসাহের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইত। বাদসাহ তাহা গ্রহণ করিয়া, তাহার ২।৩ গুণ বা ততোধিক মূল্যের দ্রব্যাদি প্রতিদান করিতেন। বিদেশীয় সওদাগরগণ এবম্প্রকারে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। সিন্ধু প্রদেশে উপস্থিত হইলে, আমারও ঐরূপ করিতে ইচ্ছা হওয়ায়, তকরিত বাসী * মহম্মদ দূরী নামক জনৈক সওদাগরের নিকট হইতে, গোলাম, উষ্ট্র, ত্রিশটী অশ্ব ও ইহাদের জন্য বিবিধ কারুকার্য্য শোভিত, চিত্র বিচিত্র—গাত্রাবরণ ক্রয় করিয়া সওদাগরকে বলিলাম, "আপনি দিল্লীতে আগমন করিলে ইহার সমুদয় মূল্য এককালে পরিশোধ করিব।" সওদাগর আমার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অণুমাত্রও ইতস্ততঃ না করতঃ সমুদয় জিনিষ ছাড়িয়া দিলেন। পরে তিনি দিল্লীতে আগমন করিলে আমি তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য মূল্য পরিশোধ করিয়াছিলাম।

* তকরিত বোগদাদের নিকটবর্ত্তী এক পল্লী।

৪। গণ্ডার। সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া পথিমধ্যে কোন বাঁশের জঙ্গলের নিকট উপস্থিত হই। ইতিপুর্ব্বে কখন বাঁশ দেখি নাই, কারণ আমাদের দেশে ইহা জন্মে না। এই জঙ্গলের মধ্য দিয়া সাধারণের যাতায়তের পথ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, হঠাৎ একটী গণ্ডার * আমার দৃষ্টি গোচর হয়। ইতিপুর্ব্বে গণ্ডার কখন দেখি নাই। একজন অশ্বারোহী আমার অগ্রে অগ্রে অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু সে হঠাৎ ইহার সম্মুখে পতিত হওয়ায় সেই গণ্ডারটী তাহার শৃঙ্গের দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহার অশ্বটী বিদীর্ণ করিয়া জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিল। আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। এই স্থানে এক দিন বৈকালে আর একটী গণ্ডার ঘাস খাইতেছে দেখিতে পাইলাম। আমি ইহাকে মারিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু সে তাহা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ জঙ্গল মধ্যে পলাইয়া গেল। কোন সময়ে আমি দিল্লীর সম্রাট তোগলক সাহের সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ বহির্গত হই। মৃগয়া শেষে একটা গণ্ডারের মস্তক রাজধানীতে আনয়ন করা হইয়াছিল।

৫। জানানি। অনন্তর দুই দিবস চলার পর—সিন্ধুতীরে অবস্থিত জানানি † সহরে উপনীত হই। সহরটী বেশ

* সচরাচর দুই জাতীয় গণ্ডার দেখিতে পাওয়া যায়, একজাতীয় একশৃঙ্গ বিশিষ্ট। ব্রহ্মপুত্রের তীরে ও আফ্রিকা অঞ্চলে ইহাদের আবির্ভাব। সুমাত্রা, যাবা প্রভৃতি স্থানে আর এক জাতীয় গণ্ডার দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাদের দুইটী শৃঙ্গ আছে; চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মদেশে ইহাদিগকে কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা কর্দ্দমে পড়িয়া থাকিতে ভালবাসে। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা কাজ্‌দিনি ইহাদিগকে "কারকান্দ" নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহারা আকৃতিতে হস্তীর সমতুল্য। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, ইহারা মহিষ অপেক্ষা বৃহৎ, হস্তী অপেক্ষা আকারে অনেক ক্ষুদ্র। ইহার চর্ম্ম এরূপ কঠিন ও স্থূল যে অতি তীক্ষ্ণ ছোরা কিম্বা তরবারির ধারে তাহা ভেদ করা যায় না। পুরাকালে গণ্ডারের চর্ম্মে ঢাল নির্ম্মিত হইত। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, গণ্ডারের শৃঙ্গনির্ম্মিত পাত্রে বিষ কিম্বা কোন বিষাক্ত দ্রব্য রাখিলে উহা তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া যায়। আরও শুনা যায় যে, ইহার শৃঙ্গনির্ম্মিত কোন দ্রব্য বিষাক্ত দ্রব্যের নিকট রাখিলে তাহার বিষশক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

† অধুনা এ নামে কোন সহরের নাম শুনিতে পাওয়া যায় না বা আছে বলিয়া বোধ হয় না। আইন আকবরীতেও "জানানি" নামীয় কোন সহরের উল্লেখ নাই। সিন্ধুতীরস্থ ঠেঠ (Thatha) সহর হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত শামীনগরে সামারা জাতির বাসস্থান। মহম্মদ তুর নগরেও সামারা জাতির বাস ছিল। ইহাও ঠেঠের নিকটবর্ত্তী। তবে বোধ হয় সিন্ধুনদের দক্ষিণতীরের কোন স্থানে জানানি সহর অবস্থিত ছিল। পরে প্রকৃতির চিরন্তন নিয়মে কুটিল কালচক্রে এই সহর ধ্বংস হইয়া অতীতের গর্ভে ইহার নামটী পর্য্যন্ত নিমজ্জিত হইয়াছে।

সুন্দর। বাজারগুলি অতি সুন্দর রূপে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। এই সহরে সামারা নামক এক জাতীয় লোকের বাস দেখিলাম। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যে সময়ে হেজাজ বেন ইউছফ সিন্ধুপ্রদেশ জয় করেন, সেই সময়ে সামারা জাতির আদি পুরুষ এই সপুরে বাস করিতেন। মুলতান নিবাসী সেখ বাহা উদ্দিনের বংশধর শেখ রুকুনদ্দিন† এক সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যে সময়ে হেজাজ, সিন্ধু জয় করিবার আশায় মহম্মদ বেন কাসেমের সাহায্যার্থ এরাক হইতে সৈন্য প্রেরণ করেন, সামারা জাতির আদি পুরুষ সেই সময়ে সৈনিকরূপে এদেশে আগমন করেন, এবং যুদ্ধান্তে তিনি অন্যান্য সৈনিকগণের সহিত স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া, বিবাহাদি করিয়া এ স্থানে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। এই সহরের অধিকাংশ অধিবাসী তাঁহার বংশধর। অন্য কোন জাতির সহিত ইহারা সম্পর্ক স্থাপন করিতে চায় না। এমন কি তাহাদের সহিত একত্রে ভোজনও করে না। তাহাদের মধ্যে যদি কেহ তাহাদের জাতীয় বন্ধন লঙ্ঘন করিয়া অন্য কাহারও সহিত গোপনে একত্রে আহার করে এবং এই সংবাদ যদি এই সম্প্রদায়ের কোন বক্তি বিশিষ্টরূপে অবগত হয়, তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ জাতিচ্যুত করা হয়। আমার ভারতাগমন কালে ওমর এই জাতির সর্দ্দার (প্রধান পুরুষ) ছিলেন। পশ্চাৎ ইঁহার পরিচয় দিব। আর একটী কথা বলিয়া রাখি ইসকান্দারিয়ায় আমার আগমনকালে, সেখ বোরহান উদ্দিন এমরাজ যাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিলেন, ইনি সেই রুকুনদ্দিন।

৬। সেওস্থান বা সেওয়ান।* জানানী সহর হইতে সেওস্থান গমনকালে পথি মধ্যে একজন সঙ্গী ও আমার অনুগামী হন। সেওস্থান একটী বৃহৎ সহর। অধিবাসিগণ অধিক পরিমাণে খরবুজার চাষ করিয়া থাকে। উহাদের খাদ্য দ্রব্য মধ্যে রুটীই প্রধান। বিদেশ হইতে অপর্য্যাপ্ত কাবুলী মটর ও জুনার আমদানী হইয়া থাকে। অধিবাসিগণ ইহারই রুটি খাইয়া জীবন ধারণ করে। মহিষের দুগ্ধও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মৎস্যও যথেষ্ট। যে সময় আমি এ স্থানে আগমন করি সে সময় দারুণ গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব। এই সময়ের প্রখর সূর্য্য উত্তাপ আর সহ্য করিতে না পারিয়া পথি মধ্যেই আমার সঙ্গীটী গাত্র বসন উন্মোচন করতঃ জলে রুমাল ভিজাইয়া দেহ আবৃত করিতেন। এবং অন্য একটী সিক্ত রুমাল স্কন্ধে রাখিয়া দিতেন। যখন গাত্র আবৃত সিক্ত রুমালটী সূর্য্য তাপে শুষ্ক হইয়া যাইত তখন অন্য সিক্ত রুমালটী দ্বারা পুনরায় দেহ আবৃত করিতেন। সম্মুখে জল পাইলে শুষ্ক গামছাটী পুনরায় সিক্ত করিতেন। এইরূপ ভাবে বহু কষ্টে উভয়ে সহরে প্রবেশ করিয়া একটী মসজিদে উপস্থিত হইলাম। মসজিদের খতিবের নাম শিবানী। পরিচয়ে জানিতে পারিলাম তাঁহারা পুরুষানুক্রমে খতিবের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার প্রপিতামহ প্রথম খতিব পদে নিযুক্ত হইবার কালে খলিফা আমিরুল মোমেনিন ওমর ইবনে আবদুল আজিজের নিকট হইতে একখানি সনন্দ প্রাপ্ত হন। তিনি ঐ সনন্দ খানি আমাকে দেখাইলেন। ৯৯ হিজিরায় খলিফা নিজ হস্তে সনন্দ খানি লিখিয়া ছিলেন। শেখ মহাম্মদ বোগদাদী নামক জনৈক বয়ঃপ্রাপ্ত বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ লাভ হইল। এই সময়ে তাঁহার বয়স ১৪০ বৎসরেরও অধিক। যদিচ তাঁহার বয়স অধিক হইয়াছে বটে তথাপি শরীর সবল রহিয়াছে। যথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতেছেন। সেখ মর্মজী নামক স্থানীয় লোকের আবাসে

---

† সেখ বাহা উদ্দিন জিকরিয়া আল কোরেশী মুলতানীর পূর্ব্বপুরুষ ৯৮ হিজিরায় মহাম্মদ বেনে কাসেমের সৈন্যদলসহ হিন্দুস্থানে আগমন করেন। কিন্তু ফেরেস্তা বলেন, "সেখ বাহা উদ্দিনের পিতামহ সেখ কামালুদ্দিন কোরেশী মক্কা হইতে ইরানে উপনীত হন, পরে তথা হইতে মুলতানে আগমন করিয়া কোটক্রোর নিবাসী মওলানা হেসামদ্দিন তারমজির কন্যার সহিত নিজ পুত্র ওজিহ উদ্দিনের উদ্বাহ ক্রিয়া সমাপন করেন। তাঁহারই ঔরসে ৫৭৮ হিজিরায় সেখ বাহা উদ্দিন জিকরিয়ার জন্ম হয়। কালে ইনি একজন যোগিশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। ইনি সেখ সাহরাবর্দ্দি সিদ্দিকার সমীপে থাকিয়া ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ করিতে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। ৬৬৬ হিজিরায় ইঁহার লোকান্তর ঘটে। অদ্যাপিও মুলতান কেল্লা বক্ষে ইঁহার সমাধি, মানব মনে অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। ইহা মুসলমানগণের একটী বিখ্যাত তীর্থস্থান। এই স্বনাম ধন্য যোগিশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বাহা উদ্দিন, সেখ রুকুন উদ্দিনের পিতামহ।

* সেওস্থান বা সেওয়ান। এই নামের একটী জনপদ করাচি বন্দরের ১৯০ মাইল দূরে এখনও রহিয়াছে। প্রায় পাঁচ সহস্র লোকের বাস। এই সহরে সাহাবাজকলন্দরের সমাধি রহিয়াছে। ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে সহরটী স্থাপন হয়। কথিত আছে এই সহরের দুর্গটী সম্রাট সেকেন্দরের নির্ম্মিত ছিল। সহরের নিকটে একটী জলপূর্ণ ঝিল রহিয়াছে। মৎস্যজীবিগণ এই ঝিলের নিকট বাসস্থান নির্ম্মাণ করতঃ মৎস্য ধরিয়া বিক্রয় করে। বর্ষাকালে ঝিলটী প্রায় ১০মাইল পর্য্যন্ত জলে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

অবস্থান করেন। বৃদ্ধ বলিতেছিলেন যে সময় চাঙ্গেজ খাঁএর পৌত্র হালাকু খাঁ বোগদাদের আব্বাসীর বংশের শেষ খলিফা "মোস্তারাসমবিল্লাহ" কে* হত্যা করেন তখন আমি বোগদাদে উপস্থিত ছিলাম।

ইতিপূর্ব্বে সামারা সম্প্রদায়ের সর্দ্দার ওনারের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। তিনি এই সহরে অবস্থান করেন। এখানকার শাসনকর্ত্তার নাম আমির কয়সয়েরুমি। তিনিও ওনার উভয়ে সম্রাটের নিকট হইতে ১৮০০ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া এ দেশ শাসন করিতেছেন। "রতন" নামক জনৈক হিন্দু জ্যোতিষী পণ্ডিত কোন আমিরের সাহায্যে সম্রাটের নিকট পরিচিত হন। অল্প দিবসের মধ্যে তিনি বাদশার প্রিয়পাত্র হইয়া এই সহরের বিচারকের ও কোষাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হয়েন। যখন তিনি এই সহরে উপস্থিত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করেন সেই সময় তাঁহার কতকগুলি শত্রুও জুটিয়া গেল। আমির কয়সরও ওনার তাঁহার অধীনে থাকিতে লজ্জা বোধ করতঃ একদা রজনী যোগে অধীনস্থ সৈন্য দ্বারা রতনকে নিহত করেন এবং সরকারী সমস্ত টাকা কড়ি যাহা তাঁহার নিকট গচ্ছিত ছিল লুণ্ঠনপূর্ব্বক আপন সৈন্যদিগকে বণ্টন করিয়া দেন। এতদ্ব্যতীত উভয়ে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীয়মান করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। কিন্তু ওনারের মনে ভয়ের উদ্রেক হওয়ায় তিনি তথা হইতে পলায়ন করেন। যখন এই সংবাদ মুলতানের শাসনকর্ত্তা সেরেতেজ এমাদুল মুলুকের নিকট পঁহুছিল তিনি কাল-বিলম্ব না করিয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে সেওস্থানাভিমুখে গমন করিলেন। কয়সর এমাদুল মুলুকের আগমন জানিতে পারিয়া আপন সৈন্যদিগকে তাঁহার গতিরোধ জন্য প্রেরণ করিলেন। সহরের সন্নিকটে উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষের বহুসংখ্যক সৈন্যক্ষয় হইল। অবশেষে কয়সরের অল্পসংখ্যক সৈন্য দুর্গাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। এ দিকে এমাদুল মুলুক ঐ সকল সৈন্যের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইলেন বটে কিন্তু তাহারা এমাদুল মুলুকের গমনের পূর্ব্বেই দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া দেয়। এমাদুল মুলুক বহু চেষ্টা করিয়াও দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া দুর্গের চতুর্দ্দিকে সৈন্য প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। চল্লিশ দিবস এই ভাবে গত হইলে একদা একটী দুর্গ দ্বার উন্মুক্ত পাইয়া সৈন্য দল দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করতঃ দুর্গস্থ সকলকে বন্দী করিলেন। পর দিবস বহুসংখ্যক সৈন্যকে হত্যা করিয়া ফেলেন এবং কয়সারকে হত্যা করিয়া তাহার চর্ম্মে ভুষিপূর্ণ করিয়া সহরের এক অত্যুচ্চ স্থানে ঝুলাইয়া দেন। সৈন্যগণের মৃতদেহ সহরের বাহিরে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করেন। ইহার অল্প দিবস পরেই আমি এই সহরে আগমন করি।

রাত্রিকালে আমি একটী মাদ্রাসাতে আশ্রয় লইলাম। গৃহের মধ্যে অত্যন্ত গ্রীষ্ম বোধ হওয়ায় গৃহের ছাদের উপর শয়ন করিলাম। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া সহরের বাহিরে কায়সরের ভুষিপূর্ণ মৃত দেহটী নয়নপথে পতিত হইল। উহা দেখিয়া আমার মনে ভয় ও দুঃখের সঞ্চার হয়। সেই জন্য আমি শীঘ্র শীঘ্র এ সহর পরিত্যাগ করিলাম।

৭। লাহিরী বন্দর*। হিরাতবাসী কাজী আলাউল মুলুক কসিহ উদ্দিন খোরাসানী রোজগার মানসে সপরিবারে দিল্লী আগমন করতঃ বাদশার দরবারে কিছুকাল অবস্থানের পর সিন্ধুপ্রদেশস্থ লাহিরী বন্দরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়েন। তিনি একজন আমোদপ্রিয় লোক। যে সময় এমাদুল মুলুক, কয়ছরের বিরুদ্ধে সেওস্থান আগমন করেন, সেই সময় লাহিরীর শাসনকর্ত্তা আলাউল মুলুকও স্বসৈন্যে তাহার সাহায্যার্থে আগমন করেন। একদা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ বাসনায় নিকটে উপস্থিত হইলে উভয়ের পরিচয়ে বিশেষ

* মোস্তারাসম বিল্লাহ বোগদাদের আব্বাসীয় বংশের শেষ খলিফাকে ৬৫৬ হিজিরায় দুর্দ্দান্ত হালাকু খাঁ কম্বলের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া গোর্জ (এক প্রকার অস্ত্র) দ্বারা মারিয়াফেলে। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন তাঁহাকে পদাঘাত দ্বারা মারিয়া ফেলে। এই বংশের খলিফাগণ প্রায় ৫০০ শত বৎসর বোগদাদের শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। হতভাগ্য হালাকু খাঁ এই বংশ নির্ম্মূল করেন।

* লাহিরীবন্দর। হণ্টার সাহেব ও ইহাকে লাহিরীবন্দর বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান করাচীবন্দরের সন্নিকট এই নামে একটী গণ্ড গ্রাম রহিয়াছে। ইহা সিন্ধু নদের পশ্চিম শাখা হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। এ সময় এই শাখা বালুকা পরিপূর্ণ হওয়ায় এই স্থানের পূর্ব্ব গৌরব অতীতগর্ভে বিলীন হইয়া ইহা এক্ষণে সামান্য ক্ষুদ্র পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। আইন আকবরিতে ইহাকে লাহিরী বন্দর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে বোধ হইতেছে যে সম্রাট আকবরের সময়েও এই বন্দর বর্ত্তমান ছিল। আবুল ফজল এই বন্দরের আয় এক লক্ষ টাকা লিখিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এখানে একটী কুঠী নির্ম্মাণ করেন। বোধ হয় ইংরাজের অধিকারের পর এই বন্দরটী বন্ধ হইয়া যায়।

প্রীতিলাভ করিলাম। তিনি লাহিরী বন্দরে প্রত্যাগমন-কালে আমিও তাঁহার অনুগামী হই। তাঁহার সহিত সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্রাদিপূর্ণ পঞ্চদশখানি জাহাজ ছিল। এতদ্ব্যতীত নিজের থাকিবার জন্য "আহোরা" নামক একখানি সুসজ্জিত জাহাজ ছিল। এই জাহাজের উভয় পার্শ্বে দুইটী নৌকাতে পরিচারক থাকিত ও অপর পার্শ্বের দুইটীতে গানবাদ্যাদি হইত। যখন জাহাজগুলি একত্রে সার বাঁধিয়া বায়ুভরে চলিতে আরম্ভ করিত সেই সময় গানবাদ্যাদিও আরম্ভ হইত। সিন্ধুবক্ষে যখন গান আরম্ভ হইত সে সময় আমার মনের অবস্থা একেবারে পরিবর্ত্তন হইত। বাদ্যযন্ত্রের সুমিষ্ট স্বর, গায়কের সুর তান সহ গান যদিচ আমি ভালরূপে বুঝিতে পারিতাম না, তথাপি হৃদয়ে যে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইত তাহা বর্ণনাতীত। সে সময় সংসারের যাবতীয় বিষয় ভুলিয়া মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় একমাত্র সেই বিশ্বনাথ খোদাতালার প্রতি মন ধাবিত হইত। ইহাতে মনে যে কি প্রকারের সুখসম্ভোগ করিতাম তাহা জীবনে কখন ভুলিব না। সেরূপ সুখ জীবনে আর কখন ভোগ করিতে পারিব কি না তাহা বলিতে পারি না। আহারের সময় উপস্থিত হইলে জাহাজগুলি একত্র করিয়া একখানি জাহাজোপরি আহারের পরিবেশন হইত। আলাওল সকলের আহারের শেষে আহার করিতেন। সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বেই নামাজ শেষ করিয়া সকলে আহারে উপবেশন করিতেন। আলাওল যে সময় আহারে বসিতেন সে সময় তাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্য আহার সমাপ্তির কাল পর্য্যন্ত সুললিতস্বরে গানবাদ্য হইত। রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে জাহাজগুলি তীরস্থ করা হইত। আলাওল তীরভূমে শিবির সন্নিবেশ করিয়া তন্মধ্যে নিশাযাপন করিতেন। রাত্রিকালে সকলে একত্রে নামাজ শেষ করিয়া আহারে উপবেশন করিতাম। আহার শেষে সকলে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিয়া শয়ন করিতাম। নিশাকালে জাহাজগুলিতে রীতিমত চৌকি দিবার জন্য সিপাহীর সুবন্দোবস্ত ছিল। সিপাহীগণ রীতিমত আপন আপন নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইয়া চৌকি দিত এবং প্রত্যেক প্রহরে রাত্রি কত হইল তাহা আলাওলকে জ্ঞাপন করিতে হইত। প্রাতঃকাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আহারাদি পাক করা হইত। আহারাদি শেষে জাহাজগুলি চলিতে আরম্ভ করিত। আলাওল সময় সময় অশ্বে আরোহণ করিয়া স্থলপথে গমন করিতেন। অগ্রে অগ্রে নাকারা নিনাদিত হইত। এই সময় জাহাজগুলি সিন্ধুবক্ষে অতি ধীরভাবে গমন করিত। এইরূপে আমরা পঞ্চ দিবসের শেষে লাহিরী বন্দরে উপস্থিত হইলাম। বন্দরটী অতি সুন্দর। সমুদ্রের তীরে অবস্থিত বলিয়া এই বন্দর অতি সমৃদ্ধিশালী। সহরের সন্নিকটে সিন্ধুনদ সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইমন, পারস্য এবং অন্যান্য দেশের বহুসংখ্যক লোক ব্যবসা বাণিজ্য করিবার জন্য আগমন করেন। এই সকল কারণে বন্দরটী ঐশ্বর্য্যশালী ও সৌন্দর্য্যশালী বলিয়া খ্যাত। আমির আলাওল মুলুকের প্রমুখাৎ শুনিলাম এই বন্দরের মোট আয় ৬০ লক্ষ মুদ্রা। আলাওয়াল ইহার বিশ অংশের এক অংশ প্রাপ্ত হন ও বাকি সমস্তই বাদশার নিকট প্রেরণ করিতে হয়।

একদিবস আমীরের সহিত সহরের প্রান্তভাগে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইয়া প্রায় সাতক্রোশ পথ অতিক্রমের পর তাবনা* নামক এক বিস্তৃত ময়দানে উপনীত হইলাম। এই ময়দানে প্রস্তরময় বহুসংখ্যক মনুষ্য ও জীবজন্তুর মূর্ত্তি ভগ্ন ও জীর্ণ অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। অনেক অট্টালিকা, প্রাচীরেরও ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। অন্য এক স্থানে একটী প্রস্তরের গৃহমধ্যে একটী চবুতারার উপর একটী মনুষ্য-মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। ইহার হস্ত দুখানি কোমরের নিকট স্থাপিত। মস্তকটী ঈষৎ লম্বা, মুখটী একপার্শ্বে ঘুরান ছিল। এই গৃহের পার্শ্বে একটী গর্ত্তমধ্যে দুর্গন্ধ জল

* তাবনা। জেনেরাল কনিংহামের মতে এই স্থান দেবলের ধ্বংসাবশেষ। দেবল লাহিরী বন্দর হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানে সিন্ধুপ্রদেশের অতি পুরাতন রাজধানী ছিল। আবুল ফজল ও ফেরেস্তা উভয়েই দেবল ও ঠেঠ (Thatha) একই স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহাদের ভ্রম। ঠেঠ, দেবলঠেঠ নামে আখ্যাত হইলেও দেবল একটী পুরাতন পৃথক সহর। কেহ কেহ এরূপ অনুমান করেন যে অধুনা করাচীবন্দরের যে স্থানে আলোগৃহ (Light house) নির্ম্মিত হইয়াছে সেই স্থানটী দেবলের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ইহার মূলে আদৌ সত্য নিহিত নাই। ঠেঠ (Thatha) অতি প্রাচীন সহর নহে। সুলতান আলাউদ্দিনের সময় হইতে এই নগরের প্রতিষ্ঠা। তহফাতল-কেরামের সঙ্কলন কর্ত্তা লিখিয়াছেন যে অধুনা যাহাকে লাহিরীবন্দর বলা হয় পুরাকালে তাহাকেই দেবলবন্দর বলিত। ইহা সত্য বলিয়া অনুমিত হইতেছে। যদিও ইলিয়ট সাহেব এ মত সমর্থন করেন না। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় দেবলের ধ্বংস হইলে ইহার অতি অদূরে লাহিরী বন্দর স্থাপিত হয়।

জমা রহিয়াছে। প্রাচীরগাত্রে হিন্দিভাষায় খোদিত একটী প্রস্তর ফলক রহিয়াছে কিন্তু ইহার অনেক স্থানের অক্ষর একবারেই অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া পাঠ করা যায় না। আলাওল বলিতেছিলেন এ দেশের ঐতিহাসিকগণ বলেন এক সময়ে এই নগরের অধিবাসিগণ কোন দেবতার শাপ-ভ্রষ্ট হইয়া প্রস্তর-দেহে পরিণত হইয়াছে। উপরুক্ত মূর্ত্তিটী এই সহরের অধীশ্বর ছিলেন। এই স্থানে তিনি বাস করিতেন বলিয়া আজও সকলে স্থানটীকে রাজবাড়ী বলিয়া থাকে। আরও শুনা যায় এইরূপ অবস্থা প্রায় এক সহস্র বৎসরের পুর্ব্বে ঘটিয়াছে। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমীরের নিকট পাঁচ দিবস অবস্থান করতঃ ভাকরাভিমুখে গমনের চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

মহাম্মদ হাফিজল হোসেন।

উদ্ভিদের দৃষ্টিশক্তি।

বিজ্ঞানতপস্বী আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রমাণ করিয়াছেন যে উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে, চেতনা আছে, অনুভূতি আছে, এমন কি চিন্তা করিবার শক্তিও তাহাদের আছে। উদ্ভিদ ও জীবে পরিণতি পরিমাণে মাত্র তারতম্য নতুবা মূলত উভয়েই প্রাণী। সংপ্রতি অধ্যাপক ডারুইন স্বতন্ত্র-ভাবে গবেষণা দ্বারা এই সত্যে উপনীত হইয়া ভারতীয় আচার্য্যের পোষকতা করিতেছেন। ভারতীয় প্রাচীন ঋষিগণ ওষধির মধ্যে ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেই জ্ঞানের অনুভব তাঁহাদেরই বংশধর দ্বারা প্রথম প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণীকৃত হইয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছে।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিয়াছে, উদ্ভিদ দেখিতে পায় কি না? এই প্রশ্নের উত্তর 'দেখা' শব্দের সংজ্ঞার উপর নির্ভর করিতেছে।

কি পরিমাণ আলোকের অনুভূতি দৃষ্টি নামে অভিহিত হইতে পারে? আলোক-উত্তেজনায় ইন্দ্রিয়-বিশেষের উপযুক্ত সঙ্করণ দ্বারা সাড়া-দেওয়াই যদি "দেখা" হয় তবে উদ্ভিদ নিশ্চয়ই দেখে। কিন্তু যদি বহিঃপদার্থের বিশিষ্ট মূর্ত্তির প্রকাশ ও অনুভূতি, দেখা হয়, তবে উদ্ভিদ-রাজ্য এখনো অন্ধ। উদ্ভিদের একজাতীয় পত্র-কোষ ঠিক আমাদের চক্ষুগোলকের মতই আলোকরশ্মি সকলকে কেন্দ্রীভূত ও পরিচালিত করিতে সক্ষম—এই তত্ত্ব সংপ্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আলোকপাতে উদ্ভিজ্জের উত্তেজনা প্রকাশ ও তৎফলে তাহাদের সঙ্করণশীলতার পরিচয় সূর্য্যমুখী ফুল সূর্য্যের গতির সহিত ফিরিয়া ফিরিয়া বহুদিন পুর্ব্বেই দিয়া রাখিয়াছে। এক্ষণে এতদপেক্ষা অধিক কিছু জ্ঞান আমাদের হইয়াছে কি না দেখা যাক।

কার্ণেগী ইন্সটিট্যুশনের উদ্ভিজ্জ-গবেষণা বিভাগের ডিরেকটার ডাক্তার ম্যাকডুগাল (Dr. D. T. Macdougal, Director of the Department of Botanical research of the Carnegie Institution) বলেন—উদ্ভিদ-জীবনের পক্ষে সম্ভবত আলোকই সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক উপাদান। কারণ, আলোক-রশ্মি হইতেই মুখ্যত উদ্ভিদে শক্তি সঞ্চিত হয় এবং বায়ু ও মৃত্তিকা হইতে লব্ধ আহার্য্য সকলকে আলোকই উদ্ভিদ-জীবনের উপযোগী করিয়া গঠন করে। আলোক হইতে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য উদ্ভিদ ইহার সর্ব্বশরীরকে এমন করিয়া আলোকের অভি-মুখী করিয়া পাতিয়া দেয় যে সে যথোপযুক্তভাবে আলোক গ্রহণ করিতে পারে—যে হেতু আলোকের তীব্রতা ও উদ্ভিদ-শরীরে আলোকপাতের কোণের বিশিষ্টতার উপর আলোক-লব্ধ শক্তি নির্ভর করে। এবং এই আলোক-পাতের কোণ ও তীব্রতা নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা উদ্ভিদের যে আছে তাহা প্রমাণ দেখিয়া অনুমান করিতে বাধ্য হইতে হয়।

জানালা বা দেয়ালের ধারে যে সব গাছ থাকে তাহারা এমন করিয়া ঝুঁকিয়া আপনাদের পত্রতল প্রসারিত করিয়া দেয় যেন সব চেয়ে বেশি আলোটা আসিয়া পত্রতলের সহিত সমকোণ করিয়া পড়ে।

উদ্ভিদের সর্ব্ব অবয়বই আলোক অনুভব করিতে সক্ষম নহে। কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গই আলোকানুভূতির প্রতিক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধযুক্ত। উদ্ভিদের অঙ্গবিশেষ আবৃত্ত করিয়া ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

যদি জানালাশোভা চারাগাছের কাণ্ডের গায়ে টিনের পাত জড়াইয়া আলোকের দিক হইতে ঘুরাইয়া দেওয়া হয়, তবে পরদিন দেখা যাইবে যে কাণ্ডটি আলোকের দিকে

বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে গাছ কাণ্ডের সাহায্য ব্যতীতও আলোক প্রাপ্ত হয় এবং আলোকানুভূতির প্রতিক্রিয়াতে ঢাকা কাণ্ড বাঁকিয়া যায়। তৎপরে সেই গাছের ফুলগুলি কালো ঢাকনি দিয়া ঢাকিয়া দিলেও দেখা যায় যে গাছ তাহার দৈনিক বরাদ্দ আলোক সংগ্রহের জন্য ঠিক অভ্রান্তভাবেই আলোকের দিকে ঘুরিতে থাকে। অতএব বৃক্ষশরীরের অবশিষ্ট বহিরঙ্গ পাতাই উদ্ভিদের আলোকানুভূতির ইন্দ্রিয়।

প্রায় সকল বৃক্ষের পত্রের একটা করিয়া লম্বা দাঁটা বা বোঁটা ও একটা চওড়া পাতা থাকে। এই পাতার প্রধান কার্য্য আপনাকে বিস্তৃত করিয়া দিয়া রশ্মিসংগ্রহ করা ও সেই শক্তি পত্রহরিত উৎপাদনে নিয়োজিত করা। পাতার বোঁটা টিনের পাত বা কালো কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিলেও গাছ আলোকের দিকে ঘুরিতে পারে, কিন্তু পত্রফলক ঢাকিয়া দিলে গাছ আর আলোকের সন্ধান পায় না, আলোকের দিকে ঘুরে না, গাছ তখন বাস্তবিকই অন্ধীকৃত। কোনো কোনো গাছ তাহাদের কাণ্ড ও পাতার বোঁটা দিয়াও অল্প অল্প আলোক অনুভব করিতে পারে।

যে সকল গাছের আলোকানুভবশক্তি খুব তীব্র তাহাদের একটা পত্রফলক অণুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে বহিঃত্বককোষের উপরিপৃষ্ঠ বাহিরের দিকে ফোলা— যেন কূর্ম্মপৃষ্ঠ আতসী কাচের মত আলোকরশ্মিগুচ্ছকে কোষের অভ্যন্তরে কেন্দ্রীভূত করিয়া দেয় এবং নিম্নকোষে চালনা করিয়া পত্রহরিত হইতে আহার্য্য সামগ্রী উৎপাদন করিতে নিয়োজিত করে।

মনে কর এই বহিঃত্বক-কোষ যেন একটা ঘর (পর পৃষ্ঠায় ক চিত্র দেখ)। তাহার ছাদ কূর্ম্মপৃষ্ঠ রোশনদান =(Skylight)-ওয়ালা ও মেঝে কাচের। যখন রশ্মিগুচ্ছ কূর্ম্মপৃষ্ঠ রোশন-দানের উপর পড়ে তখন তাহা কেন্দ্রীভূত হইয়া কাচমেঝে ভেদ করিয়া নীচের ঘরে যায় এবং পত্রহরিত হইতে শর্করা ও অন্যান্য পদার্থ প্রস্তুত করে। রোশনদান-ওয়ালা ঘরের পাশদেয়াল আলোক-অনুভবনশীল; যদি বৃক্ষপত্র অর্থাৎ সমগ্র ইমারত নড়িবার সময় রশ্মি পাশদেয়ালে পড়িয়া আঘাত করে তবে একটি দূরস্থ নড়ন-সক্ষম কলে গিয়া সাড়া পৌঁছায়। তখন ধীরে ধীরে, কিন্তু অভ্রান্ত সতর্কভাবে, সেই কল গতিপ্রাপ্ত হয় এবং পত্রগুলিকে এমন জায়গায় আনে যে রশ্মিগুচ্ছ রোশনদানের ভিতর দিয়া গিয়া মেঝে ভেদ করিয়া নীচের খাদ্যপ্রস্তুতকারী কোষে পৌঁছায়। এইরূপে গাছ প্রাত্যহিক আলোক সঞ্চয়ের জন্য আপনার সকল পত্রগুলিকে একটি বিশেষ অবস্থায় নড়াইয়া নড়াইয়া রাখিতে থাকে। যখন পত্রফলকের উপর তীব্র আলোক পতিত হয় এবং সেই তীব্রতা যদি গাছের পক্ষে ক্ষতিকর হয় তবে গাছ আলোকের দিক হইতে পত্রফলকের উপরিতল সরাইয়া লয়। আলোকের সামান্য শক্তি পরিবর্ত্তনও বুঝিতে সক্ষম এবং দ্রুত অথচ অভ্রান্তভাবে নড়িতে সমর্থ একটি কল বৃক্ষশরীরে থাকায় আপনা আপনি এই সকল কার্য্য ঘটিয়া থাকে।

গাছের এই আলোকের পরিমাণ আন্দাজ করিবার নিপুণতা খুব সহজেই পরীক্ষা করা যাইতে পারে:—একটা ছোট দ্রুত পরিবর্দ্ধনশীল চারাগাছ (যথা রাই সরিষার চারা) কয়েক ঘণ্টা অন্ধকারে রাখিয়া দিবার পর যদি দুটা বাতির আলো গাছের দুই বিপরীত দিকে রাখা যায় এবং একটা আলোককে অপরটা অপেক্ষা এক ইঞ্চিমাত্র নিকটস্থ করা যায় তবে চারাটি অসম উত্তেজনায় নিকটস্থ আলোর দিকে ঝুঁকিতে থাকিবে। কোনো কোনো গাছের অনুভবশক্তি এত প্রখর যে একগজ তফাতে রক্ষিত একটা বাতির আলোর তীব্রতার একের তিন লক্ষ ভাগের একভাগ তারতম্যও সেই সকল গাছ ধরিতে পারে। এই সূক্ষ্ম তারতম্য ধরিতে মানুষের নগ্নচক্ষু সম্পূর্ণ অক্ষম।

গাছ যে শুধু আলোক তারতম্যই ধরিতে সক্ষম এমন নহে, অধিকন্তু বর্ণ নির্ণয় করিবারও ক্ষমতা স্পষ্ট তাহাদের আছে। বর্ণপর্য্যায়ের (spectrum) বিভিন্ন অংশ গাছে বিভিন্ন প্রকারের সাড়া উৎপন্ন করে। নীল ও লাল রং একই প্রকার সাড়া উৎপন্ন করে না। গাছ নীল আলোর দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, কিন্তু লালের উপস্থিতিতে কোনো উত্তেজনা প্রকাশ পায় না।

উপরি লিখিত পরীক্ষা সকল নিঃসন্দেহই প্রমাণ করিতেছে যে পত্রফলক আলোক হইতেই উত্তেজনা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সেই উত্তেজনাজাত গতির উদ্ভব পত্রফলকে হয় না, বোঁটার গোড়া বা কাণ্ড হইতে হয়। সেই গতির

জন্মস্থান পত্রফলক হইতে হয়ত কয়েক ইঞ্চি বা এক ফুট ব্যবধানেও থাকিতে পারে। প্রায় সকল গাছেই এই গতি আলোক অনুভবক্ষম অংশ হইতে দূরে অবস্থিত অবয়বের মধ্যেই উৎপন্ন হয়। ইহা পরীক্ষার জন্য যদি একটা চারার একটি মাত্র পাতা অনাবৃত রাখিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দেওয়া হয় এবং সেই অনাবৃত পাতার উপর আলোকপাত করা যায়, তবুও গাছের আবৃত অংশেই বক্রতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা হইতে আমরা নিঃসংশয়ে অনুমান করিতে পারি যে গাছের আলোকগ্রহণক্ষম ইন্দ্রিয় হইতে দূরস্থ অনুভূতি ক্ষেত্রে একটা সাড়া বা সংবাদ প্রেরিত হয় এবং তাহা হইতেই গতি উৎপন্ন হয়। মানুষের দৃষ্টিও এইরূপ—চোখ শুধু আলোক গ্রহণ করিয়া মস্তিষ্কে অনুভূতি পৌঁছাইয়া দেয়। অতএব উদ্ভিদেরও দর্শনক্ষমতা একেবারে অস্বীকার করিবার জো নাই।

উদ্ভিদের বহিরিন্দ্রিয় সকল ও প্রাণ আছে কি না, তদ্বিষয়ে আমাদের আর্য্য পিতামহগণের কিরূপ ধারণা ছিল, তাহা মহাভারত হইতে জানা যায়। শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ের ১৮৪ অধ্যায়ে আছে :—

"ভরদ্বাজ কহিলেন, ব্রহ্মন্! কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সমুদায় পদার্থই যদি পঞ্চভূত দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্থাবর দেহে কি নিমিত্ত পঞ্চভূত লক্ষিত হয় না? দেখুন বৃক্ষলতাদি শ্রবণ, দর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন বা স্পর্শ করিতে পারে না। উহাদের শরীরেও রুধিরাদি দ্রব পদার্থ, অগ্নিরূপ তেজ, অস্থিমাংসাদিরূপ পৃথিবী, চেষ্টারূপ বায়ু ও ছিদ্ররূপ আকাশ বিদ্যমান নাই; তবে উহারা কিরূপে পাঞ্চভৌতিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে?

"ভৃগু কহিলেন, ব্রহ্মন্! বৃক্ষলতাদি স্থাবরগণ নিতান্ত ঘনীভূত বলিয়া স্থূল দৃষ্টিতে উহাদের মধ্যে আকাশ লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু যখন প্রতিনিয়ত উহাদের ফলপুষ্পোদ্গম হইতেছে, তখন বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উহাদের মধ্যে যে আকাশ আছে, তাহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে। যখন উত্তাপ দ্বারা উহাদের পত্র, ত্বক্, ফল ও পুষ্প সমুদায় ম্লান ও বিশীর্ণ হইয়া যায়, তখন আর উহাদিগের স্পর্শজ্ঞান বিষয়ে সংশয় কি? যখন বায়ু, অগ্নি ও বজ্রের শব্দে উহাদের ফল পুষ্প বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন নিশ্চয়ই বোধ করিতে হইবে যে, উহাদের শ্রবণ শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। দর্শনহীন জন্তু কখনই স্বয়ং পথ চিনিয়া গমন করিতে পারে না। অতএব যখন লতাসমুদায় বৃক্ষের নিকট আগমন, উহাকে পরিবেষ্টন ও ইতস্ততঃ গমন করে, তখন উহাদের দর্শন শক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যখন বৃক্ষলতাদি পবিত্র ও অপবিত্রগন্ধ এবং বিবিধ ধূপ দ্বারা রোগবিহীন হইয়া পুষ্পিত হইতেছে, তখন তাহারা নিঃসন্দেহ আঘ্রাণ করিতে পারে। যখন উহারা মূলদ্বারা সলিল পান করিতে সমর্থ হয়, তখন নিশ্চয়ই উহাদিগের রসনেন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। যেমন মুখদ্বারা উৎপলনাল গ্রহণ করিয়া জল শোষণ করা যায়, তদ্রূপ পাদপগণ পবনসহযোগে মূলদ্বারা সলিল পান করে। এইরূপে যখন উহাদিগকে সুখ দুঃখ সংযুক্ত এবং ছিন্ন হইলে পুনরায় প্ররোহিত দেখা যায়, তখন অবশ্যই উহাদের জীবন স্বীকার করিতে হইবে। উহাদিগকে অচেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থ মূল দ্বারা যে জলগ্রহণ করে, অগ্নি ও বায়ু সেই জল জীর্ণ করিয়া থাকে। ঐ জলের পরিপাক হওয়াতেই ঐ সকল স্থাবর পদার্থ লাবণ্যবিশিষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়।"

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিত্র পরিচয়।
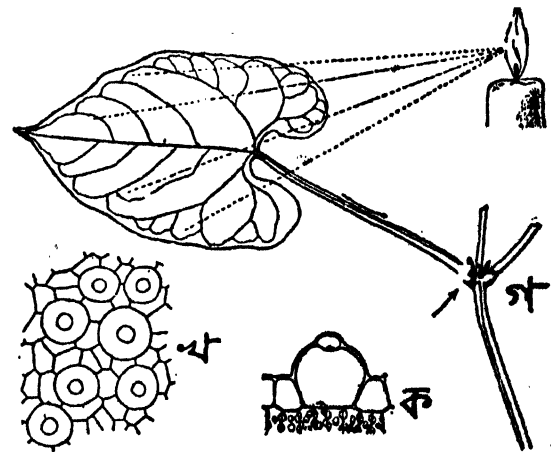
ক—পত্রপৃষ্ঠে বহিঃকোষ। মনুষ্যচক্ষুর অনুরূপ।

খ—পত্রকোষের সংস্থান।

গ—পত্রফলকে তির্য্যকপাতিত আলোকউত্তেজনার সাড়া বোঁটা বাহিয়া অনুভব-ক্ষেত্রে গতি উৎপন্ন করিতেছে।

ঔপন্যাসিক সাহিত্যে নব রীতি।

মানুষের মনকে বাদ দিয়া ঘটনাপরম্পরার সমষ্টি লইয়া উপন্যাস রচিত হইলে উহা সাধারণ পাঠকের নিকট গ্রহণীয় হইতে পারে কিন্তু উন্নত সমাজের নিকট ঐরূপ উপন্যাস সমাদর লাভ করিতে পারে না। যে অনুভূতি চিন্তাশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করিয়া আমরা সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছি, মানব চরিত্র চিত্রণের সময় যদি মানব-মনের সেই সকল অদ্ভুত ক্রিয়াকে বাদ দিয়া কতকগুলি মানুষকে উপন্যাসের মধ্যে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করা যায় তাহা হইলে সে মানুষগুলি যে নিতান্ত প্রাণবিহীন জড়-পদার্থবৎ প্রতীয়মান হইবে ইহা আর বিচিত্র কি? শিক্ষার দ্বারা যাঁহাদের রুচি পরিমার্জ্জিত হইয়াছে ও যাঁহাদের মন শিক্ষার গুণে গভীরতম বিষয় সমূহের মধ্যে প্রবেশ লাভের অধিকার পাইয়াছে তাঁহাদের নিকট শুধু ঘটনাসমূহের সমষ্টি উপন্যাস নামে গৃহীত হইতে পারে না, হইলেও তাহার মূল্য স্বল্প মাত্র।

বিগত শতাব্দীতে এবং বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের শিক্ষিত সমাজে জর্জ্জ ইলিয়টের উপন্যাস সকল যেরূপ সমাদৃত হইয়াছে এরূপ আর অতি অল্প লোকেরই হইয়াছে। ভারতবর্ষে যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেও জর্জ্জ ইলিয়াটের খুব আদর। এমন কি যাঁহারা উপন্যাস পাঠের বিরোধী এমন লোককেও জর্জ্জ ইলিয়টের উপন্যাস সকল মনোবিজ্ঞানের হিসাবে পড়িতে দেখা গিয়াছে। জর্জ্জ ইলিয়টের কোনো কোনো উপন্যাসকে উপন্যাস হিসাবে বাস্তবিক উচ্চ স্থান দেওয়া যায় না— যেমন রমোলা। কিন্তু দোষ ত্রুটী ও অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তাঁহার গ্রন্থ সকলের মধ্যে উচ্চতর এমন কোনো বস্তু আছে যাহার জন্য সেগুলি সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে। সে বস্তু মানব-মনের অভিব্যক্তি।

যে সকল লেখক লেখনী-তুলিকায় মানব মনের চিত্র প্রতিফলিত করিয়া শিক্ষিত সমাজের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে একজন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ স্থলে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে উপন্যাস হিসাবে তাঁহার সকল গ্রন্থ যে আদর্শস্থানীয় তাহা নহে। কিন্তু একজন প্রতিভাবান্ লেখক যাহা লিখিবেন তাহার সবটুকুই সুন্দর, নিখুঁত হইবে এরূপ আশা করাও অন্যায়। বরং এইরূপ লেখকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটী ভুলিয়া, তাঁহার রচনার বিশেষত্বটুকু কি পরিমাণে বিকশিত হইতেছে সেদিকে দৃষ্টি রাখাই বাঞ্ছনীয়। রবিবাবুর রচনার মধ্যে আমরা বুঝিতে পারি এবং বুঝিতে পারি না এমন অনেক ত্রুটী ও অসম্পূর্ণতা থাকিতে পারে কিন্তু বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের সারথিরূপে, বিশেষতঃ ঔপন্যাসিকরূপে তিনি কি নূতন রীতি প্রচার করিয়াছেন আজ অতি সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

বক্ষ্যমান বিষয়টী অতি গুরুতর সংক্ষেপে তাহার আলোচনাও অসম্ভব। কিন্তু তথাপি এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে উপন্যাসের মধ্যে মানব মনের বহিঃপ্রকাশ অপেক্ষা অন্তঃপ্রকাশ রবীন্দ্রনাথের রচনার একটা বিশেষত্ব। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ও পরবর্ত্তী বহুযুগের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের সিংহাসন অধিকার করিয়া থাকিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের মধ্যে মানব মনের ব্যবসা অনেকটা বেশী করিয়াছেন। কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে মানব মন কেমন সংগ্রাম করে, কত আবর্ত্তের মধ্যে হাবুডুবু খায়, যদি তাহা ভাল করিয়া দেখিতে ও বুঝিতে হয় তবে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস পড়িতেই হইবে। মনোবিজ্ঞানে বিশ্লেষিত মনের চিত্র যখন আমাদের নিকট নিতান্ত ছায়াময় (abstract) বলিয়া মনে হয় তখন যদি এক একটী মনোবৃত্তি জীবন্ত মানুষে অর্পণ করিয়া আমরা তাহাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাই তাহা হইলে দর্শনশাস্ত্র একটা জটিল পদার্থ না হইয়া আমাদের নিতান্ত পরিচিত বিষয় হইয়া পড়ে।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে রবিবাবু যে দু'খানি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন সে দু'খানির মধ্যেই তাঁহার এই রীতি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। চোখের বালি ও নৌকা ডুবি সম্বন্ধে অনেকের অনেক মত থাকিতে পারে কিন্তু উপন্যাসের আখ্যানবস্তু লইয়া আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। উপন্যাসের হিসাবে এই দুইখানিকে যে খুব উচ্চস্থান দেওয়া যায় না এরূপ মনে করিবারও যথেষ্ট কারণ

আছে। কিন্তু রবিবাবু উপন্যাসজগতে যে নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন উহা সময়োপযোগী হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রকে কেহ কেহ বঙ্গের স্কট আখ্যা দিয়া থাকেন। স্কটের উপন্যাসাবলী যেমন বৈচিত্রে, সৌন্দর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে ও অভাবনীয় ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিও সেইরূপ। কোথাও প্রেমিকের কথা, কোথাও বিদ্বেষবুদ্ধি পরিচালিত শত্রুর প্রতিহিংসার কাহিনী, কোথাও বীরের বীরত্বের চিত্র, কোথাও বা পরদুঃখকাতরা রমণীর করুণ মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। শুধু তাই নয়। তাহার মধ্যে গভীর দার্শনিক ভাব সকলও স্থান পাইয়াছে। যেমন স্কট শুধু গল্প লেখেন নাই বঙ্কিমচন্দ্রও তেমনি গল্প রচনা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। কত উচ্চভাব, কত দার্শনিক গবেষণা তাঁহার উপন্যাস সকলকে অলঙ্কৃত করিয়াছে তাহা চিন্তাশীল পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। "আনন্দমঠ" সকলেই পাঠ করিয়াছেন কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র "আনন্দমঠের" উপসংহারকালে যে কয়টী কথা লিখিয়াছেন অনেক লোকের পক্ষেই তাহার নিগূঢ় অর্থ অনুধাবন করিতে পারা যে কঠিন কাজ ইহাতে সন্দেহ নাই। কতদিন মনে মনে বলিয়াছি "বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল" কিন্তু ইহার গভীর অর্থ এখনও বুঝিতে পারি নাই। বোধ হয় "আনন্দ মঠের" আচার্য্য ব্যতীত আর কেহ তাহার গভীর অর্থ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।

যেমন বঙ্কিমচন্দ্রকে লোকে স্কট আখ্যা দিয়া থাকে রবীন্দ্রনাথকেও তেমনি কেহ কেহ জর্জ্জ ইলিয়ট বলিয়া থাকেন। এক বিষয়ে যে রবি বাবুর সহিত জর্জ্জ ইলিয়টের সুগভীর মিল আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এ প্রবন্ধের প্রারম্ভেই প্রসঙ্গক্রমে সে কথা বলা গিয়াছে। সে মিল মনের ব্যবসায় লইয়া। এডাম বীড্ (Adam Bede), সাইলাস্ মার্নার (Silas Marner), প্রভৃতি উপন্যাস দিন দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের নিকট সুপরিচিত হইতেছে। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে জর্জ্জ ইলিয়ট উপন্যাস জগতে যে নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন তাহা শিক্ষিত সমাজের অনুমোদিত। তাঁহার গ্রন্থের দোষ ত্রুটী থাকা সত্বেও এই বিশেষত্বের জন্য তিনি স্বদেশ এবং বিদেশের সাহিত্যিক ও দার্শনিকদিগের নিকট প্রচুর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস যুগের প্রবর্ত্তক। যুগ-প্রবর্ত্তকগণকে অনেক সময়েই নিন্দাভাগী হইতে হয়। ইংলণ্ডে মিল্টন নিন্দাভাগী হইয়াছিলেন—আমাদের দেশে মাইকেলকে ব্যঙ্গ করিয়া কাব্যগ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। রবি বাবুর এ চেষ্টাও যে সর্ব্বত্র সহানুভূতি পাইবে এমন আশা করা অন্যায়। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে উপন্যাস রচনা করিতে হইলে নায়কনায়িকার কার্য্যকলাপ বর্ণনাই যথেষ্ট নহে। তাহাদের মনের পরিচয় চাই। কোন্ বর্ণে কাহার মনটী চিত্রিত তাহা জানিতে পারিলে পাঠকের কল্পনাশক্তি কার্য্য করিতে পারে—তাহার চিন্তাশক্তি জাগ্রত হয়। নতুবা শুধু গল্প পড়িতে পড়িতে পাঠকের কল্পনাশক্তি মরিয়া যায়—লেখকের লেখনীর গতির সহিত কল্পনার গতি একীভূত হইয়া যায়। আপনার স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে!

চোখের বালি ও নৌকাডুবি পাঠ করিতে করিতে পাঠক এমন অনেক স্থান পাইবেন যেখানে নায়কনায়িকার কোনো চিন্তা বা বিশেষ কোন মানসিক অবস্থা অবিকল তাঁহার নিজের বলিয়া মনে হইবে। এই দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে এমন অনেক স্থান পাইবেন যেখানে চিন্তার ভাষা শরীরে এবং মনে অদ্ভুত Sensation উৎপাদন করে। জর্জ্জ ইলিয়ট্ (আসল নাম মেরী এ্যান্ ইভান্স) এই অদ্ভুত শক্তির জন্যই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি একজন সুবিখ্যাত মার্কিন লেখক তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

George Eliot's contribution, to history lies in the fact that she has given the best picture to be found in all literature of English provincial life in the reign of Queen Victoria. Sir Leslie Stephen says: "She has done for it what Scott did for the Scottish peasantry, or Fielding for the eighteenth century Englishmen, or Thackeray for the higher social stratum of his time."

রবিবাবুর উপন্যাসাবলী সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস লেখক এইরূপ সাক্ষ্য দিতে পারিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি?

একটী কথার উল্লেখ করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ

করিব। মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস সর্ব্বসাধারণের জন্য নয়। উপন্যাস হইলেই যে সকলের নিকট সহজবোধ্য হইবে এরূপ আশা করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বজনপ্রিয় এবং সর্ব্বজনপঠিত উপন্যাসগুলিও স্থানে স্থানে গভীর এবং জটিল ভাবে পূর্ণ। অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নিকটই এই শ্রেণীর উপন্যাসের সমাদর আশা করা যাইতে পারে। যেমন উচ্চতর গণিতবিজ্ঞান সাধারণ সংযোজন ও বিয়োজন নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও সাধারণ গণিত বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তির পক্ষে অনধিগম্য, তেমনি মানবমনের নিগূঢ় রহস্য সকল চিন্তা করিতে ও তাহার রহস্যজাল ভেদ করিতে অনভ্যস্ত ও অক্ষম পাঠকের নিকট রবিবাবুর উপন্যাসগুলি অনেক স্থলে শুধু "মিছে কথা গাঁথা" ব্যতীত আর কিছু নয়। রবিবাবুর উপন্যাসের আখ্যানবস্তু সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, সহৃদয় পাঠকবর্গ সে সকল সমালোচনা হইতে সার সঙ্কলন করিতে পারিবেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শুধু তাঁহার প্রবর্ত্তিত রীতি সম্বন্ধেই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা গেল।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণী।

পণ্ডিতগণের অন্যান্য ধর্ম্মের মধ্যে ভবিষ্যৎ উক্তি করা অন্যতম প্রকৃতি। 'বেগুণ গাছে আঁকুসি দিয়া বেগুণ পাড়িতে হইবে' যেমন একদল মানবশক্তির হ্রাসলক্ষ্যকারী হতাশ অভিভূত পণ্ডিতদলের কৌতূহলজনক ভবিষ্যদ্বাণী আছে, বর্ত্তমানে মানবশক্তির উৎকর্ষ ও বৃদ্ধি লক্ষ্যকারী আশাপ্রদীপ্ত পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক মানবের ভবিষ্যৎ ক্ষমতা ও অবস্থার কল্পনাও তদপেক্ষা কম কৌতুকজনক নহে। অবশ্যই বিশ্বাসীর নিকট তাহা সত্যের আভাস বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে কিন্তু বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্ব্বিশেষে সকলের নিকটই বড় কৌতূহলপ্রদ।

কিছু দিবস পূর্ব্বে ফরাসী বৈজ্ঞানিক মুসোঁ মার্সেলিস বার্থেলো,—যাঁহার রাসায়নিক উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করিলে যেন বোধ হয় তিনি প্রকৃতির কর্ম্মশালা পরিদর্শন করিয়া, তথাকার কার্য্য সন্তোষজনক নহে প্রচার পূর্ব্বক মানব কর্ত্তৃক উচ্চ অঙ্গের কর্ম্মশালা স্থাপনের ব্যবস্থায় রত হইয়াছিলেন, যাঁহার দীর্ঘজীবনের স্বভাবের সহিত ঘনিষ্ঠতায় বোধ হয় প্রকৃতি যেন তাঁহার নিকটে ধরা পড়িয়া আপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এতদিন মনুষ্যহস্তের চালনার অভাবেই প্রকৃতি সম্যক্ পরিস্ফুট হইতে পারেননাই,—সেই রসায়ন শাস্ত্রের সিদ্ধার্থ অতিরথ বার্থেলো মানবের ভবিষ্যৎ আহার্য্য, কার্য্য, ভোগ, লক্ষ্য সম্বন্ধে যে আভাস দিয়াছেন তাহা যুগপৎ বিস্ময় ও কৌতুক উৎপাদন করে।

রসায়ন বিদ্যাই তাঁহার প্রধান অবলম্বন। এই বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের যে মত ও তাঁহাদের কর্ত্তৃক এই বিদ্যার যেটুকু ক্ষেত্র বলিয়া গণ্য হইত তিনি তাহাতেই আবদ্ধ থাকেন নাই। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ এই বিদ্যার এইরূপ সংজ্ঞা দিয়া আসিতেন যে, রসায়ন শাস্ত্রের কার্য্য বিশ্লেষণপ্রক্রিয়াতেই সীমাবদ্ধ—ইহার কার্য্য ভাগ, বিভাগ, প্রতি-বিভাগ দ্বারা নৈসর্গিক বস্তুর পরিচয় গ্রহণ করা মাত্র। পণ্ডিত ল্যাভোসিয়র এই সংজ্ঞার প্রবর্ত্তক এবং বার্থেলোর পূর্ব্ববর্ত্তী সকলেই ইহা মানিয়া আসিতেন। বস্তুতও রসায়ন শাস্ত্র বহুকাল হইতেই এই শিক্ষা দিয়া আসিতেছিল মাত্র যে জল, অম্লজান ও হাই-ড্রোজেন সংমিশ্রণে উদ্ভূত; কিন্তু ঐ দুই জানের সংমিশ্রণে জল প্রস্তুত প্রণালী রসায়ন শাস্ত্রের কার্য্য নহে, আয়ত্তাধীনও নহে সকলেরই বিশ্বাস ছিল। ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বস্তুর পরিচয় গ্রহণ করাই এই বিদ্যার সীমা, গঠন-রহস্য প্রকৃতির গুপ্তধন; মানুষের তাহাতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নাই। পুরাতন রাসায়নিকের ইহাই সংস্কার ছিল। কিন্তু বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই বার্থেলো ঘোষণা করিলেন—'এই সংস্কার যে সত্য ইহা যে কুসংস্কার নহে, তাহার প্রমাণ কোথায়? যদি প্রকৃতি মূল পদার্থসমষ্টির সংমিশ্রণে যৌগিক পদার্থ গঠন করিতে পারে তবে আমি তাহা করিতে অসমর্থ থাকিব কেন? প্রকৃতি যে শক্তির সহায়তায় উহা সংসাধিত করে সে শক্তি আমা হইতে গোপন থাকিতে পারিবে কেন?' বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের প্রকৃতির ন্যায় প্রকৃতি বুড়ী তাহার যে গুপ্ত স্ত্রীধন ভাবী উত্তরাধিকারী হইতে সর্ব্বদা গোপন রাখিত যুবক বার্থেলো তাহাকে হস্তগত করিবার প্রয়াসে বদ্ধপরিকর হইলেন।

আবিষ্কারের পর আবিষ্কারে বার্থেলো প্রমাণ করিতে সমর্থ হইলেন তাঁহার ঘোষণার মূলে যে সন্দেহ ছিল তাহা সঙ্গত সন্দেহ এবং সময়ে সেই সন্দেহ সত্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এখন রাসায়নিকেরা বিশ্বাস করেন না যে রসায়ন বিদ্যা ধ্বংস ভিন্ন নির্ম্মাণ করিতে পারেনা; তাঁহারা বিশ্বাস করেন উপযুক্ত ক্ষেত্রে এবং উপযোগী অবস্থার অধীনে এই বিদ্যা দ্বারা স্বভাবের তুল্যরূপে এবং স্থলবিশেষে উৎকৃষ্টতর রূপে যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত হইতে পারে, নানাবিধ রং ও সুগন্ধি দ্রব্য যাহা রসায়ন বিদ্যার সাহায্যে প্রস্তুত হইতেছে তাহা স্বভাবজ রং ও সুগন্ধি দ্রব্য অপেক্ষা অধিক মনোরম ও উৎকৃষ্টতর। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বার্থেলো অঙ্গারক ও হাইড্রোজেন বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার অধীনে মিশ্রিত করিয়া নয়ন মনোহর এসিটিলিন প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইলেন এবং বিজ্ঞান জগতে চমৎকার ও মহানন্দ উৎপাদন করিলেন। সফলতা পরম্পরায় এখন বহু রসায়নবিদ্যাবিদেরই বিশ্বাস ও ধারণা জন্মিয়াছে যে এমন কোন স্বাভাবিক যৌগিক বস্তুই নাই যাহা এই বিদ্যার সাহায্যে সময়ে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইতে পারিবে না। এই বিশ্বাস ও ধারণা অবলম্বন করিয়া বার্থেলো রসায়ন বিদ্যার সাহায্যেই মানবের আহার্য্য প্রস্তুতের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন শস্যক্ষেত্রে বা উদ্যানে কিম্বা প্রাণিহত্যা দ্বারা মানবের আহারীয় আর সংগ্রহ করিতে হইবে না; রসায়নাগারেই ল্যাবোরেটরিতেই আহার্য্য প্রস্তুত হইয়া বাজারে বিক্রীত হইবে। অবশ্যই তিনি নিজ জীবনে বা তাঁহার পরবর্ত্তী কেহ এপর্য্যন্ত, এই উদ্যমে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হন নাই; কিন্তু তিনি যতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহাতে অতি দম্ভের সহিত বলিয়া গিয়াছেন কতিপয় দশাব্দ কাল মধ্যেই রসায়ন শাস্ত্র ইহার পূর্ণ সফলতা দেখিতে পাইবে।

তাঁহার বক্তব্য ও কার্য্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে একটু আনুসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনারও আবশ্যক—মানুষের আহার্য্যের উপকরণ কি তদ্বিষয়ে অতি সামান্য লক্ষ্য করিতে হইবে মাত্র। মানব ভক্ষ্যের প্রধান উপকরণ প্রধানতঃ ৪ চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১ম চর্ব্বি বা বসা অর্থাৎ তৈলমূলীয় পদার্থ, ২য় কার্ব্বোহাইড্রেট্ অর্থাৎ অঙ্গারক ও হাইড্রোজনের সংমিশ্রণমূলক পদার্থ, ৩য় নাইট্রোজেন মূলক পদার্থ, ৪র্থ খনিজ পদার্থ। শরীর নির্ম্মাণ, গঠন, রক্ষণ কার্য্যে ইহারা প্রত্যেকেই অত্যাবশ্যক। এই চারি পদার্থের সহিত জলও নিতান্ত আবশ্যক। জলের অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে একটী প্রধান কার্য্য এই যে ঐ সমস্ত পদার্থ কঠিনভাবে সহজে শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না, জলের সহায়তায় উহারা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া অতি সহজে শরীরে প্রবেশ করে। আহার্য্যের উদাহরণ স্থলে আমরা দুগ্ধকে গ্রহণ করিতে পারি। দুগ্ধে জল ব্যতীত উপরোক্ত চারি পদার্থই বর্ত্তমান আছে। জলের পরিমাণ অবশ্যই অত্যন্ত অধিক। শতকরা হিসাবে দুগ্ধের উপকরণের ভাগ এইরূপ—

	শতকরা
জল	৮৮
তৈল পদার্থ যাহা ননীরূপে বিদ্যমান	৩
হাইড্রোকার্বন যাহা শর্করা রূপে বিদ্যমান ...	৪½
নাইট্রোজেন মূলক পদার্থ যাহা ছানা ও এলবুমেন রূপে বিদ্যমান	৪
খনিজ পদার্থ যাহা লবণ রূপে যথা ক্লোরাইড্ অব্ সোডিয়ম্, ফসফেট্ অব্ লাইম্ আকারে বিদ্যমান এবং লৌহ ...	½
	১০০

এইরূপ মাংস, অন্ন, রুটী, ডিম প্রভৃতি মানুষের উৎকৃষ্ট খাদ্যগুলি বিশ্লেষণে দেখা যায় জল ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত ৪ প্রকার পদার্থ প্রত্যেক গুলিতেই বিভিন্ন পরিমাণে বিদ্যমান। উপরোক্ত ৪ প্রকার পদার্থের মধ্যে খনিজ পদার্থ যথা লবণ, লৌহ, ফসফেট্ প্রভৃতি যাহা অস্থি ও রক্তের উপকরণ তাহার জন্য মানুষকে চাষ আবাদ প্রাণিহত্যা করিতে হয়না

এবং তাহা যে আকারে শরীরে গ্রহণ করিতে পারে তাহাও রসায়নাগারেই প্রস্তুত হইতে পারে। চাষ আবাদ প্রাণিহত্যার একমাত্র প্রয়োজন অবশিষ্ট ৩ প্রকারের অর্থাৎ চর্ব্বি মূলক, কার্ব্বোহাইড্রেট ও নাইট্রোজেন মূলক পদার্থের সংগ্রহ, কারণ তাহারা যে আকারে শরীরের উপযোগী তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রাকৃতিক ভিন্ন অপ্রাকৃতিক উপায়ে প্রস্তুত হয় নাই। এই তিন পদার্থ অপ্রাকৃতিক উপায়ে প্রস্তুত করিতে পারিলেই মানবের খাদ্য রসায়নাগারেই প্রস্তুত হইতে পারে বলিয়া বার্থেলো বিশ্বাস করিয়াছিলেন। মানবশরীরে এই তিন প্রকার পদার্থেরই বিশেষ আবশ্যকতা আছে এবং তাহারাই মানবদেহের গঠন, রক্ষণ, পোষণ প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করে। তাহাদের মোটামুটি কার্য্য এইরূপ। মানব দেহে প্রতি মুহূর্ত্তে যজ্ঞকুণ্ডের ন্যায় যে সমস্ত কোষ প্রস্তুত হইতেছে তাহার মূল উপাদানই চর্বি বা তৈল পদার্থ অর্থাৎ চর্বি কণাই ঐ সমস্ত নূতন কোষের বীজ স্বরূপ। আমরা বাহিরে যেমন দেখিতে পাই তৈলই অগ্নিশিখার প্রাণ, তদ্রূপ মানবশরীরাভ্যন্তরেও সর্ব্বদা যে বহ্নি প্রজ্বলিত আছে তাহারও প্রধান উপাদান তৈল। এই সমস্ত কোষে আবার নাইট্রোজেন মূলক পদার্থ নীত হইয়া তথাকার কার্য্যে, যাহাকে মেটাবোলিজম্ বলে, তদ্দ্বারা তাহা মাংসে পরিণত হয়। শরীরবিদ্যার এই বিশেষ শব্দ মেটাবোলিজম্ সম্বন্ধে এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তাহা জীব-শরীরাভ্যন্তরের সেই রাসায়নিক কার্য্য যদ্দ্বারা তথায় নীত সমুদয় জড়পদার্থ প্রাণময় পদার্থে পরিণত হয়। কার্ব্বোহাইড্রেট্ পদার্থও কোষগুলি নির্ম্মাণের উপকরণ চর্ব্বি বা তৈল পদার্থের সরবরাহ ব্যতীত মেটাবোলিজমের সহায়তা করে। এই তিন পদার্থের সাহায্যেই প্রধানতঃ শরীরের সমুদয় কার্য্য সর্ব্বদা চলিতেছে। বার্থেলো বিশ্বাস করিয়াছিলেন এই তিন পদার্থ রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে প্রস্তুত করিতে পারিলেই মানবের আহার কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইতে পারে এবং সেই বিশ্বাস মূলে রসায়নাগারেই ঐ গুলি প্রস্তুতের জন্য বদ্ধপরিকর হন।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দ শেষ হইবার পূর্ব্বেই বার্থেলো তাঁহার চেষ্টার ফলে চর্ব্বিমূলক পদার্থগুলি রসায়নাগারেই প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইলেন এবং সেই সময় হইতে তাঁহার নিজ পদ্ধতি অবলম্বনেই অনতিবিলম্বেই কার্ব্বোহাইড্রেট্ পদার্থ অর্থাৎ শর্করাদি অঙ্গারক রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে প্রস্তুত করিতে কৃতকার্য্য হইলেন। অবশিষ্ট নাইট্রোজেন মূলক পদার্থ অর্থাৎ এলবুমেন জাতীয় পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুতের প্রণালী এপর্য্যন্ত উদ্ভাবিত না হইলেও বার্থেলো এবং আধুনিক বহু প্রসিদ্ধ রাসায়নবিৎগণই বিশ্বাস করেন অত্যল্প কাল মধ্যেই ঐ পথ উদ্ভাবিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু এইরূপ বা তদ্রূপ প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে বার্থেলো বলেন, এক বিশেষ আবিষ্কারের প্রয়োজন আছে এবং তাহা কোন বিশেষ 'শক্তি'র আবিষ্কার ও সেই শক্তি এত অমিতভাবে সঞ্চিত থাকিবে যে ইঙ্গিত মাত্রে সামান্য বা বিনা আয়াসে আমাদের কার্য্যে যে কোন পরিমাণে তাহাকে আমরা প্রযুক্ত করিতে পারিব। পূর্ব্ববর্ণিত এসিটিলিন প্রস্তুতপ্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাই সাধারণ অঙ্গারক ও হাইড্রোজেন মিশ্রণ দ্বারা উহা উদ্ভূত হয় বটে কিন্তু ঐ দুই পদার্থের যে প্রকারের মিশ্রণ আবশ্যক তাহা বিশেষ ও প্রবল শক্তি ইলেকট্রিসিটির সাহায্যে সম্পাদিত হয়। এই স্থলে রাসায়নিক 'মিশ্রণ' ও 'শক্তি'র তাৎপর্য্য সংগ্রহে একটু সচেষ্ট হইলেই আমরা বুঝিতে পারি এক পদার্থ অন্য পদার্থের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন হওয়াই 'মিশ্রণ' এবং যাহা ঐরূপ সংলগ্ন হইবার সুবিধার জন্য এক পদার্থকে বহু সূক্ষ্ম অংশে বিভাগ করিতে সমর্থ হয় তাহাই রাসায়নিক 'শক্তি' এবং যাহা যত বেশী অংশে বিভাগ করিতে পারে তাহা তত বড় 'শক্তি'। প্রকৃতি এই শক্তিশালিনী বলিয়াই তাহাকে নির্ম্মাত্রী ধাত্রী স্বরূপে দেখিতে পাই। মানব যত পরিমাণে এই শক্তিকে হস্তগত করিতে পারিবে ততই প্রকৃতির স্থান অধিকার করিতে থাকিবে। অঙ্কশাস্ত্রবিৎ আর্কেমিডিস যেমন বলিয়াছিলেন দণ্ড স্থাপনের স্থান পাইলে তিনি পৃথিবীকেও কক্ষচ্যুত করিতে পারিতেন, তদ্রূপ বার্থেলো বলিয়াছেন উপযুক্ত 'শক্তি' হস্তগত হইলেই মানব প্রকৃতির ন্যায় নিজ আবশ্যকীয় বহু পদার্থ নির্ম্মাণে সক্ষম হইয়া প্রকৃতির মুখাপেক্ষিতা অনেক পরিমাণে হ্রাস করিতে সমর্থ হইবে।

'শক্তি'র এই অর্থে জল, তাপ, ইলেক্ট্রিসিটি সকলই রাসয়নিক 'শক্তি'; ইহারা সকলেই পদার্থ নিচয়কে বহুধা

বিভক্ত করিতে সক্ষম এবং তজ্জন্যই এই সকল শক্তির সাহায্যেই প্রায় সমুদয় রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাধিত হয়। চাপের অধীনেও যে রাসায়নিক ক্রিয়া সাধিত হয় তাহারও কারণ অন্য কিছু নহে, তাহাও এই যে, এক পদার্থের সূক্ষ্ম অণু অন্য পদার্থের সূক্ষ্ম অণুর সহিত চাপ দ্বারা, নূতনতর পদার্থের সৃজন করে, নৈকট্যভাবে পাশাপাশি হইতে পারে। এইরূপ বলিলে রাসয়নিক ক্রিয়ার অর্থও অন্য কিছু নহে—সচরাচর দুই বা ততোধিক পদার্থের সূক্ষ্ম অণুগুলি নূতন ভাবে সজ্জিত হইয়া যে নূতন পদার্থের সৃজন করে সেই ক্রিয়ার নামই 'রাসায়নিক ক্রিয়া'। কখন বা একটী মাত্র পদার্থেও এইরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে দেখা যায় ও তথাকার ক্রিয়াকেও 'রাসায়নিক ক্রিয়া' বলে ; যথা অক্সিজেন হইতে ওজোনের উদ্ভব। অক্সিজেনের সূক্ষ্ম অণু (atoms) গুলি পূর্ব্বে যে ভাবে সজ্জিত ছিল ইলেক্‌ট্রিসিটি শক্তির প্রভাবে তাহা ভগ্ন হইয়া গিয়া নূতন আকারে সজ্জিত হয় তাহারই নাম ওজোন হয়, তাহাতে আর অন্য কোন নূতন পদার্থ সংযুক্ত হয় না। অক্সিজেন তাহার সূক্ষ্ম অণু (atoms) গুলি পরস্পর পরস্পরের প্রতি যে দুইটী আকর্ষণী বন্ধনী দ্বারা সংযুক্ত থাকিয়া যেমন গোটা বা molecules বাঁধিয়া থাকিত সেই দুইটীর একটী রজ্জু মুক্ত হইয়া গিয়া, তেমন গোটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, অন্য একটী মুক্ত সূক্ষ্মতম অণু (atom) কে বন্ধন করিয়া ফেলে এবং এইরূপে তিন তিনটী অণুর এক একটী গোটা বা molecule বাঁধে ও তাহাদের সমষ্টির নাম ওজোন হয়। যথা, যদি কোন অক্সিজেন কণা ৬টী সূক্ষ্ম অণু বা atoms এর সমষ্টি হয় তাহাতে ৩টী গোটা বা molecules থাকিবে, কিন্তু যখন ওজোনে পরিণত হইবে তখন তাহাতে ২টী গোটা বা molecules হইবে।

রসায়নাগারে প্রকৃতির ন্যায় স্বাভাবিক পদার্থ প্রস্তুত হইতে পারে ইহা নূতন কথা নহে। রসায়নাগারে হীরকও প্রস্তুত হইয়াছে কিন্তু তাহার জন্য তাপ, চাপ, ইলেক্‌ট্রিসিটি তিনটী শক্তি প্রয়োগ করিতে হয় এবং তাহা বহু ব্যয়সাধ্য ও সময়সাপেক্ষ সুতরাং ব্যবসায়ের হিসাবে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত হীরক তত কাযের হয় নাই। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বার্থেলো বলিয়াছেন রসায়নাগারে মানবের খাদ্য প্রস্তুত করিতে হইলে এমন কোন শক্তির আবিষ্কার আবশ্যক যাহা এত অফুরন্ত ভাবে পাওয়া চাই যে সামান্য বা বিনা ব্যয়ে যে কোন সময়ে যে কোন পরিমাণে তাহা আমরা রসায়নাগারের কার্য্যে লাগাইতে পারি।

এমন 'শক্তি' কোথায় পাওয়া যাইবে বার্থেলো তাহার আভাস স্বরূপে বলিয়াছেন প্রকৃতি কর্তৃক ব্যবহৃত সম্পূর্ণ শক্তি মানবের হস্তগত হওয়া অসম্ভব বা কল্পনাতীত হইলেও পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াদি সাধনের উপযুক্ত শক্তি পৃথিবীর আভ্যন্তরিক তাপের কিয়দংশ গ্রহণ করিতে পারিলেই মানবের হস্তগত হইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি বলেন পৃথিবীর অভ্যন্তরে ৩ মাইল গভীরে যে তাপ পাওয়া যায় তাহাই যথেষ্ট। এজন্য পৃথিবীর যে কোন স্থানে ৩ মাইল গভীর একটী গর্ত্ত বা গহ্বর খনন করিলেই হইবে। বর্ত্তমানে ইঞ্জিনিয়ারীং বিদ্যা যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তিনি বলেন, তাহাতে এইরূপ খাত খনন নিতান্ত কল্পনার কথা নহে এবং অত্যল্পকাল মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারীং বিদ্যার যে উন্নতি হইবে তদ্দ্বারা ইহা যে নিশ্চিত সাধিত হইতে পারিবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। পৃথিবীর আবরণের ৩ মাইল নিম্নে যে তাপ পাওয়া যাইবে, বার্থেলো বলেন, তাহাই পৃথিবীস্থ প্রাণিজগৎ বিশেষতঃ মানবজগৎ ও শিল্পজগতের পক্ষে যথেষ্ট। মানব এখানে-ওখানে শক্তি ক্ষমতার অন্বেষণ করিয়া ফিরে, কিন্তু তাহার পদতলে যে মহাভৃত্য পড়িয়া আছে তাহাকে কাযে লাগাইতে পারিলেই যে সকল মানবই প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া সমান সুখস্বচ্ছন্দ ভোগের অধিকারী হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? এইরূপ শক্তি রসায়নাগারের সহায় হইলে তথায় প্রকৃতির অনুকরণে বহু পদার্থ নির্ম্মিত হইবে তাহা ত সর্ব্ববাদিসম্মত কথা।

এইরূপ গভীর খাতের অন্যান্য সুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি বলিয়াছেন এত নিম্নে জলকে যেরূপ তাপ ও যত উচ্চ চাপের অধীনে পাওয়া যাইবে তাহার সাহায্যে মানবচালিত যে কোন কল বা এঞ্জিন একরূপ বিনাব্যয়ে চালিত হইতে পারিবে। পানীয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেও আমরা দেখিতে পাই পানীয়ের (জলের) অপবিত্রতা জন্যই মানব বহু পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এমন কোন নদী

বা প্রস্রবণ নাই যাহার জলে পীড়াজনক জীবাণু (microbes) বহুপরিমাণে বিদ্যমান থাকেনা বা এমন কোন প্রক্রিয়া দ্বারা মানব এখনো জলকে পরিশুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই যাহা দ্বারা ব্যয় করিয়াও পানীয় পীড়োৎপাদক জীবাণু হইতে একেবারে মুক্ত হয়। প্রত্যহই আমরা পানীয়ের সহিত নানা ব্যাধি-উৎপাদক বহু জীবাণু উদরস্থ করি। কিন্তু আমরা একপ্রকার বিনা ব্যয়ে ৩ মাইল নিম্নে পরিস্রুত যে বিশুদ্ধ জল পাইব তাহা অতি পবিত্র জল হইবে এবং তদ্দ্বারা মানব অকালমৃত্যুর অন্যতম কারণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত
দিনাজপুর।

লবকোট ও কুশাবতী।

('খত্রি' ও 'ছত্রি' সমন্বয়)

অযোধ্যাধিপতি মহারাজ রামচন্দ্রের পুত্র লব ও কুশ লবকোট ও কুশাবতী নামক দুইটি নূতন নগর সংস্থাপন করিয়াছিলেন, বলিয়া কিম্বদন্তী আছে।* তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী বংশধরগণ জ্ঞাতিগণের সহিত সৌহার্দ্দ রক্ষা করিয়া এই নগরদ্বয়ে আধিপত্য করিতে থাকেন। অবশেষে কুশাবতীতে কুলপুত্রের ও লবকোটে কুলরাওয়ের শাসন সময়ে প্রসঙ্গক্রমে জ্ঞাতিকলহ উপস্থিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে ভীষণ শত্রুতা প্রাদুর্ভূত হয়। ইহার ফলে কুলপুত্র নিদারুণ প্রতিহিংসাবশে প্রবল সেনাসহকারে লবকোট আক্রমণ করিয়া স্বীয় অধিকারে আনয়ন করেন। এইরূপে কুলরাও স্বাধিকারচ্যুত হইয়া নিতান্ত নিরুপায় অবস্থায় দাক্ষিণাত্যের তদানীন্তন অধিপতি মহারাজ অমৃতের আশ্রয়প্রার্থী হইলেন। অমৃত তাঁহার দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া নানারূপ সদয় ব্যবহারে তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন; এবং ক্রমে সহানুভূতি ও আন্তরিকতা বৃদ্ধির সহিত কুলরাওয়ের ন্যায় অভিজাত পাত্রে স্বীয় কন্যা-সম্প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় ঐশ্বর্য্যের অধিকার প্রদান করিলেন। এই শুভানুষ্ঠানের অল্পকাল পরেই অমৃত পরলোক গমন করেন এবং অমৃতের কন্যার গর্ভে কুলরাওয়ের এক পুত্র জন্মে। ইহাঁর নাম সাদীরাও। দক্ষিণাপথের শাসনদণ্ড কালসহকারে সাদীরাওয়ের হস্তে পতিত হইলে, তিনি আর্য্যাবর্ত্ত আক্রমণ করিয়া তাহার কিয়দংশে স্বীয় অধিকার বিস্তার করেন। তিনি সম্ভবতঃ শিশুকালেই পিতৃমাতৃহীন হন, সুতরাং অমাত্যমুখে কুলপুত্র-কর্ত্তৃক পিতার নির্ব্বাসন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, সদলবলে কুলপুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া পিতৃরাজ্য লবকোটের পুনরুদ্ধার ও সেই সঙ্গে কুলপুত্রের রাজ্য অধিকার করেন। রাজ্যভ্রংশে কুলপুত্রের বৈরাগ্যোদয় হয়; সুতরাং তিনি নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে পুণ্যতীর্থ বারাণসীতে উপনীত হইয়া ধর্ম্মসঞ্চয়ের সহিত শান্তিলাভাশায় বেদাধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। অধীয়মান বেদের স্থানবিশেষে দুর্ব্বৃত্ততার পুনঃ পুনঃ নিষেধ পাঠে কুলরাওয়ের প্রতি স্বীয় দুর্ব্ব্যবহার স্মরণ করিয়া, নিতান্ত অনুতপ্তহৃদয়ে তিনি সাদীরাওয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্বকৃত দুষ্কৃত স্বীকার পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সাদীরাও পরিতপ্ত পিতৃশত্রুর মুখে সুমধুর বেদপারায়ণ শ্রবণ করিয়া তাঁহার বিগত ব্যবহার ক্ষমা করিয়াই নিরস্ত হইলেন না, অধিকন্তু পিতৃসিংহাসনে কুলপুত্রকে স্থাপিত করিয়া লবকোটের সমস্ত অধিকার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। কুলপুত্রের এই বেদানুশীল হইতে তিনি ও তদ্বংশীয়গণ 'বেদী' নবীন আখ্যা প্রাপ্ত হন। সুপ্রসিদ্ধ শিখসম্প্রদায়ের প্রথম প্রবর্ত্তয়িতা গুরু নানকের জনক কালু এই কুলপুত্রেরই একজন অধস্তন বংশধর এবং কুলক্রমাগত 'বেদী' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। নানক ও পরবর্ত্তী শিখগুরুগণ 'খত্রি' বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচিত। পাঞ্জাবে 'খত্রি' নামক যে জাতি দৃষ্ট হয়, তাঁহারা আপনাদিগকে প্রাচীন ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন*। 'খত্রি' শব্দও ক্ষত্রিয়েরই অপভ্রংশ

* প্রাচীন লবকোট এক্ষণে লাহোর নামেই বিশেষ পরিচিত। বর্ত্তমান ফিরোজপুর নগরের ছয়ক্রোশ দূরে কুশাবতী নগর অবস্থিত ছিল বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

* কাশীস্থ নাগরীপ্রচারিণীসভার উপসভাপতি ক্ষত্রিবংশীয় বাবু শ্যামসুন্দর দাস বি-এ, বলেন,—'ছত্রি' বা রাজপুত জাতি খত্রি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, তাঁহারা আধুনিক জাতি। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অগ্নিকুল রাজপুতগণ শকসম্ভব শূদ্র নহে। পক্ষান্তরে খত্রিদিগের আচার ব্যবহার পাঞ্জাবের সারস্বত ব্রাহ্মণগণের সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্যবিশিষ্ট। তাঁহারা খত্রিগক 'কাচ্চা' অন্নগ্রহণে আপত্তি ত করেনই না বরং হায়দারাবাদ

বলিয়া অনুমতি হয় ; কারণ পাঞ্জাবীরা বঙ্গীয়দিগের ন্যায় 'ক্ষ' স্থানে সাধারণতঃ 'খ' উচ্চারণ করিয়া থাকেন। অন্ততঃ উল্লিখিত আলোচনা হইতে অবগত হওয়া যায়, সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়বংশধুরন্ধর কুশের বংশে শিখগুরু নানকের জন্ম হয়।

পক্ষান্তরে লবের বংশের একটি শাখা লবকোট (বর্ত্তমান লাহোর) পরিত্যাগ করিয়া, সৌরাষ্ট্রে (দ্বারকায়) গিয়া বসতি করিয়া, বীরনগর নামে একটি নগর সংস্থাপন করেন। কনক সেন এই শাখার আদিপুরুষ বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত। তাঁহার প্রপৌত্র বিজয় সেন বিজয়পুর ও বিদর্ভ (সিহোর) নামক নগরদ্বয় নির্ম্মাণ করেন। বল্লভীপুর * ইহাঁদিগের রাজধানী ছিল। কিন্তু কালসহকারে বল্লভীপুর অসভ্য ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ কর্ত্তৃক † আক্রান্ত হইয়া রাজবংশ বিধ্বস্ত হইলে, রাজ্ঞীগণ মহারাজ শিলাদিত্যের ‡ সহমৃতা হন ; কিন্তু অন্যতমা অন্তর্ব্বত্নী মহিষী চন্দ্রাবতীর প্রমার রাজদুহিতা পুষ্পবতী পিতৃগৃহ হইতে বল্লভী যাইবার পথে এই শোকসংবাদ অবগত হইয়া, পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া সমীপবর্ত্তী মালিয়া শৈলমালার গহ্বরে আশ্রয় লইয়া পূর্ণকালে একটি সুলক্ষণসম্পন্ন পুত্র প্রসব করেন এবং বীরনগরনিবাসিনী কমলবতী নাম্নী এক ব্রাহ্মণীর হস্তে সদ্যজাত শিশুর লালন পালন ভার সমর্পণ করিয়া পতির অনুমৃতা হন। গিরিগুহায় জন্মহেতু পরে এই শিশু গুহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। শান্তচরিত্র ব্রাহ্মণবালকগণের সহিত সাহচর্য্য ও তদুপযোগিনী শিক্ষা গুহের ভাল লাগিত না, বরং উগ্রস্বভাব পার্ব্বত্য ভীলবালকগণের প্রতিই তাঁহার অত্যধিক অনুরাগ লক্ষিত হইত। তাহারাও তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত গুহের রাজোচিত গুণাবলী সম্যক্ পরিস্ফুট হওয়ায়, তাঁহার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া তাহারা তাঁহাকে নেতারূপে বরণ করিল। ইহাতে তিনি বিন্দুমাত্র রক্তপাত না করিয়াই ইদর-ভূমির উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন। এই গুহ হইতেই রাজস্থানের শিরোমণি গিহ্লোট (গেহিলোট বা গোহিলোট) বংশের উৎপত্তি।

অষ্টম পুরুষ পর্য্যন্ত গুহের সন্ততিগণ এই পার্ব্বত্য জাতির উপর শাসনদণ্ড পরিচালিত করেন। অবশেষে রাজা নাগাদিত্যের আচরণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীলগণ তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার রাজ্য পুনর্গ্রহণ করে। এই বিপ্লবে নাগাদিত্যের তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র বাপ্‌পার জীবন বিপৎ-সংকুল হইয়া উঠিল। গিহ্লোট-রাজপরিবারের কুল-পুরোহিত নিতান্ত নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে ভাণ্ডীর দুর্গে একজন যদুবংশীয় ভীলের আশ্রয়ে রাখিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না ; সুতরাং তথা হইতে তাঁহাকে পরাশর বনে লইয়া যাওয়া হয়, এবং ত্রিকুট পর্ব্বতের সানুদেশসন্নিহিত নগেন্দ্র নগরে ব্রাহ্মণদিগের তত্ত্বাবধারণে তাঁহাকে রাখিয়া, তিনি কতকটা নিরুদ্বেগ হন। কিন্তু শান্তশীল ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মোপদেশ ও শান্তিময় ধর্ম্মানুষ্ঠান মধ্যে নিরাপদে থাকিয়াও বাপ্‌পা বালস্বভাবসুলভ চপলতা বশতঃ শোলাঙ্কিবংশীয় নগেন্দ্ররাজের ভয়ে তথা হইতেও পলায়ন করিতে বাধ্য হ'ন। এই সময়ে চিতোরপ্রদেশ প্রমারবংশীয় মোরী বা মৌর্য্য রাজ-গণের অধিকৃত ছিল। বাপ্‌পার পূর্ব্বপুরুষ গুহ প্রমারবংশীয় চন্দ্রাবতীরাজের দৌহিত্র—এই পরিচয় দিয়া চিতোররাজ মান সমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া, বাপ্‌পার শৌর্য্যবীর্য্যে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে সেনাপতিপদে বরণ করেন। এই সময়ে বৈদেশিক শত্রু-কর্ত্তৃক চিতোর আক্রান্ত হইলে, সামন্তগণ বিদেশীয় বাপ্‌পার উন্নতিতে আপনাদিগকে অপমানিত মনে করিয়া যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইলে, এক বাপ্‌পাই অসাধারণ পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া চিতোরের বহিঃশত্রু নিবারণ করিলেন। এদিকে বিদ্বেষপরায়ণ সামন্তগণ মানরাজের পক্ষপাতিতায় প্রতিহিংসা নিবৃত্তির উপায়ান্তর না দেখিয়া, বাপ্‌পাকেই কৌশলে স্বদলে আনয়ন করিয়া রাজ্যলাভের দুর্ব্বাসনা তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত করিয়া দিলেন। এই প্রলোভন ও উত্তেজনার

অঞ্চলে অনুলোম প্রতিলোমক্রমে খত্রি ও সারস্বতব্রাহ্মণে বিবাহের আদানপ্রদান হইয়া থাকে। ইহা সমাজসংস্কারকগণের অনুসন্ধানের বিষয় নহে নাই।

* বর্ত্তমান ভবনগরের পাঁচক্রোশ উত্তরপশ্চিমে প্রাচীন বল্লভীপুরীর ভগ্নাবশেষ আছে বলিয়া উল্লিখিত হয়।

† কিম্বদন্তী এইরূপ, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে সিন্ধুতটবর্ত্তী শ্যামনগরে পারদ নামক অনার্য্য জাতি বাস করিত। তাহারাই বল্লভীপুর আক্রমণ করে।

‡ কর্ণেল টড বলেন, জন্মরহস্য হেতু ইহার নাম গয়বী ছিল। মিবার ১ অং।

ফলে অচিরকাল মধ্যেই মৌরীবংশের উচ্ছেদ সাধিত হইল এবং পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমে বাপ্পাই খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে কৃতঘ্নতাপাপপঙ্কিল চিতোররাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইহার পর ছত্রিশবৎসর পর্য্যন্ত তিনি চিতোরে শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়া পারস্য রাজ্যাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন, বলিয়া ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করে।

দেশবৈরী কান্যকুব্জরাজ জয়চন্দ্রের বিদ্বেষমূলক আহ্বানে সাহাবুদ্দীন মহম্মদ ঘোরি মহারাজ পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে যে সময় ভারতে সমরযাত্রা করেন, সেই থানেশ্বরের যুদ্ধক্ষেত্রে দেশবৎসল পৃথ্বীরাজের পার্শ্বে, তদীয় ভগিনীপতি চিতোর-রাজ যোগীন্দ্র সমরসিংহকে দেখিয়া বাপ্পার বংশধরের বীরতা স্মরণ করিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। আবার পানিপথ যুদ্ধের পর ভারতসাম্রাজ্য যখন বাবরের করায়ত্ত, সমরজীরের অধস্তন পুরুষ সংগ্রামসিংহই তাহার গতিরোধ করিবার উদ্যোগ করিয়া সিক্রির যুদ্ধে বিফল মনোরথ হ'ন। আবার আকবর যখন প্রবল পরাক্রমে ও কূটবুদ্ধিসাহায্যে রাজস্থানের অন্যান্য রাজপুতগণকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিয়া পণ্যরূপে কাহারও কাহারও দুহিতা স্বীয় অবরোধভুক্ত করেন—এক মহাবীর প্রতাপসিংহই স্বাধীনতার, স্বদেশের ও স্বধর্ম্মের নামে অসি উত্তোলিত করিয়া হলদিঘাট ও দেবির যুদ্ধক্ষেত্র ভারতের পবিত্রতীর্থে পরিণত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। স্বদেশপ্রেমিকগণের চূড়ামণি প্রাতঃস্মরণীয় বীরেন্দ্র প্রতাপ অমিততেজঃ মোগলশক্তির নিকট জাতিমান বিক্রয় করা অপেক্ষা অনশনে বনে বনে ভ্রমণ করাও শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া নিতান্ত নিঃসম্বল অবস্থায় আকবরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জীবন শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যাপিত করেন। আবার ক্রূরকর্ম্মা আওরেঙ্গজেবের হস্ত হইতে রূপনগর-রাজদুহিতাকে রক্ষা করিবার জন্য মহারাজ রাজসিংহ যেরূপ মহত্ব, শৌর্য্য ও যুদ্ধনৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও চিতোরের রাজবংশের যশঃ ও স্বাধীনতা-প্রিয়তা ইতিহাসে অক্ষুণ্ণ হইয়া রহিয়াছে। স্বাধীনতার লীলাস্থলী চিতোরের গিহ্লোট বা শিশোদীয় বংশীয় যে পুরুষসিংহগণ হৃদয়ের তপ্ত শোণিত দানে মাতৃভূমির কল্যাণ কামনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা ভারতপূজ্য মহারাজ রামচন্দ্রপুত্র লবেরই বংশধর বলিয়া আমাদিগের আরও অধিক সম্মানের পাত্র। অভিহিতপূর্ব্ব যে মহানুভবগণ স্বদেশের, স্বজাতির ও স্বধর্ম্মের জন্য—সংক্ষেপতঃ ভারতের জন্য স্ব স্ব জীবন উৎসর্গ করিয়া বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, বাপ্পা হইতে আরম্ভ করিয়া ইহাঁরা সকলেই রাজপুত নামে অভিহিত। রাজপুত ও 'ছত্রি' পর্য্যায়শব্দ। 'ছত্রি' ক্ষত্রিয় শব্দেরই অপভ্রষ্ট রূপান্তর মাত্র।* এইরূপে মহারাজ রামচন্দ্রের বংশাবলী তদীয় পবিত্র নামের মাহাত্ম্যে গুরু নানকের ন্যায় মহানুভব ও প্রতাপসিংহপ্রমুখ স্বদেশব্রতী রাজসন্ন্যাসীর উৎপাদনে প্রাচীন ইতিহাসের ন্যায় আধুনিক ইতিবৃত্তেও চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে 'খত্রি' ও 'ছত্রি' জাতির উৎপত্তিস্থল একই বলিয়া প্রতীত হয়। প্রদেশবিশেষের উচ্চারণবৈষম্য হইতে পৃথক্ নামকরণ হইয়া থাকিবে। মূলতঃ এক জাতি হইলেও ভিন্ন প্রদেশে বাসনিবন্ধন আচার ও ব্যবহারের পার্থক্য উপস্থিত হওয়ায় ক্রমে ভোজনসম্বন্ধ ও বিবাহের আদানও রহিত হইয়া গিয়া পৃথক্ জাতি রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়। বোধ হয় 'খত্রি' ও 'ছত্রি'গণ আপনাদিগের পরম্পরানুগত বিরোধ বিস্মৃত হইয়া উভয় সম্প্রদায়ের একত্ব প্রতিপাদনে উদ্যুক্ত হইলে উপস্থিত কলহের বিনিময়ে একতারূপ অমৃতফলের উৎপত্তি হয়।

কালচক্রের নিষ্পেষণে আমরা এক ভাঙ্গিয়া অনেক হইয়া পড়িয়াছি এবং যতদিন আমরা এই অনেকত্ব দূরে ফেলিয়া একত্বে মিশিতে চেষ্টিত না হইব ততদিন আমাদিগের কোন আন্দোলনেরই ফল যে বিশেষ স্থায়ী হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। যাহাতে অপরের সহিত বৈষম্য আনয়ন করে, তাহাকে বিষধর সর্প বলিয়া দূরে পরিহার না করিলে, মহাপাতকের মহাপথ মনে না করিলে, আমাদিগের মুক্তির উপায়ান্তর নাই। অতএব কি রাজনীতিক বক্তা, কি নৈতিক উপদেশক, কি ধর্ম্ম-উপদেষ্টা, সকলেরই এখন একই মাত্র কর্ত্তব্যের অনুসরণে বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন যিনি যে ধর্ম্মপদ্ধতি

---

* রাজপুতগণ মিবার বংশকে 'অমৃতরত্নাকর খত্রিকুল' বলিয়া সম্বোধন করেন। ইহাতেও বোধ হয় খত্রি ও ছত্রি এক পর্য্যায় বোধক প্রতিশব্দ মাত্র। টডের মিবার অং ১৫ দ্রষ্টব্য।

অনুসরণ করুন না, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রীয়, মান্দ্রাজী যিনি যে প্রদেশবাসীই হউন না কেন, তাঁহাদিগের সকলেই 'ভারতীয়' এই সাধারণ নামের সমান ভাবে অধিকারী। ভারতীয়ত্বই তাঁহাদিগের একত্ববিধায়ক মহৎ গুণ, বা নৈয়ায়িকের 'জাতি'। আমরা কিসে ভিন্ন তাহা না দেখিয়া, কিসে অভিন্ন জানিতে বুঝিতে শিক্ষা করাই আমাদিগের জাতীয় শিক্ষার মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। যে দিন হইতে আমরা সমস্ত বৈসাদৃশ্য বিস্মৃত হইয়া ভারতবাসীমাত্রকেই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে দ্বিধা বোধ করিব না, সেই দিন হইতেই বুঝিব ভারতীয় জাতি গঠিত হইয়াছে। তখন ইংরাজ কেন, সমস্ত জগৎ আমাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেও আমাদিগকে স্বরাজের স্বত্ববঞ্চিত করিতে সমর্থ হইবে না। উপরে যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, এক রামচন্দ্র হইতেই 'খত্রি' ও 'ছত্রি' বিবদমান জাতিদ্বয়ের উৎপত্তি, সেই রূপ মনু হইতেই কি আমরা সকলে উৎপন্ন হইয়া মানব আখ্যা ধারণ করি নাই? যাহাদের মধ্যে এই প্রধান একত্ববীজ বর্ত্তমান, অন্যান্য ক্ষুদ্র বিসদৃশ ভাব যতই প্রবল হউক না, ইহার নিকট তাহাদের সমস্ত শক্তি সম্যকরূপেই পরাহত। দুঃখের বিষয় আমরা মূল ভুলিয়া গিয়া শাখার বিভিন্নতা লইয়া মূর্খের ন্যায় বিবাদ করিয়া মরি। মূলের দিকে দৃষ্টি পড়িলেই কিন্তু সব কলহ মিটিয়া যায়, অন্ধ অভিমান যখনই তাহাতে বাধা দেয়, তখনই অধোগতি ঘটিতে আরম্ভ হয়—তখনই (এক রামচন্দ্রের বংশধর হইয়াও) এক ভ্রাতা অপর ভ্রাতাকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে বদ্ধপরিকর হন। সুতরাং এই জাতীয় ক্ষুদ্র সংকীর্ণতা ভুলিয়া গিয়া আমাদিগকে ভারতীয়ত্বে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া তাহাতেই তন্ময় থাকিতে হইবে, তবেই আমরা কিছু করিতে পারিব—মহাজাতি বলিয়া পরিচয় দিবার উপযোগী হইব। এই জন্য লবকোট কুশাবতীর উপাখ্যান উপন্যস্ত করিয়া ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, এককাণ্ডের শাখাদ্বয় এক্ষণে কিরূপ বিভিন্নজাতীয় বৃক্ষরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, এবং অন্তর্দৃষ্টি ও একপ্রাণতার অভাববশতই আমরা তাহাদিগকে এ যাবৎ কিরূপ পৃথক্‌চক্ষেই দেখিয়া আসিতেছি। অতঃপরও যদি আমরা এই ভেদনীতির অনুসরণ করিয়া আত্মকলহের বীজ প্রতি হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে এ অধঃপতন হইতে আমাদিগের উদ্ধার-বাসনা বিড়ম্বনামাত্র—আমাদিগের জাতীয় উন্নতিবিধানের পথ কণ্টকাবৃত! অতএব হে ভারতবাসী ভ্রাতৃগণ! আসুন, বিরোধী ধর্ম্ম, বিরুদ্ধ ব্যবহার, বিভিন্ন ভাষা, পৃথক্ প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া, আমরা সকলেই 'ভারতসন্তান' এই অভিন্ন একত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরস্পরের সহিত সহৃদয়তা ও সহানুভূতি প্রদর্শন জন্য ক্রমশঃ বলসঞ্চয় করিতে বদ্ধপরিকর হই।

বারাণসীপ্রবাসী
ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

কঃ পন্থাঃ।

১৫।১৬ বৎসরের কথা, পালামৌএর জঙ্গলের মধ্যে এক দিন বৈকালে, এইরূপ প্রথম গ্রীষ্মের বৈকালে *, কএকজন বাঙ্গালী বসিয়া গল্প করিতেছিল। বাঙ্গালী গল্পপ্রিয়, সমাজপ্রিয়, বাঙ্গালী যেখানে থাকে সেই খানেই পাঁচজনে একত্র বসিয়া গল্প গুজব করিয়া থাকে; বিদেশী বাঙ্গালীর জীবনে এই একটু সুখ, তাহার ক্লান্তিপূর্ণ পরিশ্রমময় জীবনে এই একটু আরাম।

ছোট নাগপুরের জঙ্গলের মধ্যে পালামৌকে একটী ক্ষুদ্র বাঙ্গালী উপনিবেশ বলিলে চলে। অন্ততঃ যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ঠিক তাই ছিল। আজকাল পালামৌএ কলের গাড়ী চলিতেছে, তখন কলের গাড়ীর পথ হয় নাই। তখন সাধারণতঃ লোকে গয়া হইতে গরুর গাড়ী করিয়া ছোটনাগপুরের সেই ভয়ানক পাহাড় জঙ্গলের মধ্যদিয়া কএক দিন ধরিয়া যাইয়া পালামৌ গিয়া পঁহুছিত। এই ছিল সাধারণ পথ। কখন কখন দৃশ্যপ্রিয় নূতনত্বপ্রিয় কোন কোন বাঙ্গালীকে এক্কা করিয়া বারুণডিহিরির পথে, কখন পালামৌ জেলার বাণিজ্যপ্রধান স্থান গাড়োয়া হইয়া রোটাস দুর্গ দেখিয়া, সমস্ত সাহাবাদ জেলার সুরম্য দৃশ্য দেখিয়া, পশ্চিমের কলের গাড়ীর পথে যাতায়াত করিতে শুনা যাইত, কিন্তু সে অতি কচিৎ। সাধারণ পথ গয়ার পথ ছিল। পথের দুর্গমতা, স্থানের স্বাস্থ্য দেখিয়া, দুই চারি ঘর বাঙ্গালী পালামৌএ ঘর বাড়ী করিয়া বসবাস

* এই প্রবন্ধ গত মার্চ্চে লিখিত হয়।

করিতেছিলেন। এই সকল বাসিন্দা বাঙ্গালীর মধ্যে ৺ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রধান। শশীবাবু তখন জীবিত। প্রাতঃস্মরণীয় শশীবাবুর নাম উল্লেখে আর কেহ না হোক তদানীন্তন পালামৌবাসী বাঙ্গালী মাত্রেই সন্তুষ্ট হইবেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন আবাল বৃদ্ধ বনিতা লইয়া পালামৌএ বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় দুইশত হইবে।

তখনকার বৈকালি বৈঠক প্রায়ই সরকারী প্রধান চিকিৎসক (Civil Surgeon) কুঞ্জবাবুর বাসায় বসিত, কখন কখন শশীবাবুর বাড়ীতে।

যেদিনের কথা বলিতেছি, সেদিন আসর কুঞ্জবাবুর বাসায়। যেমন হইয়া থাকে,—পারিবারিক কথা, দেশের সমাচার, কর্ম্মস্থানের সাহেবকৃত তিরস্কার, শেষ গিয়া পড়িল কথা বাঙ্গালার ভাবী উন্নতিতে,—বিদ্যাশিক্ষা, বিলাত যাওয়া, জমাট বাঁধিল দেশের কলকারখানায়; রিষড়ার কল, বরাহনগরের কল, চামদানীর কল, বোধ হয় নিমতলার মড়া পোড়ান কলের কথাও হইয়া থাকিবে।

সকলেরই একমত, সকলেরই একরায়, সকলেই এক আশায় আশ্বস্ত; দেশের ভবিষ্যৎ বড়ই পরিষ্কার, বড়ই আশাপ্রদ। অন্যদিন অপেক্ষা সেদিন অধিকক্ষণ বৈঠক চলিল, শেষে সভা ভঙ্গ হইল। যদি পুরাতন হিসাব থাকে ডাক্তার বাবু বলিতে পারেন তাঁহার তামাকু খরচ সেদিন দ্বিগুণ হইয়াছিল কি না। আর বাসার ঠাকুর ও গৃহস্থ পরিবারের গৃহিনীরা বলিতে পারেন সেদিন রাত্রে অনশনে অথবা অর্দ্ধাশনে থাকিতে হইয়াছিল কি না। সেইদিন বৈঠকের তর্কবিতর্কে যোগ দেন নাই কেবলমাত্র উপস্থিত একজন ভদ্রলোক, তিনি নীরবে সভাস্থলে বসিয়াছিলেন। সভা ভঙ্গ হইলে তিনি নীরবে বাসায় চলিয়া গেলেন। তিনি পূর্ত্তবিভাগের লোক; পালামৌ তখন নূতন জেলা হইয়াছে, তিনি সরকারী ইমারত সকল প্রস্তুত করিতে আসিয়াছিলেন।

পরদিন বৈকালে ডাক্তার বাবুর বাসায় ঐ বাবুটী উপস্থিত আরও দুই একজন উপস্থিত, মজলিস্ তখন পুরা হয় নাই, সকলে আসিয়া জুটিতে তখনও পারে নাই। বাবুটী স্বভাবতঃ অতি ধীর প্রকৃতির লোক, তিনি আস্তে আস্তে আরম্ভ করিলেন;—তিনি বলিলেন:—"আপনারা যে কলকারখানার কাল অত প্রশংসা করিলেন তাহাতে দেশের কি সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা আপনারা জানেন না তাই অত কথা বলিলেন; আমার বাড়ী চামদানী, কলকারখানায় দেশের যে কি অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। যে চরিত্র মানুষের সর্ব্বস্বধন, যে চরিত্র জাতীয় জীবনের প্রধান উপাদান, আমরা এই কল কারখানার দায়ে তাহা খোয়াইতে বসিয়াছি; দেশ নিরন্ন, ম্যালেরিয়াতে অনেক পরিবার নির্ব্বংশ হইয়াছে, হয়তো কোন সংসারে দুই একটী বিধবা আছে, তাহাদের দিনান্তে অন্ন জুটে না, গৃহে সম্বল এক আধখানি ভাঙ্গা পাথর, আর যাহা কিছু বিক্রয়ের উপযুক্ত ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বিক্রয় করিয়া খাইয়াছে; এখন আর পেটে অন্ন নাই, শরীরে একখণ্ড জীর্ণ ছিন্ন নেকড়া ভিন্ন বস্ত্র নাই, গৃহস্থের মেয়ে সাধারণে ভিক্ষা করিতে যাইতে পারে না, আর ভিক্ষা চাহিলেই বা দেয় কে? অনেক দিন অনশনে যায়। এখন আর দেশে কাট্‌না কাটা নাই বা এমন কোন সৎবৃত্তি নাই যাহা অবলম্বন করিয়া গরীব ভদ্র লোকের মেয়ে ঘরে বসিয়া আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। সম্মুখে চামদানীর কল। ধর্ম্মপথ ত্যাগ কর, ঘর হইতে পা বাড়াও, পাপস্রোতে গা ঢাল, আর তোমার অন্ন বস্ত্রের কষ্ট নাই, স্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়া যাইবে। দৃষ্টান্ত অতি ভয়ানক। অভাগিনী দেখিতেছে, তাহার পাড়ার কত হতভাগিনী তাহারই মত অন্ন বস্ত্রের অভাবে, তাহারই মত নানা কষ্টে ছিল, আজ তাহাদের আর কোন কষ্ট নাই। এইরূপে দেশ উৎসন্ন যাইতেছে।" ভদ্রলোক নীরব। উপস্থিত সকলেই নীরব।

কথা ভাবিবার বটে। কেবল যে দেশে পাপের সংসার বৃদ্ধি পাইতেছে আর ধর্ম্মের সংসার উৎসন্ন যাইতেছে, তাহা নয়। দেশে যে কেবল কল কারখানায় নৈতিক পতন হইতেছে আর আর্থিক উন্নতি হইতেছে তাহা নয়। দেশ সকল প্রকারেই উৎসন্ন যাইতেছে। স্বজনবর্জ্জিত, সমাজরহিত স্থানে, দেশের যত যুবক যুবতী আসিয়া জুটিতেছে, তাহাদের পরিশ্রমলব্ধ অর্থ সঞ্চয় করে বা সদ্ব্যয় করে এমন পরামর্শ দেয় কে? যে স্বাস্থ্য তাহাদের সর্ব্বস্বধন, যাহার সাহায্যে তাহাদের এই সুখ, এই আপাত মধুর সুখ, তাহা রক্ষা করিতে পরামর্শ দেয় কে? তাহাদের

দৈনিক উপার্জ্জন ভস্মরাশির ন্যায় কোথায় যাইতেছে, পাপের পূজায় তাহাদের শরীর, ও অত শারীরিক পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জিত অর্থ কোথায় চলিয়া যাইতেছে; দেশ যে নির্ধন সেই নির্ধন যে নিরন্ন সেই নিরন্ন, লাভের মধ্যে দেশের মধ্যে পাপের স্রোতের বিস্তার পাইতেছে, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নিরন্নের রোগের সহিত অবৈধাচরণ জনিত রোগ সকল আসিয়া দেশকে উৎসন্ন দিতেছে। তাহার উপায়? এখন হাল যেমন ধরিবে নৌকা সেই পথে যাইবে। কিন্তু একবার দিক নির্ণয় হইলে একবার নৌকা স্রোতে গা ঢালিলে তখন তাহার গতি ফিরান শক্ত হইবে, হয়তো আর ফিরিবে না, অধঃপাতের পাকে পড়িবে।

বিষম সমস্যা;—অন্নাভাবে এই জাতি কি ধ্বংস হইবে? না পাপস্রোতে অন্নের চেষ্টায় গিয়া অধঃপাতের পাকে পড়িয়া নষ্ট হইবে? অনেকে বলিতে পারেন, যে স্ত্রীলোক-দিগকে কলে কাজ দেওয়া উচিত নয়; কিন্তু সে উপায়ে আত্মরক্ষা সম্ভবপর নয়। যাহারা কল্ করিবে, তাহারা স্বার্থের অনুরোধে স্ত্রীলোকদিগকে কলে কাজ দিবে; আইনের অবরোধ অনেক সময় দুর্ব্বল প্রকৃতির লোকদিগকে আট্‌কাইয়া রাখে, নীতির অবরোধ তাহা পারে না। লোকে তাহা মানে না। ইহার উত্তরে সুনীতি হয়তো বলিবেন, "চরকার সূতায় হাতে বুনা কাপড় ব্যবহার কর।" কলে বুনা কাপড়ের ন্যায় যদি সর্ব্বতোভাবে হাতে বুনা কাপড় সস্তা হইত, তাহা হইলে কোন আপত্তি থাকিত না। কিন্তু তাহা হইতে পারে না।

যে স্রোত বহিয়া যায় তাহা আর ফিরিয়া বিপরীতে বহে না, সময় যাহা কাটিয়া যায় তাহা আর আসে না। সময় যায়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার আনুসঙ্গিক সামগ্রী চলিয়া যায়, তাহা না হইলে সময়কে চিনি কিসে? সময়কে জানি কিসে? কাল যে আমাদের ছিল, আজ সে আমাদের নাই, আর সে সেই মূর্ত্তিতে আমাদের মধ্যে আসিবে না, আর সে আমাদের হইবে না; সময়কে চিনি তাহার পরিবর্ত্তনে, আবার সেই পরিবর্ত্তনকে চিনি সময়ে। যেদিন আর পরিবর্ত্তনকে চিনিব না, সেই দিন আমাদের স্থান হইবে অনন্তে। আবার যে কালের আর পরিবর্ত্তন থাকিবে না তখন সেই কাল আর কাল থাকিবে না, সে হইবে অনন্ত।

যাহা এককালে সম্ভবপর ছিল, অন্যকালে সম্ভবপর নয়। সময়ের উপযোগী না হইলে কোন পদার্থই কালের মুখে তিষ্ঠে না, তাহা কালের নিয়ামক হইতে পারে না। ভীমের গদা কুরুক্ষেত্রের নিয়ামক হইয়াছিল; কিন্তু ওএডের তরবারি সেণ্টমিলের যুদ্ধে নিয়ামক হয় নাই, সেখানে ইংরেজ পক্ষে নিয়ামক হইয়াছিল ওএলিংটনের বুদ্ধি। তাই বলিতেছিলাম চরকা আর ভবিষ্যৎ বাঙ্গালার স্বচ্ছন্দের নিয়ামিকা হইবার আশা নাই, তাহার উপর ভরসা করিলেই কালে তাহা মরীচিকা হইয়া দাঁড়াইবে।

অতীতের নাশেই, বর্ত্তমানের প্রকাশেই, কালের আত্ম-বিকাশ; কালের এই অতীত বর্ত্তমানের প্রভেদ বুঝিবার অভাবে তাহার এই গতকে জীবন্তভ্রমে আলিঙ্গন করিতে যাইয়াই তাহার এত দুর্গতি। জাপান বর্ত্তমানকে বর্ত্তমান বলিয়া চিনিয়াছিল, বর্ত্তমানের ভালে ভবিষ্যতের আলোক দেখিতে পাইয়াছিল, সেই আলোকে আপনার পথ চিনিয়া লইয়াছিল, তাই তাহার আজ এত সুকৃতি। আমাদের তাহাই বুঝিয়া চলিতে হইবে। বর্ত্তমানের মুখে ভবিষ্যতের মঙ্গল আরতি শুনিতে হইবে। তবে আমরা তাহার মঙ্গল রাজ্যে উঠিতে পারিব।

মানুষের প্রকৃতিই সংরক্ষণশীলা, যাহা আছে তাহা ছাড়িতে চায় না। ভারতবাসী আবার সংরক্ষণশীলের মধ্যে সংরক্ষণশীল। তাহার শিক্ষাতে বল দীক্ষাতে বল, তাহার সমাজে তাহার ধর্ম্মে বল, তাহার আচারে তাহার ব্যবহারে বল, সকল বিষয়েই ভারতবাসী অতি সংরক্ষণশীল। খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারক তাহার এই সংরক্ষণশীলতা দেখিয়া, গৈরিক বেশধারী সন্ন্যাসী সাজিয়া, পুরাতনের সাজে নূতন দীক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেছে। এই সংরক্ষণশীল জাতির পক্ষে নূতন বিষয়ে সফল হওয়া অপেক্ষা "নষ্ট বিষয় উদ্ধার" করা সহজ। তাহা তাহার প্রকৃতিগত। সেই জন্য এই "স্বদেশী আন্দোলনে" অন্য ব্যবসায় অপেক্ষা বাঙ্গালার কাপড় বুনার ব্যাপারটা অধিক সাফল্য লাভ করিয়াছে। দেখিয়াছি অবস্থাপন্ন গৃহস্থের সন্তান, আপনার ঘরে তাঁত বসাইয়া, আপনাদের সংসারের প্রায় সমস্ত কাপড় নিজে বুনিতেছে।

কিন্তু সখ ও ব্যবসা স্বতন্ত্র। চরকায় সূতা কাটিয়া, হাত-তাঁতে কাপড় বুনিয়া, কলের কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালান অসম্ভব।

চিরদিন রণসাজ সাজে না, চিরদিন লোকে যুদ্ধ করিতে পারে না, যুদ্ধের পরিণাম আছে;—যুদ্ধের পরিণাম জয় পরাজয়, এক পক্ষের জয় অপর পক্ষের পরাজয়। আমাদের দেশে বৈশ্যযুদ্ধ চলিয়াছে, তাহারই আর একটী নাম "স্বদেশী আন্দোলন।" এই স্বদেশী আন্দোলন চিরদিন চলিবে না, চিরদিন চলিতে পারে না। তখন যে পক্ষ বাজারে ভাল দ্রব্য সুবিধা দরে বিক্রয় করিতে পারিবে তাহারই জয় হইবে।

এই স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের দেশে নানারূপ দেশী দ্রব্যের কারখানা খুলা হইতেছে; আন্দোলন থামিয়া গেলে সকল প্রকারই যে আমাদের দেশে প্রস্তুত হইতে পারিবে এরূপ আশা করা যায় না। সকল দেশ, সকল প্রকার দ্রব্যের উৎপাদনের উপযুক্ত নয়, উপযুক্ত নয় বলিয়াই জগতে বাণিজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বস্ত্রবয়ন, যে আমাদের পক্ষে একটী উপযুক্ত উপজীবিকা, তাহা এই দেশের বহুকালের বাণিজ্য বিবরণেই জানা যায়। এই ব্যবসা বাঙ্গালী জাতির মধ্যশ্রেণীর স্বচ্ছন্দের মূল ছিল। যে কোন জাতির মধ্য শ্রেণীই তাহার মেরুদণ্ড স্বরূপ। যে জাতির মধ্যশ্রেণী পরিপুষ্ট, সেই জাতিই জগতে বলবান। এক্ষণে আমরা যতরূপ ব্যবসায়, আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করি না কেন, বস্ত্রবয়ন ব্যবসায়ের পুনরুদ্ধার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও আমাদের অভ্যাসের অনুরূপ। এই বস্ত্রবয়ন শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও এখনও আমাদের মধ্যে জীবিত রহিয়াছে। এখনও দেশী কাপড়ের আদর আমাদের মধ্যে সকলের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রহিয়াছে। এখনও চরকায় সূতা কাটার কথা পৌরাণিক উপন্যাসে দাঁড়ায় নাই। এখনও বর্ত্তমান বাঙ্গালীর অনেকেই পিতামহী বা প্রপিতামহী চরকায় সূতা কাটিতেন, একথা তাহারা জানেন। এখনও চরকায় সূতা কাটা হীন কাজের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। কিরূপে এই এক কালের জাতীয় উপজীবিকাকে পুনরপি আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, কিরূপে এই প্রাচীন উপজীবিকাকে মধ্যশ্রেণীর স্ত্রী পুরুষ উভয়ের আয়ত্তের মধ্যে আনিত হইবে, কিরূপে গৃহ-মহিলা আপনার পরিবার মধ্যে থাকিয়া, স্বামিপুত্রকে বস্ত্রবয়ন কার্য্যে সহায়তা করিতে পারিবে, তাহাই আমাদের বিবেচ্য, তাহাই আমাদের আলোচ্য। বড় বড় কল কারখানায় তাহাদের স্থান নাই। বড় বড় কলকারখানায় সম্ভবতঃ বিদেশী মূলধন খাটিবে। অথচ হাতে বোনা কাপড় কলের কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারিবে না, তবে কর্ত্তব্য কি?

পারিবারিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আপনার পরিবারের মধ্যে থাকিয়া আপনার সংসারধর্ম্ম বজায় রাখিয়া, আপনার জীবিকা অর্জ্জন করিবার পরিজনপ্রিয় বাঙ্গালীগৃহস্থের কোন উপায় আছে কি?

যেরূপ বড় কল কারখানা নানা স্থানে আছে আজকাল সেইরূপ ছোট ছোট কল কারখানা হইতেছে, জাপানে ঐরূপ কল কারখানা অধিক। প্রত্যেক দোকানের নিজের নিজের কারখানা ঘর আছে। তাহাতে আপনার বিক্রেয় দ্রব্য আপনার দোকানের একপ্রকার মধ্যেই, হইতেছে। যে রূপ কলিকাতার উপকণ্ঠে বড় বড় ময়দা প্রভৃতির কল আছে, আবার আজকাল কলিকাতার মধ্যেই অন্যরূপ ছোট ময়দার কল ও অন্য অন্য প্রকার ছোট ছোট কল হইয়াছে; ঐ সকল কল অধিকাংশই বৈদ্যুতিক বলে চলে। আবার আজকাল এত ছোট "অস্থাবর বাষ্পীয় কল" (Portable Steam Engine) পাওয়া যায়, যে নাতি-বৃহৎ একটী ঘরের মধ্যে ঐরূপ কলের সাহায্যে একটী কারখানা খোলা যাইতে পারে।

দেশে বিদেশে আমাদের যুবকেরা "বিষয় বিদ্যা" (technical education) শিক্ষা করিতেছে। আশা করা যায়, ঐরূপ শিক্ষিতের সংখ্যা অল্পদিনের মধ্যেই যথেষ্ট হইয়া ঐ সকল কল আবশ্যক মত মেরামত করিতে পারিবে; ঐরূপ কারখানা খোলা অধিক টাকার কাজ নয়। যদি চাঁদা করিয়া ঋণ দিয়া, উপযুক্ত পরিবার বিশেষকে দেশের মধ্যে মধ্যে উপযুক্ত স্থানে ঐরূপ "পারিবারিক শিল্পশালা" করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহারা ঐ টাকা পরিশোধ করিলে উহাতে নূতন কারখানা খোলা হয়, তাহা হইলে কালে দেশ ঐরূপ "পারিবারিক শিল্পশালায়"

পুরিয়া যাইবে। সত্য বটে বড় বড় কলকারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যের যাহা পড়ন পড়িবে সমস্ত খরচা খতাইলে ঐ সকল "পারিবারিক শিল্পশালায়" প্রস্তুত পণ্যের খরচা তাহা অপেক্ষা বেশী হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু এই সকল ক্ষুদ্র কারখানাগুলির শ্রমজীবীর পারিশ্রমিক ও ধনীর লাভ সমস্তই একহস্তে যাইবে, সমস্তই গৃহস্থ শিল্পশালাকর্ত্তা পাইবেন। সমস্ত আয়ই তাঁহার সংসারের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যয় হইবে, তাহার ভাগ কাহাকেও দিতে হইবে না। আর এক কথা, এই সকল "পারিবারিক শিল্পশালায়" কারখানার কর্ত্তার পরিবারের সকল স্ত্রীলোকেই আরাম বিশ্রাম সময় বাদে তাহাদের নিষ্কর্ম্ম সময় শিল্পশালার কাজে লাগাইতে পারিবেন; এইরূপে পূর্ব্বে চরকা কাটিয়া গৃহস্থ মহিলারা দেশের যে উপকার করিতেন, "পারিবারিক শিল্পশালা" সকল দেশে স্থাপিত হইলে, তাহারা তাহাতে কাজ করিয়া দেশের সেই উপকার করিতে পারিবেন। এই প্রথায়, দেশে "পারিবারিক শিল্পশালা" খোলা হইলে, তাহার লব্ধ আয়, বড় বড় ধনীর ধন বৃদ্ধি না করিয়া, চরিত্রহীন স্বজনভ্রষ্ট শ্রমজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি না করিয়া, প্রকৃত সমাজের সার অংশ, মধ্যশ্রেণীর উন্নতি সাধন করিবে। সমাজের অর্থাভাব ঘুচিবে, অন্নকষ্ট ঘুচিবে। অন্নাভাব জনিত মারীভয় সকল আর দেশকে প্রজ্বলিত শ্মশানে পরিণত করিয়া রাখিতে পারিবে না।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চন্দ্র।

বৌদ্ধধর্ম্মের বিশ্বপ্রেম।*

কপিলবাস্তু নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মহারাজ শুদ্ধোদন ঘণ্টা ঘোষণায় প্রচার করিয়াছেন—অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে কুমার সিদ্ধার্থ নগরোদ্যান দর্শন করিতে যাইবেন; নাগরিকগণ যেন সেজন্য প্রস্তুত থাকেন;—নগরের অপ্রীতিকর বস্তুসমূহ অপনীত করিয়া তাঁহারা যেন চতুর্দ্দিকে প্রিয়দর্শন দ্রব্যসম্ভার সংগৃহীত রাখেন।

শুদ্ধোদন পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সিদ্ধার্থ সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, তজ্জন্যই তিনি সাবধান হইতেছিলেন যে, যেন কোনও প্রকারে কুমারের হৃদয়ে বৈরাগ্যভাব আসিয়া উপস্থিত না হয়।

সপ্তম দিবসে সমস্ত নগর অলঙ্কৃত হইল। উদ্যানভূমি বহুবিধ কুসুমবিতানোজ্জ্বল ও ছত্রধ্বজপতাকালঙ্কৃত হইয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কুমারের যে সকল পথ দিয়া গমন করিবার কথা, সেই সমস্ত সুবিস্তীর্ণ পথ সিক্ত, সম্মার্জ্জিত, গন্ধোদকপরিষিক্ত ও বিকচকুসুমাবকীর্ণ হইয়া পরম শোভা ধারণ করিল। কদলীস্তম্ভ ও পূর্ণকুম্ভ, এবং কনক কিঙ্কিনীদাম ও স্ফটিক মৌক্তিক হার সেই সমস্ত পথকে আরও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিল। কুমার চতুরঙ্গ সৈন্য ও অপরাপর যথাযোগ্য পরিবারে পরিবেষ্টিত হইয়া রথযোগে নগরের পূর্ব্বদ্বার দিয়া বহিরুদ্যান ভূমি সন্দর্শন কামনায় বহির্গত হইলেন। মহোৎসব যেন শরীর পরিগ্রহ করিয়া নগর মধ্যে সঞ্চরণ করিতে লাগিল।

নগরের সেই আনন্দোৎসব অবলোকন করিয়া মহারাজ শুদ্ধোদন ভাবিতেই পারেন নাই যে, কুমারের চক্ষে তেমন কোন বস্তু আকৃষ্ট হইবে, যাহাতে তাঁহার হৃদয়ে কোন উদ্বেগ বা বৈরাগ্য জন্মিতে পারে। কিন্তু সমগ্র জগতের মঙ্গলের জন্য, আজীবন রাজভোগলালিত সুখমাত্রপরিচিত সিদ্ধার্থ তাহার মধ্যেও প্রাণিগণের ব্যাধি-জরা-মৃত্যুর ভীষণ চিত্র সন্দর্শন করিয়া বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তখন হইতে রাজকুমারের নিজের ভাবনা দূর হইল, তিনি পরের জন্য ভাবনা আরম্ভ করিলেন—কেমন করিয়া ঐ দুঃখ জ্বালা হইতে সকলকে উদ্ধার করিবেন। মহাধর্ম্ম প্রচারকের কোমল হৃদয়ে পরম রমণীয় বিশ্বপ্রেমের বীজরত্ন এই প্রথম প্রবেশ লাভ করিল। রাজ্যভোগ তাঁহার নিকটে তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইল, তিনি সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দিবা-রাত্রি অবিচ্ছেদে চিন্তা করিতে লাগিলেন—কিপ্রকারে জীবগণের মঙ্গল করিতে পারিবেন। সঙ্গীত-প্রসাদে বা সুপ-শয়নে থাকিলেও তাঁহার ঐ এক চিন্তা চিরসহচরী হইয়া উঠিয়াছিল।

তিনি মহাভিনিষ্ক্রমণ করিবার পূর্ব্বে জীবগণকে দুঃখিত দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন—"হায়! জীবগণ সংসাররূপ মহাকারাগারে প্রক্ষিপ্ত হইয়া আছে, ইহাদের এই কারাগার বিনষ্ট করিয়া মুক্তির কথা উচ্চারণ করিব। তাহারা তৃষ্ণা-শৃঙ্খলে গাঢ় নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহা হইতে ইহাদিগকে

* বোলপুর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধ্যাপক-সমিতিতে পঠিত।

প্রজ্বালিত করিয়া দিব। হায়! লোক সংসারের অবিদ্যারূপ গহন অন্ধকারে আবৃত, তাহাদের প্রজ্ঞাচক্ষু নাই; আমি ইহাদের এই মহান্ধকারে মহান্ ধর্ম্মালোক উৎপাদন করিব; আমি ইহাদের জ্ঞানপ্রদীপকে সমুদ্দীপ্ত করিয়া দিব; ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা মোহতিমিরজালের কালুষ্য অপনয়ন করিয়া ইহাদের প্রজ্ঞাচক্ষুকে বিশোধিত করিয়া দিব।"*

এই ভাব তাঁহার হৃদয়কে এতদূর অধিকার করিয়া ফেলিল যে, মহারাজ শুদ্ধোদনের সমস্ত প্রয়াসই ব্যর্থ হইয়া গেল। বোধিসত্ত্বকে গৃহে রক্ষা করিবার জন্য প্রাকার প্রস্তুত হইল, পরিখা খাত হইল, দ্বার সমূহ দৃঢ়তর করা হইল, রক্ষিদল স্থাপিত হইল, শূর সমূহ প্রেরিত হইল, এবং নগর-দ্বার ও চতুষ্পথ সমূহে মহাসৈন্যব্যূহ নিয়োজিত হইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, তিনি সারথি ছন্দককে সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে মহাভিনিষ্ক্রমণ করিলেন। প্রভুবৎসল ছন্দক সিদ্ধার্থকে প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য অনুনয় বিনয় করিয়াছিল, বহু উপদেশ প্রদান করিয়াছিল, কুমার তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন:—

"ছন্দক, এই জগৎ ক্লেশ ও ব্যাধিতে আকুল হইয়া দহ্যমান হইতেছে; ইহা মোহ-অবিদ্যার অন্ধকারে পতিত হইয়া অশরণ ও অনাথ; ইহা জরা-ব্যাধি ও মৃত্যু ভয়ে পীড়িত; এবং শত্রুস্বরূপ জন্মজনিত দুঃখ সমূহে নিতান্ত আহত।... ...আমি ধর্ম্মনৌকা আনয়ন করিয়া ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইব, এবং অনন্ত জগৎকে উত্তীর্ণ করাইব। ছন্দক, পর্ব্বতরাজ মেরুর ন্যায় আমার এই সঙ্কল্প নিশ্চল বলিয়া জানিবে।"

ভগবান্ শাক্যসিংহ সমগ্র জগতের দুঃখে ব্যথিতচিত্ত হইয়া তাহার অপনোদনের দুর্ভর ভার স্বীয় মস্তকে বহন পূর্ব্বক কঠোর পরিশ্রমে ও অবিশ্রান্ত উদ্যমে যে ধর্ম্মচিন্তামণি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাবে ভারতভূমি সেই সময়ে অদ্ভুতরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ান হইয়াও, এবং মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্তও যে ধর্ম্মকে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তিনি তাহাতে বলিয়া যাইতে ভুল করেন নাই যে, সেই অভিনব ধর্ম্মের মূল কি, এবং তাহার প্রাণই বা কি। তিনি যেমন বিশ্বজনের মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহার সেই অভিনব ধর্ম্মপ্রচার করিয়া শিষ্যগণকেও শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সেই বহিরুদ্যানভূমি সন্দর্শনের দিনে তাঁহার হৃদয়ে বিশ্বপ্রেমের যে বীজ রোপিত হইয়া কালক্রমে অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত, এবং শাখা-পল্লবে শোভিত ও পুষ্পফলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার পর তদীয় শিষ্যগণ সেই সুমহান্ বিশ্বপ্রেমতরুর সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করিয়া বহু বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সমস্ত গ্রন্থ ঐ সমুজ্জ্বল তরুবরের দিগন্তবিসর্পী সৌরভসম্ভারে আমোদিত এবং তাহারা অদ্যাপি রোপণকর্ত্তার ধর্ম্মবৈভব প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ।

আজ আমরা মহাযান-সম্প্রদায়েরই গ্রন্থ হইতে আলোচনা করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিব যে, ঐ বিশ্বপ্রেম-প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম কত মধুর ও কত সুন্দর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

"ভিক্ষু প্রকীর্ণক" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—একদিন কোন ব্যাধিপীড়িত ভিক্ষুকে ভগবান্ বৌদ্ধ বলিতেছেন—"ভিক্ষু, তুমি ভয় করিও না, ভয় করিও না। আমি তোমার পরিচর্য্যা করিব। কৈ তোমার চীবর দাও, আমি ধুইয়া দিতেছি।" ইহা শুনিয়া তাঁহার সহচর প্রিয় ভিক্ষু আয়ুষ্মান আনন্দ বলিলেন—"ভগবন্, আপনি এই অশুচিপদার্থযুক্ত চীবর ধুইবেন না, আমি ধুইব।" ভগবান্ বলিলেন—"আনন্দ, যদি তাহাই হয়, তবে তুমি এই ভিক্ষুর চীবর ধুইয়া দাও, আমি জল ঢালিয়া দিব।" এইরূপে আনন্দ সেই ভিক্ষুর চীবর ধুইয়া দিতেন, ভগবান্ জল ঢালিয়া দিতেন; আনন্দ তাহাকে ভাল করিয়া বাহিরে আনিয়া স্নান করাইয়া দিতেন, আর ভগবান্ জল ঢালিয়া দিতেন। রাজকুমার সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া এই রূপেই জীবের সেবা আরম্ভ করেন। তিনি জীবগণকে লক্ষ্য করিয়া এক স্থানে বলিয়াছিলেন—"যাহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া বহু ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এই সেই জীবগণ বিদ্যমান রহিয়াছে; জীবগণ ছাড়া জগতে অপর কোন সিদ্ধক্ষেত্র নাই।"

ভগবান্ সম্যক্ সম্বুদ্ধ 'বোধিসত্ত্ব প্রাতিমোক্ষে' শারিপুত্রকে উপদেশ দিয়াছেন—"হে শারিপুত্র, বোধিসত্ত্বগণ চিত্তশূর; তাঁহারা (অন্যের জন্য) হস্ত পরিত্যাগী, নাসা-পরিত্যাগী, শীর্ষ পরিত্যাগী, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিত্যাগী, পুত্র

* ললিত বিস্তর, ১৫ অঃ।

পরিত্যাগী, দুহিতৃ পরিত্যাগী, ভার্য্যা পরিত্যাগী, রতি পরিত্যাগী, পরিবার পরিত্যাগী, চিত্ত পরিত্যাগী, সুখ পরিত্যাগী, গৃহ পরিত্যাগী, বস্তু পরিত্যাগী, দেশ পরিত্যাগী, রত্ন পরিত্যাগী ও সর্ব্বস্ব পরিত্যাগী।”

‘নারায়ণ পরিপৃচ্ছাতে’ও এ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে:—“হে কুলপুত্র, বোধিসত্ত্বের সেরূপ কোন দ্রব্য গ্রহণ করা উচিত নহে, যাহাতে তাহার দানবুদ্ধি উৎপন্ন না হয়।...... হে কুলপুত্র, মহাসত্ত্ব বোধিসত্ত্ব এইরূপ চিন্তা করিয়া—আমার যখন এই শরীরই সমস্ত জীবকে বিতরণ করা হইয়াছে, তখন ত অন্যান্য বাহ্য বস্তু বিতরণ করা হইয়াছেই; অতএব যে যে জীবের যে যে বস্তুর প্রয়োজন, আমি তাহাকে তাহাই বিতরণ করিব—যদি আমার ঐ বস্তু থাকে; হস্তার্থীকে হস্ত, চরণার্থীকে চরণ, মাংসার্থীকে মাংস, রুধিরার্থীকে রুধির, ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গার্থীকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিত্যাগ করিব; ধন-ধান্য রজত-কাঞ্চন, হয়-গজ-বলবাহন ও গ্রাম-নিগম-নগরজনপদ প্রভৃতি বাহ্য বস্তুর আর কথা কি? যাহার যাহা প্রয়োজন উপস্থিত থাকিলে, তাহাকে তাহাই প্রদান করিব;—এবং তাহা শোকহীন, অনুতাপহীন ও ফলকামনাহীন হইয়া প্রদান করিব। আমি সমস্ত ফল নিরপেক্ষ হইয়া, কেবল জীবগণকে অনুগ্রহ করিয়া, করুণা করিয়া, অনুকম্পা করিয়া তাহাদের সংগ্রহের জন্য দান করিব, যাহাতে তাহারা সংগৃহীত হইয়া বোধিপ্রাপ্ত ধর্ম্মকে জানিতে সমর্থ হয়। হে কুলপুত্র, যেমন কোন ভৈষজ্য বৃক্ষকে মূল হইতে, বা শাখা হইতে, বা পত্র হইতে, বা ফল হইতে বা সার হইতে গ্রহণ করিলেও তাহার কোন বিকল্প উপস্থিত হয় না, সে ভৈষজ্য বৃক্ষ নির্বিকল্প হইয়া হীন-মধ্যম-উৎকৃষ্ট সমস্ত জীবের ব্যাধিকে অপনয়ন করে, হে কুলপুত্র, মহাসত্ত্ব বোধিসত্ত্বেরও সেইরূপ এই চাতুর্মহাভৌতিক শরীর সম্বন্ধে ভৈষজ্য বুদ্ধি উৎপাদন করা উচিত যে, যে যে জীবের যে যে অঙ্গের প্রয়োজন, সে তাহাই গ্রহণ করুক, হস্তার্থী হস্ত গ্রহণ করুক, চরণার্থী চরণ গ্রহণ করুক... ।”

‘আর্য্যাক্ষর যতিসূত্রে’ এ সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ পাওয়া যায়:—“আমি সমস্ত জীবের কার্য্যে এই শরীরকে ক্ষয় করিব। যেমন পৃথিবী, জল, বায়ু ও তেজ নামক বহিঃস্থ চতুর্মহাভূত নানাপ্রকারে নানা পরিভোগে নানা সুখে জীবগণের উপভোগযোগ্য হয়, আমিও সেই রূপ এই চতুর্মহাভূতোৎপন্ন শরীরকে সর্ব্বজীবের উপভোগার্হ করিব।’ সে যদি এই প্রকার চিন্তা করে, তবে শরীর দুঃখকে আর দেখিতে পায় না, এবং তাহার দ্বারা পরিখিন্নও হয় না।”

‘আর্য্য বজ্রধরসূত্রে’ সর্ব্বজীবের কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ বিষয়ে বিবিধ কথার মধ্যে এক স্থানে লিখিত হইয়াছে—“বোধিসত্ত্ব দাসত্বের জন্য নিজেকে প্রার্থয়িতার নিকটে প্রদান করিয়া নিজেকে নীচ বলিয়া চিন্তা করিবে, পৃথিবীর ন্যায় সমস্ত দুঃখ সহ্য করিতে পারিব বলিয়া মনে করিবে ও সমস্ত জীবের পরিচর্য্যায় অক্লান্তমানস হইবে।” (ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

পারস্য-প্রসূন।

(হাফেজ হইতে)

ব্যর্থতা।

খুঁজিতে খুঁজিতে তোমা নেত্র মোর অশ্রুরূপ
মুক্তাপুঞ্জ করিল বর্ষণ,
—জ্বলিল অনল মনে— হইল না তব সনে
মোর হায় সুখ-সম্মিলন!

প্রতীক্ষা।

তোমার পথের ধূলি ব্যাকুল দর্শকগণ
করিবারে নয়ন-অঞ্জন,
তুমি যাবে বলে সখা, স্থাপি’ দু’টী স্থির আঁখি
বহুকাল করিছে কর্ত্তন।

আবেদন।

একটি চুম্বন শুধু ছিল মোর দিতে বাকী
সরে গেল অধর তোমার;—
সুমধুর অধরোষ্ঠ করেছে এরূপ তব,
তুমি কর ইহার বিচার।

বিশ্বাস।

তোমার অধর তরে প্রাণ যবে উৎসর্গিনু,
ভেবেছিনু মনে,—
সে অধর-সুধা-রস একবিন্দু মোর মুখে
পড়িবে গোপনে।

নিত্য-বস্তু।

এ বিশাল বিশ্ব-চক্রে পবিত্র প্রেমের বার্ত্তা
একমাত্র শাশ্বত-রতন,
ইহা হতে শ্রেষ্ঠতর স্মৃতি-চিহ্ন কিছু আর
করি নাই কখনো দর্শন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ
মান্দ্রাজ কংগ্রেসের ভাবী সভাপতি।

দেওয়ান বাহাদুর কে, কৃষ্ণস্বামী রাও,
মান্দ্রাজ কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

রাও বাহাদুর আর্, এন্, মুধোলকার,
মান্দ্রাজের শিল্প আলোচনা সমিতির ভাবী সভাপতি।

অনুরোধ।

বসন্ত-সমীর সাথে, তোমার উদ্যান হতে
পাঠাইও ফুল্ল ফুল-রাশ,
সম্ভবতঃ তা'রি মাঝে সখা, তব মালঞ্চের
পাব আমি ধূলির সুবাস !

অনুমান।

আমার নিদ্রিত ভাগ্য হয়ত উঠিবে জাগি'
শিশিরান্তে মাধবীর সম ;—
তব পুণ্য-মুখ-জ্যোতিঃ করিয়াছে অশ্রুসিক্ত
আঁখি দু'টী মোর প্রিয়তম !

যাত্রী।

ভগ্ন তরী বাহি' ধীরে অসীম সাগর-নীরে
চলেছি একা,—
বহ অনুকুল-বায়, সখাসনে হবে হায়,
হয়ত দেখা !

ভ্রান্তি।

অন্তিম শয়ন যার দু'টী হস্ত পরিমিত
মৃত্তিকা কঠিন ;—
সে কেন গগনচুম্বী বিরচে প্রাসাদপুঞ্জ
হর্ষে নিশিদিন !

অমর।

প্রেমেতে যাহার মন জীবিত এ বিশ্বমাঝে
মৃত্যু তার নাহি কোন দিন ;
জগতের কার্য্যালয়ে মোর সেই অমরত্ব
সুঅঙ্কিত, কলঙ্কবিহীন !

প্রার্থনা।

দুয়ারে তব সেবার কাজ
রয়েছে বহু নাথ,
করুণা করে আবার দাসে
করগো আঁখি-পাত !

ভরসা।

নিরাশ হয়ে দুয়ার হ'তে
ফিরিয়া আমি যাব না !
হয়ত কোন্ নিশার কালে
ঈপ্সিত-চাঁদ গগন-ভালে
উদিবে,
আকুল করা পরাণ ভরা
বিমল আভা জ্যোছনা
হয়ত মোর ছাদের 'পর
পড়িবে !

সাধ।

ধরার মাঝ জীবন হেন
যাপ না,—
মরণ হ'লে কহিবে সবে
'মরেও অমর এ জনা' !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

প্রার্থনা।

আমারে টানিয়া আন
গোপন নিভৃতে,
হে অনন্ত ! হে মহান !
সারা বিশ্ব হ'তে।

বিক্ষিপ্ত হৃদয়-অণু
বাহিরের শত কাজে,
আপনা হারা'য়ে ফেলি
চঞ্চল বিশ্বের মাঝে।

জীবনের কণাগুলি
নিজ হাতে কুড়াইয়ে,
হে বিধাতা, বেঁধে দাও
সুদৃঢ় সঙ্কল্প দিয়ে।

বাসনার সচঞ্চল
মলিন তাড়না আসি,
যেন না উড়ায়ে দেয়
যথা তুচ্ছ, ধূলি-রাশি।

যেখানে শুষ্কতা আসি
শূন্য করি দিবে হিয়া,
বাঁচা'ও করুণাময়
স্নেহ ধারা বরষিয়া।

তুচ্ছ মলিনতা যথা—
তব দীপ্তি, হে উজ্জ্বল !
অন্তর বাহির মম
ভ'রে দি'ক সর্ব্বস্থল।

শ্রীসরলা দত্ত।

চিত্র পরিচয়।

প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যার গোড়ায় যে চিত্রটি দেওয়া গেল, তাহা কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলের শ্রীযুক্ত লালা ঈশ্বরীপ্রসাদ কর্ত্তৃক অঙ্কিত ছবির প্রতিলিপি। ইণ্ডিয়ান সোসাইটী অব্ ওরিয়াণ্ট্যাল আর্টের অনুমতি অনুসারে উহা মুদ্রিত হইল। এই অন্তঃপুরিকার চিত্র হিন্দুস্থানী আদর্শে কল্পিত হইয়াছে। ইহার বিষাদপূর্ণ শান্ত সৌন্দর্য্য সহজেই উপলব্ধ হয়।

এবার মান্দ্রাজে কংগ্রেসের আয়োজন হইতেছে; নাগপুরেও হইতেছে। মান্দ্রাজ কংগ্রেসে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হইয়াছেন, ত্রিবাঙ্কুড়ের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান দেওয়ানবাহাদুর কে. কৃষ্ণস্বামী রাও। শিল্প-আলোচনা-সমিতিও বসিবে। তাহার সভাপতি হইবেন, রাও বাহাদুর আর. এন্. মুধোল্‌কার। এই তিন জনের ছবি দেওয়া গেল।

প্রাপ্তপুস্তক পরীক্ষা।

যৎকিঞ্চিৎ—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি, এ. প্রণীত। শ্রীবটুকদেব মুখোপাধ্যায় এম, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ৯৭ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা মাত্র। এখানি ব্যঙ্গ-নাট্য, ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত। একটি মহিলার অধিক লেখাপড়া শিখিয়া মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছিল; আর একটি শিক্ষিতা মহিলার যত্নে তাহার চৈতন্য হয়। ইহাই মূলত গ্রন্থের বিষয়। উচ্চ শিক্ষার বিকারের প্রতি ব্যঙ্গ ও ঘটনার সমাবেশ আগাগোড়াই অস্বাভাবিক। এই বই পড়িতে পড়িতে নাট্যবিকার নামক বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত একখানি প্রাচীন ব্যঙ্গনাট্য স্মরণ হয়। তাহার দোষগুলি ইহাতে আছে, কিন্তু তাহার সরস হাস্যরসটুকু ইহাতে বাদ পড়িয়া গিয়াছে। একঘেয়ে ব্যাপার পড়িতে পড়িতে বিরক্তি জন্মে, হাস্যের বিকট আয়োজন দেখিয়া হাস্য কাঁদিয়া বিদায় লয়। গ্রন্থকার উচ্চ শিক্ষার গর্ব্ব রাখেন, তাহা তাঁহার নামের শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপেই প্রকাশ; অথচ এই স্বল্প স্ত্রীশিক্ষার দিনে তিনি নিতান্ত হৃদয়-হীনের মতই উচ্চ স্ত্রীশিক্ষাকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। উষা ও সুরমার যে চিত্র তাহা এমন অস্বাভাবিক যে পাগল ভিন্ন অমন আর কেহ হইতে পারে না। পাগলের খেয়াল যদি বর্ণনীয় হয়, তবে ত বর্ণনীয় বিষয়ের আর অভাবই থাকিবে না। তবে উষা ও সুরমার পাশে লাবণ্যের চরিত্র আঁকিয়া গ্রন্থকার যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা আমাদের বিবেচনায় যথেষ্ট হয় নাই। একেই আমাদের দেশের লোকে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী, তার পরে যদি শিক্ষিত লোকে, কাপুরুষের মত, স্ত্রীশিক্ষাকে এইরূপ নিতান্ত অস্বাভাবিক, মিথ্যা বর্ণে চিত্রিত করিয়া বিদ্রূপ করেন, তবে সমাজের অকল্যাণ ও অপকারই করা হইবে। বাংলা থিয়েটারে জোগাড় করিয়া অভিনয় করাইলে বা রঙ্গপ্রিয় অচিন্তাশীল অজ্ঞদর্শকের হাততালি পাইলেই রচনার সার্থকতা হয় না। যাহা প্রকাশ করা হয় তাহা দেশের, সমাজের ও সাহিত্যের উপকার করিবে কি না সে বিষয়েও চিন্তা করা আবশ্যক। হেমন্ত দত্তের চরিত্র ব্যাখ্যানটা আরো একটু সংযত প্রচ্ছন্ন ভাষায় করিলে ভালো হইত। গানগুলির মধ্যে কবিত্বের বিশেষ পরিচয় পাইলাম না—তবে গান সুর অভাবে মৃত, আমরা সুরে শুনি নাই সুতরাং অধিক কিছু বলিতে পারি না। এই গ্রন্থে নাটকত্বেরও নিতান্ত অভাব—আগাগোড়া কেমন খাপছাড়া। নবীন গ্রন্থকার শিক্ষিত, তিনি মহত্তর আদর্শ লইয়া সাধনা করুন, সুলভ খ্যাতির মোহ যেন তাঁহাকে ভ্রান্ত না করে। গ্রন্থকারের এই প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ, সেই জন্যই সকল ত্রুটিগুলিই তাঁহাকে দেখাইলাম, নতুবা তাঁহার সবিনয় ভূমিকা পাঠের পরও এমন হৃদয়হীনতার পরিচয় দিবার প্রবৃত্তি হইত না। মুদ্রারাক্ষস।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার।

ভাবাতত্ত্বে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় আমার "চক্ষু পদার্থ টা কি" প্রবন্ধের একটি ক্ষুদ্র ফুটনোটকে ফেনাইয়া তুলিয়াছেন একটু বেশী মাত্রা। "সুপারি" বাঙ্‌লা ভাষার একটা আট্‌পহুরিয়া শব্দ, এই যা আমি জানি; তা বই, তাহা যে, আসিয়াছে কোথা হইতে তাহা তিনিই বা কিরূপে জানিবেন, আর, আমিই বা কিরূপে জানিব, তাহার তো কোনো সুরাহা দেখিতেছি না। বাঙ্‌লা-মুলুকে যাহা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত অথচ যাহার মূল মৃত্তিকাগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, এইরূপ দিশী ধাঁচার শব্দগুলার উপরেই আমি "ডাহা বাঙ্‌লা" উপাধি আরোপ করিয়াছি, ইহা বলা বাহুল্য।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাপানে ভারতীয় ছাত্রের কত ব্যয় হয়?

প্রতিবাদ।

সবিনয় নিবেদন,

গত আশ্বিনের "প্রবাসী"র সমালোচনস্তম্ভে "জাপানের কথা ও শিল্পসংবাদ" নামক পুস্তকের উল্লেখ দেখিলাম। এই গ্রন্থে "জাপানে মিতব্যয়ী ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে ৩০।৩৫ টাকা এক প্রকার যথেষ্ট" এই প্রকার মত প্রকাশ করা হইয়াছে। গ্রন্থকার বোধ হয় কখনো জাপানে পদার্পণ করেন নাই, এবং শোনা কথার উপর নির্ভর করিয়া সংবাদের সত্যাসত্য বিচার করিবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। বলা বাহুল্য মিতব্যয়ী ছাত্রের পক্ষে জাপানে, পোষাক পরিচ্ছদ ও পুস্তকের ব্যয় ছাড়িয়া, ৭৫৲ হইতে ৮০৲ টাকায় এক প্রকার চলে। কেহ মনে করিবেন না যে এই টাকাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকা চলে। অবশ্য জাপানী ছাত্রেরা কম খরচে চালাইতে পারে, কিন্তু এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে এদেশ জাপান, এবং যাহা জাপানী ছাত্রের পক্ষে সম্ভব তাহা ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে নয়।

এই প্রকার ভ্রান্ত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া গত বৎসর প্রায় ৫।৬ জন ভারতীয় যুবক (যত দূর স্মরণ হয় সকলেই বঙ্গীয়) টাকা কড়ির কোনও বন্দবস্ত না করিয়াই এখানে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা জাপানে আসিয়া টাকা উপার্জ্জন করিয়া লেখা পড়া চালাইবেন এই প্রকার ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই আসিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য এখানে আসিয়া তাঁহারা প্রায় ছয় মাস যাবৎ অশেষ ক্লেশ ও অসুবিধা ভোগ করেন, এবং শুধুই তাহাই নয়, অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রকেও অশেষ অসুবিধায় ফেলেন।

অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এই পত্রখানি লিখিলাম; আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকায় কিঞ্চিৎ স্থান দান করিলে শুধু লেখককে বাধিত করিবেন তাহা নয়, দেশের কিছু উপকার করা হইবে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে বঙ্গীয় যুবকমণ্ডলী এই প্রকার ভ্রমপূর্ণ সংবাদে যত কম আস্থা স্থাপন করেন ততই মঙ্গল।

বিনীত

টো কও, জাপান। শ্রীভারতীয় ছাত্র।

৬১, ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অন্তঃপুরিকা।

শ্রীযুক্ত লালা ঈশ্বরীপ্রসাদ কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে।

কারাগারে শিশুকৃষ্ণ।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে।

Three-colour blocks by U. Ray.

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

৮ম ভাগ। | মাঘ, ১৩১৫। | ১০ম সংখ্যা

লক্ষ্মণসেনের পলায়ন-কলঙ্ক।*

প্রথম ভাগ আদৌ লিখিত হয় নাই, অথচ দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে,—এরূপ গ্রন্থ সকল দেশের সাহিত্যেই নিতান্ত সুদুর্লভ, কেবল বঙ্গসাহিত্যেই এরূপ একখানি মাত্র গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহার নাম "বাঙ্গালার ইতিহাস"। পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই "অদ্বিতীয়" গ্রন্থ রচনা করিয়া যেরূপ বিচারবুদ্ধির প্রাখর্য্য প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত মর্য্যাদা অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়া, তাঁহার জীবিতকালেই অনেকে বাঙ্গালার ইতিহাসের "প্রথম ভাগ" রচনা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার ফলে, বঙ্গসাহিত্যে এক অলৌকিক উপাখ্যান, ইতিহাসের মর্য্যাদা লাভ করিয়া, সকলের নিকট সুপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহা "বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গ-বিজয়,"—অথবা "লক্ষ্মণসেনের পলায়ন-কলঙ্ক!" এই কলঙ্ককাহিনী বন্যাতাড়িত আবর্জ্জনারাশির ন্যায় রঙ্গালয়ের দ্বারদেশে পুঞ্জীকৃত হইবামাত্র, তদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ লক্ষ্য করিয়া, বঙ্গরঙ্গালয় তাহাকে পরম সমাদরে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবার পর, তাহা ক্রমে নিরক্ষর নরনারীর নিকটেও সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে! এত কালের পর সম্প্রতি একজন সুনিপুণ চিত্রকর তাহা লইয়া একখানি চিত্রপট রচনা করিয়া, লক্ষ্মণসেনের পলায়ন-কলঙ্ক চিরস্মরণীয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা এইরূপে বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে চিরপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যে সর্ব্বথা অলীক, এখন তাহার আলোচনা করিতেও অনেকে অসম্মত হইতে পারেন। কিন্তু স্বদেশের ইতিহাসের সকল ঘটনাই স্বাধীনভাবে আলোচনা করা কর্ত্তব্য,—যাহা সত্য, তাহা নির্ণয় করিয়া, প্রচলিত ইতিহাসের সংশোধনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য,—কালবিলম্বে অসত্য কখনও সত্যের মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে না। লক্ষ্মণসেনের পলায়ন-কলঙ্কের মূলে আদৌ কোন সত্য সংশ্রব বর্ত্তমান আছে কিনা, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহাই সংক্ষেপে আলোচিত হইবে। পূর্ব্বে অনেক বার "বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয়" সমালোচনা করিতে গিয়া, প্রসঙ্গক্রমে লক্ষ্মণসেনের পলায়নকলঙ্কের কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। এখন চিত্রপট প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া মনে হইতেছে,—

* শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্রপট দর্শনে লিখিত ও রাজসাহী শাখা-সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয়বার্ষিক চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত।

বঙ্গসাহিত্যে যাহা প্রকাশিত হয়, সকল শিক্ষিত বঙ্গবাসী তাহা পাঠ করেন কিনা সন্দেহ!

বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গগমনের ষষ্টি বর্ষ পরে, সুবিখ্যাত মুসলমান ইতিহাসলেখক মিন্‌হাজ-ই-সিরাজ এদেশে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি "তবকাৎ-ই-নাসেরী" নামক দিল্লী-সাম্রাজ্যের যে ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিংশ পরিচ্ছেদে প্রসঙ্গক্রমে বঙ্গভূমির কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত কাহিনী উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে—বক্তিয়ার সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া "নওদিয়া"

লক্ষ্মণসেনের পলায়ন।

নামক রাজধানীতে উপনীত হইবামাত্র, "রায় লছমনিয়া" নামক হিন্দু নরপতি পলায়ন করিয়াছিলেন। মিন্‌হাজ বিচারনিপুণ ঐতিহাসিকের ন্যায় এই কাহিনীর সত্যাসত্য নির্ণয়ে অগ্রসর না হইয়া, লিখিয়া গিয়াছেন—যাহারা বক্তিয়ারের সহিত বিজয়-যাত্রায় বহির্গত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যাহারা তখন পর্য্যন্ত জীবিত ছিল, তাহাদের মুখে এই কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন। মিন্‌হাজের গ্রন্থ প্রমাণরূপে উল্লিখিত করিয়া, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে এই কাহিনী সংকলিত হইবার পর, ইহা ক্রমশঃ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার মূল প্রমাণ মিন্‌হাজের গ্রন্থ,—একমাত্র প্রমাণ মিন্‌হাজের গ্রন্থ,—তাহারও একমাত্র প্রমাণ বৃদ্ধ সৈনিকের পুরাতন আখ্যায়িকা! বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গগমনের ষষ্টিবর্ষ পরে এদেশে আসিয়া, মিন্‌হাজ যে বৃদ্ধ সৈনিকের নিকট এই অলৌকিক কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—তিনি তখন অশীতপর বৃদ্ধ;—তাঁহার সত্যনিষ্ঠা বা আত্মগৌরব-ঘোষণার প্রবল প্রলোভন কতদূর প্রবল ছিল, এতকাল পরে তাহার মীমাংসা করিবার সম্ভাবনা নাই!

মুসলমানাগমনের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে যাঁহারা এ দেশের রাজসিংহাসন অলংকৃত করিতেন, সেই সকল সুগৃহীতনামা নরপালগণের নানা শাসন-লিপি আবিষ্কৃত হইয়া, আমাদিগের নিকটে যে সকল পুরাতত্ত্বের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে, তাহা সপ্তদশ অশ্বারোহীর অলৌকিক দিগ্বিজয়কাহিনীর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না। বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রধান দুর্ভাগ্য সকল যুগেই সমানভাবে বর্ত্তমান,—সকল যুগেই তাহা বিজেতার বিদ্বেষ-পূর্ণ বিকৃত লেখনী হইতে প্রসূত হইয়াছে,—কোন যুগেই দেশের লোকে দেশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার আয়োজন করেন নাই!

বক্তিয়ার স্বাধীনভাবে প্রাচ্যভারতে সাম্রাজ্যসংস্থাপনে অগ্রসর হইয়া, কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্য হইবামাত্র, দিল্লীর মুসলমান বাদশাহ, তাহাকে দিল্লীসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহার জন্য প্রথম হইতেই দিল্লীসাম্রাজ্য এবং গৌড়ীয়সাম্রাজ্যের মধ্যে কলহ সংঘটিত হইবার সূত্রপাত হয়,—এবং ইহার জন্যই দিল্লীর ইতিহাসলেখকগণ দিল্লীর গৌরব ঘোষণা করিয়া (গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের কলঙ্ক কীর্ত্তন করিয়া) ইতিহাস রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। যে সকল মুসলমান বীর শোণিত ক্ষয় করিয়া গৌড়ীয় সাম্রাজ্যে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, দিল্লীশ্বর তাঁহাদিগের কোনরূপ সহায়তাসাধন না করিয়াই, তাঁহাদিগের বিজয়গৌরবের ফলভোগ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন। দিল্লীসাম্রাজ্যের

ইতিহাস লেথকের পক্ষে এই সকল কারণে গৌড়ীয় মুসলমানগণের দিগ্বিজয় ব্যাপারকে অনায়াসলব্ধ অকিঞ্চিৎকর যুদ্ধগৌরব বলিয়া ব্যাখ্যা করা অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মিন্‌হাজের কাহিনী আদৌ কোনও বৃদ্ধ সৈনিকের নিকট হইতে সংকলিত, অথবা তাঁহার কপোলকল্পিত মাত্র, তদ্বিষয়েও সন্দেহশূন্য হইবার উপায় নাই!

যাহা হউক, বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গাগমন সময়ে এদেশ রাঢ়, মিথিলা, বরেন্দ্র, বঙ্গ এবং বাগ্‌ড়ী নামক ভাগপঞ্চকে বিভক্ত থাকিবার কথা আমরা মুসলমান-লেখকদিগের গ্রন্থেই দেখিতে পাই। তৎকালে এই পঞ্চবিভাগ গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ও এক রাজার অধীন ছিল। বিক্রমপুর, লক্ষ্মণাবতী এবং লক্ষৌর নামক তিন স্থানে তিনটি রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বর্ণনায় "নওদিয়া" নামক স্থানে কোনও রাজধানী সংস্থাপিত থাকিবার উল্লেখ নাই। "নওদিয়া" কোথায় ছিল,—তাহা রাজধানী হইলে, তৎপ্রদেশে মুসলমান জায়গীর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিনা,—রায় লছমণিয়াই বা কাহার নাম—এ সকল প্রশ্নের কোনরূপ সদুত্তর প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই।

গৌড়ীয় ধ্বংসাবশেষের মধ্যবর্ত্তী খালিমপুর নামক আধুনিক গ্রামে ধর্ম্মপাল নামক নরপালের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত ও স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের যত্নে প্রকাশিত হয়, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—ধর্ম্মপালের রাজধানী পাটালপুত্রেই সংস্থাপিত ছিল। তিনি মগধাধিপতি হইয়াও, গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের কিয়দংশে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত দেবপাল নামক নরপালের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়,—তৎকালে রাজধানী মুদ্গগিরি নগরেই সংস্থাপিত ছিল। তাহার পর বঙ্গভূমির নানা স্থানে—পূর্ব্ব এবং উত্তর বঙ্গে—পালনরপালগণের রাজ্য ও রাজধানী সংস্থাপিত হইবার পরিচয় নানা শাসনলিপিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাবনার অন্তর্গত মাধাইনগরে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেন দেবের একখানি তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়,—"কর্ণাট ক্ষত্রিয়বংশের" সেন নরপালগণ বঙ্গভূমিতে কিরূপে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। এই রাজবংশের বিজয়সেন দেব নামক নরপাল রাজসাহীর অন্তর্গত বরেন্দ্র প্রদেশে প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির নামক মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ে যে ফলকলিপি রচনা করাইয়াছিলেন, তাহাতে বিজয়সেন দেবের বিজয়কাহিনী উল্লিখিত আছে। বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন গৌড়াধিকার করিয়া, "গৌড়েশ্বর" নাম গ্রহণ করেন। তিনিও বীরকীর্ত্তির জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন দেব পশ্চিমে কাশী এবং পূর্ব্বে কামরূপ পর্য্যন্ত বিজয় লাভ করিয়া, বীরকীর্ত্তির জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। মুসলমান-ইতিহাসলেখকগণ বলেন,—এই নরপতির নামানুসারেই পুরাতন গৌড়নগরের নাম "লক্ষ্মণাবতী" বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত এদেশের মুসলমান রাজ্য দিল্লীর ইতিহাসলেখকদিগের গ্রন্থে "লক্ষ্মণাবতীরাজ্য" বলিয়াই উল্লিখিত আছে। লক্ষ্মণসেনের বীরপুত্র বিশ্বরূপসেনের শাসনলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—তিনি বাহুবলে আত্মরক্ষা করিয়া—

"গর্গযবনান্বয় প্রলয় কালরুদ্র"

নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। মিন্‌হাজ যখন এদেশে পদার্পণ করেন, তখনও (বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গগমনের ষষ্টিবর্ষ পরেও) পূর্ব্ববঙ্গ লক্ষ্মণসেনের পুত্রগণের অক্ষুণ্ণ অধিকারে বর্ত্তমান ছিল,—তদ্দেশে তখন পর্য্যন্তও মুসলমানশাসন বিস্তৃত হইতে পারে নাই।

শাসনলিপির ও মুসলমান-ইতিহাসলেখকের এই সকল উক্তির সমালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়,—বক্তিয়ার সহজে এদেশে অধিকার বিস্তার করিতে পারেন নাই;—তিনি যেখানে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্মণাবতীর নিকটবর্ত্তী কয়েকটি পরগণা মাত্র; এবং সেখানেই মুসলমানদিগের সর্ব্বপ্রথম জায়গীর লাভের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধ্যাপক ব্লকম্যান পুরাতন বঙ্গভূমির ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্য সংকলনের জন্য প্রভূত অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া যে প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনিও লিখিয়া গিয়াছেন,—"দিনাজপুরের অন্তর্গত দেবকোট নামক স্থানে একটি সেনানিবাস সংস্থাপিত করিয়া, বক্তিয়ার যুদ্ধকলহে লিপ্ত ছিলেন; এবং সেই সেনানিবাসই তাঁহার বিজয়রাজ্যের পূর্ব্বোত্তর সীমা বলিয়া পরিচিত ছিল।" এই সেনানিবাসে ১২০৫ খৃষ্টাব্দের সম-

সময়ে বক্তিয়ার খিলিজির মৃত্যু হয়। উত্তর বঙ্গের "রাজ-রাজন্যকগণের" দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বাহুবলে স্বাধীনতা রক্ষা করিবার কথা ধ্যাপক ব্লকম্যান স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এই সকল প্রমাণ অতিবৃদ্ধ মুসলমান সৈনিকের অলৌকিক আখ্যায়িকার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না।

সে আখ্যায়িকায় যে "নওদিয়ার" রাজধানী ও "রায় লছমনিয়া" নামক নরপতির উল্লেখ আছে, তাহার সহিতও শাসনলিপির সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে কেহ কেহ অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন,—"নওদিয়া" নবদ্বীপের অপভ্রংশ মাত্র, এবং "লছমনিয়াও" তবে লক্ষ্মণসেনেরই অপভ্রংশ! মিন্‌হাজ লিখিয়া গিয়াছেন,—"রাজ্যাব্দের অশীতিবর্ষে বক্তিয়ার খিলিজির দিগ্বিজয় সুসম্পন্ন হইয়াছিল।" তদনুসারে আরও একটি অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করা অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। কাহারও পক্ষে অশীতিবর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না;—শৈশবে সিংহাসনে আরোহণ করিবার অনুমানও লক্ষ্মণসেনের পক্ষে সুসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, তিনি যে পরিণত বয়সেই পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহার নানা প্রমাণ ও কিংবদন্তী সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত। বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের মধ্যে যে সকল কবিতা-বিনিময় হইত, তাহা এখনও কণ্ঠে কণ্ঠে ভ্রমণ করিতেছে। এরূপ অবস্থায় একটি অসামান্য অনুমানের অবতারণা করা অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। সকল রাজার পক্ষেই সিংহাসনে আরোহণ করিবার সময় হইতে রাজ্যাব্দ গণনা করিবার রীতি প্রচলিত ছিল;—কেবল লক্ষ্মণসেনের পক্ষেই তাঁহার জন্মতিথি হইতে অব্দ গণনা করিবার একটি অসামান্য রীতির অনুমান করিয়া লওয়া হইয়াছিল! "লক্ষ্মণ-সংবৎ" নামক একটি অব্দগণনারীতি অদ্যাপি মিথিলায় কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে; এক সময়ে নানা স্থানে এই অব্দ ধরিয়া শিলালিপি খোদিত হইত। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপিতে এইরূপ অব্দ গণনার উল্লেখ দেখিয়া, তাহার সমালোচনা করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন,—"৫১ লক্ষ্মণাব্দের পূর্ব্বে কোনও সময়ে লক্ষ্মণসেনদেবের দেহান্তর সংঘটিত হয়।" মুসলমান-ইতিহাসলেখক লক্ষ্মণসেনকে পলায়ন কলঙ্কে কলঙ্কিত করেন নাই;—তদীয় রাজ্যাব্দের অশীতি বর্ষে দিগ্বিজয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন;—আমরাই তথ্যনির্ণয়ে অগ্রসর না হইয়া, অনুমানবলে "রায় লছমনিয়াকে" লক্ষ্মণসেন বলিয়া ধরিয়া লইয়া, অযথা কলঙ্কে স্বদেশের ইতিহাস মলিন করিয়া তুলিতেছি!

দুঃখ এই—যে বর্ষে এই সকল তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া, লক্ষ্মণসেনের অলীক কলঙ্কের অপনোদন করিয়া দিয়াছে, ঠিক সেই বর্ষেই কলাসমিতির পক্ষ হইতে এক চিত্রকরের "পলায়ন কলঙ্ক" নামক একখানি সর্ব্বথা কাল্পনিক চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে; আর—আর—সেই সুনিপুণ চিত্রকর—একজন বাঙ্গালী!

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

বিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণী।

(পৌষের প্রবাসীতে প্রকাশিত অংশের পর।)

এমন তাপখনির আবিষ্কার হইলে কয়লার খনিগুলির কোন আবশ্যকতাই থাকিবে না ইহা বলা বাহুল্য। কারণ এইরূপ গভীর গহ্বরে তাপ-সৌদামিনী সংযোগে যে বৃহৎ শক্তির আবির্ভাব হইবে তাহা লক্ষ লক্ষ শতাব্দী অতীত হইলেও অফুরন্ত থাকিবে এবং তদ্দ্বারা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই কল যন্ত্রাদি চালিত হইয়া অতি অল্প ব্যয়ে রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে থাকিবে। আজকাল পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য প্রস্তুত হয় কিন্তু ঐরূপ শক্তি হস্তগত হইলে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সমান সুবিধায় সকল প্রকার দ্রব্য একই ভাবে প্রস্তুত হইতে পারিবে। স্থান বিশেষের সুবিধা বা অসুবিধা বশতঃ তথাকার অধিবাসী অন্য স্থানের অধিবাসী অপেক্ষা ভাল বা মন্দ অবস্থায় আজকাল বাস করে কিন্তু তখন এই ইতর বিশেষ ক্রমশঃ লোপ হইয়া আসিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানব-সমাজে মঙ্গলময় সমতা স্থাপিত হইয়া আসিবে।

কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন বিজ্ঞান যখন মানবজগতের অধিপতি হইবে তখন বুঝি শিল্প সৌন্দর্য্যের মহিমা বিলুপ্ত হইয়া গিয়া তাহাদের স্থলে রূঢ়তা, শুষ্কতার অধিকার বিস্তৃত হইবে। কিন্তু বার্থেলো বলেন বিজ্ঞানের অভাবেই পৃথিবীতে এখনো কুৎসিতের স্থান আছে। বিজ্ঞানরাজার শাসনদণ্ড চালিত

না হওয়াতেই ক্ষুদ্র শত্রুর আক্রমণে অভিভূত হইয়া মানব এখনো পৃথিবীতে কুৎসিত আকারে পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। বিজ্ঞানের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই সকল অসৌন্দর্য্য দূর হইয়া যাইবে। দৃষ্টান্ত স্থলে বার্থেলো বলেন, ক্ষুৎরাক্ষসের আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আহার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মানব পৃথিবীর মনোহর পাত্রকে কুৎসিত আকারে পরিণত করিয়া, ধরিত্রীর অঙ্গের অলঙ্কার, প্রকৃতির ভূষণ, লতা, গুল্ম, বিটপীশ্রেণীর ধ্বংস সাধন করিয়া, নয়নমনোহর সুবিস্তীর্ণ কান্তারকে বিসদৃশ খণ্ডে খণ্ডে বিভাগ করতঃ, তাহার মসৃণ চিক্কণ গাত্রকে মানবগাত্রের কুৎসিত ব্যাধি দদ্রুপীড়ার ন্যায় হলযন্ত্রাদি সংযোগে বন্ধুর করিয়া পৃথিবীর সৌন্দর্য্য নাশ করে। কিন্তু যে দিন বিজ্ঞানরাজা প্রকৃতি রাণীর হাতে হাত ধরিয়া স্বরাজ দর্শনে বহির্গত হইবেন, যে দিন মানব ক্ষুৎশত্রুর অধীনতানিগড় ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতার বৈজয়ন্তী উড়াইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবে সেদিন অসুন্দর, কুৎসিত, মন্দ কিছুরই পৃথিবীতে আর স্থান থাকিবে না। আহার সংগ্রহের জন্য চাষ আবাদের আর প্রয়োজন না থাকিলে, পূর্ব্ববর্ণিত 'শক্তি' মানবের হস্তগত হইলে, ধরিত্রীর গাত্র সর্ব্বদা নয়নানন্দ দায়ক শষ্পশ্যামলা হরিৎ-বসনাবৃতা থাকিবে, পুষ্পালঙ্কারে সর্ব্বদা সজ্জিতা থাকিবে। বিটপীরাজিপরিবৃতা কৌস্তভখচিত মুকুটে সর্ব্বদা ভূষিতা থাকিবে, পৃথিব্যভ্যন্তর-উদ্ধৃত জলে সিক্ত হইয়া এই রুক্ষ মেদিনী মনোহর উদ্যানবীথিকায় পরিণত হইবে এবং মানব সেখানে সত্যযুগের ন্যায় অমিত সুখস্বচ্ছন্দের অধিকারী হইয়া সোণার দেশে বাস করিবে।

কেহ বা আশঙ্কা করিতে পারেন পৃথিবীর এই অবস্থা ঘটিলে মানবসমাজের বৰ্দ্ধনীশক্তি যে শারীরিক পরিশ্রম তাহা শিথিল হইয়া যাইবে এবং মানব সকল অলস হইয়া পড়িবে। কিন্তু বার্থেলো বলেন, বর্ত্তমান পৃথিবীতে উচ্চ নীচ ভেদ থাকা হেতু, অধিকারী অনধিকারী পার্থক্য থাকা বশতঃ একদিকে যেমন ক্লেশকর পরিশ্রমের নিষ্পেষণে পেষিত হইয়া মানবসমাজের কতক অংশ হীনপ্রভ হইয়া পড়িতেছে, অপরদিকেও কতকগুলি বিলাসমন্দিরের আমোদে সর্ব্বদা নিমজ্জিত থাকিয়া আপনাদিগকে অপদার্থ করিয়া ফেলিতেছে। ঐ যে নিদাঘে রৌদ্রাতপক্লিষ্ট শরীরে কৃষককুল ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছে, যাহারা শ্রাবণের মুষলধারাকে মস্তকে করিয়া, ঘর্ঘরনাদা বজ্রসম্পাতকে বুক পাতিয়া লইয়া, অঙ্কুরগুচ্ছ কর্দ্দমে রোপণ করিবে, যাহারা হেমন্তাবসানে শিশিরনিহার পীড়িত আড়ষ্ট হস্তে শস্য সংগ্রহ করিবে তাহারা তাহাদের পরিশ্রমের কতটুকু অংশের পুরস্কারের অধিকারী? আর ঐ সন্ধ্যা-সমীরণ-ব্যাকুল-হৃদয় ধনী রাজকুমারতুল্য-পালিত অশ্বকুমার যুগল চালিত রথারোহণে যখন রাজপথের উপর দিয়া অশনি-নিনাদে চলিয়া যায়, যখন বোধ হয় সেই শকট দরিদ্র কুলি-কুলের রক্তাক্ত হস্তপ্রস্তুত পথের উপর দিয়া নহে, তাহাদের পাতা বক্ষকে দলন করিয়া দৌড়িয়া যায়, তাঁহারাই বা তাঁহাদের কোন পরিশ্রমের পুরস্কারের ফলে ঐ সম্ভোগের অধিকারী? বিজ্ঞানের দণ্ড চালিত হইলে এই বৈষম্য বিদূরিত হইয়া পরিশ্রমের সমতা স্থাপিত হইবে; নিজ নিজ পরিশ্রমে মানব নিজ নিজ উন্নতির জন্যই ব্যস্ত হইবে, নিজের সুখসম্ভোগ স্বীয় পরিশ্রমের উপরই নির্ভর করিবে। তখনই পরিশ্রমের ক্লেশকরতা দূরে গিয়া সুখকরতা আসিবে। Love's Labour যথার্থই এতদিন মানবসমাজে lost বা নষ্ট হইয়া আসিয়াছে কিন্তু বিজ্ঞানের রাজ্য স্থাপিত হইলে যে কোন পরিশ্রম তাহা সকলই প্রেমের ভালবাসার পরিশ্রম হইবে, সকলই আনন্দও সুখ-দায়ক হইবে। তখন যে যত পরিশ্রম করিবে তাহার পূর্ণফলভোগী নিজেই হইবে এবং স্বীয় পরিশ্রম ব্যতিরেকে কি জ্ঞান কি নীতি, কি সৌন্দর্য্য সুখভোগ, কোন পথেই কেহ কোন উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। তখনই মানব প্রকৃত পক্ষে সত্য শিব সুন্দর যাহা, তাহারই উপাসক হইবে ও তাহারই জন্য শ্রম করিবে।

যুদ্ধ বিগ্রহ মারামারি কাটাকাটি বিবাদ কলহের স্থানও তখন পৃথিবীতে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া আসিবে। ভবিষ্য মানবসমাজে যুদ্ধের কোন আবশ্যকই থাকিবে না। বর্ব্বর যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও আজকাল (বর্ত্তমানে) যে যুদ্ধবিগ্রহাদি দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা-দের সকলেরই এক মূল কারণ উদর-চিন্তা। এই যে সেদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় রক্তবন্যা বহিয়া গেল বা পূর্ব্বপ্রভাতে রুষ-জাপ-বলপরীক্ষার অগ্নিকুণ্ডে কত মানব যে পতঙ্গের ন্যায় আপনাদিগকে আহুতি দিল তাহার সকলেরই মূল

কারণ আহার সংগ্রহ। আধুনিক পৃথিবীতে বাণিজ্যরক্ষার যে অজুহাত উঠিয়াছে তাহার অর্থ অন্য কিছুই নহে, কেমন করিয়া কোন জাতি সুখস্বচ্ছন্দে উদর পূর্ত্তি করিয়া থাকিতে পারিবে। যদি বিজ্ঞানের দরবারে তাহার সমস্যা মীমাংসিত হইয়া যায় তবে আর যুদ্ধ বিগ্রহাদির কারণ কি থাকিবে? মানুষের বাসস্থান লইয়া পুরাতন পৃথিবীতে বহু যুদ্ধাদি অবশ্যই সংঘটিত হইয়াছে—কিন্তু তৎসম্বন্ধেও একটু বিবেচনা করিলেই বুঝা যায় মানব যে দেশে শস্যাদি উৎপন্ন হইবার সুবিধা দেখিয়াছে সেই দেশের প্রতি লোলুপতা বশতঃই এক দল অপর দলের সহিত সমরে লিপ্ত হইয়াছে। স্বাস্থ্যকর কি অস্বাস্থ্যকর বিবেচনা না করিয়া যেখানে ভাল রকম শস্য উৎপন্ন হয় সেই খানেই সকলে মাথা গুঁজিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই প্রকারে বহু অস্বাস্থ্যকর, জ্বররোগের আকর, সিক্ত নিম্নভূমি মানবের বাসস্থান হইয়াছে ও তথাকার অধিবাসীরা বহুব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিতেছে। অনেক জাতির শারীরিক অবনতির প্রধান কারণই তাহাদের অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান। বার্থেলো বলেন, মানবকে আহারের জন্য শস্যক্ষেত্রের প্রতি আর তাকাইয়া থাকিতে না হইলে মানব স্বাস্থ্যকর উচ্চ ভূমিতে গিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবে। আজ যাহা মরু বলিয়া পরিচিত ও পরিত্যক্ত, বিজ্ঞানের আমলে তাহাই মনোরম উদ্যান সমন্বিত মানবের সুবাসস্থানে পারণত হইবে। বহু অর্থ ব্যয়ে শৈলাবাস নির্ম্মাণ করিয়া কেবল ধনীই এখন তাহার সুখভোগ করিতে সমর্থ কিন্তু বিজ্ঞানের রাজত্ব ক্রমশঃ উপরে উঠিতে থাকিলে উর্দ্ধে উচ্চ পর্ব্বতশিখরগুলিতেও সর্ব্বসাধারণ মানব কর্ত্তৃক নগর উপনগর প্রভৃতি স্থাপিত হইয়া আসিবে।

শেষ কথা, ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকেরই বিষম সন্দেহ ও আশঙ্কা আছে। অনেকেই মনে করেন বিজ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের ক্ষেত্র ক্রমশঃ খাট হইয়া আসিবে—বিজ্ঞানব্যাঘ্র ধর্ম্মের মেষশাবকটীকে বুঝি উদরসাৎ করিয়া ফেলিবে—অথবা বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে, বিজ্ঞানের প্রখর তাপে ও জ্ঞানচক্ষুর বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণে জলমতিতরলং ধর্ম্মটুকু বুঝি হাওয়া হইয়া উড়িয়া যাইবে। কিন্তু এই শ্রেণীর সন্দেহবাদীদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ধর্ম্মকর্ত্তা ও বিজ্ঞানকর্ত্তা কি দুই, ধর্ম্মের ফলভোগী যে মানব বিজ্ঞানের ফলভোগীও কি সেই মানব নহে? যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, যে মানব ইষ্টকামনায় কঠোর তপস্যায় গুহানিহিত ধর্ম্মতত্ত্বকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করে সেই মানবই কি সত্যসন্ধ বেশে গিরিশৃঙ্গে, অতল জলধিতলে, ব্যোমাকাশে, ভূগর্ভে প্রবিষ্ট অগাধখাতে প্রকৃতি দেবীর অনুসরণ করিয়া কঠোর আরাধনায় তাঁহার সন্তোষসাধন পূর্ব্বক বরস্বরূপে একটী একটী বিজ্ঞানতত্ত্ব গ্রহণ করিতেছে না? তবে তাঁহাদের কি উত্তর আছে জানি না। ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের শত্রুতা বা বিরোধভাব হইবার সম্ভাবনা কোথায় তাঁহারা কি বুঝাইয়া দিবেন জানি না। বার্থেলোও বলেন ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান মধ্যে কোন বিরুদ্ধ ভাব নাই, হওয়াও সম্ভব নহে। যে ধর্ম্ম যে যুগে উদ্ভূত হইয়াছে তৎধর্ম্ম তাৎকালিক বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি গাঁথিয়াই দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু বিজ্ঞান কিছু স্বাধীন, কারণ অল্পসংখ্যকের মুখাপেক্ষী, তাহারা আবার জ্ঞানবর্ত্তিকার উদ্দীপনায় অগ্রসর ও তৎপর, সুতরাং অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতি। তাই বিজ্ঞান অন্ধকারকে ফেলিয়া রাখিয়া আগে আগে চলে, ধর্ম্ম বহুভারাক্রান্ত, অন্ধকারকে সঙ্গে টানিয়া লইয়া চলিতে হয় বলিয়া কিছু ধীরে পিছু পিছু হাঁটে; এই দূরত্বেই ভ্রম হয় উভয়ের মধ্যে যেন বিরুদ্ধভাব থাকা বশতঃ উভয়ে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানই ধর্ম্মের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া অগ্রবর্ত্তী হয়, ধর্ম্ম তাহার পশ্চাদবর্ত্তী থাকে। বিজ্ঞান সচল, ধর্ম্মও অচল নহে—দৃষ্টিভ্রম বশতঃ তদ্রূপ বোধ হয় মাত্র। উদাহরণ দিয়া বার্থেলো বুঝাইয়াছেন বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম উভয়েই যেন দুই ব্যক্তির ন্যায় কোন উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিতেছে, বিজ্ঞান আগে আগে ধর্ম্ম পিছে পিছে। উপরের স্তরে উঠিতে উঠিতে বিজ্ঞানের দৃষ্টিপথে যে নূতন নূতন দৃশ্য আবির্ভূত হয় সে সর্ব্বদাই তাহা ঘোষণা করিতেছে, কিন্তু ধর্ম্ম নীচের স্তরে থাকায় তাহার দৃষ্টি শক্তির প্রসার এখনো তত বিস্তৃত হয় নাই বলিয়া প্রথমে তাহা অবিশ্বাস করিতেছে কিন্তু যেই অগ্রসর হইয়া বিজ্ঞানের পুরাতন স্থানে পৌঁছিতেছে তখন বিজ্ঞানের পূর্ব্ব উক্তির সত্যতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতেছে বটে কিন্তু ইত্যবসরে আরও উপরে উঠিয়া বিজ্ঞান যে আবার নূতন ঘোষণা করিতেছে

ধর্ম্ম তদ্বিষয়ে আবার সন্দিহান হইতেছে; ধর্ম্ম পুনরায় বিজ্ঞানের স্থানে পৌঁছিলে বিজ্ঞানের এই উক্তির বিষয়ে তাহার যে সন্দেহ তাহা দূর হইবে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের নূতনতর ঘোষণা বা প্রচারে পূর্ব্ববৎ সন্দিহান থাকিয়াই যাইবে। এইরূপে বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম আগু পিছু হইয়া উভয়েই অগ্রসর হইতেছে। বিজ্ঞান আগে হাঁটিলেই ধর্ম্মের গতির সম্ভাবনা হয়, বিজ্ঞানের উন্নতির অভাবে ধর্ম্ম নিশ্চল হইয়া পড়ে। বিজ্ঞান রেলগাড়ীর এঞ্জিন, আগুন জলে সিদ্ধ হইয়া, তাপতাড়না সহ্য করিয়া তাহাকেই আগে মাথা ঠেলিতে হয়; ধর্ম্ম সুখদায়ক গাদি আঁটা আরোহীর গাড়ী; গন্তব্য পথে যাইতে হইলে মানব ইহারই আশ্রয় গ্রহণ করে বটে কিন্তু বিজ্ঞানের দগ্ধ এঞ্জিনের গতি না থাকিলে, অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে যুড়িয়া না লইলে সুখাসন ধর্ম্মযানের সাধ্য নাই মানুষকে ঠিক্ যায়গায় পৌছাইয়া দেয়। অনাদি অনন্ত কাল বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের এইরূপ দূরত্ব থাকিয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহার কারণ দ্বন্দ্ব নহে ধর্ম্মের প্রতি বিজ্ঞানের আকর্ষণ ও বিজ্ঞানের প্রতি ধর্ম্মের সম্যক্ নির্ভরই তাহার একমাত্র কারণ। বিজ্ঞানের প্রতি ধর্ম্মবিশ্বাসীর যে সন্দেহ তাহা ভ্রান্তিমূলক; সুতরাং বিজ্ঞানভয়ে ভীত ধর্ম্মাচরণীর জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অকৃতজ্ঞতা পাপে লিপ্ত হওয়া হেতু প্রকৃত ধর্ম্ম অর্জন হয় কিনা তদ্বিষয়েও ঘোরতর সন্দেহ হইতে পারে।

এইরূপ নানা কথায় মুসো মার্সিলিস্ বার্থেলো তাঁহার প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিয়াছেন। ইহার সত্যাসত্য, যৌক্তিকতা অযৌক্তিকতা, সম্ভবতা অসম্ভবতা, ভ্রাতৃবর্গের নিজ নিজ বিবেচ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কৌতুক উদ্দেশ্যেই অদ্যকার এই প্রবন্ধ উপস্থিত করা হইয়াছে সুতরাং এই প্রবন্ধের কোন অংশ কাহারো কোন বিশ্বাস বা জ্ঞানের কিম্বা ধারণার* বিরুদ্ধবাদী হইলে প্রবন্ধপাঠককে তজ্জন্য দায়ী করিবেন না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫। দিনাজপুর।

---

* গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে 'দিনাজপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে' পঠিত।

বৌদ্ধধর্ম্মের বিশ্বপ্রেম।

(পৌষের প্রবাসীতে প্রকাশিত অংশের পর।)

ঐ গ্রন্থেরই আর এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়—বোধিসত্ত্ব স্থির সঙ্কল্প করিবেন—"আমি এই কুশল-মূল দ্বারা সর্ব্বজীবের নয়ন-স্বরূপ হইব, যাহাতে তাহাদের সমস্ত দুঃখ-রাশি নিবৃত্ত হয়; আমি সমস্ত জীবের সমস্ত ক্লেশ পরিমোচন করিয়া তাহাদের ত্রাণস্বরূপ হইব; আমি সমস্ত জীবকে সমস্ত ভয় হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদের শরণ হইব; সমস্ত স্থানে অনুগমন করিয়া আমি তাহাদের গতি স্বরূপ হইব; ...এবং তিমিরহীন জ্ঞান সন্দর্শন করাইয়া আমি তাহাদের আলোক স্বরূপ হইব...। সমস্ত জীব গুণ-জ্ঞানে অভিচ্ছাদিত হইয়া সমস্ত ক্লেশ হইতে নির্ম্মুক্ত হউক;...সমস্ত জীব দশবল-রূপ বিজ্ঞানযুক্ত হইয়া সংসারের ছত্র-স্বরূপ হউক,...এবং সমস্ত জীব বুদ্ধবিক্রম রূপ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র জগতের অবলোকনীয় হউক!"

'আর্য্য বজ্রধরসূত্রে' এই বিষয়টি অতিবিস্তৃত ও অতিগম্ভীর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এ স্থানে তাহা সঙ্কলন করা অসম্ভব। কেবল দিগ্দর্শন মাত্র করিয়া সম্প্রতি বিরত হইতে হইতেছে।

'আর্য্য গগনগঞ্জসূত্র' নামক গ্রন্থে একটী অতি ক্ষুদ্র কথায় বিশ্বপ্রেমের ভাবটি সুপ্রকাশিত হইয়া উঠিয়াছে:—

"মাভূৎ তন্মম কুশলমূলং, ধর্ম্মজ্ঞান কৌশলং বা, যন্ন সর্ব্বজীবোপভোগ্যং ভবেৎ।"

"আমার যেন সেরূপ পুণ্যমূল বা ধর্ম্মজ্ঞানে কুশলতা না হয়, যাহা সমগ্র জীবের উপভোগ্য না হইবে।"

'বীরদত্ত পরিপৃচ্ছায়' লিখিত হইয়াছে:—"শকটের ন্যায় ভার বহন করিবার জন্য ধর্ম্মবুদ্ধিতে এই শরীরকে বহন করিতে হইবে।"

ভগবান্ 'বোধিসত্ত্বপ্রাতিমোক্ষে' বলিয়াছেন—"শারিপুত্র, এই ধর্ম্ম বন্ধচ্ছেদের জন্য, এই ধর্ম্ম জন্মজরা, ব্যাধি-মরণ, ও শোকদুঃখাদির ছেদের জন্য; ইহাকে রত্ন বলিয়া, ঔষধ বলিয়া চিন্তা করিবে; ইহা সমস্ত জীবের রোগগ্লানি উপ-শমনের জন্য। সমস্ত জীবের রোগগ্লানির উপশমনের জন্য আমাদের এইরূপ ধর্ম্মই অভিলষণীয়।"

'অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞা পারমিতায়' (৩০ অঃ ৪৯৫ পৃঃ)

সদা-প্ররুদিত নামক কোন বোধিসত্ত্বকে এক শ্রেষ্ঠিদারিকা তাঁহার পূজার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন —"তাহাতে আমরা শিক্ষা করিব, শিক্ষা করিয়া সমস্ত জীবের শরণ হইব।"

'ধর্ম্ম সঙ্গীতিসূত্রে' উক্ত হইয়াছে :—"বোধিসত্ত্ব সমস্ত জীবের কার্য্য সম্পাদন করিয়া দাসের ন্যায় হইয়া থাকিবে।"

'আর্য্য বিমল কীর্ত্তি নির্দ্দেশে' সংসার-ভয়-ভীত ব্যক্তির কি করা কর্ত্তব্য—মঞ্জুশ্রীর এই প্রশ্নে একজন উত্তর করিতেছেন :—"হে মঞ্জুশ্রী, সংসার-ভয়-ভীত বোধিসত্ত্বের বুদ্ধমাহাত্ম্য অনুসরণ করা উচিত।"

"যে ব্যক্তি বুদ্ধমাহাত্ম্য অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার কি করা উচিত?"

"তাহার সমস্ত জীবে সমত্ব দর্শন করা উচিত; এবং সমত্ব দর্শন করিতে হইলে সমস্ত জীবের মোক্ষের জন্য অবস্থান করা উচিত।"

'ধর্ম্ম-সঙ্গীতিসূত্রে' সার্থবাহ বোধিসত্ত্ব ভগবান্‌কে এই কথাই বলিয়াছেন : "হে ভগবন্, যে ব্যক্তি (বস্তুতঃ) বোধিসত্ত্ব, সে প্রথমে সমস্ত জীবের জন্য বোধি (জ্ঞান) প্রার্থনা করে, নিজের জন্য নহে।"

ঐ গ্রন্থেরই অন্যত্র বোধিসত্ত্বগণের মহামৈত্রী ও মহাকামনা কাহাকে বলে—এই প্রশ্নের উত্তরে লিখিত হইয়াছে:— "বোধিসত্ত্বগণ যে, নিজের শরীর, জীবন ও সমস্ত পুণ্য জীবসমূহকে প্রদান করিয়া তাহার জন্য কোন প্রতীকার ইচ্ছা করেন না, ইহাই তাঁহাদের মহামৈত্রী; এবং তাঁহারা যে সর্ব্বপ্রথমে নিজের বোধি (জ্ঞান) প্রার্থনা না করিয়া সমস্ত জীবের বোধি ইচ্ছা করেন, ইহাই তাঁহাদের মহাকরুণা।"

বোধিসত্ত্বগণ কি জন্য শীল রক্ষা করেন, তদ্বিষয়ে 'নারায়ণ পরিপৃচ্ছায়' উক্ত হইয়াছে :—"সে যে শীল রক্ষা করে, তাহা নিজের জন্য নহে, স্বর্গের জন্য নহে, ইন্দ্রত্বের জন্য নহে, ভোগের জন্য নহে, ঐশ্বর্য্যের জন্য নহে, রূপের জন্য নহে, বর্ণের জন্য নহে, এবং যশের জন্যও নহে; সে নরক-ভীত হইয়া……বা তির্য্যগ্‌যোনি ভয়-ভীত হইয়া শীল রক্ষা করে না; সে সমস্ত জীবের হিত, সুখ ও যোগক্ষেমের প্রার্থী হইয়া শীল রক্ষা করে।"

'বোধিচর্য্যাবতারে'* একজন জীব ভক্ত বলিতেছেন :— "এই জীবগণ চিন্তামণির স্বরূপ, ভদ্রঘটের† স্বরূপ, ও কামদুগ্ধ ধেনুর স্বরূপ; অতএব গুরু ও দেবতার ন্যায় ইহাদের আরাধনা করা উচিত।…জীবগণের আরাধনা ত্যাগ করিলে অপর নিস্কৃতি আর কি আছে? (বোধিসত্ত্বগণ) যাহাদের জন্য নিজের শরীরকেও ভেদ করেন ও অবীচি নরকেও প্রবেশ করেন, তাহাদের মঙ্গল করিলেই (বস্তুতঃ) মঙ্গল করা হয়; তাহারা মহাপকারী হইলেও তাহাদের মঙ্গল করা উচিত। যাহাদের জন্য আমার স্বামীরাই (পূর্ব্ব বুদ্ধ বোধিসত্ত্বগণ) নিজের প্রতি নিরপেক্ষ হন, সেই স্বামিগণের নিকটে আমরা দাস্য না করিয়া মান করি কেন? যাহাদের সুখে মুনীন্দ্র (বুদ্ধ)গণ প্রীত হন, এবং যাহারা ব্যথা পাইলে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হন, তাহাদের তুষ্টি হইলেই মুনীন্দ্রগণ তুষ্ট হইবেন, এবং তাহাদের অপকার হইলে মুনীন্দ্রগণের অপকার করা হইবে। শরীর চারিদিকে অগ্নিতে জ্বলিয়া উঠিলে, যেমন নিখিল কাম্য বস্তুতেও সৌমনস্য উপস্থিত হয় না, সেইরূপ জীবগণের যদি ব্যথা হয়, তবে দয়াময় (মুনীন্দ্র) গণের প্রীতি উৎপাদনের অপর কোন উপায় নাই। ইহাই (অর্থাৎ জীবগণের আরাধনাই) তথাগতের আরাধনা, ইহাই স্বার্থের আরাধনা, এবং ইহাই লোকের দুঃখাপহ; অতএব ইহাই আমার ব্রত হউক।—

"তথাগতারাধনমেতদেব
স্বার্থস্য সংরাধনমেতদেব
লোকস্য দুঃখাপহমেতদেব
তস্মান্মমাস্তু ব্রতমেতদেব।"

যেমন একজন রাজপুরুষ বহুজনকে প্রমথিত করে, আর দূরদর্শী জনগণ তাহার কোন বিকারই করিতে সমর্থ হয় না, কারণ সে একাকী নহে, তাহার বল রাজ-বল,— সেইরূপ কোন দুর্ব্বল ও অপরাধীকে অবমাননা করিবে না, কেন না দয়ালু নরপালগণ তাহার বল। অতএব ভৃত্য যেমন চণ্ড প্রভুকে আরাধনা করে, জীবগণকে সেইরূপ সেবা করিবে।

* ৬।১১৯—১৩০; ইহা শিক্ষা সমুচ্চয়েও আছে, ১৫৫ পৃঃ।
† যে ঘটে হস্ত প্রদান করিলেই অভিমত বস্তু পাওয়া যায়।

ঐ 'বোধিচর্য্যাবতারেই' অন্যত্র আর এক ভক্ত প্রেম-পরিপূর্ণ হৃদয়ে বলিতেছেন :—

"জীবগণ নরকদুঃখের বিশ্রামোপায় স্বরূপ যে পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছে, আমি তাহা অনুমোদন করিতেছি; দুঃখিতেরা আনন্দের সহিত সুখে অবস্থান করুক।···দিক্ সমূহে অবস্থিত সংবুদ্ধ জনগণের নিকট আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা মোহবশতঃ দুঃখপতিত লোক সমূহের জন্য ধর্ম্মপ্রদীপ (উৎপাদন) করুন। যে সমস্ত জীব (কৃত-কৃত্য হইয়া) নির্ব্বাণ কামনা করিতেছেন, আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা অনন্তকল্প পর্য্যন্ত (এখানে) অবস্থান করুন, এই জগৎ যেন (তাঁহাদের অভাবে) অন্ধ হইয়া না যায়। আমি এইরূপে এই (পূজাদি) করিয়া যাহা কিছু শুভ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা দ্বারা আমি যেন জীব সমূহের সর্ব্বদুঃখ প্রশমনকারী হইতে পারি। আমি পীড়িত ব্যক্তিগণের ঔষধ ও বৈদ্য, এবং যতদিন রোগ নিবৃত্ত না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত তাহাদের পরিচারক। আমি অন্ন ও পান বিতরণ করিয়া জীবগণের ক্ষুধা ও পিপাসা নাশ করিব, এবং দুর্ভিক্ষের মধ্যে ও প্রলয় সময়ে (যখন আহারাদির অভাবে, লোক সমূহ মরিয়া যায়, বা পরস্পর পরস্পরের মাংস শোণিতাদি ভোজন করে, সেই সময়ে) তাহাদের পান ও ভোজন হইয়া দরিদ্র জীবগণের অগ্রে আমি অক্ষয়নিধি সদৃশ হইয়া নানা উপকরণের আকারে তাহাদের পরিচর্য্যা করিব। আমি সমস্ত জীবের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য নিরপেক্ষ হইয়া (অর্থাৎ কোনরূপ প্রত্যুপকারের আশা না করিয়া) নিজের শরীরকে, উপভোগ্য দ্রব্য সমূহকে, এবং (ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান) এই কালত্রয়স্থিত নিখিল কল্যাণকে পরিত্যাগ করিতেছি। সমস্ত বস্তুর ত্যাগই নির্ব্বাণ, এবং আমার মন সেই নির্ব্বাণকে প্রার্থনা করিতেছে; অতএব আমাকে যখন সমস্ত দ্রব্য পরিত্যাগ করিতেই হইবে, তখন তাহা জীবগণকে দেওয়াই ভাল। আমি আমার এই শরীরকে সমস্ত প্রাণীর নিকটে, তাঁহাদের যথাসুখে ব্যবহারের উপযুক্ত করিয়া দিয়াছি, তাঁহারা এখন আমাকে আঘাত করুন, নিন্দা করুন, বা ধূলি দ্বারা আকীর্ণ করুন; অথবা তাঁহারা আমার শরীর লইয়া ক্রীড়া করুন, হাস্য করুন, বা বিনাশ করুন, আমি তাঁহাদিগকে আমার শরীর দান করিয়া দিয়াছি, আমার সে চিন্তায় প্রয়োজন কি? যাহাতে তাঁহাদের সুখ হয়, তাঁহারা সেই সমস্ত কার্য্যই তাহার দ্বারা করাইয়া লউন। আমাকে গ্রহণ করিয়া কাহারো যেন কখন কোন অনর্থ না হয়। যে সমস্ত লোক আমার নিন্দা করিবেন, যাঁহারা আমার অপকার করিবেন, ও যাঁহারা আমাকে উপহাস করিবেন, তাঁহারা সকলেই বোধি (জ্ঞান) লাভী হইবেন। আমি অনাথগণের নাথ, যাত্রিকগণের সার্থবাহ, এবং পারেচ্ছুগণের নৌকা, সেতু ও পথ। আমি দীপপ্রার্থিগণের দীপ, আমি শয্যাপ্রার্থিগণের শয্যা, এবং দাসপ্রার্থী লোক সমূহের দাস।—

"দীপার্থিনামহং দীপঃ
শয্যা শয্যার্থিনামহম্।
দাসার্থিনামহং দাসো
ভবেয়ং সর্ব্বদেহিনাম্॥" *

এতক্ষণ বৌদ্ধধর্ম্মের যে একটি মধুরভাব আপনাদের নিকটে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে আর কিছু অধিক না বলিয়া দুই এক কথায় উপসংহার করিব।

'আর্য্যরত্নমেঘ (সূত্র)' নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে :—"হে কুলপুত্র, বোধিসত্ত্বগণ কি প্রকারে বোধিসত্ত্বোচিত শিক্ষা উপদেশে সংবৃত্ত হইয়া থাকেন? বোধিসত্ত্ব মনে বিচার করে, 'প্রাতিমোক্ষোচ উপদেশ মাত্রে অনুত্তর সম্যক্ সংবোধিকে লাভ করিতে পারা যায় না। তবে কি করিতে হইবে? তথাগত সেই সেই সূত্রান্ত সমূহে বোধিসত্ত্বগণের যে যে সমুদাচার ও শিক্ষাপদ সমূহ জানাইয়াছেন, সেই সমস্ত আমাকে শিক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু তাহা বিস্তর, অতএব আমাদের ন্যায় মন্দবুদ্ধি লোক সমূহের দ্বারা তাহা দুর্বিজ্ঞেয়। তবে কি করা উচিত? মর্ম্মস্থান সমূহ জানিতে হইবে, তাহা হইলে দোষ হইবে না। সে মর্ম্মস্থান কতগুলি—যে গুলিকে (ভগবান্ তথাগত) মহাযানাভিরত জনগণের জন্য সূত্রান্ত সমূহে বলিয়া গিয়াছেন।

ভগবান্ বলিয়াছেন ঐ মর্ম্মস্থান একটি মাত্র, এবং তাহা

* বোধিচর্য্যাবতার, ৩,১—১৯।

এই:—"নিজের শরীরকে, উপভোগ্য দ্রব্য সমূহকে, ও (ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান এই) কালত্রয়সহিত কল্যাণকে সমস্ত জীবের জন্য যে উৎসর্গ, তাহাই রক্ষা ও শুদ্ধির বৃদ্ধি কারক।"

"আত্মভাবস্য ভোগানাং
ত্র্যধ্ববৃত্তেঃ শতস্য চ।
উৎসর্গঃ সর্ব্বসত্ত্বেভ্য-
স্তদ্রক্ষা শুদ্ধিবর্দ্ধনম্॥"*

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

ঐতিহাসিক প্রশ্ন।

ভারতবর্ষের পরাধীনতা-সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত চিরকালই শুনিয়া আসিতেছি। তন্মধ্যে একটী মত অতি প্রসিদ্ধ। কনোজ-রাজ জয়চন্দ্র মহম্মদ ঘোরীকে এই স্বর্ণ-প্রসূ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার জন্য আহ্বান করেন। কারণ, দিল্লীর অধিপতি পৃথ্বীরাজের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। এই গৃহ-বিবাদের ফলে ভারত লক্ষ্মীর চরণে মহম্মদ ঘোরী দাসত্ব-শৃঙ্খল পরাইতে সমর্থ হন। বিগত অগ্রহায়ণ মাসের "প্রবাসীতে" শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "ধর্ম্মের বলবত্তা" শীর্ষক প্রবন্ধের পাদ-টীকায় এই প্রসঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—

"পৃথ্বীরাজের আমলে যদি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব দেশ হইতে সমূলে লোপ না পাইয়া যাইত, তাহা হইলে অশ্বমেধের অলীক আড়ম্বর মৃত্যুশয্যা হইতে কুক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়া দেশীয় রাজাদিগের আপনা আপনির মধ্যে বৈরিতানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিত না; আর তাহার উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া ভারতলক্ষ্মী লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া মুসলমান সেনাপতির আশ্রয় যাচ্ঞা করিতে যাইতেন না।"

যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে এদেশে মূর্ত্তিপূজার (ইংরাজী-নবিশদিগের মতে বলিতে গেলে, ভারতের সর্ব্বপ্রকার অধঃপতনের মূল "পৌত্তলিকতার") বহুল প্রচার হইয়াছিল, সংসারের প্রতি ঔদাস্যসূচক যতি-ধর্ম্ম ও অদৃষ্টবাদের প্রাবল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিনাশের সহিত ক্ষত্রিয়-জাতির অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছিল এবং বেতনগ্রাহী যুদ্ধ-ব্যবসায়ীদিগের হস্তে দেশরক্ষার ভার পড়িয়াছিল, যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পরিণামে দেশে তান্ত্রিক মতের অর্থাৎ পঞ্চমকার-সাধনের স্রোত প্রবাহিত হওয়ায় সমাজের নৈতিক বল ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছিল বলিয়া শুনিতে পাই, সেই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব দেশ হইতে লোপ পাওয়ায় ভারতলক্ষ্মী লজ্জায় মুসলমান সেনাপতির আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন,—এই সিদ্ধান্ত কতদূর ঐতিহাসিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা জানিতে স্বতই বাসনা হয়। আত্মকর্ম্মের ফল সকলকেই ভোগ করিতে হয়, এ সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের জন্য অপরকে দায়ী করা কতদূর সঙ্গত, তাহাও বিবেচ্য। "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন" যদি প্রকৃতির নিয়ম হয়, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্ম সেই নিয়মবশেই পুনরভ্যুদয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, এ কথা বলিলে কি ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ হয়?

জয়চন্দ্রের ললাটে যাঁহারা ভারতবর্ষের পরাধীনতার সমগ্র কলঙ্ককালিমা লেপন করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের নিকট প্রশ্ন এই, জয়চন্দ্রের পূর্ব্বে কি মুসলমান রত্নপ্রসূ ভারতবর্ষের কোনও পরিচয় প্রাপ্ত হয় নাই? জয়চন্দ্রই কি সর্ব্বপ্রথম মুসলমানকে পথ দেখাইয়া ভারতবর্ষে আনয়ন করেন? জয়চন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বে কি মুসলমানের লোলুপ-দৃষ্টি ভারতবর্ষের উপর নিপতিত হয় নাই? তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই কি ভারতবর্ষ অধিকারের চেষ্টা মুসল-মানদিগের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় নাই? জয়চন্দ্রের সহিত পৃথ্বীরাজের মনোমালিন্য না ঘটিলে কি মহম্মদঘোরীর সৈন্য-দল ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করিবার অবসর পাইত না? এই মনোমালিন্য বা "দেশীয় রাজাদিগের আপনা আপনির মধ্যে বৈরিতানল" ভারতের পরাধীনতার কত দূর সহায়তা করিয়াছিল?

ইতিহাসে দেখিতে পাই,—তিরৌরির যুদ্ধে পরাজিত হইবার দুইবৎসর পরে ১১৯৩ খ্রীঃ অব্দে মহম্মদ ঘোরী একলক্ষ বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ অতি গোপনে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করেন। তাহার পর তাঁহার শুভাগমনবার্ত্তা যখন প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তখন হিন্দু

* বোধিচর্য্যাবতার পঞ্জিকা, ৪,৪৮; শিক্ষা সমুচ্চয় ১৭ পৃঃ। এই প্রবন্ধটি ললিতবিস্তর, বোধিচর্য্যাবতার ও শিক্ষা সমুচ্চয় হইতে সঙ্কলিত। বোধিচর্য্যাবতার, তাহার টীকা পঞ্জিকা, এবং ইহার প্রধান আশ্রয় শিক্ষা-সমুচ্চয় অতি উপাদেয় গ্রন্থ। শিক্ষাসমুচ্চয়ে মহাযানের বিবিধ গ্রন্থের বাক্যাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা Prof. Cecil Bendal (Bibliotheca Buddhica, St. Petersbourg) প্রকাশ করিয়াছেন। বোধিচর্য্যা-বতার Buddhist Text Societyতে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং পঞ্জিকার সহিত মূল A. S. B. তে প্রকাশিত হইবে।

রাজন্যবর্গ তাঁহাকে বাধাদানের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ভারতবর্ষ তখন যদিও বহু খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল, এবং হয়ত সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতিদিগের মধ্যে সোদরতুল্য প্রীতিও বিদ্যমান ছিল না; তথাপি "অনতিবিলম্বে ১৫০ জন হিন্দু রাজা সসৈন্যে আসিয়া পৃথ্বীরাজের বিশাল পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহারা সকলেই গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন যে, হয় শত্রুর নিপাতসাধন করিবেন, নচেৎ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন। তিন লক্ষ অশ্বারোহী, তিন সহস্র হস্তী ও অগণ্য পদাতিসৈন্য দ্বারা সুবিশাল হিন্দুব্যূহ গঠিত হইল। হিন্দু সৈনিকদিগের বিকট গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক্ প্রকম্পিত হইতে লাগিল। এরূপ বিশাল সৈন্য সম্ভবতঃ আর কখনও একত্র সম্মিলিত হয় নাই।" ("ভারতবর্ষের মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত"—৮৩ পৃষ্ঠা)।

ইহার পর যুদ্ধের যে বর্ণনা পাই, তাহার মধ্যেও হিন্দুপক্ষ হইতে কাহারও কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল রাজপুতই প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল। তথাপি তাঁহাদিগের পরাভব ঘটিল! কেন এরূপ হইল? ১ লক্ষ ২০ সহস্র মুসলমান সেনার হস্তে হিন্দুর "৩ লক্ষ অশ্বারোহী, ৩ সহস্র হস্তী ও অগণ্য পদাতিসৈন্য" কেন পরাস্ত হইল? এই পরাজয়ের মূল উভয়পক্ষের অবলম্বিত স্বতন্ত্র যুদ্ধনীতির ও রণকৌশলের মধ্যে, অথবা অশ্বমেধের অলীক আড়ম্বরের মধ্যে অনুসন্ধেয়?

ঐতিহাসিক হণ্টার বলেন, ভারতবর্ষ সেকালে নানা ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইলেও বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণকালে ঐ সকল রাজ্যের অধিপতিদিগের মধ্যে একতার সঞ্চার হইত; সকলে সমবেত হইয়া বৈদেশিক শত্রুকে বাধাদান করিতে অগ্রসর হইতেন। সার্ব্বভৌম শক্তির বিলোপ ঘটিলেও সামন্ত রাজারা বৈদেশিক শত্রুকে বাধাদানে কখনও উপেক্ষা প্রকাশ করেন নাই। এই কারণে মুসলমানের পক্ষে ভারতবর্ষ জয় করা অতীব কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষ সহজে মুসলমানের করায়ত্ত হইয়াছিল—এ সংস্কার যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। হণ্টার সাহেব তাঁহার "ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার" নামক গ্রন্থে এই সকল কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতবর্ষ কখনই সম্পূর্ণ ভাবে মুসলমানের পদানত হয় নাই। হিন্দুগণ শেষ পর্য্যন্ত আপনাদের প্রাধান্য-রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল এবং সে চেষ্টায় প্রায় সর্ব্বাংশেই সফলকাম হইয়াছিল।

এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেবের মতে হিন্দুর যোধশক্তির অভাব কখনই ছিল না—তবে রণকৌশলে বা কুটিল যুদ্ধনীতিতে মুসলমানের অপেক্ষা হীন বলিয়াই হিন্দু বহুস্থলেই মুসলমানের হস্তে পরাজিত হইয়াছে। ইতিহাসেও দেখিতে পাই, পৃথ্বীরাজের সহিত যুদ্ধে ও তৎপরে যে সকল যুদ্ধ ঘটিয়াছে, তাহাতে হিন্দু প্রায় অসতর্কভাবে আক্রান্ত হইয়া অথবা স্বীয় সৈন্য-সংখ্যার আধিক্যসত্ত্বেও রণনীতির দোষেই মুসলমানের হস্তে পরাস্ত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবের সহিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সম্পর্কের বিষয় কোনও বিজ্ঞ ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন নাই। শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিজেন্দ্র বাবু সে সম্বন্ধ প্রদর্শন করিলে ঐতিহাসিকদিগের উপকার সাধিত হইতে পারে।

দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিতেছেন, "আমার এইরূপ মনে হয় যে, মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে আর্য্য ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে বিরোধ এবং বৈরিতার পরিবর্ত্তে ঐক্য এবং সদ্ভাব থাকিলে আমাদের দেশের এরূপ দুর্গতি হইত না।" তাঁহার এই অনুমানের মূলে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে? হিন্দুধর্ম্ম ত বিরোধগ্রাসিতার জন্যই চিরপ্রসিদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম্ম অতি অল্পদিন পরেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ্যভাবাপন্ন বৌদ্ধধর্ম্ম মহাযানসম্প্রদায় নামে পরিচিত। এই মহাযানের উৎপত্তি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকেরা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহার পর হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষত্ব ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মই উহার স্থান অধিকার করে। এই পরিবর্ত্তনকালে সমাজে উল্লেখযোগ্য কোন সংঘর্ষ সংঘটিত হয় নাই, এইরূপ উল্লেখ ঐতিহাসিকদিগের রচনায় আমরা দেখিতে পাই। সুপ্রসিদ্ধ জাপানী অধ্যাপক ওকাকুরা বলেন, খ্রীষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে জাপানে যে বৌদ্ধধর্ম্ম গমন করিয়াছিল, তাহা পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের নামান্তর মাত্র। তাই ঐ সময়ের জাপানী স্থাপত্য-শিল্পে

শিব, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীর প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান আগমনের বহুপূর্ব্বে যে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের অপূর্ব্ব সংমিলন ঘটিয়াছিল, এবং হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধবাদের বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া যে ক্রমশঃ উহাকে আপনার অঙ্গীভূত করিয়া লইতেছিল, জাপানী স্থাপত্য-শিল্প তাহারই পরিচায়ক। প্রতিভাশালী ব্রাহ্মণের কৌশলে প্রায় বিনা সংঘর্ষেই বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িতেছিল বলিয়াই মনে হয়। পূর্ব্ববঙ্গের রাজা শশাঙ্ক ও হুনবংশীয় কাশ্মীরের "মিহিরকুল" ভিন্ন আর কেহ কি কখন বৌদ্ধদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন? জাপানী অধ্যাপক ওকাকুরা তাঁহার Ideals of the East নামক গ্রন্থের ৮০ পৃষ্ঠায় বৌদ্ধধর্ম্মের তৃতীয় অবস্থার পরিচয়-দান-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

Hinduism—that form in which the Indian national consciousness had been striving to resolve Budhism ever since its appearance as a creed—is now recognised once more as the inclusive form of the nation's life. The great Vedantic revival of Sankaracharya is the assimilation of Buddhism, and its emergence in a new dynamic form.

এই গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীমতী নিবেদিতা লিখিয়াছেন,—

The thing we call Buddhism can not in itself have been a defined and formulated creed, with strict boundaries and clearly demarcated heresies, capable of giving birth to a Holy office of its own. Rather must we regard it as the name given to the vast synthesis known as Hindusim when received by a foreign consciousness, for Mr. Okakura in dealing with the subject of Japanese art in the 9th century makes it abundantly clear that the whole mythology of the East and not merely the personal doctrine of the Buddha, was the subject of interchange. Not the Buddhaising but the Indianising of the Mongolian mind, was the process actually at work—much as if Christianity should receive in some strange land the name of Franciscanism, from its first missionary.

দ্বিজেন্দ্র বাবুর লেখার ভাবে বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত মতসমূহ ভ্রমপূর্ণ। বিশেষতঃ তিনি যখন মনে করেন,—"কোন চীনদেশীয় বিজ্ঞলোক যদি বলেন যে, ভালমন্দনির্ব্বিশেষে বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগের আবালবৃদ্ধবনিতার উপরে যেরূপ মর্ম্মবিদারক নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া তাহাদিগকে আবর্জ্জনার ন্যায় ভারতবর্ষ হইতে সমূলে ঝাঁটাইয়া ফেলা হইয়াছিল, সেই পাপের ফলে অনতিপরে ভারতবর্ষ পরহস্তগত হইল, তবে তাঁহার সেকথা আমরা যে হাসিয়া উড়াইয়া দিব তাহার যো নাই।"—তখন তাঁহার ঐরূপ মতের দৃঢ়তা সম্বন্ধে আমাদিগের মনে আর সংশয়ের লেশমাত্র থাকে না। কিন্তু এইরূপ দৃঢ়তা সহকারে তিনি যে মতের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা কি অভ্রান্ত ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে? আমরাও বাল্যকালে ঐরূপ বৌদ্ধ-নির্য্যাতন ও নির্ব্বাসনের কথা শুনিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ মহোদয়ের ন্যায় পুরাতত্ত্ববিৎ তাঁহার নূতন অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ লিখিতেছেন:—

Under the Gupta dynasty (A. D. 320—480), a great revival of Brahmanical Hinduism took place and Buddhist worship slowly decayed. But Buddhism was not as a rule violently extirpated.—Page 121.

The gradual decay of Indian Buddhism was due to the fact that *other religious systems suited the people better on the whole.* Persecution, although it had some effect, was only a minor factor in the change. ....Proved cases of real persecution of religion are too rare to have seriously affected the slow change in the popular creed. Buddhism declined, for the most part, *because people no longer cared for it,* and not because it was suppressed by force. A similar process of gradual decay may now be observed in the case of Shikhism, which would become extinct if it were not kept alive by the *espreit de corps* of the Shikh regiments.—(Page 298—99,.)

এই বঙ্গদেশেই দীর্ঘকাল অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল; কিন্তু এখান হইতেও উহার বিলোপ যে হিন্দুপক্ষ হইতে অনুষ্ঠিত কোন অত্যাচারের ফলে হয় নাই, তাহা কিছুদিন পূর্ব্বে ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় "প্রবাসী"তেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এসব কথা কি মিথ্যা? এই সন্দেহক্ষেত্রে কাহার কথায় বিশ্বাস করিব? হিন্দুদিগের অত্যাচারে যে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপ হয় নাই, একথা ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ সাহেব পুনঃ পুনঃ দৃঢ়তা সহকারে ব্যক্ত করিতেছেন। তাঁহার যে প্রবন্ধ হইতে পূর্ব্বোক্ত ইংরাজী অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই প্রবন্ধগুলি সরকারী গেজেটীয়ারের দ্বিতীয় খণ্ডে (The Imperial Gazetteer of India, vol II.

1908.) উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্বেতাঙ্গ পুরাতত্ত্ববিদ্ বলেন, "বৌদ্ধযুগ" এই নাম ভারতীয় ইতিহাসের কোনও অংশের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা সুসঙ্গত নহে।—

Although the Imperial patronage and missionary zeal of Asoka had given an immense impetus to the propagation of Buddhist doctrine, the older Brahmanical and Jain religions continued through all the ages to claim multitudes of adherents....It thus appears that the term "Buddhist Period" applied to the earlier ages of Indian history in many popular books, implies a misunderstanding of the facts. Although during six centuries, from 250 B. C. to A. D. 350, Buddhism enjoyed a larger measure of popular favour than it has ever obtained since, these centuries can not be described accurately as a "Buddhist Period"; for many parts of India never received Buddhism to any considerable extent, and at all times numerous princes and communities held aloof from it.—p. 298.

ফল কথা, এই সকল ঐতিহাসিক তথ্য বা আধুনিক পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের অভিনব ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত যথার্থ, অথবা শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত, তাহার বিস্তারিত আলোচনা হওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ ভারতলক্ষ্মীর পরাধীনতা-স্বীকারের সহিত যখন বৌদ্ধ-প্রভাবের ও বৌদ্ধনির্ব্বাসনমূলক আখ্যায়িকার সম্বন্ধ-স্থাপনে দ্বিজেন্দ্র বাবুর আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে, তখন তাঁহার সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করা কি সঙ্গত? অন্য কোন লেখক ঐরূপ কথা লিখিলে তাহা উপেক্ষার বিষয় বলিয়া মনে করিতে পারিতাম; কিন্তু দ্বিজেন্দ্র বাবুর ন্যায় সুবিজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ কথা লিখিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার উক্তি সম্বন্ধে উল্লিখিত প্রশ্নগুলি উত্থাপন করা প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছি। আশা করি, তিনি প্রশ্নকারীর দোষ গ্রহণ না করিয়া উত্থাপিত সন্দেহ কয়টীর নিরাকরণে যত্নশীল হইয়া বঙ্গীয় শিক্ষিতসমাজের উপকার সাধন করিবেন।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

বৌদ্ধধর্ম্ম।

গৌতমের জীবন-কাহিনী।

(জি-দে লাফোঁর ফরাসী হইতে)

কোন্ সময়ে বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেই সম্বন্ধে দুইটি মত আছে। বুদ্ধকে যাহারা "ফো" বলিয়া অভিহিত করে সেই চীনেরা এবং উত্তর দেশের বৌদ্ধেরা বলে, বুদ্ধদেব খৃঃ পূঃ ১১শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করেন। সিংহল-বাসীরা খৃঃ পূঃ ৭ শতাব্দীতে তাঁহার জন্মকাল নির্দ্ধারিত করিয়া থাকে। প্রাচ্য পুরাতত্ত্ববিৎ য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যেও এই বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। আমি বুর্নুফের মতের পক্ষপাতী; বুর্নুফ বলেন, সিংহলবাসীদের কথাই ঠিক্। "ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন:—"খৃঃ পূঃ ৪ শতাব্দী হইতে ভারতীয় ইতিবৃত্ত তাহারা যেরূপ যত্নসহকারে ও নিয়মিতরূপে সংরক্ষিত করিয়াছে তাহাতে তাহাদেরই লিখিত বৃত্তান্ত সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক ও প্রামাণিক বলিয়া মনে হয়।"

সিদ্ধার্থ বিভিন্ন নামে পরিচিত;—শাক্যমুনি, গৌতম, ভগবৎ, তথাগত, ও বুদ্ধ; ইনি আর্য্যবংশের শাক্যশাখা হইতে সমুদ্ভুত; ইনি রাজবংশোদ্ভব, ইঁহার পিতা অযোধ্যার রাজা ছিলেন, ইনি নিজেও রাজ্যের উত্তরাধিকারী যুবরাজ। খৃঃ পূঃ ৬৫০ অব্দে কপিলবস্তু নগরে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার জননী মায়াদেবী, প্রসবের সাত দিন পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে:—"মায়া-দেবীর কুক্ষি এরূপ পবিত্র যে, বুদ্ধের পর আর কেহ যে তাহা অধিকার করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই।" জনশ্রুতি অনুসারে, বুদ্ধের জননী এমন পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিবেন, যে পরিবার চৌষট্টি গুণে বিভূষিত, এবং তিনি নিজেও বত্রিশটি গুণে বিভূষিত হইবেন—এবং এই সকল চিহ্নের দ্বারাই তিনি বুদ্ধের জননী হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন। ললিতবিস্তরে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে:—"শুদ্ধোদনের মনোমোহিনী পত্নী সহস্রের মধ্যে একটি, কারণ, তিনি পূর্ণতায় উপনীত হইয়াছিলেন। মায়া হইতে উৎপন্ন বলিয়া তিনি চিত্তহারিণী; তাই মায়াদেবী নামে তিনি অভিহিত হইয়াছেন। দেব-বালার ন্যায় তিনি পরম সুন্দরী;

তাঁহার সুঠাম দেহ, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অনিন্দ্য সুন্দর...কি অনুরাগ, কি বিদ্বেষ—কিছুতেই তাঁর আসক্তি নাই; তিনি প্রিয়দর্শন, মধুরপ্রকৃতি, ন্যায়ানুসারিণী ও হিতবাদিনী, তিনি লজ্জাশীলা ও সতীসাধ্বী, তিনি ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন। তিনি গর্ব্বশূন্য, কার্কশ্যরহিত, চাপল্যহীন; তাঁহার কাপট্য কিম্বা ছলনা নাই। তিনি ইচ্ছাসুখে ত্যাগ স্বীকার করেন, তিনি সকলের হিতকামনা করেন। তিনি কর্ম্মের মাহাত্ম্য বোঝেন, তিনি কখন মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করেন না, তিনি সর্ব্বদাই সত্য পথে বিচরণ করেন, এবং তাঁহার মন সুসংযত। সমস্ত পৃথিবীতে পরিখ্যাত রমণীদের মধ্যে যে সকল দোষরাশি পরিলক্ষিত হয়, সে সব দোষ তাঁহাতে নাই···ধর্ম্মের নিয়মানুসারে, তপস্বিনীর ন্যায় তিনি কঠোর ব্রতাচরণে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিতা। রাজারা অনুমতি পাইয়াছেন, ৩২ মাস তিনি কামপ্রবৃত্তির অনুবর্ত্তিনী হইবেন না। তিনি দাঁড়াইয়া থাকুন, বসিয়া থাকুন, শুইয়া থাকুন,—যেখানেই থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন, শুভ কর্ম্মের জ্যোতিতে তাঁহার সমস্ত জীবন উদ্‌ভাসিত হইতেছে। কি দেব, কি দানব, কি মানব, কেহ তাঁহার প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিতে পারে না—সকলেই তাঁহাকে জননী রূপে দুহিতা রূপে দর্শন করে। মায়াদেবীর সুকৃতির প্রভাবে, বৃহৎ রাজপরিবারের নিয়ত উন্নতি হইতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী রাজার রাজ্য আক্রমণ করেন না বলিয়া এই নৃপতির খ্যাতি প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে। যেমন মায়া উপযুক্ত পাত্র, তেমনি সেই পরমারাধ্য পুরুষও অপূর্ব্ব মহিমায় দীপ্তি পাইতেছেন। এইরূপে দেখা যায়, পুত্র ও তাঁহার মাতা মায়াদেবী—উভয়ই সর্ব্বপ্রকার উৎকৃষ্ট গুণে ভূষিত।" (৩০)

সমস্ত প্রখ্যাত মহাপুরুষদিগের ন্যায়, ভগবান বুদ্ধেরও জন্ম শুভসূচক নিমিত্ত সমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল; একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজা শুদ্ধোদনের নিকট ভবিষ্যদ্‌বাণী করে—তাঁহার যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, সে হয় একজন বড় রাজা, নয় একজন প্রখ্যাত মুনি হইবে। এইরূপ ভবিষ্যদ্‌বাণীতে রাজা ভীত হইয়া, পুত্র জন্মিবা মাত্র তাহাকে তিনটি বৃহৎ প্রাসাদের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন, তাহার বাহিরে সে যাইতে পাইত না। কেবল যুবকবৃন্দ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপসী ললনারা তাহার নিকট যাইতে পারিত, এবং দরিদ্র, আতুর জরাগ্রস্ত লোকদিগের প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ ছিল। শুদ্ধোদন ভাবিয়াছিলেন এইরূপ উপায়ে মানবদুঃখের দৃশ্য সমূহ পুত্রের দৃষ্টিপথে কখনই পড়িবে না। ১৬ বৎসর বয়সে, পুত্রের বিবাহ দিয়া, রাজা তাঁহাকে রাজোচিত সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য ও ভোগবিলাসের দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিলেন। ক্ষণেকের জন্য তাঁহার মনে হইয়াছিল, সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিল তাহাই ফলিবে—তাঁহার পুত্র চক্রবর্ত্তী রাজা হইবে। বিজ্ঞান শিল্পকলা ব্যায়াম প্রভৃতি ক্ষত্রোচিত সমস্ত শিক্ষিতব্য বিষয়ই তাঁহাকে উত্তমরূপে শেখান হইল। এবং জনশ্রুতি এইরূপ, সেই সকল বিষয়ে যুবা সিদ্ধার্থ বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

কিন্তু বিধাতা এই রাজপুত্রের জন্য আর একটি মহত্তর জীবন নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন—পৃথিবীতে যতগুলি বৃহৎ ধর্ম্মমত আছে তাহারই একটির তিনি নেতা হইবেন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। শাক্যরাজা সিদ্ধার্থের লক্ষ লক্ষ প্রজা থাকা সত্ত্বেও তাঁহার নাম বিস্মৃতিসাগরে নিমগ্ন হইল; পক্ষান্তরে, সেই সিদ্ধার্থ জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রভাবে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া ৪০ কোটিরও অধিক লোকের নিকট এক্ষণে পূজিত হইতেছেন।

তিনি সুদর্শন ও প্রিয়বাদী ছিলেন; বিশিষ্ট লোকের সমস্ত লক্ষণই তাঁহাতে ছিল। তাঁহার জননীর ন্যায়, তিনিও ৩২টি মহাপুরুষের লক্ষণে এবং ২৪টি গৌণ গুণে বিভূষিত ছিলেন। ললিতবিস্তরে এইরূপ কতকগুলি গুণের বর্ণনা আছে:—"যুবাপুরুষ সিদ্ধার্থের চূড়াদেশ তুঙ্গ ছিল। তাঁহার ললাট বিশাল ও সমান; নেত্র ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; ৪০টি দন্ত সমান, ঘনসন্নিবিষ্ট ও শুভ্র; চর্ম্ম সূক্ষ্ম ও স্বর্ণাভ। দেহের বহিরংশ সিংহের ন্যায়। গঠন ন্যগ্রোধ বৃক্ষের ন্যায়; তাঁহার জঙ্ঘা এন-হরিণের ন্যায়; তাহার হস্ত পদ অতীব শোভন ও সুকুমার। তাঁহার মস্তক বৃহৎ ও পরিপুষ্ট, তাঁহার কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও কুঞ্চিত। তিনি সম্পূর্ণরূপে জিতেন্দ্রিয় ছিলেন।" (৩১)

একটি আখ্যায়িকা হইতে জানা যায়, কিরূপে তাঁহার জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিলেন। একদিন যখন তিনি তাঁহার প্রাসাদের উদ্যানে বিচরণ করিতেছিলেন সেই সময়ে

একটি দুর্ব্বল অশক্ত বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলেন। বিস্মিত হইয়া, এই অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত ব্যক্তি সম্বন্ধে তিনি তাঁহার পরিচারককে জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচারক বলিল, সকল মনুষ্যই ঐ বৃদ্ধের মত হইবে এবং তিনিও একদিন এইরূপ হইবেন। এই কথা শুনিয়া বিষণ্ণভাবে তিনি তাঁর প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। আর একদিন, ক্ষতাচ্ছন্ন একজন আতুরকে দেখিতে পাইলেন; পরিচারককে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, সকল মনুষ্যই রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। তৃতীয় দিনে একটা গলিত শব দেখিতে পাইলেন; এইবার তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন, কেন না, তিনি জানিতে পারিলেন, মৃত্যু হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই। পরিশেষে তিনি মুণ্ডিত-মস্তক, কষায়বস্ত্র-পরিহিত একজন ধর্ম্মব্রত বৃদ্ধ ভিক্ষুকে দেখিতে পাইলেন। এইবার তিনি শান্তি ও মোক্ষের নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়া একেবারে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন; কেন না তিনি জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা ও নশ্বরতা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন ও বুঝিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি দুঃখ-শোক-জরা-মৃত্যু ও অবশ্যম্ভাবী পুনর্জ্জন্মের কারণ এবং ঐ সমস্ত নিবারণের উপায়চিন্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। আরও ভাবিলেন, ইহাতে সুসিদ্ধ হইতে হইলে, পিতৃগৃহে, স্বকীয় প্রাসাদ, স্বকীয় পরিবার—এমন কি, যাহা কিছু তাঁহার ধ্যানের ব্যাঘাত করিতে পারে, সমস্তই পরিত্যাগ করিতে হইবে।

এই সময়ে তিনি শুনিলেন, তাঁহার একটি পুত্র জন্মিয়াছে; ইহাতে যে সংসার হইতে পলাইতে উদ্যত হইয়াছেন, সেই সংসারবন্ধনেই আবার বদ্ধ হইতে হইবে বিবেচনা করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমার পুত্র রাহুল জন্মগ্রহণ করিয়াছে। উহা আমাকে সংসারে বদ্ধ করিবার জন্য আর একটি শৃঙ্খল।"

তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন: "ধন্য সেই মাতার শান্তি, ধন্য সেই পিতার শান্তি,—যাঁহারা এইরূপ পুত্র লাভ করিয়াছেন; ধন্য সেই পত্নীর শান্তি—যে এরূপ স্বামী লাভ করিয়াছে!" তখন সিদ্ধার্থ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন:—"হাঁ, ঠিক্ কথা; কিন্তু যে শান্তিতে হৃদয়ে সুখ আনয়ন করে, সে শান্তি কোথা হইতে আইসে?" পরিশেষে, একদিন রাত্রে, তিনি তাঁহার সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিলেন; যে ঘরে তাঁহার স্ত্রী নিদ্রা যাইতেছিলেন সেই ঘরে গিয়া তাঁহার প্রতি ও তাঁহার পুত্রের প্রতি অন্তিম বিদায়-সম্ভাষণ করিয়া এবং শুধু একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া নিজ প্রাসাদ চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিলেন। (অনেক বৎসর পরে, ভিক্ষুর বেশে, কমণ্ডলু হস্তে, আর একবার নিজ প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন)। রাত্রে একাকী পলায়ন করিয়া, শান্তি লাভের উদ্দেশে, এবং আপনার ও বিশ্বমানবের মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য একটি অরণ্যের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অমনি প্রলোভক মার ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল, এবং দৌর্ব্বল্য, কাম, পরিতাপ প্রভৃতি তাঁহার কোন রন্ধ্র অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। মার ভাবিল, এইরূপ কোন রন্ধ্র পাইলেই,—যে তাহার হস্ত হইতে সমস্ত মানব-আত্মাকে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে, সেই শত্রুকে আবার স্বকীয় বশে আনিতে সমর্থ হইবে।

অনোমা নদীর তীরে উপনীত হইয়া, তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ সুন্দর কেশগুচ্ছ অসির দ্বারা ছেদন করিলেন এবং তাঁহার অস্ত্র শস্ত্র ও অশ্ব ভৃত্যের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহাকে কপিলবস্তুতে ফিরিয়া পাঠাইলেন। এখন হইতে, জগতের সহিত তাঁহার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইল।

সেই যুগের প্রচলিত প্রথানুসারে, সিদ্ধার্থ প্রথমেই কতকগুলি কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণের শিক্ষাধীনে তাপসব্রত অবলম্বন করিলেন। ৭ বৎসর কাল ধরিয়া তিনি কঠোর তপশ্চরণ, শরীরনিগ্রহ, দীর্ঘ উপবাস, গভীর ধ্যান ও সূক্ষ্ম তত্ত্বাদির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু, তাহাতে তাঁহার মনের শান্তি হইল না, এবং তিনি যে বীজমন্ত্রের অন্বেষণ করিতেছিলেন সেরূপ মোক্ষপ্রদ কোন বীজমন্ত্রও লাভ করিতে পারিলেন না।

তাই তিনি তাঁহার দীক্ষাগুরুদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন; এবং ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে, নৈরঞ্জনা নদীর নিকটবর্ত্তী, উরুবেল্লা নামক এক মহারণ্যে উপনীত হইলেন। কঠোর হইতে কঠোরতর তপশ্চরণ করিয়া সেই অরণ্যে দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিলেন। অলৌকিক পরম জ্ঞান লাভে যাহাতে সুসিদ্ধ হইতে পারেন এই অভিপ্রায়ে, অপরিহার্য্য দৈহিক প্রয়োজনসমূহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত, বিবিধ কঠোর কর্ম্ম সাধন

করিতে লাগিলেনঃ—জিহ্বাকে তালুদেশে সংসক্ত করিয়া, আহারে বিরত হইয়া, নিঃশ্বাস রোধ করিয়া, একাগ্র চিত্ত হইয়া, সমস্ত মনকে এক লক্ষ্যের প্রতি স্থির রাখিলেন;—সেই লক্ষ্য—বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি। পার্শ্ববর্ত্তী আশ্রমের পাঁচ জন তাপস, তাঁহার কঠোর তপশ্চরণে বিস্মিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। কিন্তু তথাপি তিনি পরম জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না; শরীরকে যতই নিগ্রহ করিতে লাগিলেন, তাঁহার চরম লক্ষ্য হইতে ততই দূরে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন তিনি প্রকাশ্যরূপে তাপস-জীবন পরিত্যাগ করিলেন; তিনি বুঝিলেন, কঠোর তপশ্চরণ নিষ্ফল, উহা শরীরকে অবসন্ন করিয়া ফেলে, এবং উহার কুফল মন পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছে। শিষ্যদিগের নিন্দার ভাজন হইয়াও তিনি, শরীরকে সবল ও সতেজ করিবার জন্য আবার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন; তিনি এখন একাকী রহিলেন। এইবার তিনি উত্তম মার্গ প্রাপ্ত হইলেন; ইন্দ্রিয় সুখ হইতে বিরত হইয়া, বোধি-বৃক্ষের তলে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। এইবার তাঁহার অন্তরে শেষ-যুদ্ধ—ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহাদিগকে তিনি জয় করিয়াছেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেই সব পার্থিব প্রবৃত্তি ও কামনা তাঁহার অন্তরে আবার জাগরূক হওয়ায়, তিনি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহা আমাদের সকল দুঃখের মূল, সেই সব মায়ামোহের সহিত, জীবন-তৃষার সহিত, ভোগ-তৃষার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এখনও পর্য্যন্ত, সমস্ত পার্থিব সুখ তাঁহার মানস-চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছিলঃ—মান, যশ, প্রভুত্ব, আসক্তি, পারিবারিক সুখ।

পরিশেষে, সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ আর এক সংগ্রামে তিনি প্রবৃত্ত হইলেন; সংশয় আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করিতেছিল। কিন্তু স্বকীয় সংকল্পে অটল থাকিয়া গৌতম সমস্ত সঙ্কটেই জয়লাভ করিলেন। তদনন্তর, একদিন রাত্রিকালে পরম জ্ঞান তাঁহার নিকট উপনীত হইল; সেই জ্ঞানের বৈদ্যুতিক আলোকচ্ছটায় তাঁহার মন আচ্ছন্ন হইল। তাঁহার আত্মা, পরম্পরাক্রমে বিশুদ্ধ হইতে বিশুদ্ধতর অবস্থায় উপনীত হইল; এবং অবশেষে পরম সত্য স্বকীয় পূর্ণ মহিমায় তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইল।

বৌদ্ধশাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছেঃ—তিনি দিব্যচক্ষু লাভ করিলেন। জীব পরম্পরায় উৎপত্তির কারণ, দুঃখের মূল, দুঃখমোচনের উপায়, তিনি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন। এখন হইতে তাঁহার জীবনের গতি ফিরিল; তাঁহার জীবন একটা সুনির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। তিনি ধ্যান হইতে উঠিয়াই দেখিলেন তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি পরম জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তখনই তিনি,—স্বয়ং যে সুখের অংশভাগী হইয়াছেন, তাহা বিশ্বমানবকে দিবার জন্য বহির্গত হইলেন। ইহাই তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের আরম্ভ কাল। জনশ্রুতি অনুসারে, সিদ্ধার্থের বয়স তখন ৩৬ বৎসর। তিনি বিভিন্ন নাম নির্ব্বিশেষে গ্রহণ করিতেন; কখন কৌলিক নাম গৌতম, কখন শাক্যমুনি, কখন ভগবান্, কখন তথাগত, কখন সত্যধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সমুদ্ভূত "পূর্ব্ববর্ত্তী মুনিদিগের ন্যায় একজন মুনি," কখন বুদ্ধ—এইরূপ বিভিন্ন নামে পরিচিত হইতেন।

যে ধর্ম্মপ্রচার ৪৫ বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল, সেই ধর্ম্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে, দীর্ঘ ধ্যানের ফলে বুদ্ধদেব যে বিজয়ানন্দ লাভ করিয়াছিলেন সেই আনন্দ কিছুকাল উপভোগ করিতে অভিলাষী হইলেন; তদনন্তর, "মহাভগ্গের জনশ্রুতি অনুসারে, তিনি ২৮ দিন এবং অন্যান্য জনশ্রুতি অনুসারে ৪৯ দিন উপবাস-ব্রত পালন করেন। ললিতবিস্তরে আছে,—প্রথম ৭ দিনের পর, পাপাত্মা মার শাক্যমুনিকে মোহমুগ্ধ করিবার জন্য শেষ চেষ্টা ও প্রাণপণ চেষ্টা করে। ইহার পূর্ব্বে যখন তিনি কঠোর তপস্যায় মগ্ন হইয়া পরম সত্যের অন্বেষণ করিতেছিলেন, তখন মার তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারে নাই।

গৌতম বলিয়া উঠিলেনঃ "মার তোকে আমি জয় করিব! তোর প্রথম সৈন্য কাম সমূহ; দ্বিতীয় সৈন্য অসন্তোষ; তৃতীয় সৈন্য ক্ষুধা ও তৃষ্ণা; চতুর্থ সৈন্য লোভ; পঞ্চম সৈন্য—আলস্য ও জড়তা; ষষ্ঠ সৈন্য—ভয়; সপ্তম সৈন্য সংশয়; অষ্টম সৈন্য ক্রোধ, কাপট্য, যশস্পৃহা, প্রশংসা, মানসম্ভ্রম, মিথ্যার্জ্জিত খ্যাতি; আত্মশ্লাঘা, পরনিন্দা; এই মানব সৈন্য তাহাদের

সহিত মৈত্রীবন্ধনে বদ্ধ, যাহারা কৃষ্ণবর্ণ, যাহারা দহন করে। শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উভয়ই উহাদের মধ্যে নিমজ্জিত। তোর এই সমস্ত সৈন্য যাহারা ত্রিলোক জয় করিয়াছে, তাহাদিগকে আমি জ্ঞানের দ্বারা চূর্ণ করিব, যেমন অদগ্ধ মৃৎপাত্র জলের দ্বারা চূর্ণ হয়।" (৩২)

বিবিধ প্রকারে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া, তাঁহার গর্ব্বকে উত্তেজিত করিয়া, সংশয়ের দ্বারা তাঁহার চিত্তকে বিচলিত করিবার চেষ্টা করিয়া, তদনন্তর মার, শেষ প্রলোভন পরম রূপসী রমণীর আকারে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। বিজনে দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া তাঁহার দেহের তেজ নিঃশেষ হইয়াছে—এই সময়ে সেই সকল রমণী তাহাদের ছলাকলার দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিল। মার, স্বকীয় দুহিতাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল: তোমরা বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া তোমাদের নারীমায়া প্রদর্শন কর এবং তিনি কামের বশবর্ত্তী কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখ। তখন মার-কন্যাগণ, বোধিসত্ত্বের কাম উত্তেজিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত গাথা বলিল: "বসন্ত- কাল সমাগত, এই সুন্দর ঋতুতে তরুগণ পুষ্পিত হইয়াছে, এস বঁধু আমরা সুখ সম্ভোগ করি। তোমার সুন্দর দেহ, অতীব কমনীয়, রাজচক্রবর্ত্তীর চিহ্ন-সমূহে সমলঙ্কৃত। আমরা সুজাত, দেবমানবের সুখ বিধানার্থই আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ঐ উদ্দেশ্যেই আমরা প্রাণধারণ করিতেছি। শীঘ্র উত্থান কর, উত্থান করিয়া সুন্দর যৌবন উপভোগ কর; পরম জ্ঞানলাভ করা বড়ই কঠিন; সে চিন্তা পরিত্যাগ কর। সাজসজ্জায় সুসজ্জিতা, অলঙ্কারে বিভূষিতা এই দেখ দেব-কন্যারা তোমার উদ্দেশে আসিয়াছেন। কীটদষ্ট কাষ্ঠখণ্ড যতই শুষ্কশীর্ণ হউক না কেন, কোন্ মনুষ্য এইরূপ সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ না হইবে? উহাদের সুচিক্কণ কেশরাশি সরস সুগন্ধে পরিষিক্ত; উহাদের কিরীট ও কর্ণবলয় বিভূষিত মুখমণ্ডল প্রস্ফুটিত পুষ্প সদৃশ, উহাদের সুন্দর ললাট, উহাদের মুখ সুরঞ্জিত, উহাদের নেত্র প্রস্ফুটিত পদ্মদলের ন্যায় বিশাল, উহাদের আনন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, উহাদের ওষ্ঠ পক্ব বিম্বের ন্যায়, উহাদের সুন্দর দন্তরাজি শঙ্খের ন্যায়, যূথিকার ন্যায়, [illegible] ন্যায় শুভ্র। উহাদের দিকে চাহিয়া দেখ, উহারা কেমন প্রিয়দর্শন—উহারা কেবল সুখেরই ধ্যান করিতেছে। দেখ প্রভু, উহাদের পয়োধর কেমন কঠিন, কেমন তুঙ্গ, কেমন পীন; ঐ দেখ উহাদের সুন্দর ত্রিবলী রেখা, উহাদের সুগঠিত বিশাল নিতম্ব, উহারা বাস্তবিকই প্রিয়দর্শন। উহারা মরাল-গতি; উহারা কেমন ধীর পদক্ষেপে চলিতেছে; উহারা কেমন লালিত্যসহকারে কথা কহে; উহাদের প্রেমের ভাষা একেবারে হৃদয়ে পৌঁছে; বেশভূষায় বিভূষিতা এই সকল রূপসী ললনা, বিলাস-লীলায় সুপণ্ডিত। গীত বাদ্য নৃত্যে ইহারা সুনিপুণ, এই সকল গুণবতী রূপসীরা সুখের উদ্দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই সকল প্রেমবিক্ষুব্ধ-ললনাদিগকে যদি তুমি প্রত্যাখ্যান কর, তাহা হইলে এই পৃথিবীতে আসাই তোমার বিষম বিড়ম্বনা!"

তখন বোধিসত্ত্ব সস্মিতমুখে এইরূপ উত্তর করিলেন: "হায়! বাসনাই দুঃখের সদৃশ, এবং এই দুঃখ-মূল বাসনাই ধ্যান, অলৌকিক শক্তি এবং জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের তপস্যাকে বিনষ্ট করে; নারীর কামনায় তৃপ্তি নাই,—এইরূপ ঋষিরা বলিয়াছেন। আমি জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞদিগের তৃপ্তি উৎপাদন করিব। লবণাম্বু পানে যেমন তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ যাহারা বাসনাকে পোষণ করে তাহাদেরও তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না। যাহারা বাসনায় আসক্ত হয় তাহাদের দ্বারা, কি আপনার, কি পরের—কাহারও হিতসাধিত হয় না। কিন্তু আমি আপনার ও পরের হিতসাধনে নিরতিশয় ইচ্ছুক হইয়াছি। তোমার শরীর ফেনের ন্যায়, জলবুদ্বুদের ন্যায়; উহা মায়ার দ্বারা রঞ্জিত,—উহা যদৃচ্ছাক্রমে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া থাকে। যেমন স্বপ্নলব্ধ সুখ চিরস্থায়ী নহে, সেইরূপ জ্ঞানহীন অবিবেকী জনের চিত্ত সর্ব্বদাই বিপথে গমন করে। চক্ষু সংহত-রক্ত গোলাকার স্ফোটকের ন্যায়; উদর, ঘৃণিত মূত্রপুরীষের আধার, কর্ম্মজ স্বাভাবিক কলুষ-রাশি হইতে উৎপন্ন,—দুঃখের যন্ত্র বিশেষ। অজ্ঞান ব্যক্তিদেরই মন বিচলিত হয়, জ্ঞানীদের তাহা কদাপি হয় না; অজ্ঞান ব্যক্তিরাই শরীরকে সুন্দর বলিয়া মিথ্যা কল্পনা করে।...কটিদেশ হইতে অপ্রিয় দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয়; জানু,

জন্মা, ও পদ্ম যন্ত্রের ন্যায় একত্র আবদ্ধ; তোমাদের বাস্তবিক যাহা আছে তাহা মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। মিথ্যা কার্য্যকারণ হইতে তোমরা উৎপন্ন। কামের কোন বাস্তবিক গুণ নাই,—উহার গুণ সকল মিথ্যা—প্রজ্ঞের বিজ্ঞান-পথের বিরোধী। উহা বিষ-পত্রের ন্যায়—ভীষণ অজাগর সর্পের ন্যায়। মূঢ়েরা সুখ জ্ঞান করিয়া উহাতে মত্ত হয়। কাম-বশীভূত স্ত্রী ও পুরুষ, সৎমার্গ হইতে—ধ্যানের মার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া বিজ্ঞান হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করে, প্রবৃত্তির দ্বারা বিক্ষুব্ধ হইয়া, তাহারা ধর্ম্মজনিত সুখকে পরিত্যাগ করে, পরিশেষে কামজনিত সুখও তাহারা সম্ভোগ করিতে পারে না। আমি কামেতেও আসক্ত নই—পাপেতেও আসক্ত নই; আমি প্রিয়তে আসক্ত নই—আমি প্রিয় অপ্রিয় কিছুতেই আসক্ত নই। আকাশ-বায়ুর ন্যায় আমার মন সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়াছে।"

মারের দুহিতারা তবুও এইরূপ বলিতে লাগিল:—"যতদিন না যৌবন তোমার চলিয়া যায়,—যতদিন তোমার রূপ যৌবন থাকে এবং তোমার সুহৃৎ আমরা যতদিন থাকিব, ততদিন তুমি হাসিমুখে কামসুখ উপভোগ কর।" কিন্তু বোধিসত্ত্ব কিছুতেই বিচলিত হইলেন না:—"তৃণাগ্রলম্বিত শিশির বিন্দুর ন্যায়—শরৎকালীন মেঘের ন্যায় বাসনা সকল ক্ষণস্থায়ী। নাগকন্যাদের রোষের ন্যায় উহা ভীতিজনক।" মারের দুহিতারা আবার বলিল;—"উহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তুমি যেমন চন্দ্রানন, উহারা তেমনি পদ্মাননা, উহাদের কণ্ঠস্বর মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী; উহাদের দন্তপংক্তি তুষারের ন্যায়—রজতের ন্যায় শুভ্র; প্রধান দেবতাদিগের দ্বারা চিরবাঞ্ছিত, যাহাদের সমতুল্য ললনা দেবলোকেও দুর্লভ, তাহাদিগকে তুমি মর্ত্ত্যলোকেই পাইতে পার।" বোধিসত্ত্ব উত্তর করিলেন:—"আমি দেখিতেছি, এই শরীর মলিন, অপবিত্র, কীটপূর্ণ, অগ্নিদাহ্য, ভঙ্গুর, ও দুঃখের দ্বারা সমাচ্ছন্ন; আমি জ্ঞানিজনের পূজিত সেই অক্ষয় পদলাভ করিব, যাহা সমস্ত চরাচরের সুখোৎপাদক।" (৩৩)

উহাদের সমস্ত মায়াজালই নিষ্ফল হইল! বোধিদ্রুমের তলদেশে ধ্যান-মগ্ন নিশ্চল বুদ্ধদেব একাগ্রচিত্ত হইয়া, সমস্ত পার্থিব চিন্তা, পা কামনা দমন করিয়া, জয়ী হইয়াছিলেন; এখন তাঁহার মুখে একটি নিশ্চল প্রশান্ত-স্মিত হাস্য প্রকটিত হইল। পাপাত্মা মার, বুদ্ধদেবকে মায়াজালে বদ্ধ করিতে পারিল না বটে, কিন্তু যাহাতে তিনি ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বিশ্বমানবকে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে না পারেন, এই উদ্দেশ্যে তাঁহার নির্ব্বাণসাধনের বিঘ্নোৎপাদনে সচেষ্ট হইল।

মার তাঁহাকে যেরূপ ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, ললিত-বিস্তরে তাহার এইরূপ বর্ণনা আছে:—বহুদিন পরে, বুদ্ধদেব স্বকীয় শিষ্য আনন্দের নিকট তাঁহার প্রলোভনের বৃত্তান্ত এইরূপ ব্যক্ত করেন; "এই সময়ে পাপাত্মা মার আমার নিকটবর্ত্তী হইল। তারপর দেখ আনন্দ, আমার পাশে দাঁড়াইয়া সে আমাকে এইরূপ বলিল:—'হে মহাত্মন্ এক্ষণে আপনি নির্ব্বাণ লাভ করুন, হে সিদ্ধপুরুষ! আপনি নির্ব্বাণে প্রবেশ করুন। মহাত্মন্, এক্ষণে আপনার নির্ব্বাণের সময় হইয়াছে।' দেখ আনন্দ, মার এই কথা বলায় আমি এইরূপ উত্তর করিলাম! 'দেখ মার, যতদিন না আমি ভিক্ষুদের মধ্য হইতে এমন কতকগুলি শিষ্য পাই যাহারা জ্ঞানী ও কৃতবিদ্য, সর্ব্বসিদ্ধান্তে পারদর্শী, বিধিব্যবস্থায় পারদর্শী, যাহারা এই ধর্ম্মপথ অনুসরণ করিয়া,—গুরুর মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছে তাহা দূরদেশে প্রচার করিবে, প্রকাশ করিবে, ব্যাখ্যা করিবে, কোন প্রতিবাদ উত্থাপিত হইলে, বীজসূত্রসমূহের দ্বারা তাহাকে খণ্ডন করিবে—চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবে, দেখ পাপাত্মন্! ততদিন আমি নির্ব্বাণে কখনই প্রবেশ করিব না। যতদিন না আমার ধর্ম্ম বিশ্বমানবের মধ্যে প্রচারিত হইবে ততদিন আমি নির্ব্বাণে কখনই প্রবেশ করিব না।" (৩৪)

মারের সহিত এই শেষ যুদ্ধে জয়ী হইলেও, বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্ম, জগতে প্রচার করিবেন কি না সে বিষয়ে একটু ইতস্তত করিতেছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মমতে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া যে তিনি ইতস্তত করিতেছিলেন তাহা নহে,—কেন না পরম সত্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল—তাঁহার শুধু এই আশঙ্কা হইতেছিল পাছে লোকে তাঁহার ধর্ম্ম বুঝিতে না পারে। তিনি ভাবিলেন, বিশ্বমানব—যাহারা সংসার-আবর্ত্তে বিঘূর্ণিত—

যাহারা উহাতেই সুখ পায়, তাহাদের পক্ষে কার্য্যকারণতত্বের মর্ম্ম গ্রহণ করা কঠিন; তাহাদিগকে আরও বোঝান কঠিন—সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর লয়, সমস্ত পার্থিব বস্তুর বিয়োগ, বাসনার বিলোপ, পরিসমাপ্তি, নির্ব্বাণ। এই নৈরাশ্যের অবস্থায় তিনি বলিয়া উঠিলেন:—"কত কষ্ট স্বীকার করিয়া, কত যুদ্ধ করিয়া আমি যাহা আর্জ্জন করিয়াছি তাহা জগতের নিকট প্রকাশ করিয়া কি ফল? রাগ দ্বেষে যাহার অন্তর পূর্ণ, তাহার নিকট সত্য চিরকালই প্রচ্ছন্ন থাকে। যাহা বহু কষ্টে অর্জ্জিত হয় সেই গভীর রহস্য স্থূলবুদ্ধির নিকট প্রকাশ পায় না। যাহার তমসাচ্ছন্ন মন পার্থিব বাসনায় সমাচ্ছন্ন, সে কখনই উহা উপলব্ধি করিতে পারে না।" কিন্তু ব্রহ্মা তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া, এই সকল আশঙ্কা অতিক্রম করিতে তাঁহাকে উপদেশ দিলেন; তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া এইরূপ বলিলেন:—"হে মুক্তিদাতা! জন্মজরামৃত্যু ভোগ করিতেছে যে বিশ্বমানব তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। হে প্রভু! তোমার কথা উচ্চৈঃস্বরে প্রচার কর, সে কথার মর্ম্ম অনেকেই বুঝিতে পারিবে।"

এক্ষণে তাঁহার সম্মুখে মহৎ কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত হইল, আর তাঁহার ধর্ম্ম জগতের নিকট প্রচার না করিয়া থাকিতে পারিলেন না:—"নিত্যধামের দ্বার যেন সকলের নিকটেই উদ্‌ঘাটিত হয়! যাহার কর্ণ আছে সে যেন এই কথা শোনে ও বিশ্বাস করে। আমি নিজে যে কষ্ট পাইয়াছি তাহা ভাবিতেছিলাম, এবং সেইজন্য, হে ব্রহ্ম, এই মহাবাক্য লোকের নিকট প্রকাশ করি নাই।" (৩৫)

এইখানেই বারাণসীর ধর্ম্মোপদেশ, মুক্তিবিষয়ক ধর্ম্মোপদেশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যে সকল তাপস পূর্ব্বে তাঁহার শিষ্য ছিল, কিন্তু পরে যাহারা তাঁহাকে স্বধর্ম্মত্যাগী মনে করিয়া পরিত্যাগ করে, তাহাদের সহিত বুদ্ধদেবের আবার সাক্ষাৎ হইল। তাহাদিগকে আবার তাঁহার নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু তাহা সহজ হইল না। তাহারা বুদ্ধদেবকে দেখিবা মাত্র মনে মনে চিন্তা করিল: "এই যে গৌতম এইদিকে আস্‌ছে, ওকে সম্মান দেওয়া হবে না। যদি ইচ্ছা করে ত এইখানে বসিতে পারে।" কিন্তু বুদ্ধের ভাব দেখিয়া তাহারা স্বকীয় সংকল্প রক্ষা করিতে পারিল না, তখনই তাঁহার নিকটে গমন করিল। বুদ্ধ তাহাদিগকে বলিলেন; "আমার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ কর, ইহলোকেই তোমরা সত্যকে প্রাপ্ত হইবে।" কিন্তু ঐ তাপসেরা উপহাস করিয়া তাঁহাকে বলিল:—"কঠোর তপশ্চরণ করিয়া যাহা তুমি লাভ করিতে পার নাই, প্রাচুর্য্যের মধ্যে থাকিয়া কিরূপে সেই পরম সত্য লাভ করিবে?"—কিন্তু বুদ্ধ, এইরূপ আপত্তি হইবে বলিয়া পূর্ব্বেই ভাবিয়াছিলেন। অনেক দিন হইতেই তিনি বুঝিয়াছিলেন কঠোর তপশ্চরণ প্রকৃত পন্থা নহে। উপবাসাদিতে পার্থিব চিন্তা-সমূহ মন হইতে দূরীভূত হয় না, পরন্তু পরম জ্ঞানে উপনীত হইবার জন্য যে আত্মচেষ্টা আবশ্যক সেই আত্মচেষ্টার দ্বারাই পার্থিব চিন্তা সকল দূরীভূত হয়। ভোগবিলাসের ন্যায় শরীরশোষণও মুক্তির পথ হইতে দূরে অবস্থিত। চিত্তবৃত্তি সমূহের সামঞ্জস্য ও আভ্যন্তরিক সমন্বয়ই আমাদিগকে সত্যেতে উপনীত করে। বুদ্ধদেব জীবনকে বীণার সহিত তুলনা করিয়াছেন। বীণা হইতে ঠিক্ সুর বাহির করিতে হইলে, বীণার তারগুলিকে বেশী টানাও উচিত নহে—বেশী শিথিল করাও উচিত নহে। তাই, সেই তাপসদিগের আপত্তির উত্তরে তিনি এইরূপ বলিলেন:—"যিনি আধ্যাত্মিক জীবনের প্রয়াসী, তিনি এই দুই সীমান্ত হইতে দূরে থাকিবেন। সেই সীমান্ত দুইটি কি? একটি ভোগবিলাসের জীবন এবং আর একটি কঠোর আত্মনিগ্রহের জীবন; উভয়ই হেয় ও অসার। হে ভিক্ষুগণ! তথাগত এই উভয় সীমান্ত হইতে আপনাদিগকে দূরে রাখেন; তিনি এমন একটি পথ আবিষ্কার করেন যাহা উভয়ের মধ্যবর্ত্তী; ঐ পথই চক্ষু ও মনকে উদ্‌ঘাটিত করে, ঐ পথই সাধককে শান্তিতে, জ্ঞানেতে, বুদ্ধত্বে, নির্ব্বাণে উপনীত করে। হে ভিক্ষুগণ! সেই মধ্যম পথটি কি? সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি; এই আটটিকে আর্য্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ বা মধ্যম পথ বলে। হে ভিক্ষুগণ! দুঃখ সম্বন্ধে ইহাই পবিত্র সত্য:—জন্ম দুঃখ, জরাদুঃখ, মৃত্যুদুঃখ, অপ্রিয়-সংযোগ ও প্রিয়-বিয়োগ দুঃখ, কাম্যবস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ, সংক্ষেপে বলিতে গেলে, পার্থিব বিষয়ে এই পঞ্চধা আসক্তিই দুঃখ। হে ভিক্ষুগণ! দুঃখের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইহাই পবিত্র সত্য: তৃষ্ণাই পুনর্জন্মের

মূলীভূত হেতু—সুখের তৃষ্ণা, জীবনের তৃষ্ণা, শক্তিসামর্থ্যের তৃষ্ণা। বাসনার ধ্বংস হইলেই এই তৃষ্ণার ধ্বংস হয়। বাসনাকে একেবারে দূরীভূত করিতে হইবে, বাসনা হইতে একেবারে বিমুক্ত হইতে হইবে—মনের মধ্যে বাসনাকে তিলমাত্র স্থান দিবে না। হে ভিক্ষুগণ! ইহাই দুঃখ নিবৃত্তির প্রকৃত পন্থা।" (৩৬)

ইহাই ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের উপদেশ। পঞ্চতাপস বুদ্ধদেবের উপদেশে বশীভূত হইয়া, তাঁহার জয়কীর্ত্তন করিতে লাগিল এবং তাহারাই সর্ব্বপ্রথমে ভিক্ষুসম্প্রদায়ভুক্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করিল। "আইস ভ্রাতৃগণ, আমার ধর্ম্মমত উত্তমরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে; এখন হইতে তোমরা বিশুদ্ধতার অভিমুখে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তোমাদের সকল দুঃখ নিবৃত্তি হইবে।" কণ্ডাঞ্য, ভাষ্য, ভাপ্প, মহন্নাম ও অমার্জ্জি এই পাঁচ শিষ্য সমভিব্যাহারে বুদ্ধদেব বিনাযুদ্ধে পৃথিবী জয় করিবার জন্য বহির্গত হইলেন।

তদনন্তর, যশ নামক সম্ভ্রান্ত বংশের একজন যুবাপুরুষ বুদ্ধদেবের উপদেশে বিমুগ্ধ হইলেন। ইনি একজন ভোগ-বিলাসী, বারাণসী নগরে বিলাস-সুখে মগ্ন ছিলেন। বুদ্ধদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইনি ঐহিক সুখের অসারতা উপলব্ধি করিলেন, এবং পূর্ব্বে যেমন তাঁহার ভোগ-বিলাসে ঐকান্তিক আসক্তি ছিল, এখন আবার তেমনি আগ্রহের সহিত তিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন। ইনি বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুর পীতবসন ধারণ করিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিলেন কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই তাঁহার ব্যর্থ হইল। অবশেষে তিনিও বুদ্ধের ভক্ত হইয়া পড়িলেন। যশ এই নবধর্ম্মে সহসা দীক্ষিত হওয়ায় তাঁহার বন্ধুগণ বিস্ময়বিহ্বল হইয়া বলিয়া উঠিল:—"যে ধর্ম্মের প্রভাবে আমাদের বন্ধু বশীভূত হইয়াছে, না জানি সে ধর্ম্মটি কি।" তাহারাও বুদ্ধদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিল, এবং তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া তাহারাও নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। এইরূপে যখন বুদ্ধদেবের ৬০ জন শিষ্য হইল, তখন তিনি তাহাদিগকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে গমন করিয়া পৃথক্‌ভাবে মোক্ষধর্ম্ম প্রচার করিতে আদেশ করিলেন। "হে শিষ্যগণ! তোমরা জগতের দুঃখে অনুকম্পান্বিত হইয়া, বিশ্বমানবের হিতের জন্য, সুখের জন্য, মোক্ষের জন্য, এখনি যাত্রা কর। দুই জন এক পথে যাইও না! যে ধর্ম্ম আদিতে মহিমান্বিত, মধ্যে মহিমান্বিত, অন্তে মহিমান্বিত সেই ধর্ম্ম প্রচার কর—তাহার অক্ষরাংশ প্রচার কর—তাহার মর্ম্মভাব প্রচার কর। অনাড়ম্বর সরল জীবনের কথা—সম্যক্ ও নির্ম্মল জীবনের কথা—পবিত্র জীবনের কথা প্রচার কর। এমন লোক আছে যাহাদের চক্ষু পার্থিব ধূলিতে অন্ধীভূত হয় না, কিন্তু যদি তাহারা এই ধর্ম্মের উপদেশ শ্রবণ না করে, তাহা হইলে তাহারা কখনই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না; তাহারা এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে" (৩৭)। আর তিনি স্বয়ং উরুবেল্বা অরণ্যে ফিরিয়া যাইবেন। সেখানে সহস্র-সংখ্যক বাণপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ বাস করে, কাশ্যপ নামে তিন ভ্রাতা তাহাদের অধিনায়ক। এই ব্রাহ্মণেরা স্বকীয় জ্ঞানের জন্য, পুণ্যের জন্য ও তপস্যার জন্য গর্ব্বিত ছিল; তাহারা ঔদ্ধত্য-মিশ্র দাক্ষিণ্য সহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। কিন্তু যখন বুদ্ধদেব কতকগুলি অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিলেন, তখন সেই ব্রাহ্মণেরা তাঁহার উচ্চ পদমর্য্যাদা অবগত হইয়া শীত কালটা তাহাদের সহিত অতিবাহিত করিতে তাঁহাকে অনুনয় করিল; তিনি সম্মত হইলেন। কেবল, কাশ্যপদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে সম্মত হইল না; তখন বুদ্ধদেব, সেই ব্রাহ্মণের মন যে নীচ চিন্তায় বিক্ষুব্ধ হইতেছিল, তাহা তাহার নিকট প্রকাশ করিলেন: "দেখ কাশ্যপ তুমি সিদ্ধপুরুষ নও, তুমি এখনও সিদ্ধির পথে প্রবেশ কর নাই, তুমি এখনও সে পথের কিছুই জান না।" কাশ্যপ পরাভূত হইল, তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল: "হে প্রভু যাহাতে আমি প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা ব্রত গ্রহণ করিতে পারি, আমার প্রতি এরূপ অনুগ্রহ কর।"

কিন্তু এ পর্য্যন্ত বুদ্ধদেব বেশীর ভাগ, ব্রহ্মচারী ও ব্রাহ্মণদিগকেই নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি পথ চলিতে চলিতে মগধরাজ্যের রাজধানী রাজগৃহে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার আগমন সমাচার পাইয়া মগধরাজ বিম্বিসার মহাপ্রভুকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য অনুচরাদি সমভিব্যাহারে সবিভবে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধদেব ও কাশ্যপ পাশাপাশি উপবিষ্ট

ছিলেন, রাজা বুঝিতে পারিলেন না, উহাদের মধ্যে মহাপ্রভু কে; কিন্তু কাশ্যপ বুদ্ধদেবের পদতলে পড়িয়া বলিয়া উঠিল, "ইনিই মহাপ্রভু, আমি ইহাঁর শিষ্য।" বিম্বিসার বিস্ময়স্তম্ভিত হইয়া, বুদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিলেন এবং বৌদ্ধসমাজভুক্ত হইলেন। পরে এই বিম্বিসার বৌদ্ধধর্ম্মের একজন পরম সহায় বলিয়া পরিচিত হন। অভিজাতবর্গের অনেকেই রাজার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম আরও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

এই রাজগৃহে, বুদ্ধদেব দুইটি ব্রাহ্মণ যুবককে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করেন; তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে এই দুইজন কিছুকাল পরে প্রখ্যাত হইয়া উঠে। এই যুবকদ্বয়ের নাম,—সারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন। তখনকার দর্শন সম্প্রদায়ের যিনি অধিনায়ক—ইহাঁরা সেই সঞ্জয়ের শিষ্য ছিলেন। অশ্বজিৎ নামক বুদ্ধের এক শিষ্যের সহিত, ঘনিষ্ঠ সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ এই যুবকদ্বয়ের সাক্ষাৎ হইল। অশ্বজিৎ সেই সময় ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছিলেন এবং তখনকার প্রথানুসারে ধর্ম্মবিষয়কবাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন। শিষ্টাচারসঙ্গত পরস্পরের সহিত বন্ধুভাবে অভিবাদন বিনিময়ের পর সারীপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন:—"কাহার নামে তুমি সংসার ত্যাগ করিয়াছ, এবং তুমি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী?" অশ্বজিৎ উত্তর করিলেন:—"মহাশ্রমণ সেই তথাগতের নামে সংসার ত্যাগ করিয়াছি এবং তাঁহারই ধর্ম্ম আমি অবলম্বন করিয়াছি।"

—"আমাকে সেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দেও।"

—"আমি নিজেই শিক্ষানবীস্, আমি তোমাকে কি শিক্ষা দিব? আমি তার সারমর্ম্ম তোমার নিকট বল্‌তে পারি।"

—"অল্পই হোক্ বেশীই হউক তাহাতে কি যায় আইসে! আমি সেই ধর্ম্মের সারমর্ম্মই চাই, বচন চাইনে।" তখন অশ্বজিৎ উত্তরে এই বাক্যটি বলিলেন, যাহা বৌদ্ধধর্ম্মের একটি মূল সূত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "যে সকল পদার্থ কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, সেই সকল পদার্থের কারণটি কি এবং কিরূপে তাহাদের অন্ত হয়—তথাগত তাহারই শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহাই মহাশ্রমণের ধর্ম্ম।" তদনন্তর, এই মানুষের চরমগতির আলোচনান্তেই যাঁহারা এতদিন ব্যাপৃত ছিলেন, সেই দুই তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া উঠিলেন:—"হাঁ!" আমরা মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভের উপায় পাইয়াছি!" উহারা তখনি বুদ্ধদেবের পদতলে আসিয়া পতিত হইল। বুদ্ধদেব তাহাদিগকে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া ব্যক্ত করিলেন। সঞ্জয়, স্বকীয় শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, এরূপ ক্রোধাবিষ্ট হইলেন যে সেই ক্রোধের আবেশে, একটি শিরা ছিন্ন হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইল।

তদনন্তর, বুদ্ধদেব স্বীয় পরিবারবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আর একবার কপিলবস্তুতে যাইবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। ৮ বৎসর হইল তিনি সেখান হইতে চলিয়া আসিয়াছেন—তিনি যখন চলিয়া আসেন তখন কপিলবস্তু নিদ্রিত ছিল, এক্ষণে এই সমগ্র নগর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত জাগ্রত হইল।

তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া রাজা শুদ্ধোদন, তাঁহার সমস্ত পুরুষ আত্মীয় সমভিব্যাহারে, পুত্র সিদ্ধার্থকে অভিবাদন করিবার নিমিত্ত নগর হইতে বহির্গত হইলেন। পার্শ্ববর্ত্তী কোন এক অরণ্যে পুত্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কারণ, বৌদ্ধসংঘের নিয়মানুসারে, তাঁহার শিষ্যদিগের ন্যায় তিনিও কোন গৃহস্থের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারেন না। এই সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী—পিতার প্রতি ভক্তি ও ভালবাসায় বুদ্ধদেবের হৃদয় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু পুত্রকে ভিক্ষুবসন পরিহিত ছিন্নশ্মশ্রু ছিন্নবেশ দেখিবেন ইহা শুদ্ধোদনের অসহ্য হইল। পরদিন প্রাতে বুদ্ধদেব ভিক্ষাপাত্রহস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই কথা নগরে রাষ্ট্র হইল; শুদ্ধোদন ইহা শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ বুদ্ধের নিকট আসিলেন। "বৎস! দরিদ্রের ন্যায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া কেন আমার অবমাননা করিতেছ?" বুদ্ধ উত্তর করিলেন:—"মহারাজ! ইহাই আমার কুলধর্ম্ম।"—"আমরা ক্ষত্রিয় রাজবংশ হইতে সমুৎপন্ন, আমাদের মধ্যে এপর্য্যন্ত কেহই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া এতটা নীচতা স্বীকার করে নাই।" কিন্তু বুদ্ধ একটু হাসিয়া এইরূপ উত্তর করিলেন:—"আপনি রাজবংশোদ্ভব বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারেন, কিন্তু আমার পূর্ব্বপুরুষ—অতীতকালের বুদ্ধগণ এবং তাঁহারাও আমার ন্যায় ভিক্ষা

করিয়া বেড়াইতেন।” রাজা বিষণ্ণমনে পুত্রকে প্রাসাদে লইয়া গেলেন। সেখানে বুদ্ধদেবের পত্নী যশোধরা বুদ্ধদেবের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যখন হইতে বুদ্ধদেব গৃহ হইতে প্রস্থান করেন, সেই অবধি যশোধরা একাকিনী বিষাদে কাল যাপন করিতেছিলেন। দুইজন শিষ্য সমভিব্যাহারে বুদ্ধদেব (কেন না, কোন স্ত্রীলোকের গৃহে, কোন ভিক্ষু, সংঘ-নিয়মানুসারে, একাকী যাইতে পারে না) তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অবশ্য যশোধরার হৃদয়ের কোপ ও অভিমান সঞ্চিত হইয়াছিল,—বুদ্ধদেব কি উচ্চ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। যে পতিকে তিনি এত ভালবাসিতেন সেই প্রিয়তম পতি তাঁহার রূপলাবণ্যকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন, শুধু এই কথা ভাবিয়াই তিনি যারপর নাই কষ্ট পাইতেছিলেন। কিন্তু পীতবসনপরিহিত সন্ন্যাসবেশধারী মহাপুরুষ বুদ্ধকে দেখিবামাত্র, তিনি তাঁহার পদতলে গিয়া পড়িলেন এবং পতির জানু ধরিয়া, একটি কথাও উচ্চারণ না করিয়া নীরবে অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

বুদ্ধদেব তাঁহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; যশোধরা যে সকল পুণ্যব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি মুক্তিলাভের অধিকারিণী হইয়াছেন, এই বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন। উভয়ের সাক্ষাৎকার এইরূপে শেষ হইল। কিন্তু যশোধরা রমণী, তিনি যখন দেখিলেন, তাঁহার রূপলাবণ্য, তাঁহার অশ্রুবর্ষণ সকলই বৃথা হইল, তখন তিনি ভাবিলেন—তিনি যে কাজ পারিলেন না, হয়ত তাঁর পুত্রের দ্বারা সেই কাজ সুসিদ্ধ হইবে। তিনি আশা করিয়াছিলেন, অপত্যস্নেহ বুদ্ধদেবকে গৃহে আবার আবদ্ধ করিতে পারিবে। এই মনে করিয়া, তিনি তাঁহার পুত্রকে সুন্দর বেশভূষায় ভূষিত করিয়া বুদ্ধের নিকট প্রেরণ করিলেন। শিশু বলিল:—“পিতঃ! আমি ত একদিন রাজা হইয়া শাক্যবংশের রাজসিংহাসনে উপবেশন করিব; অতএব উত্তরাধিকার সূত্রে আমার যাহা প্রাপ্য আমাকে তাহা প্রদান করুন।” গৌতম উত্তর করিলেন—“তোমার যাহা প্রাপ্য তাহা নশ্বর, দুঃখ তাহার পরিণাম—; ওরূপ কোন বস্তু আমার দিবার নাই। আমি তোমাকে যাহা দিতে পারি তাহা আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য। সে ঐশ্বর্য্য আমি বোধিদ্রুমের মূলে বসিয়া উপার্জ্জন করিয়াছি—তাহার ক্ষয় নাই।” তখন হইতে তাঁহার পুত্রকে আপনার নিকটে রাখিয়া সৎধর্ম্মের উপদেশ দিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহার পুত্র রাহুল একজন উৎসাহী ভিক্ষু হইয়া দাঁড়াইল। এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া আরও অনেক লোক দীক্ষা গ্রহণ করিল। বুদ্ধের পরিবারস্থ অনেক ব্যক্তি তাহাদের পদমর্য্যাদা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুর পীত বসন পরিধান করিল; ইহাদের নাম,—আনন্দ, উপলী, অনুরুদ্ধ। দেবদত্ত জুডাস ইস্ক্যারিয়টের অগ্রদূত বলিলেও হয়। জুডাস ইস্ক্যারিয়টের ন্যায় দেবদত্ত স্বকীয় প্রভু বুদ্ধকে নিহত করিবার জন্য এবং সংঘ হইতে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ছিনাইয়া লইবার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু বুদ্ধদেবের অক্ষয় দয়া ও সাধু সংকল্পের নিকট পরাভূত হইয়া তাহার সমস্ত চেষ্টা বিফল হয়। এইরূপে শাক্যমুনি ৪৫ বৎসর ধরিয়া গ্রামে গ্রামে, প্রদেশে প্রদেশে, দৃষ্টান্ত কথার দ্বারা, ধর্ম্মোপদেশের দ্বারা—ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, লোকদিগকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। “মহা পরিনির্ব্বাণসূত্তে” তাঁহার অন্তিম মুহূর্ত্তের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। জরাক্রান্ত হইয়া তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন দিন দিন তাঁহার বলক্ষয় হইতেছে; তিনি তাঁহার প্রিয়তম শিষ্যকে বলিলেন:—“দেখ আনন্দ, আমার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি।” আনন্দ অশ্রুবর্ষণ করিল এবং শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে আরও কিছুকাল থাকিবার জন্য তাঁহাকে অনুনয় করিল। বুদ্ধদেব বলিলেন:—“আনন্দ, তোমাকে আমি কি উপদেশ দিই নাই যে, আমরা যাহাদিগকে ভালবাসি তাহাদের সহিত একসময় বিচ্ছেদ হইবে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে—ইহাই জগতের নিয়ম? সংযোগোৎপন্ন পদার্থ মাত্রেরই ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী—অতএব মানুষ মরিবে না—সে তথাগতই হউক না, যেই হউক না—ইহা কি কখন সম্ভব? কেহই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। শুন, আমি সত্য বলিতেছি, তিন মাসের মধ্যে, তথাগত পরিনির্ব্বাণে প্রবেশ করিবে। অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, যে সত্য আমি অবগত হইয়া তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছি, তাহা সম্যকরূপে তোমরা গ্রহণ কর। দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে তোমাদের জীবনকে

এই ধর্ম্মের ভাবে অনুপ্রাণিত কর, এই ধর্ম্মে নিমগ্ন হইয়া, আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া তোমরা ইহাকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত কর—যেন এই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম স্থায়ী হয়—বহুকাল সংরক্ষিত হয়। যে এই বিশুদ্ধতার পথ অনুসরণ করিবে সে নিশ্চিতই ভবসিন্ধু পার হইয়া সেই পরম স্থানে উপনীত হইবে যেখানে সকল দুঃখের অবসান হয় (৩৮)।"

তাঁহার জীবনের শেষ দশায়, তাঁহার নির্দ্দেশিত পথ অধ্যবসায় সহকারে অনুসরণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার শিষ্য-দিগকে ক্রমাগত বলিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, সংশয় ও তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইবে বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার শিষ্য-দিগকে বয়ানগরে একত্র করিয়া তাহাদিগকে এই কথা বলিলেন:—"ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগের নিকট হইতে চলিয়া গেলে, বৌদ্ধ সমাজের প্রাচীনেরা, ভিক্ষু সন্ন্যাসীরা এইরূপ বলিবে: আমি এই কথা কিংবা ঐ কথা বুদ্ধের নিজ মুখ হইতে শুনিয়াছি; সাক্ষাৎ বুদ্ধের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। ইহাই আমাদের গুরুর উপদিষ্ট সত্য, ইহাই আমাদের গুরুর মত, গুরুর সিদ্ধান্ত। এই সব কথা, বিনা পরীক্ষায় বিশ্বাসও করিবে না, কিংবা অবজ্ঞা সহকারে অগ্রাহ্যও করিবে না। প্রত্যেক কথা তোমরা কোন প্রকার পূর্ব্বসংস্কারের বশবর্ত্তী না হইয়া মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিবে এবং আমার উপদিষ্ট বৌদ্ধধর্ম্মের মুখ্য লক্ষণাদির সহিত, সংঘের নিয়মাবলীর সহিত মিল করিয়া দেখিবে। এইরূপ তুলনা করিয়া—যদি অমুক প্রাচীনের কথা, অমুক ভিক্ষুর কথা আমার উপদিষ্ট ধর্ম্মের সহিত, সংঘের নিয়মের সহিত মিল না হয় তবে তাহা অগ্রাহ্য করিবে; এবং তাহার বিপরীত হইলে গ্রহণ করিবে। এই আমার উপদেশ (৩৯)।" তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে কুশীনারা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার দুর্ব্বলতার বৃদ্ধি হইল, দারুণ কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন, অবশেষে পথের ধারে একটা গাছের তলায় বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইলেন। তৃষ্ণায় কাতর হইয়া আনন্দের নিকট একটু জল চাহিলেন। আনন্দ উত্তর করিল, যে স্বল্পতোয় নদীতে একটু জল আছে, সার্থবাহরা সেই নদীর উপর দিয়া চলাচল করায় সেই নদীর জল কর্দ্দমাক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বুদ্ধদেব পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করায়, আনন্দ কমণ্ডলু ভরিয়া জল আনিল, এবং সেই জল অনাবিল ও স্বচ্ছ দেখিয়া বিস্মিত হইল। এই অদ্ভুত ঘটনার পর, যে সার্থবাহরা নদী পার হইয়াছিল তাহাদের অধিস্বামী পুক্কুসা, বুদ্ধদেব আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া, তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, বহুমূল্য কিংখাব পরিচ্ছদ উপহার দিল। শাক্যমুনি উহার একখানি বস্ত্র লইয়া পরিধান করিলেন; কিন্তু পরিবামাত্র উহা ম্লান ও জৌলস্-বিহীন বলিয়া মনে হইল।

আনন্দ বিস্ময়াভিভূত হইয়া বলিয়া উঠিল: "প্রভো, আপনার মুখ এরূপ ভাস্বর, এমন একটা প্রভা আপনার দেহ হইতে নিঃসৃত হইতেছে, যে উহার নিকট আপনার বহুমূল্য বস্ত্রখানি অতীব ম্লান ও অনুজ্জ্বল বলিয়া মনে হই-তেছে।" বুদ্ধ উত্তর করিলেন:—"আনন্দ, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য। এই পার্থিব জীবন-পথে বুদ্ধ দুইবার রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রথমবার, সেই রাত্রে যখন বুদ্ধ পরম জ্ঞানলাভ করে; দ্বিতীয়বার রাত্রিকালে যখন বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণে প্রবেশ করিবে। আর আনন্দ আজি তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে, বুদ্ধ চিরশান্তির মধ্যে প্রবেশ করিবে।" বস্তুতই শাক্যমুনির অন্তিম কাল আসন্ন। বুদ্ধদেব শিষ্যমণ্ডলী সমভিব্যাহারে, কায়ক্লেশে কুশীনারার অনতিদূরস্থ শালবনের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে পৌঁছিয়াই তিনি দুইটি যমজ-তরুর মাঝখানে শুইয়া পড়িলেন। গাছ দুটি তৎক্ষণাৎ ফুলে ভরিয়া গেল; এবং সেই সকল ফুল আসন্নমৃত্যু বুদ্ধদেবের উপর অশ্রুচ্ছলে ঝরিয়া পড়িল; প্রকৃতিদেবী স্বয়ং যেন ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। রাত্রিতে স্বর্গীয় সঙ্গীত শ্রুত হইল। তখন বুদ্ধদেব বলি-লেন;—"দেখ, কি চমৎকার দৃশ্য! তথাগতের সম্মানার্থ স্বর্গ মর্ত্ত্য রেষারিষি করিতেছে। কিন্তু এরূপ সম্মান তথা-গতের সমুচিত নহে। আমার শিষ্যদিগের মধ্যে যাহারা চিত্তের মধ্যে সতত অবস্থিতি করিবে, আমার উপদেশ যথাযথরূপে পালন করিয়া সাধুভাবে জীবন যাপন করিবে, কেবল তাহাদিগের দ্বারাই আমি যথোচিতরূপে সম্মানিত হইব (৪০)।" যতই রাত্রি অধিক হইতে লাগিল, শাক্য-মুনির শরীর ততই ক্ষীণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। রোরুদ্য-মান শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে, তাঁহার আত্মা সতত প্রশান্ত ছিল।

তিনি তাহাদিগকে বলিলেন; "বন্ধুগণ, আমার মরণ আসন্ন বলিয়া তোমরা ব্যাকুল হইও না, এরূপ মনে করিও না যে, গুরুর মুখ রুদ্ধ হইয়াছে, তিনি নির্ব্বাক্‌ হইয়াছেন, আমাদের আর কেহ নেতা নাই। আমি তোমাদের নিকট যে ধর্ম্ম ঘোষণা করিয়াছি, এবং নিষ্কলঙ্ক জীবন সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছি—আমার অবর্ত্তমানে উহারাই তোমাদের নেতা হইবে।"

গম্ভীর ও নিস্তব্ধ রাত্রি; কেবল শিষ্যদিগের ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাসে সেই নিস্তব্ধতা ক্ষুব্ধ হইতেছে; এবং সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শাক্যাসংহের কণ্ঠনিসৃত আহ্বান-বাক্য তিনবার প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল; "হে ভিক্ষুগণ! বুদ্ধ সম্বন্ধে, ধর্ম্ম ও সংঘ সম্বন্ধে যদি তোমাদের কোন সংশয় থাকে, আমাকে বল, আমি তাহার নিরাকরণ করিব।" কেহই উত্তর করিল না। তথাগত কায়ক্লেশে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন, শিষ্যদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং মুমূর্ষু কণ্ঠস্বরে এই কথা বলিলেন:—"প্রিয় শিষ্যগণ! এখন তবে আমি শান্তিতে মরিতে পারিব। আমি তোমাদের যাহা বলিয়াছি সর্ব্বদাই মনে রাখিবে; জাত পদার্থ মাত্রই নশ্বর। প্রযত্ন সহকারে পুণ্য সঞ্চয় কর এবং এইরূপে মোক্ষে উপনীত হও।" ইহাই তাঁহার শেষবাক্য। ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া তিনি অচিরাৎ সিদ্ধপুরুষসুলভ সুগভীর সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার শিষ্য আনন্দ তাঁহার অন্তিম নিঃশ্বাসের স্পর্শ লাভ করিবার নিমিত্ত নিকটে আসিল। তখন বুদ্ধদেব পরিনির্ব্বাণে প্রবেশ করিয়াছেন—যে অবস্থা হইতে সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না—আর কখনই ফিরিয়া আসিতে হয় না।

ইহাই সেই মহাপুরুষের জীবনকাহিনী, ভক্তবৃন্দ যাঁহাকে তথাগত, সিদ্ধার্থ, ও বুদ্ধনামে অভিহিত করিয়া থাকে; যাঁহার স্বর্ণমূর্ত্তিতে, পিত্তল-মূর্ত্তিতে, খোদিত-কাষ্ঠমূর্ত্তিতে প্রাচ্যখণ্ডের ও অতিপ্রাচ্যখণ্ডের দেবালয় ও মন্দির সকল সমাচ্ছন্ন;—সেই বুদ্ধ, যাঁহার মুখে মধুর স্মিত-হাস্য চির-বিরাজমান, যিনি পবিত্র পদ্মাসনে ধ্যানের ভঙ্গীতে অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়নে উপবিষ্ট হইয়া, সহস্র সহস্র বৎসর হইতে, ৫০ কোটি লোকের পূজা গ্রহণ করিতেছেন;—যাহারা প্রতিদিন তাঁহার চরণে ভক্তিপূর্ণ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে এবং মধুর সুগন্ধি ধূপ প্রজ্বলিত করে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

ইব্‌নে বতুতার ভারত ভ্রমণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

১। ভাকর। (১) লাহিরী হইতে ভাকরগমন কালে আলাওল হক আমার পথের সামগ্রীর সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন। এই সহরের মধ্যে সিন্ধু নদের একটী শাখা প্রবাহিত হইতেছে। ইহার বিষয় পরে বর্ণনা করা হইবে। এই নদীর তীরে একটী প্রকাণ্ড পান্থশালা রহিয়াছে। প্রবাসিগণ এই স্থানে সমাগত হইলে যথারীতি তাঁহাদিগকে সম্মানিত করা হইয়া থাকে। কসলু খাঁ এই অতিথিনিবাসের স্থাপয়িতা। যথাস্থানে কস্লু খাঁয়ের পরিচয় প্রদত্ত হইবে। আমার পরিচিত ইমাম আবদুল্লা হানফি ও সামসুদ্দিন মহাম্মদ সীরাজীর সহিত এই সহরে সাক্ষাৎলাভ হইল। ইমাম আবদুল্লা আবু হানিফা সহরের কাজীর পদে নিযুক্ত আছেন। এই সময় সামসুদ্দিনের বয়স ১২০ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে।

২। আওচাহ। (২) কিছুকাল ভাকরে অবস্থান করার পর এই স্থানে আগমন করি। সহরটী মন্দ নয়। বাজার-গুলি পরিপাটির সহিত সাজান রহিয়াছে। সিন্ধুনদ এই জনপদটীর পাদদেশ বিধৌত করিয়া চলিয়াছে। সৈয়দ

---

(১) অধুনাতন যাহাকে শকর বলা যায়, সম্ভবতঃ তাহাকেই ভাকর নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই স্থানে মির মহম্মদ ভকরির সমাধি রহিয়াছে। যাহাকে খাজা খেজেরের খানকা বলা যায় সম্ভবতঃ ইহাই কশলু খাঁয়ের অতিথি নিবাস ছিল। আর যাহাকে সাদা বিলাহ বলা হয় এইটী হিন্দুদিগের অতি প্রাচীন মন্দির বলিয়া বোধ হয়। এখনও হিন্দুগণ মন্দিরে গমন করতঃ পূজাদি করিয়া থাকেন। এ সময় শকর একটী বৃহৎ বন্দর। প্রায় ত্রিশ সহস্র লোকের বাস। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে এই সহর ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের অধীনে আইসে।

(২) এই সহরটী বর্ত্তমান ভাওয়ালপুর রাজ্যের নিকটস্থ পঞ্চনদ নদীর তীরে এবং মুলতান হইতে প্রায় ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বকালে পঞ্চনদ এই সহরের নিকটে সিন্ধুর সহিত মিলিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে পঞ্চনদের পাঁচটী—নদী ইহা হইতে প্রায় ৪০ মাইল দূরে মটনকোটের নিকট যাইয়া মিলিত হইয়াছে। General Cunningham বলেন এই সহর সম্রাট সেকেন্দর স্থাপন করেন। নাসিরুদ্দিন কাবাচার সময়ে এই সহর সিন্ধু প্রদেশের রাজধানী ছিল।

জালালউদ্দীন কাজী এখানকার শাসন কর্ত্তা। তিনি একজন সাহসিক ও দয়ালু পুরুষ। তাঁহার সহিত পরিচয় হইলে আমি তাঁহার নিকটেই থাকিতাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। যে সময় আমি দিল্লীতে ছিলাম সে সময়ও কয়েকবার আমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই সময় দিল্লীর সম্রাট দৌলতাবাদে (১) অবস্থান করিতেছিলেন। সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎমানসে জালাল দৌলতাবাদে গমন করেন। আমিও যাইতে প্রস্তুত ছিলাম কিন্তু জালাল আমার গমনে বাধা দিয়া তথায় তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে বলিলেন যে ইহার খরচপত্রের যাহা আবশ্যক হয় তৎক্ষণাৎ প্রদান করিবে। তাঁহার অনুপস্থিতিতে আমি প্রায় পাঁচ সহস্র টাকা অতি অল্প দিবসের মধ্যে ব্যয় করিয়াছিলাম। জালাল প্রত্যাগমন করিলে কর্ম্মচারিগণ এই কথা তাঁহার কর্ণগোচর করায় তিনি আমার প্রতি বিরক্ত না হইয়া বরং সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এই সহরে জালালউদ্দীন হয়দরি উব্বি (২) নামক একজন সাধুপুরুষের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে একখানা খেরকা (পুরাতন জামা) দিয়াছিলেন। এক সময়ে দস্যুগণ কর্ত্তৃক আমার অন্যান্য দ্রব্যের সহিত ঐ খেরকাটী অপহৃত হয়।

৩। মুলতান। (৩) ইতিপূর্ব্বে আমার ঘোড়া ও অন্যান্য-দ্রব্যাদি মুলতানে প্রেরণ করিয়া আমি অন্যান্য-স্থান পরিভ্রমণ করতঃ মুলতানাভিমুখে গমন করিলাম। পথিমধ্যে আমার ঘোড়া, চাকর ও অন্যান্য মাল পাইলাম। তখনও তাহারা মুলতান পঁহুছিতে পারে নাই। পথিমধ্যে একটী ক্ষুদ্র নদী পাওয়া গেল। এই নদীতীর হইতে প্রায় দশ ক্রোশ দূরে মুলতান অবস্থিত। নদীটী অত্যন্ত গভীর সেইজন্য নৌকা ভিন্ন পার হওয়া দুরূহ। বাদশার তরফ হইতে নৌকার রীতিমত বন্দোবস্ত আছে। এই নদী পার হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক প্রবাসীর দ্রব্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা হয়। মালের মাশুল স্বরূপ প্রত্যেক মালের সিকি অংশ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। আমার হিন্দুস্থানে আগমনের দুই বৎসর পরে বাদশা এই কর উঠাইয়া দেন। হিন্দুস্থান

(১) দৌলতাবাদ বা দেওগিরি। অতি প্রাচীন সহর। মহাম্মদ সা তোগলক দিল্লীরাজধানী এই সহরে আনায়ন করেন। এখানকার দুর্গটী দেখিবার জিনিষ; প্রায় ১২০ ফিট উচ্চ।

(২) এই স্থানে সৈয়দ জালাল বোখারী ও মকদুম জাঁহানিয়া জাহাগস্ত প্রভৃতি সাধুপুরুষগণের সমাধি অতি জীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। বতুতার আগমন সময়ে মকদুম জাঁহানিয়া জীবিত ছিলেন। তাঁহার পিতামহের নামই সৈয়দ জালাল বোখারি। বতুতা ভুলবশতঃ জাঁহানিয়া জাঁহাগস্তকে সৈয়দ জালালুদ্দিন হয়দরী উব্বি নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন মখদুম জাঁহানীয়া জাঁহাগস্তের সমাধি কনোজ নগরে রহিয়াছে।

(৩) মুলতান অতি প্রাচীন সহর। সম্রাট সেকেন্দরের সময় এই সহর মালি নামক এক জাতির রাজধানী ছিল। কিন্তু General Cunningham বলেন এই সহরে অতি প্রাচীনকাল হইতে সূর্য্য দেবতার মন্দির আছে বলিয়া বিখ্যাত। ৬৪১ খৃষ্টাব্দে আসং হিউন (Hiouen thsang) নামক বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হিন্দুস্থানে আগমন করেন। সে সময় সূর্য্যদেবতার মন্দির বর্ত্তমান ছিল। এই সময়ে মুলতান প্রায় পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চাচনামা হইতে জানা যায় ৭১৪ খৃষ্টাব্দে মহাম্মদ কাসেম এই সহর অধিকার করেন। এই সময় বিয়াস নদী সহরের উত্তরপূর্ব্বদিকে এবং রাবি দুর্গ ও সহরের মধ্যে প্রবাহিত ছিল। ৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বালাজরী এই মন্দিরের উল্লেখচ্ছলে বলিয়াছেন "সিন্ধুবাসী হিন্দু-যাত্রিগণ এখানে আগমন করতঃ দাড়ি ও মস্তক মুণ্ডন করিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করে।" ৯২০ খৃষ্টাব্দের আবুজিদ ও মহুদি এই মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন। ৯৫০ খৃষ্টাব্দের আসতখরী (Istakhri) লিখিয়াছেন "অন্য কোন হিন্দু রাজা এই সহর অধিকার করিতে সাহসী হন না, পাছে মন্দিরের সম্মান নষ্ট হয়। তাঁহার সময় মন্দিরটী বাজারের চকে ছিল। ৯৭৬ খৃষ্টাব্দের ইবনে হাওকাল বলেন "মূর্ত্তিটী মনুষ্য প্রকৃতির, একটী চবুতারার উপর স্থাপিত। চক্ষুতে বহুমূল্যের দুইটী প্রস্তর বসান রহিয়াছে। ইহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তবর্ণের। কি দ্রব্যে প্রস্তুত তাহা অজ্ঞাত।" হাওকালের বর্ণনার কিছু দিবস পরে কারামতা এই সহর অধিকার করতঃ মন্দির ধ্বংস করিয়া তৎস্থানে একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। যে সময় আবু রাইহান এদেশে আগমন করেন, সে সময় মন্দিরটী ছিল না বলিয়া উল্লেখ করিতে দেখা যায়; কিন্তু ১১৩০ খৃষ্টাব্দের আওরেসী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই সময়ে রাবি নদী সহরের নিকটে প্রবাহিত হইত।—১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গ-জেবের শাসনসময়ে "মেসিও-থাভি-নও" নামক জনেক ফরাসী এদেশে আগমন করেন। তিনিও ইবনে হাওকালের মতের অনেক পোষকতা করিয়াছেন। সাধারণতঃ প্রবাদ আছে যে—এই মন্দির আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক মসজিদে পরিণত হয়। ঐ মসজিদ মুলরাজ কর্ত্তৃক কামান দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। General Cunningham বলেন ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে দুর্গের সন্নিকটে ইহার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। তৈমুরের সময় রাবি কেল্লার উত্তরদিকে এবং ইহার একটী শাখা উভয়ের মধ্য প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত ছিল। কুলাদ পুরির মন্দির যাহা এখন কেল্লার মধ্যে অবস্থিত, ইহার সহিত সূর্য্যমন্দিরের কোন সংস্রব নাই। সহরের পাঁচ মাইল দূরে যে সূর্য্যকণ্ঠ মন্দির আছে সম্ভবতঃ এইটী সূর্য্য-মন্দির হইতে পারে। এই সহর মধ্যে শাহ রুকনউদ্দিন আলমের সমাধি একটী দেখিবার জিনিষ। ইহার উচ্চতা ১০০ ফিট। কবরটী অত্যুচ্চ স্থানের উপর রহিয়াছে বলিয়া প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূর হইতে দেখা যায়। কথিত আছে মুলতান গেয়াসউদ্দিন তোগলক ঐ কবর নিজের জন্য প্রস্তুত করাইয়াছিলেন কিন্তু তৎপুত্র মহাম্মদ সাহ তোগলক ঐ কবরমধ্যে রুকনউদ্দিনকে সমাধিস্থ করেন। এই সহরের লোকসংখ্যা প্রায় আশি হাজার। বতুতা দশ ক্রোশ পরে সম্ভবতঃ রাবি নদী পার হইয়াছিলেন। যদি তিনি চিনাব, ঝিলাম ও রাবি তিনটী নদীই পার হইতেন তাহা হইলে ছোট নদী বলিতেন না।

গমনেচ্ছায় বহু লোক এই নদীর তীরে উপস্থিত রহিয়াছেন। আমার সঙ্গে কোনরূপ মূল্যবান দ্রব্যাদি ছিল না বটে কিন্তু যাহা ছিল তাহা দেখিয়া একজন বড় লোক বলিয়া বোধ হইতেছিল। যখন আমার দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিবে সে সময় আমাকে লজ্জায় পড়িতে হইবে বলিয়া চিন্তিত হইতে হইল। যাহা হউক খোদাতালা শীঘ্রই সে চিন্তা দূর করিলেন। মুলতানের হাকিম কুতবল মালেক আমার আগমন সংবাদ জানিতে পারিয়া একজন সিপাহী প্রেরণ করেন। কেহ যেন আমার মালপত্র পরীক্ষা না করে সে তাহার জন্য বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে নদী পার হইয়া সেই নদীতীরে রাত্রিযাপনের বন্দোবস্ত করিলাম। পরদিবস প্রাতঃকালে বাদশার আখবার নবিস ও ডাকের সরদার দেহকান সমরকন্দি আমাকে সঙ্গে করিয়া মুলতানাভিমুখে লইয়া চলিলেন। আমি মুলতানে পঁহুছিয়া প্রথম কোতবল মালেকের নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি বিছানা হইতে উঠিয়া আমায় অভ্যর্থনা করিলেন এবং আপন পার্শ্বে বসিবার আজ্ঞা দিলেন। সেই সময় আমি তাঁহার সম্মুখে উপঢৌকন স্বরূপ একটী গোলাম একটী ঘোড়া কিসমিস ও বাদাম উপস্থিত করিলাম। বাদাম কিসমিস এদেশে জন্মে না খোরাসান হইতে আনা হইয়া থাকে। কোতবল মালেক একটী চবুতারার উপর কারুকার্য্যখচিত সুন্দর মসনদের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার উভয় পার্শ্বে সহরের কাজী, সিপাহসালার, খতিব ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোক উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে একটী বিস্তৃত ময়দানে সৈন্যগণ তীর, ধনুক, ঘোড়া প্রভৃতি যুদ্ধসামগ্রী লইয়া আপন আপন যুদ্ধকৌশল দেখাইতেছিল। কোতবল মালেক প্রত্যেক সৈনের যুদ্ধকৌশল দেখিয়া তাহাদের পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি করিতেছিলেন। তৎপর তিনি আমাকে সেখ রুকন দ্দিন কোরেসীর নিকট অবস্থান জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া যাইতে অনুমতি দিলে আমি তথা হইতে গমন করতঃ উক্ত সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলাম। রুকনউদ্দিন কোরেসী একজন সম্ভ্রান্ত খোরাসানবাসী, বাদশার দরবারে থাকার জন্য এদেশে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় আরও বহু সম্ভ্রান্ত লোক ঐ উদ্দেশ্যে আগমন করিয়া এখানে অবস্থান করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে খোদাওয়ান্দজাদা কেয়ামদ্দিন (১) যোরহান উদ্দিন, এমাদ উদ্দীন, জিয়া উদ্দিন, মোবারক নামক জনেক সমরকন্দের জমিদার, প্রভৃতি লোক গুলিই প্রধান। ইহাদের সঙ্গে বন্ধুবান্ধব ও চাকর প্রভৃতি আরও বহু লোক ছিল। আমার আগমনের পর দিল্লী হইতে সম্রাট খোদাওয়ান্দজাদাকে অভ্যর্থনার সহিত দিল্লী গমন জন্য খেলাত সহ বসনজী নামক জনৈক হাজব (চোবদার) এবং মহাম্মদ হারদি নামক জনেক কোতয়ালকে প্রেরণ করেন। এতৎ সঙ্গে সম্রাটজননী মকদুমিয়া জাহান (২) তাঁহার পরিবারদিগের জন্য পৃথক খেলাতসহ আরও কতকগুলি লোক প্রেরণ করেন। তাহারা মুলতানে আগমন করার পর খোদাওয়ান্দজাদার দিল্লী গমনের দিন স্থির করা হয়। তাঁহার সঙ্গে আমাদেরও গমনের হুকুম হয়। দিল্লী গমনের পূর্ব্ব দিবসে জনৈক কর্ম্মচারী একখানি ফারমে আমাদের প্রত্যেকের স্বাক্ষর লওয়ার জন্য উপস্থিত হইলে আমরা সকলে তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া দিলাম। অনেকে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হইলেন। সম্রাটের আদেশ আছে "যদি কোন বিদেশী এদেশে আগমন করতঃ বসবাস করিতে অস্বীকৃত হন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দিল্লী অভিমুখে যাইতে দেওয়া হয় না, (৩)।" আমরা বসবাস করিতে স্বীকৃত হওয়ায় স্বাক্ষর লওয়া হইল। আমরা দিল্লী গমন জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। মুলতান হইতে দিল্লী ৪০ দিবসের পথ।

৪। দস্তরখান। (৪) যখন আমরা দিল্লী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম, তখন আমাদের পথের আহারের রীতিমত বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। প্রত্যেক নির্দ্দিষ্ট স্থানে

---

(১) ফেরেস্তা লিখিয়াছেন "ঐ সময় ঘোর রাজবংশধরগণকে খোদাওয়ান্দজাদা এবং আব্বাসিয় রাজবংশধরগণকে মখদুমজাদা বলা যাইত।"

(২) সম্রাট জননীকে সে সময়ে মকদুমিয়াজাহান বলা হইত।

(৩) ইহাতে অনুমান হয় বিদেশীয়দিগকে উচ্চপদস্থ কার্য্যে নিযুক্ত করা কেবল যে বাদশার উদ্দেশ্য তাহা নহে বরং যাহাতে তাঁহারা সপরিবারে এদেশে বসবাস করতঃ ইস্‌লাম ধর্ম্ম বিস্তার করেন ইহাই তাঁহার মূল উদ্দেশ্য। এই জন্য খোদাওয়ান্দজাদা ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, সেখ মুসা প্রভৃতি রাজবংশধরগণ সিওহাম প্রদশের জাজনির সহর হইতে সপরিবারে এদেশে আগমন করেন। সম্রাট তাঁহাদিগকে রোহটাক ও সিরাটের কাজীর পদ প্রদান করতঃ তথায় বসবাস করিতে আজ্ঞা দেন।

(৪) আহারের সময় যে কাপড় বিছাইয়া তাহার উপর আহারীয় সামগ্রী রাখিয়া আহার করা হয় তাহাকে দস্তরখান বলে।

আহারীয় সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছিল। খোদাওয়ান্দজাদার সহিত একত্রে বসিয়া সকলকে আহার করিতে হইত। মুলতান হইতে এক মনজেল গমনের পর যে প্রকার আহারের ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহার বর্ণনা করা আবশ্যক। প্রথমে একখানি দস্তরখান বিছাইয়া তাহার চতুষ্পার্শে আমাদিগকে বসিতে অনুমতি করা হয়। আমরা বসিলে প্রত্যেককে রৌপ্য ও কাচ নির্ম্মিত গেলাসে মিছরি ও গোলাবের সরবৎ পান করিতে দেওয়া হয়। তৎপরে এক একখানি বাসনে ৫।৬খানি করিয়া পাতলা চাপাতি রুটী, ছাগমাংস ভাজা, পারাঠা, হালুয়া খসতি (ইহা আটা চিনি ও ঘৃত দিয়া প্রস্তুত) ৪।৫ খণ্ড সমছা (ইহা আমি পূর্ব্বে কখন খাই নাই) পোলাও কোরমা প্রভৃতি দেওয়ার শেষে হাজব "বিস্‌মিল্লাহ" বলিয়া সকলকে আহার করিতে অনুমতি দিলেন। আহারশেষে পান ও সুপারি দিয়া সকলকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিশ্রাম করিতে বলিলেন। আমরা একে একে বিশ্রামাগারে গমন করিলাম। বিশ্রামান্তে আবুহর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম।

৫। আবুহর। (১) মুলতান হইতে গমন করিয়া এই সহরে উপনীত হইলাম। সহরটী ছোট বটে কিন্তু অতি সুন্দর। এই সহরের অধিকাংশ স্থানে কুল বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। ফলও অপর্য্যাপ্ত রহিয়াছে। ফলগুলি দেখিতে মাজু ফলের ন্যায়। আমাদের দেশে যে সকল কুল জন্মে, ইহা তাহা অপেক্ষা বৃহৎ ও খাইতে সুস্বাদু।

৬। হিন্দুস্থানের ফল।

(ক) জাম্বুন (জাম) এই ফল দেখিতে জায়তুন ফলের ন্যায় কিন্তু রঙটা সামান্য কাল।

(খ) কাঁটাল। এই ফল দুই প্রকারের হয়, যে ফল মূলে জন্মে তাহাকে "বরকী" বলে ইহা খাইতে সুস্বাদু। বৃক্ষোপরি যে ফল জন্মে তাহাকে "চুকি" বলে।

(গ) কসেরুহ (কেশুর)। এই সকল পুষ্করিণীতে জন্মে। যখন পুষ্করিণীর জল শুষ্ক হইয়া যায় সেই সময় মৃত্তিকা খনন করতঃ ঐ ফল উত্তোলন করিয়া থাকে।

(ঘ) মহুয়া। এই ফলের বৃক্ষগুলি বৃহৎ বৃহৎ, পাতাগুলি আখরোটের পাতার ন্যায় কিন্তু ঈষৎ লাল ও হরিদ্রা বর্ণ মিশ্রিত। ফলগুলি আলুবোখারার ন্যায় হইয়া থাকে। এই ফলের মুখে কিসমিসের ন্যায় অন্য একটী দানা (১) থাকে। ইহার আস্বাদ আঙ্গুর ফলের ন্যায়। অধিক খাইলে মাথা ঘুরে। এই বৃক্ষ বৎসরে দুইবার ফলোৎপাদন করিয়া থাকে। ইহার বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া প্রদীপে জ্বালান হইয়া থাকে।

(ঙ) আনার। আমাদের দেশের ন্যায় হিন্দুস্থানে আনার জন্মিয়া থাকে। এদেশে আনার অর্থাৎ দড়িম বৃক্ষ হইতে বৎসরে দুইবার ফল পাওয়া যায়। জজিরে যেবত অল মহলে (মালদ্বীপ) আনার বৃক্ষ প্রায় বার মাসই ফলোৎপাদন করিয়া থাকে।

(চ) রঙ্গতরাহ (কমলা লেবু) (২)। এই ফল আমি আগ্রহের সহিত খাইতাম।

(ছ) আম। (৩) এই ফল হিন্দুস্থানের সকল ফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আম পাকিলে হরিদ্রাবর্ণের হয়। ঝড়বৃষ্টিতে কাঁচা ফল পড়িয়া গেলে তাহার আচার (৪) প্রস্তুত করে। আমাদের দেশে যে প্রকারে লেবুর ও লঙ্কার আচার প্রস্তুত করে হিন্দুস্থানবাসীও সেই প্রকারে আচার প্রস্তুত করে।

---

(১) বতুতা এই সহরটী মুলতান ও পাকপটনের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অধুনা ফিরোজপুর জেলায় ফাজিলকার নিকটবর্ত্তী পাকপটনের ৬০ মাইল পূর্ব্বে আবুহার নামক এক জনপদ রহিয়াছে। বতুতা যে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই আবুহরের নিকটস্থ ভেলণ্ডী নামক স্থানে রাজপুত রাজা রাণামল অবস্থান করিতেন। এই রাজার কন্যাকে সালার রজব (ফিরোজ শাহের পিতা বা মহাম্মদ তোগলকের পিতৃব্য) বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই গর্ভে ফিরোজ শাহের জন্ম হয়। এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত ইতিহাস "তারিখ ফিরোজ শাহী"তে উল্লেখ আছে।

(১) বতুতা মহুয়ার ফল এবং ফুল নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। তিনি যে দানাকে কিসমিসের ন্যায় বলিয়াছেন সেইটী মহুয়ার ফুল। ঐ ফুল শুষ্ক হইয়া ফলের মুখে লাগিয়া থাকে। মহুয়ার ফুলে এক প্রকার মাদক দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

(২) কমলালেবুর অনেক নাম আছে যথা:—সঙ্গতরাহ, নারঙ্গ ও তরঞ্জ, নারঙ্গী, কয়নাহ, কাওলা, গুল গুল প্রভৃতি।

(৩) কবিবর আমির খসরু আম ও আচারের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যথা—

"নগজে কুনমা নগজেকুন বোস্তাঁন
নগজে তেরিন মেঁওয়ে হিন্দুস্থান"

(৪) আচার সম্বন্ধে—"লোকমা না রওয়াদ জেরে আগার আঁচার না ইয়াবী।"

বতুতার আগমনের নয় বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৭২৫ হিজীরাতে কবিবরের মৃত্যু হয়।

৭। আবিবকহর। (১) আমরা আরব ও আজমবাসী ২২ জন অশ্বারোহী বেলা দুই প্রহরের সময় আবুহর হইতে গমন করতঃ সন্ধ্যাকালে একটী ময়দানে উপনীত হইলাম। আমাদের অন্যান্য সঙ্গিগণ পূর্ব্বেই গমন করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে পর্ব্বত রহিয়াছে। এই সকল পর্ব্বতোপরি দস্যুগণ অবস্থান করিয়া থাকে। আমরা যে সময়ে এই ময়দানে উপস্থিত হইলাম সেই সময় অনেকগুলি দস্যু আসিয়া আক্রমণ করিল। আমরা সকলে হৃষ্টপুষ্ট ও সাহসিক ছিলাম। তাহারা সম্মুখে না আসিয়া দূর হইতে তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কয়েকটী তীর আমার শরীরে ও আমার অশ্ব-শরীরে লাগিয়াছিল। তীরগুলি মজবুত ছিলনা বলিয়া অধিক আহত হই নাই। একজন সঙ্গীর ঘোড়া তীরে আহত হইয়া মরিতেছে দেখিয়া তাহাকে জবহে করিয়া দিলাম। আমাদের সঙ্গে একজন তুর্কী লোক ছিলেন। তিনি ঐ ঘোড়ার কাঁচা মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই দস্যুদলের সহিত আমাদের ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হয়। ইহাতে আমরা সকলে সামান্য সামান্য আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আমি ঐ দস্যুদলের ১২ জনকে নিহত করিয়াছিলাম। এই বিপদে পড়িয়া আমাদের আবিবকহর পঁহুছিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর লাগিয়াছিল। এই সহরে দুই দিবস অবস্থানের পর অজধ্যানাভিমুখে গমন করিলাম।

৮। অজধ্যান (পাকপটন) (২) অজধ্যান একটী ক্ষুদ্র সহর। হিন্দুস্থানের বাদসা সেখ ফরিদ উদ্দিনের শিষ্য ছিলেন, তিনি গুরুর উপভোগের জন্য এই সহর গুরুকে প্রদান করিয়া ছিলেন।

একদা বুরহানুদ্দিন ইসকন্দরী আমাকে বলিয়াছিলেন যে "অজধ্যানে তোমার সহিত সেখ ফরিদউদ্দিনের * সাক্ষাৎ হইবে তাঁহাকে আমার অভিবাদন জানাইবে।" ঈশ্বরানুগ্রহে এই স্থানে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। সেখ সদাসর্ব্বদা ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। সেই জন্য একপ্রকার লোকসহবাস ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিলেই হয়। যদি কাহারও বস্ত্রাগ্র দৈবাৎ তাঁহার বস্ত্রে স্পৃষ্ট হইত তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ নিজেই ধৌত করিয়া ফেলিতেন। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ করিলাম এবং সেখ বুরহান উদ্দিনের অভিবাদন জ্ঞাত করিলাম। সেখ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উত্তর দিলেন যে তিনি অন্য কাহাকে অভিবাদন দিতে বলিয়াছেন। অনন্তর তথা হইতে গমন করিয়া তাঁহার দুই পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। ইহাঁরা উভয়ে বিদ্বান ও জ্ঞানী লোক। জ্যেষ্ঠের নাম মা-আ-জদ্দিন এবং কনিষ্ঠের নাম আলমউদ্দিন। জ্যেষ্ঠ মা-আ-জদ্দিন পিতার মৃত্যুর পর পিতৃস্থানে সমাসীন হন। ইহার পিতামহ সেখ ফরিদউদ্দিন সকরগঞ্জের † সমাধি জিয়ারত করিলাম। এই নগর হইতে যাত্রাকালে আলমউদ্দিন বলিলেন আমার পরম গুরু পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাও। সেই সময় তাঁহার পিতা বাটীর একটী উচ্চ ছাদের উপর সমাসীন ছিলেন। তাঁহার পরিধানে শ্বেতবস্ত্র ও

(১) পাকপটন হইতে প্রায় ২০ ক্রোশ দূরে ও জেলা মূলতানের পুরাতন সড়কের ধারে মৌজে দোহালুর নিকটে আবুবকর দাকাকী নামক জনেক মহাত্মার সমাধি রহিয়াছে। সম্ভবতঃ এই স্থানই আবিবকর হইবে। এখানে চৈত্র মাসে একটী মেলা হইয়া থাকে, প্রায় দশ বার হাজার লোকের সমাগম হয়। কিন্ত বতুতা এই মহাত্মার সমাধি সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই, সেই জন্য আমাদের সন্দেহ রহিয়া গেল। আবুবকর দকাকী একজন যোগিশ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। দুঃখের বিষয় যে তাঁহার সমাধি কোথায় আছে তাহার স্থান আজ পর্য্যন্ত কেহই নির্দ্দেশ করেন নাই।

(২) পাকপটনের প্রাচীন নাম অজধান। এই স্থানে বাবা ফরিদ-উদ্দিন সকরগঞ্জের সমাধি রহিয়াছে। ফরিদ এই স্থানকে পটন নামে অভিহিত করিতেন বলিয়া সম্রাট আকবর এই স্থানকে পাকপটন বলিতেন। অধুনা এই সহর শতদ্রু হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। প্রথমে এই সহরের পাদদেশ দিয়া শতদ্রু নদী প্রবাহিত হইত। যাত্রিগণ মুলতান হইতে দিল্লী আগমনকালে এই স্থানে নদী পার হইতেন। এক্ষণে পাকপটন জেলা মণ্টগমারীর অধীনস্থ একটী মহকুমা। প্রত্যেক বৎসর মহরম মাসে বাবা ফরিদের সমাধির নিকট একটী বড় মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় প্রায় ৬০।৭০ হাজার লোকের সমাগম হইয়া থাকে। সহরের লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। আইন আকবরীতে ইহাকে কেবল "পটন" ও ফেরেস্তা "পটন বাবা ফরিদ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

* যে সময়ে বতুতা এই সহরে আগমন করেন সেই সময়ে বাবা ফরিদউদ্দিন সকরগঞ্জের পৌত্র সেখ আলাউদ্দিন মওজ দেরিয়ারী পিতামহের স্থানে সমাসীন ছিলেন। বতুতা যে দুইজন পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহারা আলাউদ্দিনের পুত্র। সেখ আলাউদ্দিন সুলতান মহাম্মদ তোগলকের গুরু ছিলেন। ৭৩৪ হিজীরায় আলাউদ্দিনের মৃত্যু হইলে মহাম্মদ তোগলক মালেক কবুলাহ নামক জনেক কর্ম্মচারীর উপর আলাউদ্দিনের সমাধি নির্ম্মাণের ভার দেন। বতুতা ভ্রমবশত সেখ আলাউদ্দিনের নামের পরিবর্ত্তে সেখ ফরিদউদ্দিনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

† বাবা সেখ ফরিদউদ্দিন সকরগঞ্জ ৫৮৪ হিজীরাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৭০ হিজীরাতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মস্তকোপরি একটী বৃহৎ পাগড়ী, ঐ পাগড়ীর একাংশ ছাদের নিম্নে ঝুলিতেছিল। আমি তাঁহাকে অভিবাদন করতঃ গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তিনি আশীর্ব্বাদ করতঃ আমার জন্য মিছরি উপঢৌকন পাঠাইয়া দিলেন। আমি তাহা গ্রহণ করতঃ নগরাভ্যন্তরাভিমুখে গমন করিলাম।

৯। সতীদাহ। * তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ নগরাভ্যন্তরে গমন করিয়া দেখিতে পাইলাম কতকগুলি লোক দলবাঁধিয়া গমন করিতেছে। তাহাদের পশ্চাতে আমার সঙ্গীগণকেও দেখিলাম। তাহাদিগকে এরূপ দল বাঁধিয়া গমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম একজন হিন্দুর স্ত্রী স্বামীর মৃতদেহের সহিত দগ্ধ হইল। স্ত্রীলোকটী স্বামীর মৃতদেহের সহিত জড়িত হইয়া অগ্নিমধ্যে দগ্ধ হইয়াছিল। ইহারা তাহা দর্শনার্থে গমন করিয়াছিলেন।

আমি আরও একসময় একজন হিন্দু স্ত্রীলোককে বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতে দেখিয়া তাহার সঙ্গী লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম ঐ স্ত্রীলোকটীর স্বামী মরিয়া গিয়াছে, সে তাহার স্বামীর মৃতদেহের সহিত দগ্ধ হইবে। যে স্থানে চিতা প্রস্তুত হইয়াছে অশ্বপৃষ্ঠে তথায় গমন করিতেছে। আবরোহী † সহরে থাকা কালে আমি স্বচক্ষে যে সতীদাহ দেখিয়াছি তাহার বর্ণনা করিতেছি। এই সহরের অধিকাংশ লোক হিন্দু অধিবাসী। এখানকার কাজী সামারা সম্প্রদায়ের একজন মুসলমান। হিন্দু অধিবাসিগণ সর্ব্বদা কাজীর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকেন। সেই জন্য বাদশার কতকগুলি সৈন্য তথায় অবস্থান করিত। এক দিবস হিন্দুদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হয়। অনেক হিন্দু মারা যায়। তাহাদের মধ্যে তিন জন লোকের তিনটী স্ত্রী আপন আপন স্বামীর সহিত দগ্ধ হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সেই সংবাদ বাদশার নিকটে প্রেরণ করা হয়। প্রায় এক মাস গতে বাদশার হুকুম পঁহুছিলে তাহারা দগ্ধ হইবার তিন দিবস পূর্ব্বে নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ ও নানা প্রকার সুখাদ্য দ্রব্য আহার করিতে লাগিল। অন্যান্য হিন্দু স্ত্রীলোকগণ আসিয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ আমোদ আহ্লাদে যোগ দিতে লাগিল। চতুর্থ দিবসে নানা প্রকার বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া তিনজনে পৃথক পৃথক তিনটী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ বাম হস্তে একটী নারিকেল এবং অপর হস্তে একটী আরসি গ্রহণ করতঃ হৃষ্টচিত্তে বার বার মুখ দর্শন করিতে করিতে চিতাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তাহাদের আত্মীয়গণ অশ্ববলগা ধারণ করতঃ অতি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। অগ্র পশ্চাতে ঢাক ঢোল ইত্যাদি বাজিতেছিল। অন্যান্য হিন্দুগণ তাহাদের নিকটে গমন করিয়া আপন মৃত আত্মীয়কে তাহাদের অভিবাদন জানাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছিল। স্ত্রীলোকগণ "আচ্ছা" বলিয়া সম্মতি প্রকাশ করিতেছিল। ইহাদের সঙ্গে বাদসার সিপাহীগণও ছিল। দাহক্রিয়া দেখিবার জন্য আমরাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলাম। অবশেষে তিন ক্রোশ চলার পর একটী নিবিড় অন্ধকার বিশিষ্ট অরণ্যমধ্যে সকলে প্রবেশ করিলাম। অরণ্যমধ্যে চারিটী মন্দির। তৎপার্শ্বে অন্ধকার ও দুর্গন্ধময় জলে পরিপূর্ণ একটী কূপ রহিয়াছে। পৃথিবী মধ্যে কূপটি যে নরক তাহাতে সন্দেহ নাই। কূপের নিকটে একটী গর্ত্ত মধ্যে চিতা প্রস্তুত রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অগ্নিতে সর্ষপ তৈল দেওয়া হইতেছে। অগ্নি আরও অধিক ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। চারিজন লোক একটী কাঁথার চারিটী কোণ ধারণ করতঃ চিতাটী ঢাকিয়া রাখিয়াছে পাছে অগ্নি দেখিয়া স্ত্রীলোকেরা ভয় পায়। সেই সময় ঐ তিন জন

* আবুল ফজল লিখিয়াছেন হিন্দুশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে স্ত্রীর স্বামী মরিয়া যায় তাহার উচিত আহ্লাদের সহিত স্বামীসহ দগ্ধ হওয়া। কিন্তু সাধারণে তাহাকে ঐ কার্য্য হইতে বিরত রাখিবে। বিধবাগণ বৈধব্যাবস্থায় জীবিত থাকা অপেক্ষা স্বামীর সহিত দগ্ধ হওয়া মঙ্গল বিবেচনা করেন। আরও লিখিয়াছেন সতীদাহ হওয়ার পাঁচটী কারণ আছে যথা—১ম। অধিক ভাবনা উপস্থিত হইলে আত্মীয়গণ লইয়া গিয়া দাহ করিয়া ফেলে। ২য়। ভালবাসার নিমিত্ত স্বেচ্ছায় দগ্ধ হয়। ৩য়। লজ্জাবশত দগ্ধ হয়। ৪র্থ। সামাজিক রীতি অনুসারে। ৫ম। স্বামীর আত্মীয়গণ জোর পূর্ব্বক দাহ করিয়া ফেলেন। দ্বিতীয় কারণ ব্যতীত অন্যান্যরূপে দাহ করিতে হইলে বাদসার হুকুম লইতে হইত।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে লর্ডবেণ্টিঙ্ক এই প্রথা রহিত করেন।

† সিন্ধু প্রদেশে রোঢ়ী জেলার অধীনস্থ "ওবাওরদ" নামক যে একটী মহকুমা রহিয়াছে সম্ভবতঃ বতুতা ঐ স্থানকে আবরোহী নামে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রবাদ আছে এই সহর ৭৮৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপন করা হয়। ১৩৫২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত একটী মসজিদ আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে। সহরের লোকসংখ্যা প্রায় তিনসহস্র। আইন আকবরীতে সরকার মুলতানে "আবাওরা" নামক একটী স্থানের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ ইহাও হইলে হইতে পারে।

স্ত্রীলোক মধ্যে একজন আসিয়া তাহাদের নিকট হইতে কাঁথাটী কাড়িয়া লইয়া বলিতে লাগিল "আমরা জানি না কি যে উহার মধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছে? তবে কেন অনর্থক ঢাকিয়া রাখিয়াছ।?"

অবশেষে তিন জন স্ত্রীলোক অশ্ব হইতে অবতরণ করতঃ দেহ হইতে একে একে সমস্ত গহনাগুলি খুলিয়া ফেলিয়া একখানি মোটা কাপড় পরিধান করিয়া কুপ মধ্যে স্নান করিতে লাগিল। স্নান শেষ হইয়া গেলে একে একে চিতার নিকটবর্ত্তী হইয়া অগ্নিকে অভিবাদন করতঃ কুণ্ড-মধ্যে ঝম্প প্রদান করিতে লাগিল। এইরূপে প্রত্যেকে কুণ্ডমধ্যে ঝম্প দিল। ঢাক ঢোল দ্বিগুণ রবে বাজিতে লাগিল। দর্শকগণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কাহারও মুখে কথাটি পর্য্যন্ত নাই। মুহূর্ত্ত মধ্যে কার্য্য শেষ হইয়া গেল। তাহাদের আত্মীয়গণ বড় বড় কাষ্ঠখণ্ড ও তৈল অনবরত প্রদান করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া আমি অজ্ঞান হইয়া ঘোড়া হইতে পড়িতেছিলাম এমন সময় আমার সঙ্গী বুঝিতে পারিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলেন এবং জল দ্বারা মুখাদি ধৌত করিয়া দেন। অতঃপর আমরা তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলাম। হিন্দুজাতি এই প্রকারে আপন দেহ গঙ্গামধ্যেও ডুবাইয়া দেয়। গঙ্গানদী ইহাদের পরম তীর্থস্থান। তাহাদের বিশ্বাস স্বর্গের সহিত এই নদীর যোগ আছে। যদি কেহ গঙ্গামধ্যে ডুবিবার ইচ্ছা করে, তাহা হইলে পূর্ব্বেই সকলকে বলিয়া রাখে "আমি সাংসারিক কোন প্রকার কষ্টে পড়িয়া ডুবিতেছি তাহা নহে বরং গোস্বামীর (ঈশ্বরের) সন্তোষসাধনার্থে ডুবিতেছি।" সেই ব্যক্তি ডুবিয়া মরিয়া গেলে তাহার আত্মীয়গণ মৃতদেহ উঠাইয়া দাহ করিয়া ফেলে।

১০। সুরসতী (সরসাহ) *। অজধ্যান হইতে সুরসতী সহরে গমন করিলাম। সহরটী অতি বৃহৎ। এখানে ধান্য প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। চাউলও অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া বিখ্যাত। সামসদ্দিন বসুনজী প্রমুখাৎ শুনিলাম এখানকার চাউল দিল্লীতে অতি মহার্ঘ দরে বিক্রয় হইয়া থাকে।

১১। হানসী।* সুরসতী হইতে গমন করিয়া হানসীতে পঁহুছিলাম। সহরটী অতি সুন্দর। প্রবাদ আছে একজন হিন্দু রাজা এই সহর স্থাপন করিয়াছিলেন। কাজী কামালউদ্দিন ও তাহার ভ্রাতাদ্বয় (কতলু খাঁ ও সামসদ্দিন) এই সহরের অধিবাসী ছিলেন। কতলু খাঁ বাদশার শিক্ষক ছিলেন। সামসদ্দিন মক্কা গমন করিয়া তথায় বাস করেন এবং মক্কাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

১২। মসুদাবাদ ও পালম। † দুই দিবস চলার পর মসুদাবাদে পঁহুছিলাম। এই সহর হইতে দিল্লী ১০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বাদশা মালেক হোসাঙ্গকে হানসী ও মসুদাবাদ জায়গীর প্রদান করিয়াছেন। মসুদাবাদে

---

* পুরাতন ঐতিহাসিকগণ "সরসাহকে" সুরসতী নামে উল্লেখ করিতেন। আবুল ফজল সরসাহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই সহরটী সরস্বতী (ঘাঘরা) নদীর তটে রহিয়াছে বলিয়া ইহাকে সুরসতী বলিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন সারস নামে এক রাজা এখানে বাস করিতেন সেই জন্য ইহাকে সুরসতী নামে অভিহিত করিয়া থাকে কিন্তু ইহা মিথ্যা কথা। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে মেজর থারসবী ইহার নিকটে আর একটী সহর স্থাপন করেন, ইহাকেও ঐ নামে অভিহিত করা হয়। অধুনা ইহার লোক সংখ্যা ১৭ সহস্রের অধিক। ১০২৬ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে পুরাতন সহরটী ধ্বংস হইয়া যায়। নূতন সহরের উত্তরপূর্ব্ব কোণে পুরাতন সহরের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়। ঘাঘরা নদীর একটী শাখা ইহার পার্শ্বদিয়া প্রবাহিত হইতেছিল কিন্তু এখন ঐ শাখা বালুকাপূর্ণ হওয়ায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

বতুতার সময়ে এখানে ধান্য প্রচুর পরিমাণে জন্মিত। এখনও প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মে বটে কিন্তু চাউল তত ভাল হয় না। পূর্ব্বে এই সহরে সোবেদার অবস্থান করিতেন। ফিরোজসাহ হেসার সহর স্থাপন করিলে সোবেদার ঐ সহর পরিত্যাগ করিয়া হেসারে অবস্থান করিতেন।

* এই সহর হিসার জেলার অধীনস্থ একটী মহকুমা। লোক সংখ্যা প্রায় ১৬ হাজার। কথিত আছে অনঙ্গপাল এই সহরের স্থাপনকর্ত্তা। এখানকার কেল্লাটী পৃথ্বীরায়ের তৈয়ারী। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে সহরটী ধ্বংস হইয়া যায়। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে জর্জ টমাস পুনঃ-স্থাপন এবং কেল্লাটীর নঃ নির্ম্মাণ করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে এই সহর ইংরাজ অধিকারভুক্ত হয়। সুলতান মহমুদ গজনী, সুলতান মছউদ গজনী ও সাহাবুদ্দিন গোরির সময় কেল্লাটী দৃঢ় ছিল। আইন আকবরীতে এই কেল্লার উল্লেখ আছে।

† আকবর বাদশার সময়েও এই সহর বর্ত্তমান ছিল। আইন আকবরীতে উল্লেখ আছে যে এখানে একটী পুরাতন দুর্গও ছিল। হানসী হইতে মসুদাবাদ ৬০ মাইল দুরবর্ত্তী। এখন বোধ হইতেছে বতুতা ও তাঁহার সঙ্গিগণ প্রতিদিন ৩০ মাইল পথ গমন করিতেন। মসুদাবাদ, দিল্লীও সুরসতী পথে নাই। মালেক হোসেঙ্গ নামক যে ব্যক্তি খোদাওয়ান্দ জাদার অভ্যর্থনার্থে গমন করিয়াছিলেন, মসুদাবাদ ও হানসী তাঁহার জায়গীর ছিল বলিয়া তিনি ঐ পথে তাঁহাদিগকে লইয়া গিয়াছিলেন। "সামস সিরাজ" ফিরোজসাহের সিন্ধু হইতে দিল্লী আগমনের যে পথ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সাধারণতঃ রোহটাক, মহম ও হানসী মধ্য দিয়া যে সড়ক ছিল।

পালম। এই গ্রামটী এখনও দিল্লীর নিকটে রহিয়াছে।

পঁহুছিয়া শুনিতে পাইলাম বাদশা কনোজে গমন করিয়াছেন। দিল্লী হইতে কনোজ দশ মনজেল দূরে অবস্থিত। দিল্লী হইতে বাদশার মাতা মখদুমা জাঁহান ও মন্ত্রি খাজে জাঁহান আহাম্মদ আমাদের অভ্যর্থনার্থে সেখ বোসতানী, সেরিফ মাজেন্দ্রানী, জহীরউদ্দিন জনজানী প্রভৃতি অনেক লোককে প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদের মসুদাবাদে পঁহুছা সংবাদ ডাকযোগে বাদশার নিকট প্রেরণ করা হয় এবং তাঁহার উত্তর না আসা পর্য্যন্ত ৩ দিবস তথায় অবস্থান করিতে হইয়াছিল। কনোজ হইতে সংবাদ পঁহুছিল আমাদিগকে দিল্লীঅভিমুখে গমন করিবার আজ্ঞা দেওয়া হয়। মসুদাবাদ হইতে গমন করিয়া পালম নামক একটী গণ্ডগ্রামে উপস্থিত হইলাম। বাদশা তাঁহার সহচর নাসিরুদ্দিনকে এই গ্রামটী জায়গীর প্রদান করিয়াছেন।

মহাম্মদ হাফিজল হোসেন।

গোরা।

৪০

বরদাসুন্দরী তাঁহার ব্রাহ্মিকাবন্ধুদিগকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহাদের ছাতের উপরেই সভা হইত। হরিমোহিনী তাঁহার স্বাভাবিক গ্রাম্য সরলতার সহিত মেয়েদের আদর অভ্যর্থনা করিতে চেষ্টা করিতেন কিন্তু ইহারা যে তাঁহাকে অবজ্ঞা করে তাহা তাঁহার কাছে গোপন রহিল না। এমন কি, হিন্দুদের সামাজিক আচার ব্যবহার লইয়া তাঁহার সমক্ষেই বরদাসুন্দরী তীব্র সমালোচনা উত্থাপিত করিতেন এবং অনেক রমণী হরিমোহিনীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া সেই সমালোচনায় যোগ দিতেন।

সুচরিতা তাহার মাসীর কাছে থাকিয়া এই সমস্ত আক্রমণ নীরবে সহ্য করিত। কেবল, সেও যে তাহার মাসীর দলে, ইহাই সে যেন গায়ে পড়িয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিত। যেদিন আহারের আয়োজন থাকিত সেদিন সুচরিতাকে সকলে খাইতে ডাকিলে সে বলিত—"না, আমি খাইনে!"

"সে কি! তুমি বুঝি আমাদের সঙ্গে বসে খাবে না!"

"না।"

বরদাসুন্দরী বলিতেন, "আজকাল সুচরিতা যে মস্ত হিঁদু হয়ে উঠেচেন তা বুঝি জান না। উনি যে আমাদের ছোঁয়া খান না!"

"সুচরিতাও হিঁদু হয়ে উঠ্‌লো! কালে কালে কতই যে দেখতে হবে তাই ভাবি।"

হরিমোহিনী ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিতেন, "রাধারাণী, মা, যাও মা। তুমি খেতে যাও মা!"

দলের লোকের কাছে যে সুচরিতা তাঁহার জন্য এমন করিয়া খোঁটা খাইতেছে ইহা তাঁহার কাছে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সুচরিতা অটল হইয়া থাকিত। একদিন কোনো ব্রাহ্মমেয়ে কৌতূহল বশত হরিমোহিনীর ঘরের মধ্যে জুতা লইয়া প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে সুচরিতা পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"ও ঘরে যেয়ো না।"

"কেন?"

"ও ঘরে ওঁর ঠাকুর আছে।"

"ঠাকুর আছে! তুমি বুঝি রোজ ঠাকুর পুজো কর।"

হরিমোহিনী বলিলেন—"হাঁ, মা, পুজো করি বই কি!"

"ঠাকুরকে তোমার ভক্তি হয়?"

"পোড়া কপাল আমার! ভক্তি আর কই হল? ভক্তি হলে ত বেঁচেই যেতুম!"

সেদিন ললিতা উপস্থিত ছিল। সে মুখ লাল করিয়া প্রশ্নকারিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যাঁর উপাসনা কর তাঁকে ভক্তি কর?"

"বাঃ ভক্তি করিনে ত কি।"

ললিতা সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, "ভক্তি ত করই না, আর, ভক্তি যে কর না, সেটা তোমার জানাও নেই।"

সুচরিতা যাহাতে আচার ব্যবহারে তাহার দল হইতে পৃথক না হয় সেজন্য হরিমোহিনী অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

ইতিপূর্ব্বে হারান বাবুতে বরদাসুন্দরীতে ভিতরে ভিতরে একটা বিরোধের ভাবই ছিল। বর্ত্তমান ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে খুব মিল হইল। বরদাসুন্দরী কহিলেন, যিনি যাই বলুন না কেন ব্রাহ্মসমাজের আদর্শকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য যদি কাহারো দৃষ্টি থাকে ত সে পানু বাবুর। হারান বাবুও, ব্রাহ্মপরিবারকে সর্ব্বপ্রকারে নিষ্কলঙ্ক

রাখিবার প্রতি বরদাসুন্দরীর একান্ত বেদনাপূর্ণ সচেতনতাকে ব্রাহ্মগৃহিণী মাত্রেরই পক্ষে একটি সুদৃষ্টান্ত বলিয়া সকলের কাছে প্রকাশ করিলেন। তাঁহার এই প্রশংসার মধ্যে পরেশ বাবুর প্রতি বিশেষ একটু খোঁচা ছিল।

হারান বাবু একদিন পরেশ বাবুর সম্মুখেই সুচরিতাকে কহিলেন, "শুনলুম না কি আজকাল তুমি ঠাকুরের প্রসাদ খেতে আরম্ভ করেচ?"

সুচরিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল কিন্তু যেন সে কথাটা শুনিতেই পাইল না এমনিভাবে টেবিলের উপরকার দোয়াতদানিতে কলমগুলা গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। পরেশ বাবু একবার করুণনেত্রে সুচরিতার মুখের দিকে চাহিয়া হারান বাবুকে কহিলেন, "পানুবাবু, আমরা যা কিছু খাই সবই ত ঠাকুরের প্রসাদ।"

হারান বাবু কহিলেন, "কিন্তু সুচরিতা যে আমাদের ঠাকুরকে পরিত্যাগ করবার উদ্যোগ করচেন।"

পরেশ বাবু কহিলেন, "তাও যদি সম্ভব হয় তবে তা নিয়ে উৎপাত করলে কি তার কোনো প্রতিকার হবে?"

হারান বাবু কহিলেন, "স্রোতে যে লোক ভেসে যাচ্চে তাকে কি ডাঙায় তোলবার চেষ্টাও করতে হবে না?"

পরেশ বাবু কহিলেন—"সকলে মিলে তার মাথার উপর ঢেলা ছুঁড়ে মারাকেই ডাঙায় তোলবার চেষ্টা বলা যায় না। পানুবাবু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমি এতটুকু বেলা থেকেই সুচরিতাকে দেখে আসচি। ও যদি জলেই পড়ত তাহলে আমি আপনাদের সকলের আগেই জানতে পারতুম এবং আমি উদাসীন থাকতুম না।"

হারান বাবু কহিলেন—"সুচরিতা ত এখানেই রয়েচেন। আপনি ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন না। শুনতে পাই উনি সকলের ছোঁয়া খান না। সে কথা কি মিথ্যা?"

সুচরিতা দোয়াতদানের প্রতি অনাবশ্যক মনোযোগ দূর করিয়া কহিল, "বাবা জানেন আমি সকলের ছোঁয়া খাইনে। উনি যদি আমার এই আচরণ সহ্য করে থাকেন তাহলেই হল। আপনাদের যদি ভাল না লাগে আপনারা যত খুসি আমায় নিন্দা করুন কিন্তু বাবাকে বিরক্ত করচেন কেন? উনি আপনাদের কত ক্ষমা করে চলেন তা আপনারা জানেন? এ কি তারই প্রতিফল?"

হারান বাবু আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—"সুচরিতাও আজকাল কথা কহিতে শিখিয়াছে!"

পরেশ বাবু শান্তিপ্রিয় লোক; তিনি নিজের বা পরের সম্বন্ধে অধিক আলোচনা ভালো বাসেন না। এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজে তিনি কোনো কাজে কোনো প্রধান পদ গ্রহণ করেন নাই; নিজেকে কাহারো লক্ষ্যগোচর না করিয়া নিভৃতে জীবন যাপন করিয়াছেন। হারান বাবু পরেশের এই ভাবকেই উৎসাহহীনতা ও ঔদাসীন্য বলিয়া গণ্য করিতেন, এমন কি, পরেশ বাবুকে তিনি ইহা লইয়া ভর্ৎসনাও করিয়াছেন। ইহার উত্তরে পরেশ বাবু বলিয়াছিলেন, ঈশ্বর, সচল এবং অচল এই দুই শ্রেণীর পদার্থই সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি নিতান্তই অচল। আমার মত লোকের দ্বারা যে কাজ পাওয়া সম্ভব ঈশ্বর তাহা আদায় করিয়া লইবেন। যাহা সম্ভব নহে তাহার জন্য চঞ্চল হইয়া কোনো লাভ নাই। আমার বয়স যথেষ্ট হইয়াছে; আমার কি শক্তি আছে আর কি নাই তাহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। এখন আমাকে ঠেলাঠেলি করিয়া কোনো ফল পাওয়া যাইবে না।

হারান বাবুর ধারণা ছিল তিনি অসাড় হৃদয়েও উৎসাহ সঞ্চার করিতে পারেন; জড়চিত্তকে কর্ত্তব্যের পথে ঠেলিয়া দেওয়া এবং স্খলিতজীবনকে অনুতাপে বিগলিত করা একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা; তাঁহার অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং একাগ্র শুভ ইচ্ছাকে কেহই অধিকদিন প্রতিরোধ করিতে পারে না এইরূপ তাঁহার বিশ্বাস। তাঁহার সমাজের লোকের ব্যক্তিগত চরিত্রে যে সকল ভাল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তিনি নিজেকেই কোনো না কোনো প্রকারে তাহার প্রধান কারণ বলিয়া নিশ্চয় স্থির করিয়াছেন। তাঁহার অলক্ষ্য প্রভাবও যে ভিতরে ভিতরে কাজ করে ইহাতে তাঁহার সন্দেহ নাই। এ পর্য্যন্ত সুচরিতাকে যখনি তাঁহার সম্মুখে কেহ বিশেষরূপে প্রশংসা করিয়াছে তিনি এমনভাব ধারণ করিয়াছেন যেন সে প্রশংসা সম্পূর্ণই তাঁহার। তিনি উপদেশ, দৃষ্টান্ত এবং সঙ্গতেজের দ্বারা সুচরিতার চরিত্রকে এমন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন যে এই সুচরিতার জীবনের দ্বারাই লোক-সমাজে তাঁহার আশ্চর্য্য প্রভাব প্রমাণিত হইবে এইরূপ তাঁহার আশা ছিল।

সেই সুচরিতার শোচনীয় পতনে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁহার গর্ব্ব কিছুমাত্র হ্রাস হইল না তিনি সমস্ত দোষ চাপাইলেন পরেশ বাবুর স্কন্ধে। পরেশ বাবুকে লোকে বরাবর প্রশংসা করিয়া আসিয়াছে কিন্তু হারান বাবু কখনো তাহাতে যোগ দেন নাই; ইহাতেও তাঁহার কতদূর প্রাজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা এইবার সকলে বুঝিতে পারিবে এইরূপ তিনি আশা করিতেছেন।

হারান বাবুর মত লোক আর সকলি সহ্য করিতে পারেন কিন্তু যাহাদিগকে বিশেষরূপে হিতপথে চালাইতে চেষ্টা করেন তাহারা যদি নিজের বুদ্ধি অনুসারে স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করে তবে সে অপরাধ তিনি কোনোমতেই ক্ষমা করিতে পারেন না। সহজে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে অসাধ্য; যতই দেখেন তাঁহার উপদেশে ফল হইতেছে না ততই তাঁহার জেদ বাড়িয়া যাইতে থাকে; তিনি ফিরিয়া ফিরিয়া বারম্বার আক্রমণ করিতে থাকেন। কল যেমন দম না ফুরাইলে থামিতে পারে না তিনিও তেমনি কোনোমতেই নিজেকে সম্বরণ করিতে পারেন না; বিমুখ কর্ণের কাছে এক কথা সহস্রবার আবৃত্তি করিয়াও হার মানিতে চাহেন না।

ইহাতে সুচরিতা বড় কষ্ট পাইতে লাগিল,—নিজের জন্য নহে, পরেশ বাবুর জন্য। পরেশ বাবু যে ব্রাহ্মসমাজের সকলের সমালোচনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছেন এই অশান্তি নিবারণ করা যাইবে কি উপায়ে? অপর পক্ষে সুচরিতার মাসিও প্রতিদিন বুঝিতে পারিতেছেন যে, তিনি একান্ত নম্র হইয়া নিজেকে যতই আড়ালে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন ততই এই পরিবারের পক্ষে উপদ্রব স্বরূপ হইয়া উঠিতেছেন। এজন্য তাহার মাসীর অত্যন্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ সুচরিতাকে প্রত্যহ দগ্ধ করিতে লাগিল। এই সঙ্কট হইতে উদ্ধারের যে পথ কোথায় তাহা সুচরিতা কোনোমতেই ভাবিয়া পাইল না।

এদিকে সুচরিতার শীঘ্র বিবাহ দিয়া ফেলিবার জন্য বরদাসুন্দরী পরেশ বাবুকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন "সুচরিতার দায়িত্ব আর আমাদের বহন করা চলে না, সে এখন নিজের মতে চলতে আরম্ভ করেছে। তার বিবাহের যদি দেরি থাকে তাহলে মেয়েদের নিয়ে আমি অন্য কোথাও যাব—সুচরিতার অদ্ভুত দৃষ্টান্ত মেয়েদের পক্ষে বড়ই অনিষ্টের কারণ হচ্চে। দেখো এর জন্য পরে তোমাকে অনুতাপ করতে হবেই। ললিতা আগেত এরকম ছিল না; এখন ও যে আপন ইচ্ছামত যা খুসি একটা কাণ্ড করে বসে কাকেও মানে না তার মূলে কে? সেদিন যে ব্যাপারটা বাধিয়ে বসল, যার জন্য আমি লজ্জায় মরে যাচ্চি; তুমি কি মনে কর তার মধ্যে সুচরিতার কোনো হাত ছিল না? তুমি নিজের মেয়েদের চেয়ে সুচরিতাকে বরাবর বেশি ভালবাস তাতে আমি কোনোদিন কোনো কথা বলিনি কিন্তু আর চলে না সে আমি স্পষ্টই বলে রাখ্‌চি।"

সুচরিতার জন্য নহে কিন্তু পারিবারিক অশান্তির জন্য পরেশ বাবু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বরদাসুন্দরী যে উপলক্ষ্যটি পাইয়া বসিয়াছেন ইহা লইয়া তিনি যে হুলস্থূল কাণ্ড বাধাইয়া বসিবেন এবং যতই দেখিবেন আন্দোলনে কোনো ফল হইতেছে না ততই দুর্ব্বার হইয়া উঠিতে থাকিবেন ইহাতে তাঁহার কোনো সন্দেহ ছিল না। যদি সুচরিতার বিবাহ সত্বর সম্ভবপর হয় তবে বর্ত্তমান অবস্থায় সুচরিতার পক্ষেও তাহা শান্তিজনক হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি বরদাসুন্দরীকে বলিলেন, "পানু বাবু যদি সুচরিতাকে সম্মত করতে পারেন তাহলে আমি বিবাহ সম্বন্ধে কোনো আপত্তি করব না।"

বরদাসুন্দরী কহিলেন—"আবার কতবার করে সম্মত করতে হবে? তুমি ত অবাক্ করলে! এত সাধাসাধিই বা কেন? পানু বাবুর মত পাত্র উনি পাবেন কোথায় তাই জিজ্ঞাসা করি। তুমি রাগ কর আর যাই কর সত্যি কথা বলতে কি, সুচরিতা পানু বাবুর যোগ্য মেয়ে নয়!"

পরেশ বাবু কহিলেন, "পানু বাবুর প্রতি সুচরিতার মনের ভাব যে কি তা আমি স্পষ্ট করে বুঝ্‌তে পারিনি। অতএব তারা নিজেদের মধ্যে যতক্ষণ কথাটা পরিষ্কার করে না নেবে ততক্ষণ আমি এবিষয়ে কোনো প্রকারে হস্তক্ষেপ করতে পারব না।"

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "বুঝ্‌তে পারনি! এতদিন পরে স্বীকার করলে! ঐ মেয়েটিকে বোঝা বড় সহজ নয়! ও বাইরে এক রকম ভিতরে এক রকম।"

বরদাসুন্দরী হারান বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

সেদিন কাগজে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান দুর্গতির আলোচনা ছিল। তাহার মধ্যে পরেশ বাবুর পরিবারের প্রতি এমন ভাবে লক্ষ্য করা ছিল যে, কোনো নাম না থাকা সত্ত্বেও আক্রমণের বিষয় যে কে তাহা সকলের কাছেই বেশ স্পষ্ট হইয়াছিল; এবং লেখক যে কে তাহাও লেখার ভঙ্গীতে অনুমান করা কঠিন হয় নাই। কাগজখানার কোনোমতে চোখ বুলাইয়াই সুচরিতা তাহা কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িতেছিল। ছিঁড়িতে ছিড়িতে কাগজের অংশগুলিকে যেন পরমাণুতে পরিণত করিবার জন্য তাহার রোখ চড়িয়া যাইতেছিল।

এমন সময় হারান বাবু ঘরে প্রবেশ করিয়া সুচরিতার পাশে একটা চৌকি টানিয়া বসিলেন। সুচরিতা একবার মুখ তুলিয়াও চাহিল না, সে যেমন কাগজ ছিঁড়িতেছিল তেমনি ছিঁড়িতেই লাগিল।

হারানবাবু কহিলেন, "সুচরিতা, আজ একটা গুরুতর কথা আছে। আমার কথায় একটু মন দিতে হবে।"

সুচরিতা কাগজ ছিঁড়িতেই লাগিল। নখে ছেঁড়া যখন অসম্ভব হইল তখন থলে হইতে কাঁচি বাহির করিয়া কাঁচিটা দিয়া কাটিতে লাগিল। ঠিক এই মুহূর্ত্তেই ললিতা ঘরে প্রবেশ করিল।

হারান বাবু কহিলেন, "ললিতা, সুচরিতার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।"

ললিতা ঘর হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই সুচরিতা তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিল। ললিতা কহিল, "তোমার সঙ্গে পানু বাবুর যে কথা আছে!" সুচরিতা তাহার কোনো উত্তর না করিয়া ললিতার আঁচল চাপিয়াই রহিল—তখন ললিতা সুচরিতার আসনের এক পাশে বসিয়া পড়িল।

হারান বাবু কোনো বাধাতেই দমিবার পাত্র নহেন। তিনি আর ভূমিকা মাত্র না করিয়া একেবারে কথাটা পাড়িয়া বসিলেন। কহিলেন, "আমাদের বিবাহে আর বিলম্ব হওয়া আমি উচিত মনে করিনে। পরেশ বাবুকে জানিয়েছিলাম; তিনি বল্লেন, তোমার সম্মতি পেলেই আর কোনো বাধা থাকবে না। আমি স্থির করেছি, আগামী রবিবারের পরের রবিবারেই—"

সুচরিতা কথা শেষ করিতে না দিয়াই কহিল, "না।"

সুচরিতার মুখে এই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্ট এবং উদ্ধত "না" শুনিয়া হারান বাবু থমকিয়া গেলেন। সুচরিতাকে তিনি অত্যন্ত বাধ্য বলিয়া জানিতেন। সে যে একমাত্র "না" বাণের দ্বারা তাঁহার প্রস্তাবটাকে এক মুহূর্ত্তে অর্দ্ধপথে ছেদন করিয়া ফেলিবে ইহা তিনি মনেও করেন নাই। তিনি বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"না! না মানে কি? তুমি আরো দেরি করতে চাও?"

সুচরিতা আবার কহিল, "না।"

হারান বাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "তবে?"

সুচরিতা মাথা নত করিয়া কহিল, "বিবাহে আমার মত নেই।"

হারান বাবু হতবুদ্ধির ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মত নেই? তার মানে?"

ললিতা ঠোকর দিয়া কহিল, "পানু বাবু, আপনি আজ বাংলা ভাষা ভুলে গেলেন না কি?"

হারান বাবু কঠোর দৃষ্টি দ্বারা ললিতাকে আঘাত করিয়া কহিলেন, "বরঞ্চ মাতৃভাষা ভুলে গেছি একথা স্বীকার করা সহজ কিন্তু যে মানুষের কথায় বরাবর শ্রদ্ধা করে এসেছি তাকে ভুল বুঝেছি একথা স্বীকার করা সহজ নয়।"

ললিতা কহিল, "মানুষকে বুঝ্‌তে সময় লাগে, আপনার সম্বন্ধেও হয় ত সেকথা খাটে!"

হারান বাবু কহিলেন, "প্রথম থেকে আজ পর্য্যন্ত আমার কথার বা মতের বা ব্যবহারের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি—আমি আমাকে ভুল বোঝবার কোনো উপলক্ষ্য কাউকে দিইনি একথা আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি—সুচরিতাই বলুন আমি ঠিক বলচি কি না!"

ললিতা আবার একটা কি উত্তর দিতে যাইতেছিল—সুচরিতা তাহাকে থামাইয়া দিয়া কহিল—"আপনি ঠিক বলচেন! আপনাকে আমি কোনো দোষ দিতে চাইনে।"

হারান বাবু কহিলেন, "দোষ যদি না দেবে তবে আমার প্রতি অন্যায়ই বা করবে কেন?"

সুচরিতা দৃঢ়স্বরে কহিল, "যদি একে অন্যায় বলেন তবে আমি অন্যায়ই করব—কিন্তু"—

বাহির হইতে ডাক আসিল, "দিদি, ঘরে আছেন?"

সুচরিতা উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি কহিল—"আসুন্, বিনয় বাবু, আসুন্!"

"ভুল করচেন দিদি, বিনয় বাবু আসেননি, আমি বিনয় মাত্র, আমাকে সমাদর করে লজ্জা দেবেন না"—বলিয়া বিনয় ঘরে প্রবেশ করিয়াই হারান বাবুকে দেখিতে পাইল। হারান বাবুর মুখের অপ্রসন্নতা লক্ষ্য করিয়া কহিল—"অনেক দিন আসিনি বলে রাগ করেচেন বুঝি!"

হারান বাবু পরিহাসে যোগ দিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "রাগ করবারই কথা বটে! কিন্তু আজ আপনি একটু অসময়ে এসেচেন—সুচরিতার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ কথা হচ্ছিল!"

বিনয় শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিল—"ঐ দেখুন, আমি কখন্ এলে যে অসময়ে আসা হয় না তা আমি আজ পর্য্যন্ত বুঝতেই পারলুম না! এই জন্যই আস্‌তে সাহসই হয় না!" বলিয়া বিনয় বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিল।

সুচরিতা কহিল "বিনয় বাবু, যাবেন না। আমাদের যা কথা ছিল শেষ হয়ে গেছে। আপনি বসুন্।"

বিনয় বুঝিতে পারিল সে আসাতে সুচরিতা একটা বিশেষ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। খুসি হইয়া একটা চৌকিতে বসিয়া পড়িল এবং কহিল "আমাকে প্রশ্রয় দিলে আমি কিছুতেই সাম্‌লাতে পারিনে। আমাকে বস্‌তে বল্‌লে আমি বসবই এই রকম আমার স্বভাব। অতএব, দিদির প্রতি নিবেদন এই যে, এসব কথা যেন বুঝে সুঝে বলেন, নইলে বিপদে পড়বেন।"

হারান বাবু কোনো কথা না বলিয়া আসন্ন ঝড়ের মত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তিনি নীরবে প্রকাশ করিলেন, আচ্ছা বেশ, আমি অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলাম—আমার যা কথা আছে তাহা শেষ পর্য্যন্ত বলিয়া তবে আমি উঠিব।

দ্বারের বাহির হইতে বিনয়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়াই ললিতার বুকের ভিতরকার সমস্ত রক্ত যেন চমক খাইয়া উঠিয়াছিল। সে বহুকষ্টে আপনার স্বাভাবিক ভাব রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কিছুতেই পারিল না। বিনয় যখন ঘরে প্রবেশ করিল ললিতা বেশ সহজে তাহার পরিচিত বন্ধুর মত তাহাকে কোনো কথা বলিতে পারিল না। কোন্ দিকে চাহিবে, নিজের হাতখানা লইয়া কি করিবে সে যেন একটা ভাবনার বিষয় হইয়া পড়িল। একবার উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সুচরিতা কোনমতেই তাহার কাপড় ছাড়িল না।

বিনয়ও যাহা কিছু কথাবার্ত্তা সমস্ত সুচরিতার সঙ্গেই চালাইল—ললিতার নিকট কোনো কথা ফাঁদা তাহার মত বাক্‌পটু লোকের কাছেও আজ শক্ত হইয়া উঠিল। এই জন্যই সে যেন ডবল্ জোরে সুচরিতার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল—কোথাও কোনো ফাঁক্ পড়িতে দিল না।

কিন্তু হারান বাবুর কাছে ললিতা ও বিনয়ের এই নূতন সঙ্কোচ অগোচর রহিল না। যে ললিতা তাঁহার সম্বন্ধে আজকাল এমন প্রখর ভাবে প্রগল্‌ভা হইয়া উঠিয়াছে সে আজ বিনয়ের কাছে এমন সঙ্কুচিত ইহা দেখিয়া তিনি মনে মনে জ্বলিতে লাগিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের লোকের সহিত কন্যাদের অবাধ পরিচয়ের অবকাশ দিয়া পরেশ বাবু যে নিজের পরিবারকে কিরূপ কদাচারের মধ্যে লইয়া যাইতেছেন তাহা মনে করিয়া পরেশ বাবুর প্রতি তাঁহার ঘৃণা আরো বাড়িয়া উঠিল এবং পরেশ বাবুকে যেন একদিন এজন্য বিশেষ অনুতাপ করিতে হয় এই কামনা তাঁহার মনের মধ্যে অভিশাপের মত জাগিতে লাগিল।

অনেক ক্ষণ এই ভাবে চলিলে পর স্পষ্টই বুঝা গেল হারান বাবু উঠিবেন না। তখন সুচরিতা বিনয়কে কহিল, "মাসীর সঙ্গে অনেক দিন আপনার দেখা হয়নি। তিনি আপনার কথা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন। একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন না?"

বিনয় চৌকি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"মাসির কথা আমার মনে ছিল না এমন অপবাদ আমাকে দেবেন না।"

সুচরিতা যখন বিনয়কে তাহার মাসির কাছে লইয়া গেল তখন ললিতা উঠিয়া কহিল, "পানু বাবু, আমার সঙ্গে আপনার বোধ হয় বিশেষ কোনো প্রয়োজন নেই।"

হারানবাবু কহিলেন "না। তোমার বোধ হয় অন্যত্র বিশেষ প্রয়োজন আছে। তুমি যেতে পার!"

ললিতা কথাটার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিল। সে তৎক্ষণাৎ উদ্ধত ভাবে মাথা তুলিয়া ইঙ্গিতকে স্পষ্ট করিয়া দিয়া কহিল—"বিনয় বাবু আজ অনেক দিন পরে এসেছেন, তাঁর

সঙ্গে গল্প করতে যাচ্চি। ততক্ষণ আপনি নিজের লেখা যদি পড়তে চান তাহলে—না, ঐ যা, সে কাগজখানা দিদি দেখ্‌চি কুটিকুটি করে ফেলেচেন। পরের লেখা যদি সহ্য করতে পারেন তাহলে এইগুলি দেখ্‌তে পারেন।"

বলিয়া কোণের টেবিল হইতে সযত্নরক্ষিত গোরার রচনাগুলি আনিয়া হারান বাবুর সম্মুখে রাখিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

হরিমোহিনী বিনয়কে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিলেন। কেবল যে এই প্রিয়দর্শন যুবকের প্রতি স্নেহবশত তাহা নহে। এবাড়িতে বাহিরের লোক যে কেহ হরিমোহিনীর কাছে আসিয়াছে সকলেই তাঁহাকে যেন কোন্ এক ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর মত দেখিয়াছে। তাহারা কলিকাতার লোক, প্রায় সকলেই ইংরেজি ও বাংলা লেখাপড়ায় তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—তাহাদের দূরত্ব ও অবজ্ঞার আঘাতে তিনি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিলেন। বিনয়কে তিনি আশ্রয়ের মত অনুভব করিলেন। বিনয়ও কলিকাতার লোক, হরিমোহিনী শুনিয়াছেন লেখাপড়াতেও সে বড় কম নয়, অথচ এই বিনয় তাঁহাকে কিছুমাত্র অশ্রদ্ধা করে না; তাঁহাকে আপন লোকের মত দেখে ইহাতে তাঁহার আত্মসম্মান একটা নির্ভর পাইল। বিশেষ করিয়া এই জন্যই অল্প পরিচয়েই বিনয় তাঁহার নিকট আত্মীয়ের স্থান লাভ করিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল বিনয় তাঁহার বর্ম্মের মত হইয়া অন্য লোকের ঔদ্ধত্য হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবে। এবাড়িতে তিনি অত্যন্ত বেশি প্রকাশ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন—বিনয় যেন তাঁহার আবরণের মত হইয়া তাঁহাকে আড়াল করিয়া রাখিবে।

হরিমোহিনীর কাছে বিনয় যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই ললিতা সেখানে কখনই সহজে যাইতনা—কিন্তু আজ হারান বাবুর গুপ্ত বিদ্রূপের আঘাতে সে সমস্ত সঙ্কোচ ছিন্ন করিয়া যেন জোর করিয়া উপরের ঘরে গেল। শুধু গেল তাহা নহে, গিয়াই বিনয়ের সঙ্গে অজস্র কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিল। তাহাদের সভা খুব জমিয়া উঠিল; এমন কি, মাঝে মাঝে তাহাদের হাসির শব্দ নীচের ঘরে একাকী-আসীন হারান বাবুর "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া" বিদ্ধ করিতে লাগিল। তিনি বেশিক্ষণ একলা থাকিতে পারিলেন না, বরদাসুন্দরীর সঙ্গে আলাপ করিয়া মনের আক্ষেপ নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। বরদাসুন্দরী শুনিলেন যে সুচরিতা হারান বাবুর সঙ্গে বিবাহে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছে। শুনিয়া তাঁহার পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব হইল। তিনি কহিলেন, "পানু বাবু, আপনি ভালমানুষি করলে চল্‌বে না! ও যখন বারবার সম্মতি প্রকাশ করেচে এবং ব্রাহ্মসমাজসুদ্ধ সকলেই যখন এই বিয়ের জন্য অপেক্ষা করে আছে তখন ও আজ মাথা নাড়ল বলেই যে সমস্ত উল্‌টে যাবে এ কখনই হতে দেওয়া চল্‌বে না। আপনার দাবি আপনি কিছুতেই ছাড়বেন না বলে রাখ্‌চি, দেখি ও কি করতে পারে!"

এ সম্বন্ধে হারান বাবুকে উৎসাহ দেওয়া বাহুল্য—তিনি তখন কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়া মাথা তুলিয়া মনে মনে বলিতেছিলেন, "অন্ প্রিন্সিপ্‌ল্" এ দাবি ছাড়া চলিবে না—আমার পক্ষে সুচরিতাকে ত্যাগ করা বেশি কথা নয় কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের মাথা হেঁট করিয়া দিতে পারিব না!—

বিনয় হরিমোহিনীর সহিত আত্মীয়তাকে পাকা করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে আহারের আবদার করিয়া বসিয়াছিল। হরিমোহিনী তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হইয়া একটি ছোট থালায় কিছু ভিজানো ছোলা, ছানা, মাখন, একটু চিনি, একটি কলা, এবং কাঁসার বাটিতে কিছু দুধ আনিয়া সযত্নে বিনয়ের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন। বিনয় হাসিয়া কহিল, অসময়ে ক্ষুধা জানাইয়া মাসিকে বিপদে ফেলিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আমিই ঠকিলাম—এই বলিয়া খুব আড়ম্বর করিয়া বিনয় আহারে বসিয়াছে এমন সময় বরদাসুন্দরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিনয় তাহার থালার উপরে যথাসম্ভব নত হইয়া নমস্কারের চেষ্টা করিয়া কহিল—"অনেকক্ষণ নীচে ছিলুম; আপনার সঙ্গে দেখা হল না।" বরদাসুন্দরী তাহার কোনো উত্তর না করিয়া সুচরিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "এই যে ইনি এখানে! আমি যা ঠাউরেছিলুম তাই! সভা বসেচে! আমোদ করচেন! এদিকে বেচারা হারান বাবু সকাল থেকে ওঁর জন্যে অপেক্ষা করে বসে রয়েচেন, যেন তিনি ওঁর বাগানের মালী! ছেলেবেলা থেকে ওদের মানুষ করলুম—কই বাপু, এতদিন ত ওদের এরকম

ব্যবহার কখনো দেখিনি। কে জানে আজকাল এসব শিক্ষা কোথা থেকে পাচ্চে! আমাদের পরিবারে যা কখনো ঘটতে পারত না আজকাল তাই আরম্ভ হয়েচে—সমাজের লোকের কাছে যে আমাদের মুখ দেখাবার জো রইল না! এতদিন ধরে এত করে যা শেখানো গেল সে সমস্তই দুদিনে বিসর্জ্জন দিলে! এ কি সব কাণ্ড!"

হরিমোহিনী শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া সুচরিতাকে কহিলেন, "নীচে কেউ বসে আছেন আমি ত জান্‌তেম না! বড় অন্যায় হয়ে গেছে ত! মা, যাও তুমি শীঘ্র যাও! আমি অপরাধ করে ফেলেচি!"

অপরাধ যে হরিমোহিনীর লেশমাত্র নহে ইহাই বলিবার জন্য ললিতা মুহূর্ত্তের মধ্যে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল। সুচরিতা গোপনে সবলে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে নিরস্ত করিল এবং কোনো প্রতিবাদমাত্র না করিয়া নীচে চলিয়া গেল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিনয় বরদাসুন্দরীর স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিল। বিনয় যে তাঁহাদের পরিবারের প্রভাবে পড়িয়া ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবে এ সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। বিনয়কে তিনি যেন নিজের হাতে গড়িয়া তুলিতেছেন বলিয়া একটা বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করিতেছিলেন; সে গর্ব্ব তিনি তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে কারো কারো কাছে প্রকাশও করিয়াছিলেন। সেই বিনয়কে আজ শত্রুপক্ষের শিবিরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তাঁহার মনের মধ্যে যেন একটা দাহ উপস্থিত হইল এবং নিজের কন্যা ললিতাকে বিনয়ের পুনঃপতনের সহায়কারী দেখিয়া তাঁহার চিত্তজ্বালা যে আরো দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল সে কথা বলা বাহুল্য। তিনি রুক্ষ স্বরে কহিলেন, "ললিতা, এখানে কি তোমার কোনো কাজ আছে?"

ললিতা কহিল—"হাঁ, বিনয় বাবু এসেচেন তাই—"

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "বিনয় বাবু যাঁর কাছে এসেচেন তিনি ওঁর আতিথ্য করবেন, তুমি এখন নীচে এস, কাজ আছে!"

ললিতা স্থির করিল, হারান বাবু নিশ্চয়ই বিনয় ও তাহার দুইজনের নাম লইয়া মাকে এমন কিছু বলিয়াছেন যাহা বলিবার অধিকার তাঁহার নাই। এই অনুমান করিয়া তাহার মন অত্যন্ত শক্ত হইয়া উঠিল। সে অনাবশ্যক প্রগল্‌ভতার সহিত কহিল, "বিনয় বাবু অনেক দিন পরে এসেচেন ওঁর সঙ্গে একটু গল্প করে নিয়ে তার পরে আমি যাচ্চি।"

বরদাসুন্দরী ললিতার কথার স্বরে বুঝিলেন জোর খাটিবে না। হরিমোহিনীর সম্মুখেই পাছে তাঁহার পরাভব প্রকাশ হইয়া পড়ে এই ভয়ে তিনি আর কিছু না বলিয়া এবং বিনয়কে কোনো প্রকার সম্ভাষণ না করিয়া চলিয়া গেলেন।

ললিতা বিনয়ের সঙ্গে গল্প করিবার উৎসাহ তাহার মার কাছে প্রকাশ করিল বটে কিন্তু বরদাসুন্দরী চলিয়া গেলে সে উৎসাহের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তিনজনেই কেমন এক প্রকার কুণ্ঠিত হইয়া রহিল এবং অল্পক্ষণপরেই ললিতা উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

এ বাড়িতে হরিমোহিনীর যে কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহা বিনয় স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। কথা পাড়িয়া ক্রমশঃ হরিমোহিনীর পূর্ব্ব ইতিহাস সমস্তই সে শুনিয়া লইল। সকল কথার শেষে হরিমোহিনী কহিলেন, "বাবা, আমার মত অনাথার পক্ষে সংসার ঠিক স্থান নয়। কোনো তীর্থে গিয়ে দেবসেবায় মন দিতে পারলেই আমার পক্ষে ভাল হত। আমার অল্প যে কটি টাকা বাকি রয়েছে—তাতে আমার কিছুদিন চলে যেত, তার পরেও যদি বেঁচে থাকতুম ত পরের বাড়িতে রেঁধে খেয়েও আমার কোনোমতে দিন কেটে যেত। কাশীতে দেখে এলুম, এমন ত কত লোকের বেশ চলে যাচ্চে! কিন্তু আমি পাপিষ্ঠা বলে সে কোনোমতেই পেরে উঠ্‌লুম না। একলা থাক্‌লেই আমার সমস্ত দুঃখের কথা আমাকে যেন ঘিরে বসে, ঠাকুর দেবতা কাউকে আমার কাছে আস্‌তে দেয় না। ভয় হয় পাছে পাগল হয়ে যাই। যে মানুষ ডুবে মরচে তার পক্ষে ভেলা যেমন, রাধারাণী আর সতীশ আমার পক্ষে তেমনি হয়ে উঠেছে,—ওদের ছাড়বার কথা মনে করতে গেলেই দেখি আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। তাই আমার দিন রাত্রি ভয় হয় ওদের ছাড়তেই হবে—নইলে সব খুইয়ে আবার এই ক'দিনের মধ্যেই ওদের এত ভাল বাস্‌তে গেলুম কি জন্যে? বাবা, তোমার কাছে

বলতে আমার লজ্জা নেই, এদের দুটিকে পাওয়ার পর থেকে ঠাকুরের পূজো আমি মনের সঙ্গে করতে পেরেছি—এরা যদি যায় তবে আমার ঠাকুর তখনি কঠিন পাথর হয়ে যাবে!”

এই বলিয়া বস্ত্রাঞ্চলে হরিমোহিনী দুই চক্ষু মুছিলেন।

সুচরিতা নীচের ঘরে আসিয়া হারান বাবুর সম্মুখে দাঁড়াইল—কহিল “আপনার কি কথা আছে বলুন!

হারান বাবু কহিল—“বোস।”

সুচরিতা বসিল না, স্থির দাঁড়াইয়া রহিল।

হারান বাবু কহিলেন, “সুচরিতা, তুমি আমার প্রতি অন্যায় করচ।”

সুচরিতা কহিল “আপনিও আমার প্রতি অন্যায় করচেন।”

হারান বাবু কহিলেন, “কেন, আমি তোমাকে যা কথা দিয়েছি এখনো তা—”

সুচরিতা মাঝখানে বাধা দিয়া কহিল—“ন্যায় অন্যায় কি শুধু কেবল কথায়? সেই কথার উপর জোর দিয়ে আপনি কাজে আমার প্রতি অত্যাচার করতে চান? একটা সত্য কি সহস্র মিথ্যার চেয়ে বড় নয়? আমি যদি একশো বার ভুল করে থাকি তবে কি আপনি জোর করে আমার সেই ভুলকেই অগ্রগণ্য করবেন? আজ আমার যখন সেই ভুল ভেঙেছে তখন আমি আমার আগেকার কোনো কথাকে স্বীকার করব না—করলে আমার অন্যায় হবে!”

সুচরিতার যে এমন পরিবর্ত্তন কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে তাহা হারান বাবু কোনো মতেই বুঝিতে পারিলেন না। তাহার স্বাভাবিক স্তব্ধতা ও নম্রতা আজ এমন করিয়া ভাঙিয়া গেছে ইহা যে তাঁহারই দ্বারা ঘটিতে পারে তাহা অনুমান করিবার শক্তি ও বিনয় তাঁহার ছিল না। সুচরিতার নূতন সঙ্গীগুলির প্রতি মনে মনে দোষারোপ করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি কি ভুল করেছিলে?”

সুচরিতা কহিল—“সে কথা কেন আমাকে জিজ্ঞাসা করচেন? পূর্ব্বে মত ছিল এখন আমার মত নেই এই কি যথেষ্ট নয়?”

হারান বাবু কহিলেন—“ব্রাহ্মসমাজের কাছে যে আমাদের জবাবদিহি আছে! সমাজের লোকের কাছে তুমিই বা কি বলবে আমিই বা কি বলব?”

সুচরিতা কহিল “আমি কোনো কথাই বলব না। আপনি যদি বলতে ইচ্ছা করেন তবে বলবেন, সুচরিতার বয়স অল্প, ওর বুদ্ধি নেই, ওর মতি অস্থির। যেমন ইচ্ছা তেম্‌নি বলবেন! কিন্তু এ সম্বন্ধে এই আমাদের শেষ কথা হয়ে গেল!”

হারান বাবু কহিলেন, “শেষ কথা হতেই পারে না। পরেশ বাবু যদি—”

বলিতে বলিতেই পরেশ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কহিলেন, “কি পানু বাবু, আমার কথা কি বলচেন?”

সুচরিতা তখন ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল। হারান বাবু ডাকিয়া কহিলেন, “সুচরিতা যেয়োনা, পরেশ বাবুর কাছে কথাটা হয়ে যাক্।”

সুচরিতা ফিরিয়া দাঁড়াইল। হারান বাবু কহিলেন, “পরেশ বাবু, এত দিন পরে আজ সুচরিতা বলচেন বিবাহে ওঁর মত নেই! এত বড় গুরুতর বিষয় নিয়ে কি এত দিন ওঁর খেলা করা উচিত ছিল? এই যে কদর্য্য উপসর্গটা ঘট্‌ল এজন্যে কি আপনাকেও দায়ী হতে হবে না?”

পরেশ বাবু সুচরিতার মাথায় হাত বুলাইয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, “মা তোমার এখানে থাকবার দরকার নেই, তুমি যাও!”

এই সামান্য কথাটুকু শুনিবামাত্র এক মুহূর্ত্তে অশ্রুজলে সুচরিতার দুই চোখ ভাসিয়া গেল এবং সে তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেল।

পরেশ বাবু কহিল, “সুচরিতা যে নিজের মন ভাল করে না বুঝেই বিবাহে সম্মতি দিয়েছিল এই সন্দেহ অনেক দিন থেকে আমার মনে উদয় হওয়াতেই সমাজের লোকের সাম্‌নে আপনাদের সম্বন্ধ পাকা করার বিষয়ে আমি আপনার অনুরোধ পালন করতে পারিনি।”

হারান বাবু কহিলেন, “সুচরিতা তখন নিজের মন ঠিক বুঝেই সম্মতি দিয়েছিল, এখনই না বুঝে অসম্মতি দিচ্চে এ রকম সন্দেহ আপনার মনে উদয় হচ্চে না?”

পরেশ বাবু কহিলেন, "দুটোই হতে পারে কিন্তু এ রকম সন্দেহের স্থলে ত বিবাহ হতে পারে না।"

হারান বাবু কহিলেন, "আপনি সুচরিতাকে সৎ-পরামর্শ দেবেন না?"

পরেশ বাবু কহিলেন, "আপনি নিশ্চয় জানেন সুচরিতাকে আমি কখনো সাধ্যমতে অসৎ পরামর্শ দিতে পারি নে!"

হারান বাবু কহিলেন, "তাই যদি হত, তা'হলে সুচরিতার এ রকম পরিণাম কখনই ঘট্‌তে পারত না। আপনার পরিবারে আজ কাল যে সব ব্যাপার আরম্ভ হয়েছে এ যে সমস্তই আপনার অবিবেচনার ফল এ কথা আমি আপনাকে মুখের সাম্‌নেই বলচি!"

পরেশ বাবু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "এ ত আপনি ঠিক কথাই বল্‌চেন,—আমার পরিবারের সমস্ত ফলাফলের দায়িত্ব আমি নেব না ত কে নেবে?"

হারান বাবু কহিলেন, "এজন্যে আপনাকে অনুতাপ করতে হবে—সে আমি বলে রাখ্‌চি।"

পরেশ বাবু কহিলেন, "অনুতাপ ত ঈশ্বরের দয়া। অপরাধকেই ভয় করি, পানু বাবু, অনুতাপকে নয়।"

সুচরিতা ঘরে প্রবেশ করিয়া পরেশ বাবুর হাত ধরিয়া কহিল, "বাবা, তোমার উপাসনার সময় হয়েচে।"

পরেশ বাবু কহিলেন, "পানু বাবু, তবে কি একটু বস্‌বেন?"

হারান বাবু কহিলেন, "না"। বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

আগে আত্মশাসন পরে রাজ্য-শাসন।

বরিশাল, ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৫।

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

বর্ত্তমান মাসের "প্রবাসী"তে আপনার প্রবন্ধ পড়িয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। আপনি যে আমার অকিঞ্চিৎকর রচনা উপলক্ষ্য করিয়া এমন একটী উপাদেয় ও শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ "প্রবাসী"তে প্রকাশিত করিয়াছেন, ইহাতে আমি যেমন অত্যন্ত শ্লাঘা বোধ করিতেছি, "প্রবাসীর" পাঠকগণও তেমনি নিরতিশয় উপকৃত হইয়াছেন। আমার বন্ধুগণ উহা পড়িয়া মোহিত হইয়াছেন।

আপনার প্রবন্ধটী মনোযোগ পূর্ব্বক বারংবার পড়িয়া আমার মনে কয়েকটী প্রশ্নের উদয় হইয়াছে। কিন্তু আমি সেগুলি পত্রিকায় উপস্থিত করিতে সঙ্কুচিত হইতেছি—কারণ, আপনি ব্রাহ্মসমাজের পূজনীয়, ঋষিকল্প আচার্য্য, আর আমি উহার একজন নগণ্য সভ্য। সুতরাং আমার প্রশ্নগুলি এই পত্র সাহায্যে জানাইতেছি। আপনি যদি এগুলির উত্তর স্বরূপ একটী প্রবন্ধ "প্রবাসী"তে প্রকাশ করেন, তবে আমার, এবং সঙ্গে সঙ্গে অপরেরও, পরম উপকার হইবে। অনুগ্রহ করিয়া আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, এই প্রার্থনা।

১। "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ", এই কথাটী বোধ হয় কুরুপাণ্ডবদিগের সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু সেকালে ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝাইত, এখনও কি আমরা তাই বুঝি?

২। বিভিন্নদেশে, বিভিন্নযুগে, ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায়। স্বাধীন ও পরাধীন দেশের ধর্ম্ম এক নয়। ভবিষ্যতে পৃথিবীতে যে সনাতন ধর্ম্মের জয় হইবে বলিয়া আপনি বিশ্বাস করেন, তাহার সংজ্ঞা ও আকার কি?

৩। ইয়ুরোপীয় সভ্যতা দানবী সভ্যতা; ভারতেই মানবী সভ্যতার উদ্ভব হইবে—বা হইয়াছে, ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু ঐ মানবী সভ্যতা কিপ্রকারে জয়যুক্ত হইবে? ভারতবর্ষ আত্মশাসন-ক্ষমতা লাভ না করিলে কি উহা জয়লাভ করিতে পারিবে?

৪। মানবী সভ্যতার ভাবী জয় যদি ভারতবর্ষের আত্মশাসন-ক্ষমতা লাভের উপর নির্ভর করে, তবে সেই ক্ষমতা লাভের পায় কি কি?

৫। * * * *

৬। এযাবৎ কোনও দেশের স্বাধীনতালাভচেষ্টাতেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের জয় দেখিতে পাই না। ভারতবর্ষে সম্প্রতি যে আন্দোলনতরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, সরল ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ তাহা হইতে দূরে থাকিবেন, না যতদিন সম্ভব যোগ রক্ষা করিয়া বাকী কার্য্যের ভার অপরের হস্তে ন্যস্ত করিবেন?

৭। ওয়াশিংটন প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপরায়ণ বীর-পুরুষদিগের দৃষ্টান্তে সময়োচিত ধর্ম্মের সময়োচিত জয়ই দেখিয়া-শিখিবার বিষয় ইহা বলা বাহুল্য।—ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় এ কথার অর্থ কি ?

আলোচ্য প্রবন্ধটীতে আপনি যে সকল মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার প্রায় সমস্তগুলি অসঙ্কোচে মানিয়া লইতে পারিতেছি বলিয়াই এই কয়েকটী প্রশ্ন করিতে সাহসী হইলাম। পত্রে বা পত্রিকায় সদুত্তর পাইলে যৎপরোনাস্তি অনুগৃহীত হইব।

আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত—

শ্রীরজনীকান্ত গুহ,

(ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ),

বরিশাল।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর।

বিহিত সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক নমস্কার এবং নিবেদন—

আপনি যাহা যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন মোটের উপরে তাহার একটা সদুত্তর যাহা আমার মনে উপস্থিত হইতেছে তাঁহাই আমি নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

ধর্ম্ম কি ? যাহা ধরিয়া থাকিবার বস্তু তাহারই শাব্দিক সংজ্ঞা ধর্ম্ম। ইংরাজি ভাষায় যিনি principleকে ধরিয়া থাকেন তিনি man of principle।—তুমি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ? না I *hold* অর্থাৎ ধরি অমুক religion। ধৃ ধর্ম্ম, কৃ কর্ম্ম। কর্ম্ম করিবার বস্তু ; ধর্ম্ম ধরিবার বস্তু বা অবলম্বন করিবার বস্তু। এই গেল ধর্ম্মের শাব্দিক অর্থ। ধর্ম্ম যে মনুষ্যের সর্ব্বথা অবলম্বনীয় এ বিষয়ে সাধারণত—পুরাকালেও যেমন বর্ত্তমান যুগেও তেম্নি—মনুষ্যজাতির মধ্যে মতভেদ নাই। সকলেই বলে সত্য জানিবার বস্তু এবং অন্বেষণ করিবার বস্তু ; সকলেই বলে ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার বস্তু এবং সাধন করিবার বস্তু। কেহই বলে না যে, অসত্য জানিবার বস্তু বা অন্বেষণ করিবার বস্তু ; কেহই বলে না যে, অধর্ম্ম অবলম্বন করিবার বস্তু বা সাধন করিবার বস্তু। আসল ধরিতে গেলে ধর্ম্মও এক, সত্যও এক। কিন্তু মনুষ্যের অপূর্ণতা বশতঃ সত্যের নানাপ্রকার শ্রেণীবিভাগ ঘটিয়া দাঁড়াইয়াছে ; ধর্ম্মেরও তাই। কোনো সত্য জ্যোতিষী সত্য, কোনো সত্য রাসায়নিক সত্য, কোনো সত্য জ্যামিতিক সত্য, কোনো সত্য আধ্যাত্মিক সত্য, কোনো সত্য গোটা সত্য, কোনো সত্য আধা সত্য ; সত্যের মধ্যে এইরূপ জাতিগত প্রভেদ এবং মাত্রাঘটিত তারতম্য ঘটিয়া দাঁড়াইয়াছে। তেম্নি আবার কোনো ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, কোনো ধর্ম্ম ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, কোনো ধর্ম্ম বৈশ্য ধর্ম্ম, কোনো ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম, কোনো ধর্ম্ম সাময়িক ধর্ম্ম—ধর্ম্মের মধ্যে এইরূপ জাতিগত এবং গুণগত প্রভেদ ঘটিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা কিছুই কঠিন নহে যে, কি রাসায়নিক সত্য, কি জ্যামিতিক সত্য, কি ভৌতিক সত্য, কি আধ্যাত্মিক সত্য—সকল সত্য একই সত্য ; তেম্নি, কি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, কি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, কি বৈশ্য ধর্ম্ম—সকল ধর্ম্ম একই ধর্ম্ম। একদিকে যেমন ভিন্ন ভিন্ন নানা সত্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জানিবার এবং অন্বেষণ করিবার বস্তু, আর একদিকে, তেম্নি ভিন্ন ভিন্ন নানা সত্যের সঙ্গে এক যে সত্য নিরবচ্ছিন্ন লাগিয়া আছে, সেই এক সত্য সকলেরই জানিবার এবং অন্বেষণ করিবার বস্তু ; তথৈব, ভিন্ন ভিন্ন নানা ধর্ম্ম যেমন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের অবলম্বন করিবার এবং সাধন করিবার বস্তু, তেম্নি, ভিন্ন ভিন্ন নানা ধর্ম্মের সঙ্গে এক যে ধর্ম্ম নিরবচ্ছিন্ন লাগিয়া আছে, সেই এক ধর্ম্ম সকলেরই অবলম্বন করিবার এবং সাধন করিবার বস্তু। এক সত্যকে ছাড়িয়া অপর কোনো সত্য হইতেই পারে না ; তেম্নি এক ধর্ম্মকে ছাড়িয়া অপর কোনো ধর্ম্ম হইতেই পারে না। নিউটন আপেলের পতনে এবং গ্রহাদির পরিভ্রমণে একই মাধ্যাকর্ষণের কার্য্যকারিতা দেখিয়াছিলেন। এক সত্যের সন্ধান পাইতে হইলে জ্ঞানের এই প্রকারই সমদর্শিতা আবশ্যক। তেম্নি এক ধর্ম্মের পথ ধরিয়া চলিতে হইলে হৃদয়ের সমব্যথিতা আবশ্যক—পরের সুখ দুঃখকে আপনার সুখ দুঃখ করিয়া লওয়া আবশ্যক।

জ্ঞান এবং ধর্ম্ম গোড়ায় একই বস্তু। হৃদয় দিয়া পর'কে আপনার মতো করিয়া জানা ধর্ম্মের গোড়া'র কথা। ধর্ম্মের এই গোড়ার কথাটী ছাড়িয়া কোনো ধর্ম্ম হইতেই পারে না। কাহাকেও যদি আমরা দেখি যে, তিনি দেশের লোকের সুখদুঃখকে আপনার সুখদুঃখ করিয়া লইয়া

দেশ রক্ষার্থে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, ইনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্। পক্ষান্তরে যদি আমরা দেখি যে, পরের ধন আত্মসাৎ করিবার জন্য ডাকাতেরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখন আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, ইহারা মরিবার জন্য বিষ বৃক্ষ রোপণ করিতেছে। যেরূপ যুদ্ধ শুধুই কেবল হত্যাকাণ্ড সেরূপ হিংসাপ্রধান যুদ্ধ ঘোরতর অধর্ম্ম। আত্মীয় স্বজন এবং স্বদেশকে শত্রু-হস্ত হইতে বাঁচাইবার জন্য শূরবীরেরা যেরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ন, সেইরূপ যুদ্ধই ধর্ম্মযুদ্ধ। ধর্ম্মকে ছাড়িয়া ধর্ম্মযুদ্ধ হইতেই পারে না। ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ধর্ম্মে পরিগঠিত হওয়া আবশ্যক। বাহিরের রিপুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে অন্তরের রিপুগণের উপরে অন্ততঃ খানিকটা দূর পর্য্যন্ত জয়লাভ করা আবশ্যক। জাপানীরা বাহিরের ভল্লুকদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহাদের আপনা আপনির মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য কি পর্য্যন্ত না ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিল! অন্তরের রিপুগণের উপরে জয়লাভ করিবার পূর্ব্বে তাহারা যদি রাগের মাথায় ভল্লুকদিগের প্রতি দাঁতমুখ খিঁচাইত, তাহা হইলে তাহারা ধনে প্রাণে মারা যাইত। "গাছে না উঠিতেই এক কাঁধি" এরূপ কথা জাপানী শাস্ত্রে লেখে না। "ধর্ম্ম চাহি না—শুধু কেবল জয় চাই" এরূপ স্বার্থাভিসন্ধি কখনই চরম সিদ্ধিতে উপনীত হইতে পারে না—যেহেতু ঈশ্বর উপরে আছেন।

আপনি বলিতেছেন—"এ যাবৎকাল কোনো দেশের স্বাধীনতালাভচেষ্টাতেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের জয় দেখিতে পাই না।" আপনি হয় তো ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকেই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম বলিতেছেন। আর, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রক্তপাতদূষিত বলিয়া তাহাকে অবিশুদ্ধের কোটায় নিক্ষেপ করিতেছেন। প্রকৃত কথা এই যে, ধর্ম্মাধর্ম্মের কষ্টিপাথর হস্তপদ নহে—ধর্ম্মাধর্ম্মের কষ্টিপাথর মন। বিশুদ্ধ মনে যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম* অনুষ্ঠান করে—সে ব্যক্তি বিশুদ্ধ ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করে; যেমন অর্জ্জুন করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে অবিশুদ্ধ মনে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তির ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে। তবে যদি আপনি বলেন যে, আমাদের দেশের এরূপ দুর্গতি কেন? তাহার উত্তর এই যে, জাতীয় দুর্গতি জাতীয় পাপের ফল। রোম দেশের অধঃপতন—বাবিলোন দেশের অধঃপতন—আমাদের দেশের অধঃপতন—এবং আর আর কোন্ দেশের ললাটে কিরূপ দারুণ অধঃপতন লেখা আছে তাহা কে বলিতে পারে—সবই পাপের ফল। স্পেনের inquisition স্পেন জাতির অধঃপতনের গোড়ার কথা। St. Bartholomew উৎসবে Huguenot হত্যা ফরাসীস্ দেশীয় রাজ্যবিপ্লবের গোড়ার কথা। বৌদ্ধদিগের প্রতি মাত্রাতীত নিষ্ঠুরাচরণ আমাদের দেশের অধঃপতনের গোড়ার কথা। Inquisitionএর প্রবল প্রতাপে রাজ্যের অন্তরের স্বাধীনতার বিনাশের পর হইতেই যেমন স্পেনের priestcraft দেশের লক্ষ্মীশ্রীকে গ্রাস করিয়া ফেলিল, বৌদ্ধ বিনাশের পর হইতে আমাদের দেশেও তেম্নি অপ-ব্রাহ্মণেরা আপনাদের কু-অভিসন্ধি রীতিমত পাকাইয়া তুলিতে জো পাইলেন। ব্রাহ্মণেরা যখনই নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশের পরিবর্ত্তে পাদোদক প্রদান করিয়া আপনাদের পদমর্য্যাদার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখনই পাপকলুষিত যজ্ঞোপবীতের রজ্জু গলায় দিয়া ব্রহ্মণ্যদেব প্রাণত্যাগ করিলেন, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। বৌদ্ধধর্ম্মের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের অন্তরের স্বাধীনতা বিনাশ প্রাপ্ত হইল; তার সাক্ষী বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে ভাস্করাচার্য্য, চরক, সুশ্রুত, পতঞ্জলি প্রভৃতি বড় বড় লোক যাঁহারা জন্মিয়াছিলেন, বৌদ্ধধর্ম্মের বিনাশের পর তাঁহাদের ন্যায় স্বাধীনচিত্ত প্রতিভাশালী লোকের প্রাদুর্ভাব রহিত হইয়া যাওয়াতে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের উন্নতির পথে জন্মের মতো কাঁটা পড়িয়া গেল। আমাদের দেশে যখন লোকের অন্তরের স্বাধীনতা এইরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইল, তখন বাহিরের স্বাধীনতা বিনাশ পাইতে বড় বেশী বিলম্ব হইল না। আমাদের দেশের এই যে দারুণ দুর্ব্বিপাক—এ দুর্ব্বিপাকের খণ্ডন হইবে কিসে? আমাদের দেশের আপাদ-মস্তক এই যে জড়ভাব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছে—এ

* এ কথা বলা বাহুল্য যে গুপ্তহত্যা বা আক্রান্ত ব্যক্তিকে আত্মরক্ষার সুযোগ না দিয়া হত্যা কোনও কালে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয় নাই এবং বর্ত্তমান ভারত প্রকৃত ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুষ্ঠানেরও উপযুক্ত ক্ষেত্র নহে—সম্পাদক।

রোগের ঔষধ কি? জাতীয় পাপের ঔষধ জাতীয় অনুতাপ এবং জাতীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান। একদিকে যেমন আমরা আমাদের দেশের পূর্ব্বতন পাপের ফলভোগ করিতেছি, আর একদিকে তেম্নি আমাদের দেশের পূর্ব্বতন তপস্যা এবং সুকৃতির ফল লোকসমাজে তলে তলে কার্য্য করিতেছে। এখনো যদি আমরা বেদ উপনিষদ্ গীতা প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের শাস্ত্র সকলের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশের সেই অন্তর্নিগূঢ় পুণ্যফল জাগাইয়া তুলি, আর তাহারই উপরে জাতীয় ঐক্যের গোড়াপত্তন করিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের সে চেষ্টা কখনই বিফল হইবে না। আমাদের জানা উচিত যে, অন্তরের স্বাধীনতাই বাহিরের স্বাধীনতার সোপান; তেম্নি অন্তরের পরাধীনতাই বাহিরের পরাধীনতার সোপান। আমরা যদি ঔদ্ধত্যের সভা না করিয়া অনুতাপের সভা করি; আর, জাতীয় ভ্রাতারা মিলিয়া অনুতপ্তচিত্তে ঈশ্বরের নিকটে আমাদের মর্ম্মবেদনা জানাই তাহা হইলেও অকূল পাথারে আমরা কতকটা কূল কিনারা পাই; কিন্তু আমরা বলিতে শিখিয়াছি—"ধর্ম্ম চাহি না, ঈশ্বর চাহি না।" ইহাতে আর আমাদের কত ভাল হইবে?

স্বাধীনতা কাহাকে বলে এবং ধর্ম্ম কাহাকে বলে, এটা যদি আমরা স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখি, তবে দেখিতে পাইব যে দুয়ের মধ্যে মূলেই প্রভেদ নাই। কিন্তু স্বাধীনতা এবং ধর্ম্মের মধ্যে একটা মনঃকল্পিত ব্যবধানের প্রাচীর দাঁড় করাইয়া লোকে যখন স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া নাচিয়া উঠে—সে স্বাধীনতা সোণার হরিণ, তাহাকে বিশ্বাস নাই। তাহা ফরাসীস্ বিপ্লবকারীদিগের "Equality Fraternity Liberty" বই আর কিছুই নহে। ভারত = রামচন্দ্র; ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা = সীতাদেবী; দানবী স্বাধীনতা = মায়ামৃগ। ঐ মায়ামৃগটা সীতাদেবীকে রাবণের হস্তে সমর্পণ করিবার পন্থায় ফিরিতেছে অহোরাত্র। আমাদের দেশের সভাপতিরাও তেম্নি! তাঁহারা দেশসুদ্ধ লোককে মায়াবিনী সভ্যতায় দীক্ষিত করিবার জন্য মহা মহা সভা আহ্বান করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্পষ্টই বলেন যে "আমরা অযোধ্যাপুরীকে সোণার লঙ্কাপুরী করিতে চাই—এ বিষয়ে কর্ত্তারা আমাদিগকে সাহায্য প্রদান করুন; যদি সাহায্য প্রদান না করেন তবে আমরা সকলে মিলি তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিব।" বিরুদ্ধাচরণের কথা শুনি লঙ্কেশ্বর মনে মনে হাসিতেছেন। তিনি বেস্ জানেন যে "এদের না আছে ঐন্দ্রজালিক ব্রহ্মাস্ত্র না আছে তিরস্কর মন্ত্রবিদ্যা, না আছে কিছু; এরা ফণাধারী ঢোঁড়া বিষধর-গর্জ্জনকারী শরতের মেঘ। তবে এরা যদি সত্য সত্য অযোধ্যাপুরীকে লঙ্কাপুরী করিয়া গড়িয়া তোলে, আমাদে তাহাতে বিশেষ কোন আপত্তি নাই; কেননা অযোধ্যাপু লঙ্কাপুরী হইলে তাহা আমাদেরই পুরী হইবে।" ফ কথা এই যে আমরা দানবী সভ্যতার উপরে আমাদে জাতীয় স্বাধীনতার গোড়া পত্তন করিতে চেষ্টা করিতেছি মনে কর যেন তাহাতে আমরা কৃতকার্য্য হইলাম। মনে কর যেন দানবী সভ্যতা আমাদের স্কন্ধের ভার-লাঘব করিয়া সাতসমুদ্র পারে প্রস্থান করিল। তাহা হইলে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা দাঁড়াইবে কিসের উপরে? আমাদের স্বদেশীয় মানবী সভ্যতার উপরেতো দাঁড়াইবে?

কিন্তু হায়! দেশীয় ভাণ্ডারে জ্ঞান-রত্ন ভক্তিসুধা সাধনসম্পদ্ প্রভৃতি যত কিছু সার পদার্থ এযাবৎকাল পর্য্যন্ত বহুযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল, স্বদেশের সেই মহামূল্য পৈতৃক মূল ধন আমরা অনেককাল যাবৎ খোয়াইয়া বসিয়া আছি! তবে কি ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ ব্যতিরেকে এক্ষণে আমাদের বাঁচিবার উপায় নাই? দানবী সভ্যতা ছাড়া কি আর সভ্যতা নাই? প্রকৃত সভ্যতা বলিয়া কি একটা পদার্থ নাই? আমার ধ্রুব বিশ্বাস এই যে, আমাদের দেশের অন্তরে অন্তরে—হাড়ে হাড়ে বলিলেও হয়—প্রকৃত সত্যের ভাব, প্রকৃত ধর্ম্মের ভাব, প্রকৃত মঙ্গলের ভাব জাগিতেছে; যদিচ বাহিরে বাহিরে ঠিক তাহার বিপরীত। আমার মন তাই বলে যে, সেই অন্তর্নিগূঢ় অধ্যাত্মশক্তিকে ধৈর্য্য বীর্য্য পরহিতৈষিতা স্থায় সত্য প্রভৃতির অনুষ্ঠান দ্বারা জাগাইয়া তুলিয়া তাহারই উপরে জাতীয় ঐক্যের গোড়া পত্তন সর্ব্বথা বিধেয়; কেননা, অধ্যাত্ম শক্তির একটা ঈশ্বরদত্ত বল আছে—সে বলের সামনে অপর কোনো বলই মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারে না। শক্তিশেলের বেদনায় লক্ষ্মণ যখন মুমূর্ষু দশাপন্ন তখন হনুমান-বীর গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে যেমনতর একটা

বিশল্যকরণী মহৌষধি আনিয়া তাহার গুণে লক্ষ্মণকে যমদ্বার হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিল, সেইরূপ একটা প্রবল-পরাক্রম মহৌষধ আমাদের জন্ম আবশ্যক হইয়াছে ; নচেৎ আমাদের যেমন বিষম সান্নিপাতিক ব্যাধি তাহাতে সামান্য গোচের টোট্‌কা টুট্‌কিতে ফল দর্শিবে না, ইহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। সে ঔষধ সত্য ধর্ম্ম (শীতলা পূজা, মনসা পূজা নহে) সত্য স্বাধীনতা (স্বেচ্ছাচারিতা নহে) সত্য ধৈর্য্য বীর্য্য (চপলমতিসুলভ মৌখিক বীরত্ব প্রকাশ নহে) ; সত্য চাই—অকৃত্রিম সত্য চাই—খাঁটি সত্য চাই।

কায়মনোবাক্যের একতা চাই ; হৃদয়ে হৃদয়ে—মর্ম্মে মর্ম্মে—যোগ চাই ; তবেই ঔষধের গুণ ধরিবে দেখিতে দেখিতে ; নচেৎ মাথা খুঁড়িলেও কিছুই হইবে না। সত্যের এম্নি গুণ যে, "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"

আপনার অনুরক্ত
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাগজ।

কাগজ আমাদের আধুনিক সভ্যতার একটী প্রধান উপাদান স্বরূপ ; এবং আপনি আবার শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে ইহা আমাদের সভ্যতার একটী অন্তরায়। ইহা আমাদের সুন্দর পৃথিবীকে বৃক্ষশূন্য করিবার ভয় দেখাইতেছে। পৃথিবী বৃক্ষশূন্য হইলে সমস্ত স্রোতস্বতী শুকাইতে আরম্ভ করিবে ; পৃথিবী বৃষ্টিশূন্য হইবে এবং ইহা একটী মরুভূমিতে পরিণত হইবে।

আপনি বলিতে পারেন যে পৃথিবীর এই অবস্থায় পরিণত হওয়া পর্য্যন্ত আপনি বাঁচিবেন না, সমস্ত পৃথিবী এই অবস্থায় পরিণত হওয়া পর্য্যন্ত আপনি নাও বাঁচিতে পারেন। কিন্তু এখন একটী দেশের বিষয় আলোচনা করা যাক্। তাহা হইলে আপনার এই ভ্রম বিদূরিত হইবে। মার্কিন দেশের কাগজের কলগুলি রোজ যে পরিমাণ বৃক্ষ চর্ব্বণ করিতেছে যদি ক্রমাম্বয়ে কএক দিন এই পরিমাণে করিতে থাকে তাহা হইলে আপনি আপনার জীবদ্দশায়ই এই দেশকে জঙ্গল-শূন্য দেখিয়া যাইতে পারিবেন।

আপনার এই বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে এই দেশের জঙ্গল-বিভাগের বড় কর্ত্তার মন্তব্য শ্রবণ করিলেই আপনার সে সন্দেহ ভঞ্জন হইবে। তিনি বলিয়াছেন—"আমাদের এখন কেবল মাত্র দুই হাজার বিলিয়ন ফুট (two thousand billion feet), গাছ অবশিষ্ট আছে। যে পরিমাণে এতকাল এই গাছ ব্যয়িত হইয়াআ সিতেছে, এখনও যদি সে পরিমাণে ব্যয়িত হইতে থাকে, তাহা হইলে এই অবশিষ্ট কাঠ গুলিতে ২০ বৎসর মাত্র চলিতে পারে। নিউ ইয়র্কের (New York) জঙ্গল এবং মৎস্য বিভাগের কমিসনার (Commissioner) মিঃ হুইপল্ (Whipple) আরও কি বলিয়াছেন শ্রবণ করুন। তিনি বলিয়াছেন "আধুনিক সময়ে নিউ ইয়র্ক (New York) সহরে ৪১ বিলিয়ন ফুট কাঠ অবশিষ্ট আছে এবং প্রতি বৎসর ১২ বিলিয়ন ফুট করিয়া ব্যয়িত হইতেছে।" এবং তিনি ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন "যদি আরও কএক বৎসর কোন প্রকার পরিবর্ত্তন না হইয়া এই প্রকারে কাঠ ব্যয়িত হইতে থাকে, তাহা হইলে এই কাঠ ২২ বৎসর মধ্যে নিঃশেষ হইবে।" এবং এত কাঠ কি প্রকারে ব্যয় হইতেছে তাঁহাকে এই প্রশ্ন করায় তিনি উত্তরে বলিয়াছেন "এক মাত্র খবরের কাগজের জন্যই প্রতিবৎসর দুই বিলিয়ন ফুট কাঠ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।"

মার্কিন দেশের কৃষি বিভাগীয় রিপোর্টে প্রকাশ প্রতি বৎসর পাঁচশত ছাব্বিস মাইল ব্যাপী কাঠ এক মাত্র কাগজ প্রস্তুতের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; এদেশীয় প্রকাশকেরা প্রতি বৎসর ৩,৫০০,০০০ কর্ড (cord)এর ও অধিক কাঠ ব্যয় করিয়া থাকে।

গত বৎসর একমাত্র নিউ ইয়র্কের (New York) ওয়ারল্ড (world) নামক পত্রিকার জন্য ৭৭৩:৮৭৫ পাউণ্ড শাদা কাগজ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এক মাত্র রবিবারের সংস্করণের জন্য দৈনিক খবরের কাগজের এক সপ্তাহে ব্যবহৃত কাগজের শতকরা ৩০ ভাগ করিয়া লাগে, অবশিষ্ট ৭০ ভাগ সপ্তাহের অন্যান্য বারের জন্য ব্যয়িত হয়।

কাগজের যৌগিক পদার্থ ৮০ ভাগ কাঠ এবং ২০ ভাগ

অন্য পদার্থ যাহা পরে বলা হইবে। ইহা হইতেই ঐ বিভাগীয় বহুদর্শী লোকগণ স্থিরীকৃত করিয়াছেন যে এই কাগজের একমাত্র রবিবারের সংস্করণের জন্য ২৯.৭ একর জমির কাঠ লাগিয়া থাকে, সপ্তাহের অন্যান্যদিনের জন্য ১১.৫ একর জমির কাঠ লাগে। এস্থানে রবিবারের সংস্করণের ১৫৬টী পত্রিকা বিদ্যমান।

গত নবেম্বর মাসে যুক্ত রাজ্যের Census Bureau যে বুলেটিন্ (Bnlletin) প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে নিম্নলিখিত মন্তব্য উদ্ধৃত করা গেল। "১৯০৫ সনে যুক্তরাজ্যে মোট যত কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে তন্মধ্যে নয় হাজার টন্ (ton) কেবল মাত্র সংবাদপত্র এবং মাসিক পত্রের জন্য ব্যয় হইয়াছে। ইহা ঐ সনের মোট প্রস্তুত কাগজের এক তৃতীয়াংশ। এই সমস্ত কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য ১৫০০০ লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল, এবং নয় কোটী সাতাইশ লক্ষ দুই হাজার আট শত পনর টাকা বেতন দিতে হইয়াছে। এই সমস্ত কাগজের কল ১০ দশ লক্ষ তিন শত কর্ড (cord) কাঠ ব্যবহার করিয়াছে, যাহা এক হাজার একর জমির উদ্ভূত পদার্থ। ইহার কতকাংশ কানাডা হইতেও আমদানি হইয়াছে। ইহা হইতেই দেখা যায় যে একমাত্র যুক্তরাজ্যে এক মিলিয়ন সাত শত ষাট হাজার ফুট কাঠ প্রতিবৎসর সংবাদ পত্র এবং মাসিক পত্রে পরিণত হইতেছে।" এই বুলেটিনে আরো প্রকাশ ১৯০৫ সালে মোট সাতান্নকোটি বিশলক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার নয় শত ষোল টাকা মূল্যের কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল। তন্মধ্যে সংবাদ পত্রের কাগজ দশ কোটী আটাত্তর লক্ষ এক চল্লিশ হাজার চারি শত ছাপান্ন টাকার; পুস্তকের কাগজ এগার কোটী তেত্রিশ লক্ষ উনআশি হাজার তিন শত বাষট্টি টাকার; উৎকৃষ্ট কাগজ ছয় কোটী চুয়াত্তর লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার সাত শত ছিয়ানব্বই টাকার; দোকানের জিনিষ পত্রাদি বাঁধিবার কাগজ নয় কোটী বাইশ লক্ষ সাতান্ন হাজার আট শত অষ্টাশি টাকার; বোর্ড বা পাটা পাঁচ কোটী চৌদ্দ লক্ষ আট হাজার ছয় শত সাতান্ন টাকার।"

কেবল একমাত্র নিউইয়র্ক সহরের সংবাদপত্রগুলির জন্যই সমস্ত যুক্তরাজ্যের প্রস্তুত কাগজের এক অষ্টমাংশ ব্যয়িত হইয়া থাকে। এই সকল সংবাদপত্রের সংখ্যা এতই অধিক যে যদি এক দিনের প্রকাশিত সংবাদপত্র পাঁচ ফুট প্রশস্ত টুক্রা করিয়া বিস্তৃত করা যায়, তাহা হইলে ইহা নিউইয়র্ক হইতে তিন হাজার মাইল দূরবর্ত্তী সেনফ্রানসিস্কো পৌঁছিবে। এক সপ্তাহের কাগজ বিস্তৃত করিলে বিষুবরেখা দিয়া সমস্ত পৃথিবীকে বেষ্টন করিতে পারে। দশ সপ্তাহে ইহা চন্দ্রমণ্ডলে পৌঁছিতে পারে। এবং যদি এক বৎসরের সংবাদ পত্র পাঁচ ইঞ্চি টুক্রা করিয়া বিস্তৃত করা যায় তবে বোধ হয় ইহা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলের সহিত পৃথিবীর সংযোগ করা যাইতে পারে।

ইহা বলাই বাহুল্য যে এই সমস্ত কাগজ কলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কল এমন সুন্দর ভাবে প্রস্তুত যে এই বৃহতোদর কলের এক প্রান্ত দিয়া কাষ্ঠ প্রদান করিলেই অপর প্রান্ত দিয়া ইহা ছাপিবার উপযোগী কাগজ হইয়া বাহির হয়। এই বৃহতোদর কলের একটী বৃক্ষকে কাগজে পরিণত করিতে ১০।১২ ঘণ্টা সময় লাগিয়া থাকে, বিশেষ দক্ষতার সহিত চালাইতে পারিলে ইহাপেক্ষাও অল্প সময়ে করিতে পারা যায়।

একটী জীবন্ত গাছকে কত সত্বর সংবাদ পত্রে পরিণত করা যাইতে পারে, এ বিষয় নিয়া সম্প্রতি জর্ম্মন দেশের (Germany) ইসেনথল (Essenthal) সহরে একটী পরীক্ষা করা হইয়াছিল। পরীক্ষার সম্পূর্ণ বিবরণ এই:— একটী কলের নিকটস্থ তিনটী বৃক্ষকে সাতটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় কাটা হইয়াছিল, এবং তৎক্ষণাৎই বৃক্ষত্রয়কে বৃহতোদর কলের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, এবং প্রথম কাগজের রোল ঠিক নয়টা চৌত্রিশ মিনিটের সময় প্রেসে যাইবার উপযুক্ত হইয়া বাহির হইয়াছিল, এবং তৎক্ষণাৎই কাগজগুলিকে একখানা অটোমোবাইলে (automobile) করিয়া নিকটস্থ সংবাদপত্র আফিসে পাঠান হইয়াছিল, এবং দশ ঘটিকার সময়ই সে সংবাদ পত্র রাস্তায় বিক্রয় হইতে থাকে। এই বৃক্ষত্রয়কে খবরের কাগজে পরিণত করিতে ঠিক দুই ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। ইহা হইতেই অনুমিত হইবে যে কত সত্বর একটী কলে কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কাগজের কলে প্রথমে কাঠগুলিকে করাত দ্বারা চিরিয়া ফেলে এবং পিশিয়া ছাতুর ন্যায় করে। এই পেষণ কার্য্য কোন প্রকার ছুরি কিম্বা করাত দ্বারা হয় না, অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন জাঁতা দ্বারা হইয়া থাকে। এই জাঁতা এত ক্ষমতাপন্ন যে ইহাতে পাঁচ শত কিম্বা ছয় শত ঘোড়ার ক্ষমতা থাকে। এই সকল কল এমন কৌশলে প্রস্তুত যে এই ছাতুগুলি আপনিই জল মিশ্রিত হইয়া কর্দ্দমাকারে পরিণত হয়। এই কর্দ্দমাকার কাঠ হইতে আঁশ নির্ম্মুক্ত করিবার জন্য উহাকে ফুটন্ত গন্ধক দ্রাবকে দেওয়া হইয়া থাকে। উহাকে কিঞ্চিৎকাল এই দ্রাবক মধ্যে রাখিয়া, জল দ্বারা ধুইয়া ফেলা হয়।

অবশেষে কর্দ্দমাকার পদার্থকে মসৃণ কাগজে পরিণত করিবার জন্য অল্প পরিমাণ কর্দ্দম, কাগজে কালী বিস্তৃত না হইবার জন্য অল্প পরিমাণ রজন (resin) ও সাদা করিবার জন্য কিছু নীল মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। ইহা এখন দেখিতে পায়সের মত সাদা হইল। এই পায়সকে অধিক মিশ্রিত ও কাগজাকারে বিস্তৃত করিবার জন্য, ইহার উপর দিয়া জল প্রবাহিত করা হইয়া থাকে। জল ঠিক একটী প্রশস্ত ফিতার আকার ধারণ করিয়া একটী তারের জালের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়, এবং ঐ পদার্থগুলি জালের দুই পার্শ দিয়া পড়িয়া না যাইবার জন্য, ঐ জালের দুই পার্শ্ব রবারের ফিতা দ্বারা আটকান থাকে। ইহা এখন ঠিক কাগজের ন্যায় বিস্তৃত হইল।

ঐ জলগুলি জালের ছিদ্র মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে পড়িয়া যায় এবং কাগজগুলি শুকাইতে থাকে। তারপর এই গুলিকে একটী রোলারের (roller) ভিতর প্রবেশ করান হয় এবং রোলারের চাপদ্বারা ইহার জল বাহির করিয়া দেয়। তদনন্তর এইগুলিকে সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক করিবার জন্য একটী গরম সিলিণ্ডারের (cylinder) ভিতর দিয়া পরিচালিত করা হইয়া থাকে। অবশেষে এই কাগজগুলিকে মসৃণ করিবার জন্য ধারাবাহিকরূপে ঠাণ্ডা লোহার রোলারের মধ্য দিয়া পরিচালিত করা হইয়া থাকে। এখন ইহা ছাপাইবার উপযোগী কাগজে পরিণত হইল। এই গুলিকে অতি পরিপাটীরূপে রোল করিয়া, ফরমাইস্ অনুযায়ী আকারে পরিণত করা হয়।

খুব ভাল রোলিং মেশিনে এক মিনিটে পাঁচশত ফুট করিয়া কাগজ গুটাইতে পারে। যুক্ত রাজ্যের রামফোর্ড ফলস্ (Rumford Ealls) নামক স্থানে একটী কলে চব্বিশ (২৪) ঘণ্টায় আশি (৮০) মাইল করিয়া কাগজ বাহির করিয়া থাকে। প্রতি মাইল কাগজ ওজনে অর্দ্ধ টন (ton) করিয়া। পরীক্ষা দ্বারা দেখা হইয়াছে যে প্রতি দিনে যুক্ত রাজ্যের সমস্ত কলগুলিতে চারি হাজার টন্ করিয়া কাগজ উৎপন্ন করিয়া থাকে। তন্মধ্যে একমাত্র নিউইয়র্ক সহরের পত্রিকাগুলির জন্যই পাঁচ শত টন্ করিয়া ব্যয়িত হয়।

যুক্তরাজ্যে অত্যন্ত অধিক কাগজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন বিষয়ে এদেশে কাগজ প্রস্তুত শিল্পই সর্ব্ব-প্রধান বলিয়া বিবেচিত হয়। ১৯০৫ সনের সেন্সাস রিপোর্টে প্রকাশ যে উক্ত বৎসর এই রাজ্যে ছাব্বিশ হাজার চারি শত বাইশটি ছাপাখানা ছিল এবং এই সকল ছাপাখানায় এক শত যোল কোটী সত্তর লক্ষ সাতান্ন হাজার দুই শত পাঁচ টাকা মূলধন খাটিত এবং প্রতি বৎসর দেড় শত কোটী ছত্রিশ লক্ষ পচাশি হাজার নয় শত অষ্টাশি টাকা মূল্যের পুস্তকাদি বাহির হইত। ইহার এক তৃতীয় ভাগ ছাপাখানা কেবলমাত্র পুস্তক এবং বিজ্ঞাপনাদি ছাপার জন্য ব্যাপৃত ছিল এবং এক ষষ্ঠভাগ কেবলমাত্র মাসিক পত্র এবং সংবাদ পত্রাদি ছাপিবার জন্যই ব্যাপৃত থাকিত। অবশিষ্ট অন্যান্য কার্য্য করিত। এখন বোধ হয় ছাপাখানার সংখ্যা এবং পত্রিকার সংখ্যা পূর্ব্ব হইতে কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে।

গত ১৯০৫ সনে যুক্তরাজ্যে মোট একহাজার বত্রিশ কোটী একান্ন লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার এক শত অষ্টাশীখানা সংবাদ পত্র এবং মাসিক পত্রিকা ছাপা হইয়াছিল। দৈনিক সংবাদ পত্রের রবিবারিক সংস্করণ প্রতি রবিবার এক কোটী পনর লক্ষ উনচল্লিশ হাজার একুশখানা করিয়া হইয়াছিল, এবং অন্যান্য দিনের কাগজ প্রতিদিন দু'কোটী দশ লক্ষ উনআশী হাজার এক শত ত্রিশখানা করিয়া হইয়াছিল। এবং মাসিক পত্রিকা প্রতি মাসে ছয় কোটী তেতাল্লিশ লক্ষ ছয় হাজার এক শত পঞ্চাশখানা করিয়া হইয়াছিল, এবং সাপ্তাহিক প্রতি সপ্তাহে দুই কোটী

সাতাত্তর লক্ষ বত্রিশ হাজার সাঁইত্রিশখানা করিয়া হইয়াছিল।

নিউইয়র্ক ষ্টেট্‌স্‌ৎজিটাঙ (New York Staats Zeitung) নামক পত্রের সম্পাদক এবং প্রকাশক মিঃ হারম্যান রিডার (Hermann ridder) গত অক্টোবর মাসে জাতীয় পৌর-সম্মিলনীতে (National Civic Federation) বলিয়াছেন যে, এস্থানের সংবাদ পত্র এবং মাসিক পত্রগুলি প্রতি মাসে কেবলমাত্র কাগজের জন্যই সতের কোটী পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া থাকে। কেবলমাত্র একটী কাগজ প্রস্তুতের কারখানাতেই প্রতি বৎসর ছয় কোটী ছত্রিশ লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচ শত টাকার ব্যবসা হইয়া থাকে, পনর হাজার লোক খাটে, এবং উহা ২৫৯৭ বর্গ মাইল কাঠের জমির অধিকারী।

সংবাদপত্র এবং মাসিক পত্রের পরই এস্থানের ট্রাম গাড়ির কোম্পানি এবং টেলিফোন কোম্পানি (telephone Co.) অধিক মাত্রায় কাগজ ব্যয় করিয়া থাকে। একমাত্র ট্রাম কোম্পানির পরিবর্ত্তনের (transfer) জন্যই প্রতি বৎসর তিন কোটি টুকরা কাগজ ব্যবহার হইয়া থাকে, যাহার জন্য মোটামুটী তিন শত তা কাগজ ছাপাইবার প্রয়োজন হয়। টেলিফোন কোম্পানির কেবল মাত্র নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া ও সিকাগোর জন্য চৌদ্দ লক্ষ খানা গ্রাহক তালিকার আবশ্যক হয়, যাহার জন্য দুই কোটী পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড কাগজের আবশ্যক হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে এই সমস্ত কাগজ পুরাতন কাপড়ে প্রস্তুত হইত। সেই সময়ে কাগজের মূল্যও অধিক ছিল, এখনো অনেক ভাল কাগজ পুরাতন কাপড় দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

যুক্তরাজ্যে কাঠ দ্বারা কাগজ প্রস্তুতের প্রথা প্রথমে ১৮৬৭ সালে মাসাচুসেট্‌ (Massachusset) প্রদেশের ষ্টক্‌-ব্রিজ্‌ (Stock Bridge) সহরের মিঃ আলবার্টো পাগেন-ষ্টেবার (Alberto Pagensteber) দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়। সে সময়ে কেবলমাত্র যাঁতা দ্বারা কাঠ পেষণ করিয়াই কাগজ প্রস্তুত করা হইত। সেই জন্য তখন এই উপায়ে উৎকৃষ্ট কাগজ পাওয়া যাইত না। এখন পেষিত কাঠ গুলিকে ফুটন্ত গন্ধক দ্রাবকের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া উত্তমরূপে আঁশ নির্ম্মুক্ত করা হয়, সেই জন্যই এখন উত্তম কাগজ পাওয়া যাইতেছে।

সমস্ত কাঠেই কাগজ হয় না। এখন এখানে সমস্ত কাঠ দ্বারাই কাগজ প্রস্তুতের পরীক্ষা চলিতেছে। অনেক ফলও পাওয়া গিয়াছে। বোধ হয় শীঘ্রই কৃতকার্য্যতা লাভ হইবে।

খৃষ্ট জন্মিবার কএক বৎসর পূর্ব্বে চীন পণ্ডিত শ্রীযুত জায় লুন (Ts'ai lun) দ্বারা চীন দেশে প্রথমে কাগজ আবিষ্কৃত হয়। এই চীন পণ্ডিত অনেক গবেষণার পর রেশম দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন। অবশেষে তিনি ধানের খড় এবং পুরাতন কাপড় দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

ইজিপ্‌সিয়ানরা (Egyptians) রশ (Rush) নামক ঘাস দ্বারা প্রস্তুত কাগজে লিখিত। সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে সমরকন্দ (Samarcand) সহরে চীনবাসীদের প্রণালীতে কাগজ প্রস্তুতের জন্য এক কারখানা খোলা হইয়াছিল।

৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা নগরের আরব পণ্ডিত যোজেফ্‌ আমরু (Joseph Amru) স্বাধীন ভাবে কাগজ প্রস্তুত করেন। শিক্ষিত আরবগণ শীঘ্রই ইহার ব্যবহার আরম্ভ করে। আমরুর কাগজ প্রথমে তুলা দ্বারা প্রস্তুত হইত। অবশেষে তুলার পরিবর্ত্তে পাট ব্যবহার হইত। এই আরবীয় কাগজ একাদশ শতাব্দিতে মুরদের (Moor) দ্বারায় স্পেইনে যায়, এবং স্পেইন হইতে ফ্রান্সে যায় এবং এই প্রকারে সমস্ত ইউরোপে যাইতে আরম্ভ করে।

এখনো ইউরোপীয় অনেক দেশে হস্ত পরিচালিত প্রথায় কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। যুক্তরাজ্যের মাসাচুসেট্‌ (Massachusset) প্রদেশের অ্যাডাম (Adum) নামক স্থানে একমাত্র একটী কলে এখনও এদেশে হস্ত পরিচালিত প্রথায় কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। এই হস্ত প্রস্তুত কাগজ অত্যন্ত শক্ত ও সুন্দর এবং অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। হস্ত পরিচালিত প্রথায় পাঁচ জনা লোক এক দিনে তিন রিমের অধিক কাগজ প্রস্তুত করিতে পারে না।

যে সমস্ত হস্তপ্রস্তুত কাগজ এ রাজ্যে ব্যবহৃত হয় তাহার অধিকাংশই জাপান হইতে আমদানি হয়। কিঞ্চিৎ পরিমাণ ফ্রান্স ও ইটালী হইতেও আমদানি হয়। আধুনিক সময়ে ইম্পিরিয়াল্‌জাপানিজ্‌ ভেলাম (Imperial Japanese

Vellum) নামক হস্ত প্রস্তুত কাগজই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং অত্যন্ত অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। ইহার এক রিম্ (৫০০ পাঁচ শত তা) চারি শত বায়াত্তর টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়। প্রকৃত ইম্পিরিয়াল জাপানিজ্ ভেলাম (Imperial Japanese Vellum) কাগজের পরীক্ষা অতি সহজেই করা যায়। যদি ইহা প্রকৃত উক্ত কাগজ হয়, অত্যন্ত মসৃণ থাকা সত্ত্বেও, কোন প্রদীপের শিখার বিপরীত দিকে ধরিলে, পশমী কাপড়ের ন্যায় দেখাইবে। অন্য উপায়েও এ পরীক্ষা করা যাইতে পারে। একটুক্রা ঐ কাগজ জলের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে যদি বিস্তৃত থাকে তাহা হইলে ইহা প্রকৃত, আর যদি কোঁকড়া হইয়া যায় তবেই জানা যায় ইহা নকল।

অনেক সময় কাগজে জলছাপা দেওয়া যায়। কাগজ ভিজা থাকিতে থাকিতে ইস্পাতের ছাঁচ দ্বারা (Steel die) এই ছাপ দেওয়া হইয়া থাকে।

নষ্ট কাগজ আবার কাগজ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহা ফেলা যায় না।

এই যুক্তরাজ্যে এক ব্যক্তি কাগজ দ্বারা রাঁধিবার কড়া ডেক্‌চি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছেন। তিনি এই সমস্ত পদার্থ কাগজের উপর তাঁহার আবিষ্কৃত অদাহ্য এনামেলের প্রলেপ দান দ্বারাই করিতেছেন।

রসায়নের গুণে কাগজ দ্বারা কি না হইতেছে? ইহা দ্বারা গাড়ির চাকা, অদাহ্য ছাত (ceiling), কৃত্রিম দন্ত, ঘরের মেঝে, জলের বাল্‌তি, জানালার জাল, খড়খড়ি, ফিল্‌টার, সুতা, পোষাকের লাইনিং (dress-lining) প্রভৃতি আরোও অনেক পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে।

পুরাতন কাগজের কালী উঠাইতে পারিলে কাগজের মূল্য অনেক হ্রাস হইবে, সেই জন্যই খবরের কাগজ ও পুস্তকের মূল্য অনেক কমিবে। যে পণ্ডিত ইহা করিতে সমর্থ হইবেন তিনি সাধারণের অত্যন্ত ধন্যবাদার্হ হইবেন। ছাপার কালিতে তিসির তৈল এবং রজন থাকার দরুণ কোন রাসায়নিক পদার্থই এ পর্য্যন্ত ইহা উঠাইয়া ফেলিতে সমর্থ হয় নাই।

কালিফর্নিয়া।　　　　শ্রীনিরুপমচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা।

আভিজাত্য।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই আভিজাত্যের উপর অল্প বা অধিক পরিমাণে লোকের শ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন দেশে আভিজাত্য সম্পন্ন ব্যক্তিরা ভূমির অক্ষুণ্ণ স্বত্বাধিকারী হইয়া আছেন, এমন কি সূচ্যগ্র ভূমিও অনভিজাতদিগের অধিকৃত নহে। তাহারা কেবল কর প্রদান পূর্ব্বক কর্ষণাদি করিতে অথবা করাইতে পারে। ভূমি সম্পর্কিত কথা বাদ দিলেও দেখিতে পাই যে, সমাজেও অভিজাতদিগের অনেক বিষয়ে অপ্রতিহত প্রভুত্ব রহিয়াছে। তাঁহারা দক্ষিণা পাইলেই অনভিজাতকে ইচ্ছা পূর্ব্বক আভিজাত্যের সম্মানে অলঙ্কৃত করিতে পারেন। কাহার সাধ্য যে, তাঁহাদিগকে প্রসন্ন না করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। পক্ষান্তরে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে আভিজাত্যশূন্য ব্যক্তিদিগকে যৎপরোনাস্তি অপদস্থও করিতে সমর্থ আছেন। অন্যান্য সাধারণ কার্য্যে তাঁহাদের সহিত অনভিজাত মনীষিবর্গ যোগদান করিতে পারিলেও এক ভোজ্যাধারে ভোজন প্রভৃতি সাম্যমূলক ব্যবহারে তাহাদিগকে বঞ্চিত থাকিতে হয়। এইরূপ নিদর্শনও পাওয়া যায় যে, আভিজাত্যশূন্য উচ্চপদস্থ রাজপুরুষও নিম্নপদস্থ অভিজাত রাজপুরুষের সহিত এক ভোজ্যাধারে ভোজন করিতে অধিকারী হয়েন না। এরূপ নিয়মে না হউক, কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্বাংশেই কোন না কোন প্রকারে অভিজাত-দিগের গৌরব অনভিজাত অপেক্ষা অধিক রহিয়াছে। একজাতি হইতে অপর জাতির আভিজাত্য অন্যরূপ হইতে পারে, পরন্তু এমন জাতি বিরল আছে, যাহাকে আভিজাত্য সংস্কার অধিকৃত করে নাই। এই ত গেল মর্ত্ত্যলোকের কথা—আবার স্বর্গেও আভিজাত্যের রাজপথ পরিষ্কৃত রহিয়াছে; সেখানেও এক দেবতা অন্য দেবতার সমকক্ষতা করিতে পারেন না। যখন স্বর্গ মর্ত্ত্যলোকবাসীরই মনঃ-কল্পিত, তখন সেইখানেও যে তাহাদের আভিজাত্যভাব প্রবেশ করিবে ইহাতে বৈচিত্র্য কি আছে?

পুরাকালে সরস্বতী দেবীর লীলারঙ্গভূমি একমাত্র অভিজাতদিগের হৃদয় ও রসনা ছিল, এই জন্য অনভিজাত-বৃন্দ যদিচ্ছাক্রমে তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হইতেন।

এইক্ষণে বিদ্যার ব্যাপ্তি জনসাধারণের মধ্যে হইতে চলিল, সুতরাং বর্ত্তমান অনভিজাতেরা আর বড় অভিজাতদিগের নেতৃত্বে সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বিদ্যা, ধন প্রভৃতি মানবীয় অভ্যুদয়কারী যে সকল জিনিষ আছে, তাহাতে মনুষ্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার। এইগুলি একমাত্র অভিজাতদিগের স্বাধিকৃত হইতে পারে না। এই কারণে পৃথিবীতে আভিজাত্য ও অনাভিজাত্য লইয়া একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে; ভগবান্‌ই নিশ্চয়রূপে বলিতে পারেন কোনপক্ষ বিজয়লক্ষ্মী লাভ করিবে। তবে সম্ভাবনা এই যে, সংখ্যা, উৎসাহ ও কার্য্যপটুতার গুরুত্ব বা আধিক্যে অনভিজাতেরাই এই সংগ্রামে বিজয়ী হইবেন। অধিকন্তু সংগ্রামকালে উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষই শান্তিসুখ উপভোগ করিতে পারেন না, উভয়কেই বিজয়াশাপ্রণোদিত হইয়া রণসম্ভার সংগ্রহে ব্যস্ত থাকিতে হয়। তাই আজ পৃথিবীর কোথাও শান্তিদেবীকে বিরাজমানা দেখিতে পাওয়া যায় না; সর্ব্বত্রই যেন অশান্তির তপ্ত প্রস্রবণ বহিতেছে। পূর্ব্বে যাহারা যে অভিজাত বিশেষের আজ্ঞাবহ ভৃত্যত্ব বা উচ্ছিষ্ট ভোজনেও আপনাকে ধন্য মনে করিত, তাহারা আর এক্ষণে তাঁহাদিগকে আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়াও মানিতে চাহে না। এই ত গেল অনভিজাতের কথা। আবার অনেক অভিজাত মহোদয় বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য বা "স্তম্ভেন নীবার ইবাবশিষ্ট" উক্তির লক্ষ্য হইয়াও আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ অথবা তাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ পণ্ডিত এবং সম্পন্ন ছিলেন বলিয়া 'ডম্‌-ম্‌-ম্‌' করিতে ছাড়েন না। এই উভয় গুণধরদিগের কৃতিনৈপুণ্যে সমাজে একটা অভিনব বিশৃঙ্খল ভাব আসিয়া পড়িয়াছে।

আভিজাত্যকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম ধর্ম্মের আভিজাত্য, দ্বিতীয় বিদ্যার আভিজাত্য, তৃতীয় ভূমির আভিজাত্য ও চতুর্থ ধনের আভিজাত্য। প্রথম ও দ্বিতীয় আভিজাত্যের মূলে অন্যায় বা অধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায় না, পরন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ আভিজাত্যের ভিত্তি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলে অন্যায় এবং অধর্ম্ম ছাড়া বড় কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। পাওয়া যাইবে কি প্রকারে? পরমেশ্বর জমির সৃষ্টি করিয়াছেন জীব মাত্রের অথবা মানব মাত্রের জন্য, তাহাতে বলদৃপ্ত হইয়া অন্যের উপভোগ্য অংশ স্বায়ত্ত করিয়া লওয়া ডাকাতিরই নামান্তর মাত্র। পক্ষান্তরে কতকগুলা লোক ধনী হইয়াছে আর কোটী কোটী নরনারী দারিদ্র্যের তীব্র নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইতেছে, ইহার অর্থ কি ইহা নহে যে উহাদের প্রাপ্য অংশ ছলে বলে কৌশলে ধনিমহোদয়েরা আত্মসাৎ করিয়াছেন? ধনরাশি যদি কোষাগারে তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গ হইতে আপনা আপনি ঝর ঝর করিয়া পড়িত, তবে বলিতে পারিতাম যে, ঐগুলি একমাত্র তাঁহাদের প্রাপ্য। একজন ধনকুবের হইলেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র লোকের স্কন্ধে দুরারোহ অকিঞ্চনতা আসিয়া চাপিল। আমাদের বোধ হয় রাজত্ব ও ধনাগমের এইরূপ করাল দৃশ্য দেখিয়া বা অনুভব করিয়া ভারতের প্রাচীন ঋষিবৃন্দ নিখিল আভিজাত্যের মধ্যে ধর্ম্ম ও বিদ্যার আভিজাত্যকে সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়াছিলেন। এইক্ষণেও ভারত হইতে ঐপ্রকার ভাব নির্ম্মূল হয় নাই; আজ ও অকিঞ্চন মহাপুরুষকে রাজ্যেশ্বর পর্য্যন্ত ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন, আজও শাকান্নভোজী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহারাজেরও অভ্যর্থনায় বঞ্চিত নহেন; তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, দিন দিন যেরূপ প্রতীচ্যভাবের প্রসার হইতে চলিল, ইহাতে অদূর ভবিষ্যতেই উহা অদৃশ্য হইতে পারে।

বর্ত্তমান পৃথিবীতে তৃতীয় ও চতুর্থ আভিজাত্যের অধিক গৌরব—এই দুই আভিজাত্যের মধ্যে একটীও যাঁহাদের আছে, তাঁহাদিগকে বক্ষ স্ফীত করিয়া চলিতে দেখা যায়। কেবল ইহা হইতেই যদি গুণধরেরা তৃপ্তিলাভ করিতেন তবে তত অনর্থপাতের আশঙ্কা হইত না। কিন্তু তাহারা অনভিজাতদিগের উন্নতিকে চক্ষুর শূল মনে করেন; প্রভুরা চাহেন যে, অনভিজাতেরা শ্রমজীবী বা কৃষক শ্রেণীতে পরিণত থাকিয়া তাঁহাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্যত্ব বা অধমর্ণ পদই অলঙ্কৃত করুক। এই শ্রেণীর মহাপুরুষদিগের ধারণা যে, সুখ সম্ভোগ ও শান্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণ কেবল অভিজাতদিগের জন্য নিয়মিত হইয়াছে। আহা প্রভুরা কি অপরূপ ধারণা করিয়া বসিয়াছেন! জিজ্ঞাসা করি, অনভিজাতেরা কি লোষ্ট্র বা উপলখণ্ডের ন্যায় সুখ সংভোগের শক্তিতে বঞ্চিত রহিয়াছে? তাহারা বিদ্যা বুদ্ধি ও সুনীতি প্রভৃতিতে কি অভিজাতদিগের প্রতিযোগিতা করিতেছে না? অনভি-

জাতেরা দিবারাত্রি পরিশ্রম করুক, আর তোমরা তাহাদের পরিশ্রমলব্ধ দ্রব্যদ্বারা কেহ রাজসিংহাসন সুশোভিত কর, কেহ বিলাসনন্দনবনের পুরন্দর হও—এই অদ্ভুতনীতির সমাদর তোমাদের নিকট হইতে পারে; পরন্তু কোন উদারচেতা মনীষীই ইহা অনুমোদন করিতে পারেন না।

পাঠক বুঝিতে পারিলেন যে যাঁহারা রাজ্য ও ধনের আভিজাত্য লইয়া অহঙ্কারে ফুলিয়া থাকেন, তাঁহারাই পৃথিবীতে দারিদ্র্য প্রসারিত হইবার মূলে রহিয়াছেন। পৃথিবীতে যত ধন ও জমি আছে ঐগুলি যদি সমভাগে জনসাধারণে বিভক্ত হয় তবে দারিদ্র্যই দরিদ্র হইয়া যায়। বিচারচক্ষু খুলিয়া দেখিলে ভূস্বামী ও ধনীদিগকে আমরা লৌকিক চক্ষে যেরূপ দেখিতে পাই তাহার বিপরীতভাব ঘটিয়া থাকে। বোধ হয়, যেন তাঁহারা অনভিজাতদিগের বক্ষে ছুরিকা প্রহার করিতেছেন। রাজ্য ও ধনের অভিজাতেরা সকল বিষয়ে অন্যথাসিদ্ধ না হইলেও যে, অনভিজাতদিগের অভ্যুদয়ক্ষেত্রে পঙ্গপাল স্বরূপ, এই বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। জমি ও ধন যদি একশ্রেণীর লোকের স্বাধিকৃত রহিল, তবে যে অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরা দৈন্য ও দুঃখে কাল হরণ করিবে, এইরূপ হইবারই কথা। তাহার কারণ এই যে এই দুইএর উপর লৌকিক সুখ নির্ভর করিতেছে। পক্ষান্তরে দীন ও দুঃখীর বিদ্যা ও সভ্যতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ আসিতে পারে না। আসিবে কিরূপে? তাহারা সর্ব্বদাই আত্মীয়ের পোষণ চিন্তায় ব্যস্ত থাকে, এমন কি উদর পূর্ণ করিয়া আহারও প্রাপ্ত হয় না। এদিকে ভূস্বামী ও ধনবানেরা তাহাদের প্রাপ্য অর্থ আত্মসাৎ করিয়া অজস্র উহার অপব্যবহারে নিযুক্ত আছেন। ভ্রমেও তাহাদের ঐরূপ শোচনীয় দশার প্রতি প্রভুদের দৃষ্টি পড়ে না। ইহা কেবল নিজের আত্মীয়বর্গের অথবা সমশ্রেণীর চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে। তাঁহারা অসমশ্রেণীর প্রতি যদি কদাচিৎ দয়াও করিতেছেন মানিয়া লওয়া যায়, তথাপি নগ্নপদ অকোমলাঙ্গ কৃষিবল ও শ্রমজীবীর প্রতি ভালবাসায় যে স্বপ্নও দেখেন, তাহা কোন প্রকারে স্বীকার করিতে পারা যায় না। পরন্তু বিবেক উপদেশ করে যে, যাহাদিগকে তাঁহারা ঘৃণা করিতেছেন, তাহাদের উপরেই প্রভুদের জীবনরক্ষার ভার রহিয়াছে। কৃষক যদি শস্য উৎপাদন না করে এবং শ্রমজীবী যদি দ্রব্যসম্ভার বহন প্রভৃতি ব্যাপারে বিরত হয়, তবে অবিলম্বেই তাঁহাদিগকে এই সাধের লীলাভূমি হইতে অন্তর্ধান করিতে হইবে। সুবর্ণমুদ্রা চর্ব্বণ পূর্ব্বক যে, কেহ কখন জীবনধারণ করিয়াছে ইহা শুনিতে পাওয়া যায় কৈ? যে কৃষক ও তদীয় পত্নী বালক বালিকার সহিত দুঃসহ শীতাতপ সহন পূর্ব্বক মানবীয় জীবন রক্ষার মূল বস্তু উৎপন্ন করে, এই পাপ পৃথিবীতে তাহারাই অনাহারে মরিয়া যায়। সংক্রামক ব্যাধিও ঐ হতভাগ্যদিগকেই আক্রমণ করে। প্লেগে যত লোক মৃত্যুর কবলে পতিত হয় তাহাদের মধ্যে ধনীর সংখ্যা অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। সদাশয় ভূস্বামী ও ধনিবৃন্দ যদি বিবেকের নির্জ্জন কুটীরে বসিয়া ভাবেন যে তাঁহাদের ঐ ভূমি ও ধন কোথা হইতে অধিকৃত হইল, তবে অবশ্যই তাঁহারা এইরূপ দেববাণী শুনিতে পাইবেন যে, "হে ভূস্বামিন ও ধনিবৃন্দ ঐ ভূমি ও ধন সাধারণের; ঐগুলি তোমাদের বা ত্বদীয় পিতৃপুরুষদিগের নহে। তোমরা, যদি পাপ হইতে মুক্ত হইতে চাও, তবে অবিলম্বে সাধারণের হিতার্থ ঐগুলিকে উৎসর্গ করিয়া দাও। নতুবা অদূর ভবিষ্যতেই শ্রমজীবী ও কৃষকদিগের অভিসম্পাতে তোমাদিগকে দগ্ধ হইতে হইবে।"

অবশ্যই রাজ্য ও ধনের অভিজাতদিগের মধ্যে সদাশয়ও রহিয়াছেন, পরন্তু ঐ সদাশয়দিগকে সদাশয়তা গুণের জন্য সম্মান করা উচিত হইলেও কদাপি অভিজাত বলিয়া জনসাধারণ তাহাদিগের অভিনন্দন করিতে পারে না। না, পারিবেন কি প্রকারে? এইরূপ আভিজাত্য প্রবর্ত্তনের কাহিনী শুনিবা মাত্রই নীতিপরায়ণ সহৃদয় ব্যক্তি কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করেন। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, অভিজাতবংশের রীতিনীতি ভালই হইয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করি দুইটা মিষ্ট কথা অথবা কায়দার সহিত ভদ্রলোকের সমক্ষে উপবেশন আদি করাই কি ইহার অর্থ? যদি এইরূপই হয়, তবে ঐ ভাল হওয়ার জন্য আভিজাত্যকে সম্মান না দিয়া ভদ্রলোকদিগের সহবাসকে উহা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। ধরাধামে এমন অভিজাতও বিরল নহে, যাহাকে একটা মনুষ্যাকৃতি অভিনব বলিবর্দ্দ মাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদি আভিজাত্যের ঐরূপ মহিমাই

হইত, তবে কি আমরা এইরূপ দৃশ্য দেখিতে পাইতাম। উক্ত অভিজাতবংশের প্রবর্ত্তক যে, প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্ন লুণ্ঠনকারী ছিলেন, সত্যের অনুরোধে বাধ্য হইয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

এই পর্য্যন্ত রাজ্যও ধনসংক্রান্ত আভিজাত্যের আলোচনা করা গেল। এই ক্ষণে ধর্ম্ম ও বিদ্যার আভিজাত্য বিষয়ে গুণাগুণের অনুসন্ধান করা যাউক। পিতা মাতার ধর্ম্মভাব যদি নিয়তরূপে সন্তানে সংক্রমিত হইত, তবে বিদ্যা ও ধর্ম্মের আভিজাত্য এই মরজগতে অতি আদরের জিনিষ হইয়া পড়িত; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অনেক স্থলে ইহার বৈপরীত্য দেখিতে পাওয়া যায়। দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ ইহার উদাহরণ স্থল। অধিকন্তু রাজ্য ও ধনের আভিজাত্য যেরূপ অনভিজাতদিগের রুধির শোষণ না করিয়া পরিতৃপ্ত হয় না, তদ্রূপ এই আভিজাত্য নহে। বরং ইহা দ্বারা অনেক বিষয়ে সমাজের উপকার সংসাধিত হয়। যদ্যপি পুরাকালের পৌরোহিত্যও এরূপ করাল দৃশ্য দেখাইয়াছে, তথাপি বর্ত্তমান সময়ে উহা তিরোহিতপ্রায়। এক্ষণে আর কোন সভ্যসমাজে প্রকাশ্যভাবে পুরোহিতের যথেচ্ছাচার দৃষ্টিগোচর হয় না। স্মরণাতীত কাল হইতে আর্য্যভূমিতে যে, সন্ন্যাসীদিগের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি চলিয়া আসিতেছে, তাহাও দৈনন্দিন সঙ্কোচনীতির অনুসরণ করিতেছে। প্রতীচ্য শিক্ষার প্রভাব যাঁহাদের উপর অক্ষুণ্ণ আছে তাঁহারা বড় সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না। যাহারা স্বয়ং অশিক্ষিত এবং শিক্ষিত লোকের ভাবে বঞ্চিত, তাহারাই তদীয় সেবায় আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়া থাকে। ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ অনেক সাধু সন্ন্যাসী আছেন, যাঁহাদের মধ্যে আভিজাত্য ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ গুণ দেখিতে পাওয়া যায় না; ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধিরও অভিমান করিয়া থাকেন। অনেকে আবার স্বয়ং সিদ্ধির অভিমান না করিয়াও গুরুকে অথবা গুরুর গুরুকে সিদ্ধের সর্দ্দার বলিয়া ঘোষণা করেন। সত্যের অনুরোধে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, এইরূপ সাধু সন্ন্যাসীরা ভারতবাসীর গলগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই নহেন। অবশ্যই সদাশয় মনীষী সন্ন্যাসীরা পৃথিবীর কল্যাণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাই বলিয়া কি নিরক্ষর ভেগাবণ্ড অর্থাৎ ভবঘুরেদিগেরও গুণ গাইতে হইবে? ভারতে এই জাতীয়তার অরুণোদয় সময়ে সাধু সন্ন্যাসীরা যদি দেশের কল্যাণে ব্রতী হয়েন, তবে এক মহান কার্য্য সংসাধিত হইতে পারে। বঙ্গভূমির অনেক ভট্টাচার্য্য মহোদয়েরা স্বদেশের হিতসাধন করিতেছেন শুনিয়া সুখী হওয়া গেল। ভারতে যে জাতীয়তার অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে ভট্টাচার্য্যদিগের ত কথাই নাই আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে ভক্তিবারি সেচন পূর্ব্বক ঐ অঙ্কুর যাহাতে মহাবৃক্ষে পরিণত হয় তাহা করিতে হইবে। আবহমানকাল হইতেই আর্য্যভূমির সদাশয় সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণগণ জনসাধারণকে কল্যাণের পথ দেখাইয়া আসিতেছেন। আশা করি বর্ত্তমান সময়েও তাঁহারা এইরূপ করিবেন।

রাজ্য ও ধনের আভিজাত্য প্রবর্ত্তক যেরূপ অন্যের প্রাপ্য অংশ আত্মসাৎ করিয়া আসিয়াছেন, সেইরূপ ধর্ম্ম ও বিদ্যার আভিজাত্য প্রবর্ত্তক নহেন। এই আভিজাত্যের মূল অতীব পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক; কিন্তু পশ্চাৎ ইহাও ক্রমনীতিতে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। যখন প্রথম ও দ্বিতীয় আভিজাত্যের মূল শুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক, পক্ষান্তরে তৃতীয় ও চতুর্থ আভিজাত্যের মূলদেশের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিলেও অন্যায় এবং নৃশংসতার মাত্রা অধিক হইতে ও অধিকতম দেখিতে পাওয়া যায়; তখন আভিজাত্যের প্রবর্ত্তক লইয়া যে অভিজাতেরা গৌরব করিয়া থাকেন, তাহা প্রথম ও দ্বিতীয় আভিজাত্যশালী ব্যক্তিদিগের পক্ষেই উচিত। তৃতীয় ও চতুর্থ আভিজাত্যের লোকদিগের পক্ষে বরং উহা স্মরণ করিয়া অধোবদন হওয়াই বিধেয়। দেখিতে পাই অনেকেই তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ রাজকীয় উচ্চ কর্ম্মচারী বা বীরপুরুষ ছিলেন বলিয়া অভিমানের বর্ষণ আরম্ভ করেন; পরন্তু অল্পবেতনের কর্ম্মচারী হইয়া তাঁহারা কিরূপে রাশীকৃত অর্থের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা কি প্রভুরা কখন ভাবিয়া দেখিয়াছেন? পক্ষান্তরে বীরত্বের গৌরব ঠিক বলা যাইতে পারিত, যদি ঐ বীরপুরুষ স্বয়ং জমির সৃষ্টি করিয়া লইতেন। আর অন্যের জিনিষ কাড়িয়া লওয়াও যদি সম্মানের কারণ হয়, তবে দস্যুদিগকে কেন আমরা সম্মান করি না? বৈষম্য ত কেবল লোকসংখ্যাতেই পাওয়া যায়, অর্থাৎ দস্যুর দল ছোট আর এই প্রকার বীরের দল বড়।

স্বর্গীয় মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য ।

পাঠক অনুধাবন করুন এই শ্রেণীর লোকেরাই জনসাধারণের উন্নতি রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, স্বার্থের দাস হইয়া ইঁহারাই স্বকীয় ভ্রাতৃগণের শোণিত পান করিতেছেন। পরন্তু ইহা নিশ্চিত যে কোন শ্রেণীর প্রভুত্ব চিরদিন সমভাবে চলিতে পারে না। অদূর ভবিষ্যতে যে ইঁহাদের আধিপত্য চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে, তাহার পূর্ব্বসূচনা আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণেও যদি তাঁহারা সাবধান হন, অর্থাৎ উদারতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সাধারণের হিতকর কার্য্যে ধনের উৎসর্গ করেন, তবে বিপৎপাতের সম্ভাবনা থাকে না।

অন্যান্য দেশের অপেক্ষা ভারতের আভিজাত্যপ্রথা উৎকৃষ্ট হইলেও যে, সাধারণের উন্নতির পরিপন্থী এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভূমি ও ধনের ন্যায় ধর্ম্ম এবং বিদ্যা যে বংশবিশেষেরই একচেটিয়া থাকিবে ইহাতে কি কোন যুক্তি আছে? বিশ্বরূপ শ্রীভগবানের রাজ্যে সকল বিষয়েই মানব মাত্রের তুল্য অধিকার; যিনি ইহার সঙ্কোচ করিতে যাইবেন, তাঁহাকে মহাপাপে লিপ্ত হইতে হইবে। সুতরাং আভিজাত্যের অভিমানকে এই যুগে বটপত্রে ভাসাইয়া দেওয়াই যুক্তি সঙ্গত। বিশেষ বিবেচ্য এই যে, যেরূপ সময় পড়িয়াছে তাহাতে যদি অভিজাতবৃন্দ স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া অনভিজাতদিগের সহিত সাম্যমূলক ব্যবহার করেন, তবে তদীয় মহত্বই প্রকাশ পাইবে। আর যদি দলননীতির অনুসরণ পূর্ব্বক অনভিজাতদিগের রুধির শোষণে ব্রতী থাকেন, তবে তাঁহারা অচিরেই অব্যক্ত অবস্থায় উপনীত হইবেন। বস্তুতঃ এই মরজগতে ঘটনা মাত্রেরই আদি ও অন্ত অব্যক্ত, কেবল মধ্য অবস্থাই অভিব্যক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বিস্ময়ের কারণ এই যে, এইরূপ সমস্যাতেও অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি ন্যায় পথে চলিতে চাহেন না, তাঁহারা স্বার্থের মোহনবেশ দেখিয়া একবারে উহা ভুলিয়া যান! এমন কি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন! আমরা অভিজাতদিগের মঙ্গল কামনা করিয়া আলোচ্য বিষয়ের উপসংহারে আবার বলিতেছি অনভিজাতদিগকে তাঁহারা প্রাণের ভালবাসা অর্পণ করুন, অবিলম্বে সকল জঞ্জাল ঘুচিয়া যাইবে, পৃথিবীতে শান্তির হিল্লোল বহিতে থাকিবে।

"নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" পরিব্রাজক

অনুপসহর। অচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা।

মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য।

গত ১১ই নভেম্বর পঞ্জাবের শ্মশান-চিতায় প্রবাসী বাঙ্গালী মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্যের শবদেহ ভস্মীভূত হইয়াছে। মন্মথনাথ পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন এবং পিতার জ্ঞানপ্রিয়তা, অমায়িকতা, পরোপকারপ্রবৃত্তি প্রভৃতি বহুগুণের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মন্মথনাথ জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৫ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। এই বয়সে তিনি যেরূপ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন তাহা সকলের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে মন্মথনাথের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

মন্মথনাথ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। এই কলেজ হইতে তিনি বি,এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম,এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষাতেই তিনি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি সংস্কৃত কলেজের উপাধি পরীক্ষায় "বিদ্যারত্ন" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি অত্যল্পকাল মধ্যে আপনার কার্য্যদক্ষতায় সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার কার্য্য লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছেন। মান্দ্রাজ, রেঙ্গুন, শিলং, কলিকাতা, নাগপুর—নানাস্থানে কার্য্য করিবার পর মন্মথনাথ পঞ্জাবের একাউন্‌টেণ্ট জেনারল পদ লাভ করেন ও লাহোরে যাইয়া ৩রা নভেম্বর কার্য্যভার গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য ইতঃপূর্ব্বে আর কোন ভারতবাসী এই পদ লাভ করেন নাই। পরদিন তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন, এবং আট দিনে পীড়া সাংঘাতিক হইয়া তাঁহার জীবন নষ্ট করে। ইংরাজাধিকৃত ভারতে মন্মথনাথ প্রথম ভারতবাসী একাউন্‌টেণ্ট-জেনারল।

কিন্তু মন্মথনাথের গৌরব বিদ্যায় বা উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর পদে নহে; পরন্তু সরল ও সবল মনুষ্যত্বের বিকাশে। তাঁহার মত সরল ও অমায়িক লোক দুর্লভ। তিনি লোকের

উপকার করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করিতেন। তিনি প্রবাসে যখন যেস্থানে যাইতেন তখন সেইস্থানে তাঁহার গৃহ বাঙ্গালীদিগের মিলনমন্দিরে পরিণত হইত। তিনি যৎকালে মাদ্রাজে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ নামে প্রসিদ্ধ নরেন্দ্রনাথ তাঁহার গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ তখন আমেরিকায় যাইতে ইচ্ছুক, কিন্তু পাথেয়সম্বলশূন্য। মন্মথনাথ উদ্যোগী হইয়া সভা আহ্বান করিয়া তাঁহার আমেরিকা-যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সেই সভায় নরেন্দ্রনাথের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দুই সহস্র টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল।

রেঙ্গুনে অবস্থানকালে মন্মথনাথ প্রত্যহ ষ্টীমার ঘাটে বেড়াইতে যাইতেন, জাহাজ হইতে কোন বাঙ্গালী নামিলে সাদরে তাঁহাকে আপনার গৃহে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেন। মৌলবী আব্দুল জব্বর ব্যতীত আর কোন প্রবাসী বাঙ্গালীর এরূপ স্বজাতিপ্রীতির কথা আমরা জানি না। কত অভিমানী, গৃহত্যাগী বালক তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া অ্যাডভোকেট হইয়াছে। আর তিনি যে কতজনের চাকরী করিয়া দিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

তিনি যখন নাগপুরে ডেপুটী কন্‌ট্রোলার তখন নাগপুরে প্লেগের প্রবল প্রকোপ, প্রতিদিন শত শত লোক এই বিষব্যাধির অতর্কিত আক্রমণে প্রাণ হারাইতেছে। ধনবানগণ সহর পরিত্যাগ করিতেছে। সকলেই ভীত। মন্মথনাথ দরিদ্রদিগের দুঃখ দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইলেন। তিনি আপনার গৃহপ্রাঙ্গনে তাম্বু খাটাইয়া নিরাশ্রয় প্লেগপীড়িত রোগীর চিকিৎসার ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিলেন; সময় সময় স্বয়ং রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এমন অসাধারণ সহানুভূতি ও দয়া সচরাচর দেখা যায় না। নাগপুরবাসীরা মন্মথনাথের গুণে মুগ্ধ হইয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে "ধর্ম্মরাজ" বলিত।

আশ্রিত, অনুগত ও অধস্তন কর্ম্মচারী—সকলকেই মন্মথনাথ আপনার মনে করিতেন। তিনি আফিসের কেরাণীদিগের সহিত বন্ধুভাবে আলাপ করিতেন বলিয়া তাঁহার কোন পদগর্ব্বগর্ব্বিত বন্ধু একবার তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। মন্মথনাথ হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—উহারা কি আমার সমকক্ষ নহে? যতক্ষণ আপিসের কাযে থাকি, ততক্ষণ উহারা আমার অধীন সত্য; কিন্তু তাহার পর আমরা সকলেই সমান। মন্মথনাথ যখন নাগপুরে তখন উপরওয়ালা য়ুরোপীয়কে সামান্য দোষে কেরাণীদিগকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিতে দেখিয়া তিনি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী বলেন, অর্থদণ্ড ব্যতীত কেরাণীরা ত্রুটিসংশোধনে সচেষ্ট হইবে না। শুনিয়া মন্মথনাথ বলেন, একবার জরিমানা রদ করিয়া—কেবল সতর্ক করিয়া দিলেই তিনি বুঝিবেন—জরিমানা অনাবশ্যক, কেবল দরিদ্রের পীড়ন। তাঁহার কথায় য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী সেবার জরিমানা রদ করিলেন; ফলে দেখিলেন ও বুঝিলেন, জরিমানা অনাবশ্যক। একটি ব্রাহ্মণ যুবক পাচকরূপে বহুদিন মন্মথনাথের সেবা করিয়াছিল। তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক জানিয়া এবং বিবাহ ব্যয় নির্ব্বাহে অসমর্থ জানিয়া মন্মথনাথ স্বয়ং সমস্ত ব্যয় বহন করিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং বিবাহের পর সস্ত্রীক তাহাকে এক দিনের জন্য আপনার গৃহে আনিয়া তাহার ব্যবহার জন্য আপনার শয়নকক্ষ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। যে দুর্ল্লভ সহানুভূতির পূত প্রবাহে সকল প্রভেদ ভাসিয়া যায় মন্মথনাথের হৃদয়ে সেই সহানুভূতি নিত্যপ্রবাহিত ছিল। মন্মথনাথ যখন নাগপুর ত্যাগ করেন তখন তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদানের উদ্যোগ হয়। মন্মথনাথ চেষ্টা করিয়া তাঁহার গুণমুগ্ধদিগকে সে চেষ্টা হইতে নিরস্ত করেন। কিন্তু যখন এই অভিনন্দন পত্র প্রদানের উদ্যোগ হয় তখনই তাঁহার অধীনস্থ একজন কর্ম্মচারী তাঁহার উপরওয়ালাদিগকে সে কথা জানাইয়া লিখেন যে, মন্মথ বাবু নিয়মবিগর্হিত কার্য্য করিতেছেন। উপরওয়ালা য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী মন্মথনাথকে স্নেহ করিতেন, তিনি অভিযোগকারীর ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাহার ব্যবহারের কথা মন্মথনাথকে জানান। বলা বাহুল্য মন্মথনাথ তাহাকে কোন রূপ শাস্তিদান করেন নাই। পরন্তু অল্পদিন পরে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া তাঁহার নিরন্ন পুত্রকে একটি চাকরী জোগাড় করিয়া দেন।

মন্মথনাথ বিদ্যানুরাগী ছিলেন, এবং নিজ ব্যয়ে স্বগ্রামস্থ বিদ্যালয়ের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

নানা গুণে মন্মথনাথ লোকের শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ অর্জ্জন

করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ চাঁদা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ কলিকাতায় অ্যালবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতালে একটি গৃহ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদিগের এই সাধু চেষ্টা সফল হইলে দুঃখী দরিদ্রের যথেষ্ট উপকার হইবে এবং মন্মথনাথের স্মৃতি রক্ষার উপযুক্ত কার্য্যই হইবে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

কেদার রায়।

বাঙ্গাল কেদার রায় ;—
ঘোষিল উচ্চে বজ্র কণ্ঠে
"নাহি মানি বাদশায়।"
বৃদ্ধ মন্ত্রী মানিয়া বিস্ময়,
হস্তযুগল যোড় করি কয়,
"যুদ্ধ করিবে বাদশার সনে !
পারিবে আঁটিতে তায় ?"
"মরিব, তবু স্বাধীন মরিব,"
কহিল কেদার রায় !

কেদার মহাবীর,
বসেছে উচ্চ সিংহাসনে,
সৌম্য, শান্ত, ধীর ;—
দূত আসিয়া নিবেদিল ধেয়ে,
পঞ্চশত রণতরী নিয়ে,
মানসিংহ-প্রেরিত মন্দা
ঘিরেছে পদ্মাতীর ;
"সাজ-সাজ," শুধু কহিল ডাকিয়া
বাঙ্গাল কেদার বীর !
পদ্মা তরঙ্গিণী,
নাচিল রঙ্গে বীর কল্লোলে
ভীষণ রঙ্গিণী !
শ্রীপুরের ভীম দুর্গপ্রাচীরে,
আছাড়ি আছাড়ি পড়িছে অধীরে
ব্যগ্র হৃদয়ে জানাইছে যেন—
"আমি আছি সঙ্গিনী !"
নাচিল পদ্মা রঙ্গে ভঙ্গে
ভাসিল রণ-তরণী।

গর্জ্জি উঠে কামান,—
ঝলকিয়া উঠে আগুনের শিখা
হানিয়া মৃত্যুবাণ !
গুড়ুম-গুড়ুম-বুম-বুম-বুম,
আবরি পদ্মা,কামানের ধূম,
বিশাল বিজয় পতাকার মত
ছাইয়া ফেলে বিমান।
ঝলকে ঝলকে আদেশি মরণ
গর্জ্জি উঠে কামান !

ভীষণ গোলার ঘায়,—
খণ্ড খণ্ড মোগল তরণী,
একে একে ডুবে যায় !
পঞ্চ শতেক তরী এসেছিল,
একটীও ফিরি যাইতে নারিল,
ছিন্ন ভিন্ন সকল সৈন্য,
মরিল মন্দা রায় ;
একটীও লোক না ফিরি যাইল
ভীষণ গোলার ঘায় !

বিশাল পদ্মা বুকে,—
মৃদু সমীরণ গুন গুন করি
গান গেয়ে যায় সুখে—
বিক্রমপুরের বীর ডাকি কয়
"কোন্ জনে আর বাঙ্গালীর ভয়
কোমর বাঁধিয়া—হৃদয় বাঁধিয়া,
দাঁড়াইলে বুক্ ঠুকে !"
অতল সলিল গভীর কল্লোলে
বিশাল পদ্মাবুকে।

(যাঁহারা মানসিংহের সহিত কেদার রায়ের যুদ্ধের বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহেন, তাঁহারা Elliot's History of India—Vol VI দেখুন।)

ঢাকা। শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

আলো।

(From "Light" by F. W. Bourdillon.)

নিশা চাহে অগণ্য নয়নে,
দিনের শুধুই এক আঁখি ;—
তবু, সেই একেরি বিহনে
অন্ধকারে বিশ্ব ফেলে ঢাকি'!

শত চোখে চেয়ে দেখে মন,
একই লোচন হৃদয়ের ;
তবু, অন্ধ হ'লে সে নয়ন,
নিবে যায় জ্যোতি জীবনের !

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

আহ্বান।

তুমি নাহি যার তার কেহ নাহি আর—
দিনমণি অস্ত গেলে সকলি আঁধার।
নিবায়ে আলোক এবে দিবা হ'ল শেষ,
খেলা ফেলি' ছুটে আসি' খুঁজি সারাদেশ,
কোথা তুমি, কোথা তুমি, কোথা মা জননি—
আঁধারের শুক-তারা, নয়নের মণি !
যত দাও ওগো ! শিশুমুখে নাহি রুচে
দিব্য রাজভোগ,—তা'র সর্ব্বজ্বালা ঘুচে
মাতা যবে হাতে করে' মুখে দেয় তুলে ;—
আজি দাঁড়াইয়া চির বিরহের কুলে
ডাকি গো তোমায়, দেখা দাও, দেখা দাও,
মানসের চিত্রলেখা বাস্তবে ফুটাও,
ঘুচাও এ অন্তরাল,—ওগো একবার
অন্তরের ধন এস অন্তরে আমার !

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমালোচনা।

তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত—শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ২১০+৪০ পৃষ্ঠা। মূল্য দশ আনা মাত্র। জ্ঞানে গুণে তেজস্বিতায় যে পুরুষ দেশের সকলের শ্রদ্ধাপাত্র তাঁহারই রাজদ্রোহ অভিযোগের আমূল বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। তিলকের যে বক্তৃতায় তাঁহার বিরাট মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহারও বঙ্গানুবাদ ইহাতে আছে। গ্রন্থারম্ভে সংক্ষেপে তিলকের জীবনী ও চরিত্র বিবৃত হইয়াছে। তিলকের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি পরিষ্কার হাফটোন চিত্র ইহাতে আছে। পুস্তকের আকারানুপাতে মূল্য সামান্য করিয়া সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকেরই আয়ত্তগম্য করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

আর্য্যনারী—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত, এম,এ, ও শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার প্রণীত। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ১৭৮ পৃষ্ঠা। কাপড়ে সুন্দর বাঁধা। মূল্য ১৲ টাকা। দেশী এণ্টিক কাগজে পরিপাটীরূপে মুদ্রিত। ইহাতে ২৩ জন পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক আর্য্য রমণীর চরিত্র বিবৃত হইয়াছে। চরিত্রগুলি শুধু উপাখ্যানরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যেক চরিত্রের বিশেষত্ব, মাধুর্য্য বা শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট করিয়া ধরিয়া বুঝানো হয় নাই। ইহাতে অল্পশিক্ষিত পাঠিকাদের একটু অসুবিধা হইবে, এবং আমাদের দেশের পাঠিকারা অধিকাংশই অল্পশিক্ষিত—কোনো চরিত্রের উপাখ্যান পাঠ করিয়া তাহার বিশেষত্ব বাছিয়া বুঝার মত চিন্তাশক্তির উন্মেষ তাঁহাদের প্রায়ই হয় না। যাহাই হউক এখানি অতি উপাদেয় স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। কন্যা ভগিনীদিগকে উপহার দিবার উপযুক্ত।

ঠাকুর দাদার ঝুলি বা বাঙ্গালার গীতকথা—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার প্রণীত। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত। সুপার রয়াল ষোড়শাংশিত ৩৩৬ পৃষ্ঠা। ইহাতে ৫৯ খানি ছোট বড় খোদিত ছবি ও ১৭ খানি হাফটোন ছবি আছে। এতন্মধ্যে তিনখানি ছবি তিন রঙে ছাপা। বড় বড় অক্ষরে মুদ্রণাদি পরিষ্কার। বাঁধানো পরিপাটী। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। ইহাতে পূর্ব্ব-বঙ্গ-প্রচলিত পল্লীকাহিনী সকল সংগৃহীত হইয়াছে। কাহিনীগুলি গদ্য পদ্য সঙ্গীতময়। দক্ষিণা বাবু এই সমস্ত লুপ্ত রত্ন উদ্ধারে ব্রতী হইয়া বঙ্গভাষাকে খাঁটি দেশী সম্পদে সৌষ্ঠবান্বিত করিতেছেন। দক্ষিণা বাবুর বিশেষ কৃতিত্ব পল্লী কথকের ভাষাকে অবিকৃত রাখিতে পারায়। এই পুস্তকখানি আবালবৃদ্ধবনিতার পরম উপভোগ্য। ইহাতে পাঁচটি কাহিনী আছে।

ক্ষেত্রনাথ গ্রন্থাবলী (প্রথমভাগ)—শ্রীক্ষেত্রনাথ সেন মণ্ডল প্রণীত। ইহাতে 'আদর্শ-সাধনা-গার্হস্থ্য-দুটীভাই', 'রাজকুমারী' ও 'বকমারী' নামক দুটি নাটক ও একটি প্রহসন বা ব্যঙ্গ-নাট্য আছে। রয়াল চতুর্থাংশিত ১০৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৲ টাকা। গ্রন্থারম্ভে প্রকাশকের নিবেদনটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না।

"প্রকাশকের নিবেদন।

"দেশের ও মানব জাতির মঙ্গল সাধন উদ্দেশে শ্রীযুত ক্ষেত্রনাথের অমৃতময়ী লেখনী হইতে বিবিধ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হইয়াছে। যশ, অর্থ, লোকরঞ্জন প্রবৃত্তি চরিতার্থ, তাঁহার উদ্দেশ্য নহে; স্বার্থসাধন তাঁহার কামনা নহে; বিদ্যাপ্রকাশ তাঁহার চেষ্টা নহে; সুতরাং তৎপ্রণীত অলঙ্কৃত সরল পুস্তকগুলি এতদিন অপ্রকাশিত ছিল।

"নানা জাতীয় কাব্য-কুসুমের সৌন্দর্য্য-সৌরভ-বিকাশে বঙ্গীয় কাব্য কানন শোভিত ও আমোদিত হইলে, ইহার স্বভাব শ্রী আরও বর্দ্ধিত

হইবে; দর্শকের জ্ঞান-দৃষ্টির মধ্যে পতিত হইলে, দেশের অনেক কল্যাণ সাধিত হইবে; এই বিবেচনায় সহৃদয় বন্ধুগণের অনুরোধে, লেখকের নিভৃত-রক্ষিত, গুপ্ত-প্রতিপালিত কাব্য-কুসুম-লতিকা নিচয় একটি একটি করিয়া তুলিয়া লইয়া অসম্পূর্ণ অভাবপূর্ণ বঙ্গোদ্যানে প্রোথিত করিতে অগ্রসর হইলাম। গুণগ্রাহী পাঠক কর্ত্তৃক যত্নে লালিত পালিত হইলে কৃতার্থ হইবে?"

প্রকাশক গ্রন্থকারের কোন আত্মীয় হইবেন, নামসাদৃশ্যে অনুমান করিতেছি। তিনি ত গ্রন্থকারকে স্বর্গে তুলিয়াছেন, আমাদের বিচারে তাঁহার স্থান কোথায় দেখা যাক—ছন্দ ও ভাবের নমুনা যেখান সেখান হইতে তুলিয়া দিলাম—

"বৃদ্ধ তুমি;
চাষার সন্তান বটে,
কিন্তু কহিতেছি অতি সার কথা।
বুঝিতেছি
কুলাঙ্গার পুত্র হতে
মান ধর্ম্ম যশ হানি হইবে আমার।"

ইত্যাদিরূপ সর্ব্বত্রই। কি নিয়মে যে কোনো পংক্তি হ্রস্ব ও কোনো পংক্তি দীর্ঘ, দীর্ঘতর হইল তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। ঝকমারীর মধ্যে রুচির কথা না বলাই ভালো। এমন অপদার্থ রচনা কি না ছাপাইলেই নয়? ছাপাইয়া আবার সমালোচনার সখ কেন? সকলের সময় কি গ্রন্থকারের মত সুলভ? গ্রন্থকারের অমৃতময়ী (?) লেখনী দ্বিতীয় ভাগ প্রণয়ণে বিরত হইলে "দেশের ও মানবজাতির মঙ্গল সাধন" হইবে। এরূপ রচনা প্রকাশে "যশ, অর্থ, লোকরঞ্জন প্রবৃত্তি চরিতার্থ" ত হইবেই না, অধিকন্তু বহু কটু কাটব্য পরিপাক করিতে হইবে। গ্রন্থকারের কি এমন কেহ বন্ধু নাই যিনি সদুপদেশ দ্বারা তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ রাখিতে পারেন? আজ আমার মুদ্রারাক্ষস নাম সার্থক হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রের উচ্ছিষ্ট এমন কদর্য্য কর্ম্মভোগ আমারো ভাগ্যে কমই জোটে। রাক্ষসের মত তাহাকেও কবলিত করিতে হইল। কি দুর্দ্দৈব!

Two Lectures of Srijut Aravinda Ghose, B.A., (Cantab)—Published by G. P. Murdeshwar, B.A., Price 9 pies. ইহাতে Advice to National College Students and the Present Situation সম্বন্ধে দুটি বক্তৃতা আছে। প্রত্যেক বাক্যে অরবিন্দ বাবুর মনস্বিতা, তেজ, ধর্ম্মপ্রাণতা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। পড়িতে পড়িতে হৃদয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। এই মনস্বী পুরুষের আত্মত্যাগ, অকুতোভয়তা প্রভৃতি পাঠককে স্তম্ভিত করিয়া দেয়। পুস্তকের ছাপা কাগজ কদর্য্য।

বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক—শ্রীশিবরতন মিত্র সঙ্কলিত। বঙ্গভাষার পরলোকগত যাবতীয় সাহিত্যসেবকগণের বর্ণানুক্রমিক সচিত্র চরিতাভিধান। ৯ম হইতে ১১ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বিদ্যাপতি পর্য্যন্ত আছে। ইহাতে বহু অশ্রুতপূর্ব্বনামা লেখকের পরিচয় আছে। শিবরতন বাবু বহু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে যে দুষ্কর এ পর্য্যন্ত অননুষ্ঠিত ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা যে বাংলা ভাষার মহদুপকার সাধন করিতেছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশের সমগ্র সুধী সমাজ এই পুস্তকের প্রশংসা করিতেছেন। এক্ষণে পাঠক সাধারণ এই পুস্তকের গুণানুযায়ী আদর করিলে গ্রন্থকারকে উৎসাহিত ও বঙ্গভাষার উপকার করিবেন। এই খণ্ডে পাঁচজন সাহিত্য সেবকের চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের চিত্র প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার আমাদের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। গুপ্ত কবির চিত্র এ পর্য্যন্ত কখন কোথাও প্রকাশিত হয় নাই এবং তাহার প্রতিলিপিও নিতান্ত দুর্লভ। শিবরতন বাবু সেই দুর্লভ চিত্র প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এরূপ ঘটনা য়ুরোপে হইলে এক দিনে হাজার হাজার বই বিক্রয় হইয়া যাইত, বঙ্গীয় পাঠক সেরূপ গুণগ্রাহী কবে হইবে?

মুকুট—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ডবল ক্রাউন ২৪ পেজি ৬০ পৃষ্ঠা। মূল্য ।০ আনা মাত্র। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। বহুকাল পূর্ব্বে 'বালক' নামক অধুনালুপ্ত মাসিক পত্রে রবিবাবুর 'মুকুট' নামক যে ক্ষুদ্র উপন্যাস বাহির হইয়াছিল তাহাকেই বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বালকদের অভিনয়ের উপযোগী করিয়া নাটকাকারে পরিণত করা হইয়াছে। নাটকের উপাখ্যানটি অতি মনোরম ও করুণ। ভ্রাতৃস্নেহের একটি পবিত্র চিত্র ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে। চরিত্রগুলি জীবন্ত। যুবরাজের সরল, ব্রাহ্মণ ও কবির ভাব; ইন্দ্রকুমারের ক্ষাত্রতেজ ও নীচতার প্রতি উপেক্ষা; ধুরন্ধর ও রাজধরের ক্রূরতা; ঈশা খাঁর মনস্বিতা; এই অল্প পরিসরের মধ্যেও স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। হাস্য ও করুণ রস পাশাপাশি হাত ধরাধরি করিয়া আছে। পুস্তকখানিতে স্ত্রীচরিত্র নাই—ছাত্রদের অভিনয়ের উপযোগী। রবিবাবু তাঁহার বিদ্যালয়ের ছাত্রদের আনন্দের সঙ্গে শিক্ষার সমন্বয় করিবার জন্য বালকদের অভিনয়ের উপযোগী নাটিকা মধ্যে মধ্যে বঙ্গসাহিত্যকে উপহার দিয়া তাহাকে সম্পৎশালী করিতেছেন। এইরূপ বালিকাদের অভিনয়োপযোগী দুই একখানা নাটিকার নিতান্ত অভাব আছে। আশা করি সে অভাব বহুদিন অপূর্ণ থাকিবে না।

ক্ষীরের পুতুল ও শকুন্তলা—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। এই দুইখানি সর্ব্বজন প্রিয়, শিশুদের পরম আদৃত, আদিম শিশুপাঠ্য গ্রন্থ বহুদিন অপ্রাপ্য ছিল। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস এই দুইখানি পুস্তকের নূতন সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। শকুন্তলা ভালো এণ্টিক কাগজে সুচারুরূপে মুদ্রিত, তাহাতে ছয়খানি নব চিত্রিত কলাসম্মত চিত্রের হাফটোন প্রতিলিপি আছে। ক্ষীরের পুতুলে আছে তিন খানি। অবনীন্দ্র বাবু সর্ব্বপ্রথম শিশুদের সাহিত্য রচনায় কৃতকার্য্য ও যশস্বী হন। অবনীন্দ্র বাবু শব্দচিত্রে অদ্বিতীয়, প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন; তাঁহার বর্ণনায় মনের মধ্যে বর্ণিত দৃশ্যগুলি ছবির মত বর্ণে সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠে: "নেজঝোলা টিয়েপাখী আকাশ সবুজ করে কোন দেশে উড়ে গেল" প্রভৃতি বর্ণনা একদিকে কবিত্বময়, অপরদিকে চিত্রকলাকুশলের উপযুক্ত। এই পুস্তক দুখানি বহুকাল পরে আবার শিশুদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে।

বনফুল—শ্রীমতী প্রতিভাকুমারী দেবী প্রণীত। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীনয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পুস্তকখানি বিক্রয়ের জন্য নহে, সুতরাং মূল্য নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এখানি কবিতা পুস্তক। একটি বারো তের বৎসরের বালিকার লেখা। পুস্তকের কবিতাগুলি বেশ প্রাঞ্জল, মধুর ও সৎভাব পূর্ণ হইয়াছে। কোনো কোনো কবিতায় পূর্ব্বতন কবিগণের ভাবের ছায়া পড়িয়াছে, শব্দমাত্রিক ছন্দগুলির স্থানে স্থানে গতিভঙ্গ হইয়াছে, কিন্তু এসকল ত্রুটি বালিকার অনিবার্য্য, সুতরাং মার্জ্জনীয়। পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা বাস্তবিকই প্রীত হইয়াছি। বালিকা কবি সাধনা করিলে ও চর্চ্চা রাখিলে কালে কাব্যসাহিত্যে আপনার পথ করিয়া যশোলাভ করিবেন আশা করি। বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার এইসব অমৃতময় ফল বিরোধীদিগকে সচেতন করিবে। বালিকার স্বদেশমমতা, ভগবৎপ্রীতি, অশ্রুর মধ্যে আনন্দের সন্ধান, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত সমপ্রাণতা আমাকে বিমুগ্ধ করিয়াছে। বালিকাকে আমরা আশীর্ব্বাদ ও অভিনন্দন করিতেছি। পুস্তকের ছাপা পরিষ্কার ও নির্ভুল, দিব্য নয়নরঞ্জন হইয়াছে।

শকুন্তলা—স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক বিবৃত শকুন্তলার উপাখ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হইয়াছে। এই পুস্তকের গ্রন্থস্বত্ব গ্রন্থকারের নাই। এখন ইহা যে কেহ ছাপিতে পারে। এই সুযোগে

শকুন্তলার বহু সংস্করণ বাহির হইয়াছে। আমাদের সমালোচ্য সংস্করণ বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক প্রণেতা শ্রীশিবরতন মিত্র ও অধ্যাপক শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে বিদ্যাসাগর বিবৃত মূল উপাখ্যান ত আছেই, তদ্ভিন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী, টীকা, পরিশিষ্ট প্রভৃতি আছে। বহু শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ, প্রাচীন ইতিহাস, ভূগোলের পরিচয় গ্রন্থখানিকে ছাত্রদিগের অধিকতর উপযোগী করিয়াছে। প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী রবিবর্ম্মা ও ধুরন্ধর প্রভৃতির ৮ খানি ছবি সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুখানি দুইরঙে ছাপা, ছবি সুন্দর হইয়াছে। পুস্তকের প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য ।।৹ আনা মাত্র। পুরু এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা।

হস্তলিপি লিখন প্রণালী—শ্রীশিবরতন মিত্র প্রণীত। ডবলক্রাউন অষ্টাংশিত ৫৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ।৹ আনা মাত্র। এই পুস্তক নানাবিধ রঙীন কালীতে অতি পরিপাটীরূপে মুদ্রিত। কাগজ পুরু ও মসৃণ। পুস্তকখানির বাহ্যদৃশ্য ভাল। ইহাতে কিণ্ডার গার্টেন পদ্ধতির অনুরূপ অভিনব প্রণালীতে শিশুদিগকে লিখিতে, পড়িতে ও অঙ্ককষিতে শিখাইবার প্রয়াস আছে। এই এক পুস্তকে বর্ণপরিচয় প্রথম-ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, ধারাপাত ও হস্তলিপি বিষয়ক শিক্ষা আছে। প্রায় ৩৫০টি ব্লক দ্বারা অক্ষর রচনা শেখানো হইয়াছে। টানা হস্তাক্ষরের আদর্শরূপে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও রবি বাবুর হস্তাক্ষর দ্বারা এই পুস্তকখানি মণ্ডিত। শিশুদিগের উপযোগী এইরূপ পুস্তক বাংলায় এই বোধ হয় প্রথম। পুস্তক প্রাপ্তি স্থান—ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

মুদ্রা-রাক্ষস।

চিত্রপরিচয়।

মথুরার রাজা কংস এরূপ অত্যাচারী ছিলেন, যে প্রজাদের পক্ষে তাঁহার অত্যাচার সহ্য করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। তখন প্রজাদের সান্ত্বনার জন্যই যেন কংসবধ সম্বন্ধে দৈববাণীর কথা রাজ্যময় ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। দৈববাণীর উৎপত্তিও বিস্ময়জনক।

কংস নিজ বন্ধু ও অমাত্য বাসুদেব এবং নিজ ভগিনী দেবকীকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি এই জন্য নিজ ভগিনী দেবকীর সহিত বাসুদেবের বিবাহ দিলেন, এবং বিবাহের পর এক রথে করিয়া, নিজেই সারথি হইয়া, তাঁহাদিগকে বাসুদেবের গৃহে লইয়া যাইবার জন্য রথ চালাইয়া দিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে এই আকাশবাণী শ্রুত হইল, "রে অত্যাচারী দুর্ব্বৃত্ত রাজা, এই দম্পতির অষ্টম সন্তান একটি বালক হইবে। সেই বালক বার বৎসর বয়সে নিজ হস্তে তোর প্রাণ বধ করিবে!" ইহা শুনিয়া বাসুদেব-দেবকীর প্রতি কংসের প্রীতি ঘোর বিদ্বেষে পরিণত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া আবার মথুরায় রথ লইয়া গেলেন; এবং সেখানে বাসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। উদ্দেশ্য এই ছিল যে তাঁহাদের প্রত্যেক সন্তানকে কংস জন্মের পরই বধ করিবেন।

এইরূপ বার বার সাত বার সাতটি শিশু জন্মিল। কেবল বলরাম ছাড়া, আর সব শিশুই কংসের নিষ্ঠুর হস্তে প্রাণ হারাইল। বলরামকে গোপনে কারাগার হইতে সরাইয়া ফেলা হইয়াছিল, এবং কংসকে বলা হইয়াছিল যে শিশুটি জন্মিবার পরেই মারা গিয়াছে।

এখন দৈববাণী সফল হইবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবকী ও বাসুদেব উৎসুক হৃদয়ে তাঁহাদের অষ্টম সন্তানের জন্মের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, যে সন্তান দ্বাদশবর্ষ বয়সে দেশের সমুদয় লোককে অত্যাচারী কংসের নিষ্ঠুর উৎপীড়ন হইতে মুক্তি দিবে।

আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। মেঘে বাতাসে যেন যুদ্ধ লাগিয়া গিয়াছে। ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। যমুনার জল বাড়িয়া চলিয়াছে। এমন নিশিতে দ্বিপ্রহরে কৃষ্ণের জন্ম হইল। মায়ের প্রাণ সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল। কিন্তু হায়! সে আনন্দ স্থায়ী হইল না। নর-পিশাচ কংস এখনই আসিয়া যে এই শিশুকে বধ করিবে।

কারাগারে যেন কাহার স্বর শ্রুত হইতে লাগিল। প্রথমে কৃষ্ণের জনকজননী ভাবিয়াছিলেন, এ বুঝি ঝড় বৃষ্টির শব্দ। কিন্তু কাণপাতিয়া শুনিয়া তাঁহারা এই কথা স্পষ্ট কর্ণগোচর করিলেন, "উঠ! শিশুটিকে কোলে লইয়া, গোকুলে গোপরাজ নন্দের গৃহে তাহাকে রাখিয়া আইস, এবং তাঁহার গৃহে যে বালিকাটি জন্মিয়াছে, তাহাকে এখানে লইয়া আইস।"

কথাগুলি শুনিয়া কৃষ্ণকে লইয়া যাইবার জন্য বাসুদেব হাত বাড়াইয়াছেন,—এই মুহূর্ত্তটি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়াছেন। মাতৃহৃদয়ের সংগ্রাম, মাতৃ-হৃদয়ের আকুল ভাষা দেবকীর চক্ষুতে সুচিত্রিত হইয়া ছবি-খানিকে করুণরসে প্লাবিত করিয়াছে। শিশু নিশ্চিন্তমনে মাতৃক্রোড়ে শয়ান!

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় অনেক বৎসর গত হইল—

"কত কাল পরে,
বল ভারত রে,"

ইত্যাদি, মর্ম্মস্পর্শী স্বদেশপ্রেমোদ্বেল গান রচনা করেন। এই গানের কয়েকটি পংক্তি, যথা—

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে
পর দাসখতে সমুদায় দিলে।
পর হাতে দিয়ে ধনরত্ন সুখে,
বহ লৌহবিনির্ম্মিত হার বুকে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত।

শ্রীসুবোধচন্দ্র মল্লিক।

দণ্ডায়মান

শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ বসু।

(অর্দ্ধশয়নাবস্থায়)
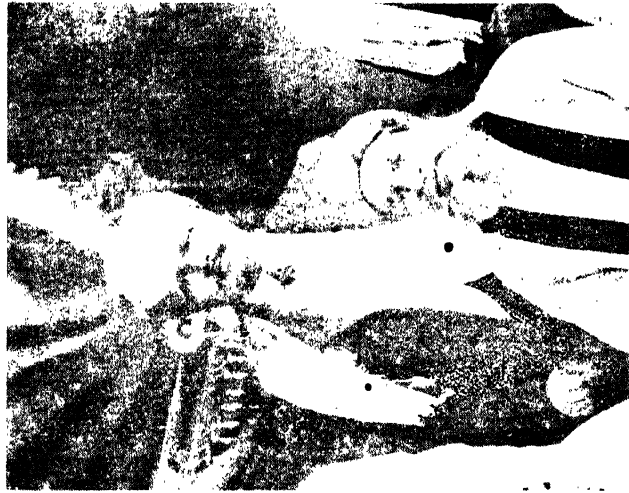
শ্রীপুলিনবিহারী দাস,

ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতা।

পর ভাষণ আসন আনন রে,
পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে।
পর দীপশিখা নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

গত কয়েক মাস প্রবাসীর মলাটে ছাপা হইতেছিল। অনেকে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহা কেন ছাপা হইত? সংক্ষেপে এ প্রশ্নের উত্তর এই যে "প্রবাসী" নামটির অর্থ বুঝান আমাদের উদ্দেশ্য ছিল।

ইংরাজীতে একটি কথা আছে "sojourners and exiles in the land of our birth।" "প্রবাসী" শব্দ দ্বারাও এইরূপ ভাব সূচিত হয়।

অনেকে বলিবেন, কেন আমরা ত নিজের দেশেই রহিয়াছি; তবে "প্রবাসী" নামের সার্থকতা কি?

কাজেই স্বগৃহবাসী ও প্রবাসীতে প্রভেদ কি, বুঝা দরকার। আমি যখন নিজের গৃহে নিজের পরিবারের মধ্যে থাকি, তখন আমি তাহার আয় ব্যয়ের ব্যবস্থা করি, ভৃত্যাদি নিয়োগের বন্দোবস্ত নিজে করি, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার আয়োজন ও ব্যবস্থা নিজে করি, বাড়ী মেরামত, তাহার স্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা, প্রয়োজন মত ২।১টা কামরা বাড়ান কমান, ইত্যাদি সমস্তই, আবশ্যক হইলে বন্ধু বান্ধব এবং পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের পরামর্শ লইয়া, করিয়া থাকি। কিন্তু যখন প্রবাসে পরের বাড়ীতে থাকি, তখন আমার এরূপ কিছু করিবার অধিকার থাকে না। আমরা স্বদেশে বাস করি বটে, কিন্তু দেশের কোন ব্যবস্থা আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা সাপেক্ষ নহে। আয় ব্যয়ের বন্দোবস্তও আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। সুতরাং আমরা স্বদেশে থাকিয়াও প্রবাসী।

যত দিন দেশের আইন প্রণয়নে, রাজ-কর্ম্মচারী নিয়োগে এবং আয় ব্যয়ের বন্দোবস্তে আমাদের, অন্ততঃ কোন কোন বিষয়ে, সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব না জন্মিবে, তত দিন "প্রবাসী" নামের সার্থকতা ঘুচিবে না।

এই কর্ত্তৃত্ব লাভেরই অন্য নাম রাজনৈতিক অধিকার লাভ। এই রাজনৈতিক অধিকারলাভ সম্বন্ধে আমাদের দেশে দুইদল লোকের দুরকম মত দেখা যায়। একদল চান বৃটিশ সাম্রাজ্যে থাকিয়া ইংলণ্ডের মত বা বৃটিশ উপনিবেশগুলির মত স্বায়ত্ত-শাসন-ক্ষমতা, আর একদল চান সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। এই দুইদলে অনেক ঝগড়া হইয়া গিয়াছে। আমাদের বিবেচনায় এই ঝগড়া না হইলে ভাল হইত, এবং এখনও ঝগড়াটা মিটিয়া গেলে ভাল হয়। কারণ, আমরা উভয় প্রকার "স্বরাজ" হইতেই বহুদূরে, এবং, "যুগান্তরের" দল ছাড়িয়া দিলে, সকল ভারতবর্ষীয় রাজনীতিজ্ঞই আইনসঙ্গত উপায়ে রাজনৈতিক অধিকারলাভের চেষ্টার পক্ষপাতী। সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতীদেরও কার্য্যতঃ শেষ অস্ত্র passive resistance, এবং মধ্যপন্থী দলের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত গোখ্‌লেও বলিয়াছেন যে passive resistance তাঁহাদেরও দলের মতে বৈধ আন্দোলনের চরম উপায়। যাহা হউক, ঝগড়া মিটাইব বলিয়া চেষ্টা করিলে সম্ভবতঃ শীঘ্র মিটিবে না। পরে অবস্থাচক্রের পেষণে দুই দল মিশিয়া এক হইতে পারে।

মধ্যপন্থী হওয়ায় আজকাল অনেক সুবিধা আছে। একদিন ছিল যখন কংগ্রেসে যোগ দিলেই মানুষ অ-রাজভক্ত হইয়া যাইত। এবার কিন্তু যাঁহারা মান্দ্রাজ কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন, তাঁদের আর মা'র নাই! এমন দিন ছিল যখন শ্বেতচর্ম্ম উচ্চরাজপদ হইতে গৃহীতাবসর কটন সাহেবও যাচ্‌ঞা করিয়াও কর্জ্জনের সঙ্গে দেখা করিবার অনুমতি পান নাই। এবার কিন্তু মান্দ্রাজ কংগ্রেসের অনেক 'কালা' প্রতিনিধিও তথাকার লাট সাহেবের প্রাসাদে যাচ্‌ঞা না করিয়াও তাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়াছেন। এ বড় সহজ কথা নয়!

কিন্তু ইহাও বলি যে সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ও ত একজন প্রধান মধ্যপন্থী ছিলেন। তাঁহার নির্ব্বাসনটা হইল কেন? অবশ্য তাঁহার স্পর্শদোষ ঘটিয়াছিল বটে; তিনি অরবিন্দ ঘোষের মেসো মহাশয়, তাঁহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণের চেষ্টা করিতেছিলেন। শুনা যায় সেকালে ঘ্রাণের জন্যই অনেক সুব্রাহ্মণ পিরালি হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা স্পর্শদোষ মানেন না; সুতরাং কৃষ্ণবাবু অরবিন্দ ঘোষের মেসো বলিয়া তিনি কখনই মধ্যপন্থিতার অধিকার হইতে চ্যুত হইতে পারেন না। স্বদেশী বয়কটও ত আরও অনেক মধ্যপন্থী করিয়াছেন, কৃষ্ণবাবু না হয় স্বাভাবিক শুভভক্তি প্রযুক্ত খুব বেশী করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বদেশী বয়কটের বিরুদ্ধেও ত এপর্য্যন্ত কোন লিখিত আইন হয় নাই। তবে তাঁহার অপরাধটা হইল কি? তাঁহাকে যাঁহারা জানেন, তাঁহার এরূপ স্বদেশবাসীদের মধ্যে এমন গাধা এবং পাপিষ্ঠ কেহই নাই যে, তাঁহার ডাকাইতি বা নরহত্যার সঙ্গে সংস্রব আছে বলিয়া রাজপুরুষদের সন্দেহের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া, তাহার উত্তর দিতে যাইবে, বা এরূপ অবজ্ঞের সন্দেহ থাকিলে তাহার প্রতিবাদ করিবে। তবে তাঁহার অপরাধটা হইল কি? সেকালে, শুনিয়াছি, ধর্ম্মস্য তত্ত্বং গুহায়াং নিহিত বলিয়া বিবেচিত হইত; আজ কাল রাজনীতির তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং;—পার্লেমেণ্টের সভ্যরূপ যে দেবাঃ, তাঁহারাও ন জানন্তি, ত' আমরা ত মানবাঃ, কেমন করিয়া জানিব কি অপরাধে বিনা বিচারে নির্ব্বাসন হয়?

যাহা হউক, প্রসঙ্গতঃ অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি; নির্ব্বাসনের কথা পরে বলিব। এখন রাজনৈতিক অধিকারের কথাই বলি। অনেক মধ্যপন্থী মনে করেন যে তাঁহারা ইংরাজকে খুসি করিয়া কিছু রাজনৈতিক অধিকার বখ্‌শিস্ পাইবেন। এইজন্য তাঁহারা নিজের চরমপন্থী ভাইদের ত্যাজ্যভাই করিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া মাথা মুড়াইতেও প্রস্তুত। ইংরাজেরাও ইহাতে ভারি খুসি। ভাল, রাজনীতি ত একটা খেলা; দেখা যাক্ কে জেতে!

কিন্তু একটা বড় মজা দেখা যাইতেছে। ইংলিশম্যান প্রভৃতি ইংরাজ-চরমপন্থীদের মুখপাত্র ভারতীয় মধ্যপন্থীদের উপরও সন্তুষ্ট নন। তাঁহারা তিনটা শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন—(১) সম্পূর্ণ অধীনতা, (২) ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা, (৩) সম্পূর্ণ স্বাধীনতা;—অর্থাৎ একেবারে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত, উপবেশন বা বাঁকা হইয়া দাঁড়ান, এবং সম্পূর্ণ সোজা হইয়া ঘাড় উঁচু করিয়া দাঁড়ান। ইংলিশম্যানের দলের লোকেরা আমাদের সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত চান; উপবেশন বা বাঁকা হইয়া দাঁড়ান চান না,—কি জানি যদি আমাদের হঠাৎ একেবারে খাড়া হইয়া দাঁড়াইবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠে। তাই তাঁহারা কংগ্রেসের লক্ষ্য যে ঔপনিবেশিক স্বরাজ, তাহা পছন্দ করেন না, ওটাকে সম্পূর্ণ স্বরাজের পথের একটা সরাই বা পান্থশালা মনে করেন। যে মর্লীর উপর এক শ্রেণীর মধ্যপন্থীদের এত অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি, তিনি সম্পূর্ণ স্বরাজপ্রয়াসীদিগকে বলেন "our enemies" এবং মধ্যপন্থীদিগের লক্ষ্যকে বলেন—"crying for the moon," অর্থাৎ বামনের বা পাগলের বা শিশুর চাঁদের জন্য ক্রন্দন। সুতরাং দাঁড়াইতেছে এই যে মর্লীর মত লোকেরও মতে আমাদের দেশের একদল লোক ইংলণ্ডের শত্রু, আর একদল পাগল। আমাদের উভয়সঙ্কট—শত্রু বা পাগল কোন্ নামটা পছন্দ করিব, তাহা স্থির করা নিতান্ত সহজ নয়। মর্লী যে হঠাৎ বক্তৃতার স্রোতে এই সব কথা এক বার বলিয়া ফেলিয়াছেন তাহা নয়, পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। এই সেদিনও ভারত-শাসন-প্রণালী-সংস্কার বিষয়ক বক্তৃতাতেও সেই কথাই প্রকারান্তরে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার অবশিষ্ট জীবনকাল যদি কুড়িগুণ লম্বা হইত, তাহা হইলেও তিনি ভারতে পার্লেমেণ্ট প্রবর্ত্তনের কল্পনা করিতে পারিতেন না। তাঁহার বয়স এখন ৭০। বিলাতের লোকের ৯০ বৎসর বাঁচা কিছু বিচিত্র নহে। তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে এই যে তিনি ২০×২০=৪০০ চারি শত বৎসর পরেও ভারতবাসীদিগকে নিজেদের পার্লেমেণ্টে দেশশাসনের ক্ষমতা দিতে রাজী নন। যাহা হউক, আমরা কাহারও কথায়, অন্যান্য সভ্যজাতির মত উন্নত, সুখী ও শক্তিশালী হইবার জন্য আমাদের বৈধ এবং ধর্ম্মসঙ্গত চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে পারি না। আমরা মানুষ, অন্য মানুষের মত আমাদেরও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আছে। তাহা ঈশ্বরদত্ত। ঈশ্বরের অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আমরা রাজনৈতিক অধিকারলাভ চেষ্টায় কণ্টকাকীর্ণ কিন্তু বৈধ ও ধর্ম্মসঙ্গত পথে চলিব। এমন কোন প্রকার সাহস, বীরত্ব, বা আত্মোৎসর্গের কাজ নাই, যাহা আমাদের দেশের লোকে করে নাই, বা করিতে পারে না। সুতরাং আমাদের নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। তবে পথটা ভাল করিয়া চিনিয়া লইয়া দৃঢ়পদে তাহাতেই চলা উচিত, এবং সেই পথ ধর্ম্মসঙ্গত হওয়া চাই। ভারতে এখন ক্ষত্রিয়যুদ্ধের স্থান নাই। কিন্তু বৈশ্যযুদ্ধের অর্থাৎ শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় যথেষ্ট স্থান আছে, এবং জ্ঞানে, চরিত্রে, ধর্ম্মে উন্নত হইবার যে প্রতিযোগিতা তাহা কখনও অসাময়িক হইবার নয়। এই উভয় প্রকার প্রতিযোগিতা আমাদের অবলম্বনীয় পন্থা। ভবিষ্যতে দেশ প্রস্তুত হইলে এবং প্রয়োজন হইলে passive resistanceও একটি বৈধ উপায়।

এ সকল ভবিষ্যতের কথা। বর্ত্তমানে মর্লী সাহেব যে শাসনসংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের লাভালাভ কি? তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে আমাদের কিছু লাভ আছে বৈ কি? কিন্তু লর্ড সভার শত্রুতায় উহা কার্য্যে পরিণত না হইতেও পারে। আর যদি শীঘ্র পার্লেমেণ্ট ভঙ্গ হইয়া পুনর্নির্ব্বাচনে উদারনৈতিকদের জিত না হয়, তাহা হইলে ত প্রস্তাব পার্লেমেণ্টে উপস্থিতই হইবে না। কিন্তু প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলেও খুব বেশী লাভ নাই। কারণ, জাতীয় উন্নতি অবনতি যে সকল রাজবিধির উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করে, সে সমস্তই বড় লাটের সভায় হয়। সেখানে প্রজাদের প্রতিনিধিরা সংখ্যায় কম থাকিবেন। সাম্রাজ্যিক বা প্রাদেশিক আয় ব্যয় সম্বন্ধে আমাদের প্রতিনিধিরা কেবল মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবেন, শিক্ষা, বা স্বাস্থ্যবৃদ্ধি, ইত্যাদির জন্য আমরা এক পয়সাও রাজকোষের খরচ বাড়াইতে পারিব না। অর্থাৎ সর্ব্বস্ব তোমার, চাবিকাঠিটি আমার। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় বে-সরকারী সভ্যের সংখ্যা সরকারী সভ্যের সংখ্যার চেয়ে বেশী হইবে বটে, কিন্তু বেসরকারী সভ্য সকলেই প্রজার প্রতিনিধি বা প্রজাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন না। তন্মধ্যে ইংরাজ থাকিবেন, গবর্ণমেণ্টের মনোনীত লোক থাকিবেন। সুতরাং বে-সরকারী সমুদয় সভ্যই কোন আইন প্রণয়নের বেলায় যে প্রজাপক্ষে থাকিবেন, এরূপ সম্ভাবনা কম। আর তাহা হইলেও, বে-সরকারী সভ্যদের মতে কোন আইন পাশ হইলেও, তাহা ছোট লাট ও বড় লাটের রদ করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

প্রস্তাবের মধ্যে আছে যে মিউনিসিপালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট

বোর্ড প্রভৃতিকে অনেক স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। তাহা হইলে একটা খুব লাভ বটে। এক একটি গ্রামকে স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তিভূমি করিবার প্রস্তাব আছে। তাহা হইলে, আমরা নিস্বার্থ স্বদেশপ্রেমমূলক চেষ্টা দ্বারা গ্রামগুলিকে জাগাইয়া তুলিতে পারিলে, খুব লাভ হইবে বটে।

প্রস্তাবের মধ্যে একটা বড় অনিষ্টকর কথা আছে। তাহা শ্রেণী অনুসারে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন; অর্থাৎ জাতি, ধর্ম্ম, জীবিকা আদি অনুসারে নির্ব্বাচন। ইংলণ্ডে স্কটলণ্ডে বা আয়র্লণ্ডে রোম্যান কাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট, শ্রমজীবী ও মূলধনী, চাষা ও কারিগর, এইরূপ শ্রেণী ভাগ করিয়া পার্লেমেণ্টে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের কোন বন্দোবস্ত নাই। আমরা যতদূর জানি কোন সভ্য দেশেই এরূপ ব্যবস্থা নাই। অথচ বিলাতে যে ধর্ম্মবিদ্বেষ, শ্রেণীগতবিদ্বেষ ও তজ্জন্য অশান্তি নাই, তাহা নহে। এরূপ শ্রেণীবিভাগ দ্বারা জাতিগঠনের অন্তরায়কে স্থায়ী করা হয়। সুতরাং আমরা ইহার বিরোধী। কিন্তু এখন মুসলমানদিগকে স্বার্থপর লোকে শিখাইয়াছে যে তাহাদের সঙ্গে হিন্দুদের এত রাজনৈতিক পার্থক্য যে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি না পাইলে তাহাদের চলে না। যাহাই হউক, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিরা নিস্বার্থভাবে কাজ করিলেই কিছুদিনের অভিজ্ঞতাতেই বুঝিতে পারিবেন যে সকল ভারতবাসীরই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ এক। আর সকল শ্রেণীর লোকই কিছু রাজনৈতিক অধিকার পাইলে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাও অশিক্ষিত সর্ব্বজাতীয় গরিবলোকদের সঙ্গে মিশিতে এবং তাহাদের উন্নতিসাধনের জন্য চেষ্টা করিতে বাধ্য হইবেন। ইহাও কম লাভ নয়।

বাঙ্গলাদেশকে আবার অখণ্ড না করিলে প্রস্তাবিতশাসন-প্রণালীতেও আমাদের কোন লাভ হইবে না। এখন স্পষ্ট কথা বলা ভাল। বঙ্গবিহার ছোটনাগপুর উড়িষ্যা ও আসাম এই সকল প্রদেশবাসী হিন্দু বাঙ্গালীই শিক্ষা, রাজ-নৈতিক যোগ্যতা ও নৈতিক সাহসে অগ্রসর। কিন্তু পশ্চিম-বাঙ্গলার ৭টি বিভাগের মধ্যে হিন্দু বাঙ্গালী কেবল ২টির প্রতিনিধিত্ব পাইবেন, পূর্ব্ববঙ্গেও হিন্দু বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গালী অপেক্ষা সংখ্যায় কম। রাজনৈতিক কাজের জন্য যোগ্যতম যাহারা তাহাদের এই দশা হইলে লাভ কোথায়? ভিন্ন কোন প্রদেশের উপর আমরা প্রভুত্ব করিতে চাই না। গবর্ণমেণ্ট বিহার উড়িষ্যাদিকে পৃথক্ করিয়া লইতে পারেন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু আমরা সব বাঙ্গালী একত্র থাকিয়া আমাদের কষ্টার্জ্জিত শিক্ষা ও রাজনৈতিক যোগ্যতার ফলভোগ করিতে চাই। আমরা এরূপ দেশ-বিভাগের বিরোধী যদ্দ্বারা যোগ্যতমেরা তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। এইরূপে প্রজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রদেশবিভাগ করিবার ক্ষমতা যতদিন গবর্ণমেণ্টের থাকিবে, ততদিন আমাদের রাজনৈতিক অধিকারের কোন মূল্য থাকিবে না।

তাহার পর, এখন কর্জ্জনের শিক্ষানীতিতে উচ্চশিক্ষা ক্রমেই অল্প হইতে অল্পতর লোকে পাইবে। এই শিক্ষানীতি পরিবর্ত্তিত না হইলে আমরা দেশের ছোট বড় কাজের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত নেতা কোথায় পাইব?

দেশের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার না হইলে প্রজা-কুল রাজনৈতিক অধিকারের সুব্যবহার করিবে কেমন করিয়া? সভ্যদেশ মাত্রেই প্রাথমিক শিক্ষা সকল ছেলেমেয়ে বিনামূল্যে পায়। আমাদের দেশেই উল্টা রীতি।

তাহার পর, এই যে বিনা বিচারে দেশের সর্ব্বজনপূজ্য মহোপকারী লোকদের নির্ব্বাসন, এই যে স্বদেশবান্ধবসমিতি প্রভৃতি দেশের উপকারকার্য্যে নিযুক্ত সভাগুলিকে বিনা বিচারে বে-আইনী সভা বলিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া, এরূপ অদ্ভুত আইন প্রচলিত থাকিলে রাজনৈতিক নেতৃত্ব কিরূপে সম্ভব, দেশহিতকর কার্য্যই বা কিরূপে সম্ভব, এবং রাজ-নৈতিক কোনও অধিকারেরই বা মূল্য কি?

হইতে পারে যে নির্ব্বাসিত ব্যক্তিরা দোষী, হইতে পারে যে সভাগুলি বে-আইনী কার্য্য করিতেছিল। কিন্তু প্রমাণ কোথায়? লাট সাহেব ত পরম্পরাক্রমে শেষে বুদ্ধিমান ধার্ম্মিক গুপ্তচর বা গোয়েন্দাদের কথার উপর নির্ভর করিয়াই ভদ্রলোকদের নাম দাগী করেন। ঘোর পাপিষ্ঠ নরহন্তার বিচার আছে। আর অশ্বিনীকুমার দত্ত ও কৃষ্ণ-কুমার মিত্রের ন্যায় দেশহিতব্রত, ধার্ম্মিক, পবিত্রচেতা, আত্মোৎসৃষ্ট লোকদের বিচার নাই? দেশে কী অন্তর্বিদ্রোহ হইতেছিল, কী সর্ব্বত্রব্যাপী অশান্তির আগুন জ্বলিতেছিল যে হঠাৎ এরূপ করা দরকার হইল?

আমরা ত জানিতাম অশ্বিনী বাবু ও কৃষ্ণ বাবু অনেক সাহসী লোকের উন্মার্গগামিতাকে দমনে রাখিতেছিলেন ও রাখিয়াছিলেন। ইঁহারা স্বদেশী প্রচার ও বিদেশীপণ্যবর্জ্জন শিক্ষা দিতেছিলেন বটে; কিন্তু তাহা বে-আইনী কাজ নহে। বিদেশী বণিকদের চীৎকারে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট স্বদেশীর নেতাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া-ছেন, একথা পথে ঘাটে হাটে বাজারে লোকে বলিতেছে বটে; কিন্তু বিশিষ্ট প্রমাণ না পাইলে এরূপ কথায় বিশ্বাস করা উচিত নয়। সুতরাং আবার জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের অপরাধ কি?

স্বদেশবান্ধবসমিতি প্রভৃতিরও অপরাধ আমরা জানি না। আমরা জানি, তাঁহারা স্বদেশীর প্রচলন ও বিদেশী পণ্যের বর্জ্জন, দুর্ভিক্ষক্লিষ্টকে সাহায্যদান, সালিসীর দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি, তীর্থযাত্রীদের উপর অত্যাচার নিবারণ ও তাহাদের কষ্ট দূরীকরণ, প্রভৃতি সৎকার্য্য করিতেছিলেন।

অধিকন্তু তাঁহারা ব্যায়াম লাঠিলেখা প্রভৃতির দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্য শক্তি ও সাহস লাভ করিতেছিলেন। এই সমস্তই ভাল এবং আইনসঙ্গত কাজ। সার্ হার্ভী আডামসন বলেন যে "এই সব সমিতি বিদ্রোহের আয়োজন করিতেছিল, যদিও ইহাদের দশ পনর হাজার সভ্যের মধ্যে সম্ভবত অধিকাংশই নেতাদের গূঢ় অভিসন্ধি জানিত না।" তাহারা নাকি ডাকাইতি ও নরহত্যাও করিত! কিন্তু আমরা বলি তাহাদের মধ্যে সকলে দূরে থাকুক, যদি এক হাজার লোক,—হাজার দূরে থাকুক, এক শত লোকও যদি বাস্তবিক এই সকল কুকাজ করিত, তাহা হইলে, পুলিসের যেরূপ কার্য্যক্ষমতা, তাহাতে দেশে অরাজকতা উপস্থিত হইত, তাহা নিবারণ করা বর্ত্তমান পুলিশ কর্ম্মচারীদের সাধ্যাতীত হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। কয়েকটা ডাকাইতি হইয়াছে বটে; তাহারও, পুলিশের কথাবিশ্বাস করিতে গেলে, সবগুলিই একই ক্ষুদ্র দলের কার্য্য। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা দোষী প্রমাণ হইলেও তজ্জন্য দেশের শিরোমণিদের দ্বারা চালিত প্রত্যেক সমিতিকে বে-আইনী বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। গোরা সৈন্যদলেও ত কেহ কেহ চোর ও হন্তা বলিয়া প্রমাণিত হয়। তাহাতে সমস্ত দলের সাজা হয় না। ডাকাতেরা ডাকাতি করিবার সময় কোন্ সমিতির সভ্য ছিল, তাহা প্রমাণ করা চাই। তাহারা যে সমিতির নেতাদের জ্ঞাতসারে ডাকাতি করিতেছিল, তাহা প্রমাণ করা চাই। ডাকাতি করা সমিতির একটা উদ্দেশ্য তাহা প্রমাণ করা চাই। ডাকাতিলব্ধ টাকা সমিতি লইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ চাই। নরহত্যা সম্বন্ধেও এই সব কথা খাটে। এরূপ প্রমাণ না হইলে, গবর্ণমেণ্ট স্বীয় প্রভূত শক্তির বলে সমিতিগুলির উচ্ছেদ সাধন করিলেন বটে, কিন্তু জনসাধারণকে ইহা বিশ্বাস করাইতে পারিবেন না যে ভদ্রলোকের হাজার হাজার ছেলে দেশ-হিতৈষিতার মুখোস্ পরিয়া অশ্রুতপূর্ব্ব ভণ্ডামি সহকারে ডাকাইতি ও নরহত্যায় ব্যাপৃত ছিল। যদি অশ্বিনীকুমার দত্তকে প্রকারান্তরে বদ্মায়েসের সর্দার বলা হয়, তাহা হইলে চিন্তাহীন লোকদের ডাকাইতিকে নির্দোষ মনে করিতে বেশী সময় লাগিবে কি? ইহাতে মহা অনিষ্ট হইবে।

আর বাঙ্গালীর ছেলের যদি সৈনিকগুণ না থাকে, তবে ভয় কিসের? যদি থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে সরকারী সৈনিক বা সরকারী ভলান্টিয়ার করিয়া লইলেই আপদ চুকিয়া যায়।

মোটের উপর আমরা এই বুঝি যে দেশের কাজ হওয়া চাই। স্বদেশীর প্রচলন ও বিদেশী পণ্যের বর্জ্জন, শিক্ষা বিস্তার, সালিসী বিচার, শারীরিক স্বাস্থ্য, বল ও সাহস লাভ, তীর্থযাত্রী প্রভৃতি বিপন্ন ও উৎপীড়িত লোকদের সাহায্য দান, দুর্ভিক্ষ নিবারণ, ইত্যাদি সমস্তই আইনসঙ্গত এবং ধর্ম্মসঙ্গত কাজ। এ সকলের বিরুদ্ধে কোন আইন নাই, হইতে পারে না, এবং হইলেও সকল লোককে তদ্রূপ আইন মানান অসম্ভব। স্বদেশবাসী ভাই ভগিনীগণ, বিধাতা আমাদের নেতা, তপস্যা আমাদের স্বভাবসিদ্ধ, ব্রতপালন আমাদের চিরাভ্যস্ত কর্ম্ম। তবে কেন আমরা নিরাশ হইব? আমরা এ পর্য্যন্ত আইন মানিয়া চলিতেছি, ভবিষ্যতেও, বিবেকবিরুদ্ধ এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ না হইলে, আইন মানিব। কোনকালেই পরের অনিষ্ট চেষ্টারূপ অধর্ম্ম করিব না। কিন্তু কোনও কারণে দেশের মঙ্গল সাধনেও বিরত থাকিব না।

শুনিতে পাই আজকাল নাকি কেহ কেহ বলিতেছেন যে বিদেশীপণ্যবর্জ্জন হইতেই রাজনৈতিক হত্যা, বোমা নিক্ষেপ আদির উৎপত্তি। বেশ কথা! খৃষ্টীয় ধর্ম্মের নামেও ত অনেক তথাকথিত খৃষ্টান অনেক লোককে পুড়াইয়া এবং অন্যপ্রকারে নিষ্ঠুরভাবে মারিয়া ফেলিয়াছে। তজ্জন্য কি বাস্তবিক খৃষ্ট কিম্বা তাঁহার উপদেশাবলী দায়ী? বিদেশী-পণ্য বর্জ্জনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বোমা নিক্ষেপে, ইহা বাতুলের কথা। ইহার আর কি জবাব দিব?

৬১, ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মহাভারত লিখন—ব্যাস বক্তা, গণেশ লেখক।

সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে।

Three-colour blocks by U. Ray. KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

৮ম ভাগ। | ফাল্গুন, ১৩১৫। | ১১শ সংখ্যা।

গোরা।

৪১

একই সময়ে নিজের অন্তরের সঙ্গে, আবার নিজের বাহিরের সঙ্গে সুচরিতার যে সংগ্রাম বাধিয়া উঠিয়াছে তাহাতে তাহাকে ভীত করিয়া তুলিয়াছে। গোরার প্রতি তাহার যে মনের ভাব এতদিন তাহার অলক্ষ্যে বল পাইয়া উঠিতেছিল এবং গোরার জেলে যাওয়ার পর হইতে যাহা তাহার নিজের কাছে সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট এবং দুর্নিবার রূপে দেখা দিয়াছে তাহা লইয়া সে যে কি করিবে, তাহার পরিণাম যে কি তাহা সে কিছুই ভাবিয়া পায় না, সে কথা কাহাকেও বলিতেও পারে না, নিজের কাছে নিজে কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। এই নিগূঢ় বেদনাটাকে লইয়া সে গোপনে বসিয়া নিজের সঙ্গে যে একটা বোঝাপড়া করিয়া লইবে তাহার সে নিভৃত অবকাশটুকুও নাই—হারানবাবু তাহার দ্বারের কাছে তাঁহাদের সমস্ত সমাজকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার উপক্রম করিয়াছেন; এমন কি, ছাপার কাগজের ঢাকেও কাঠি পড়িবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইহার উপরেও তাহার মাসীর সমস্যা এমন হইয়া উঠিয়াছে যে অতি সত্বর তাহার একটা কোনো মীমাংসা না করিলে একদিনও আর চলে না। সুচরিতা বুঝিয়াছে এবার তাহার জীবনের একটা সন্ধিক্ষণ আসিয়াছে, চিরপরিচিত পথে চিরাভ্যস্ত নিশ্চিন্ত ভাবে চলিবার দিন আর নাই।

এই তাহার সঙ্কটের সময় তাহার একমাত্র অবলম্বন ছিল পরেশবাবু। তাঁহার কাছে সে পরামর্শ চাহে নাই, উপদেশ চাহে নাই; অনেক কথা ছিল যাহা পরেশবাবুর সম্মুখে সে উপস্থিত করিতে পারিত না এবং এমন অনেক কথা ছিল যাহা লজ্জাকর হীনতাবশতই পরেশবাবুর কাছে প্রকাশের অযোগ্য। কেবল পরেশবাবুর জীবন, পরেশ বাবুর সঙ্গমাত্র তাহাকে যেন নিঃশব্দে কোন্ পিতৃক্রোড়ে কোন্ মাতৃবক্ষে আকর্ষণ করিয়া লইত।

এখন শীতের দিনে সন্ধ্যার সময়ে পরেশবাবু বাগানে যাইতেন না। বাড়ির পশ্চিমদিকের একটি ছোট ঘরে মুক্তদ্বারের সম্মুখে একখানি আসন পাতিয়া তিনি উপাসনায় বসিতেন; তাঁহার শুক্লকেশমণ্ডিত শান্তমুখের উপরে সূর্য্যাস্তের আভা আসিয়া পড়িত। সেই সময়ে সুচরিতা নিঃশব্দপদে চুপ করিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বসিত। নিজের অশান্ত ব্যথিত চিত্তটিকে সে যেন পরেশের উপাসনার গভীরতার মাঝখানে নিমজ্জিত করিয়া রাখিত। আজকাল উপাসনান্তে, প্রায়ই পরেশ দেখিতে পাইতেন তাঁহার এই

কন্যাটি এই ছাত্রীটি স্তব্ধ হইয়া তাঁহার কাছে বসিয়া আছে; তখন তিনি একটি অনির্ব্বচনীয় আধ্যাত্মিক মাধুর্য্যের দ্বারা এই বালিকাটিকে পরিবেষ্টিত দেখিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া নিঃশব্দে ইহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেন।

ভূমার সহিত মিলনকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিয়াছিল বলিয়া যাহা শ্রেয়তম এবং সত্যতম পরেশের চিত্ত সর্ব্বদাই তাহার অভিমুখ ছিল। এই জন্য সংসার কোনোমতেই তাঁহার কাছে অত্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠিতে পারিত না। এইরূপে নিজের মধ্যে তিনি একটি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই মত বা আচরণ লইয়া তিনি অন্যের প্রতি কোন প্রকার জবরদস্তি করিতে পারিতেন না। মঙ্গলের প্রতি নির্ভর এবং সংসারের প্রতি ধৈর্য্য তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। ইহা তাঁহার এত অধিক পরিমাণে ছিল যে সাম্প্রদায়িক লোকের কাছে তিনি নিন্দিত হইতেন, কিন্তু নিন্দাকে তিনি এমন করিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেন যে হয়ত তাহা তাঁহাকে আঘাত করিত কিন্তু তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া থাকিত না। তিনি মনের মধ্যে এই কথাটাই কেবলি থাকিয়া থাকিয়া আবৃত্তি করিতেন আমি আর কাহারও হাত হইতে কিছুই লইবনা-আমি তাঁহার হাত হইতেই সমস্ত লইব।

পরেশের জীবনের এই গভীর নিস্তব্ধ শান্তির স্পর্শলাভ করিবার জন্যই আজকাল সুচরিতা নানা উপলক্ষ্যেই তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই অনভিজ্ঞ বালিকাবয়সে তাহার বিরুদ্ধ হৃদয় এবং বিরুদ্ধ সংসার যখন তাহাকে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে তখন সে বারবার কেবল মনে করিয়াছে বাবার পা দুখানা মাথায় চাপিয়া ধরিয়া খানিকক্ষণের জন্য যদি মাটিতে পড়িয়া থাকিতে পারি তবে আমার মন শান্তিতে ভরিয়া উঠে।

এইরূপে সুচরিতা মনে ভাবিয়াছিল সে মনের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত সমস্ত আঘাতকে ঠেকাইয়া রাখিবে অবশেষে সমস্ত প্রতিকূলতা আপনি পরাস্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু সেরূপ ঘটিল না তাহাকে অপরিচিত পথে বাহির হইতে হইল।

বরদাসুন্দরী যখন দেখিলেন রাগ করিয়া ভর্ৎসনা করিয়া সুচরিতাকে টলানো সম্ভব নহে এবং পরেশকেও সহায়রূপে পাইবার কোনো আশা নাই তখন হরিমোহিনীর প্রতি তাঁহার ক্রোধ অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার গৃহের মধ্যে হরিমোহিনীর অস্তিত্ব তাঁহাকে উঠিতে বসিতে যন্ত্রণা দিতে লাগিল।

সেদিন তাঁহার পিতার মৃত্যুদিনের বার্ষিক উপাসনা উপলক্ষ্যে তিনি বিনয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। উপাসনা সন্ধ্যার সময় হইবে, তৎপূর্ব্বেই তিনি সভাগৃহ সাজাইয়া রাখিতেছিলেন; সুচরিতা এবং অন্য মেয়েরাও তাঁহার সহায়তা করিতেছিল।

এমন সময় তাঁহার চোখে পড়িল বিনয় পাশের সিঁড়ি দিয়া উপরে হরিমোহিনীর নিকট যাইতেছে। মন যখন ভারাক্রান্ত থাকে তখন ক্ষুদ্র ঘটনাও বড় হইয়া উঠে। বিনয়ের এই উপরের ঘরে যাওয়া একমুহূর্ত্তে তাঁহার কাছে এমন অসহ্য হইয়া উঠিল যে তিনি ঘর সাজানো ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ হরিমোহিনীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন বিনয় মাদুরে বসিয়া আত্মীয়ের ন্যায় বিশ্রব্ধভাবে হরিমোহিনীর সহিত কথা কহিতেছে।

বরদাসুন্দরী বলিয়া উঠিলেন, দেখ তুমি আমাদের এখানে যতদিন খুসি থাক আমি তোমাকে আদর যত্ন করেই রাখ্‌ব। কিন্তু আমি বলচি তোমার ঐ ঠাকুরকে এখানে রাখা চল্‌বে না।

হরিমোহিনী চিরকাল পাড়াগাঁয়েই থাকিতেন। ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ছিল যে তাহারা খৃষ্টানেরই শাখা বিশেষ। সুতরাং তাহাদেরই সংস্রব সম্বন্ধে বিচার করিবার বিষয় আছে কিন্তু তাহারাও যে তাঁহার সম্বন্ধে সঙ্কোচ অনুভব করিতে পারে ইহা তিনি এই কয়দিনে ক্রমশই বুঝিতে পারিতেছিলেন। কি করা কর্ত্তব্য ব্যাকুল হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন এমন সময়ে আজ বরদাসুন্দরীর মুখে এই কথা শুনিয়া তিনি বুঝিলেন যে আর চিন্তা করিবার সময় নাই যাহা হয় একটা কিছু স্থির করিতে হইবে। প্রথমে ভাবিলেন কলিকাতায় একটা কোথাও বাসা লইয়া থাকিবেন তাহা হইলে মাঝে মাঝে সুচরিতা ও সতীশকে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু তাঁহার যে অল্প সম্বল, তাহাতে কলিকাতার খরচ চলিবে না।

বরদাসুন্দরী অকস্মাৎ ঝড়ের মত আসিয়া যখন চলিয়া

গেলেন তখন বিনয় মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হরিমোহিনী বলিয়া উঠিলেন —"আমি তীর্থে যাব তোমরা কেউ আমাকে পৌঁছে দিয়ে আস্‌তে পারবে বাবা ?"

বিনয় কহিল—"খুব পারব। কিন্তু তার আয়োজন করতে ত দু চার দিন দেরি হবে ততদিন চল মাসি তুমি আমার মার কাছে গিয়ে থাকবে।"

হরিমোহিনী কহিলেন "বাবা, আমার ভার বিষম ভার। বিধাতা আমার কপালের উপর কি বোঝা চাপিয়েচেন জানিনে, আমাকে কেউ বইতে পারে না। আমার শ্বশুর বাড়িতেও যখন আমার ভার সইল না তখনি আমার বোঝা উচিত ছিল! কিন্তু বড় অবুঝ মন বাবা—বুক যে খালি হয়ে গেছে সেইটে ভরাবার জন্যে কেবলি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি আমার পোড়া ভাগ্যও যে সঙ্গে সঙ্গে চলেচে। আর থাক্‌ বাবা, আর কারো বাড়িতে গিয়ে কাজ নেই—যিনি বিশ্বের বোঝা বন তাঁরি পাদপদ্মে এবার আমি আশ্রয় গ্রহণ করব—আর আমি পারিনে।"—বলিয়া বারবার করিয়া দুই চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

বিনয় কহিল—"সে বল্লে হবে না মাসি। আমার মার সঙ্গে অন্য কারো তুলনা করলে চলবে না। যিনি নিজের জীবনের সমস্ত ভার ভগবানকে সমর্পণ করতে পেরেচেন তিনি অন্যের ভার বইতে ক্লেশ বোধ করেন না। যেমন আমার মা—আর যেমন এখানে দেখ্‌লেন পরেশবাবু। সে আমি শুন্‌ব না—একবার আমার তীর্থে তোমাকে বেড়িয়ে নিয়ে আস্‌ব তার পরে তোমার তীর্থ আমি দেখ্‌তে যাব।"

হরিমোহিনী কহিলেন, "তাঁদের তা হলে ত একবার খবর দিয়ে—"

বিনয় কহিল—"আমরা গেলেই মা খবর পাবেন—সেইটেই হবে পাকা খবর!"

হরিমোহিনী কহিলেন—"তা হলে কাল সকালে"—

বিনয় কহিল, "দরকার কি! আজ রাত্রেই গেলে হবে!"

সন্ধ্যার সময় সুচরিতা আসিয়া কহিল, "বিনয় বাবু, মা আপনাকে ডাক্‌তে পাঠালেন। উপাসনার সময় হয়েছে।"

বিনয় কহিল "মাসীর সঙ্গে কথা আছে, আজ আমি যেতে পারব না।"

আসল কথা, আজ বিনয় বরদাসুন্দরীর উপাসনার নিমন্ত্রণ কোনোমতে স্বীকার করিতে পারিল না। তাহার মনে হইল সমস্তই বিড়ম্বনা।

হরিমোহিনী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিল, "বাবা বিনয়, যাও তুমি। আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা সে পরে হবে। তোমাদের কাজকর্ম্ম আগে হয়ে যাক তার পরে তুমি এসো।"

সুচারিতা কহিল, "আপনি এলে কিন্তু ভাল হয়।"

বিনয় বুঝিল সে সভাক্ষেত্রে না গেলে এই পরিবারে যে বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে তাহাকে কিছু পরিমাণে আরো অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইবে। এইজন্য সে উপাসনাস্থলে গেল কিন্তু তাহাতেও সম্পূর্ণ ফল লাভ হইল না।

উপাসনার পর আহার ছিল—বিনয় কহিল "আজ আমার ক্ষুধা নেই।"

বরদাসুন্দরী কহিলেন—"ক্ষুধার অপরাধ নেই। আপনি ত উপরেই খাওয়া সেরে এসেচেন।"

বিনয় হাসিয়া কহিল, "হাঁ, লোভী লোকের এই রকম দশাই ঘটে! উপস্থিতের প্রলোভনে ভবিষ্যৎ খুইয়ে বসে।" এই বলিয়া বিনয় প্রস্থানের উদ্যোগ করিল।

বরদাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপরে যাচ্চেন বুঝি ?"

বিনয় সংক্ষেপে কেবল "হাঁ" বলিয়া বাহির হইয়া গেল; দ্বারের কাছে সুচরিতা ছিল তাহাকে মৃদুস্বরে কহিল, "দিদি একবার মাসীর কাছে যাবেন বিশেষ কথা আছে।"

ললিতা আতিথ্যে নিযুক্ত ছিল। একসময় সে হারান বাবুর কাছে আসিতেই তিনি অকারণে বলিয়া উঠিলেন, "বিনয় বাবু ত এখানে নেই তিনি উপরে গিয়েচেন।"

শুনিয়াই ললিতা সেখানে দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখের দিকে চোখ তুলিয়া অসঙ্কোচে কহিল, "জানি। তিনি আমার সঙ্গে না দেখা করে যাবেন না। আমার এখানকার কাজ সারা হলেই আমি উপরে যাব এখন।"

ললিতাকে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত করিতে না পারিয়া হারানের

অন্তররুদ্ধ দাহ আরো বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বিনয় সুচরিতাকে হঠাৎ কি একটা বলিয়া গেল এবং সুচরিতা অনতিকাল পরেই তাহার অনুসরণ করিল ইহাও হারান বাবুর লক্ষ্য এড়াইতে পারে নাই। তিনি আজ সুচরিতার সহিত আলাপের উপলক্ষ্য সন্ধান করিয়া বারম্বার অকৃতার্থ হইয়াছেন—দুই একবার সুচরিতা তাঁহার সুস্পষ্ট আহ্বান এমন করিয়া এড়াইয়া গেছে যে সভাস্থ লোকের কাছে হারান বাবু নিজেকে অপদস্থ জ্ঞান করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার মন সুস্থ ছিল না।

সুচরিতা উপরে গিয়া দেখিল হরিমোহিনী তাঁহার জিনিষপত্র গুছাইয়া এমনভাবে বসিয়া আছেন যেন এখনি কোথায় যাইবেন। সুচরিতা জিজ্ঞাসা করিল—"মাসি এ কি?"

হরিমোহিনী তাহার কোনো উত্তর দিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং কহিলেন, "সতীশ কোথায় আছে তাকে একবার ডেকে দাও মা!"

সুচরিতা বিনয়ের মুখের দিকে চাহিতেই বিনয় কহিল—"এবাড়িতে মাসি থাকলে সকলেরি অসুবিধে হয় তাই আমি ওঁকে মার কাছে নিয়ে যাচ্চি।"

হরিমোহিনী কহিলেন, "সেখানে থেকে আমি তীর্থে যাব মনে করেচি। আমার মত লোকের কারো বাড়িতে এরকম করে থাকা ভাল হয় না। চিরদিন লোকে আমাকে এমন করে সহ্যই বা করবে কেন?"

সুচরিতা নিজেই একথা কয়েক দিন হইতে ভাবিতেছিল। এবাড়িতে বাস করা যে তাহার মাসির পক্ষে অপমান তাহা সে অনুভব করিয়াছিল সুতরাং সে কোনো উত্তর দিতে পারিল না। চুপ করিয়া তাঁহার কাছে গিয়া বসিয়া রহিল। রাত্রি হইয়াছে; ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয় নাই। কলিকাতার হেমন্তের অস্বচ্ছ আকাশে তারাগুলি বাষ্পাচ্ছন্ন। কাহাদের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল তাহা সেই অন্ধকারে দেখা গেল না।

সিঁড়ি হইতেই সতীশের উচ্চকণ্ঠে মাসিমা ধ্বনি শুনা গেল। "কি বাবা, এস বাবা" বলিয়া হরিমোহিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। সুচরিতা কহিল, "মাসিমা, আজ রাত্রে কোথাও যাওয়া হতেই পারে না, কাল সকালে সমস্ত ঠিক করা যাবে। বাবাকে ভাল করে না বলে তুমি কি করে যেতে পারবে বল! সে যে বড় অন্যায় হবে।"

বিনয় বরদাসুন্দরী কর্ত্তৃক হরিমোহিনীর অপমানে উত্তেজিত হইয়া একথা ভাবে নাই। সে স্থির করিয়াছিল এক রাত্রিও মাসীর এবাড়িতে থাকা উচিত হইবে না—এবং আশ্রয়ের অভাবেই যে হরিমোহিনী সমস্ত সহ্য করিয়া এবাড়িতে রহিয়াছেন বরদাসুন্দরীর সেই ধারণা দূর করিবার জন্য বিনয় হরিমোহিনীকে এখান হইতে লইয়া যাইতে লেশমাত্র বিলম্ব করিতে চাহিতেছিল না। সুচরিতার কথা শুনিয়া বিনয়ের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে, এবাড়িতে বরদাসুন্দরীর সঙ্গেই যে হরিমোহিনীর একমাত্র এবং সর্ব্বপ্রধান সম্বন্ধ তাহা নহে। যে ব্যক্তি অপমান করিয়াছে তাহাকেই বড় করিয়া দেখিতে হইবে আর যে লোক উদারভাবে আত্মীয়ের মত আশ্রয় দিয়াছে তাহাকে ভুলিয়া যাইতে হইবে এ ত ঠিক নহে।

বিনয় বলিয়া উঠিল, "সে ঠিক কথা। পরেশ বাবুকে না জানিয়ে কোনোমতেই যাওয়া যায় না।"

সতীশ আসিয়াই কহিল, "মাসিমা, জান রাশিয়ানরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে আসচে? ভারি মজা হবে!"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কার দলে?"

সতীশ কহিল—"আমি রাশিয়ানের দলে।"

বিনয় কহিল—"তাহলে রাশিয়ানের আর ভাবনা নেই।"

এইরূপে সতীশ মাসীমার সভা জমাইয়া তুলিতেই সুচরিতা আস্তে আস্তে সেখান হইতে উঠিয়া নীচে চলিয়া গেল।

সুচরিতা জানিত শুইতে যাইবার পূর্ব্বে পরেশ বাবু তাঁহার কোনো একটি প্রিয় বই খানিকটা করিয়া পড়িতেন। কতদিন সেইরূপ সময়ে সুচরিতা তাঁহার কাছে আসিয়া বসিয়াছে এবং সুচরিতার অনুরোধে পরেশ বাবু তাহাকেও পড়িয়া শুনাইয়াছেন।

আজও তাঁহার নির্জ্জন ঘরে পরেশ বাবু আলোটি জ্বালাইয়া এমার্সনের গ্রন্থ পড়িতেছিলেন। সুচরিতা ধীরে ধীরে তাঁহার পাশে চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল। পরেশ বাবু বইখানি রাখিয়া একবার তাহার মুখের দিকে

চাহিলেন। সুচরিতার সঙ্কল্প ভঙ্গ হইল—সে সংসারের কোনো কথাই তুলিতে পারিল না। কহিল, "বাবা, আমাকে পড়ে শোনাও।"

পরেশ বাবু তাহাকে পড়িয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। রাত্রি দশটা বাজিয়া গেলে পড়া শেষ হইল। তখনো সুচরিতা নিদ্রার পূর্ব্বে পরেশ বাবুর মনে কোনোপ্রকার ক্ষোভ পাছে জন্মে এইজন্য কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিল।

পরেশ বাবু তাহাকে স্নেহস্বরে ডাকিলেন—"রাধে।"

সে তখনি ফিরিয়া আসিল। পরেশ বাবু কহিলেন—"তুমি তোমার মাসির কথা আমাকে বলতে এসেছিলে?"

পরেশ বাবু তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়াছেন জানিয়া সুচরিতা বিস্মিত হইয়া কহিল, "হাঁ বাবা, কিন্তু আজ থাক্ কাল সকালে কথা হবে!"

পরেশ বাবু কহিলেন—"বোস।"

সুচরিতা বসিলে তিনি কহিলেন—"তোমার মাসির এখানে কষ্ট হচ্চে সে কথা আমি চিন্তা করেছি। তাঁর ধর্ম্মবিশ্বাস ও আচরণ লাবণ্যর মার সংস্কারে যে এত বেশি আঘাত দেবে তা আমি আগে ঠিক জান্‌তে পারিনি। যখন দেখচি তাঁকে পীড়া দিচ্চে তখন এবাড়িতে তোমার মাসিকে রাখ্‌লে তিনি সঙ্কুচিত হয়ে থাক্‌বেন।"

সুচরিতা কহিল—"আমার মাসি এখান থেকে যাবার জন্যেই প্রস্তুত হয়েচেন।"

পরেশ বাবু কহিলেন, "আমি জানতুম যে তিনি যাবেন। তোমরা দুজনেই তাঁর একমাত্র আত্মীয়—তোমরা তাঁকে এমন অনাথার মত বিদায় দিতে পারবে না সেও আমি জানি। তাই আমি একয়দিন এসম্বন্ধে ভাবছিলুম।"

তাহার মাসি কি সঙ্কটে পড়িয়াছেন পরেশ বাবু যে তাহা বুঝিয়াছেন ও তাহা লইয়া ভাবিতেছেন একথা সুচরিতা একেবারেই অনুমান করে নাই। পাছে তিনি জানিতে পারিয়া বেদনা বোধ করেন এই ভয়ে সে এতদিন অত্যন্ত সাবধানে চলিতেছিল—আজ পরেশ বাবুর কথা শুনিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল এবং তাহার চোখের পাতা ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল।

পরেশ বাবু কহিলেন—"তোমার মাসীর জন্যে আমি একটি বাড়ি ঠিক করে রেখেচি।"

সুচরিতা কহিল—"কিন্তু তিনি ত"—

পরেশ বাবু। ভাড়া দিতে পারবেন না! ভাড়া তিনি কেন দেবেন? তুমি ভাড়া দেবে।

সুচরিতা অবাক্ হইয়া পরেশ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পরেশ বাবু হাসিয়া কহিলেন, "তোমারই বাড়িতে থাক্‌তে দিয়ো, ভাড়া দিতে হবে না।"

শুনিয়া সুচরিতা আরো বিস্মিত হইল। পরেশ বাবু কহিলেন, "কলকাতায় তোমাদের দুটো বাড়ি আছে জান না! একটি তোমার একটি সতীশের। মৃত্যু সময়ে তোমার বাবা আমার হাতে কিছু টাকা দিয়ে যান। আমি তাই খাটিয়ে বাড়িয়ে তুলে কলকাতায় দুটো বাড়ি কিনেছি। এত দিন তার ভাড়া পাচ্ছিলুম, তাও জম্‌ছিল। তোমার বাড়ির ভাড়াটে অল্প দিন হল উঠে গেছে—সেখানে তোমার মাসির থাকবার কোনো অসুবিধা হবে না।"

সুচরিতা কহিল, "সেখানে তিনি কি একলা থাক্‌তে পারবেন?"

পরেশ বাবু কহিলেন, "তোমরা তাঁর আপনার লোক থাক্‌তে তাঁকে একলা থাক্‌তে হবে কেন?"

সুচরিতা কহিল, "সেই কথাই তোমাকে বলবার জন্যে আজ এসেছিলুম। মাসি চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েচেন, আমি ভাব্‌ছিলুম আমি একলা কি করে তাঁকে যেতে দেব। তাই তোমার উপদেশ নেব বলে এসেচি। তুমি যা বল্‌বে আমি তাই করব।"

পরেশ বাবু কহিলেন, "আমাদের বাসার গায়েই এই যে গলি, এই গলির দুটো তিনটে বাড়ি পরেই তোমার বাড়ি—ঐ বারান্দায় দাঁড়ালে সে বাড়ি দেখা যায়। সেখানে তোমরা থাক্‌লে নিতান্ত অরক্ষিত অবস্থায় থাক্‌তে হবে না। আমি তোমাদের দেখ্‌তে শুন্‌তে পারব।"

সুচরিতার বুকের উপর হইতে একটা মস্ত পাথর নামিয়া গেল। "বাবাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া যাইব" এই চিন্তার সে কোনো অবধি পাইতেছিল না। কিন্তু যাইতেই হইবে ইহাও তাহার কাছে নিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল।

সুচরিতা আবেগে পরিপূর্ণ হৃদয় লইয়া চুপ করিয়া পরেশ বাবুর কাছে বসিয়া রহিল। পরেশ বাবুও স্তব্ধ হইয়া নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে নিজেকে গভীরভাবে নিহিত করিয়া বসিয়া রহিলেন। সুচরিতা তাঁহার শিষ্যা, তাঁহার কন্যা, তাঁহার সুহৃদ্। সে তাঁহার জীবনের এমন কি, তাঁহার ঈশ্বরোপাসনার সঙ্গে জড়িত হইয়া গিয়াছিল। যে দিন সে নিঃশব্দে আসিয়া তাঁহার উপাসনার সহিত যোগ দিত—সে দিন তাঁহার উপাসনা যেন বিশেষ পূর্ণতা লাভ করিত। প্রতি দিন সুচরিতার জীবনকে মঙ্গলপূর্ণ স্নেহের দ্বারা গড়িতে গড়িতে তিনি নিজের জীবনকেও একটি বিশেষ পরিণতি দান করিতেছিলেন। সুচরিতা যেমন ভক্তি যেমন একান্ত নম্রতার সহিত তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল এমন করিয়া আর কেহ তাঁহার কাছে আসে নাই;—ফুল যেমন করিয়া আকাশের দিকে তাকায় সে তেমনি করিয়া তাঁহার দিকে তাহার সমস্ত প্রকৃতিকে উন্মুখ এবং উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছিল। এমন একাগ্রভাবে কেহ কাছে আসিলে মানুষের দান করিবার শক্তি আপনি বাড়িয়া যায়—অন্তঃকরণ জলভারনম্র মেঘের মত পরিপূর্ণতার দ্বারা নত হইয়া পড়ে। নিজের যাহা কিছু সত্য যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহা কোনো অনুকূল চিত্তের নিকট প্রতিদিন দান করিবার সুযোগের মত এমন শুভ-যোগ মানুষের কাছে আর কিছু হইতেই পারে না; সেই দুর্লভ সুযোগ সুচরিতা পরেশকে দিয়াছিল। এজন্য সুচরিতার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অত্যন্ত গভীর হইয়াছিল। আজ সেই সুচরিতার সঙ্গে তাঁহার বাহ্য সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে;—ফলকে নিজের জীবন-রসে পরিপক্ক করিয়া তুলিয়া তাহাকে নিজের নিকট হইতে মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। এজন্য তিনি মনের মধ্যে যে বেদনা অনুভব করিতেছিলেন সেই নিগূঢ় বেদনাটিকে তিনি অন্তর্যামীর নিকট নিবেদন করিয়া দিতেছিলেন। সুচরিতার পাথেয় সঞ্চয় হইয়াছে এখন নিজের শক্তিতে প্রশস্ত পথে সুখে দুঃখে আঘাত প্রতিঘাতে নূতন অভিজ্ঞতা লাভের দিকে যে তাহার আহ্বান আসিয়াছে তাহার আয়োজন কিছু দিন হইতেই পরেশ লক্ষ্য করিতেছিলেন; তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন, বৎসে যাত্রা কর—তোমার চির-জীবন যে কেবল আমার বুদ্ধি এবং আমার আশ্রয়ের দ্বারাই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিব এমন কখনই হইতে পারিবে না—ঈশ্বর আমার নিকট হইতে তোমাকে মুক্ত করিয়া বিচিত্রের ভিতর দিয়া তোমাকে চরম পরিণামে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যান—তাঁহার মধ্যে তোমার জীবন সার্থক হউক! এই বলিয়া আশৈশব স্নেহপালিত সুচরিতাকে তিনি মনের মধ্যে নিজের দিক হইতে ঈশ্বরের দিকে পবিত্র উৎসর্গ সামগ্রীর মত তুলিয়া ধরিতেছিলেন। পরেশ বরদাসুন্দরীর প্রতি রাগ করেন নাই, নিজের সংসারের প্রতি মনকে কোনো প্রকার বিরোধ অনুভব করিতে প্রশ্রয় দেন নাই; তিনি জানিতেন সঙ্কীর্ণ উপকূলের মাঝখানে নূতন বর্ষণের জলরাশি হঠাৎ আসিয়া পড়িলে অত্যন্ত একটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়—তাহার একমাত্র প্রতিকার তাহাকে প্রশস্ত ক্ষেত্রে মুক্ত করিয়া দেওয়া। তিনি জানিতেন অল্প দিনের মধ্যে সুচরিতাকে আশ্রয় করিয়া এই ছোট পারবারটির মধ্যে যে সকল অপ্রত্যাশিত সমাবেশ ঘটিয়াছে তাহা এখানকার বাঁধা সংস্কারকে পীড়িত করিতেছে, তাহাকে এখানে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা না করিয়া মুক্তিদান করিলে তবেই স্বভাবের সহিত সামঞ্জস্য ঘটিয়া সমস্ত শান্ত হইতে পারিবে। ইহা জানিয়া, যাহাতে সহজে সেই শান্তি ও সামঞ্জস্য ঘটিতে পারে নীরবে তাহারই আয়োজন করিতেছিলেন।

দুইজনে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ঘড়িতে এগারোটা বাজিয়া গেল। তখন পরেশবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুচরিতার হাত ধরিয়া তাহাকে গাড়িবারান্দার ছাদে লইয়া গেলেন। সন্ধ্যাকাশের বাষ্প কাটিয়া গিয়া তখন নির্ম্মল অন্ধকারের মধ্যে তারাগুলি দীপ্তি পাইতেছিল; সুচরিতাকে পাশে লইয়া পরেশ সেই নিস্তব্ধরাত্রে প্রার্থনা করিলেন—সংসারের সমস্ত অসত্য কাটিয়া পরিপূর্ণ সত্য আমাদের জীবনের মাঝখানে নির্ম্মল মূর্ত্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুন্।

৪২

পরদিন প্রাতে হরিমোহিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া পরেশকে প্রণাম করিতেই তিনি ব্যস্ত হইয়া সরিয়া গিয়া কহিলেন "করেন কি?"

হরিমোহিনী অশ্রুনেত্রে কহিলেন, "আপনার ঋণ আমি কোনো জন্মে শোধ করতে পারব না। আমার মত এত

বড় নিরুপায়ের আপনি উপায় করে দিয়েচেন এ আপনি ভিন্ন আর কেউ করতে পারত না। ইচ্ছে করলেও আমার ভাল কেউ করতে পারে না এ আমি দেখেচি—তোমার উপর ভগবানের খুব অনুগ্রহ আছে তাই তুমি আমার মত লোকের উপরেও অনুগ্রহ করতে পেরেচ!"

পরেশ বাবু অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, "আমি বিশেষ কিছুই করিনি—এ সমস্ত রাধারাণী—"

হরিমোহিনী বাধা দিয়া কহিলেন "জানি জানি—কিন্তু রাধারাণীই যে তোমার—ও যা করে সে যে তোমারি করা। ওর যখন মা গেল, ওর বাপও রইলনা তখন ভেবেছিলুম মেয়েটা বড় দুর্ভাগিনী—কিন্তু ওর দুঃখের কপালকে ভগবান যে এমন ধন্য করে তুল্‌বেন তা কেমন করে জান্‌ব বল! দেখ, ঘুরে ফিরে শেষে আজ তোমার দেখা যখন পেয়েছি তখন বেশ বুঝতে পেরেছি ভগবান আমাকেও দয়া করেচেন।"

"মাসী, মা এসেচেন তোমাকে নেবার জন্যে" বলিয়া বিনয় আসিয়া উপস্থিত হইল। সুচরিতা উঠিয়া পড়িয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কোথায় তিনি?"

বিনয় কহিল "নীচে আপনার মার কাছে বসে আছেন।"

সুচরিতা তাড়াতাড়ি নীচে চলিয়া গেল।

পরেশবাবু হরিমোহিনীকে কহিলেন "আমি আপনার বাড়িতে জিনিষপত্র সমস্ত গুছিয়ে দিয়ে আসিগে।"

পরেশবাবু চলিয়া গেলে বিস্মিত বিনয় কহিল—"মাসি, তোমার বাড়ির কথা ত জানতুম না।"

হরিমোহিনী কহিলেন "আমিও যে জানতুম না বাবা। জান্‌তেন কেবল পরেশবাবু। আমাদের রাধারাণীর বাড়ি।"

বিনয় সমস্ত বিবরণ শুনিয়া কহিল, "ভেবেছিলুম পৃথিবীতে বিনয় একজন কারো একটা কোনো কাজে লাগ্‌বে। তাও ফস্‌কে গেল। এ পর্য্যন্ত মায়ের ত কিছুই করতে পারিনি, যা করবার সে তিনিই আমার করেন—মাসীরও কিছু করতে পারব না তাঁর কাছ থেকেই আদায় করব। আমার ঐ নেবারই কপাল দেবার নয়।"

কিছুক্ষণ পরে ললিতা ও সুচরিতার সঙ্গে আনন্দময়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিমোহিনী অগ্রসর হইয়া গিয়া কহিলেন—"ভগবান যখন দয়া করেন তখন আর কৃপণতা করেন না—দিদি, তোমাকেও আজ পেলুম।" বলিয়া হাতে ধরিয়া তাঁহাকে আনিয়া মাদুরের পরে বসাইলেন।

হরিমোহিনী কহিলেন, "দিদি তোমার কথা ছাড়া বিনয়ের মুখে আর কোনো কথা নেই।"

আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন—"ছেলে বেলা থেকেই ওর ঐরোগ, যে কথা ধরে সে কথা শীঘ্র ছাড়ে না। শীঘ্র মাসির পালাও সুরু হবে!"

বিনয় কহিল—"তা হবে, সে আমি আগে থাক্‌তেই বলে রাখ্‌চি। আমার অনেক বয়সের মাসী, নিজে সংগ্রহ করেছি, এতদিন যে বঞ্চিত ছিলুম নানা রকম করে সেটা পুষিয়ে নিতে হবে।"

আনন্দময়ী ললিতার দিকে চাহিয়া সহাস্যে কহিলেন—"আমাদের বিনয় ওর যা অভাব তা সংগ্রহ করতেও জানে আর সংগ্রহ করে প্রাণ মনে তার আদর করতেও জানে। তোমাদের ও যে কি চোখে দেখেচে সে আমিই জানি—যা কখনো ভাবতে পারত না তারই যেন হঠাৎ সাক্ষাৎ পেয়েছে! তোমাদের সঙ্গে ওদের জানাশোনা হওয়াতে আমি যে কত খুসি হয়েছি সে আর কিবল্‌ব মা! তোমাদের এই ঘরে যে এমন করে বিনয়ের মন বসেছে তাতে ওর ভারি উপকার হয়েছে। সে কথা ও খুব বোঝে আর স্বীকার করতেও ছাড়ে না।"

ললিতা একটা কিছু উত্তর করিবার চেষ্টা করিয়াও কথা খুঁজিয়া পাইল না, তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সুচরিতা ললিতার বিপদ দেখিয়া কহিল—"সকল মানুষের ভিতরকার ভালটি বিনয়বাবু দেখ্‌তে পান, এই জন্যই সকল মানুষের যেটুকু ভাল সেইটুকুই ওঁর ভোগে আসে। সে অনেকটা ওঁর গুণ।"

বিনয় কহিল—"মা, তুমি বিনয়কে যতবড় আলোচনার বিষয় বলে ঠিক করে রেখেচ সংসারে তার ততবড় গৌরব নেই। একথাটা তোমাকে বোঝাব মনে করি নিতান্ত অহঙ্কারবশতই পারিনে। কিন্তু আর চল্ল না। মা আর নয়, বিনয়ের কথা আজ এই পর্য্যন্ত!"

এমন সময় সতীশ তাহার অচিরজাত কুকুরশাবকটাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া উপস্থিত

হইল। হরিমোহিনী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"বাবা সতীশ, লক্ষী বাপ আমার ও কুকুরটাকে নিয়ে যাও বাবা।"

সতীশ কহিল "ও কিছু করবে না মাসী। ও তোমার ঘরে যাবে না। তুমি একে একটু আদর কর, ও কিছু বল্‌বে না।"

হরিমোহিনী সরিয়া গিয়া কহিলেন, "না, বাবা, না, ওকে নিয়ে যাও!"

তখন আনন্দময়ী কুকুরসুদ্ধ সতীশকে নিজের কাছে টানিয়া লইলেন। কুকুরকে কোলের উপর লইয়া সতীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সতীশ, না? আমাদের বিনয়ের বন্ধু?"

বিনয়ের বন্ধু বলিয়া নিজের পরিচয়কে সতীশ কিছুই অসঙ্গত মনে করিত না সুতরাং সে অসঙ্কোচে বলিল—"হাঁ।" বলিয়া আনন্দময়ীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আনন্দময়ী কহিলেন, "আমি যে বিনয়ের মা হই!"

কুকুরশাবক আনন্দময়ীর হাতের বালা চর্ব্বণের চেষ্টা করিয়া আত্মবিনোদনে প্রবৃত্ত হইল। সুচরিতা কহিল, "বক্তিয়ার মাকে প্রণাম কর্!"

সতীশ লজ্জিতভাবে কোনোমতে প্রণামটা সারিয়া লইল।

এমন সময় বরদাসুন্দরী উপরে আসিয়া হরিমোহিনীর দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া আনন্দময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি আমাদের এখানে কিছু খাবেন?"

আনন্দময়ী কহিলেন "খাওয়া ছোঁওয়া নিয়ে আমি কিছু বাছ বিচার করিনে। কিন্তু আজকের থাক্—গোরা ফিরে আসুক্ তার পরে খাব।"

আনন্দময়ী গোরার অসাক্ষাতে গোরার অপ্রিয় কোনো আচরণ করিতে পারিলেন না।

বরদাসুন্দরী বিনয়ের দিকে তাকাইয়া কহিলেন "এই যে বিনয় বাবু এখানে; আমি বলি আপনি আসেন নি বুঝি?"

বিনয় তৎক্ষণাৎ বলিল, "আমি যে এসেছি সে বুঝি আপনাকে না জানিয়ে যাব ভেবেছেন?"

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "কাল ত নিমন্ত্রণের খাওয়া ফাঁকি দিয়েচেন আজ না হয় বিনা নিমন্ত্রণের খাওয়া খাবেন।"

বিনয় কহিল—"সেইটেতেই আমার লোভ বেশি। মাইনের চেয়ে উপ্‌রি পাওনার টান বড়।"

হরিমোহিনী মনে মনে বিস্মিত হইলেন। বিনয় এবাড়িতে খাওয়া দাওয়া করে—আনন্দময়ীও বাছ-বিচার করেন না। ইহাতে তাঁহার মন প্রসন্ন হইল না।

বরদাসুন্দরী চলিয়া গেলে হরিমোহিনী সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দিদি, তোমার স্বামী কি"—

আনন্দময়ী কহিলেন—"আমার স্বামী খুব হিন্দু।"

হরিমোহিনী অবাক্ হইয়া রহিলেন। আনন্দময়ী তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন—"বোন, যতদিন সমাজ আমার সকলের চেয়ে বড় ছিল ততদিন সমাজকেই মেনে চলতুম কিন্তু একদিন ভগবান আমার ঘরে হঠাৎ এমন করে দেখা দিলেন যে আমাকে আর সমাজ মান্‌তে দিলেন না। তিনি নিজে এসে আমার জাত কেড়ে নিয়েচেন তখন আমি আর কাকে ভয় করি!"

হরিমোহিনী এ কৈফিয়তের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন—"তোমার স্বামী?"

আনন্দময়ী কহিলেন "আমার স্বামী রাগ করেন।"

হরিমোহিনী। "ছেলেরা?"

আনন্দময়ী। ছেলেরাও খুসি নয়। কিন্তু তাদের খুসি করেই কি বাঁচব? বোন্, আমার একথা কাউকে বোঝাবার নয়—যিনি সব জানেন তিনিই বুঝ্‌বেন।

বলিয়া আনন্দময়ী হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিলেন।

হরিমোহিনী ভাবিলেন হয় ত কোনো মিশনারির মেয়ে আসিয়া আনন্দময়ীকে খৃষ্টানি ভজাইয়া গেছে। তাঁহার মনের মধ্যে অত্যন্ত একটা সঙ্কোচ উপস্থিত হইল।

আমেরিকার গ্রামে উন্নতির পরাকাষ্ঠা।

ভারতবর্ষে জাতীয় শিল্পোন্নতির জন্য বিরাট চেষ্টা জাগ্রত হইয়াছে। ভারতের সকল অবস্থার, সম্প্রদায়ের ও প্রদেশের জনসাধারণ পুরাতন শিল্পের উদ্ধার ও নূতন কারিগরীর প্রবর্ত্তন করিতে যত্নবান হইয়াছে। এ দেশের লোকের কর্ম্মপ্রবর্ত্তনার ও চিন্তার বিষয় হইয়াছে এবং কারুশিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। বর্ত্তমান সময়ে বাণিজ্য ও শিল্প প্রচেষ্টা সমগ্র জাতির মনকে এমন ভাবে অধিকার করিয়াছে যে মানবজীবনের উপযোগী অপরাপর বিষয় একেবারে প্রচ্ছন্ন ও বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছে।

যখন প্রাচ্যভূমে প্রতীচ্য ও প্রাচ্য দেশবাসিগণ সম্মিলিত চেষ্টায় প্রতীচ্যের আদর্শে শিল্পসাধনার আয়োজন করে, তখন একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে প্রতীচ্য দেশের এই রীতি প্রাচ্য দেশে নিরবচ্ছিন্ন সুফলপ্রসূ হইবে কিনা। কল কারখানা দোকান পাটের প্রবর্ত্তনে গ্রামগুলি উপেক্ষিত পরিত্যক্ত হইয়া আপনার স্নেহলালিত সন্তানগুলিকে সহরের সর্ব্বগ্রাসী কবলে সমর্পণ করিতে থাকে। ইহাতে সমগ্র মানবসমাজ একেবারে বিশৃঙ্খল হইয়া এক এক জন অর্থশালী ব্যক্তির অধীন হইয়া পড়ে। মজুরদের অবস্থা সুখকর হয় না, আনন্দজনক ত নহেই। গ্রামের পারিবারিক বন্ধন শিথিল ও বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। নিঃসম্পর্ক হাজার হাজার নরনারী সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে বাস করিতে বাধ্য হয়, সমাজের শাসন হইতে দূরে থাকিয়া তাহাদের নীতি, চরিত্র ও স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। প্রাচ্যভূমের ছোট ছোট কারখানার কারিকরগণ স্বীয় পরিবারের পুণ্যছায়ায় থাকিয়া কাজ করিতে পারে, আপনার ঘরকন্নাও দেখিতে পারে। বড় বড় কারবারের মালিকগণ অর্থসঞ্চয়ের লোভে মজুরদের মজুরী যথাসম্ভব অল্পই দেয়, তাহাতে তাহারা সহরের কদর্য্য অংশে থাকিতে বাধ্য হয়। মাতলামি ও আনুসঙ্গিক পাপ সকল শিল্পোন্নতির সহচর হইয়া উঠে, অবশেষে দারিদ্র্য ও দুর্নীতি সামাজিক সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। পারিবারিক বন্ধন শিথিল হইলেই স্বার্থপরতা আসে। অন্ধ অনুকরণের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতীচ্যের ব্যবসায় পদ্ধতি প্রাচ্যদেশে আমদানি করিলে এই সমস্ত দোষও অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

যাঁহারা প্রতীচ্য দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের গতি বিচক্ষণতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে তৎসম্পর্কান্বিত দোষ সমূহ দূরীকরণের জন্যও কি প্রগাঢ় ও প্রবল চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। য়ুরোপ ও আমেরিকার কেন্দ্রীভূত ধনশালিত্বের বিপক্ষে সামাজিক সাম্যনীতি (Socialism দণ্ডায়মান হইয়াছে; সহরে বিলাসের বিপক্ষে সরল জীবনযাত্রা প্রণালীর পক্ষপাতী দল উদ্ভূত হইয়াছে; সাংসারিকতার বিপক্ষে আধ্যাত্মিকতা প্রবল হইতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দী যেমন সাংসারিক উন্নতির জন্য প্রসিদ্ধ, বর্ত্তমান শতাব্দীর টানটা যেন আধ্যাত্মিকতার দিকেই প্রধান হইয়া উঠিতেছে। এখন সমগ্র পৃথিবী যেন নাগর-দোলায় উঠা নামা করিতেছে। প্রতীচ্য এত দিন সাংসারিকতার ঝোঁকে মত্ত হইয়া ফিরিতেছিল এখন আধ্যাত্মিকতার আস্বাদ পাইয়া সেই দিকে ফিরিতেছে; আর প্রাচ্য এতকাল অধ্যাত্ম চিন্তায় স্তব্ধ হইয়াছিল, এইবার সাংসারিকতা ও অর্থ সঞ্চয়ের জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। মানুষ যে কখনো সাংসারিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সামঞ্জস্য রাখিয়া যথার্থ সভ্যতা লাভ করিতে পারিবে তাহা ভবিষ্যদ্বাণীরও অজ্ঞেয়।

যাঁহারা তলাইয়া চিন্তা করেন, তাঁহারা বুঝিতেছেন যে গ্রাম সকলই সমাজশরীরের হৃদ্‌যন্ত্র এবং বাণিজ্য কেন্দ্র-সকল তাহার উপশিরার প্রান্ত মাত্র। লোহিত শোণিত হৃদ্‌যন্ত্র হইতে বাহির হইয়া ধমনীর সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন অংশে নীত হয়। সেই সংক্রমণ শেষে রক্ত দূষিত হইয়া কালো হইয়া যায় এবং সেই কালো রক্ত উপশিরা বাহিয়া হৃদ্‌যন্ত্রে ফিরিয়া আসে ও পরিষ্কৃত হয় এবং সেই রক্তপ্রবাহ সমগ্র শরীরকে সুস্থ রাখে। তেমনি বলিষ্ঠ কর্ম্মঠ সুস্থ নরনারী কাঁচা বয়সে গ্রাম ছাড়িয়া কলকারখানায় খাটিতে যায়। সহরে জীবন যাপন করিয়া যখন দেহ খিন্ন, চিত্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহারা তখন পুনরায় নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য গ্রামে ফিরিয়া আসে।

সময়ের লক্ষণ যেরূপ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে তাহাতে প্রকাণ্ড কারখানা ভবিষ্যতে খুব অল্পই নির্ম্মিত হইবে।

আজ কাল বড় বড় সহর ভাঙিয়া ছোট ছোট দশ পনরটা বিভাগ করা হইতেছে এবং এক একটা বিভাগ দশ বিশ মাইল দূরে দূরে রাখা হইতেছে, আর এই সকল বিভাগ বৈদ্যুতপথে সংযুক্ত করা হইতেছে, সেই পথে আলো, জল, ফুটপাথ পরিমার্জ্জন প্রভৃতির ব্যবস্থা আধুনিক দস্তুর মতই থাকিতেছে।

প্রতীচ্য ভূখণ্ডে এই রীতিতে সহর সকল গ্রাম্যশ্রী ধারণ করিতেছে এবং গ্রাম সকলও সহরে ভাব প্রাপ্ত হইতেছে। মানুষ মত্ত হইয়া ব্যবসায় কেন্দ্রে ছুটিয়া গিয়া বিশ্ব প্রকৃতির কল্পনা সমস্ত উল্টাপাল্টা করিয়া দেয়। পল্লী পরমেশ্বরের নির্ম্মাণ। সহর মানুষের তৈয়ারি। দশ মাইল ক্ষেত্রের মধ্যে লক্ষ লোকের ভিড় জমাইয়া তোলা বস্তুতই দেবনিয়মের ব্যতিক্রম ঘটানো। স্বাস্থ্যতত্ত্ব যত অধিক অনুশীলিত হইতেছে এবং বৈজ্ঞানিক নরনারী সহরে জীবনের অপকারিতা যতই উপলব্ধি করিতেছেন, ততই সকলের মনে সহরগুলিকে পল্লীতে পরিণত করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। যে লোক কিছুদিন আগে চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের মত সহরের ভিড়ের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল সেই এখন সহরের ধূমধূসর অন্ধকার ও পূতি-গন্ধময় বাতাসকে গ্রাম্যপবিত্রতায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। এই কারণেই সহরের মাঝে মাঝে উদ্যান রচিত হইতেছে, ছায়াশীতল তরুবীথি রাজপথে সারি দিতেছে।

ঠিক সমান পরিবর্ত্তন পল্লী অঞ্চলেও ঘটিতেছে। গ্রাম সকলেও বৈদ্যুতিক আলোক, টেলিফো, সিমেণ্টমাজা পথ, পাকা রাস্তা, জলের কল, ঢাকা নর্দ্দমা প্রভৃতি সহরের উন্নতি ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিতেছে।

আমেরিকার মার্কিন প্রদেশে পশ্চিম ইলিনয় একটি সমৃদ্ধ প্রদেশ। সেই প্রদেশের ছোট্ট পল্লী কেমব্রিজ, গ্রামের সহুরে ভাব পাওয়ার একটি উদাহরণ। ইহা কোনো শিল্পকেন্দ্রও নহে, পুরাতন সহরও নহে। যে স্থানে এই সহর প্রতিষ্ঠিত, ষাট বৎসর পূর্ব্বে সেই স্থান জনহীন, বৃক্ষহীন, পথহীন ঘাসের জঙ্গল ছিল। কেমব্রিজ বড় সহর নহে। ১৯০৮ সালে ইহার জনসংখ্যা মাত্র ১৪০০ চৌদ্দশত ছিল। ইহার আয়তন এক বর্গ মাইল মাত্র। কিন্তু কেমব্রিজ আধুনিক প্রণালীতে অত্যন্ত উন্নত পল্লীগ্রাম; বর্ত্তমান কালের ভাবস্রোতের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত।

কেমব্রিজে বৈদ্যুত আলোক, টেলিফোঁ ও সিমেণ্টমাজা পথ আছে। সেখানে কলে যথেষ্ট পরিমাণ পরিষ্কার স্বাস্থ্যজনক জল সরবরাহ করা হয়—এবং এই জলের কল থাকাতে আগুনলাগার ভয় কম হইয়াছে, দমকলে জল উচু বাড়ীর চেয়েও উচুঁতে ছিটানো যায়। আজকাল গভীর আর্টিসিয়ান (Artesian) কূপ খনন করিয়া সহরের কলে জল জোগানো হয়। এই সকল কূপ খননের পূর্ব্বে রাস্তার চৌমাথায় নির্ম্মিত চৌবাচ্চা হইতে জল লওয়া হইত। বৃষ্টির জল সহরের বাড়ীর ছাদ হইতে সংগ্রহ করিয়া এই সব চৌবাচ্চায় জমা করা হইত, এবং ঘরে আগুন লাগিলে সহরের পুরুষগণ, দরকার হইলে স্ত্রীলোকেরাও, পম্প দিয়া সেই জল ছিটাইয়া আগুন নিভাইত। এখন দমকলের সাহায্যে বড় বড় আগুনও সহজে নিভানো যায়। কলের জল গভীর আর্টিসিয়ান কূপ হইতে তোলা হয়। ভারতেও এইরূপ কূপের প্রচলন হওয়া উচিত। ডাঙ্গা জায়গায় যেখানে সাধারণ কূপে জল বারোমাস থাকে না, অথবা যে সকল স্থানে কূপের জল স্বাস্থ্যকর হয় না সেই সকল জায়গায় আর্টিসিয়ান কূপ করাইলে স্বাদু স্বাস্থ্যকর জল বারোমাস পাওয়া যাইতে পারে। ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতির আক্রমণে অকালমৃত্যুর ভয়ও অনেক পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে।

কেমব্রিজ সহরে অগ্নিনির্ব্বাপক সমিতি (fire brigade), একটি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় ও একটি আদালত আছে। এখন সেখানে ষ্টিম রেলপথ আছে। অল্পদিনেই বৈদ্যুত ট্রেন নিকটস্থ সহর সকলের সহিত ইহাকে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করিয়া দিবে। ডাকঘর হইতে প্রত্যহ চারবার চিঠি বিলি হয় এবং বৎসরে পনর হাজার টাকার ডাক টিকিট বিক্রয় হয়। ডাকের বাক্স রাখার করস্বরূপ বৎসরে বারো হাজার টাকা আদায় হয়। ডাকঘরে একজন পোষ্টমাষ্টার, একজন সহকারী, একজন কেরাণী ও পাঁচজন হরকরা কাজ করে। প্রত্যেক হরকরাকে ২৭ মাইল পথ পরিভ্রমণ করিতে হয়। তাহারা সপ্তাহে একদিন পাড়াগাঁয়ের চাষাদের ডাক বিলি করে, এবং তাহাদের চিঠিপত্র সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসে এবং

কেম্‌ব্রিজে মিঃ জনসনের ঔষধের দোকান
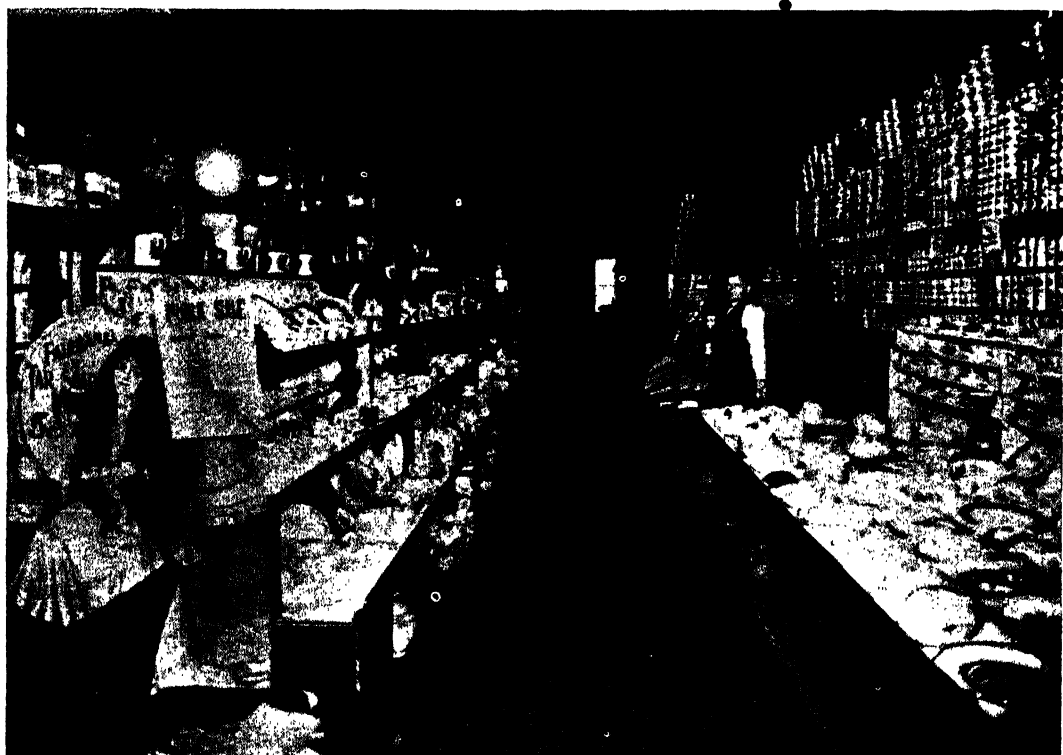
কেম্‌ব্রিজে হান্ট্, জনসন ও টেলারের মুদির দোকান।
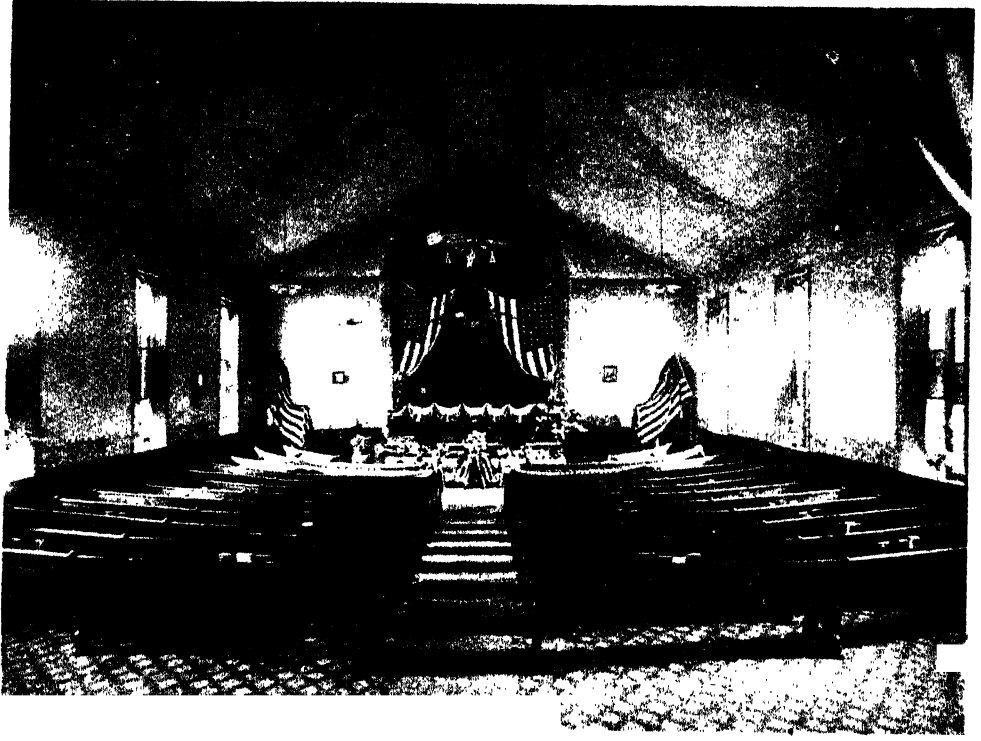
কেম্‌ব্রিজের একটি গির্জ্জার অভ্যন্তর।

প্রবন্ধ লেখক কেম্‌ব্রিজের মিঃ ঈষ্টল্যাণ্ডের এই বাড়িতে থাকেন

টিকিট প্রভৃতি পোষ্টাপিস সংক্রান্ত দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়া আসে। চাষারা গভর্ণমেণ্টের এই ব্যবস্থায় বিশেষ উপকৃত ও প্রীত হইয়াছে। এজন্য তাহাদিগকে কিছু দিতে হয় না। তাহারা শুধু একটা জলবারক (water poof) শক্ত বাক্স জোগাড় করিয়া রাখে। তাহাতেই হরকরা চিঠিপত্র দিয়া যায়। এই গ্রাম্য খয়রাতি চিঠিবিলির ব্যবস্থা করিতে যুক্ত প্রদেশের শাসকসম্প্রদায়কে ১৯০৬ সাল হইতে এযাবত ২৯০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে। প্রত্যেক বৎসরে ইহার জন্য সরকারের ১০ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা খরচ হইতেছে এবং সে খরচ ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে। কেমব্রিজ ডাকঘরে দুজন স্ত্রীহরকরা আছে।

এই সহরে একটা সাধারণ পাঠাগার আছে তাহার পুস্তক সংখ্যা কয়েক হাজার হইবে। সঙ্গীতসমাজ আছে। দুইটি চিত্রশালা আছে—সেখানে আড়াই আনা পয়সা দিয়া শত শত হস্ত লম্বা চলন্ত ছবি দেখিতে ও একটি সচিত্র গান শুনিতে পাওয়া যায়। কেমব্রিজে একটি নাট্যশালাও আছে—পর্য্যটক নাট্যসম্প্রদায় সপ্তাহে একদিন বা বেশি, সেখানে অভিনয় করে। ইহা ছাড়া সহরের সঙ্গীত সম্প্রদায় সকল মাঝে মাঝে সহরের চারটি গির্জায় একতানবাদ্য করে। আর একটি গির্জা আছে সেখানে ইংলণ্ডের ধর্ম্মমতানুসারে উপাসনা হয়—কিন্তু সব সময়ে এই গির্জার কাজ হয় না। একটি রমণী শ্রীমতী ইমোজিন এটন একটি বাদ্যদলের কর্ত্রী। কেমব্রিজে **মাদকতার জন্য মদ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ বলিয়া সেখানে মদের দোকান নাই।** সেখানে চারটি সরাই, চারটি পানশালা, যেখানে লোকে সোডা, লেমনেড পান করে, কুলপি বরফ ও মিঠাই খায়, এবং দুইটি ভোজনাগার আছে। একটা রুটির দোকান, একটা কলে কাপড় ধোলাইয়ের কারখানা, তিনটি নরসুন্দরের দোকান, একটা জুতার দোকান, তিনটা ভুষিমালের আড়ত, তিনটা জামার দোকান, দুইটা দেয়ালে চিত্রকাগজের দোকান, চারিটা কাঁসারির দোকান, দুইটা মাংসের বাজার, তিনটা মুদিখানা, তিনটা ধনাগার বা ব্যাঙ্ক, এবং ছয়জন আইন ব্যবসায়ী সারা বৎসর ধরিয়া খুব জোরে কারবার করে। সহরে সাতজন ডাক্তার আছে—তন্মধ্যে দুইজন নারী; দুইজন দন্তচিকিৎসক; একজন পশুচিকিৎসক। দুজন পুরুষের দরজি ও ছয়জন স্ত্রীলোকের দরজি পোষাক করিতে ব্যতিব্যস্ত থাকে। একটি দরজির শিক্ষাশালা আছে সেখানে মেয়েদের সেলাই শেখানো হয়। দুজন জলের কল প্রভৃতির নল স্থাপক, তিনজন কামার, তিনজন বাড়ীর ঠিকাদার, দশজন চিত্রকর এবং ত্রিশজন ছুতার সহরে থাকা সত্ত্বেও লোকে নূতন বাড়ী তৈয়ার করিতে বা পুরাতন বাড়ী মেরামত করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। দুটি ভাড়াটে আস্তাবল ও একটা মোটরগাড়ীর আড্ডা থাকাতে লোকের কাজে গতায়াত বা সখের ভ্রমণে খুব সুবিধা আছে। ৬টি হাতিয়ারের দোকান চতুঃপার্শ্বের চাষাদের চাষবাসের হাতিয়ার জোগায়। তিনখানি সাপ্তাহিক খবরের কাগজ বাহির হয়, আর তাহাদের ছাপা খানায় খুচরা কাজও হইয়া থাকে। একজন দক্ষ ফটোগ্রাফ ওয়ালার দোকান সহরবাসীদিগের দ্বারা বেশ ভালো রূপেই সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। প্রধান প্রধান রাস্তার মোড়ে নয়নরঞ্জক ফুলের কেয়ারি আছে, এখন একটি সাধারণভোগ্য উদ্যান রচনার কল্পনা চলিতেছে।

এই প্রবন্ধের সঙ্গে যে সব ছপি ছাপা হইল তাহা দেখিলেই কেমব্রিজের মত ক্ষুদ্র আয়তনের ভারতীয় গ্রামের দুরবস্থা বুঝিতে পারা যাইবে। ভারতের বহু সহর হয় ত বহু প্রাচীন, শত শত বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের উদ্ভব হইয়াছে; কিন্তু অধিবাসিগণ এমন হীনভাবে থাকে যে তাহাদের নিজেদের বা পারিপার্শ্বিকের উন্নতি করিবার ইচ্ছা বা সাধ্য থাকার লক্ষণ মোটেই প্রকাশ পায় না। যে ভারতীয় গ্রামে চোদ্দশতজন মাত্র অধিবাসী সেখানে খানকয়েক ঘনপুঞ্জীকৃত কুঁড়েঘর ও কাঁচা ইট পাথরের গোটাকত বাড়ী ছাড়া আর কিছু থাকে না। সেখানে খান পাঁচ ছয় জঘন্য নোংরা, পুরাণো রকমের দোকান একসঙ্গে সকল আবশ্যকীয় দ্রব্যই বিক্রয় করে, রকমারি জিনিষের বিভিন্ন দোকান প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। সহরের মানুষগুলাও কেমন নির্জ্জীব রকমের। তাহারা দারিদ্র্যের প্রতিমূর্ত্তি, দুর্ভিক্ষের সাক্ষী। তাহাদের পক্ষে জীবনযাত্রা ক্লেশকর, রসমাধুর্য্যহীন! তাহারা মেটেদেয়ালের খোড়োঘরে বাস করে, একই ঘরে রান্না খাওয়া শোওয়া

বসা প্রভৃতি ঘরকন্নার সব কাজই চলে। সেই ঘরের পাশেই হয়ত গোয়ালঘর, তাহারই পাশে সারের জন্য গোবর পচিয়া বিষম দুর্গন্ধ প্রচার করিতেছে। স্ত্রীপুরুষের পরিচ্ছদ নাই বলিলেও হয়। বাঙালী অপেক্ষা অন্য দেশীয় স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ কতকটা ভালো।

ভারতের কৃষকেরা হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত চাষের পদ্ধতি এখনও অবলম্বন করিয়া আছে। তাহার লাঙল সেই আদিম কালেরই—ধীর মন্থর বলদে টানিয়া যতক্ষণে যতদূর যাহা করিতে পারে। কৃষক জলের জন্য আকাশের দিকেই তাকাইয়া অপেক্ষা করে, কদাচিৎ কখনো সেচন করিয়া ক্ষেত্রে জল দেয়—কিন্তু সেই সেচন প্রণালীও এই বৈজ্ঞানিক যুগে ছেলেখেলা বলিয়া মনে হয়। শিল্প বা কারুকরী কর্ম্মেও ভারতীয় কারিগরেরা এইরূপ। বাপ পিতামহের অনুসৃত পন্থা তাহারা কিছুতেই ত্যাগ করিতে চাহে না।

এই পাশ্চাত্য গ্রাম কেমব্রিজে উন্নতির চরম পরিণতির বীজ প্রকটভাবে রহিয়াছে। এই সহরের মধ্যে ও চতুঃপার্শ্বে সর্ব্বত্রই পরিবর্ত্তন চলিতেছে এবং সেই পরিবর্ত্তন উন্নতির দিকেই। লোকেরা যেন উন্নতি-পাগল। তাহারা পরিশ্রম-লঘুকর ও আরামপ্রদ সর্ব্ববিধ সাধন আপনাদের গৃহশালায় মধ্যে চায়—যাহাতে তাহারা উন্নতিশীলতার দাবী করিতে পারে। কেমব্রিজের অধিবাসীর গোশালা বা অশ্বশালা ভারতের অনেক আফিস আদালতের ঘরের চেয়েও ভালো। সেখানকার গোশালা অশ্বশালা বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত, এবং সেই দিবালোকসদৃশ আলোক জ্বলিয়া দুগ্ধ দোহন সম্পন্ন হয়।

বিদ্যালয় মন্দিরটি সেখানকার গর্ব্বের সামগ্রী। একটি জমকালো বাড়ী, ১২৭ ফুট লম্বা, ৭৬ ফুট চৌড়া। উঁচু পোতার উপর দুতলা। ইহা ইট প্রস্তরে গ্রথিত, ছাদ শ্লেটপাথরের, ভিতরটায় ওককাঠের অস্তর দেওয়া। তাপ দিয়া বাড়ীকে গরম করা, হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য-রক্ষার আয়োজন প্রভৃতি হাল নিয়মানুযায়ী সকল ব্যবস্থাই আছে। পোতার নীচে নর্দ্দমার জলে রোগবীজাণুধ্বংস করিবার ব্যবস্থাঘর, চুল্লীঘর, চারিটা টাটকা তাজা বাতাস ও তাপের ঘর, গৃহস্থালীবিজ্ঞান ও হাতে কাজ শিখানোর ঘর, দুইটি খেলার ঘর ও একটা কুস্তির আখড়ার বড় ঘর আছে।

দোতালায় ছয়টি পাঠাগার, একটা খাবার ঘর, একটা শিক্ষকদের বিশ্রামকক্ষ, এবং একটা ৭০ফুট লম্বা ও ১৭ ফুট চৌড়া বারান্দা আছে। তেতলায় বিদ্যালয়ের সভা গৃহ, আবৃত্তি গৃহ, পর্য্যবেক্ষকের কার্য্যালয়, ভাণ্ডার প্রভৃতি আছে। সকল ঘরের সঙ্গেই জামা কাপড় রাখার পৃথক কামরা আছে। তা ছাড়া পুস্তকালয় ও বড় বড় বারান্দা প্রভৃতিরও ব্যবস্থা আছে।

বিদ্যালয়ের যন্ত্রশালায় আধুনিকতম সকল উপকরণই আছে। বিজ্ঞানের বক্তৃতাগারে পাখীর চমৎকার সংগ্রহ আছে। এগুলি একজন জনহিতৈষী নাগরিকের দান। সব ঘরেই প্রায় বিদ্যুতের আলোক আছে—সর্ব্বসুদ্ধ মোট ১৬০টা বৈদ্যুতবাতি আছে। সব ঘরেই ঘড়ী আছে। এই সকল ঘড়ী বৈদ্যুতবলে চলে এবং আপনাআপনি বিদ্যালয়ের কার্য্যের অনুযায়ী সময় নির্দ্দেশ করিয়া যুগপৎ বাজে।

প্রত্যেক ঘরের পাশেই সেহেতখানা ও প্রত্যেক তালায় পানীয়জলের কল আছে।

সকল জানালাতে খড়খড়ি আছে, তাহা স্প্রিঙের সাহায্যে গুটানো যায়। ছাত্রদের ডেস্ক ছাড়া আর সব আসবাবই ওককাঠের। সকল ঘরই ছবিদ্বারা ভূষিত। সকল ঘরেই বই রাখার তাক আছে। ঘর থেকে বারান্দায় যাইবার দরজায় কাচের কপাট আছে।

খাবার ঘরও যথোপযুক্তরূপে সজ্জিত এবং তাহাতে একটি অগ্নিকুণ্ড আছে। শিক্ষকদের বিশ্রামাগারে ১৮০ টাকা মূল্যের বেতবোনা আসবাব আছে—সেগুলি শিক্ষকেরা নিজের পয়সায় কিনিয়াছেন; এবং ২১০ টাকা দামের কম্বল, পর্দ্দা, আয়না, ও প্রসাধন উপাদান কেমব্রিজের সদাশয় বণিকগণ দান করিয়াছেন।

স্কুল ঘরের পশ্চাতে একটা বড় এক জাতীয় তালগাছ বেদীর উপরে আছে, এটি একজন নাগরিকের দান। এই তালগাছটির বেড় ১০ ফুট; ৫ ফুট বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা বিদ্যালয়টিকে দুর্লভ সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে।

১১৭ জন বালক ও ১৩৮ জন বালিকা এখানে বিদ্যার্থী। ১০ জন শিক্ষক লেখাপড়া শেখান, একজন চিত্রাঙ্কন ও

কেম্‌ব্রিজ গ্রামের বিদ্যালয় ও আদালত
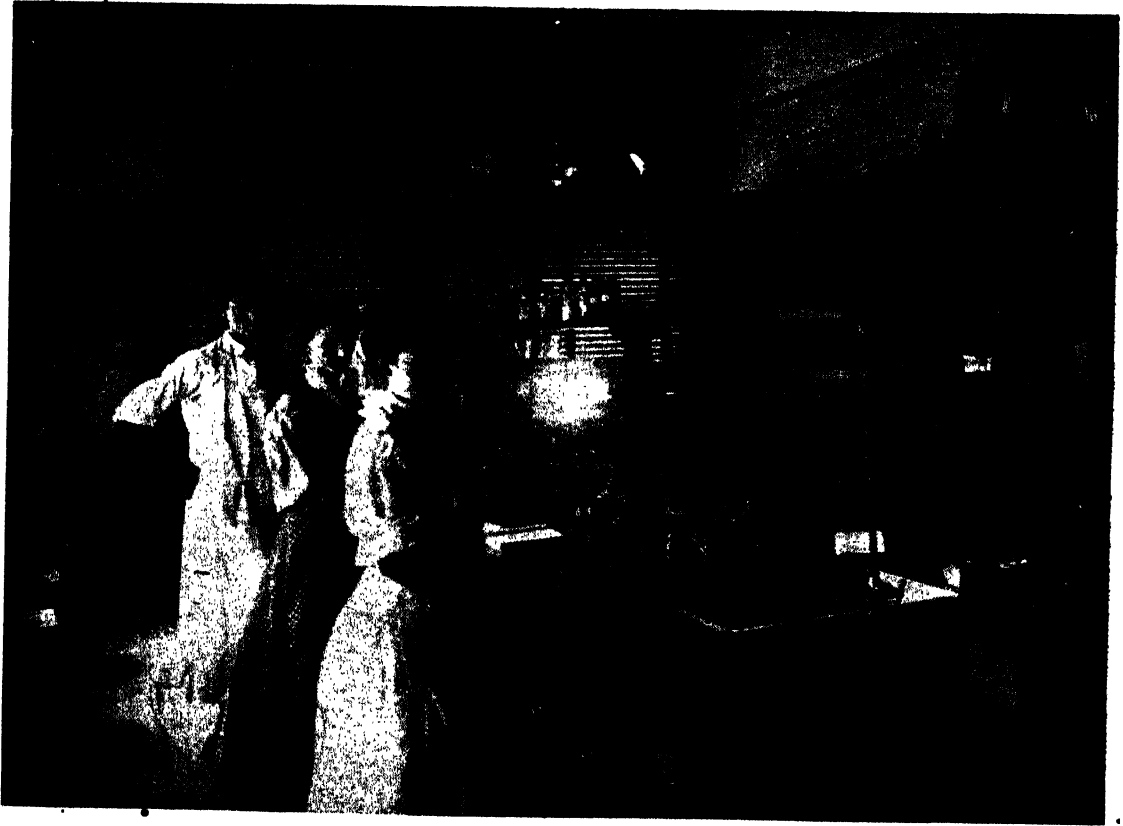
কেম্‌ব্রিজ গ্রাম্য পাঠশালার রাসায়নিক পরীক্ষাগার।
ভারতের অধিকাংশ কলেজেও এরূপ যন্ত্রাগার নাই।

কেম্‌ব্রিজ ক্রনিক্‌ল সংবাদপত্রের ছাপাখানা। সর্ব্বদক্ষিণেব লোকটি সম্পাদক, কার্য্যাধ্যক্ষ, প্রধান কম্পোজিটর এবং কলের কারিগর।

কেমব্রিজের একটি নাপিত্তের দোকান

একজন সঙ্গীত শিক্ষা দিয়া থাকেন। প্রত্যেক শ্রেণীতে সপ্তাহে একদিন সঙ্গীত ও মাসে একদিন চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দেওয়া হয়।

ইলিনয়তে শিক্ষা সকলেই পাইতে বাধ্য। সেই বাধ্য-করা আইনের নিম্নলিখিত ধারাগুলি পাঠযোগ্য —

প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার অধীনস্থ ৭ হইতে ১৬ বৎসরের বালকবালিকাকে শিক্ষা পাইবার জন্য কোনো না কোনো বিদ্যালয়ে পাঠাইতে বাধ্য, এবং সেই বালকবালিকারা সমগ্র শিক্ষাকালে (বৎসরে ১১০ দিনের কম নহে) বিদ্যালয়ে যোগদান করিবে।

কিন্তু যে সকল বালকবালিকাদিগকে কোনো উপযুক্ত ব্যক্তি উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী শিক্ষা দেন তাহাদের ও যাহারা ১৪ হইতে ১৬ বৎসর বয়সে কোনো দরকারী আইনসঙ্গত কাজে ব্যাপৃত থাকিতে বাধ্য হয় তাহাদের প্রতি এই আইন প্রযুজ্য নহে।

যাহারা এই নিয়ম লঙ্ঘন করে তাহাদের ১৫৲ হইতে ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারে।

এই জরিমানালব্ধ টাকা সেই বালকের বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে ব্যয়িত হইবে।

বালকের বয়স ভাঁড়াইলে ৯৲ হইতে ৬০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারে।

দুই চারিজন কর্ম্মচারী এই সকল নিয়ম যথাযথ পালিত হইতেছে কি না দেখিবেন। তাঁহারা স্কুলপালানো ছেলেদের ধরিয়া শিক্ষকের জিম্মা করিয়া দিবেন।

বিদ্যালয়ের অতি সন্নিকটেই সহরের প্রধান সংবাদপত্র ক্রনিকেলের আপিস। ইহা সাপ্তাহিক এবং ৫০ বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া চলিতেছে। দুটি ছাপার কল গ্যাসোলিন এঞ্জিনে চালিত হয়। সেই আপিসে কাটাই কল ও অক্ষরবিন্যাসের কাজও চলে। ইহার স্বত্বাধিকারী একজন আত্মচেষ্টায়-কৃতী পুরুষ, অথচ তাঁহার বয়স ত্রিশের কোঠায়। তিনি যে কখন কোনো বিদ্যালয়ে পড়িয়াছেন ইহা তাঁহার মনে নাই এবং তাঁহাকে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া সকল জিনিষ উপার্জ্জন করিতে হইয়াছে। তিনি স্বয়ং এই কাগজ সম্পাদন ও পর্য্যবেক্ষণ করেন, কাগজের জন্য বাহারো বিজ্ঞাপনগুলি কম্পোজ করেন এবং অন্যান্য কাজের অক্ষরবিন্যাসেরও তত্ত্বাবধান করেন। এই কাগজ ৮ পৃষ্ঠা। ভিতরের চার পৃষ্ঠা এই আপিসে ছাপা হয় না, তাহা ছাপা কিনিয়া লওয়া হয়। একটি খবর-জোগানদার সমিতি খবরের জোগান দেয়। এই সমিতির কার্য্যালয় সব নগরেই আছে এবং ইহাদের নিকট সাহায্য লইয়া মফস্বল সহরের বহু কাগজ পরিচালিত হয়। ইহা আমাদের পক্ষে এক অদ্ভুত বিচিত্র ব্যাপার।

মার্কিন দেশের যে-কাগজের কাটতি যত অধিক তাহাতে বিজ্ঞাপন দিবার খরচও তেমনি বেশি। এইজন্য খবর জোগানদারদের দর খুব বেশি। ইহাতে মফস্বলের কাগজওয়ালাদের খুব সুবিধা। তাহারা সাদা কাগজের দামেই খবর ছাপা কাগজ পায়।

খবর জোগানদারদের বিরাট কারবার। তাহারা দেশ বিদেশের খবর যোগায়। এসব দেশের সকল খবরই রাষ্ট্র-সম্পর্কীয়, এজন্য বিভিন্ন দলের কাগজের জন্য খবর-জোগানদারেরা বিভিন্ন রকমের কাগজ ছাপে। যে সংবাদ পত্র যে দলের গোঁড়া তাহার জন্য তাহার মতের অনুকূল সংবাদ পাঠানো হয়। খবর ছাড়া বাজার ও টাকার দর, চাষী, পশুপালক, দর্জ্জি প্রভৃতিরও জ্ঞাতব্য বহু তত্ত্ব তাহারা জোগায়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্রমশ প্রকাশ্য বড় গল্প, একটা স্বসম্পূর্ণ ছোট গল্প, কিছু চুটকি রস ও ছেলেদের জন্য ধাঁধাও থাকে। মাঝে মাঝে সচিত্র ভ্রমণকাহিনীও বাহির হয়।

কেমব্রিজের লোকেরা সন্ধ্যা বেলায় আড়াই আনার মেলায় ঘণ্টা খানেক যাপন করে। সচল ছবিগুলি আকর্ষক---তাহাতে এমন কিছু থাকে না যে কাহারো রুচিতে আঘাত লাগে। দৃশ্যগুলি প্রায়ই হাস্যকর। কখনো কখনো করুণ দৃশ্য দ্বারাও দর্শকদের ভাবোদ্রেক করানো হয়। এই সমস্ত ছবি শুধুই আনন্দ নয় অনেক সময় শিক্ষাও দেয়। জুলাই মাসের ৪ঠা মার্কিন দেশ ইংলণ্ড হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হয়। সেই দিনে এ বৎসর স্বাধীনতা লাভের জন্য যুদ্ধাভিনয় দেখানো হইয়াছিল, চিত্র দর্শনের পর দর্শকেরা দেশপ্রাণতা ও সাম্যভাবে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

কেম্ব্রিজের উন্নতি বিষয়ে অনেক কিছু বলা যাইতে পারে, তবে বাক্য অপেক্ষা এই প্রবন্ধ সংলগ্ন চিত্রাবলি

অধিক ব্যক্ত করিতে পারিবে। এই প্রবন্ধের লেখক যে বাড়ীতে তিন সপ্তাহ ধরিয়া আছেন তাহার একটা বর্ণনা দিলে ভাড়াটে বাড়ীরও একটা ধারণা হইবে। ইহা ইটের পোতার উপর কাঠের দুতলা বাড়ী, বৈঠকখানার দেয়াল বড় বড় চিত্রভূষিত; তাহার কয়েকখানি গৃহকর্ত্রীর স্বহস্ত অঙ্কিত। এক কোণে সুস্বর পিয়ানো। মেঝে শক্ত কাঠের, খুব পালিশ করা, কিয়দংশ সুদৃশ্য গাল্‌চেতে ঢাকা। অপর কোণে রমণীর লিখিবার ডেস্ক। কতকগুলি দোলনা চেয়ার ও কেদারা ঘরখানিকে আরামের মূর্ত্তি দান করিয়াছে। বৈঠকখানার পাশে বসিবার ঘর। একখানি গদিআঁটা কৌচ, দুএক খানি আরাম কেদারা, ওক কাঠের টেবিল, বই ও সাময়িক পত্র ভরা তাক ও আলমারি ঘরটিকে আরাম ও সুখকর করিয়াছে। মেঝেটি গালিচায় ঢাকা, বসিবার ঘর হইতে খাবার ঘর, রান্নাঘর ও রজকাগারে যাওয়া যায়। রান্নাঘরে গ্যাসজ্বালা উনন আছে। তিন প্রকার জিনিষ একসঙ্গে রান্না করা যায়। রুটি, পিটে প্রভৃতি সেঁকিবার জন্য তুন্দুরও আছে। উননের কাছেই একটা সিন্দুক আছে, তাহাতে তরি তরকারি, মসলা পাতি, কাঁটা চামচে ছুরি প্রভৃতির নানা খোপ আছে। সেই সিন্দুকের হড়্‌পি টানা দেরাজ আছে, তাহাতে ময়দা ঠাসা, প্রভৃতি কাজ হয়। এই এক সিন্দুকে রন্ধনের সকল উপকরণই থাকে, রাঁধুনিকে এঘর সেঘর ছুটাছুটি করিতে হয় না।

রজকাগারে একটা কাপড় ধোয়া কল আছে, তাহা জলের তোড়ে চলে। এই কলের সঙ্গে একটা কাপড় নিংড়োবার কল আছে, তাহাতে পাতলা মোটা সকল কাপড়ই বেশ নিংড়ানো হয়। এই সব কল হাত দিয়াও চালানো যায়। সেই ঘরেই ধোবার গামলা, নীলের গামলা আছে। তাহাতে এক নল দিয়া জল আনা যায় ও আর এক নল দিয়া তাহা হইতে জল বাহির করিয়া দেওয়া যায়। জলবহন প্রভৃতির হাঙ্গাম নাই। এই সব কলে কাপড় কাচা এত সহজ যে সহরের সকল পরিবারই প্রায় আপনারাই কাপড় ধুইয়া লয়। এই ঘরে ইস্ত্রির টেবিল থাকে। এক ঘরেই সকল আয়োজন সম্পূর্ণ থাকাতে কাহারো কাজ করিতে ছুটাছুটি করিয়া ক্লান্ত হইতে হয় না। ধোপাঘরের তাকটি সর্ব্বাপেক্ষা ভালো। তাহাতে কাপড়ের দাগ উঠাইবার মসলা থাকে। পটাশ, লবণ ও তরল এমোনিয়া দিয়া একরূপ দাগ উঠাইবার মসলা তৈয়ারি হয়। এক বোতল এমোনিয়া সাদা কাপড়ের দাগ উঠাইবার জন্য থাকে। পশুর পিত্ত দিয়া রঙিন কাপড়ের রং বাঁচানো হয়। কাপড়ের মহিষা বা চিতি উঠাইবার জন্য চূণের ক্লোরাইড ব্যবহৃত হয়, ফল বা চা প্রভৃতির দাগ অক্সালিক এসিড দিয়া তোলা হয়, নেবুর নুন লোহার দাগ দূর করে।

শয়ন কক্ষ, সেহেতখানা, সেলাই ঘর দ্বিতলে। প্রত্যেক শয়নকক্ষে হাত ধুইবার গামলা ও জলের ব্যবস্থা আছে। খাট সব লোহার—তাহাতে স্প্রিং ও পালকের গদি আছে। স্নানাগারে গরম ও ঠাণ্ডা জলের কল আছে। জলের পাইপের নীচে গ্যাস জ্বালিয়া যে কোনো সময়ে তৎক্ষণাৎ গরম জলে স্নান হইতে পারে।

সেলাইকল পায়ে বা বিদ্যুতে চলে। সে ঘরে একটা বড় টেবিলও আছে—তাহার উপর পোষাকের কাট ছাঁট করা হয়।

সন্ত নিহাল সিংহ।

[এই প্রবন্ধের লেখক একজন আমেরিকাপ্রবাসী পঞ্জাবী। মূল প্রবন্ধ ইংরাজীতে লিখিত। আমরা তাহার অনুবাদ করিয়া দিলাম।

আমাদের দেশেও জমী, জল ও বাতাস আছে। ভগবান্ আমাদিগকেও সকল শক্তি দিয়া মানুষ করিয়া পাঠাইয়াছেন। অথচ আমাদের এত দুর্দ্দশা কেন, তাহা পাঠক পাঠিকাগণ গভীর ভাবে চিন্তা করিলে আমাদের শ্রম সার্থক হইবে।]

ফল রক্ষণ।

পৃথিবীর নানা দেশে যত প্রকারের ফল জন্মে, অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় এক ভারতবর্ষেই প্রায় তার সকল প্রকারের নমুনা পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকার কালিফর্ণিয়া নামক প্রদেশও ফলের জন্য বিখ্যাত হইয়াছে। এদেশবাসীরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে এক ফলেরই নানা রকম শ্রেণী সৃষ্টি করিয়া উৎপাদন করাইতেছে। কিন্তু জগতের মধ্যে যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল বলিয়া সমস্ত সভ্য জাতির নিকট পরিচিত সেই 'আম' এখানে এখনও জন্মাইতে পারিতেছে না। অনেক চেষ্টা হইতেছে সত্য, কিন্তু এখনও জল বায়ুকে আমের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারে নাই। ইহারা কৃষি সম্বন্ধে দিন দিন যেরূপ উন্নতি করিতেছে

কে জানে যে আর দশ বৎসর পরে আমও এখানে জন্মাইতে পারিবে না! এদেশের যাহারা আম দেখিয়াছে তাহাদের ত কথাই নাই; যাহারা দেখে নাই—শতকরা নিরানব্বই জনই না দেখার দলে—তাহারাও আমের গুণে—অনেকেই শুনিয়া—এত মুগ্ধ যে আমের কথা যখনই তাহাদের সঙ্গে হইয়াছে তখনই লক্ষ্য করিয়াছি যে যদি এখানে আম দেখাইবার একটি প্রদর্শনী খোলা হয় তবে অনেকেই এক ডলার (৩৲ টাকা) দিয়া টিকিট কিনিয়া যাইতে রাজী আছে। যে ফলের উপর ইহাদের এত আগ্রহ তাহা যে ইহারা না জন্মাইয়া ছাড়িবে তাহা মনে হয় না।

আম বলিতে গেলে ভারতেরই একমাত্র একচেটিয়া সম্পত্তি, যদিও অন্যান্য কোন কোন স্থানে জন্মে বটে কিন্তু তাহা অতি অল্প পরিমাণে এবং গুণে ভারতীয় আমের তুলনায় অত্যন্ত নিকৃষ্ট। আমাদের দেশ হইতে যদি আম কোন রূপে ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠান যায় তবে যে প্রচুর লাভবান হওয়া যায় তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। একথা নিশ্চয় যে আমকে স্বাভাবিক অবস্থায় কখনও ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠান সহজ নয়, অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া যদিও কোন রূপে পাঠান যাইতে পারে বটে কিন্তু ব্যবসার পক্ষে সে কথা উত্থাপন করাই বিড়ম্বনা মাত্র। একমাত্র এবং উৎকৃষ্টতম উপায় এই যে আমকে টিনে ভরিয়া প্রিজার্ভ অর্থাৎ রক্ষা করিয়া পাঠান যাইতে পারে এবং তাহাতে ব্যয়ও কম এবং প্রচুর লাভবান হওয়া যায়। আমাদের দেশের লোক প্রিজার্ভ অর্থাৎ রক্ষিত ফলের ধার ধারে না বটে—অবশ্যই যদি কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে টাট্‌কা আমের মত স্বাদগন্ধযুক্ত আম পায় তবে ধার ধারে কিনা দেখা যায়—কিন্তু এদেশের লোকের যেন টাট্‌কা ছেড়ে প্রিজার্ভ ফলের দিকেই বেশী ঝোঁক। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এখানে একটিও ক্যানারী অর্থাৎ ফল রক্ষার কারখানা (cannary) ছিলনা বলিলেই চলে কিন্তু আজ সুধু এই ইউনাইটেড ষ্টেটের মধ্যেই বিশ হাজার নানা প্রকারের ক্যানারী আছে এবং চল্লিশ লক্ষের উপর লোক এই সব ক্যানারীতে কাজ করিয়া নিজেদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। ফলের ক্যানারীতে ইহারা কর্ম্মচারীদিগকে প্রত্যহ গড়ে দুই ডলার অর্থাৎ ৬৲ টাকা করিয়া বেতন দিয়াও ইহারা গড়ে শতকরা আশি টাকা লাভ করিতেছে। আর আমাদের দেশে দৈনিক মজুরী ।৴০ আনা হইতে ৸০ আনাই যথেষ্ট। আর ক্যানারী যদি ফলের বাগানের নিকট খোলা যায়—যেমন মুরসিদাবাদ, পূর্ণিয়া, মালদহ ইত্যাদি স্থানে—তবে ফলের মূল্যও খুব সস্তা হইবে। আমি যে ক্যানারীতে কাজ করিতাম (এখানে ফলের ক্যানারী ছয় মাস খোলা থাকে। অন্য ছয় মাস এখানে বিশেষ কোন ফল জন্মে না। তাই ও ছয় মাস ইহারা ক্যানিংএর কাজ বন্ধ রাখে এবং ফলের টিন ইত্যাদি নানা স্থানে পাঠাইতে ব্যস্ত থাকে।), তাহার সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের সহিত আম সম্বন্ধে আমার প্রায়ই কথা হইত। একদিন তিনি বলিলেন যে "আমি আশ্চর্য্য হইতেছি যে তোমাদের দেশে যখন এত আম জন্মে এবং মজুর এত সস্তা তখন এতদিন তোমরা কেন আম প্রিজার্ভ করিবার ক্যানারী খোল নাই! আমার ত মনে হয় যে আজ ভারতবর্ষে গিয়া যদি শুধু আম প্রিজার্ভ করিবার জন্যই অন্যূন দুই শত ক্যানারীও খোল তবে ইউরোপ ত দূরের কথা এক আমেরিকার বাজারেই যোগান দিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারিবে না, এদেশে আমের এত কাট্‌তি হইবে। অবশ্যই যদি আমাদের দেশে আম জন্মিত তবে তোমরা আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিতে কিনা সন্দেহ। কেন না আমেরিকায় কোন জিনিষ পাঠাইতে হইলেই তোমাদিগকে ডিউটি (মাশুল) দিতে হইবে। আমাদের সে ব্যয় নাই। তা যখন নয়, আম যখন ভারতবর্ষ ছাড়া ক্যান করিবার মত প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীর অন্য কোথাও জন্মেনা, তখন তোমাদের আর প্রতিযোগী কে হইবে? ও ব্যবসায় তোমাদেরই একচেটিয়া, ইহাতে যে তোমরা প্রচুর লাভ করিতে পারিবে তাহাতে একটুকুও সন্দেহ করিবার কিছু নাই।"

ক্যানিংএর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে ১২০০০ হাজার ফ্রাঙ্ক পুরস্কার ঘোষণা করেন যে, 'যে নৌ-সৈন্যদের (marines) খাদ্য প্রিজার্ভ (Preserve) অর্থাৎ রক্ষা করিবার উৎকৃষ্ট উপায় বাহির করিতে পারিবে তাহাকে উক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে।' ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এপার্ট
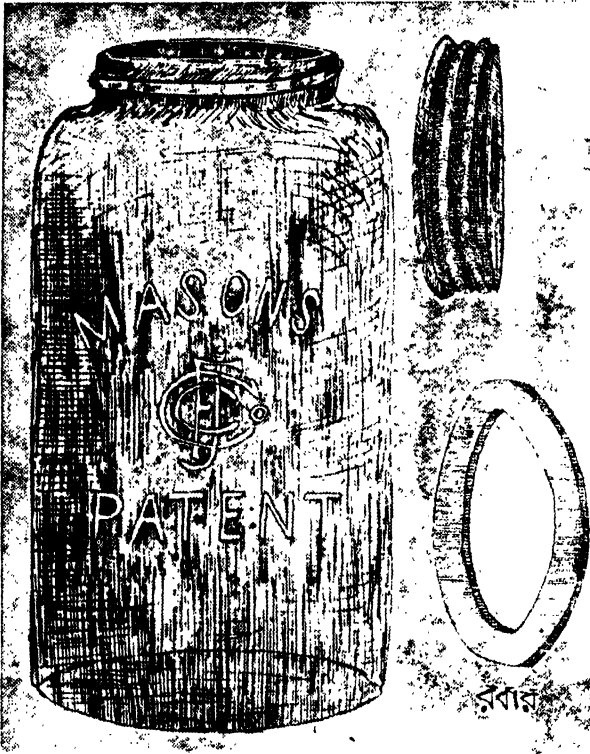
গলায় রবার দেওয়া ফল রক্ষার বোতল।

(Appert) নামক একব্যক্তি (চাটনিওয়ালা) প্রথম উপায় আবিষ্কার করে। সে লক্ষ্য করিয়াছিল যে 'জগতে যত জিনিষ পচিয়া নষ্ট হয় তাহার একমাত্র কারণ এই যে জিনিষের মধ্যে ফারমেণ্ট (Ferment) নামক এক প্রকার ক্ষুদ্রতম কীটাণু, যাহা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত দেখা যায় না—প্রবেশ করিয়া জিনিষকে পচাইয়া ফেলে; যদি কোন উপায়ে উক্ত কীটাণুদিগকে উত্তাপ দিয়া বিনষ্ট করতঃ জিনিষগুলিকে বায়ুশূন্য স্থানে রাখা যায় তবে আর জিনিষ পচিয়া নষ্ট হইতে পারে না।' সে তাহার এই নির্দ্ধারণ কার্য্যত প্রমাণ করাইয়া দেখাইয়া ফরাসী গভর্ণমেণ্ট হইতে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে উক্ত পুরস্কার পায়, এবং উক্ত সালেই ফরাসী গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে ও অনুমোদনে এক পুস্তক প্রকাশ করে। আজকাল ক্যানিংএর প্রণালী এত উন্নতি লাভ করিয়াছে যে এই পুস্তক আজকাল আর ইতিহাসের সাক্ষ্য দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ কাজে আসে না। এপার্ট (Appert) কাচের বোতলে ভরিয়া প্রিজার্ভ করাই একমাত্র উপায় নির্দ্ধারণ করে কিন্তু ঐ সালেই (১৮১০ খৃষ্টাব্দে) ইংলণ্ডে পিটার ডুরাণ্ট (Peter Durant) নামক অন্য এক ব্যক্তি প্রোচলিন্ এবং টিনের ডিবায় ভরিয়া প্রিজার্ভিংএর আবিষ্কার করে। তাহাতে ব্যবসায়ের পক্ষে অনেক সুবিধা হইয়াছে। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে টমাস কেন্‌সেট্ (Thomas Kensett) নামক এক ব্যক্তি ইংলণ্ড হইতে উক্ত প্রিজার্ভিং কার্য্য শিক্ষা করিয়া নিউইয়র্কে বাস করিবার জন্য চলিয়া আসে এবং নিউইয়র্কেই উক্ত ব্যবসায় নিবু নিবু ভাবে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চালায়। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ক্যানিং ব্যবসায়ের ক্রমে বিস্তৃতি ঘটে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কেবল মাছ মাংসই ক্যান্ করা হইত। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্রথম ফল ও শাক সব্জী তরকারী Vegetable) ক্যান্ করা আরম্ভ হয়। আজ ক্যানিং ব্যবসায় আমেরিকার মধ্যে এক প্রধানতম ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আজ সুধু ইউনাইটেড্ ষ্টেটের মধ্যেই নানা প্রকারের ২০০০০ বিশ হাজার ক্যানারী এবং চল্লিশ লক্ষ লোক সুধু ক্যানারীতে কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

ক্যানিংএর মূলতত্ত্ব (Principle)

"জগতে যত জিনিষই দেখা যায় পচিয়া নষ্ট হয় তাহার একমাত্র কারণ যে তাহাতে ফারমেণ্ট (Ferment) নামক এক প্রকার কীটাণু, যাহা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া দেখা যায় না, প্রবেশ করিয়া উক্ত জিনিষকে পচাইয়া ফেলে। যদি কোন প্রকারে উত্তাপ দিয়া উক্ত কীটাণু-গুলিকে বিনষ্ট করতঃ জিনিষগুলিকে কোন বায়ুশূন্যস্থানে রাখা যায় তবে তাহা আর পচিয়া নষ্ট হইতে পারেনা।" দুগ্ধ, মাছ, মাংস, ফল তরকারি (vegetable) ইত্যাদি সমস্ত ক্যানিংএর মূলতত্ত্বই এই।

টিনের ডিবায় বা কাচের বোতলে ভরিয়া ফল রক্ষণ (Fruit Canning)

ফল প্রিজার্ভিং বা ফল রক্ষণ প্রধানতঃ তিন প্রকারে করা হয়।১। ফলকে শুষ্ক করিয়া (Drying)।২। ফলকে

বোতল বা টিনে ভরিয়া (Canning) ।৩। জ্যাম ও জেলীর (Jam and Jelley) আকারে বোতলে বা টিনে ভরিয়া। আমার এ প্রবন্ধে আমি শুধু ক্যানিংএর (ফলকে বোতলে বা টিনে ভরিয়া প্রিজার্ভিংএর) আলোচনা করিব। আশা আছে আমার পরবর্ত্তী প্রবন্ধে যথাক্রমে শুষ্ক করিয়া ফল রক্ষণ (Drying) এবং জ্যাম জেলী প্রস্তুত প্রণালীর আলোচনা করিব। অন্য দুই প্রণালী হইতে ক্যানিংএর বিশেষত্ব এই যে ইহাতে বহুকাল পরেও ফলের স্বাদ, গন্ধ, রং এবং আকৃতি (taste, flavor, color, and shape) প্রায় টাট্কা ফলের মতই থাকে। যে সমস্ত ফল সিদ্ধ করিলে তাহার স্বাদ, গন্ধ বা রংএর বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না কেবল সেই সমস্ত ফলই ক্যানিংএর উপযোগী। অবশ্যই অতিরিক্ত সিদ্ধ করিলে সমস্ত ফলেরই স্বাদ গন্ধ, ও রং আকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে, তজ্জন্যই যাহাতে অতিরিক্ত সিদ্ধ না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার।

যাঁহারা ব্যবসার জন্য ফল প্রিজার্ভ করিতে চান তাহাদের পক্ষে টিনের ডিবাই উপযোগী। কেননা বোতলের দাম বেশি এবং তাহা নানাস্থানে পাঠাইতে অনেক ভাঙ্গিয়া যাইবারই সম্ভাবনা, কিন্তু যাহারা ঘরে শুধু নিজেদের জন্য ফল প্রিজার্ভ করিতে চান তাঁহাদের পক্ষে বোতলই সুবিধা কেননা বাড়ীতে টিনের মুখে ঝালা দেওয়া ইত্যাদি কাজ অত্যন্ত অসুবিধা জনক। বোতলের দাম বেশি বটে কিন্তু একবারে ২০।২৫ টা বোতল কিনিয়া রাখিলে প্রতি বৎসরই রবার বদলাইয়া তাহাতেই ফল প্রিজার্ভ করা যায়। অবশ্যই যাহাতে বোতল না ভাঙ্গে তজ্জন্য সতর্ক হইতে হইবে।

টিনের ডিবায় ভরিয়া ব্যবসার জন্য ফল রক্ষণ (Canning)

প্রথমত ফলের খোসা ছাড়াইতে হইবে। পরে তাহাকে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে বেশ করিয়া ধুইতে হইবে। ফল যদি বড় হয় তবে তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করাই সুবিধা এবং ভিতরস্থ আঠি (Pit) ফেলে দিলেই ভাল হয়। কেননা সিদ্ধ করিলে আঠি হইতে কোন তিক্ত রস বাহির হইয়া ফলের স্বাদ নষ্ট করিয়া দিতে পারে। আমার যতদূর মনে হয় দেশে থাকিতে যখন আম সিদ্ধ খেয়েছি তখন যেন আঠির নিকটের অংশটা কিছু তিক্তই মনে হইত। অবশ্য আমার তাহা ভাল করিয়া মনে হইতেছেনা। যাহা হউক তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই চলিবে। সাধারণ কথায়, আঠিটা ফেলে দিলেই ভাল হয়, বিশেষতঃ অত বড় ফল টিনে ভরাও অসুবিধা। পরে তাহাকে কাঁচা, পাকা ইত্যাদি টিনের ডিবার ভিতর ভরিতে হইবে এবং তাহাতে চিনির সিরা (Syrup) প্রায় টিনের মুখ পর্য্যন্ত ভরিয়া ভরিতে হইবে। চিনির সিরার (Syrupএর) পরিবর্ত্তে যদি সুধু জলও ভরা যায় তাহাতে ফল প্রিজার্ভ করার কোন হানি করিবে না কিন্তু তাহাতে ফলের স্বাদ ভাল হইবে না। তাই চিনির সিরা ব্যবহার করা হয়। কতটা জলের সহিত কত পরিমাণ চিনি দিয়া সিরা (Syrup) প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা নিজ নিজ স্বাদের উপর নির্ভর করে। যাহাতে ফলের স্বাদ ভাল হয় সেই পরিমাণ চিনি দেওয়াই উচিত। অতিরিক্ত চিনি দিলে অতিরিক্ত মিষ্ট হইয়া ফলের স্বাভাবিক স্বাদকে নষ্ট করিবে। দুই তিনবার পরীক্ষা করিয়া চিনির পরিমাণ ঠিক করিয়া লইলেই হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি চিনির সিরা Syrup) ফল রক্ষণের কিছুই সহায়তা বা হানি করেনা, শুধু স্বাদের জন্য উহা দিতে হয়। এ পর্য্যন্ত টিনের মুখ খোলাই আছে। ফল ভরা ও চিনির সিরা দেওয়া হইয়া গেলে পর টিনের মুখে একটি ঢাকনি দিয়া তাহাকে ঝালা দিয়া বন্ধ করিতে হইবে। উক্ত ঢাকনির মধ্য স্থানে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র—যেমন একটি মোটা সূচি প্রবেশ করিতে পারে, এই পরিমাণ রাখিতে হইবে। পরে টিনগুলিকে ফুটন্ত জলের ট্যাঙ্কে উক্ত ক্ষুদ্র ছিদ্র উপরের দিকে রাখিয়া ডুবাইতে হইবে। টিনের উপরস্থ ছিদ্র অত্যন্ত ক্ষুদ্র বিধায় বাহিরের জল ভিতরে বা ভিতরের সিরা বাহিরে আসিতে পারিবেনা। এরূপ ভাবে ৪।৫ মিনিট কি বড় টিন হইলে ৭।৮ মিনিট ডুবাইয়া রাখিলেই টিনের ভিতরস্থ বায়ু উত্তাপ পাইয়া উক্ত ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। পরে টিন গুলিকে ফুটন্ত জল হইতে উঠাইয়া তখন তখনই ঝালা দিয়া উক্ত ক্ষুদ্র ছিদ্র বন্ধ করিতে হইবে। সাধারণ লোক মনে করিতে পারেন যে যখন ফুটন্ত জল হইতে টিন গুলিকে উঠান হইবে তখনইত ঐ ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া বায়ু পুনরায় ভিতরে প্রবেশ করিতে

সিদ্ধ করিবার আগে বোতলে ফল রাখা।

সমস্যা। কেন না এক এক প্রকার ফলে এক এক প্রকার কীটাণু, সে সমস্তই ব্যাক্‌টেরিওলজীর (Bacteriology) কথা, সে সমস্ত আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে মোটের উপর এই বলা যায় যে ২৫ হইতে ৩০ মিনিট সময় ফুটন্ত জলের (১০০° ডিগ্রী (100°c)) উত্তাপে ফল সিদ্ধ করিলে প্রায় সমস্ত ফলেরই কীটাণু মারা যায়। এই সিদ্ধ করা অনেকটা আবার ফলের অবস্থার উপর নির্ভর করে, যেমন কাঁচা ফল পাকা ফল অপেক্ষা বেশি সময় এবং অতি পাকা ফল আরও কম সময় সিদ্ধ করিতে হয় নতুবা ফলের আকৃতি, রং, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, ফলকে যে শ্রেণীবিভাগ করিয়া টিনে ভরিতে হয় তাহার প্রধান কারণই এই যে এক এক রকম ফলের এক এক রকম সময়ের দরকার হইবে। কাঁচা পাকা ফল যদি একত্র এক টিনের ভিতর ভরা যায় তবে কাঁচাটা দস্তর মত:সিদ্ধ হইতে হইতে পাকাটা হয় ত একেবারে গলিয়াই যাইবে। তাই ফলের শ্রেণীবিভাগের বিশেষ দরকার। ফুটন্ত জলে ২৫ হইতে ৩০ মিনিট সিদ্ধ করিয়া যদি দেখা যায় যে ফলের আকৃতি, রং, স্বাদ ও গন্ধের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তবে ইহা অপেক্ষা কম সময় সিদ্ধ করিতে হইবে। আর যদি দেখা যায় যে ২৫ কি ৩০ মিনিট উত্তাপে ফলের রং, আকার স্বাদ গন্ধের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে (অনেক ফল সিদ্ধ করিলে তাহার স্বাদ গন্ধ ও রং ভাল হয়) তবে না হয় উহা অপেক্ষা আরও বেশি সময় সিদ্ধ করা যায়। এ সমস্তই পরীক্ষার উপর নির্ভর করে। এদেশে যদি আম জন্মিত তবে না হয় পরীক্ষা করিয়া আমিই সময় বলিয়া দিতে পারিতাম যে 'আম কতক্ষণ কত উত্তাপে সিদ্ধ করিতে হইবে'। কিন্তু এদেশে তাহার আর আশা নাই, তাই আমাদের দেশস্থ যদি কেহ পরীক্ষা করিয়া

পারিবে! কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবেন যে টিনগুলি তখনও অত্যন্ত গরম থাকিবে এবং টিনের মধ্যস্থ শূন্য স্থান সমস্তই জলীয় বাষ্পে (vapor) পূর্ণ থাকিবে। তাই বায়ু আর ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিবেনা। অবশ্য যদি টিন গরম থাকিতে থাকিতেই উক্ত ক্ষুদ্র ছিদ্র বন্ধ করা না হয় তবেত বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিবেই। তজ্জন্যই যাহাতে টিন গরম থাকিতে থাকিতে উক্ত ক্ষুদ্র ছিদ্র বন্ধ করা হয় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। উক্ত ক্ষুদ্র ছিদ্র বন্ধ করা হইয়া গেলে পর পুনরায় টিনগুলিকে ফুটন্ত জলের ট্যাঙ্কে ডুবাইয়া ভিতরস্থ ফলকে সিদ্ধ করিতে হইবে। এই যে পুনরায় ফুটন্ত জলের ট্যাঙ্কে ডুবান ইহা কেবল ফলের সঙ্গে যে কীটাণু, যাহার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, সেগুলিকে মারিয়া ফেলিবার জন্য! কত উত্তাপে (Temperature) কত সময় সিদ্ধ করিলে ফলের কীটাণু মারা যায় তাহাই

দেখেন তবেই বুঝিতে পারিবেন। এখানে পীচ্ নামক ফল সাধারণতঃ ২৫ হইতে ৩০ মিনিট সিদ্ধ করা হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সময়ের পরিমাণ অনেকটা ফলের অবস্থার উপর নির্ভর করে ; যেমন কাঁচা ফলের একটু বেশী সময়ের দরকার, অতি পাকা হইলে আরও কম সময়ের দরকার। কারখানার লোকেরা ব্যবসার জন্য ফল প্রিজার্ভ করে তাই ইহাদিগকে সব রকমই করিতে হয় অবশ্যই বিক্রীর সময় ইহারা ভিন্ন ভিন্ন রকমের ফল ভিন্ন ভিন্ন দরে বিক্রয় করে। তাই ক্রেতাকে, ভিতরের ফল না দেখিতে পাইলেও, ঠকিতে হয় না। এইরূপ ফুটন্ত জলে নির্দ্দিষ্ট সময় সিদ্ধ করা হইয়া গেলে পর ফলের টিন-গুলি ফুটন্ত জলের ট্যাঙ্ক হইতে উঠাইয়াই তৎক্ষণাৎ ঠাণ্ডা জলের ট্যাঙ্কে ডুবাইতে হইবে, কেন না টিনগুলিকে তৎক্ষণাৎ ঠাণ্ডা করিয়া না ফেলিলে উত্তাপে যে সিদ্ধ কার্য্য টিনের ভিতরে চলিতেছে তাহা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চলিবে এবং অতিরিক্ত সিদ্ধ হইয়া ফলের স্বাদ গন্ধ নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এরূপ ভাবে ৫।৭ মিনিট ঠাণ্ডা জলের ট্যাঙ্কে টিনগুলি ডুবাইয়া রাখিলেই তাহা ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। পরে উহাদিগকে ট্যাঙ্ক হইতে উঠাইয়া, যে দিকের মুখ ঝালা দিয়া লাগান হইয়াছে সেই দিকটা নীচে দিয়া দাঁড় করাইয়া সাজাইয়া রাখিতে হইবে। পরে যখন টিনের গায়ে লেবেল লাগান হইবে তখন বিশেষ দৃষ্টি করিয়া দেখিতে হইবে যে কোন স্থান দিয়া ভিতরস্থ সিরা (Syrup) এক আধটুও চুয়াইয়া পড়িয়াছে কিনা। যে টিনে একটু সন্দেহ হইবে তৎক্ষণাৎ তাহা পুনরায় প্রিজার্ভ করিবার জন্য পৃথক করিয়া দিতে হইবে। এই সমস্ত বাতিল টিন-গুলির মুখ কাটিয়া ফলগুলি বাহির করতঃ পুনরায় পূর্ব্বোক্ত নিয়মে প্রিজার্ভ করিতে হইবে, এ সমস্ত টিনের ফলের অতিরিক্ত সিদ্ধ না হইয়া আর উপায় নাই। ঐ সমস্ত ফল পাই (Pie) নামক পিষ্টকের জন্য ব্যবহৃত হয়। লেবেল লাগান হইয়া গেলে পর উহাদিগকে কাঠের বাক্সে—প্রতি বাক্সে দুই ডজন অর্থাৎ ২৪টা করিয়া ভরিয়া নানা স্থানে চালান দিবার জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে।

নিম্নলিখিতরূপে ক্যানারীর কার্য্যকে সংক্ষেপে ভাগ করা যাইতে পারে।

১। ফলের খোসা ছাড়ান ও আঁটি ফেলান (Peeling)
২। শ্রেণী বিভাগ করা (Sorting)
৩। টিনের ভিতর ভরা (Canning or filling)
৪। সিরা দেওয়া (Syruping)
৬। ঢাক্‌নি লাগান (Capping)
৫। বাতাস বাহির করিবার জন্য ফুটন্ত জলের ট্যাঙ্কে ডুবান (Airtighting)

ফল রক্ষার "লাইট্‌নিং" বোতল। ১নং।

৭। ক্ষুদ্র ছিদ্র বন্ধ করা (Soldering)
৮। সিদ্ধ করা (Cooking)
৯। ঠাণ্ডা জলের ট্যাঙ্কে ডুবান (Cooling)
১০। ঝালা-দেওয়া মুখ নীচের দিকে দিয়ে দাঁড় করাইয়া রাখা।
১১। লেবেল লাগান। (Labeling)
১২। কাঠের বাক্সে বন্ধ করা। (Casing)

আমাদের দেশে যাঁহারা ক্যানারী খুলিতে চান তাঁহাদের ক্যানারীর সঙ্গে একটি টিনের ডিবা প্রস্তুত করিবার

কারখানা (Can factory) ও খোলা দরকার, কেন না আমাদের দেশে টিনের ডিবা বাজারে বেশী কিনিতে পাওয়া যায় না। যাহা যায় তাহারও অত্যন্ত দাম বেশি। তাই ক্যানারীর সঙ্গে সঙ্গে একটি টিনের ডিবা প্রস্তুত করিবার কারখানার নেহাৎ দরকার। আমি পরবর্ত্তী প্রবন্ধে টিনের ডিবা প্রস্তুত করিবার কারখানা ও ক্যানারীর ৩।৪ রকমের (বড়, ছোট, মাঝারি) ৩।৪টি মোটামোটি এষ্টিমেট (Estimate) বা আনুমানিক ব্যয়ের ফর্দ্দ পাঠাইব।

ক্যানিংএর উপযোগী ফল।

অতি কাঁচা, অতি পাকা, দাগিলাগা, কি পচা ফল ক্যানিংএর সম্পূর্ণ অনুপযোগী। টিন বা বোতলের মধ্যে এমন কোন গুপ্ত গুণ নাই যাহা মন্দ জিনিষকে ভাল করিতে পারে। ভাল জিনিষকে ভাল রাখাই ক্যানিংএর কাজ। ফলে যখন রং ধরিয়াছে এমন অবস্থায় গাছ হইতে পাড়িয়া টাট্‌কা টাট্‌কা সেই দিনই ক্যান্ (Can) করা দরকার। ব্যবসার পক্ষে অনেক সময় ওরূপ হইয়া উঠে না সত্য কিন্তু যাহাতে সেরূপ বন্দোবস্ত করা যায় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। মাঝে যে আমেরিকায় এ ব্যবসায় কিছু মন্দা ধরিয়াছিল তাহার একমাত্র কারণ যে তখন লোকে যা তা ফল যাহা পাইত তাহাই ক্যান্ (Can) করিত। কিন্তু আজকাল ইহারা সে বিষয়ে খুব সতর্ক। যাঁহারা বাড়ীতে নিজেদের জন্য ফল প্রিজার্ভ করিতে চান তাঁহারা অনায়াসেই গাছ হইতে টাট্‌কা ভাল ফল পাড়িয়া প্রিজার্ভ করিতে পারেন। অবশ্য যাঁহারা সহরে থাকেন তাঁদের পক্ষে সব সময় টাট্‌কা ফল পাওয়া মুস্কিল, সম্পূর্ণ টাট্‌কা না হউক যাহাতে ফলের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দোষগুলি না থাকে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার।

বাড়ীতে বোতলে ভরিয়া ফল রক্ষণ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাড়ীতে টিনের ডিবায় ভরিয়া ফল রক্ষণ বড়ই অসুবিধাজনক। কেননা ঝালা দিয়া ঢাক্‌নি লাগান ইত্যাদি কাজ বাড়ীতে বড় হইয়া উঠিবে না। বোতলই বাড়ীর পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক। এই বোতলে ফল রক্ষা দুই প্রকারে হইতে পারে। এক টিনের মতই বোতলে ফল ভরিয়া ফুটন্ত জলের কেট্‌লিতে ডুবাইয়া ফল সিদ্ধ করা, অন্য নিয়ম, ভিন্ন পাত্রে ফল সিদ্ধ করিয়া বোতলে ভরা। ভিন্ন পাত্রে ফল সিদ্ধ করিয়া বোতলে ভরাই অত্যন্ত সুবিধাজনক। আমেরিকার প্রত্যেক বাড়ীতে বাড়ীতে যে ফল রক্ষা করা হয় তাহার অধিকাংশই শেষোক্ত নিয়মে। আমাদের দেশস্থ রান্নাকার্য্যে সুনিপুণ ভগিনীগণ ও জননীগণ যে একার্য্য অবাধে করিতে পারিবেন তাহাতে একটুকুও সন্দেহ নাই। নূতন রান্না শিক্ষা-কারিণীর মত প্রথম প্রথম একটু ভয় বা অসুবিধা হইতে পারে বটে কিন্তু দুই একবার করিয়া অভ্যস্ত হইয়া গেলেই দেখিবেন যে ভাত রান্না করা আর আম প্রিজার্ভ করা উভয়েই সমান বিদ্যা বুদ্ধির দরকার।

প্রথমতঃ ভাল ভাল ফল বেছে নিয়ে তাহার খোসা ছাড়াইতে হইবে। পরে তাহার আঁঠি ফেলে দিতে হইবে, (যদি আম হয় তবে দুই দিকের পিঠ প্রায় আঁটি ঘেসাইয়া কাটিয়া লইয়া বাকি অংশটা তখনই ছেলে পিলে-দিগকে দিয়ে দিলেই ভাল হয়) পরে তাহাকে বেশ পরিষ্কার জলে ধুইতে হইবে। ধোয়া হ'য়ে গেলে সিদ্ধ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বেশ পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলেই ফল গুলিকে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে কেননা তাহাতে ফলের রং নষ্ট হইবে না। পরে একটি পাত্রে (এনামেলের ষ্ট্যু-প্যান হইলেই ভাল হয়) তিন পেয়ালা জলের সহিত দুই পেয়ালা চিনি এরূপ পরিমাণে—অবশ্যই যাঁহারা একটু বেশি মিষ্টি ভাল বাসেন তাঁহারা চিনির পরিমাণ বাড়াইলেই চলিতে পারিবে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই হইবে,—মিশ্রিত করিয়া উনানে বসাইয়া দিতে হইবে। যখনই জল ফুটিয়া উঠিবে তখনই ফল যাহা ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখা হইয়াছে উহার মধ্যে দিতে হইবে পরে ঢাক্‌নি দিয়া পাত্রের মুখটি ঢেকে দিয়া ১৫ কি ২০ মিনিট পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিতে হইবে, পরে ফল বেশ সিদ্ধ হয়ে গেলে পর পাত্রটি উনানের উপর থাকিতে থাকিতেই উহা হইতে কিছু ফুটন্ত সিরা (Syrup) প্রথমত বোতলে ভরিয়া পরে একটি চাম্‌চা বা হাতা দিয়া ফলগুলি ভরিতে হইবে পরে উত্তপ্ত সিরা—যাহা তখন পাত্রে বাকি আছে, তাহা বোতলের সম্পূর্ণ মুখ পর্য্যন্ত ভরিয়া রবারের সহিত ১নং বোতল হইলে ঢাক্‌নি ও ২নং বোতল হইলে স্ক্রু বেশ করিয়া আটিয়া লাগাইতে হইবে। পরে একটি ভিজা

গামছা (গরম জলে ভিজান) দিয়া বোতলের গলা ইত্যাদি বেশ করিয়া পুঁছিয়া তাহাকে উপুড় করিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিতে হইবে। যদি দেখা যায় যে ভিতর হইতে কিছু সিরা বোতলের মুখ দিয়া বাহিরে আসিতেছে তবে জানিবেন পরিশ্রম বৃথা হইয়াছে কেননা বোতলের মুখে ফাঁক আছে। আর যদি দেখা যায় যে কিছু সিরাই বাহির হইতেছে না তবে অন্তত দুই বৎসর জন্য নিশ্চিন্ত থাকা যাইবে যে ফল কিছুতেই নষ্ট হইবে না। বোতল উপুড় করিয়া রাখিলে যদি দেখা যায় সিরা বাহিরে আসিতেছে তবে তখনই মুখ খুলিয়া ভিতরের সিরা ও ফল গরম থাকিতে থাকিতেই, অন্য কিছু গরম সিরা, যাহা যে পাত্রে ফল সিদ্ধ করা হইয়াছে তাহাতে অবশিষ্ট আছে—বোতলে পুনরায় সম্পূর্ণরূপে ভরিয়া পুনরায় মুখ বেশ শক্ত করিয়া লাগাইতে হইবে। এবং পুনরায় উপুড় করিয়া দাঁড় করিয়া রাখিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে।

যদি উত্তপ্ত সিরা (Syrup) ঠাণ্ডা বোতলে ভরা যায় তবে বোতল ভাঙ্গিয়া যাইবারই পৌনে ষোল আনা সম্ভব। তাই বোতলে সিরা ও ফল ভরিবার পূর্ব্বে বোতলকে বেশ করিয়া গরম করিয়া লইতে হইবে। একটি গামলা বা কড়াইয়ের মধ্যে জল গরম করিয়া তাহাতে বোতলটি ডুবাইয়া রাখিতে হইবে এবং মাঝে মাঝে একটি ছুরি বা চামচা দিয়া বোতলটিকে গড়াইয়া গড়াইয়া এপিট ওপিট করিতে হইবে তাহাতে গরম সমানভাবে বোতলের সকল স্থানে লাগিতে পারিবে। এক স্থানে বেশি গরম ও অন্য স্থানে কম গরম লাগিলে বোতল ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা। বোতলের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঢাকনি ও রবারও গরম করিতে হইবে। এরূপভাবে বোতল গরম করাতে দুই কাজই হইবে; বোতলের মধ্যে যদি কোন পোকা ইত্যাদি (germ) থাকে তাহা মারা যাইবে এবং বোতল ভাঙ্গিবার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে। যখন ফল সিদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাহাকে বোতলে ভরিবার উপযোগী করা হইবে তখনই বোতল গরম জল হইতে উঠাইয়া তাড়াতাড়ি বোতল গরম থাকিতে থাকিতেই পূর্ব্বোক্ত নিয়মে সিরা ও ফল ভরিতে হইবে। পরে রবার ও ঢাকনি গরম জল হইতে উঠাইয়া লাগাইতে হইবে। খোলা জানালার বা দরজার নিকট যেখানে বায়ু চলাচল করিতেছে এরূপ স্থানে বোতলে ফল ভরা কার্য্য না করাই ভাল। কেননা হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া বোতল ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। বোতলকে ভাঙ্গিবার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইলে যাহাতে সিরা ও বোতল প্রায় সমান গরম হয়,

ফল রক্ষার "ইকনমি" বোতল। ৩নং।

তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। একটি গামছা গরম জলে ভিজাইয়া এবং চাপিয়া তাহা হইতে জল ফেলিয়া দিয়া তিন চার ভাঁজ করতঃ একটি কাঠের পিঁড়া বা চৌকির উপর পাতিয়া তাহার উপর বোতলটি বসাইয়া ফল ভরা কার্য্য করিলেই ভাল হয়। ফল ভরা ও মুখ লাগান ইত্যাদি কার্য্য হ'য়ে গেলে পর বোতলটি ঠাণ্ডা না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে এক স্থানে দাঁড় করাইয়া রাখা দরকার। পরে বোতল ঠাণ্ডা হ'লে পর একটি মেটে (Brown) রঙের কাগজ দিয়া বোতলটিকে জড়াইয়া যেখানে আলো যেতে না পারে এমন স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে। টিনে ভরিয়া ফল প্রিজার্ভ করিলে যেখানে সেখানে রাখা যায় কিন্তু বোতলে টিন হইতে সে বিষয়ে

অসুবিধা। আমেরিকার প্রত্যেক বাড়ীতেই মাটির নীচে ঘর (Cellar) আছে, সেখানে তাহারা এ সমস্ত ফলের বোতল রাখে। কেহবা উপরেই সিঁড়ির নীচে একটি ক্ষুদ্র ঘর করিয়া যাহাতে সেখানে আলো প্রবেশ করিতে না পারে এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া সেখানেই এ সমস্ত বোতল রাখে। এই যে বোতলের উপর মেটে (Brown) রঙের কাগজ জড়ান এ কেবল আলো যাহাতে বোতলে না লাগিতে পারে তজ্জন্য। আমাদের দেশে ইচ্ছা করিলেই প্রত্যেক বাড়ীতেই এরূপ একটি ক্ষুদ্র অন্ধকার ঘরের বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া যায়।

এখানে যে যে রকমের বোতল ব্যবহার করা হয় তাহার তিন রকমের তিনটি চিত্র দেওয়া গেল। ইহার মধ্যে ১নং ও ৩নং অর্থাৎ Lightning ও Economy নামক বোতলই বেশি ব্যবহার করা হয়। Economy বোতলে ৩নং) আলগা রবারের দরকার হয় না উহার ঢাকনিতেই একরূপ সিমেণ্ট লাগান আছে তাহাতেই রবারের কাজ করে। আমাদের দেশে এরূপ কোন বোতল পাওয়া যাইবে কি না বলিতে পারি না, বাজারে অনুসন্ধান করিলে যদি না পাওয়া যায় তবে কাহার কতটা বোতলের দরকার তাহা যদি ঢাকার সবজজ শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র দাস মহাশয়ের নিকট লিখিয়া পাঠান তবে আমরা সেই পরিমাণ বোতল এখান হইতে পাঠাইতে চেষ্টা করিতে পারি। আমার নিকট চিঠি লিখিতে খরচ ৵১০ পয়সা। তাই আমার নিকট চিঠি না লিখিয়া ঢাকার সবজজ শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র দাস মহাশয়কে লিখিলেই তিনি আমাদিগকে জানাইতে পারিবেন, তাঁর ছেলে ও আমি এক বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ি। তিনি প্রায়ই এখানে চিঠি লেখেন। তাই তাঁকে লিখিলেই তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে জানাইবেন।

আম সম্বন্ধে অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত অধ্যাপক শেলটন্ (Professer Shelton) ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ব্রিসবেন নগরে (Brisbane) যে এক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহা উক্তসালে আগষ্ট মাসে ১০নং বুলেটিন (Bulletin) এ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"As to the sort of fruit suitable for canning, he (Prof. Shelton) might say that any that did not change in the process of cooking could be canned. Oranges, of course would not do, because they became bitter when boiled. He had had a long experience of canning, and among Australian fruits there were many excellently suited for the process. Mangoes, for instance, were excellent, and he might just say here that they were capable of about as many manipulations in cooking as any fruit he had ever seen. In fact, if he were going to plant an orchard along the coast he should have five or six mangoe-trees to every one of any other sort."

(Bulletin No 10) Report of Agriculture Conferences, August 1891 (Page 57, Brisbane, Queensland.)

আমার সময় খুব কম। তাই অনেক স্থানে হয়ত খুব পরিষ্কার করিয়া লিখিতে পারি নাই। যদি ফল রক্ষা সম্বন্ধে কেহ কিছু জানিতে উৎসুক হ'ন এবং এ প্রবন্ধে তাহা পরিষ্কার বুঝিতে না পারেন তবে অনুগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমাকে লিখিলে আমরা যথাসাধ্য সংবাদ দিতে চেষ্টা করিব।*

অনাথ বন্ধু সরকার।

Stanford University,
California, U. S. A.

নবযুগের উৎসব।†

নিজের অসম্পূর্ণতার মধ্যে সম্পূর্ণ সত্যকে আবিষ্কার করতে সময় লাগে। আমরা যে যথার্থ কি, আমরা যে কি করচি, তার পরিণাম কি, তার তাৎপর্য্য কি সেইটি স্পষ্ট বোঝা সহজ কথা নয়।

বালক নিজেকে ঘরের ছেলে বলেই জানে। তার ঘরের সম্বন্ধকেই সে চরম সম্বন্ধ বলে জ্ঞান করে। সে

* এ প্রবন্ধে ক্যানারীর (cannary) কার্য্য যে বার বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে পরবর্ত্তী প্রবন্ধে তাহার প্রত্যেক বিভাগের চিত্র সহ কার্য্যপ্রণালী আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। ইতি লেখক।

† (শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক মাঘোৎসবে পঠিত।)

জানেনা সে ঘরের চেয়ে অনেক বড়—সে জানেনা, মানব-জীবনে সকলের চেয়ে বড় সম্বন্ধ তার ঘরের বাইরেই।

সে মানুষ সুতরাং সে সমস্ত মানবের। সে যদি ফল হয় তবে তার বাপ মা কেবল বৃন্তমাত্র; সমস্ত মানববৃক্ষের সঙ্গে একেবারে শিকড় থেকে ডাল পর্য্যন্ত তার মজ্জাগত যোগ।

কিন্তু সে যে একান্তভাবে ঘরেরই নয়, সে যে মানুষ, একথা শিশু অনেকদিন পর্য্যন্ত একেবারেই জানেনা। তবু একথা একদিন তাকে জান্‌তেই হবে যে ঘর তাকে ঘরের মধ্যেই সম্পূর্ণ আত্মসাৎ কর্‌বার জন্যে পালন করচে না—সে মানবসমাজের জন্যেই বেড়ে উঠ্‌চে।

আমরা আজ পঞ্চাশবৎসরের উর্দ্ধকাল এই ১১ই মাঘের উৎসব করে আস্‌চি। আমরা কি কর্‌চি, এ উৎসব কিসের উৎসব, সে কথা আমাদের বোঝবার সময় হয়েছে; আর বিলম্ব কর্‌লে চল্‌বে না।

আমরা মনে করেছিলুম আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্ম-সমাজের উৎসব। ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের সম্বৎসরের ক্লান্তি ও অবসাদকে উৎসবের আনন্দে বিসর্জ্জন দেবেন, তাঁদের ক্ষয়গ্রস্ত জীবনের ক্ষতিপূরণ করবেন, প্রতিদিনের সঞ্চিত মলিনতা ধৌত করে নেবেন; মহোৎসব-ক্ষেত্রে চিরনবীনতার যে অমৃত উৎস আছে তারি জল পান করবেন এবং তাতেই স্নান করে নবজীবনের সদ্যোজাত শিশুর মত প্রফুল্ল হয়ে উঠবেন।

এই লাভ এই আনন্দ ব্রাহ্মসমাজ উৎসবের থেকে গ্রহণ যদি করতে পারেন তবে ব্রাহ্মসম্প্রদায় ধন্য হবেন কিন্তু এই টুকুতেই উৎসবের শেষ পরিচয় আমরা লাভ করতে পারিনে। আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের চেয়ে অনেক বড়; এমন কি, এ'কে যদি ভারতবর্ষের উৎসব বলি তাহলেও এ'কে ছোট করা হবে।

আমি বলচি আমাদের এই উৎসব মানব-সমাজের উৎসব। একথা যদি সম্পূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে আজ না বলতে পারি তাহলে চিত্তের সঙ্কোচ দূর হবে না; তাহলে এই উৎবের ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার আমাদের কাছে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হবেনা; আমরা ঠিক জেনে যাবনা কিসের যজ্ঞে আমরা আহূত হয়েছি।

আমাদের উৎসবকে ব্রহ্মোৎসব বলব কিন্তু ব্রাহ্মোৎসব বলবনা এই সঙ্কল্প মনে নিয়ে আমি এসেছি; যিনি সত্যম্ তাঁর আলোকে এই উৎসবকে সমস্ত পৃথিবীতে আজ প্রসারিত করে দেখ্‌ব; আমাদের এই প্রাঙ্গণ আজ পৃথিবীর মহাপ্রাঙ্গণ; এর ক্ষুদ্রতা নেই।

একদিন ভারতবর্ষ তাঁর তপোবনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে দিব্যধামানি তস্থুঃ—
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"

হে অমৃতের পুত্রগণ যারা দিব্যধামে আছ সকলে শোন—আমি জ্যোতির্ম্ময় মহান পুরুষকে জেনেছি।

প্রদীপ আপনার আলোককে কেবল আপনার মধ্যে গোপন করে রাখ্‌তে পারেনা। মহান্তম্ পুরুষং মহান পুরুষকে মহৎ সত্যকে যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা আর ত দরজা বন্ধ করে থাকৃতে পারেন না; এক মুহূর্ত্তেই তাঁরা একেবারে বিশ্ব-লোকের মাঝখানে এসে দাঁড়ান; নিত্যকাল তাঁদের কণ্ঠকে আশ্রয় করে আপন মহাবাণী ঘোষণা করেন। দিব্যধামকে তাঁরা তাঁদের চারিদিকেই প্রসারিত দেখেন; আর, যে মানুষের মুখেই দৃষ্টিপাত করেন, সে মূর্খই হোক্ আর পণ্ডিতই হোক্ সে রাজচক্রবর্ত্তী হোক্ আর দীন দরিদ্রই হোক্, অমৃতের পুত্র বলে তার পরিচয় প্রাপ্ত হন।

সেই যেদিন ভারতবর্ষের তপোবনে অনন্তের বার্ত্তা এসে পৌঁচেছিল, সে দিন ভারতবর্ষ আপনাকে দিব্যধাম বলে জান্‌তেন, সেদিন তিনি অমৃতের পুত্রদের সভায় অমৃতমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন; সেদিন তিনি বলেছিলেন—

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি,
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।"

যিনি সর্ব্বভূতকেই পরমাত্মার মধ্যে এবং পরমাত্মাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি কাউকেই আর ঘৃণা করেন না।

ভারতবর্ষ বলেছিলেন—"তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি"—যিনি সর্ব্বব্যাপী তাঁকে সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত ধীরেরা সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।

সেদিন ভারতবর্ষ নিখিল লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে-ছিলেন; জলস্থল আকাশকে পরিপূর্ণ দেখেছিলেন; উর্দ্ধপূর্ণমধঃপূর্ণং দেখেছিলেন—সেদিন সমস্ত অন্ধকার তাঁর

কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে গিয়েছিল, তিনি বলেছিলেন "বেদাহং", আমি জেনেছি, আমি পেয়েছি।

সেইদিনই ভারতবর্ষের উৎসবের দিন ছিল; কেননা সেইদিনই ভারতবর্ষ তাঁর অমৃতযজ্ঞে সর্ব্বমানবকে অমৃতের পুত্র বলে আহ্বান করেছিলেন—তাঁর ঘৃণা ছিল না, অহঙ্কার ছিল না। তিনি পরমাত্মার যোগে সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছিলেন। সে দিন তাঁর আমন্ত্রণধ্বনি জগতের কোথাও সঙ্কুচিত হয়নি; তাঁর ব্রহ্মমন্ত্র বিশ্বসঙ্গীতের সঙ্গে একতানে মিলিত হয়ে নিত্যকালের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল—সেই তাঁর ছিল উৎসবের দিন।

তার পরে বিধাতা জানেন কোথা হতে অপরাধ প্রবেশ করল। বিশ্বলোকের দ্বার চারিদিক হতে বন্ধ হতে লাগ্‌ল—নির্ব্বাপিত প্রদীপের মত ভারতবর্ষ আপনার মধ্যে আপনি অবরুদ্ধ হল। প্রবল স্রোতস্বিনী যখন মরে আস্‌তে থাকে তখন যেমন দেখ্‌তে দেখ্‌তে পদে পদে বালির চর জেগে উঠে তার সমুদ্রগামিনী ধারার গতিরোধ করে দেয়, তাকে বহুতর ছোট ছোট জলাশয়ে বিভক্ত করে;—যে ধারা দূরদূরান্তরের প্রাণদায়িনী ছিল, যা দেশ-দেশান্তরে সম্পদ্ বহন করে নিয়ে যেত, যে অশ্রান্ত ধারার কলধ্বনি জগৎসঙ্গীতের তানপুরার মত পর্ব্বতশিখর থেকে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত নিরন্তর বাজ্‌তে থাক্‌ত—সেই বিশ্বকল্যাণী ধারাকে কেবল খণ্ড খণ্ড ভাবে এক একটা ক্ষুদ্র গ্রামের সামগ্রী করে তোলে সেই খণ্ডগুলি আপন পূর্ব্বতন ঐক্যটিকে বিস্মৃত হয়ে বিশ্বনৃত্যে আর যোগ দেয় না, বিশ্বগীতসভায় আর স্থান পায় না,—সেই রকম করেই নিখিল মানবের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধের পুণ্যধারা সহস্র সাম্প্রদায়িক বালুর চরে খণ্ডিত হয়ে গতিহীন হয়ে পড়ল।—তার পরে, হায়, সেই বিশ্ববাণী কোথায়? কোথায় সেই বিশ্বপ্রাণের তরঙ্গদোলা? রুদ্ধ জল যেমন কেবলি ভয় পায় অল্পমাত্র অশুচিতায় পাছে তাকে কলুষিত করে, এইজন্যে সে যেমন স্নান-পানের নিষেধের দ্বারা নিজের চারিদিকে বেড়া তুলে দেয়, তেমনি আজ বদ্ধ ভারতবর্ষ কেবলি কলুষের আশঙ্কায় বাহিরের বৃহৎ সংস্রবকে সর্ব্বতোভাবে দূরে রাখবার জন্যে নিষেধের প্রাচীর তুলে দিয়ে সূর্য্যালোক এবং বাতাসকে পর্য্যন্ত তিরস্কৃত করেছেন,—কেবলি বিভাগ, কেবলি বাধা;—বিশ্বের লোক গুরুর কাছে বসে যে দীক্ষা নেবে সে দীক্ষার মন্ত্র কোথায়, সে দীক্ষার অবারিত মন্দির কোথায়—সে আহ্বানবাণী কোথায় যে বাণী একদিন চারিদিকে এই বলে ধ্বনিত হয়েছিল—

"যথাপঃ প্রবতাযন্তি যথা মাসা অহর্জরম্ এবং মাং ব্রহ্মচারিণোধাত আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহাঃ—

"জল যেমন স্বভাবতই নিম্নদেশে গমন করে, মাস সকল যেমন স্বভাবতই সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক হতেই ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট আসুন স্বাহা!" কিন্তু সেই স্বভাবের পথ যে আজ রুদ্ধ। ধর্ম্ম, জ্ঞান, সমাজ তাদের সিংহদ্বার বন্ধ করে বসে আছে—কেবল অন্তঃপুরের যাতায়াতের জন্যে খিড়কির দরজার ব্যবহার চল্‌চে মাত্র।

সত্যসম্পদের দারিদ্র্য না ঘট্‌লে এমন দুর্গতি কখনই হয় না। যে বলতে পেরেছে "বেদাহং" আমি জেনেছি, তাকে বেরিয়ে আস্‌তেই হবে, তাকে বল্‌তেই হবে "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

এই রকম দৈন্যে নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত দ্বার জানালা বন্ধ করে যখন ঘুমচ্ছিলুম এমন সময় একটি ভোরের পাখীর কণ্ঠ থেকে আমাদের রুদ্ধ ঘরের মধ্যে বিশ্বের নিত্যসঙ্গীতের সুর এসে পৌঁছিল—যে সুরে লোকলোকান্তর, যুগযুগান্তর সুর মিলিয়েছে, যে সুরে পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে সূর্য্য তারা একই আত্মীয়তার আনন্দে ঝঙ্কৃত হয়েছে—সেই সুর একদিন শোনা গেল।

আবার যেন কে বল্লে "বেদাহমেতং"—আমি এঁকে জেনেছি! কাকে জেনেছ? "আদিত্য বর্ণং"—জ্যোতির্ম্ময়কে জেনেছি—যাঁকে কেউ গোপন করতে পারে না। জ্যোতির্ম্ময়? কই তাঁকে ত আমার গৃহসামগ্রীর মধ্যে দেখ্‌চিনে।—না, তোমার অন্ধকার দিয়ে ঢেকে তাঁকে তোমার ঘরের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখোনি—তাঁকে দেখ্‌ছি তমসঃ পরস্তাৎ—তোমাদের সমস্ত রুদ্ধ অন্ধকারের পরপার হতে। তুমি যাকে তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে ধরে রেখেছ, পাছে আর কেউ সেখানে প্রবেশ করে বলে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়েচ, সে যে অন্ধকার—নিখিল মানব সেখান থেকে ফিরে ফিরে যায়, সূর্য্য চন্দ্র সেখানে দৃষ্টিপাত করে না—

সেখানে জ্ঞানের স্থানে শাস্ত্রের বাক্য, ভক্তির স্থানে পূজাপদ্ধতি, কর্ম্মের স্থানে অভ্যস্ত আচার; সেখানে দ্বারে একজন ভয়ঙ্কর 'না' বসে আছে, সে বলচে, না, না, এখানে না—দূরে যাও, দূরে যাও। সে বলচে কান বন্ধ কর, পাছে মন্ত্র কানে যায়, সরে বস পাছে স্পর্শ লাগে, দরজা ঠেলোনা পাছে তোমার দৃষ্টি পড়ে! এত "না" দিয়ে তুমি যাকে ঢেকে রেখেছ আমি সেই অন্ধকারের কথা বলছিনে—কিন্তু বেদাহমেতং—আমি তাঁকে জেনেছি যিনি নিখিলের—যাঁকে জান্‌লে আর কাউকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না, কাউকে ঘৃণা করা যায় না—যাঁকে জান্‌লে, নিম্ন দেশ যেমন জলসকলকে স্বভাবতই আহ্বান করে, সংবৎসর যেমন মাসসকলকে স্বভাবতই আহ্বান করে তেমনি স্বভাবত সকলকেই অবাধে আহ্বান করবার অধিকার জন্মে—তাঁকেই জেনেছি।

ঘরের লোক ক্রুদ্ধ হয়ে ভিতর থেকে গর্জ্জন করে উঠল—দূর কর দূর কর, এ'কে বের করে দাও—এ'ত আমার ঘরের সামগ্রী নয়! এ'ত আমার নিয়মকে মান্‌বে না!

না, এ তোমারি ঘরের না, এ তোমার নিয়মের বাধ্য নয়। কিন্তু পারবে না—আকাশের আলোককে গায়ের জোর দিয়ে ঠেলে ফেলতে পারবে না—তার সঙ্গে বিরোধ করতে গেলেও তাকে স্বীকার করতে হবে। প্রভাত এসেছে!

প্রভাত এসেছে—আমাদের উৎসব এই কথা বলচে! আমাদের এই উৎসব ঘরের উৎসব নয়, ব্রাহ্মসমাজের উৎসব নয়, মানবের চিত্তগগনে যে প্রভাতের উদয় হচ্চে এ যে সেই সুমহৎ প্রভাতের উৎসব!

বহু যুগ পূর্ব্বে এই প্রভাত-উৎসবের পবিত্র গম্ভীর মন্ত্র এই ভারতবর্ষের তপোবনে ধ্বনিত হয়েছিল, "একমেবাদ্বিতীয়ং।" অদ্বিতীয় এক! পৃথিবীর এই পূর্ব্বদিগন্তে আবার কোন্ জাগ্রত মহাপুরুষ অন্ধকার রাত্রির পরপার হতে সেই মন্ত্র বহন করে এনে স্তব্ধ আকাশের মধ্যে স্পন্দন সঞ্চার করে দিলেন! একমেবাদ্বিতীয়ং! অদ্বিতীয় এক!

এই যে প্রভাতের মন্ত্র উদয়শিখরের উপরে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিলে, যে, "এক সূর্য্য উদয় হচ্চেন, এবার ছোট ছোট অসংখ্য প্রদীপ নেবাও"—এই মন্ত্র কোনো একঘরের মন্ত্র নয়, এই প্রভাত কোনো একটি দেশের প্রভাত নয়—হে পশ্চিম, তুমিও শোনো, তুমি জাগ্রত হও—শৃণ্বন্তু বিশ্বে—হে বিশ্ববাসী, সকলে শোনো—পূর্ব্বগগনের প্রান্তে একটি বাণী জেগে উঠেছে—বেদাহমেতং—আমি জান্‌তে পারচি—তমসঃপরস্তাৎ—অন্ধকারের পরপার থেকে আমি জান্‌তে পারচি—নিশাবসানের আকাশ উদয়োন্মুখ আদিত্যের আসন্ন আবির্ভাবকে যেমন করে জান্‌তে পারে তেমনি করে।

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃপরস্তাৎ।"

এই নূতন যুগে পৃথিবীর মানবচিত্তে যে প্রভাত আসচে সেই নব প্রভাতের বার্ত্তা বাংলাদেশে আজ আশি বৎসর হল প্রথম এসে উপস্থিত হয়েছিল। তখন পৃথিবীতে দেশের সঙ্গে দেশের বিরোধ, ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের সংগ্রাম; তখন শাস্ত্রবাক্য এবং বাহ্য প্রথার লৌহ সিংহাসনে বিভাগই ছিল রাজা—সেই ভেদবুদ্ধির প্রাচীররুদ্ধ অন্ধকারের মধ্যে রাজা রামমোহন যখন অদ্বিতীয় একের আলোক তুলে ধরলেন তখন তিনি দেখ্‌তে পেলেন যে, যে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টানধর্ম্ম আজ একত্র সমাগত হয়েছে সেই ভারতবর্ষেই বহু পূর্ব্ব যুগে এই বিচিত্র অতিথিদের একসভায় বসাবার জন্যে আয়োজন হয়ে গেছে। মানব সভ্যতা যখন দেশে দেশে নব নব বিকাশের শাখা প্রশাখায় ব্যাপ্ত হতে চলেছিল তখন এই ভারতবর্ষ বারম্বার মন্ত্র জপ করিতেছিলেন—এক! এক! এক! তিনি বল্‌ছিলেন—ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি—এই এককেই যদি মানুষ জানে তবে সে সত্য হয়—ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ—এই এককে যদি না জানে তবে তার মহতী বিনষ্টি। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হয়েছে সে কেবল এই মহান্ একের উপলব্ধি অভাবে—যত ক্ষুদ্রতা নিষ্ফলতা দৌর্ব্বল্য, সে এই একের থেকে বিচ্যুতিতে—যত মহাপুরুষের আবির্ভাব সে এই এককে প্রচার করিতে—যত মহাবিপ্লবের আগমন সে এই এককে উদ্ধার করবার জন্যে!

যখন ঘোরতর বিভাগ বিরোধ বিক্ষিপ্ততার দুর্দ্দিনের মধ্যে কোথায় এই বাংলা দেশে অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় রূপে এই বিশ্বব্যাপী একের মন্ত্র—একমেবাদ্বিতীয়ং—দ্বিধা-

বিহীন সুস্পষ্টস্বরে উচ্চারিত হয়ে উঠ্‌ল তখন এ কথা নিশ্চয় জান্‌তে হবে—সমস্ত মানবচিত্তে কোথা হতে একটি নিগূঢ় জাগরণের বেগ সঞ্চারিত হয়েছে—এই বাংলা দেশে তার প্রথম সংবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে!

আমাদের দেশে আজ বিরাট্ মানবের আগমন হয়েছে। এখানে আমাদের রাজ্য নেই, বাণিজ্য নেই, গৌরব নেই, পৃথিবীতে আমরা সকলের চেয়ে মাথা নীচু করে রয়েছি—আমাদেরই এই দরিদ্র ঘরের অপমানিত শূন্যতার মাঝখানে বিরাট মানবের অভ্যুদয় হয়েছে। তিনি আজ আমাদেরই কাছে কর গ্রহণ করবেন বলে এসেছেন। সকল মানুষের কাছে নিত্যকালের ডালায় সাজিয়ে ধরতে পারি এমন কোনো রাজদুর্লভ অর্ঘ্য আমাদের এখানে সংগ্রহ হয়েছে, নইলে আমাদের এ সৌভাগ্য হত না। আমাদের এই উৎসর্গ বটের তলায় নয়, ঘরের দালানে নয়, গ্রামের মণ্ডপে নয়, এ উৎসর্গ বিশ্বের প্রাঙ্গণে! এইখানেই তাঁর প্রাপ্য নেবেন বলে বিশ্বমানব তাঁর দূতকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; তিনি আমাদের মন্ত্র দিয়ে গিয়েছেন, "একমেবাদ্বিতীয়ং!" বলে গিয়েছেন মনে রাখিস্, সকল বৈচিত্রের মধ্যে মনে রাখিস্ অদ্বিতীয় এক! সকল বিরোধের মধ্যে ধরে রাখিস্ অদ্বিতীয় এক।

সেই মন্ত্রের পর থেকেই আর ত আমাদের নিদ্রা নেই দেখচি! "এক" আমাদের স্পর্শ করেচেন, আর আমরা সুস্থির থাক্‌তে পারচিনে! আজ আমরা ঘর ছেড়ে, দল ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে বিশ্ব-পথের পথিক হব বলে চঞ্চল হয়ে উঠেছি! এ পথের পাথেয় আছে বলে জানতুম না—এখন দেখ্‌ছি অভাব নেই! ঘরে বাহিরে অনৈক্যের দ্বারা যারা নিতান্ত বিচ্ছিন্ন সমস্ত মানুষের মধ্যে তারাই "এক"কে প্রচার করবার হুকুম পেয়েছে। এক জায়গায় সম্বল আছে বলেই এমন হুকুম এসে পৌঁছিল!

তার পর থেকে আনাগোনা ত চলেইচে; একে একে দূত আসচে। এই দেশে এমন একটি বাণী তৈরি হচ্চে যা পূর্ব্বপশ্চিমকে এক দিব্যধামে আহ্বান করবে, যা একের আলোকে অমৃতের পুত্রগণকে অমৃতের পরিচয়ে মিলিত করবে। রামমোহন রায়ের আগমনের পর থেকে আমাদের দেশের চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্ম, সম্পূর্ণ না জেনেও, একটি চিরন্তনের অভিমুখে চলেছে। আমরা কোনো একটি জায়গায় নিত্যকে লাভ করব এবং প্রকাশ করব এমন একটি গভীর আবেগ আমাদের অন্তরের মধ্যে জোয়ারের প্রথম টানের মত স্ফীত হয়ে উঠ্‌ছে। আমরা অনুভব করচি, সমাজের সঙ্গে সমাজ, বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞান, ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্ম যে এক পরমতীর্থে এক সাগরসঙ্গমে পুণ্যস্নান করতে পারে তারই রহস্য আমরা আবিষ্কার করব। সেই কাজ যেন ভিতরে ভিতরে আরম্ভ হয়ে গেছে; আমাদের দেশে পৃথিবীর যে একটি প্রাচীন গুরুকুল ছিল সেই গুরুকুলের দ্বার আবার যেন এখনি খুল্‌বে এম্‌নি আমাদের মনে হচ্চে। কেন না, কিছুকাল পূর্ব্বে যেখানে একেবারে নিঃশব্দ ছিল এখন যে সেখানে কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্চে! আর ঐ যে দেখ্‌ছি বাতায়নে এক একজন মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াচ্চেন! তাঁদের মুখ দেখে চেনা যাচ্চে তাঁরা মুক্ত পৃথিবীর লোক, তাঁরা নিখিল মানবের আত্মীয়; পৃথিবীতে কালে কালে যে সকল মহাপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন দেশে আগমন করেছেন সেই যাজ্ঞবল্ক্য, বিশ্বামিত্র, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, সকলকেই তাঁরা ব্রহ্মের বলে চিনেছেন; তাঁরা মৃতবাক্য মৃত আচারের গোরস্থানে প্রাচীর তুলে বাস করেন না! তাঁদের বাক্য প্রতিধ্বনি নয়, কার্য্য অনুকরণ নয়, গতি অনুবৃত্তি নয়; তাঁরা মানবাত্মার মাহাত্ম্য-সঙ্গীতকে এখনি বিশ্বলোকের রাজপথে ধ্বনিত করে তুলবেন। সেই মহা সঙ্গীতের মূল ধুয়াটি আমাদের গুরু ধরিয়ে দিয়ে গেছেন—"একমেবাদ্বিতীয়ং।" সকল বিচিত্র তানকেই এই ধুয়াতেই বারম্বার ফিরিয়ে আন্‌তে হবে—একমেবাদ্বিতীয়ং।

আর আমাদের লুকিয়ে থাকবার যো নেই! এবার আমাদের প্রকাশিত হতে হবে—ব্রহ্মের আলোকে সকলের সাম্‌নে প্রকাশিত হতে হবে—বিশ্ববিধাতার নিকট থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে সমুদয় মানুষের কাছে এসে দাঁড়াতে হবে। সেই পরিচয়পত্রটি তিনি তাঁর দূতকে দিয়ে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কোন্ পরিচয় আমাদের? আমাদের পরিচয় এই যে আমরা তারা যারা বলে না যে ঈশ্বর বিশেষ স্থানে বিশেষ স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত, আমরা তারা যারা বলে, "একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" সেই এক প্রভুই সর্ব্বভূতের

অন্তরাত্মা, আমরা তারা যারা বলে না যে বাহিরের কোনো প্রক্রিয়া দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় অথবা কোনো বিশেষ শাস্ত্রে ঈশ্বরের জ্ঞান বিশেষ লোকের জন্যে আবদ্ধ হয়ে আছে, আমরা বলি "হৃদা মনীষা মনসাভিক্লপ্তঃ" হৃদয়স্থিত সংশয়রহিত বুদ্ধির দ্বারাই তাঁকে জানা যায়; আমরা তারা যারা ঈশ্বরকে কোনো বিশেষ জাতির বিশেষ লভ্য বলিনে আমরা বলি তিনি অবর্ণঃ এবং বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি, সর্ব্ব বর্ণেরই প্রয়োজন বিধান করেন কোনো বর্ণকে বঞ্চিত করেন না; আমরা তারা যারা এই বাণী ঘোষণার ভার নিয়েছি এক, এক, অদ্বিতীয় এক! তবে আমরা আর স্থানীয় ধর্ম্ম এবং সাময়িক লোকাচারের মধ্যে বাঁধা পড়ে থাক্‌ব কেমন করে! আমরা একের আলোকে সকলের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে প্রকাশ পাব। আমাদের উৎসব সেই প্রকাশের উৎসব, সেই বিশ্বলোকের মধ্যে প্রকাশের উৎসব, সেই কথা মনে রাখ্‌তে হবে! এই উৎসবে সেই প্রভাতের প্রথম রশ্মিপাত হয়েছে যে প্রভাত একটি মহাদিনের অভ্যুদয় সূচনা করচে।

সেই মহাদিন এসেছে অথচ এখনো সে আসে নি। অনাগত মহাভবিষ্যতে তার মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাচ্চি। তার মধ্যে যে সত্য বিরাজ করচে সে ত এমন সত্য নয় যাকে আমরা একেবারে লাভ করে আমাদের সম্প্রদায়ের লোহার সিন্ধুকে দলিল দস্তাবেজের সঙ্গে চাবি বন্ধ করে বসে আছি; যাকে বল্‌ব এ আমাদের ব্রাহ্মসমাজের, ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের! না! আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিনি, আমরা যে কিসের জন্য এই উৎসবকে বর্ষে বর্ষে বহন করে আস্‌চি তা ভাল করে বুঝতে পারিনি। আমরা স্থির করেছিলুম এই দিনে একদা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়েছিল আমরা ব্রাহ্মরা তাই উৎসব করি। কথাটা এমন ক্ষুদ্র নয়। "এব দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ" এই যে মহান্ আত্মা এই যে বিশ্বকর্ম্মা দেবতা যিনি সর্ব্বদা জনগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন তিনিই আজ বর্ত্তমান যুগে জগতে ধর্ম্মসমন্বয় জাতিসমন্বয়ের আহ্বান এই অখ্যাত বাংলাদেশের দ্বার হতে প্রেরণ করেছেন; আমরা তাই বলছি ধন্য, ধন্য, আমরা ধন্য!—এই আশ্চর্য্য ইতিহাসের আনন্দকে আমরা মাঘোৎসবে জাগ্রত করচি। এই মহৎসত্যে আজ আমাদের উদ্বোধিত হতে হবে—বিধাতার এই মহতী কৃপার যে গম্ভীর দায়িত্ব তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে! —বুদ্ধিকে প্রশস্ত কর, হৃদয়কে প্রসারিত কর, নিজেকে দরিদ্র বলে জেনোনা, দুর্ব্বল বলে মেনোনা—তপস্যায় প্রবৃত্ত হও, দুঃখকে বরণ কর, ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে ভোগ করবার জন্যে জ্ঞানকে মৃতপ্রায় এবং কর্ম্মকে যন্ত্রবৎ কোরোনা—সত্যকে সকলের উর্দ্ধে স্বীকার কর এবং ব্রহ্মের আনন্দে জীবনকে পরিপূর্ণ করে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ কর।

হে জনগণের হৃদয়াসন-সন্নিবিষ্ট বিশ্বকর্ম্মা, তুমি যে আজ আমাদের নিয়ে তোমার কোন্ মহৎকর্ম্ম রচনা করচ, হে মহান্ আত্মা, তা এখনো আমরা সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি! তোমার ভগবৎশক্তি আমাদের বুদ্ধিকে কোন্ খানে স্পর্শ করেছে, কোথায় তোমার সৃষ্টিলীলা চল্‌চে তা এখনো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, জগৎ সংসারে আমাদের গৌরবান্বিত ভাগ্য যে কোন্ দিগন্তরালে আমাদের জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে তা বুঝ্‌তে পারচিনে বলে আমাদের চেষ্টা ক্ষণে ক্ষণে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়চে আমাদের দৈন্য-বুদ্ধি ঘুচ্‌চেনা, আমাদের সত্য উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌চেনা, আমাদের দুঃখ এবং ত্যাগ মহত্ত্ব লাভ করচে না, সমস্তই ছোট হয়ে পড়চে; স্বার্থ, আরাম, অভ্যাস এবং লোকভয়ের চেয়ে বড় কিছুকেই চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্চিনে, একথা বলবার বল পাচ্চিনে যে সমস্ত সংসার যদি আমার বিরুদ্ধ হয় তবু তুমি আমার পক্ষে আছ, কেননা, তোমার সংকল্প আমাতে সিদ্ধ হচ্চে, আমার মধ্যে তোমার জয় হবে! হে পরমাত্মন্, এই আত্ম-অবিশ্বাসের আশাহীন অন্ধকার থেকে, এই জীবনযাত্রায় নাস্তিকতার নিদারুণ কর্ত্তৃত্ব থেকে আমাদের উদ্ধার কর, উদ্ধার কর, আমাদের সচেতন কর; তোমার যে অভিপ্রায়কে আমরা বহন করচি তার মহত্ত্ব উপলব্ধি করাও, তোমার আদেশে জগতে আমরা যে নবযুগের সিংহ-দ্বার উদ্ঘাটন করবার জন্যে যাত্রা করেছি সে পথের লক্ষ্য কি তা যেন সাম্প্রদায়িক মূঢ়তায় আমরা পথিমধ্যে বিস্মৃত হয়ে না বসে থাকি! জগতে তোমার বিচিত্র আনন্দরূপের মধ্যে এক অপরূপ অরূপকে নমস্কার করি, নানাদেশে নানাকালে তোমার নানা বিধানের মধ্যে এক শাশ্বত বিধানকে আমরা মাথায় পেতে নিই—ভয় দূর হোক্, অশ্রদ্ধা দূর হোক্, অহঙ্কার দূর হোক্, তোমার থেকে কিছুই বিচ্ছিন্ন নেই,

সমস্তই তোমার এক অমোঘ শক্তিতে বিধৃত, এবং এক মঙ্গল সঙ্কল্পের বিশ্বব্যাপী আকর্ষণে চালিত এই কথা নিঃসংশয় জেনে সর্ব্বত্রই ভক্তিকে প্রসারিত করে নতমস্তকে জোড়-হাতে তোমার সেই নিগূঢ় সঙ্কল্পকে দেখবার চেষ্টা করি! তোমার সেই সংকল্প কোনো দেশে বদ্ধ নয়, কোনো কালে খণ্ডিত নয়, পণ্ডিতেরা তাকে ঘরে বসে গড়তে পারে না, রাজা তাকে কৃত্রিম নিয়মে বাঁধতে পারে না, এই কথা নিশ্চিত জেনে এবং সেই মহা সঙ্কল্পের সঙ্গে আমাদের সমুদয় সঙ্কল্পকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সম্মিলিত করে দিয়ে তোমার রাজধানীর রাজপথে যাত্রা করে বেরই; আশার আলোকে আমাদের আকাশ প্লাবিত হয়ে যাক্, হৃদয় বলতে থাক্ আনন্দং পরমানন্দং, এবং আমাদের এই দেশ আপনার বেদীর উপরে আর একবার দাঁড়িয়ে উঠে মানবসমাজের সমস্ত ভেদবিভেদের উপরে এই বাণী প্রচার করে দিক্—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে দিব্যধামানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পেন্সিল্‌ভেনিয়া-প্রবাসীর পত্র।

১০ই অক্টোবর সাউদামটন থেকে জাহাজে চড়েছিলাম। জাহাজে উঠবার আগে একবার ডাক্তারের একজামিন অর্থাৎ স্বাস্থ্যপরীক্ষা হয়। দেখলাম এক জায়গায় ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছে, আর এক একজন করে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, তিনি শুধু চোখের পাতাটা উল্টে দেখচেন। বস্, একজামিন হয়ে গেল। এ জাহাজটা গোলকুণ্ডার চেয়ে অনেক বড়, প্রায় ১১০০০ টন। ক্যাবিনের বা কাম্‌রার অন্ত নেই। যেদিকে যাওয়া যায় সেদিকেই ক্যাবিন। এসব ক্যাবিনে রাতদিনই ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট্ জ্বল্‌ছে। প্রথম দিন এসে তো ক্যাবিন খুজে কিছুতেই পাই না। শেষে অনেক চেষ্টা করে তো ক্যাবিন পাওয়া গেল। ব্যাগগুলো রেখে একবার উপরে গেলাম। জাহাজ ছেড়ে দিয়ে খানিক দূর এসেছে এমন সময় আমার ক্যাবিনে এসে দেখি পোর্ট্‌হোল্ খোলা পেয়ে দিব্যি একটা ঢেউ ঘরের ভিতর ঢুকে বিছানা বালিশ জিনিসপত্র সব ভিজিয়ে ঘরের মেজেতে বেশ খেলা করে বেড়াচ্ছে। ক্যাবিন-বয়কে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে একটা ঢেউ ভিতরে অনধিকার প্রবেশ করে এই কাণ্ড করে রেখেছেন। যা হোক আবার সমস্ত বিছানা বালিশ বদলে দিল। ২৩শে রাত্রি ৮৷১৪ মিনিটের গাড়িতে চড়ে ২৪শে বেলা ১১টার সময় এখানে এসে পৌঁছিয়েছি। রাস্তায় "বেলফণ্টে" একবার বদলাতে হয়েছিল।—প্রথম ৩।৪ দিন সমুদ্র এত ভয়ানক ছিল যে ঢেউ আপার ডেক ছাড়িয়ে উঠেছিল। ক্যাবিন থেকে বাইরে বার হবার সাধ্য কারো ছিল না। ১৫ই সমুদ্র শান্ত হয়, আমিও সেদিন প্রথম ডেকে যেতে পারি। জাহাজে কেবল আমি একমাত্র কালা আদমী তাই আমি গেলেই সাহেব মেমগুলো হাঁ করে দেখত। যা হোক সেখানে একটী আমেরিকান ইহুদীর সঙ্গে বেশ ভাব হয়েছিল, আমেরিকায় নেমে তার দ্বারা কিছু উপকার পাওয়া গেছে। ১৬ই অক্টোবর জাহাজে বসে আমিও রাখি-উৎসব নিজে নিজে করলাম। সে দিন রান্না কোন জিনিষ খাই নাই শুধু আপেল আর বাদাম খেয়ে কাটিয়েছি। মাসখানেক পরে সেদিন স্নানও করি। ১৭ই আমাদের 'ফিলাডেলফিয়া' জাহাজ প্রায় রাত্রি ১০টার সময় নিউ ইয়র্ক পৌছায়। সেদিন সকাল থেকে এত কুয়াসা হয়েছিল যে চারিদিকের কিছুই দেখা যায় নাই। আগে থাকতেই আমার ভাবনা হয়েছিল যে এই অজানা সহরে কোথায় গিয়ে উঠব, তার উপর এই কুয়াসা, আর রাত্রি ১০টার সময় জাহাজ জেটিতে লাগল। নিউ ইয়র্কে কারো ঠিকানা জানতাম না বলে আগে চিঠি দেওয়া হয়নি। প্রথমে জাহাজে উঠবার আগেই ত একবার সেই জন্মকাল থেকে কুষ্ঠি লিখে দিতে হয়েছে। আবার নামবার সময় যত কিছু খবর আছে সব লিখে দিয়েও রক্ষা নাই, আবার ট্রাঙ্ক খুলে একজামিন করে তবে ছেড়েছে। তবে এটা ইংরাজ বাবু-দেরও করেছে; তাঁদের লালমুখ দেখে ছেড়ে কথা কয়নি। এক এক সাহেব তো চটেই লাল। যাক্, নামবার পর সেই ইহুদী তার এক বন্ধুকে 80th Streetএ নামিয়ে দিতে বললে, সেও 82nd St. যাবে। আমাকে লণ্ডনে একজন আন্দাজে নিউ ইয়র্কের ইণ্ডিয়া হাউসের ঠিকানা দিয়েছিল। 80tht St.এ নেমে দেখি সেখানে ১১০২ পার্ক এ্যাভিনিউর চিহ্নও নেই; আর যে আমার সঙ্গে ছিল সেও

"পেন্সিলভেনিয়া-প্রবাসীর পত্র" শীর্ষক প্রবন্ধের দুইটি চিত্র
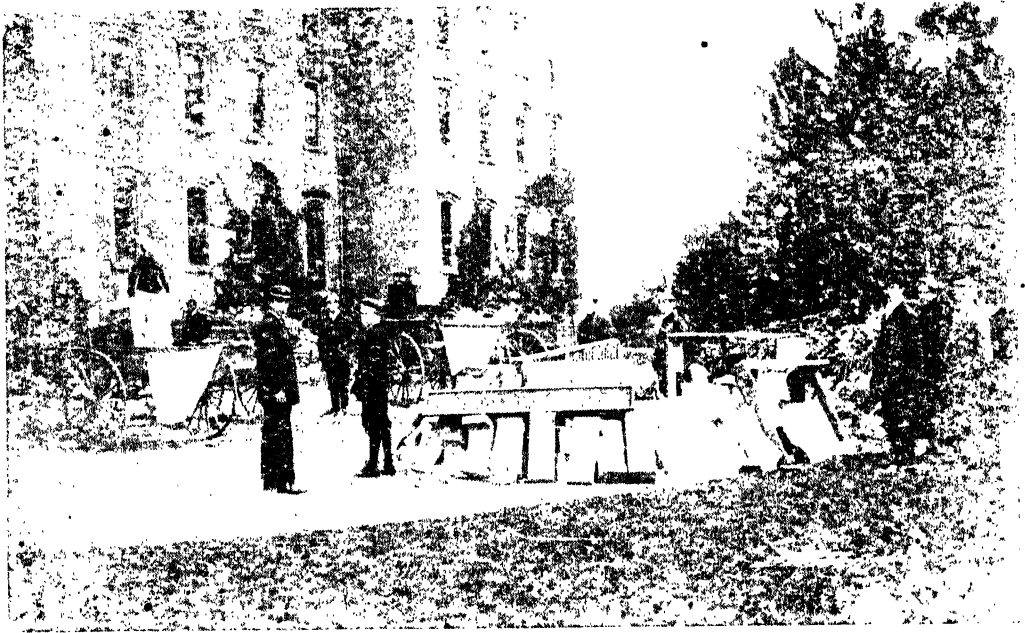
কবি নবীনচন্দ্র সেন।

বলী রামমূর্ত্তি নায়ুডু।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।

বিচারপতি শঙ্করন্ নায়ার।

তার বাড়ী খুঁজে পায় না। সে 'সাউথ আফ্রিকা' থেকে ৫ বছর পরে বাড়ী ফিরছে। একটী বাড়িতে গিয়ে প্রথমে ধাক্কা ধাক্কি আরম্ভ করলে, খানিক পরে সে বাড়ীর লোক বেরিয়ে এসে বলল যে সে বাড়ীতে অন্য লোক থাকে। শুনে তো বুড়োর চক্ষুস্থির। তার পর রাস্তায় রাস্তায় দুজনেই হায়রান হয়ে প্রায় একঘণ্টা পরে সে হঠাৎ তার এক চেনা লোক দেখতে পেয়ে তবে তার বাড়ী খুঁজে পায়। আমাকেও তার বাড়ী নিয়ে গেল কিন্তু আমি দেখলাম যে আমাকে রাত্রে জায়গা দিতে হলে তাদের অসুবিধা হবে। তাই রাত্রে সেখানে থাকতে রাজী হলাম না। তারা প্রথমে আমাকে থাকতে অনেক করে বলল কিন্তু যখন দেখল যে আমি থাকতে রাজী নই তখন বুড়ো তার ছেলেকে আমার সঙ্গে ইণ্ডিয়া হাউস্ খুঁজে বার করতে পাঠাল। ছেলেটি পার্ক এ্যাভিনিউ জানত তাই ১১৪২ নম্বর খুঁজে নিতে বেশী কষ্ট হল না। রাত সাড়ে এগারটার পর গিয়ে ইণ্ডিয়া হাউসে হাজির হলাম। এখানে এখন ৪ জন বোর্ডার আছেন। তার মধ্যে ৩ জন বাঙ্গালী আর একজন সিংহলী। আজ বেলা সাড়ে ১১টার সময় এখানে এসে পৌঁছিয়েছি; আজ শনিবার বলে ভর্ত্তি হওয়া হলো না। বোধ হয় সোমবারের আগে ভর্ত্তি হওয়া হবে না। আমেরিকার মধ্যে সব চেয়ে ভাল ইউনিভারসিটি বোষ্টনে, কিন্তু সেখানকার ফি ২৫০ ডলার বলে সেখানে যাওয়া হলো না। ওখানে থাকতে ভেবেছিলাম যে ফেল্প্‌স্ সাহেবের স্কলারসিপ্ মানে যেখানে খুসী ভর্ত্তি হতে পারব; কিন্তু নিউ ইয়র্কে এসে শুনলাম যে সে সব কিছু নয়; কয়েকটী ইউনিভারসিটি হিন্দু ছাত্রদের বেতনের টাকা ছেড়ে দেবে বলেছে তার জোরেই ফেল্প্‌স্ ছেলেদের ফ্রি স্কলারসিপ্ দেবেন বলেছিলেন।

যা হোক, সে সব ইউনিভারসিটি ফি ছেড়ে দেবে বলেছে তার মধ্যে দেখলাম এটাই সব চেয়ে ভাল তাই এখানে চলে এলাম। ব্রুক্‌লিন (Brooklyn)এর প্র্যাট্ ইন্সটিটিউসনে ভর্ত্তি যাব ঠিক করেছিলাম কিন্তু সেখানে প্রথমতঃ কোন ডিগ্রি দেয় না তার ওপর সেটা তত ভাল ইন্সটিটিউসন্ নয়। এখন এই কলেজে আমি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স (Chemical Engineering Course) নিচ্ছি। প্রথম দুই বছর সব জায়গাতেই প্রায় এক পড়া হয়। শেষের দুই বছর স্পেশেল কোর্স নিয়ে শেষ করলে B. Sc. ডিগ্রী পাওয়া যায়। আমি ভেবেছি প্রথম দুই বৎসর এখানে পড়ে এখানকার প্রফেসারদের সুপারিসে যদি বোষ্টন technicalএ free scholarship যোগাড় করতে পারি তবে শেষদিকটা সেখানে পড়তে পারব। সেখানে special student হয়ে ভর্ত্তি হতে পারলে এক বছরেই কোর্স্ শেষ করা যেতে পারে। এখানকার জলবায়ু খুব ভাল। কলেজ সমুদ্রের জল থেকে ১০০০ ফিট উঁচু পাহাড়ের উপর। আমাদের দেশের দার্জ্জিলিংএর মত পাহাড়ে জায়গা। মাসে মাসে যে সব বাঁধা খরচ আছে তা দিলাম—

১ম term:—১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৯শে জানুয়ারী—Incidentals—\$ 18, Gymnasium fee—\$ 5, Room Rent—\$ 27, Library fee \$. 1.50 cents, Damage Deposit—\$ 5.50 cents, Key deposit—50 cents, Laboratory charges —\$ 15; মোট \$ 67. ২য় term:—২রা ফেব্রুয়ারী থেকে ১লা জুলাই—মোট \$ 62। দুই termএ এক বছর হয়। খাওয়া খরচ মাসে \$ 12এ একটু খারাপ এবং মাসে \$ 15এ ভাল। তা ছাড়া খুচরা বোধ হয় ৪।৫ ডলার লাগবে।—\$ 100 tuition fee ছিল কিন্তু আমাকে দিতে হবে না। এক \$ বা ডলার ৩৲। এখানে ভর্ত্তি হবার সময় Boarding এবং lodging fee, incidental fee, library, laboratory ইত্যাদি ধরে সব শুদ্ধ এক termএর জন্য ৬৭ ডলার দিতে হবে। এখন থেকে হিন্দু ছাত্র হইলেই তাকে ফ্রী নেওয়া হবে। এই পেন্‌সিলভেনিয়া ষ্টেট্ কলেজ এখানে নাকি খুব সস্তা বলে বিখ্যাত। এত কম খরচে নাকি অন্য কলেজে থাকা যায় না।

এখানকার ৬টা খুব ভোর জানতে হবে। ৭॥০টা থেকে সকালের খাওয়া আরম্ভ হয়। খাবার কোন নির্দ্দিষ্ট জায়গা নেই কেউ বা হোটেলে খায় আর কেউ বা আমি যেখানে খাই (Mc. Allister hall) সেখানে খায়। এই Mc. Allister hallএ সব চেয়ে সস্তায় খাওয়া দেয়। অন্য অন্য হোটেলে মাসে ১৫ ডলার নেয়, কিন্তু এখানে ১২

ডলার। তবে খাওয়াও তদ্রূপ। একটু সুবিধা এই যে তিন বারই এক গেলাস করে দুধ দেয়। Breakfastএর পর ৮টা থেকে ৮·১৫ মিনিট পর্য্যন্ত chapel. ৮·২০ মিনিট থেকে ক্লাশ আরম্ভ হয়। যদি অন্য অন্য departmentএ প্রায়ই মাঝে মাঝে এক এক period খালি থাকে কিন্তু আমার departmentএ সব চেয়ে বেশী খাটুনি। তার উপর আমি আবার দেরীতে এসেছি বলে workshopএ অতিরিক্ত সময় খাটিতে হয়। আমার প্রায় সপ্তাহে ৩৫ ঘণ্টা ক্লাশ। মাঝে ১২·২০ থেকে ১·৩০ পর্য্যন্ত ছুটী (dinner) থাকে তার পর প্রায়ই ৪টা পর্য্যন্ত ক্লাশ থাকে। তার পর মিলিটারি ড্রিল সকলকেই করতে হয়। রাত্রে ৬টার সময় খাবার আগে যে টুকু সময় পাই একটু বেড়িয়ে আসি। তার পর পড়তে বসতে হয় প্রায় ১২।১২॥০ টা পর্য্যন্ত। কেবল শনিবার বেলা ১·৩০র পর আর ক্লাশ থাকে না। রবিবার ছুটী থাকে। আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে ঢের বেশী খাটতে হয়। এখানকার কলেজে প্রত্যেককে ক্লাশে পড়া করে নিয়ে যেতে হয়। প্রত্যেককেই পড়া দিতে হয়। এখন বোধ হয় বুঝতে পারছ কেমন ভাবে আছি। এই কলেজ সহরের মধ্যে নয় বলে চারিদিকে খুব নির্জ্জন আর পাহাড়ে ভরা। সহরের কোন বিলাস কিম্বা আমোদ এখানে নেই কিন্তু আমেরিকান ছেলেরা এর মধ্যেই নিজেদের মধ্যে নানা আমোদ করে। এদের নানা আমোদ প্রমোদ আছে। তার মধ্যে যে দুটী আমি এসে দেখেছি তার ছবি পাঠালাম। ১মটা যে দিন এখানে প্রথম আসি (২৪শে) সে দিন হয়েছিল। এটী হচ্ছে কলেজের annual cider scrap। এক পিপে দ্রাক্ষারস মাঝ খানে রাখে আর দুধারে Freshmen (1st year) আর Sophomore (2nd year) গোল হয়ে দাঁড়িয়ে College yell কয়েকবার চেঁচায়। এই কলেজ yell (চীৎকার) আবার মজার, না আছে তার মাথা, না আছে মুণ্ড। আমাদের Freshmen yell কি জান? 'রারা রারা, রারা রেলভ্; পেন্‌সি ষ্টেট্ নাইন্‌টিন্ টুয়েলভ্।' Sophomore yell বিন্দা লাক্কা, বুমালাকা, বিংবাং বেং... পেন্‌সিলভেনিয়া ষ্টেট নাইনটিন্ ইলেভ্‌ন, ইত্যাদি। যখন ৫।৬ শো ছেলে মিলে এক সঙ্গে এই বিটকেল ডাক ছাড়ে তখন যেন কাণের পোকা বার হবার যো হয়। যা হোক চীৎকার হয়ে গেলে একটা বন্দুকের আওয়াজ হয় আর অমনি দুই দল এগিয়ে সেই পিপে অধিকার করবার চেষ্টা করে। সেই

হুড়োহুড়িতে কত যে হাত পা ভাঙ্গে তার ঠিকানা নাই। যে ক্লাস হারে তাহাদের ভারি অপমান। বিশেষতঃ যদি freshman হারে তবে অমনি Sophomore রা নূতন নূতন আইন তৈরী করবে যে ফ্রেশ্‌ম্যান্ পকেটে হাত দিয়ে চলতে পাবে না, তারা ঘাসের উপর দিয়ে চলতে পাবে না, ইত্যাদি যত রাজ্যের খামখেয়ালি নিয়ম আছে সব তৈরী করবে। যে ছবিটা দিলাম (৬২২ পৃঃ দেখ) সেটা সেই পিপে অধিকারের চেষ্টা হচ্ছে, কয়েকজন Sophomore পিপের উপর উঠে দাঁড়িয়েছে আর তার চারিদিকে ঠেলাঠেলি ঘুষোঘুষি চলেছে। এবারে প্রায় ৩।৪টী জখম হয়েছিল। এবার freshmanরা হেরেছে।

দ্বিতীয়টা হচ্ছে Hallow e'en day. এটা ৩১শে অক্টোবর হয়। এদিন আমাদের দেশে যেমন লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাত্রে ছেলেরা চুরি করে বেড়ায় তেমনি এরাও সমস্তরাত ধরে যত mischief করে রাখে। অধ্যাপকদের ঘরে গিয়ে শূয়োর মুরগী ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে আসে। যত রাজ্যের বাঁদ্‌রামি আছে সব করবে। ৩১শে প্রায় রাত ১টা পর্য্যন্ত বাইরে ছেলেদের গোলমাল শুনেছি। ১লা ভোর বেলা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি আমাদের ঘরের সামনের এক গাছে পাইখানা থেকে সব toilet paper নিয়ে গিয়ে টাঙ্গিয়েছে, আর mainএর দরজার সামনে যত রাজ্যের ভাঙ্গাগাড়ী ইঞ্জিন ইট পাটকেল পাথর ইত্যাদি এনে সব রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে (উপরের ছবি দেখ)। Station থেকে signboard এনে এক জায়গায় কতকগুলো পাথর জড় করে তার মাঝখানে এক শূয়োর ছেড়ে দিয়ে তার পাশে সেই সাইন বোর্ড লাগিয়েছে। একটা ঘরশুদ্ধ মুরগী তুলে এনে রেখেছে আর খড় দিয়ে Democratic, Republican আর Socialist partyর তিন পুতুল তৈরী করেছে। একবার নীচে দেখতে গিয়েছিলাম, মধ্যে কে যেন একটা ফটো তুলেছে; এই ফটোটীতে দেখলাম আমি রয়েছি তাই ৫ সেণ্ট দিয়ে কিনে পাঠালাম। সেদিন কলেজের ফটোগ্রাফারের কাছে একটী ছবি তোলান হল। তার একখানাও পাঠালাম।

গত ২০শে নভেম্বর এখানে পেন্সিলভেনিয়া day ছিল (কলেজের জন্মদিন) সেদিন Pennsylvaniaর গভর্ণর এসেছিল। সমস্ত দিন ধরে নানা আমোদ হয়েছে।

এখানকার বোর্ডিংএর নিয়ম এই যে ঘরের আসবাবের মধ্যে খাট টেবিল আর চেয়ার দেয় তা ছাড়া বাকী সব

নিজেকে কিনতে হয়। একটা মাথার বালিশের দামই প্রায় ৫৲ টাকা, তাও আবার সকলের চেয়ে কম দর। এখানকার সমস্ত জিনিষের দামই প্রায় চার গুণ।

এত দেরীতে এসেছি যে প্রথমে regular student করে নিতে চায় নাই কিন্তু শেষে chemistry departmentএর Dean recommend করাতে তবে regular student করে নিয়েছে। এখানে এর আগে কোন ভারতীয় ছাত্র আসে নাই। এদের ধারণা যে ভারতীয়রা ইংরাজী জানে না কিন্তু আমার ইংরাজী শুনে তো অবাক! বলে যে 'How could you learn the English language? We didn't know that Indians could speak English so well!' যা হোক, আমার ইংরাজী শুনেই যে রকম খুসী, ভাল ইংরাজী শুনলে না জানি কি করে। এখানটা একটা গ্রামের মত, সমস্ত গ্রাম জড়িয়ে এই State College। এক একটা বাড়িতে এক এক department। এই উপত্যকাটাতে (Mittany valley) সব শুদ্ধ প্রায় ১০ হাজার লোক থাকে, তার মধ্যে প্রায় সকলেই এই ইউনিভারসিটির কোন না কোন কাজ করে। এই কলেজের চারদিকেই পাহাড়ে ঘেরা। চারিদিকের দৃশ্য খুব সুন্দর। আমেরিকার প্রায় সব ইউনিভারসিটিতেই ছেলে মেয়েরা একসঙ্গে পড়ে। আমাদের German classএ প্রায় ৫।৬ জন মেয়ে পড়ে। তবে তারা প্রায়ই art course আর domestic science নেয়। আমাদের সবশুদ্ধ ৪ বছরের কোর্স্। প্রথম বৎসরকে বলে Freshman year দ্বিতীয় Sophomore year তার পর Junior year সব শেষ Senior year. এখানে প্রত্যেক departmentএ প্রথম দ্বিতীয় termএ প্রায় general education দেওয়া হয়। আমার Industrial Chemistry subject বলে German compulsory. শেষের দুই বছর যে subjectএ specialrise করবার দরকার সেই subject পড়ার আর সঙ্গে সঙ্গে সেই রকম factoryতে tour করতে হয়। আমাকে দুই বছর Chemical Factoryতে tour করতে হবে।

শ্রীপ্রেমানন্দ দাস।

বঙ্গসাহিত্যে-বিজ্ঞান। *

ওরে বাছা! মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
শ্রীমধুসূদন।

"Ours is a noble language.........He who
uses a French word where an English
word would do just as well is
guilty of high treason against
his mother-tongue."—Southey ("The Doctor").

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় যখন আপনাদের প্রতিনিধি স্বরূপ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া সাহিত্য-সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন তখন আমি যুগপৎ বিস্ময় ও আতঙ্কে অভিভূত হইলাম। প্রথমতঃ মনে হইল নাম বা ঠিকানা ভুলিয়া হয়ত তাঁহারা আমার নিকট আসিয়াছেন। আমি সাহিত্যসেবা করি নাই। বলিতে লজ্জা হয়, মাতৃ-ভাষায় দুইটি কথা সংযোগ করিতে হইলে আমার হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ যে আসনে সাহিত্যরথী রবীন্দ্রনাথকে আপনারা একবার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সে আসন গ্রহণ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা, বাতুলতা মাত্র। তার পর আমি এক প্রকার চিররুগ্ন। দূর প্রদেশে আসিয়া কোন প্রকার শ্রমসাধ্য কাজ করা আমার শক্তি ও সামর্থ্যের অতীত। এই সকল কারণ প্রদর্শন করিয়া আমি এই সম্মান প্রত্যাখ্যান করি। কিন্তু শশধর বাবু যখন পরদিন সাহিত্যপরিষদের দুই প্রধান স্তম্ভস্বরূপ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়দ্বয়কে সঙ্গে করিয়া পুনরায় এই ক্ষুদ্র ও ক্ষীণদেহ মশককে ধৃত করিবার জন্য জাল বিস্তার করিলেন, তখন পরাভূত হইয়া আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলাম। আমি এক-প্রকার বন্দিভাবে আপনাদের সমক্ষে আনীত। এই গুরুভার আমার স্কন্ধে চাপাইয়া আপনারা কতদূর সফলতা লাভ করিবেন জানি না, তবে "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" এই শাস্ত্রোক্ত বচনের উপর নির্ভর করিয়া আজ সম্মিলনের কার্য্য আরম্ভ করিতেছি।

* রাজসাহীতে সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে ১৮ই মাঘ সভাপতি বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের বক্তৃতা।

স্থানীয় কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে বঙ্গসাহিত্যে কি কি পায় অবলম্বন করিলে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের সার হইতে পারে তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

জাতীয় সাহিত্য জাতির মানসিক অবস্থার পরিচায়ক পরিমাপক। যে কোন দেশের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের হিত্য নিবিষ্টভাবে পর্য্যালোচনা করিলে সে দেশের ৎকালীন লৌকিক চরিত্র সম্বন্ধে প্রভূত অভিজ্ঞতা লাভ রা যায়। কারণ, সাহিত্য জাতীয় চরিত্র ও প্রবৃত্তির হ্যিক বিকাশ মাত্র। যেমন চিত্রকর নীরব ভাষায় ত্রিত বিষয়ে কেমন এক প্রকার সজীবতা প্রদান করেন দ্বারা আলেখ্যবিশেষের মনোগত ভাব অনায়াসেই উপলব্ধি রা যায় তেমনি সাহিত্য-চিত্রে জাতীয় চরিত্র মুখরিত হয়। ঙ্গলা সাহিত্যের সূচনা হইতেই তাহাতে ধর্ম্মপ্রবণতা বলক্ষিত হয়। মাণিকচাঁদ ও গোবিন্দচন্দ্রের গীতাবলী তে আরম্ভ করিয়া রামপ্রসাদের শ্যামাসংগীত ও ভারত-ন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত কেবল এই একই সুর। এই বের চরম বিকাশ হইয়াছে বৈষ্ণব সাহিত্যে। প্রেমের , নামে রুচি, যে সাহিত্যের মূলমন্ত্র, সেই বৈষ্ণব হিত্যের উন্মাদন স্রোতে দেখিতে পাই সেই এক ভাব— প্রবণতা। এই বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রসাদেই আমরা জ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বীণা-নিক্কণ শুনিয়া মাতৃ-ষাকে ও স্বদেশকে গৌরবান্বিত মনে করি। চণ্ডীদাস হার প্রেম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন আমরা তাঁহার পদাবলী ন্ধেও সেই উক্তি প্রয়োগ করিব। ইহার আদ্যোপান্ত কষিত হেম"।

এই ধর্ম্মসাহিত্যের স্রোত মাণিকচাঁদের সময় অর্থাৎ একাদশ শতাব্দী হইতে প্রবাহিত হইয়া বাঙ্গলা ভাষার পাদন, পুষ্টিসাধন ও কলেবরবৃদ্ধি করিয়াছে। সেই াত আজও প্রবাহিত হইতেছে। এমন কি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের গুরুস্থানীয় (inspirer) জয়দেবের সময় হইতে কমল গোস্বামীর সময় পর্য্যন্ত—এই সাতশত বৎসর একই প্রসঙ্গ চলিতেছে। গীতগোবিন্দে যে তরঙ্গ লোড়িত, 'রাই উন্মাদিনী'তেও তাহারই সংঘাত দেখি। ন কি ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী গ্রন্থকারেরাও এই সংক্রামকতা াইতে পারেন নাই। পদাবলী সাহিত্যের ভণিতায় ৭৪।৭৫ জন মুসলমান কবিরও নাম পাওয়া যায়। গত কয় বৎসর বাঙ্গলা ভাষায় যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে অধিকাংশই ধর্ম্মবিষয়ক। (পরিশিষ্ট দেখ)

বাঙ্গালা সাহিত্যে কোন্ সময়ে গদ্যের প্রথম আবির্ভাব হয় তাহার আলোচনা করিবার আমাদের সময় নাই। তবে মোটামুটি ইহা ধরা যাইতে পারে যে গদ্য সাহিত্যের বয়স শতবর্ষ মাত্র। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ স্থাপন সময় হইতে বঙ্গসাহিত্য নবযুগে পদার্পণ করিয়াছে। কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতি শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ, রাজীব-লোচন এবং মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, রাম রাম বসু, রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই যুগের প্রবর্ত্তক। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসলেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইংরেজ প্রভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইতিহাস সবিস্তারে বিবৃত করিয়া, নিম্নলিখিত কথা কয়টী বলিয়া তাঁহার সারবান গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন :—

"ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সামাজিক জীবনে ও রাজনৈতিক জীবনে নূতন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে; নূতন আদর্শ, নূতন উন্নতি, নূতন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমস্ত জাতি অভ্যুত্থান করিয়াছে। সাহিত্যে এই নবভাবের ফলে গদ্য সাহিত্যের অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। বাঙ্গালা এখন বাঙ্গালা ভাষাকে মান্য করিতে শিখিতেছে, এ বড় শুভ লক্ষণ। ক্রীড়াশীল শিশু যেমন সমুদ্রতীরে খেলা করিতে করিতে একান্ত মনে গভীর ঊর্ম্মিরাশির অস্ফুট ধ্বনি শুনিয়া চমকিত হয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রসঙ্গে ব্যাপৃত থাকিয়া আমিও সেইরূপ বঙ্গসাহিত্যের অদূরবর্ত্তী উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির কথা কল্পনা করিয়া বিস্মিত ও প্রীত হইয়াছি। অর্দ্ধ শতাব্দীতে বঙ্গীয় গদ্য যেরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে কাহার মনে ভাবী উন্নতির উচ্চ আশা অঙ্কুরিত না হয়?"

আজ আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী। রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে যে বীজ অঙ্কুরিত হয়, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের অসামান্য প্রতিভাপ্রভাবে তাহার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। এমন কি বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যকে অনেকে বিদ্যাসাগরীয় যুগের সাহিত্য এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গলা সাহিত্যের শব্দবিন্যাস বর্ত্তমান হইতে অনেকটা বিভিন্ন। তাঁহার বেতাল পঞ্চবিংশতি সংস্কৃত সমাসবদ্ধপদে পরিপূর্ণ। একপংক্তি রচনার মধ্যে ৩৷৪টি দুরূহ সমাসবদ্ধপদের অস্তিত্ব বর্ত্তমান পাঠকদিগের নিকট কিরূপ সুখপাঠ্য হইবে তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের শৈশবে ইহাই রীতি ছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের

পাঠ্যপুস্তক "প্রবোধচন্দ্রিকা" তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। "কোকিলকলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছী-করাত্যচ্ছনির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে" ইহাই তখনকার আদর্শ ভাষা ছিল। এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র "আলালের ঘরের দুলালে"র মুখবন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখ-যোগ্য। অধ্যাপকেরা ঘিকে "আজ্য" বলিতেন, কদাচ "ঘৃতে" নামিতেন। খইকে "লাজ", চিনিকে "শর্করা" ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া ভাষার সৌষ্ঠব বর্দ্ধন-করিতেছিলেন। যাহাহউক নূতন বন্যায় সে ঢেউ চলিয়া গেল। বসন্তের অতৃপ্ত কোকিল বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে যেমন একদিকে বিরহের উচ্ছ্বাসগীতিকা গাহিতে লাগিল, আবার 'আনন্দমঠে' স্বদেশপ্রেমিকতার ভৈরবনিনাদ, অপরদিকে সংযম, আত্মনিবৃত্তি, যোগ, অনুশীলন, সুখ, দুঃখ, ইত্যাদির উচ্ছ্বাসে 'বঙ্গদর্শন' বঙ্গদেশে নূতন যুগ আনয়ন করিল। সেই অলোকসামান্য প্রতিভায় উদ্ভাসিত হইয়া আজ বাঙ্গলা সাহিত্য সমগ্র ভারতসাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অক্ষয়কুমার, দীনবন্ধু, কালীপ্রসন্ন, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই ক্ষেত্রে নিজ নিজ প্রতিভাবারি সিঞ্চন করিয়া উর্ব্বরতা সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। ঈশ্বরগুপ্ত, শ্রীমধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এই সাহিত্যের কাব্যাংশ কনকাভরণে সাজাইয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। কিন্তু এসমস্ত সত্ত্বেও আজ আমাদের সম্মুখে একটি ভীষণ বিপদ উপস্থিত। আমাদের সাহিত্যের আংশিক উন্নতি হইয়াছে বটে, সাহিত্যের উপন্যাস ও কাব্যাংশের পূর্ণ বিকাশ হইতেছে ইহাও সত্য বটে, কিন্তু একটি মাত্র কারণে ভাষার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে পারিতেছে না। শারীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, যে অঙ্গের চালনা হয় সেই অঙ্গ দৃঢ় ও সবল হইতে থাকে, আবার যে অঙ্গের চালনা হয়না তাহা ক্ষীণ হইতেও ক্ষীণতর হইয়া পরে একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। আমাদের সাহিত্যে বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকের একান্তই অভাব।

প্রাচীন ভারতে সত্যের ও নূতন তত্ত্বের অনুসন্ধানের জন্য ঋষিরা ব্যস্ত থাকিতেন। কিন্তু মধ্যযুগে এ সমস্ত লুপ্ত হইল। চৌষট্টি কলার অন্তর্ভূক্ত যিনি যত বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতেন, তিনি শিক্ষিত সমাজে তত জ্ঞানবান বলিয়া আদৃত হইতেন। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' অতি প্রাচীন গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থ পাঠে জানা যায় ধাতুবাদ (Chemistry and Metallurgy) ঐ সকল কলার মধ্যে পরিগণিত হইত। চরকে বনৌষধি চিনিয়া ও বাছিয়া লইবার জন্য উদ্ভিদ্-বিদ্যালাভের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং সুশ্রুতে শবব্যবচ্ছেদ করিয়া অস্থিবিদ্যা শিখিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে শল্যতন্ত্র (Surgery) একটি প্রধান অঙ্গ। সুশ্রুতে যে ক্ষারপাকবিধি বর্ণিত আছে তাহা নব্য রসায়ন শাস্ত্রের এক অধ্যায় বলিয়া অবিকৃত ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু হায়, যে ভারতের পূর্ব্বকালীন ঋষিগণ জ্ঞানে ও ধর্ম্মে বর্ত্তমান জগতেরও আদর্শ, যাঁহাদের কাব্য ও দর্শন আজও সভ্য জগতের সাহিত্য মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে, যে সামগান একদিন ভারতের বন-ভবনে উচ্চারিত ও গীত হইয়া ভারতে ধর্ম্মের যুগ আনয়ন করিয়াছিল, যে তটশালিনী গঙ্গাযমুনা আবহমান-কাল হইতে কুলুকুলু নিনাদে বহিয়া, বক্ষে প্রাচীন ইতিহাস ধারণ করিয়া আজও হিন্দুস্থান পবিত্র করিয়া সাগরসঙ্গমে ধাইতেছে, সেই ভারতের, সেই পুণ্যদেশ আর্য্যাবর্ত্তের জ্ঞানরবি, দুর্ভাগ্য বংশধর আমাদিগের দোষে, অস্তমিত হইল! সত্যই কবি গাহিয়াছেন :—

"অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে
তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।"

অনুসন্ধিৎসা তিরোহিত হইল, ঔষধ সংগ্রহের জন্য উদ্ভিদ পরিচয়ের ভার বেদিয়া জাতির উপর সমর্পিত হইল। অস্ত্র চালনার দুঃসাধ্য ভার নরসুন্দরের উপর ন্যস্ত হইল। যাহা হউক, অতীতের আলোচনা ও অনুশোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আর প্রয়োজন নাই। এখন সময় আসিয়াছে।

গত কয় বৎসর বাঙ্গলা ভাষায় যে সকল বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রায় সমস্ত গুলিই পাঠ্যপুস্তক-শ্রেণীভুক্ত। দুই একখানি মাত্র সাধারণ পাঠোপযোগী। ইহা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য হইতে বিজ্ঞান স্থানচ্যুত হইয়াছে। বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ইউরোপখণ্ডে ও আসিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তে আশ্রয় লইয়াছেন। বাস্তবিক ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গলা সাহিত্যের এ প্রকার

দুর্গতি হয় নাই। বাঙ্গলা সাময়িক পত্রিকায় তখন বিজ্ঞান স্বীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। অক্ষয়কুমার "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"য় পদার্থবিদ্যা বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, রাজেন্দ্রলাল "বিবিধার্থ সংগ্রহে" ভূতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা বাঙ্গলা সাহিত্যের অস্থিমজ্জাগত হইয়া থাকিবে। বাঙ্গলা সাহিত্যে বিজ্ঞানের যাহা কিছু সমাবেশ হইয়াছে তজ্জন্য এই দুই মহাত্মার নিকট আমরা চিরঋণী থাকিব। ইঁহাদের কিছু পূর্ব্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লর্ড হার্ডিঞ্জের আনুকূল্যে Encyclopœdia Bengalensis অথবা "বিদ্যাকল্পদ্রুম" আখ্যা দিয়া কয়েক খণ্ড পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। ইহাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনতত্ত্ব সকল প্রকাশিত হইত। রাজেন্দ্রলাল ও কৃষ্ণমোহন উভয়েই অশেষশাস্ত্রবিৎ ও নানা ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন। যদিও তাঁহাদের রচনা অক্ষয়কুমারের রচনার ন্যায় স্থায়ী প্রচলিত সাহিত্যের (Classics) মধ্যে গণ্য হইবে না তথাপি তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের অভিনব পথ-প্রদর্শক বলিয়া চিরকাল মান্য হইবেন। কিন্তু ইঁহাদের পূর্ব্বেও বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারের জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের মিশনারী-গণকে বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তাঁহারাই আবার বাঙ্গলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারেরও প্রথম প্রবর্ত্তক। আমাদের জাতীয় অভিমান আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলিয়া একথা আমাদের ভুলিয়া যাইলে, কিম্বা 'খৃষ্টানী বাঙ্গলা' বলিয়া তাঁহাদের কৃত কার্য্যকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। ঐতিহাসিক, ন্যায়ের ও সত্যের তুলাদণ্ড হস্তে করিয়া যাহার যে সম্মান প্রাপ্য তাহাকে তাহা প্রদান করিবেন।

১৮২৫ খৃঃ অঃ উইলিয়ম ইয়েটস্ প্রথমে 'পদার্থ বিদ্যা সার' বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত করেন। ইহাতে পদার্থ বিদ্যা ভিন্ন মৎস্য, পতঙ্গ, পক্ষী ও অন্যান্য জীবের বর্ণনা আছে। এতদ্ভিন্ন "কিমিয়া বিদ্যাসার" নামক রসায়নবিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ শ্রীরামপুর হইতে প্রচারিত হয়। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই পুস্তকের সবিস্তার সমালোচনা করিয়াছেন। ১৮১৮ খৃঃ শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ 'সমাচার-দর্পণ' নামে সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন, এবং তাঁহারাই আবার 'দিগ্‌দর্শন' নামক নানাতত্ত্ববিষয়িনী পত্রিকা পরিচালিত করিতেন। এই পত্রিকাতেই বাঙ্গলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রথম সূত্রপাত হয়।

ইহার পর ১৮২১ খৃঃ "বিজ্ঞান অনুবাদ সমিতি" (Society for translating European Sciences) নামে একটী সমিতি স্থাপিত হয়। প্রফেসর উইলসন্ এই সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন ও উক্ত সমিতির চেষ্টায় 'বিজ্ঞান সেবধি' নামক গ্রন্থের ১৫ খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১৮৫১ খৃঃ অঃ Vernacular Literary Society নামে আর এক সমিতি স্থাপিত হয়। বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও যাহাতে বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে জ্ঞানালোক প্রবেশ করিতে পারে তদ্বিষয়ে ইহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। মহাত্মা বেথুন ও বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই সভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এতদ্ভিন্ন গবর্মেণ্ট মাসিক ১৫০৲ চাঁদা দিয়া ইহার আনুকূল্য করিতেন। এই সভার উদ্‌যোগেই ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র "বিবিধার্থ সংগ্রহ" প্রকাশ করেন। মহামতি হজ্‌সন প্রাট্ এই সমিতির স্থাপয়িতাদিগের মধ্যে অন্যতম উদ্যোগী সভ্য ছিলেন। তিনি উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার স্থূল মর্ম্ম এই :—

"বাঙ্গলার অধিবাসীদিগকে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদিতে ব্যুৎপন্ন করার আশা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং জাতীয় ভাষায় ইহাদিগের শিক্ষার পথ প্রসরতর করা কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত বাঙ্গলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। * * ইহাদের নিমিত্ত সরল সুখপাঠ্য গ্রন্থ প্রচার করিয়া পাঠলিপ্সার সৃষ্টি করিতে হইবে। জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত তৃষ্ণা বৃদ্ধি করিতে হইবে; নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে অল্পমূল্যের গ্রন্থ প্রচার করিতে হইবে। সেই সকল গ্রন্থে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও মানবশরীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সহজ ও চিত্তাকর্ষী প্রবন্ধ থাকিবে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধেও প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রচার করিতে হইবে। নীতিপ্রভৃতি উপদেশসূচক গ্রন্থ প্রচারও অতি প্রয়োজনীয়, ইহাতে সমাজের যথেষ্ট উন্নতি হইবে। এই সকল প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত সহজ ও সরল সাহিত্য প্রচার অতি আবশ্যক। এই সমিতিকে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে।" (বিশ্বকোষ)

বিজ্ঞান প্রচার সম্বন্ধে এই সমিতির আশা তাদৃশী ফলবতী হয় নাই। ১৭ খানি পুস্তক প্রকাশের পর সমিতি

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে গল্প ও আমোদজনক পুস্তকই এদেশের পাঠকসাধারণের অধিকতর প্রিয়। এতদ্‌ব্যতীত অপর শ্রেণীর পুস্তক আদৌ আদরে গৃহীত হয় না।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে কলিকাতা, হুগলী ও ঢাকা এই তিনস্থানে তিনটি নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ব্যবহারার্থ পদার্থ-বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, জ্যামিতি, ভূগোল, প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি বাঙ্গলা পুস্তক প্রণীত হয়। ইহা ভিন্ন ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষার উপযোগী পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা বিষয়ক অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মেডিক্যাল স্কুল সমূহের পাঠ্য অস্থিবিদ্যা, শরীরবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা-ঘটিত অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থও বাঙ্গলা ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ প্রচারেও যে বাঙ্গলা ভাষার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

এখন আলোচনার বিষয় এই যে অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক-কাল ধরিয়া বাঙ্গলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সকল প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু ইহাতে বিশেষ কিছু ফললাভ হইয়াছে কি না। বিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল পুস্তকের কিছু কাট্‌তি আছে তাহা Text Book Committee নির্ব্বাচিত তালিকাভুক্ত, সুতরাং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সোপান-স্বরূপ। একাদশ বা দ্বাদশ বর্ষীয় বালকাদিগের গলাধঃ-করণের জন্য যে সকল বিজ্ঞানপাঠ প্রচারিত হইয়াছে তদ্দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের ইষ্ট কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহা সঠিক বলা যায় না। আসল কথা এই, আমাদের দেশ হইতে প্রকৃত জ্ঞানস্পৃহা চলিয়া গিয়াছে। জ্ঞানের প্রতি একটা আন্তরিক টান না থাকিলে কেবল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ২।৩টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় বিশেষ ফললাভ হয় না। এই জ্ঞান-স্পৃহার অভাবেই যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত বিদ্যালয় সমূহে বহুকাল হইতে বিজ্ঞান-অধ্যাপন ব্যবস্থা হইয়াছে, তথাপি বিজ্ঞানের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ-সম্পন্ন ব্যুৎপন্ন ছাত্র আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না; কেননা ইংরাজিতে একটী কথা আছে, ঘোড়াকে জলাশয়ের নিকট আনিলে কি হইবে? উহার যে তৃষ্ণা নাই। একজামিন পাশই যেখানকার ছাত্রজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানকার যুবকগণের দ্বারা অধীত বৈজ্ঞানিক বিদ্যার শাখা প্রশাখাদির উন্নতি হইবে এরূপ প্রত্যাশা করা নিতান্তই বৃথা। সেই সকল মৃতকল্প, স্বাস্থ্যবিহীন যুবকগণের যত্নে জাতীয় ভাষার উন্নতি-বিধান কিম্বা যে কোনও প্রকার দুরূহ ও অধ্যবসায়-মূলক কার্য্যের সাফল্য সম্পাদনের আশা নিতান্তই সুদুর-পরাহত। বস্তুতঃ একজামিন পাশ করিবার নিমিত্ত এরূপ হাস্যোদ্দীপক উন্মত্ততা পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ করিয়া সরস্বতীর নিকট চিরবিদায়গ্রহণ,— শিক্ষিতের এরূপ জঘন্য প্রবৃত্তি আর কোন দেশেই নাই। আমরা এদেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া জ্ঞানী ও গুণী হইয়াছি বলিয়া আত্মাদরে স্ফীত হই, অপরাপর দেশে সেই সময়েই প্রকৃত জ্ঞানচর্চ্চার কাল আরম্ভ হয়। কারণ যে সকল দেশের লোকের জ্ঞানের প্রতি যথার্থ অনুরাগ আছে, তাঁহারা একথা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে বাহির হইয়াই জ্ঞান-সমুদ্র-মন্থনের প্রশস্ত সময়। আমরা দ্বারকেই গৃহ বলিয়া মনে করিয়াছি, সুতরাং জ্ঞান-মন্দিরের দ্বারেই অবস্থান করি, অভ্যন্তরস্থ রত্নরাজি দৃষ্টিগোচর না করিয়াই ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পঞ্জিকা পরীক্ষোত্তীর্ণগণের নামে পরিপূর্ণ দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। এক বৎসর হয়ত উদ্ভিদ্ বিদ্যায় ১০ জন প্রথম শ্রেণীতে এম্, এ, পাশ হইলেন। কিন্তু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এখানেই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল; সে সমুদায় যুবকগণকে ২।১ বৎসর পর আর বিদ্যামন্দিরের প্রাঙ্গণেও দেখিতে পাওয়া যায় না। পিপাসাশূন্য জ্ঞানালোচনার এইত পরিণাম! জাপানের জ্ঞান-তৃষ্ণা আর আমাদের যুবকগণের জ্ঞান-তৃষ্ণা এই দুই তুলনা করিলে অবাক্ হইতে হয়। প্রায় চারি বৎসর হইল আমি লণ্ডন নগরে একটী জাপ্ রসায়নবিৎএর সহিত পরিচিত হই। তিনি অনেক কষ্টকৃচ্ছ্র সহ্য করিয়া দুঃসহ দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া লণ্ডনের কোন রসায়নাগারে মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার অসামান্য দৃঢ়তার গুণে, "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই জাতীয় চরিত্রের প্রভাবে, (সত্বরই) তিনটি নূতন ধাতু আবিষ্কার করিয়া

তিনি বৈজ্ঞানিক জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি আহরণ করিয়াছেন। সম্প্রতি সঞ্জীবনীতে কোন বাঙ্গালীযুবক জাপানে পদার্পণ করিয়াই যাহা লিখিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল :—

"জাপানীদের জ্ঞানতৃষ্ণা যেরূপ, অন্য কোন জাতির সেরূপ আছে কি না সন্দেহ। কি ছোট, কি বড়, কি ধনী, কি নির্ধন, কি বিদ্বান, কি মূর্খ, সকলেই নূতন বিষয় জানিতে এতদূর আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে যে ভাবিলে অবাক হইতে হয়। জাহাজ হইতে জাপানে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে যে আভাস পাইয়াছিলাম তাহাতেই মনে করিয়াছিলাম এরূপ জাতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। * * * *

চাকরাণীগুলি পর্য্যন্ত বাহিরের বিষয় সম্বন্ধে যতটা খোঁজ রাখে আমাদের দেশের অধিকাংশ ভদ্রমহিলাই তাহা জানেন না।"

বস্তুতঃ একটু তলাইয়া দেখিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে এই সংগ্রাম—দুঃখ দারিদ্র্য অতিক্রম করিয়া জ্ঞানানুধাবনের প্রবৃত্তি, দুইটি মহীয়সী আসক্তি দ্বারা পরিপুষ্ট। এই দুইটি প্রবৃত্তির কোনটি প্রথম এবং কোনটি দ্বিতীয় ইহা নির্দ্ধারণ করা দুরূহ। জ্ঞানস্পৃহা প্রবৃত্তিদ্বয়ের একটি, জাতীয়জীবন প্রতিষ্ঠা অপরটি। এই দুইটির সমন্বয়েতেই জাপান আজ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জ্ঞানের সংগ্রামে অটুট। 'আমি উপলক্ষ্যমাত্র, দেশের ও মানব সমাজের কল্যাণ আমার মুখ্য উদ্দেশ্য, স্বদেশ আমার জগতের ইতিহাসে শীর্ষস্থান অধিকার করুক' এই বাণী জাপযুবকহৃদয়ের ধমনীতে তাড়িৎপ্রবাহ সঞ্চার করিয়াছে। এই ভাব জাতীয় জীবনে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান। বাঙ্গালার যুবক! সমগ্র ভারতের যুবক! তোমাদের হৃদয়তন্ত্রী কি এ সঙ্গীতে বাজিয়া উঠে না? তোমাদের কি জগতের জ্ঞানকোষে অর্পণ করিবার কিছুই নাই? তোমরা কি চিরকাল পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে?

এখন একবার ফ্রান্সের দিকে তাকাইয়া দেখা যাউক। ফরাসীবিপ্লবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই জ্ঞানপিপাসা কি প্রকার বলবতী হইয়াছিল তাহা বাকল (Buckle) সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। যখন লাবোয়াসিয়ে, লালাণ্ড, বাঁফো প্রভৃতি মনীষিগণ প্রকৃতির নবতত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়া সরল ও সরস ভাষায় জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন তখন ফরাসী সমাজে ধনীর রম্য হর্ম্ম্যে ও দরিদ্রের পর্ণকুটীরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে বিজ্ঞান সমিতিতে যে সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচিত হইত তাহা শুনিবার জন্য দুই চারিজন বিশেষজ্ঞ মাত্র উপস্থিত হইতেন। কিন্তু এই নূতন বার্ত্তা শুনিবার জন্য সকল শ্রেণীর লোক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। যে সকল সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ ইতর লোকের সংস্পর্শে আসিলে নিজকে অপবিত্র জ্ঞান করিতেন তাঁহারাই পদমর্য্যাদা ভুলিয়া লেকচার শুনিবার জন্য নগণ্য লোকের সহিত ঘেসাঘেসি করিয়া বসিবার একটু স্থান পাইলেই চরিতার্থ হইতেন।

সম্প্রতি এক ধুয়া উঠিয়াছে যে বহু অর্থব্যয়ে যন্ত্রাগার (Laboratory) প্রস্তুত না হইলে বিজ্ঞান শিখা হয় না। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের গ্রামে ও নগরে, উদ্যানে ও বনে, জলে ও স্থলে, প্রান্তরে ও ভগ্নস্তূপে, নদী ও সরোবরে, তরুকোটরে ও গিরিগহ্বরে, অনন্ত পরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে জ্ঞান-পিপাসুর যে কত প্রকার অনুসন্ধেয় বিষয় ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহা কে নির্ণয় করিবে? বাঙ্গলার দয়েল, বাংলার পাপিয়া, বাঙ্গলার ছাতারের জীবনের কথা কে লিখিবে? বাঙ্গলার মশা, বাঙ্গলার সাপ, বাঙ্গলার মাছ, বাঙ্গলার কুকুর, ইহাদের সম্বন্ধে কি আমাদের জানিবার কিছুই বাকী নাই? এদেশের সোদাল, বেল, বাবলা ও শ্যেওড়ার কাহিনী শুধু কি ইউরোপীয় লেখক-দিগের কেতাব পড়িয়াই আমাদিগকে শিখিতে হইবে? বনে, জঙ্গলে ও উপবনে যে সকল তরু, লতা ও গুল্ম জন্মে তাহার গ্রাম্য নাম ও পরিচয় পাইতে হইলে শতাধিক বর্ষের লিখিত রক্সবর্গের (Roxburgh) "ফ্লোরা ইণ্ডিকা" (Flora Indica) এখনও আমাদিগকে উদ্‌ঘাটন করিতে হয়। ইহা কি আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় নহে? এদেশের ভিন্ন ভিন্ন কৃষিপ্রণালী, প্রাচীন ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়াপদ্ধতি, এসবের ভিতরে কি আমাদের জ্ঞাতব্য কিছুই থাকিতে পারে না?

রসায়ন, পদার্থবিদ্যাদি শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা এবং ভূতত্ত্ববিদ্যার মৌলিক গবেষণা যে বিরাট যন্ত্রাগারের অভাবে কতক দূর চলিতে পারে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ছুরি, কাঁচি, অণুবীক্ষণ ইত্যাদি সরঞ্জাম কিনিতে ১০০৲ টাকার অধিক মূল্য লাগে না; কিন্তু গোড়াইতেই গলদ, জ্ঞানের পুণ্য পিপাসা কোথায়?

এদেশের প্রকৃতিবিদ্যার্থী যুবক দেখিয়াছেন, এখন একবার ইউরোপের প্রকৃতিবিদ্যার্থী যুবকের কথা শুনুন। বিদ্যাবিষয়ক উপকরণ আহরণের জন্য জ্ঞানপিপাসু ইউরোপীয় যুবক আফ্রিকার নিবিড় শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে প্রাণ হাতে করিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের অনুসন্ধানের নিমিত্ত আহার নিদ্রা ভুলিয়া কার্য্য করিতে থাকেন, ভোগলালসা তখন তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানপিপাসা তাঁহাদের হৃদয়ের একমাত্র আসক্তি। আপনারা অনেকেই জানেন, উদ্ভিদ্নিচয় আহরণের জন্য হুকার (Sir Joseph Hooker) ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে কত বিপদ আলিঙ্গন করিয়া হিমালয় পর্ব্বতের বহু উচ্চদেশ পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান্ রেলওয়ে হয় নাই। সেজন্য তখন হিমাচলারোহণ এখনকার মত সুগম ছিল না। তুষারমণ্ডিত মেরুপ্রদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা জানিবার জন্য কত অর্থব্যয়ে কতবার অভিযান প্রেরণ করা হইয়াছে; কত বৈজ্ঞানিক তাহাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। পাশ্চাত্যদেশের কি অদম্য উৎসাহ! কি অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা! যখন ন্যানসেন (Nansen) ফিরিয়া আসিলেন সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা তাঁহার ভ্রমণকাহিনী শুনিবার জন্য ব্যাকুল।

অতঃপর আমাদের আলোচ্য বিষয় বাঙ্গলা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য,—ইহার বর্ত্তমান অবস্থা ও ইহার ভাবী উন্নতি বিধানের উপায়-নির্দ্দেশ। তিনটি দেশের সাহিত্যের ইতিহাস এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিবে। কারণ ইতিহাসে সদৃশ ঘটনাই ঘটিয়া থাকে। যাহা জর্ম্মানীতে সম্ভবপর হইয়াছিল, যাহা রুষিয়াদেশে সম্ভবপর হইয়াছিল, যাহা জাপানেও সম্প্রতি সম্ভবপর হইয়াছে, তাহা বাঙ্গলাদেশেও সম্ভবপর হইবে। এই তিন দেশই অল্প সময়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জগতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে জর্ম্মান সাহিত্যের কি দুর্গতি ছিল! সত্য বটে, মার্টিন লুথার মাতৃভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে ইহার আদর ও চর্চ্চা বাড়াইয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যালয়ে লাটীন ও গ্রীকই অধীত হইত এবং রাজসভায় ফরাসী ভাষা চলিত ছিল। এমন কি ফ্রেডরিক্ দি গ্রেট্ মাতৃভাষা ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করিতেন। তিনি ফরাসী ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া বলটেয়ারের সমক্ষে আবৃত্তি করিতেন এবং তাঁহার নিকট একটু বাহবা পাইলে নিজকে ধন্য মনে করিতেন।

কিন্তু ফ্রেডরিকের মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যেই Schiller, Goethe, Kant, Hegel প্রভৃতি একদিকে, আবার ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে Liebig, Wohler প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ অপর দিকে জর্ম্মান ভাষাকে মহাশক্তিশালিনী করিয়া তুলিলেন। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে রুষিয়ার যে কি দুরবস্থা ছিল তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে মহামতি বাক্‌ল্ ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় এই দেশকে সুসভ্য আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই অনার্য্য জাতির ভাষা আজ আদর্শস্থানীয়। যে ভাষা রুষভল্লুকের উপযুক্ত বলিয়া উপহসিত হইত, টলষ্টয়ের ন্যায় ঔপন্যাসিক সে ভাষাকে বিবিধ আভরণে সাজাইয়া জগতের সম্মুখে সমুপস্থিত করিয়াছেন। সেই ভাষাতেই বিখ্যাত রুষ রসায়নশাস্ত্রবিৎ মেণ্ডেলীফ (Mendeleef) স্বীয় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সমুদায় লিপিবদ্ধ করিয়া ইউরোপীয় অপরাপর পণ্ডিতদিগকে রুষ ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই ত মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

অধিক কি, এসিয়া খণ্ডেই ইহার দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে জাপান কি ছিল আর আজ কি হইয়াছে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। যে সমুদায় স্বদেশপ্রেমিক বর্ত্তমান জাপান গঠন করিয়াছেন, তাঁহারা উৎসাহী, আশাস্থল যুবকবৃন্দকে প্রতীচ্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত ইউরোপে পাঠাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তৎতৎ দেশীয় পণ্ডিতদিগকে জাপানে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আনয়ন করেন। বলা বাহুল্য, যদিও উক্ত পণ্ডিতগণ স্ব স্ব ভাষার সাহায্যেই শিক্ষা প্রদান করিতেন, তথাপি শীঘ্রই সে সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। জাপান নিজের ভাষার আদর বুঝিল; বুঝিল বৈদেশিক ভাষাতে শিক্ষা কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না, বুঝিল মাতৃভাষার সৌষ্ঠবসাধন অবশ্যকর্ত্তব্য।

ফল কথা এই যে আমরা যত দিন স্বাধীনভাবে নূতন নূতন গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃভাষায় সেই সকল তত্ত্ব প্রচার করিতে সক্ষম না হইব ততদিন আমাদের ভাষার

এই দারিদ্র্য ঘুচিবে না। প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি এক প্রকার মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। যেমন ধনীর সন্তান পৈতৃক বিষয়বিভব হারাইয়া নিঃস্বভাবে কালাতিপাত করেন অথচ পূর্ব্ব-পুরুষগণের ঐশ্বর্য্যের দোহাই দিয়া গর্ব্বে স্ফীত হন, আমাদেরও দশা সেইরূপ। লেকি বলেন যে দ্বাদশ খৃঃ শতাব্দী হইতে ইয়োরোপখণ্ডে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রথম প্রবাহিত হয়; প্রায় সেই সময় হইতেই ভারতগগন তিমিরাচ্ছন্ন হইল। অধ্যাপক বেবর (Weber) যথার্থই বলিয়াছেন, ভাস্করাচার্য্য ভারতগগনের শেষ নক্ষত্র। সত্য বটে আমরা নব্যস্মৃতি ও নব্যন্যায়ের দোহাই দিয়া বাঙ্গালীমস্তিষ্কের প্রখরতার শ্লাঘা করিয়া থাকি; কিন্তু ইহা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে যে সময়ে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি মন্থন ও আলোড়ন করিয়া নবমবর্ষীয়া বিধবা নির্জ্জলা উপবাস না করিলে তাহার পিতৃ ও মাতৃ কুলের ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন কয় পুরুষ নিরয়গামী হইবে, ইত্যাকার গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন, যে সময়ে রঘুনাথ, গদাধর ও জগদীশ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ বিবিধ জটিল টীকা টিপ্পনী রচনা করিয়া টোলের ছাত্রদিগের আতঙ্ক উৎপাদন করিতেছিলেন, যে সময়ে এখানকার জ্যোতির্ব্বিদবৃন্দ প্রাতে দুই দণ্ড দশপল গতে নৈঋত কোণে বায়স কা কা রব করিলে সে দিন কিপ্রকারে যাইবে ইত্যাদি বিষয় নির্ণয় পূর্ব্বক কাকচরিত্র রচনা করিতেছিলেন, যে সময়ে এদেশের অধ্যাপকবৃন্দ "তাল পড়িয়া ঢিপ করে কি ঢিপ করিয়া পড়ে" ইত্যাকার তর্কের মীমাংসায় সভাস্থলে ভীতি উৎপাদন করিয়া সমবেত জনগণের অন্তরে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা উৎপাদন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইয়োরোপখণ্ডে গ্যালিলিও, কেপ্লার, নিউটন প্রভৃতি মনস্বিগণ উদীয়মান হইয়া প্রকৃতির নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ঘাটন পূর্ব্বক জ্ঞানজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিতেছিলেন। তাই বলি, আজ সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি নিস্পন্দ ও অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যাহা হউক, বিধাতার কৃপায় হাওয়া ফিরিয়াছে; মরা গাঙে সত্য সত্যই বাণ ডাকিয়াছে। আজ বাঙ্গালী জাতি ও সমগ্র ভারত নূতন উৎসাহে, নূতন উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত। যে দিন রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনই ভারতের সমৃদ্ধিসোপান বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন সেই দিনই বুঝি বিধাতা ভারতের প্রতি পুনরায় শুভদৃষ্টিপাত করিলেন। জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল জাতি পুরাতন আচার, ব্যবহার, জ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ে নিতান্তই গোঁড়া, যাঁহারা প্রাচীন শিক্ষার ও প্রাচীন প্রথার নামে আত্মহারা হন, যাঁহারা বর্ত্তমান জগতের জীবন্তভাব জাতীয় জীবনে সংবেশিত করা হঠকারিতা বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বর্ত্তমান কালের ইতিহাসে নগণ্য ও মৃতপ্রায়; এমন কি এই সমস্ত জাতি নূতনের প্রবল সংঘর্ষণে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ বিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই যে বর্ত্তমান ইয়োরোপের শিক্ষা অত্যল্পকাল হইল আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু আমরা ইহা যেন না ভুলি যে বর্ত্তমান অবস্থায় ইয়োরোপ আমাদিগকে যোজনাধিক পশ্চাতে ফেলিয়া বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পূর্ণোন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। আমার স্বতঃই মনে হয় আমাদের এই অধোগতির কারণ পুরাতনের প্রতি এক অস্বাভাবিক ও অনেক সময়ে অহেতুক আসক্তি এবং অপরাপর জাতির গুণাবলীর প্রতি বিদ্বেষ ও তাচ্ছিল্যের ভাব। এস্থানে অবশ্য স্বীকার্য্য যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আচারপদ্ধতি ও শিক্ষা অনেক সময়ে বর্ত্তমান সভ্যজাতিগণের আচার-পদ্ধতি হইতেও শ্রেষ্ঠ ছিল এবং সে সমুদায়ের প্রতি ভক্তিবিহীন হওয়া মূঢ়তার লক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে অনেক বিষয়ের আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে—যেমন বাহ্য জগতে, তেমনই মানসিক রাজ্যে। এস্থানে প্রশ্নটি একটু বিশদভাবে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমি আশঙ্কিত হইতেছি পাছে কাহারও মনে অপ্রীতি সঞ্চার করিয়া ফেলি; কিন্তু যদি স্বাধীন চিন্তা মানবমাত্রেরই পৈত্রিক সম্পত্তি হয় তাহা হইলে আমাকে বলিতেই হইবে যে পরকীয় শিক্ষা ও জ্ঞানের গ্রহণেচ্ছা আমাদের আদৌ নাই, যদি থাকিত তাহা হইলে অন্ততঃ বিজ্ঞান বিষয়ে বর্ত্তমান ইয়োরোপ ও আমেরিকা আমাদের অনুকরণীয় হইত। এই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য শিক্ষার সংমিশ্রণের উপরেই আমার মতে ভাবী ভারতের সমৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে। যে জাপান ত্রিংশ বর্ষ পূর্ব্বে ঘোর তমসাচ্ছন্ন ছিল, জগতে যাহার অস্তিত্ব (ঐতিহাসিক হিসাবে) সন্দেহের বিষয় ছিল, সেই জাপান

পাশ্চাত্য শিক্ষা জাতীয় শিক্ষার সহিত সংযোজন করিয়া আজ কি এক অভিনব ক্ষমতাশালী জাতি হইয়া আসিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে বিরাজ করিতেছে!

এখন জ্ঞানজগতে যেমন তুমুল সংগ্রাম, পার্থিব জগতেও ততোধিক। নূতনের দ্বারা পুরাতনের সংস্কার করিতেই হইবে, নচেৎ ভয় হয়, ভারতভাগ্যরবি প্রভাতাকাশে উঠিয়াই অস্তমিত হইবে।

দেশের দুর্গতি ও দুরবস্থার বিষয় এখন চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন যে যতদিন একদিকে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং অন্যদিকে কোটী কোটী নরনারী অজ্ঞান অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিবে ততদিন আমাদের উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার আশা খুব কম। যাঁহারা ইংরাজী ভাষা অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান শিখিতেছেন তাঁহারা অগাধ জলরাশির মধ্যে শিশিরবিন্দুর ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। মহামতি বাকল ইংলণ্ড ও জর্ম্মান দেশের শিক্ষাবিস্তার তুলনা করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে জর্ম্মানদেশে সর্ব্ববিষয়ে অসামান্য প্রতিভাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অথচ রাজনৈতিক উন্নতি বিষয়ে ইংলণ্ড অপেক্ষা পশ্চাৎপদ। ইহার কারণ এই যে জর্ম্মানদেশীয় পণ্ডিতগণ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া এমন এক "পণ্ডিতী" ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন যে তাহা কেবল সঙ্কীর্ণ "গণ্ডীর" মধ্যে সীমাবদ্ধ; সে সমস্ত উচ্চভাব সমাজের নিম্নতর স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে না! ইহার ফল এই হইয়াছে যে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় ও জনসাধারণের মধ্যে একরূপ একটী অনতিক্রম্য প্রাচীর স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডে বহুকাল হইতে বিজ্ঞানবিষয়ক সাধারণের বোধগম্য অনেক সরল পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে তাহার ভাব ও স্থূলমর্ম্ম প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। এই প্রকার শ্রেণীগত পার্থক্য আমাদের দেশে অত্যধিক প্রবল। আরও একটী কথা, আমরা এতক্ষণ ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত ও নীরেট অজ্ঞদলের কথা বলিলাম। ইহার মাঝামাঝি একদল পড়িয়া রহিলেন। অর্থাৎ যাঁহারা কেবলমাত্র সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যানে ব্রতী। ইঁহারা কলাপ ও পাণিনি; কালিদাস, মাঘ ও ভারবী; জটিল ন্যায় শাস্ত্র, এতদ্ভিন্ন বেদ, বেদান্ত ও দর্শন লইয়াই ব্যস্ত। মোটামুটি বলিতে গেলে তাঁহারা ১৫০০ হইতে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের ভারতে বাস করেন। ইহাঁদিগকে আমরা অবশ্য আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে গণনা করিতে কুণ্ঠিত হই; কিন্তু আবার ইহাঁরাই সমাজে "পণ্ডিত" উপাধিধারী এবং ইহাঁদের আধিপত্য জনসাধারণের উপর ব্রিটীশশাসন অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত ও কঠোর। এই শ্রেণীকে একেবারে বাদ দিলে চলিবে না।

কেহ কেহ বলিবেন যে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণী লোপ প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। গবর্ণমেণ্ট হইতে "উপাধি" প্রদানের যে পরীক্ষা গৃহীত হয় তাহার "আদ্য" "মধ্য" ও "উপাধি" এই তিন বিভাগে কেবল বঙ্গদেশে প্রতিবৎসর অন্যূন ৪৫০০ পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়া থাকেন। সমগ্র টোলের ছাত্র সংখ্যা ইহাপেক্ষা অনেক অধিক। অতএব দেখা যাইতেছে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানের গ্রন্থ সকল প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইলে এমত সহস্র সহস্র ইংরাজী অনভিজ্ঞ পাঠক পাঠিকাগণের হাতে পৌছিবে যাহা ইংরাজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থের পক্ষে কদাচ সম্ভব নয়। অবশ্য যাঁহারা বিজ্ঞান চর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিয়া মৌলিকতত্ত্ব নির্ণয় ও গবেষণায় সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিবেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা ইংরাজী কেন জর্ম্মান ও ফরাসী ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীও পাঠ করিতে বাধ্য হন।

আমাদের বলার উদ্দেশ্য এই যে যাঁহারা "শিক্ষিত" বলিয়া অভিহিত তাঁহাদের বিজ্ঞানের মূল তাৎপর্য্যগুলি জানা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে অর্থাৎ আধুনিক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই বিজ্ঞানশাস্ত্রসম্বন্ধীয় সাধারণ বিষয়গুলি মোটামুটি জানা বিশেষ আবশ্যক।

এখন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিব। জাপানিরা জর্ম্মনি ও রুষিয়ার ন্যায় যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মাতৃভাষায় প্রচার করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহারা মধ্য পথ অবলম্বন করিয়াছেন অর্থাৎ মৌলিক গবেষণা সমূহ ইংরাজি ও জর্ম্মান ভাষায় প্রকাশিত করেন, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে বিজ্ঞানের নানাবিধ মূলতত্ত্ব প্রচার হইতে পারে তজ্জন্য মাতৃভাষা

অবলম্বন করিয়াছেন। ইয়োরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য থাকিলেও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রায় একই; সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগতে একই পরিভাষা হইলে যে কতদূর সুবিধা হয় তাহা নির্ণয় করা যায় না। জাপানিরা এই সুবিধা টুকু হৃদয়ঙ্গম করিয়াই মধ্য পথ অবলম্বন করিয়াছেন; আমাদেরও তাহাই অবলম্বনীয়, কেননা, উক্ত জাতির অবস্থার সহিত আমাদের অবস্থার বিশেষ সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান।

ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সৃজন করা সাহিত্য-সম্মিলনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আহ্লাদের বিষয়, কয়েক বৎসর যাবৎ সাহিত্যপরিষৎ এ বিষয়ে যত্নবান হইয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহোদয়গণ তজ্জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় সাময়িক পত্রিকায় যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন তাহাতেও এ বিষয়ে সহায়তা হইতেছে। নাগরী-প্রচারিণী সভা ভূগোল, খগোল, অর্থনীতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতি ঘটিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংকলন করিয়াছেন। পরলোকগত জগন্নাথ স্বামী তেলেগু ভাষায় রসায়নশাস্ত্র বিষয়ক একখানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন ও তাহাতে সংস্কৃতমূলক অনেক পরিভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। সম্প্রতি Vernacular Text Book Committee বাঙ্গলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সংকলন করিয়াছেন এবং আশা করা যায় সাহিত্য সম্মিলনও এই অধিবেশনে একটি বিশেষজ্ঞের সমিতি (Committee of Experts) নিয়োজিত করিয়া কি ভাবে পরিভাষা গৃহীত হইবে তাহার নিষ্পত্তির উপায় বিধান করিবেন।

বর্ত্তমান সাহিত্য সম্মিলনের অনুষ্ঠাতাগণ বাংলা সাহিত্যকে সাধারণ সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্য এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া শেষোক্ত বিভাগের কার্য্যক্ষেত্র British Association for the Advancement of Learning and Scienceএর আদর্শে যে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন তাহা সদ্যুক্তি বলিয়া বোধ হয়। মানবতত্ত্ব (Anthropology), পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, লোকতত্ত্ব (Ethnology), ভূগোল, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা, উদ্ভিদ্-বিদ্যা, ভূ-বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা হইয়া যাহাতে তৎ তৎ বিষয়ক গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত হয় তজ্জন্য আমাদিগকে সুচেষ্ট হইতে হইবে। আশা করি এই অধিবেশনে রাজসাহী বিভাগের লোকতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই একটি সারবান প্রবন্ধ পঠিত হইয়া ইহার সূচনা হইবে। অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় এই যে রাজসাহীর কয়েকজন কৃতবিদ্য সন্তান পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে নূতন পথ দেখাইয়া আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের পাত্র হইয়াছেন। বাঙ্গালী যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া ইতিহাস রচনা করিতে সক্ষম, সিরাজদ্দৌলা প্রণেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয় তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছেন। আমার বন্ধু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার ইয়োরোপ ও ভারত-বর্ষের নানাস্থান হইতে বহু দুর্লভ পারসী পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সেই সকল মন্থন করিয়া রত্নাবলী আহরণ করিতেছেন। তিনি যে সমুদায় বিবরণ লিখিতেছেন তাহা পাঠ করিতে করিতে আমি অনেক সময়ে আত্মবিস্মৃতি লাভ করিয়াছি এবং নিজকে কল্পনায় অনেক সময়ে ঔরঙ্গজেব বাদসাহের সমকালীন বলিয়া মনে করিয়াছি। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ মহৎকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন এবং মোগলরাজ্যের বিশাল ইতিহাস লিখিয়া মাতৃভাষার সৌষ্ঠব সাধন করেন, ঈশ্বরের নিকট ইহাই আমা-দিগের আন্তরিক প্রার্থনা। আমাদিগের সম্মিলনের একজন প্রধান উদেযাক্তা শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় "মানব-সমাজের ক্রমবিকাশ" প্রভৃতি শীর্ষক যে সকল প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন তদ্দারা বাঙ্গলা সাহিত্যের একটী অভাব মোচন হইবার সূচনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল বহু-পরিশ্রমে মুসলমান বৈষ্ণবদিগের প্রাচীন পদাবলী সংগ্রহ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের মহদুপকার সাধন করি-য়াছেন।

আজ আমরা নূতন জাতীয় জীবনের প্রাসাদের প্রথম সোপানে দণ্ডায়মান। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে দেশে 'জাতীয় জীবন' ইত্যাদি আশা ও উৎ-সাহের কথা অলীক ও কবিকল্পনা-প্রসূত উন্মাদোক্তি বলিয়া বিবেচিত হইত, যে দেশ স্বদেশপ্রেম বলিয়া

কথা বহু শতাব্দী যাবৎ বিস্মৃত ছিল, যে দেশ মাতৃভাষা ভুলিয়া এতদিন বৈদেশিক ভাষাকে শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বার বিবেচনা করিত, সেই দেশে আজ কি এক অপূর্ব্ব ভাব আসিয়া মৃত প্রাণে কি এক অমৃত বারি সিঞ্চন করিয়া সঞ্জীবিত করিল। যে যুবকগণের কাষ্ঠহাসি দর্শনে পূর্ব্বে আশঙ্কার উদ্রেক হইত, যে দেশের প্রৌঢ়গণের মিতব্যয়িতা আত্মপ্রবঞ্চনামূলক বলিলে অত্যুক্তি হইত না, আজ কি এক অপূর্ব্ব ঈশ্বরপ্রেরিতভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই যুবক সরসবদনে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল, সেই প্রৌঢ় ব্যক্তি লোকসেবায়, জাতীয় শিক্ষায় অকাতরে বহুকষ্টসঞ্চিত অর্থ নিয়োগ করিল। ইহা কি আশার কথা নহে—ইহা ভাবিলেও কি প্রাণে শক্তি সঞ্চারিত হয় না? দুই বৎসর পূর্ব্বে যে বাঙ্গালী যুবক পিতামাতার স্নেহক্রোড় ত্যাগ করিয়া অথবা নবপরিণীতা ভার্য্যাকে ছাড়িয়া বৈদেশিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য দূরদেশে যাইতে কুণ্ঠিত হইত, আজ জানি না কি এক অদৃষ্টপূর্ব্ব, অচিন্ত্যপূর্ব্ব ভাবে প্রোৎসাহিত হইয়া জন্মভূমিকে গৌরবান্বিত করিতে সেই যুবক বিদেশযাত্রা করিল। তাই বলিতেছিলাম আজ আমরা জাতীয় জীবনের সোপানে দণ্ডায়মান—আজ নূতন আশা, নূতন উদ্দীপনার দিন!

বাঙ্গলায় এমন দীনহীন কাঙ্গাল হতভাগ্য কে আছ ভাই, যে আজ বিধাতার মঙ্গলময় আহ্বানে আহুত হইয়া মাতৃভূমির ও মাতৃভাষার আরতির জন্য নৈবেদ্যোপচার লইয়া সমুপস্থিত না হইবে? ধনি! তুমি তোমার অর্থ লইয়া, বলি! তুমি তোমার বল লইয়া, বিদ্বান! তুমি তোমার অর্জ্জিতবিদ্যা লইয়া—সকলে সমবেত হও।

আজ আমরা যুগসন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। সমস্ত ভারত আজ আমাদিগের দিকে সোৎসাহনেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে, স্বর্গ হইতে পিতৃপুরুষ আমাদের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিতেছেন। আজ আমরা জাতীয় জীবনের এমন একস্তরে দণ্ডায়মান যেখানে আমাদের সম্মুখে দুইটি মাত্র পথ, একটী অনন্ত অমরত্বের অপরটি অনন্ত অকীর্ত্তির, মধ্যপথে আর কিছুই নাই। আজ যদি আমরা তুচ্ছ আয়াসে মজিয়া ভবিষ্যৎ প্রেরিত এই মহাভাব উপেক্ষা করি, ভবিষ্যৎ বংশাবলী আমাদিগকে বিশ্বাসঘাতক উপাধিতে কলঙ্কিত করিবে, ভারতাকাশের উদীয়মান রবি উষার উন্মেষেই, হায়, আবার অস্তমিত হইবে।

কিন্তু আজ আশার দিন, আজ উদ্দীপনার যুগ। বাঙ্গলা এ আহ্বান উপেক্ষা করে নাই—সতীশচন্দ্র ও রাধাকুমুদের ন্যায় বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী যুবক, সুবোধচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রকিশোর, সূর্য্যকান্ত, মনীন্দ্রচন্দ্র, তারকনাথ, যোগেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতি ধনাঢ্যগণ যে দেশের জাতীয় শিক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর ও মুক্তহস্ত, সে দেশ নিশ্চয়ই উঠিবে—সে দেশের ভাষা ও বিজ্ঞান কখনই উপেক্ষিত থাকিবে না। যাহাতে অধীতবিদ্য, বিজ্ঞানবিদ্ ছাত্রগণ বৃত্তিলাভ করিয়া অন্নচিন্তা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ও অনন্যমনে বিজ্ঞানচর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিয়া বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা দেশের সেবায় মনপ্রাণ নিয়োগ করিতে পারে এমন উপায় নির্দ্ধারণ করুন। সৌভাগ্যক্রমে এখন কৃতবিদ্য ও নিষ্ঠাবান ছাত্রের অভাব নাই। তাহারা বিলাসবিভ্রমের প্রত্যাশী নহে। যাহাতে তাহাদের সাংসারিক অভাব মোচন হয় ও তাহারা একান্ত মনে বিজ্ঞান সেবায় ব্রতী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করুন। জ্ঞান জাতীয় জীবনের উৎস। এই উৎসের পরিপুষ্টি সাধনের জন্য আবার ভারতে নিষ্কাম জ্ঞানচর্চ্চা প্রবর্ত্তিত হউক।

পরিশিষ্ট।

১

ইং ১৯০১—১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ।

বিষয়	১৯০১	১৯০২	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫	১৯০৬	১৯০৭
জীবনী	২৫	১৮	১৯	২২	১৫	১৫	২০
ইতিহাস	২০	৪১	১৮	৪২	২৭	২৬	৩১
ভাষা ও ব্যাকরণ	২১২	২১৮	১৭৭	১৫১	১১১	১০১	৬৪
দর্শন ও নীতিবিজ্ঞান	২	৪	৩	৩	১	৩	৩
Arts	১১	২৫	১৪	১৯	১৬	৩০	২২
নাটক	৬২	৬৭	৪৭	৬৩	৬২	৭৪	৩৯
উপন্যাস	৮৪	১১০	১০২	৮৫	৯১	১১০	১২৩
পদ্য	১২০	১২০	৮৭	৮৪	৭৫	৯৩	৫৫
ধর্ম্ম	৩৪৮	৪০০	৩০১	২৮৯	২২৩	২৯৪	২৩৩
চিকিৎসা	৫০	৬৮	৪১	৬০	৬০	৭৩	৬১
আইন	১৬	২৭	১৬	১৫	১৩	৭	১১
রাজনীতি	...	...	...	১	...	...	...
বিজ্ঞান	৩২	২৩	১৯	১৩	১৭	১৩	১০
বিজ্ঞান (গণিত বিভাগ)	৪২	৬২	৪৫	৪৪	২৫	১৮	৩৩
ভ্রমণ	১	১	৪	৪	৩	৩	...
বিবিধ	৫১১	৫৭৭	৪৬৩	৫৭৪	৬৪৫	৬৪৭	৪৮৪
মোট	১৫৩৬	১৭৬১	১৩৫৬	১৪৬৯	১৩৮৪	১৫০৭	১১৮৯

২

ইং ১৯০১—১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত মুসলমানী বাঙ্গালা পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ।

বিষয়	১৯০১	১৯০২	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫	১৯০৬	১৯০৭
জীবনী	১	...	...	...	...	...	...
ইতিহাস	...	১	...	৩	২	১	...
উপন্যাস	১৭	১৭	১১	১৪	৪	৫	...
ধর্ম্ম	১৯	১৭	১১	১৯	৯	৬	৭
ভাষা ও ব্যাকরণ	...	...	...	১	...	...	...
বিবিধ	২৭	১৫	৫	১২	১	৫	১
মোট	৬৪	৫০	২৭	৪৯	১৬	১৭	৮

	সমস্ত প্রকাশিত পুস্তক	বাঙ্গালা পুস্তক	শতকরা বাঙ্গালা পুস্তক	শতকরা বাঙ্গালা ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক	বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক পুস্তক	স্কুলপাঠ্য বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক পুস্তক	শতকরা স্কুলপাঠ্য বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক পুস্তক
১৯০১	৩০৬৯	১৫৩৬	৫০·০৪	২২·৬৫	৭৪	৬২	৮৩·৭৮
১৯০২	৩৩৬৬	১৭৬১	৫২·৩১	২২·৭১	৮৫	৭৪	৮৭·০৫
১৯০৩	২৮৮৭	১৩৫৬	৪৬·৯৬	২২·১৯	৬৪	৬৪	১০০
১৯০৪	৩০৫৪	১৪৬৯	৪৮·১০	১৯·৬৭	৫৭	৫৭	১০০
১৯০৫	২৮০০	১৩৮৪	৪৯·৪০	১৬·১১	৪২	৪২	১০০
১৯০৬	৩৪৪০	১৫০৭	৪৩·৪০	১৯·৫০	৩১	২৯	৯৩·৫৪
১৯০৭	২৯৯৫	১১৮৯	৩৯·৬৯	১৯·৫৯	৪৩	৪১	৯৯·৯৯

ভারতের সার কথা।

জগৎবাসী মনুষ্যমাত্রেই জানেন, ভারতবর্ষ, আত্মাব্যতীত আর কিছুকে কখনো সত্য ব'লে স্বীকার করে নাই। এই এক-সত্য বা আত্মাই ভারতবর্ষের মর্ম্ম, এই এক-সত্য বা আত্মাতে নিষ্ঠাই ভারতবর্ষের ধর্ম্ম, এবং এই এক-সত্য বা আত্মার প্রতিষ্ঠাই ভারতবর্ষের কর্ম্ম। আত্মার পূজা ব্যতীত, আত্মাকে স্বীকার করা ব্যতীত, আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা ব্যতীত যোগৈশ্বর্য্যের লীলাভূমি, অদ্বিতীয় সত্যের প্রকাশক্ষেত্র, আত্মার প্রতিষ্ঠাস্থান, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ উদ্ধারের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। যে মুহূর্ত্তে সমস্ত ভারতবাসী একত্র সমবেত হ'য়ে, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ধনী, দরিদ্র, রুগ্ন, সুস্থ, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, রাজা, প্রজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শ্রেষ্ঠ-কর্ম্মী, নিকৃষ্ট-কর্ম্মী সকলের অন্তরে বাহিরে প্রত্যক্ষ প্রকাশমান এই চৈতন্যময় আত্মাকে অন্তরে বাহিরে স্বীকার করিবে সেই মুহূর্ত্তে ভারতবর্ষ বা ভারতবাসী অন্তরে বাহিরে মুক্তি লাভের দ্বারা জ্ঞানে ধন্য, ভাবে ধন্য, কর্ম্মে ধন্য হ'য়ে আপনাকে বা মনুষ্যজাতিকে বা জগতকে পরম কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

শ্রীহেমলতা দেবী।

বৌদ্ধযুগ ও ভাস্করাচার্য্য।

বিগত মাঘ মাসের "প্রবাসীতে" শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একস্থলে দেখিলাম, তিনি লিখিয়াছেন,—

"বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের অন্তরের স্বাধীনতা বিনাশ প্রাপ্ত হইল; তার সাক্ষী বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে ভাস্করাচার্য্য, চরক, সুশ্রুত, পতঞ্জলি প্রভৃতি বড় বড় লোক যাঁহারা জন্মিয়াছিলেন, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিনাশের পর তাঁহাদের ন্যায় স্বাধীন-চিত্ত প্রতিভাশালী লোকের প্রাদুর্ভাব রহিত হইয়া যাওয়াতে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের উন্নতির পথে জন্মের মত কাঁটা পড়িয়া গেল। আমাদের দেশে যখন অন্তরের স্বাধীনতা এইরূপ বিনাশ পাইল, তখন বাহিরের স্বাধীনতা বিনাশ পাইতে বড় বেশী বিলম্ব হইল না।"

আমার দুর্ভাগ্যক্রমে বৌদ্ধ সাহিত্যের আলোচনা করিবার সুযোগ আমি কখনই প্রাপ্ত হই নাই। এই কারণে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা নাই এবং সেই জন্যই বৌদ্ধধর্ম্মের বিনাশের সহিত ভারতীয় পরাধীনতার কি সম্পর্ক তাহা অবধারণ করিতে আমি অসমর্থ হইতেছি। যে সকল ঐতিহাসিকের রচনা আমার নেত্র-পথবর্ত্তী হইয়াছে সেই সকল ঐতিহাসিক দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষের পরাধীনতার সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের বিনাশের সংস্রব প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করেন নাই। কাজেই শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিজেন্দ্র বাবুর ঐ কথাটী আমার নিকট নিতান্ত নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে এবং সেই জন্যই আমি এ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে উত্যক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। দ্বিজেন্দ্র বাবু স্বভাবসিদ্ধ উদারতা-গুণে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্যটী বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবার ক্লেশ স্বীকার

করিলে আমি অত্যন্ত অনুগৃহীত হইব—“প্রবাসীর” পাঠকেরাও উপকৃত হইবেন।

আমাদিগের দেশে ধর্ম্মসাহিত্য ও দর্শন-শাস্ত্রাদি বিষয়ে যাঁহারা গ্রন্থরচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বংশপরিচয় ও আবির্ভাব কালাদির নির্ণয় করা নিতান্তই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কালিদাসের ন্যায় অপেক্ষাকৃত অধুনাতন কালের প্রসিদ্ধ কবিরও প্রকৃত পরিচয় জানিবার কোন উপায় নাই। যে রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব এ দেশে এত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে তাহা যে কালিদাসেরই রচিত তাহার কোন নিদর্শন গ্রন্থমধ্যে বিদ্যমান নাই। সেকালের সাত্ত্বিকপ্রকৃতি গ্রন্থকারেরা স্বরচিতগ্রন্থে আপনাদিগের নামও সকল সময়ে সংযুক্ত করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন। এরূপ অবস্থায় চরক, সুশ্রুত, প্রভৃতি গ্রন্থ কোন্ সময়ে, কাহার উৎসাহে, কিরূপ অবস্থায় রচিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। ঐ সকল গ্রন্থ এদেশে ঋষি প্রণীত বলিয়াই প্রসিদ্ধ। “ঋষি প্রণীত” বলিলে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে প্রণীত—ইহাই সাধারণতঃ সকলে বুঝিয়া থাকেন। পতঞ্জলি ও কাত্যায়নের আবির্ভাবকাল যেরূপ বহুপরিমাণে নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, চরক ও সুশ্রুতের সময় সেরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে কি? তাঁহারা যে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এরূপ মনে করিবার কি কারণ আছে? (১)

ভাস্করাচার্য্যকে দ্বিজেন্দ্র বাবু কোন্ প্রমাণের বলে “বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে” আবির্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ভাস্করাচার্য্য স্বরচিত সিদ্ধান্ত শিরোমণির শেষে লিখিয়াছেন—

> রস-গুণ-পূর্ণ-মহী (১৩০৬) সম শকনৃপ সময়েঽভবন্ মমোৎপত্তিঃ।
> রসগুণ (৩৬) বর্ষেণ ময়া সিদ্ধান্তশিরোমণী রচিতঃ॥ ৫৮
> গোলেপ্রশ্নাধ্যায়ে।

সৌভাগ্যক্রমে এদেশের জ্যোতিষী সম্প্রদায় আপনাদিগের পরিচয়দান বিষয়ে বিশেষ কুণ্ঠা প্রকাশ করিতেন না। তাই আমরা তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই আবির্ভাবকাল অনায়াসে নির্ণয় করিতে পারি। জ্যোতির্ব্বিদ ভাস্করাচার্য্য উদ্ধৃত শ্লোকে বলিয়াছেন যে, ১৩০৬ শকাব্দে (১১১৪ খ্রীঃ) তাঁহার জন্ম ও ৩৬ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে (১১৫০ খ্রীঃ) সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থ রচিত হয়। তিনি মহারাষ্ট্র দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীধর আচার্য্য তত্রত্য যাদববংশীয় মহারাজ জৈত্র পালের (১১৯১—১২১০ খ্রীঃ) সভাপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন (মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রি-প্রকাশিত সিদ্ধান্ত শিরোমণির ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। যিনি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে আবির্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত?

ভাস্করাচার্য্যের “করণ কুতূহল” নামক গ্রন্থের প্রারম্ভাব্দ নির্দ্দেশস্থলে ১৩৭৫ শকাব্দের (১১৮৩ খ্রীঃ) উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহার পর কতদিন ভাস্করাচার্য্য জীবিত ছিলেন তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। ইতিহাসে দেখিতে পাই ১১৯১ খ্রীঃ (অর্থাৎ ভাস্করাচার্য্যের করণকুতূহলের রচনা আরম্ভ হইবার ৮ বৎসর পরে) মহম্মদ ঘোরীর সহিত হিন্দু নরপতিদিগের প্রথম সংঘর্ষ ঘটে। সুতরাং ভাস্করাচার্য্যের দেহোপরম ও মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণ প্রায় সমসাময়িক ঘটনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়।

এখন দেখা যাউক, যে মহারাষ্ট্র দেশে ভাস্করাচার্য্য জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই মহারাষ্ট্র দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব কোন্ সময়ে কিরূপ ছিল। ঐতিহাসিকেরা বলেন, মহাবংশ ও দীপবংশ নামক বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে যে, মহারাজ অশোকের সময়ে মহারাষ্ট্র দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য বহুসংখ্যক বৌদ্ধাচার্য্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই উল্লেখ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাষ্ট্র দেশে সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা হয় বলিতে হইবে। এই চেষ্টার ফলে তথায় ব্রাহ্মণ প্রাধান্য মূলক হিন্দুধর্ম্মের কতদূর প্রতিপত্তি লোপ পাইয়াছিল তাহা দেখা যাউক। ডাঃ রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকার মহাশয় “দক্ষিণাপথের প্রাচীন ইতিহাস” (Early History of the Deccan) নামক গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন,—

> Brahmanism also flourished side by side with Buddhism. In the inscription at Nasik in which

(১) ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় চরকসংহিতার রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বুদ্ধদেব চরকের প্রায় সামসময়িক।

Ushavadata dedicates the cave monastery excavated at his expense for the use of the itinerant "priests of the four quarters," he speaks, as we have seen, of his many charities to Brahmans. The same notion as regards these matters prevailed then as now. Ushavadata fed a hundred thousand Brahmans as the Maharaj Sindia did about thirty years ago. It was considered highly meritorious to get Brahmans married at one's expense then as now. Gotamiputra also, in the same inscription which records a benefaction in favour of the Buddhists, is spoken of as the only protector of Brahmans and as having like Ushavadata put them in the way of increasing their race. Kings and princes then appear to have patronized the followers of both the religions and in none of the inscriptions is there an indication of an open hostility between them.

উপরি উদ্ধৃত অংশে—যে উষবদাতের উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দীর প্রথম পাদে ও গোতমীপুত্র ঐ শতাব্দীর ২য় পাদে মহারাষ্ট্র দেশে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের সময়ে মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যমূলক হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের অপেক্ষা কোন অংশে হীনপ্রভ ছিল না। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখনও ব্রাহ্মণকে ভোজন ও দক্ষিণা দান করা পরম পুণ্য-কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে প্রকাশ্য শত্রুতার কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যাইত না। খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দীর অবস্থা সম্বন্ধে ডাক্তার ভাণ্ডারকার এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর শেষ ভাগে—মহারাষ্ট্র দেশে চালুক্যবংশীয় নরপতিদিগের প্রাধান্য ছিল। বিগত মাঘ মাসের প্রবাসীর ৫৪৪ পৃষ্ঠায় পুরাতত্ত্ববিদ ভিন্‌সেণ্ট্ স্মিথ্ মহোদয়ের যে মন্তব্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তদনুসারে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে উত্তর ভারতে গুপ্ত বংশীয় নরপতিদিগের প্রাদুর্ভাব কালে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যমূলক হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয় ও বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি আরম্ভ হয়। মহারাষ্ট্রেও চালুক্য বংশের রাজত্ব কালে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি ও পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে ছিল। ডাক্তার ভাণ্ডারকার ঐ সময়ের অবস্থাবর্ণন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

No inscription has yet come to light showing any close relations between the Buddhists and the Chalukya princes. But that the religion did prevail, and that there were many Buddhist temples and monasteries, is shown by the account given by Hwan Thsang. Still there is little question that it was in a condition of decline. With the decline of Buddhism came the revival of Brahmanism and especially of the sacrificial religion. The prevalence of the religion of Buddha had brought sacrifices into discredit; but we now see them rising into importance. Pula-Kesi I is mentioned in all the inscriptions in which his name occurs as having performed a great many sacrifices and even the Asvamedha. I have elsewhere remarked that the names of most of the famous Brahmanical writers on sacrificial rites have the tittle of Svamin attached to them; and that it was in use at a certain period, and was given only to those conversant with the sacrificial lore. The period of the early Chalukyas appears to be that period...........The ritual of the sacrifices must during the previous centuries have become confused, and it was the great object of these writers to settle it by the interpretation of the word of the old Rishis. And the Puranic side of Brahmanism also received a great development during this period...............The Chalukyas like their predecessors in previous times, were tolerant towards all religions.

এখানেও দেখিতেছি বৌদ্ধধর্ম্মের উপর কোন প্রকার অত্যাচার না করিয়া চালুক্য রাজগণ পৌরাণিক ও বৈদিক ধর্ম্মের উন্নতি-সাধন করিয়াছিলেন এবং "পৃথ্বীরাজের আমলে অশ্বমেধের অলীক আড়ম্বর, মৃত্যু-শয্যা হইতে গাত্রোত্থান" করে নাই—খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভেই উহা পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। বহু সংখ্যক যাগযজ্ঞের বিশেষতঃ অশ্বমেধের অনুষ্ঠানকারী পুলকেশী খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম যে এই সময়ে অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছিল তাহা ডাক্তার ভাণ্ডারকার মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

চালুক্য বংশের পর—রাষ্ট্রকুট বংশের আবির্ভাব হয়। এই রাজবংশ ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রে রাজত্ব করেন। ইঁহাদিগের শাসন-সময়ে পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রভাব অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল।—

Under them the worship of the Puranic Gods rose into much greater importance than before. The days when Kings and Princes got temples and monasteries cut out of the solid rock for the use of the followers of Gotama Buddha had gone by, never to return.

Instead of them we have during this period temples excavated or constructed on a more magnificent scale and dedicated to the worship of Siva and Vishnu. Several of the grants of this Rashtrakuta princes praise their bounty and mention their having constructed temples.

ইহার পর হইতে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য-মূলক হিন্দুধর্ম্মের ক্রমোৎকর্ষ ঘটিতে থাকে। এবং তাহারই শেষ অবস্থায় ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় মনীষীর জন্ম হয়। উল্লিখিত বৃত্তান্ত হইতে দৃষ্ট হইবে যে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভেও মহারাষ্ট্রদেশে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য-মূলক হিন্দুধর্ম্মের প্রতিপত্তি বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন ছিল না। সেকালের রাজারা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি সমধিক পক্ষপাত বা বিরাগ প্রকাশ করিতেন না। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব হ্রাস পাইতে থাকে। ঐ সময় হইতে ভাস্করাচার্য্যের সময় পর্য্যন্ত প্রায় ৭ শত বৎসর কাল হিন্দুধর্ম্মের প্রবলতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে ভবভূতির ন্যায় মহাকবি হইতে আরম্ভ করিয়া ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ব্বিদ পর্য্যন্ত নানা শ্রেণীর স্বাধীনচিত্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তি ঐ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বরাহ-মিহিরের জন্ম যে দেশেই হইয়া থাকুক তিনি পূর্ব্বোক্ত নবীন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব-কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আর্য্যভট্ট খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে (অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতন ও পৌরাণিক ধর্ম্মের অভ্যুদয় আরম্ভ হইবার শতাধিক বর্ষ পরে) পৃথিবীর দৈনন্দিন গতির আবিষ্কার করিয়া অমরত্ব-লাভ করেন। কালিদাস যদি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক হন, তাহা হইলে তাঁহাকেও নব ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অভ্যুদয়-কালে আবির্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। বাণভট্ট, সুবন্ধু, দণ্ডী প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের অধিকাংশ প্রসিদ্ধ লেখক এই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অভ্যুদয়-কালেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ বর্ত্তমান কালের ও মধ্যযুগের মধ্বাচার্য্যের নিকট অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অতি অল্প লোকেই অন্যমত প্রকাশ করিবেন। শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদ মহারাষ্ট্রদেশে প্রচারিত না হইলে ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর চেষ্টা সফল হইত কিনা সন্দেহ। সেই শঙ্করাচার্য্য নব ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অভ্যুদয় আরম্ভ হইবার প্রায় ৪ শত বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সহিত ভারতবাসীর স্বাধীন প্রতিভা-অবনতি-কল্পনা কতদূর সুসঙ্গত? বিশেষতঃ ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় ব্যক্তির অভ্যুদয়কে বৌদ্ধপ্রভাবের ফল বলিয়া বর্ণনা করা কতদূর যুক্তিসিদ্ধ? আশাকরি শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এবিষয়ে আমার সংশয় নিবৃত্তি করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন।

বঙ্গসাহিত্যের আর একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সাহিত্যগগন অন্ধকার করিয়া অনন্তে বিলীন হইয়াছে। সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে নবীনচন্দ্র আর নাই।

সে আজ ৩৫ বৎসরের কথা। তখন বাঙ্গালাসাহিত্যের রেনাশাঁসের (Renaissance) অর্থাৎ পুনর্জন্মের সময়। বঙ্গসাহিত্যের কার্লাইল রাজনারায়ণ বসু ইহাকে বঙ্কিমের কাল বা বঙ্গদর্শনের যুগ বলিয়াছেন। তখন বাঙ্গালীর চক্ষে এক অদ্ভুত বিস্ময় জন্মাইয়া ও যেন কোন নূতন বিশ্বের বিচিত্র সংবাদ লইয়া বাঙ্গালীর মুমূর্ষু প্রাণে এক নূতন আশার সংবাদ বহন করিয়া বঙ্গদর্শন আবির্ভূত হইয়াছে। বঙ্গদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদর্শনের মহারথীরা একে একে উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্মণ্ডিত গ্রহরাজির মত ফুটিয়া উঠিয়াছেন। একে বঙ্গদর্শনের অদ্ভুতকর্ম্মা সম্পাদকই স্বয়ং মহারথী—একা এক সহস্র—রবীন্দ্রনাথের কথায় "আর্ত্ত বঙ্গভাষা" যখন যেখানে ডাকিয়াছে, তখন সেখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার সহকারীরাও যেরূপ বুদ্ধিকুশলী—বিধি-বিড়ম্বিত এ হতভাগ্য দেশে কেন, কোন স্বাধীন প্রতীচ্য সাহিত্যের কোনো গৌরবময় যুগেও এরূপ অদ্ভুতকর্ম্মা সাহিত্যরথীদের একত্রে একাধারে সমাবেশ বিরল। প্রাচ্য-শাস্ত্রকোবিদ্ ডাক্তার রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, গ্রীক ও হিন্দু প্রণেতা প্রফুল্ল বাবু, কবিবর হেমচন্দ্র, পদ্মিনী কাব্যের রচয়িতা রঙ্গলাল বন্দ্যো, সম্পাদকের অগ্রজ, যাঁহার সহজ মর্ম্মস্পর্শী বর্ণনা ও ভাষা বাঙ্গলার রচনায় আদর্শ হইয়া রহিয়াছে সেই কলাকুশলী সঞ্জীব বাবু,

অক্ষয় বাবু, যিনি "গ্রাবু" লিখিয়া সম্প্রতি বিখ্যাত হইয়াছিলেন, উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম রচয়িতা চন্দ্রশেখর, "শক্তি-কানন" রচয়িতা ও বঙ্গদর্শনের সহকারীসম্পাদক শ্রীশ বাবু, ইত্যাদি কত রথীরই আর নাম করিব—তখনকার বঙ্গসাহিত্যের রথীদের অভ্যুদয়ের তুলনায় হেমচন্দ্রের কথায় বলিলে বলিতে হয় "পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ!" তখন উদীয়মান বঙ্গসাহিত্যের সেই মহারথীদের রচনা বক্ষে করিয়া সেই প্রতীচ্য ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা-প্লাবিত বঙ্গীয় যুবকের অনেক বৈঠকখানা গৃহের আন্দোলন স্রোত সম্পূর্ণ বিভিন্নখাতে অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তন করিতেছিল—দুর্গেশনন্দিনী তখন কিছুদিন আগেই প্রকাশ হইয়া বঙ্গীয় উপন্যাস জগতে এক বিস্ময়কর যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। চন্দ্রশেখর সেই বৎসরেই বঙ্গদর্শনে বাহির হইতেছে। সেই সময় আয়তনে ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারে, গ্রন্থকারের নাম নাই, কলিকাতা পার্থিব যন্ত্রে মুদ্রিত 'অবকাশরঞ্জিনী' নামধেয় একখানি ক্ষুদ্র গীতিকাব্য বঙ্গদর্শনের সম্পাদকের হস্তে সমালোচনার জন্য পৌছিল।

বলা বাহুল্য, কবি ইতিপূর্ব্বেই বঙ্কিমের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। প্রতিভার বিকাশে ভাবী কালে যাঁহারা বঙ্গীয় সাহিত্যে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন তাঁহাদের গুণগ্রহণে বঙ্গদর্শন কখনই উদাসীন ছিল না। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমী সার্টিফিকেট যাঁহারা পাইলেন তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে সেদিন হইতেই যশস্বী হইলেন—এ অনন্যদুর্লভ সৌভাগ্য ও ক্ষমতা আর কোনো বঙ্গীয় মাসিক পত্রের ভাগ্যে ঘটে নাই। শুনা আছে যে "এডিনবরা রিভিউ" যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন সম্পাদক জেফ্রি, মেকলে, লকহার্ট, সিড্‌নি স্মিথ, নিউম্যান্ প্রভৃতি রচনারসিকদের (Stylist) লেখার গুণে তদানীন্তন লেখকেরা নিজ নিজ ক্ষমতানুসারে পুরস্কার বা তিরস্কার লাভ করিতেন—উক্ত রিভিউয়ের সম্পাদক ও লেখকেরাই যেন তদানীন্তন ইংরাজী সাহিত্যের রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন। অতিমাত্র লোকপ্রিয় গ্রন্থও "এডিনবরার" লেখকদের সম্মার্জ্জনার পর একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে এরূপও দেখা গিয়াছে—দ্বাদশ সংস্করণ অতীত মণ্টগমারির (জেম্‌স নহে রবার্ট) "Satan" কাব্য তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সব সময়ে যে রিভিউয়ের কশাঘাত উপযুক্ত স্থলে প্রযুক্ত হইত তাহা নহে; অভিজ্ঞ পাঠকেরা Keatsএর Hyperionএর কথা স্মরণ রাখিবেন। কিন্তু বঙ্গদর্শনের কীর্ত্তিউদ্ভাসিত ললাটে এরূপ দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা কখনও কেহই অর্পণ করিতে পারে নাই।

সে যাহা হউক, নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জিনী ১২৮০ সাল অর্থাৎ ২য় বৎসরের বঙ্গদর্শনে বৈশাখ সংখ্যায় সমালোচিত হয়। উক্ত অনুকূল সমালোচনায় কবি একেবারে সাধারণ্যে পরিচিত হইলেন। সে অবধি বঙ্গদর্শনেও "শ্রীন—" স্বাক্ষর বিশিষ্ট কবিতার রচনা নৈপুণ্যে বঙ্গীয় পাঠকেরা বিস্ময়চমকিত হইতেন। তাহার পর বর্ষে পলাশীর যুদ্ধ সমালোচিত হইয়া নবীনচন্দ্রকে বঙ্গ-সাহিত্যের অতি উচ্চস্থানে স্থাপন করিয়াছিল।

তাহার পর তাঁহার পরবর্ত্তী রচনাগুলি এ ত্রিশ বৎসরে তাঁহার যৌবনে অর্জ্জিত যশঃ ক্রমশঃ অধিকতর উজ্জ্বল করিয়াছে মাত্র।

বঙ্গসাহিত্যে নবীনচন্দ্রের স্থান কোথায়? বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে তিনি কোন্ কোন্ অমূল্য রত্নরাজি প্রদান করিয়াছেন, উহারা কি কি গুণে অমূল্য তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে আলোচনার এস্থান ও সময় নহে। ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তাহার যথাযথ বিচার করিবেন—এরূপ বিচার করিতে আমরা সম্যক্ কৃতকার্য্যও হইব না। মহাকবির প্রতিভা অভ্রংলিহ গগনচুম্বী শৈলশিখরের তুল্য। উত্তুঙ্গশৃঙ্গবিহারী চমরী ও মৃগযূথের অনুসরণকারী কিরাতেরা শৃঙ্গের উচ্চতা নিরূপণে সমর্থ, কিন্তু গিরির তলভাগে যাহারা, মেঘস্পর্শী শিখরদেশের অভ্রমণ্ডিত রহস্যকুহেলিকা, তাহার অস্তমান রবিময়ূখের ঐন্দ্রজালিক বর্ণচ্ছটা, তাহার উষার মুকুটজ্যোতিঃ ও প্রান্তলীন বর্ণরাগের প্রতি প্রলুব্ধ প্রশংসমান নেত্রে চাহিয়া থাকেন মাত্র, সেই দুরারোহ শৈলরাজির মহিমা নিরূপণে তাঁহারা সম্পূর্ণ অসমর্থ। কবিবরের সমকালবর্ত্তী আমাদের অনেকটা সেই দশা। তথাপি এক্ষেত্রে অক্ষম হইলেও তাঁহার অমর কার্য্যের একটী সংক্ষিপ্ত আভাস দেওয়া আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

অবকাশরঞ্জিনী তাঁহার প্রথম ও শেষ গীতিকাব্য। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের রচনা হইতে

রবীন্দ্রনাথের সুমধুর গীতিকাব্যের মর্ম্মস্পর্শী ঝঙ্কারে বঙ্গসাহিত্যগগন পরিপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র অবকাশরঞ্জিনীর সমালোচনায় স্থলে গীতিকাব্যের কথার ব্যাখ্যায় বলিয়াছিলেন যে গীতের যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও যদি সেই এক উদ্দেশ্য হয় তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা মাত্র গীতিকাব্য। বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্র, মাইকেল, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ সকলেই ত গীতিকাব্য রচনা করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ সমশ্রেণীর রচনায় নবীনচন্দ্রের বিশেষত্ব কোথায়? সংক্ষেপে বলিতে গেলে বোধ হয় নবীনচন্দ্রের গীতিকাব্যে বিশেষত্ব তাঁহার ভাষার সবল পৌরুষতায়, তাঁহার শব্দচাতুর্য্যে এবং উক্ত শব্দের প্রয়োগ পটুতায়। রবীন্দ্রনাথের সহিত এ বিষয়ে তুলনা করিলে বিষয়টী আরও স্পষ্ট হইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত স্থানে বলিয়াছিলেন যে অবকাশরঞ্জিনীর কবির শব্দচাতুর্য্য ও ছন্দোমাধুর্য্য বিস্ময়কর। আত্মচিত্তসম্বন্ধীয় উক্তিমাত্রবিশিষ্ট অব্যক্তব্য কথা, যাহা গীতিকাব্যের আত্মা, তাহাতেও নবীনচন্দ্রের কম পটুতা নাই। কোনো পক্ষের অপ্রিয় তুলনা করা এস্থলে আদৌ সমুচিত নহে। তবে বলিলে অন্যায় হয় না যে বর্ত্তমান গীতিকাব্য সাহিত্যে ছন্দোমাধুর্য্য ও গীতিকাব্যোপযোগী শব্দ চয়নে রবীন্দ্রনাথ যে বিস্ময়কর পটুতা দেখাইয়াছেন তাহা ভারতচন্দ্র ব্যতীত বাঙ্গালায় আর কোনো কবিই সেরূপ দেখাইতে পারেন নাই, নবীনচন্দ্রও নহে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষা কোমল, পৌরুষভাববর্জ্জিত, (তাঁহার বর্ত্তমান স্বদেশী সঙ্গীত বলিতেছি না) যেন কোমলকায় লতার ন্যায় লতাইয়া পড়িতেছে। নবীনচন্দ্রের আর গীতিকবিতা নাই—তাঁহার ইহা পূর্ব্বের রচনা হইলেও যে সকল মোহিনীসৃষ্টিগুণে বা যে সব অপূর্ব্ব রসের সফল অবতারণায় কবির কাব্যকে উচ্চ আসন প্রদান করা যায় সে সব গুণ অবকাশরঞ্জিনীতে নাই, অবকাশরঞ্জিনীর সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র একথা বলিয়াছিলেন।

"পলাশীর যুদ্ধে"র ভাষা আরও সুস্পষ্ট, সুব্যক্ত, ও সবল—বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় "জ্বালাময়ী অগ্নিতুল্যা।" উহা বায়রণের অগ্ন্যুদ্গারের মতই তীব্র ও উগ্র। কবি যেন একাব্যে আপনাকে যথার্থ খুঁজিয়া পাইয়াছেন। এরূপ সবল ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গী হেমচন্দ্র ব্যতীত অন্য কোনো বঙ্গ কবির কাব্যে পাওয়া দুষ্কর। এই আগ্নেয় গিরিয় অগ্নিস্রাবের সঙ্গে করুণামন্দাকিনীর পূত ধারা বহিয়া চলিয়াছে। বহুবৎসর পূর্ব্বে পলাশীর যুদ্ধ পড়িয়াছি—কিন্তু এখনও তাহার দর্পিত "ব্রিটিশের রণবাদ্য" কানে লাগিয়া আছে। বস্তুতঃ, সংগ্রামে সংগ্রামস্থল ও বিজয়ীর জয়োল্লাস নবীনচন্দ্রের মত এমন অদ্ভুত পটুতার সহিত বাঙ্গালীর কাব্যে আর কেহও শুনাইতে পারেন নাই—রণস্থলের ভীষণ সর্ব্বসংহারিণী মূর্ত্তি কে সম্যক কল্পনা করিতে পারিয়াছে?—সেখানে অবশ্যম্ভাবী বিজয়ে উৎফুল্ল সেনার দর্পিত উল্লাস ধ্বনি শুনিব, না সেই অনন্ত মুহূর্ত্তে সৈনিকের বিরহকাতর অন্তঃকরণের ব্যথা—'প্রিয়ে কেরোলাইনার' উদ্দিষ্ট মর্ম্মোচ্ছ্বাসের কথাগুলি শুনিব, না সেনাপতির প্রণয়িনী 'মেস্কিলিনের' উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট অশ্রুর মুক্তাবিন্দুর প্রতি লক্ষ্য করিব, না নির্জ্জন কারাগারে পতিব্রতা নবাবপত্নীর 'কেন দুঃখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল'—এ হৃদয়দ্রাবী গীতিতে গলিয়া যাইব? পলাশীযুদ্ধের কবি বিস্ময়কর কৌশলসহকারে এই দুই রসের একত্রে অপূর্ব্ব সমাবেশ করিয়াছেন। বীরের হৃদয়ের বহিরাবরণ কেবল কঠিন, তাঁহার চর্ম্মবর্ম্মাচ্ছাদিত হৃদয় কিন্তু করুণ ভাবরসে কোমল, কবি একথা ভুলেন নাই।

রঙ্গমতী, পলাশীর ও রৈবতকের, এ দুই রচনার সন্ধিস্থল—এ কাব্যের প্রতিছত্রে কবি যেন আভাস দিতেছেন যে তিনি বিষয়ান্তরে ও স্থানান্তরে ব্যাপৃত থাকিবেন—To-morrow to fresh fields and pastures new—কৃষ্ণের জীবন ও কাব্য ভবিষ্যতে যে তাঁহার সঙ্গীতের বিষয় হইবে—এ গ্রন্থে তাহার পূর্ণ আভাস আছে। তাহা ছাড়া, গ্রন্থের অনেক স্থলের বর্ণনা ও শব্দচিত্র মনে লাগিয়া থাকে। এ গ্রন্থও বহুপূর্ব্বে পড়িয়াছি—অনেকবার পড়িয়াছি—সকল কথা এস্থলে সমালোচনার দরকার নাই—তবে জুমিয়া বালার গীতি 'যে দেশে রয়েছ তুমি' ইত্যাদি এখনও ভুলিতে পারি নাই। সে সুন্দর গীতটী বঙ্গ সাহিত্যে এপর্য্যন্ত অননুকরণীয় হইয়া আছে। কবির যে উদ্দেশ্য পলাশীর যুদ্ধে প্রতীয়মান—পর জীবনে কবি যেন সে ক্ষেত্রই পরিত্যাগ করিলেন। অনেকে এ পরিবর্ত্তন সুখের বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন—অনেকে

আবার মনে করেন—যে পরবর্ত্তী কাব্যে যেন কবির অবনতি হইয়াছে তাঁহার মানসিক তন্তুচ্ছেদ হইয়াছে কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয় এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। পলাশীক্ষেত্রে যে বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মবিদ্রোহ ভারতের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়াছে—কবি তাঁহার দূরদৃষ্টিতে অতীতের ভারতীয় সমস্ত ঐতিহাসিক রণক্ষেত্র খুঁজিয়া দেখিলেন—সেই একই লোককাহিনী সেই ভ্রাতৃদ্রোহ সেই গৃহবিবাদ, সেই বিশ্বাসঘাতকতা। ইহাতে একটা মীরজাফর ও একটা জয়চন্দ্র কেবল ধরা পড়ে নাই। তাহার পর সুদূর অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে আর কোন মহাপুরুষ এই "ক্ষত ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে" এক মহা ধর্ম্মরাজ্যে স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন কিনা। তাঁহার মানস চিত্রপটে কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল মূর্ত্তিই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সেই বরেণ্য মূর্ত্তিকে সম্মুখে রাখিয়া কবি তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন। সুতরাং যে জাতীয়ভাব পলাশীর যুদ্ধে বিকশিত, সেই ভাবের ধারাবাহিকতা কুরুক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পরিরক্ষিত বলিয়াই বোধ হয়।

তবে এই সমশ্রেণী চারি খানি কাব্যের সমালোচনা যোগ্যতর ব্যক্তি করিয়াছেন—যিনি মাননীয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়ের কুরুক্ষেত্রের সমালোচনা পাঠ করিয়াছেন তাঁহার আর এ সম্বন্ধে কোনো কথা অধিক জ্ঞাতব্য নাই। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ও এসময়ে কবির সকল কাব্যের বিস্তারিত আলোচনা, বিশেষতঃ দোষের আলোচনা, আদৌ সমীচীন হইবেনা বিবেচনায় আমরা প্রাসঙ্গিকভাবে তাঁহার কাব্যের এরূপ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি। প্রবন্ধান্তরে ও সময়ান্তরে তাঁহার জীবন ও কাব্যের বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। তবে সেই অসাধারণ মহাকবি কোন্ গুণে অসাধারণ ছিলেন, বঙ্গীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে অন্যান্য মহাজনের ন্যায় তিনি বিশেষ কোন্ রত্নদান করিয়া গেলেন সে সম্বন্ধে আভাস না দিলে এ প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। বঙ্গসাহিত্যে নবীনচন্দ্রের সে বিশেষ দান কি ?—আমাদের ক্ষুদ্র বোধে সেটী এই—তিনি অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে কবিজনোচিত সূক্ষ্ম ভবিষ্যদ্দৃষ্টির গুণে ভারতের ভবিষ্য ইতিহাসের এক আভাস দিয়া গিয়াছেন। কোন্ পথে কি ভাবে চালিত হইলে ভারতের পূর্ব্ব জ্ঞানগরিমা, পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য বীর্য্য, পূর্ব্ব ঋদ্ধিসিদ্ধি ফিরিয়া আসিবে—এক কথায় কোন্ পথে চালিত হইলে আবার ভারত 'মহাভারতে' মহাধর্ম্মসাম্রাজ্যে পরিণত হইবে, কবি তাঁহার চিত্রিত কৃষ্ণচরিত্রে সে পথের পূর্ণ ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা বোধ করি ইহাই তাঁহার বিশেষ দান। বঙ্গীয় সাহিত্যের অনুরাগী অনেক বিজ্ঞ পাঠকদেরও নিকট কবির শেষোক্ত কাব্যত্রয় রৈবতক; কুরুক্ষেত্র, প্রভাস সমাদৃত হইতে দেখি নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি তাঁহারা এস্থলে কবির মানসিক তন্তুচ্ছেদের আশঙ্কা করেন। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে আশঙ্কা কতদূর অমূক। বস্তুতঃ তাঁহারা যেখানে কবির প্রতিভার গৌরবের হানি দেখিতে পান সেখানেই তাঁহার প্রতিভার সার্থকতা। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নব্যভারত সম্পাদক মহাশয় ও হীরেন্দ্র বাবুর মধ্যে কৃষ্ণচরিত্রের মৌলিককল্পনা লইয়া অনেক বাকবিতণ্ডা হইয়াছিল। এ স্থলে সে তর্কের পুনরবতারণা নিষ্প্রয়োজন। এস্থলে সে আলোচনা করিব না—তবে উভয়ের কল্পনায় যে এক ফল—সেই ফল, সেই উদ্দেশ্য, এই মহাভারত পুনঃসংস্থাপনকর্ত্তা কৃষ্ণের অবতার-বাদ সংস্থাপন। কুরুক্ষেত্রের ১ম সর্গে ব্যাসের মুখে এ উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত হইয়াছে। ব্যাস সংশয়ী শিষ্যকে ভারত ও ধর্ম্মেতিহাসের অনেক নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যায় বুঝাইতেছেন :—

"——কর দরশন।
সর্ব্বত্র ধর্ম্মের গ্লানি অধর্ম্ম প্রবল,—
সাধুদের হাহাকার, দুষ্কৃত দুর্জ্জন
বর্ষিতেছে নিরন্তর পাপ হলাহল।
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, এই পাপভার
করিতে মোচন, বৎস! করিতে প্রচার
মহারাজ্য ধর্ম্মরাজ্য, করিতে প্রচার
ভারতে মহাভারত ; কৃষ্ণ অবতার।
অপূর্ব্ব জীবনলীলা! কংসের নিধন,
উগ্রসেনে রাজ্যদান, আত্মনির্ব্বাসন,
নিবারিতে রক্ত স্রোত সমুদ্রের পার।

সেই জরাসন্ধবধ, অদ্ভুত কৌশল,—
কারামুক্তি, রাজমেধ যজ্ঞ নিবারণ;
রাজসূয়ে পাণ্ডবের সাম্রাজ্য প্রবল
বিনা যুদ্ধে কি কৌশলে হইল স্থাপিত!
সর্ব্বত্র নির্লিপ্ত কৃষ্ণ, সর্ব্বত্র নিষ্কাম,
সর্ব্বত্রই দয়াধর্ম্ম আদর্শ মহান্।"

নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ ভারতবর্ষকে—

বাঁধি ধর্ম্ম নীতিপাশে
মিলাইব অনায়াসে
জননীর খণ্ড দেহ; করিয়া চালিত
জ্ঞানাঙ্কুশে, ভেদ জ্ঞান করিব রহিত।
শিখাব একত্ব মর্ম্ম,—
এক জাতি, এক ধর্ম্ম,
এরূপে করিব এক সাম্রাজ্য স্থাপন,
সমগ্র মানব প্রজা, রাজা নারায়ণ!"

এইরূপ এক বিশাল মহাভারত, এক বিরাট্ ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য গঠিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন—ইহার ফল কুরুক্ষেত্র, ইহার ফল 'ভূতলে অতুল' ধর্ম্মশাস্ত্র গীতা, ইহার ফল ব্রাহ্মণ্যের আবহমানকাল প্রতিষ্ঠিত একদেশিতা বিনাশ, ইহার ফল আর্য্য অনার্য্যের যুগান্তর ব্যাপী সংঘর্ষের ধ্বংস ও ইহার চরম অমৃতময় ফল কুরুক্ষেত্রের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার ভস্মস্তূপ হইতে এক মহা ধর্ম্মসাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান।

নবীনচন্দ্র এই বিশাল চিত্রফলকে মহর্ষি ব্যাসের পূতপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, যে সব বিশাল চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাও ঐরূপ বিশাল, বিরাট, উচ্চ—'যেন স্পর্শে দিনমণি!' শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, সুভদ্রা, শৈলজা, অভিমন্যু, উত্তরা, জরুৎকারু,—প্রত্যেকটী উজ্জ্বল সুস্পষ্ট, সুব্যক্ত, প্রত্যেকটী নিজের স্বাতন্ত্র্যে পূর্ণ অভিব্যক্ত। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন, সেই নরনারায়ণের বিশালোজ্জ্বল চিত্রপট যেন চিত্রফলক ছাপাইয়া উঠিয়াছে, বর্ণ এতই উজ্জ্বল! নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ স্বজাতিপ্রীতি ও দেশকালের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়া বিশ্বসংসারকে এক ধর্ম্মসাম্রাজ্যে গড়িতে চাহিয়াছেন, সে সাম্রাজ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র, আর্য্য অনার্য্য, নীচ উচ্চের কোনো ভেদাভেদ নাই—জাতি ও দেশের সঙ্কীর্ণতা এক মহান্ সার্ব্বজনীন সার্ব্বভৌমিক ভাবে বিলীন হইয়া গিয়াছে। তাই রৈবতকে শ্রীকৃষ্ণের মুখে কবি বলাইয়াছেন যে—

"ফলাফল নারায়ণ পদে সমর্পিয়া
এই কর্ত্তব্যের স্রোতে যাইব ভাসিয়া।
এক ধর্ম্ম, এক জাতি,
এক রাজ্য, এক নীতি,
সকলের এক ভিত্তি সর্ব্বভূতহিত;
সাধনা নিষ্কাম ধর্ম্ম,
লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম,
একমেবাদ্বিতীয়ম্!—করিব নিশ্চিত
ওই ধর্ম্মরাজ্য মহাভারত স্থাপিত।"

দেখুন হেমচন্দ্র যাহার "একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে" ইত্যাদি বাক্যে আভাস দিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র পুরাণেতিহাস সিন্ধু মন্থন করিয়া যে অমূল্য কৌস্তভনিধি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, নবীনচন্দ্রের অমৃতময়ী লেখনী সে কল্পনাকে অপূর্ব্ব জ্যোতি-বিমণ্ডিত করিয়া বঙ্গীয় পাঠকের নেত্রসমীপে উপস্থিত করিয়াছেন। ইহাই কবির শ্রেষ্ঠ—ইহাই কবির বিশেষ দান—এক্ষণ ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা বিচার করুন—নবীনচন্দ্রের স্থান কোথায়? কত উচ্চে!

ইদানীন্তন কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি আর বঙ্গসাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ট যোগ রাখেন নাই—শান্তসমাহিতচিত্তে জীবনের শান্তিময় পরিসমাপ্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া-ছিলেন। নিজ প্রিয় গ্রামে—প্রিয়তম পরিবারবর্গে পরি-বেষ্টিত হইয়া তিনি জীবনলীলা শেষ করিবেন ইহা তাঁহার অনেক দিনের আশা ছিল। তাঁহার সম্প্রতি প্রকাশিত আত্মজীবনচরিতে তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন যে এই দুঃখময় জীবনমরুতে বাল্যে যাঁহাদের হারাইয়াছিলেন, সেই জনকজননীর সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষার জন্য তিনি সতৃষ্ণ নয়নপাত করিয়া আছেন। কে আশা করিয়াছিল যে তাঁহার সে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ভগবান এত শীঘ্রই পূর্ণ করিবেন! কে জানিত যে এত শীঘ্রই আমরা তাঁহাকে হারাইব! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত মধুর লীলা বর্ণনে ও নাম কীর্ত্তনে, একবার হেলায় শ্রদ্ধায় যে নাম গ্রহণ করিলে ঋষি বলিয়াছিলেন যে আমরা এ দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারি—'সকৃদপি পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়াবা'—সেই

শ্রীহরির লীলা বর্ণনা করিয়া নিজের জীবন ভক্তিময় করিবেন, এটা তাঁর শেষ জীবনের ঐকান্তিক আশা ছিল। তিনি সে কার্য্যে কতদূর সক্ষম হইয়াছেন ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তাহার বিচার করুন। কিন্তু এ কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে তিনি আমাদের দুঃখিনী বঙ্গভাষাকে যে অমূল্য রত্নহারে ভূষিতা করিয়া গিয়াছেন—সে রত্নে সমৃদ্ধা বঙ্গভাষা সগর্ব্বে বিদেশীকে আপনার রত্নপেটিকা উন্মোচন করিয়া দেখাইতে পারিবেন, ও যত দিন বঙ্গসাহিত্য, বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালী বাঁচিয়া থাকিবে তত দিন নবীনচন্দ্রের নাম স্বর্ণ অক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে ও কবি নবীনচন্দ্র "যশঃস্বর্গে অম্লান বরমাল্য ধারণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের অমরগণের সহিত একাসনে বাস করিতে থাকিবেন।"

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

উপেক্ষিত।

প্রভাতে সাজায়ে পাত্রে ধূলিকণাহীন
বহুদিন সাধনার পূজা উপচার
লইয়া আসিনু যবে দেবতার পদে,
ব্যাকুল বাসনাভরে দিতে উপহার,
দেখিনু সহসা হ'ল মন্দিরের দ্বার
রুদ্ধ, হায়! চাপি শ্বাস দাঁড়ানু কাতরে।
উপহাসি তীব্রস্বরে যেন বার বার
রুদ্ধদ্বার শব্দধ্বনি ধ্বনিল গম্ভীরে।
উপেক্ষিত মত আমি রহিনু বাহিরে
নীরব নিরাশাখানি সাথে লয়ে মম।
গভীর স্তব্ধতারাশি শিয়র উপরে
জাগিয়া রহিল স্থির অভিশাপসম।
শুনিনু অর্চ্চনাবাণী মদির অধীর
উঠিছে মন্দির মাঝে ভক্তপ্রাণ হ'তে।
আমার প্রার্থনা ব্যর্থ দুরাশার মত
কাঁদি উঠে প্রতিহত রুদ্ধ দ্বার পথে।
দেখিনু আরতি দীপে উজ্জ্বল মন্দির,
আমার পূজায় সেথা নাহি শুধু স্থান।
আশীষ বচন শত ধ্বনিছে গম্ভীর
নীরব বেদনা খানি শুধু পেনু দান।
প্রভাত-আলোক-হাসি ক্রমে গেল নিবে,
সন্ধ্যার ছায়াটি নামি এলো ধীরে ধীরে;—
নিরর্থ তপস্যামত মন্দির বাহিরে,
আমার অর্চ্চনা খানি র'ল শুধু প'ড়ে।

লজ্জাবতী বসু।

চিত্রপরিচয়।

গত ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে মান্দ্রাজে ভারতবর্ষীয় সমাজসংস্কার সভার যে অধিবেশন হয়, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত শঙ্করন্ নায়ার তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার মূর্ত্তি বর্ত্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত হইল।

নয়জন নির্ব্বাসিত বাঙ্গালীর মধ্যে কয়েকজনের ছবি আমরা ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার ছবি দিলাম।

ওস্তাদ রামমূর্ত্তি।

আজকাল সকলের মুখেই রামমূর্ত্তি ওস্তাদের নাম ফিরিতেছে। রামমূর্ত্তি অশেষ বলশালী পুরুষ। তিনি বহু প্রদেশে আপনার বলের পরিচয় দিয়া সংপ্রতি বাংলা দেশে আসিয়াছেন। নিম্নে আমরা তাঁহার পরিচয় সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

ইঁহার পূরা নাম শ্রীযুক্ত রামমূর্ত্তি নাইডু। ইঁহার পিতার নাম মৃত নারায়ণ স্বামী নাইডু রায় বাহাদুর। ইনি বিজিয়ানাগ্রামের পুলিস ইন্সপেকটর ছিলেন। রামমূর্ত্তির যখন মাত্র দুই বৎসর বয়স তখন তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। ৩।৪ বৎসর হইল তাঁহার পিতারও ৪৫ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। এই হিসাবে ওস্তাদ রামমূর্ত্তির বয়স বেশি নয়। তাঁহাকে দেখিলে ত্রিশ বৎসরের অধিক বয়স্ক বোধ হয় না। ইঁহারা মান্দ্রাজ প্রদেশের অধিবাসী।

বাল্যকালে রামমূর্ত্তি রোগা ছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁর হাঁপানি রোগ হয়। চুরট ব্যবহার করিয়া সে রোগ সারিয়া গিয়াছে। সেই সময় তিনি প্রাথমিক

পাঠশালায় পড়িতেন। তৎপরে উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। সেই শৈশবে ভীম, হনুমান প্রভৃতি পৌরাণিক বীরগণের কাহিনী শুনিয়া তাঁহার বললাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। দশ বৎসর বয়সে স্কুলের ব্যায়ামের আখড়ায় ভর্ত্তি হন। সেখানে তিনি সকল রকম খেলায় যোগ দিতেন। এই সময়ে প্রসিদ্ধ কুস্তিগীর গোলাম ও অপরাপর পালোয়ানের খ্যাতি তাঁহাকে অধিকতর উত্তেজিত করে। তদনন্তর ব্যায়ামের প্রকার ও সময় বাড়িতে থাকে। দুই বৎসর স্যাণ্ডোর ডাম্বেল কসরতে কোনো ফল না পাইয়া তাহা ত্যাগ করেন এবং সতর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জিমন্যাষ্টিক করেন। তখন বিদেশী রীতি ছাড়িয়া দেশী ব্যায়াম ডন, বৈঠক প্রভৃতি অবলম্বন করেন। এই সময়ে তিনি এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়িয়া কিঞ্চিৎ ইংরাজি ও সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করেন। তিনি সুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে এই সত্য আবিষ্কার করেন যে বলাধান ও শরীর পুষ্টির একমাত্র উপায় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ, মনোযোগ দিয়া এমন কোনো ব্যায়াম করা আবশ্যক যাহাতে সর্ব্বশরীরের পেশী সুগঠিত হইয়া উঠে। পেটের পেশী পুষ্ট করিতে প্রাণায়াম করিতে হয়।

স্যাণ্ডোর ব্যায়ামরীতি ঠিক এইরূপ। স্প্রিঙের ডাম্বেল কসরতকারীকে সর্ব্বদা আপন কর্ম্মের দিকে সচেতন রাখে, ব্যায়াম অভ্যাসগত হইয়া পড়ে না। পেটের পেশী গঠনের জন্য শুইয়া উঠিয়া বসার যে কসরত তাহা যোগেরই একটি অঙ্গ, আমাদের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। স্যাণ্ডোর বলসাধনের মূলমন্ত্রও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ। এই নিয়মে রামমূর্ত্তি যে কেন সফলতা ও সন্তোষ লাভ করেন নাই বলা যায় না।

ওস্তাদ রামমূর্ত্তি প্রত্যহ ভোর তিনটা হইতে বেলা নয়টা পর্য্যন্ত ব্যায়াম করেন, তাহার মধ্যে বারো মাইল পথ না থামিয়া না জিরাইয়া দৌড়ানো প্রধান। আজ কাল খেলা দেখানো ছাড়া আর অন্য সময়ে ব্যায়াম করেন না।

স্যাণ্ডো এদেশে আসার পর তাঁহার মনে কসরত দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জনের ইচ্ছা হয়। প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ যখন এদেশে আসিয়াছিলেন তাঁহার সম্মুখে রামমূর্ত্তি প্রথম আপনার বলের পরিচয় দেন। তদবধি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরিয়া আপনার শক্তিলীলা দেখাইতেছেন। সমগ্র ভারতভ্রমণ শেষ করিয়া ওস্তাদজীর বিলাত যাইবারও বাসনা আছে।

মধ্যাহ্নে একটার সময় একপোয়া চালের ভাত ও তদুপযুক্ত ডাল তরকারী ইহাঁর প্রধান আহার, মাছমাংসে ইহাঁর রুচি নাই। খাওয়ার সময় অল্প ঘি খান, দুধ খান না। প্রাতে নয়টার সময় 'ঠাণ্ডাই' সরবত পান করেন। এই সরবত তৈয়ারার প্রক্রিয়া এইরূপ—বাদাম, মৌরী, গোলমরিচ, দুটি ছোটএলাচ, সর্ব্ব মোট একসের সারারাত জলে ভিজানো থাকে। প্রভাতে ছাঁকিয়া পিশিয়া চিনির সহিত সরবত হয়। এই সরবত পানের আধঘণ্টা পরে খানিকটা মাখন আহার হয়। বৈকাল চারটার সময় আবার ঠাণ্ডাই সরবত, এক পোয়া গৃহপ্রস্তুত রাবড়ি এবং ঘিচিনিমধু মিশ্রিত পানীয় গরম করিয়া পান করেন। ঘি ও মধু মিশ্রিত হইলে বিষ হয়, বৈদ্যক শাস্ত্রের মত। মধু গরম করিলেও বিষ হয়। এই দ্বিবিধ বিষ হজম করা বিষম ক্ষমতাবান পাকস্থলীর কাজ সন্দেহ নাই।

ওস্তাদজীর বক্ষস্থলের বেড় সাধারণত ৪৮ ইঞ্চি; বিস্ফারিত অবস্থায় ৫৭ ইঞ্চি। খাড়াই ৫ ফুট ৬½ ইঞ্চি। ওজন ২½ মণ।

ইনি আপনার বলের পরিচয় নিত্য শত শত লোকের সম্মুখে দিতেছেন। মাথা ও পা দুইটি কাঠের উপর রাখিয়া সমস্ত শরীরটা শূন্যের উপর লম্বা করিয়া একটা পুলের মত শয়ন করেন। সেইরূপ অবস্থায় বুকের উপর পাথর চাপাইয়া দুইজন পলোয়ান দুইটা লোহার প্রকাণ্ড হাতুড়ি মারিয়া সেই পাথর চুরমার করিয়া দেয়। ওস্তাদজী মাটিতে উপুড় হইয়া শুইলে ছয়জন পলোয়ানে একখানা প্রকাণ্ড পাথর গড়াইয়া আনিয়া কষ্টে স্বষ্টে তাঁহার পিঠের উপর চাপাইয়া দেয় এবং সেই পাথরের উপর আরো তিনখানা বড় বড় পাথরের টালি রাখিয়া হাতুড়ির আঘাতে একে একে তিনখানা টালিই ভাঙা হয়। তার পর সব লোক সরিয়া গেলে প্রকাণ্ড পাথরখানা ওস্তাদজী পিঠ হইতে আপনিই ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেন। ওস্তাদজী চিত হইয়া শয়ন করেন। দুখানা গোরুর গাড়ী লোকে পরিপূর্ণ করিয়া তাঁহার বুকের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়, একটা চাকা বুকের

উপর দিয়া আর একখানা উরুর উপর দিয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা বলের পরিচয় ঘাড়ের জোরে মোটা লোহার শিকল ছেঁড়া এবং ১২ ঘোড়ার জোরের চলন্ত মোটর গাড়ী পিছন হইতে টানিয়া তাহার গতিবেগ রোধ করিয়া থামান। ইনি স্যাণ্ডোকে বল পরীক্ষায় আহ্বান করিয়াছিলেন, স্যাণ্ডো কিন্তু সে আহ্বান গ্রহণ করেন নাই।

ওস্তাদ রামমূর্ত্তি সমগ্র ভারতবাসীর দুর্ব্বল অখ্যাতি দূর করিয়াছেন। বাঙালীর 'ভেতো' অপবাদও মোচন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন ভাত খাওয়াই দুর্ব্বলতার কারণ নহে। মনের বলই প্রধান বল। ওস্তাদ রামমূর্ত্তি শীঘ্রই তাঁহার ব্যায়ামরীতির এক পুস্তক ইংরাজিতে লিখিয়া প্রকাশ করিবেন। পরে ভারতীয় সর্ব্বভাষায় তাহার অনুবাদ হইবে।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ওস্তাদ রামমূর্ত্তিকে অভিনন্দন করিতেছি। তাঁহার বিজয় ভারতেরই বিজয়।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

গণেশ ও বেদব্যাস।

মুখপত্ররূপে যে রঙিন চিত্রখানি সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা উদীয়মান চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের একখানি সুন্দর চিত্রের প্রতিলিপি। মৌলিক চিত্রখানি দেখিবামাত্রই হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত উডরফ উহা লইয়া স্বদেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হন। তিনি অনুগ্রহ করিয়া সেই চিত্রের যে ফটোগ্রাফ লইতে দিয়াছিলেন তাহারই সাহায্যে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় এই সুন্দর রঙিন প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। মূল চিত্র সম্মুখে না থাকাতেও চিত্রপ্রতিলিপি অতি সুন্দর ও প্রায় মূলানুগত হইয়াছে। কেবল বেদব্যাসের কাপড়ের রং গৈরিক না হইয়া প্রায় লাল হইয়া গিয়াছে।

এই চিত্রের ইতিহাস হিন্দুসাধারণের সুপরিজ্ঞাত। তথাপি সংক্ষেপে ইহা বিবৃত হইতেছে। ব্যাসদেব যখন মহাভারত রচনা করিতে সঙ্কল্প করিলেন তখন একজন যোগ্য লেখক আর জোটে না। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া গণেশকে ধরিলেন। গণেশ বুদ্ধির অবতার, কেরাণীর দেবতা—গণেশ চার হাত চালাইলে লিখিবেন ভালো। গণেশও রাজি হইলেন, এই সর্ত্তে, যে তিনি লিখিতে লিখিতে থামিবেন না, অপেক্ষা করিবেন না—ব্যাস বলিবেন অনর্গল, তিনিও লিখিবেন হরদম। ইহার পাল্টা ব্যাস আবার সর্ত্ত করিলেন, ভালো, তোমায় আমার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না, কিন্তু তোমাকে প্রত্যেক শ্লোকের অর্থ বুঝিয়া লিখিতে হইবে। তথাস্তু, গণেশ স্বীকৃত হইলেন। লেখা আরম্ভ হইয়াছে। গণেশ দুই হাতে কাগজ ও অপর দুই হাতে কলম ধরিয়া কলের মত দ্রুত লিখিতেছেন। তখনকারকালে শোষণ কাগজ ছিল না, চূণের পুঁটুলি দিয়া কালী শুষ্ক করা হইত। গণেশ শুঁড়ে চূণের পুঁটুলি ধরিয়া লেখা কাগজের কালী শুষিতেছেন আর ভূমিতে রাখিতেছেন। গণেশের বাহন ইঁদুর। সেও নিশ্চিন্ত নাই, সে, যাহাতে লিখিত পাতাগুলি উড়িয়া না যায় তজ্জন্য, কাগজ-চাপার কাজ করিতেছে। গণেশের চার হাত, শুঁড় কাউ, কাগজ চাপাও সজীব, তাহাকে তুলিয়া বসাইতে হয় না, সে আপনিই তড়াক করিয়া লেখা কাগজে লাফাইয়া বসে। ব্যাসদেব ত আস্থির, গণেশের লেখার জন্য বাক্য জোগান্ দিতে পারেন না, তখন তিনি কুটিলতা অবলম্বন করিয়া মাঝে মাঝে দুর্ব্বোধ্য শ্লোক রচনা করিতে লাগিলেন, সেই ব্যাসকূটের অর্থ ভাবিতে গণেশের যেটুকু বিলম্ব হইতে লাগিল, সেই অবসরে ব্যাসদেব অনেকখানি রচনা করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে সমগ্র মহাভারত রচিত ও লিখিত হইয়াছিল।

চিত্রে অঙ্কিত গণেশের মুখশ্রীতে বুদ্ধি, মনোযোগ, তেজস্বিতা ও আনন্দ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দুই দাঘ কান খাড়া করিয়া ব্যাসের প্রত্যেক কথা ধরিবার ব্যগ্রতাও সুন্দর অঙ্কিত হইয়াছে। মানবেতর প্রাণীর মুখে মানবোচিত ভাবের আরোপ ও প্রকাশ অতি কঠিন। নবীন শিল্পী ইহাতে সম্যক কৃতকার্য্য হইয়া আপনার ক্ষমতার সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

ব্যাসদেব পাণ্ডবের অক্ষক্রীড়ার উপাখ্যান বর্ণনা করিতেছেন। তাহার মুখে একটি শান্ত ধ্যানতন্ময়ভাব বড় চমৎকার ফুটিয়াছে। সুখ দুঃখের মিশ্রছায়া সেই শান্ত শ্রীকে উজ্জ্বল করিয়াছে। ব্যাসদেব হাত দিয়া অক্ষপাশপাতন সূচনা করিতেছেন ইহাই শিল্পীর পরিকল্পনা। কিন্তু আমরা হাতের ভঙ্গীতে গভীরতর সৌন্দর্য্য দেখিতেছি—হৃদয়ের গভীর ভাবপ্রবাহ ছন্দে কাব্যে প্রকাশ পাইতেছে, তাহারই প্রশান্ত পুলক ঋষি অনুভব করিতেছেন।

চিত্রের পারিপার্শ্বিকটিও যথেষ্ট ভাবব্যঞ্জক হইয়াছে। বটতরুতলে বসিয়া ভারতের একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য-ইতিহাস বিরচিত হইতেছে। তাহার রচয়িতা ঋষি, লেখক দেবতা, স্থান তপোবন। প্রাচীন ভারতে উচ্চ চিন্তার সহিত সরল জীবনযাত্রা প্রণালীর কি পবিত্র সংমিশ্রণ ইহার মধ্যে দেখা যাইতেছে। বটতরু তাহার অসংখ্য শাখা মূল লইয়া তপোবনের জটিল গহনতা, পবিত্রতা ও শান্তশীতলভাবের ব্যঞ্জনা প্রকাশ করিতেছে। ব্যাস কবির কুশাসন ও কমণ্ডলু ত্যাগের নিদর্শন। এই ত্যাগ পুষ্পমাল্য বিভূষিত, সমগ্র ভারত কর্ত্তৃক সংপূজিত, পবিত্র মহান্।

গণেশ অর্দ্ধ পশু, অর্দ্ধ নর ও উভয়ের সংমিশ্রণে দেবভাবে হিন্দুশাস্ত্রে পরিকল্পিত। ইহা বোধ হয় পশু হইতে নরসমাজ পর্য্যন্ত সকলের ঘনিষ্ঠ যোগ ও দেবতার সহিত আত্মীয়তা দেখাইবার জন্যই পরিকল্পিত হইয়া থাকিবে।

গণেশের শ্বেত মস্তক পবিত্রতা, বুদ্ধির নির্ম্মলতা, প্রসন্নতা প্রভৃতির পরিব্যঞ্জক। ভারতে বর্ণচিত্রের প্রত্যেকটিরই অর্থ ছিল।

এই চিত্রখানি ভারতীয় চিত্রকলারীতি অনুসারে অঙ্কিত। ইহা ধ্যানধারণার চিত্র, য়ুরোপীয় কলার মত কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মনুষ্য সৃষ্টি।

মানুষ যে হঠাৎ একদিন তাহার হস্তপদ ও জ্ঞানবুদ্ধি লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। যে দিন বিধাতার অনন্ত শক্তির এক ক্ষুদ্রকণা জড়ে প্রবিষ্ট হইয়া নির্জীবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সেই দিন হইতেই

অমেরুদণ্ড প্রাণিগণ তাহাদের দেহের কঠিন আবরণদ্বারা ঠিক সেই কাজ করাইয়া লয়। দেহের প্রধান প্রধান ইন্দ্রিয় ও পেশীগুলি ঐ আবরণেই আবদ্ধ থাকে। কাজেই চর্ম্মত্যাগ করার পর নূতন চর্ম্ম বাহির হওয়া না পর্য্যন্ত ইহাদিগকে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকিতে হয়। বৎসরে দুই তিনবার করিয়া যদি মানুষকে দেহের অস্থি ত্যাগ করিতে হইত, এবং নূতন অস্থিগুলিকে অঙ্কুরিত ও কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য যদি তাহাকে দুই তিন মাস শয্যাশায়ী থাকিতে হইত, তাহা হইলে মানুষ কখনই এত উন্নতি লাভ করিতে পারিত না। অমেরুদণ্ড জীব দৈহিক উন্নতির জন্য চর্ম্মত্যাগে অভ্যস্ত হইয়া, ঠিক্ পূর্ব্বোক্ত কারণে উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। কিছুদিন জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিয়া ইহারা যে একটু অভিজ্ঞতা লাভ করিত, লুপ্তচর্ম্ম হইয়া পড়িলে অনভ্যাসে তাহার প্রায় সকলি নষ্ট হইয়া যাইত।—শ্রীজগদানন্দ রায়।

(ক্রমশঃ)

প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

ক্রুসেড ও জেহাদ—বিখ্যাত স্বদেশী প্রচারক শ্রীদীন মহম্মদ কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। প্রথম খণ্ড ক্রাউন অষ্টাংশিত ১৭৮-১১ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা। জেরুজালেম খৃষ্টের জন্মভূমি, সুতরাং খৃষ্টানদিগের মহাতীর্থ। এই ভূখণ্ড মুসলমান রাজ্যের অন্তর্গত। ইহাকে খৃষ্টান অধিকারে আনিবার জন্য মধ্যযুগে য়ুরোপে যে সমরাভিযান হয় তাহার নাম ক্রুসেড। এই ধর্ম্মান্ধতায় উত্তেজিত হইয়া খৃষ্টানগণ নির্দোষী মুসলমানদিগকে বহুপ্রকারে উৎপীড়িত ও উত্যক্ত করেন। ইহাতে উত্তেজিত হইয়া মুসলমানগণ প্রতিশোধমানসে যে সমরাভিযান করেন তাহার নাম জেহাদ। সমালোচ্য পুস্তকে এই সকল ঘটনার চিত্তাকর্ষক ইতিহাস ও কাহিনী সংগৃহীত ও আলোচিত হইয়াছে। ইতিহাসপ্রিয় পাঠকগণ ইহা পাঠ করিয়া প্রীত হইবেন। হিন্দু মুসলমানের সমবেতযত্নে বঙ্গভাষা সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে—ইহা আমাদের একজাতীয়ত্বের আনন্দময় পরিচয়। পুস্তকের ভাষা ভাল।

হরিবল্লভের স্নেহ—শ্রীঅমরচন্দ্র দত্ত প্রণীত। সান্যাল কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ক্রাউন অষ্টাংশিত ২৯৬ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা মলাট। ছাপা কাগজ ভালো। মূল্যের উল্লেখ নাই। পুস্তকের প্রারম্ভে গ্রন্থকারের একখানি চিত্র সন্নিবেশিত আছে। ইহা একখানি সামাজিক উপন্যাস। ব্রাহ্মসমাজের কথাই ইহার প্রধান উপজীব্য, প্রসঙ্গক্রমে হিন্দুসমাজের কথাও আসিয়া পড়িয়াছে। গ্রন্থকার যথেষ্ট সাবধানতার সহিত সাম্প্রদায়িকতার বাহিরে দাঁড়াইয়া উভয় সমাজের দোষগুণ অল্প অল্প দেখাইয়াছেন। গ্রন্থখানির মধ্যে সামাজিক সমস্যা বা সামাজিক বিশেষত্ব যে প্রকৃষ্টভাবে মীমাংসিত বা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহা নহে; ইহাতে সমাজের অনেক কথা আলোচিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে সামাজিক উপন্যাস বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। উপন্যাসের হিসাবেও এখানি খুব শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হয় নাই; ইহার মধ্যে বর্ণিত প্রায় সকল চরিত্র অপরিপুষ্ট, কেহই আপনার ব্যক্তিত্বে স্বতন্ত্র ও পরিষ্কার হইয়া উঠে নাই। আখ্যানবস্তুও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, উদ্দেশ্যহীন এবং একঘেয়ে। কিন্তু হৃদয়বান গ্রন্থকারের ঘটনার সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ শক্তি, কার্য্যের ক্রমপর্য্যায় নির্ণয়, রসিকতা ও সমান ধ্বনির শব্দপ্রয়োগ-ক্ষমতা একটি সরল লিখনভঙ্গীতে প্রকাশ হইয়া বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে শিক্ষিতা স্ত্রীর আদর্শ আর্য্যোচিত সারল্য, বলিষ্ঠতা, নিষ্ঠা ও পবিত্রতায় মহীয়ান হইয়াছে। যাঁহারা সময় কাটাইবার জন্য উপন্যাস পড়েন, তাঁহারা এই পুস্তক পড়িলে প্রীত হইবেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। পরিশেষে বক্তব্য, ধর্ম্মপ্রচারকের চরিত্র অমন সাংসারিকতার কৃষ্ণবর্ণে অঙ্কিত না করিলেই ভালো হইত।

রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত—তৎকর্ত্তৃক লিখিত হস্তলিপি হইতে কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ক্রাউন অষ্টাংশিত ২১৯+৮ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট দেশী এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা। বসু মহাশয়ের বিভিন্ন বয়সের, বৈদ্যনাথের বাড়ীর ও তাৎকালিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের ১৬ খানি হাফটোন ছবি এই পুস্তকখানিতে আছে—তন্মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের ছবি তিন রঙে ছাপা অতি সুন্দর। পুস্তকের মূল্য কাগজের মলাট মাত্র ১৷৵০ এবং সুন্দর বাঁধানো মলাট ১৸৵০ মাত্র। ২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে প্রবাসী কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়। পুস্তকের আকার ও চিত্রাদির অনুপাতে মূল্য খুব সুলভ হইয়াছে। এই পুস্তকে বসু মহাশয়ের নির্ভীক তেজস্বিতা, সবল মনুষ্যত্ব, শুভানুষ্ঠানে আগ্রহ, অন্যায়-অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইয়াছে। এই পুস্তক পাঠ করিলে বসু মহাশয়ের কর্ম্মজীবনের সর্ব্ববিষয়াভিমুখতা ও ধর্ম্মজীবনের প্রগাঢ়তা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে তৎকালের বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির ও ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গে ইংরাজী শিক্ষার প্রারম্ভে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রীতি নীতি ও হাস্যকর সাহেবিয়ানা, ব্রাহ্মসমাজের জন্ম ও প্রসার, সাহিত্য ও রাষ্ট্রনীতি কিরূপ অবস্থায় ছিল, তাহার পরিচয় ইহাতে পাওয়া যাইবে। ইহা উপন্যাসের মত কৌতূহলোদ্দীপক ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। আত্মচরিতে এমন অকপটভাবে নিজের দোষগুণ বর্ণনা খুব অল্প লোকই করিতে পারেন। বঙ্গের সহস্র সহস্র লোক বৈদ্যনাথে রাজনারায়ণ বাবুকে দর্শন ও তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করা পুণ্য ও আনন্দের কার্য্য মনে করিতেন। তাঁহারা এই ভূমানন্দরসে নিমগ্ন হাস্যনিপুণ চিরযৌবনসম্পন্ন বৃদ্ধের পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ পাইয়া প্রীত হইবেন।

শান্তিনিকেতন—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। ক্রাউন ২৪ পেজি ৮৯ পৃষ্ঠা। মূল্য চারি আনা মাত্র। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় রবিবাবুর কয়েকটি ধর্ম্মোপদেশ সংগৃহীত হইয়াছে। চলিত ভাষায় ঘরের কথায় ধর্ম্মতত্ত্বের জটিল বিষয়ও সরল সরস করিয়া বলা হইয়াছে। ইহাতে রবিবাবুর পরিণত প্রতিভার চিন্তাশীলতা চমৎকার ফুটিয়াছে। শান্তিপিপাসু, ধর্ম্মজিজ্ঞাসু, চিন্তাশীল বা মুমুক্ষু ব্যক্তি ইহা পাঠ করিয়া প্রীত হইবেন ও উপকার বোধ করিবেন। কবির মোহনস্পর্শে ধর্ম্মতত্ত্বগুলিও যে রসে কাব্যে কেমনতরভাবে ভরিয়া উঠিয়াছে তাহা না পড়িলে বুঝানো কঠিন হইবে। পুস্তকের ছাপা কাগজও সুন্দর। পকেটপর্য্যায় হিসাবে আকারটিও উপযোগী। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মুদ্রা-রাক্ষস।

৬১, ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গান্ধারী

শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA

আগামী ১৩১৬ সালের প্রবাসী।

১। প্রবাসীর বর্ত্তমান গ্রাহক ও গ্রাহিকাদিগের মধ্যে যাঁহারা আগামী বর্ষে প্রবাসী লইতে চান না, তাঁহারা ১৫ই চৈত্রের মধ্যে তাহা আমাকে জানাইলে অনুগৃহীত হইব।

২। যাঁহারা আগামী বর্ষের প্রবাসী চান, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ১৫ই চৈত্রের মধ্যে টাকা পাঠাইলে উপকৃত হইব।

পুরাতন গ্রাহক ও গ্রাহিকারা গ্রাহক-নম্বর দিতে ভুলিবেন না।

নূতন গ্রাহক ও গ্রাহিকারা মনি অর্ডারের কূপনে "নূতন" কথাটি লিখিয়া বাধিত করিবেন।

৩। বর্ত্তমান গ্রাহক ও গ্রাহিকাদিগের মধ্যে যাঁহারা কাগজ পাঠাইতে নিষেধ করিবেন না, কিম্বা টাকা পাঠাইবেন না, তাঁহাদের নামে আগামী বৈশাখ মাসের কাগজ ভ্যালু পেয়েবল্ ডাকে পাঠাইব।

আজকাল ভ্যালু পেয়েবল্ যোগে কাগজ লইলে অনেক সময় বড় ঠিকানার গোলযোগ হয়। তজ্জন্য মনি অর্ডার দ্বারা টাকা পাঠানই ভাল।

প্রবাসীর কলেবর ও উৎকর্ষ।

আমি "বিজ্ঞাপনে লম্বা ক্রিয়া"কে বড় ভয় করি। তজ্জন্য আগামী বৎসরের প্রবাসী সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিব না। কেবল ইহাই জানাইয়া রাখি, যে, লেখার উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্যে এবং ছবির উৎকর্ষ ও সংখ্যা বিষয়ে, বাঙ্গলা মাসিক পত্রসমূহের মধ্যে প্রবাসীর বর্ত্তমান স্থান বজায় রাখিতে চেষ্টা করিব।

বর্ত্তমান বৎসরের প্রবাসীর কোন কোন সংখ্যা ফুরাইয়া যাওয়ায় এখন আর কেহ ১৩১৫ সালের সম্পূর্ণ প্রবাসী পাইতেছেন না। ১৩১৩ এবং ১৩১৪ সালেও এইরূপ ঘটিয়াছিল। তজ্জন্য আমি ১৩১৬ সালের প্রবাসী কিছু বেশী ছাপাইব। সম্ভবতঃ ৫০০ মাত্র অধিক ছাপাইব। তাহাও ফুরাইয়া যাইতে পারে।

২৬শে ফাল্গুন, ১৩১৫ সাল।
কলিকাতা, ২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

৮ম ভাগ। | চৈত্র, ১৩১৫। | ১২শ সংখ্যা।

গোরা।

৪৩

পরেশ বাবুর বাসার কাছেই সর্ব্বদা তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া বাস করিতে পারিবে এই কথা শুনিয়া সুচরিতা অত্যন্ত আরাম বোধ করিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহার নূতন বাড়ির গৃহসজ্জা সমাপ্ত এবং সেখানে উঠিয়া যাইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইল তখন সুচরিতার বুকের ভিতর যেন টানিয়া ধরিতে লাগিল। কাছে থাকা না থাকা লইয়া কথা নয় কিন্তু জীবনের সঙ্গে জীবনের যে সর্ব্বাঙ্গীন যোগ ছিল তাহাতে এতদিন পরে একটা বিচ্ছেদ ঘটিবার কাল আসিয়াছে ইহা আজ সুচরিতার কাছে যেন তাহার এক অংশের মৃত্যুর মত বোধ হইতে লাগিল। এই পরিবারের মধ্যে সুচরিতার যেটুকু স্থান ছিল, তাহার যে কিছু কাজ ছিল, প্রত্যেক চাকরটির সঙ্গেও তাহার যে সম্বন্ধ ছিল সমস্তই সুচরিতার হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে লাগিল।

সুচরিতার যে নিজের কিছু সঙ্গতি আছে এবং সেই সঙ্গতির জোরে আজ সে অনায়াসেই স্বাধীন হইবার উপক্রম করিতেছে এই সংবাদে বরদাসুন্দরী বারবার স্বরিয়া প্রকাশ করিলেন যে, ইহাতে ভালই হইল, এতদিন এত সাবধানে যে দায়িত্বভার বহন করিয়া আসিতেছিলেন তাহা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু মনে মনে সুচরিতার প্রতি তাঁহার যেন একটা অভিমানের ভাব জন্মিল; সুচরিতা যে তাঁহাদের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আজ নিজের সম্বলের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে এ যেন তাহার একটা অপরাধ। তাঁহারা ছাড়া সুচরিতার অন্য কোনো গতি নাই ইহাই মনে করিয়া অনেক সময় সুচরিতাকে তিনি আপন পরিবারের একটা আপদ বলিয়া নিজের প্রতি করুণা অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু সেই সুচরিতার ভার যখন লাঘব হইবার সংবাদ হঠাৎ পাইলেন তখন ত মনের মধ্যে কিছুমাত্র প্রসন্নতা অনুভব করিলেন না। তাঁহাদের আশ্রয় সুচরিতার পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে ইহাই জানিয়া সে যে গর্ব্ব অনুভব করিতে পারে, তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য না হইতে পারে এই কথা মনে করিয়া তিনি আগে হইতেই তাহাকে অপরাধী করিতে লাগিলেন। এ কয়দিন বিশেষভাবে তাহার প্রতি দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিলেন। পূর্ব্বে তাহাকে ঘরের কাজকর্ম্মে যেমন করিয়া ডাকিতেন এখন তাহা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া গায়ে পড়িয়া তাহাকে অস্বাভাবিক সম্ভ্রম দেখাইতে লাগিলেন। বিদায়ের পূর্ব্বে সুচরিতা

ব্যথিত চিত্তে বেশি করিয়াই বরদাসুন্দরীর গৃহকার্য্যে যোগ দিতে চেষ্টা করিতেছিল, নানা উপলক্ষ্যে তাঁহার কাছে কাছে ফিরিতেছিল, কিন্তু বরদাসুন্দরী যেন পাছে তার অসম্মান ঘটে এইরূপ ভাব দেখাইয়া তাহাকে দূরে ঠেকাইয়া রাখিতেছিলেন। এতকাল যাঁহাকে মা বলিয়া যাঁহার কাছে সুচরিতা মানুষ হইয়াছে আজ বিদায় লইবার সময়েও তিনি যে তাহার প্রতি চিত্তকে প্রতিকূল করিয়া রহিলেন এই বেদনাই সুচরিতাকে সব চেয়ে বেশি করিয়া বাজিতে লাগিল।

লাবণ্য ললিতা লীলা সুচরিতার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতে লাগিল। তাহারা অত্যন্ত উৎসাহ করিয়া তাহার নূতন বাড়ির ঘর সাজাইতে গেল কিন্তু সেই উৎসাহের ভিতরেও অব্যক্ত বেদনার অশ্রুজল প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল।

এতদিন পর্য্যন্ত সুচরিতা নানা ছুতা করিয়া পরেশ বাবুর কত কি ছোটখাট কাজ করিয়া আসিয়াছে। হয় ত ফুলদানিতে ফুল সাজাইয়াছে, টেবিলের উপর বই গুছাইয়াছে, নিজের হাতে বিছানা রৌদ্রে দিয়াছে, স্নানের সময় প্রত্যহ তাঁহাকে খবর দিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়াছে— এই সমস্ত অভ্যস্ত কাজের কোনো গুরুত্বই প্রতিদিন কোনো পক্ষ অনুভব করে না। কিন্তু এ সকল অনাবশ্যক কাজও যখন বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইবার সময় উপস্থিত হয় তখন এই সকল ছোটখাট সেবা, যাহা একজনে না করিলে অনায়াসে আর একজনে করিতে পারে, যাহা না করিলেও কাহারো বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না, এই গুলিই দুই পক্ষের চিত্তকে মথিত করিতে থাকে। সুচরিতা আজ কাল যখন পরেশের ঘরের কোনো সামান্য কাজ করিতে আসে তখন সেই কাজটা পরেশের কাছে মস্ত হইয়া দেখা দেয় ও তাঁহার বক্ষের মধ্যে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস জমা হইয়া উঠে। এবং এই কাজ আজ বাদে কাল অন্যের হাতে সম্পন্ন হইতে থাকিবে এই কথা মনে করিয়া সুচরিতার চোখ ছলছল করিয়া আসে।

যেদিন মধ্যাহ্নে আহার করিয়া সুচরিতাদের নূতন বাড়িতে উঠিয়া যাইবার কথা সেদিন প্রাতঃকালে পরেশ বাবু তাঁহার নিভৃত ঘরটিতে উপাসনা করিতে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার আসনের সম্মুখদেশ ফুল দিয়া সাজাইয়া ঘরের একপ্রান্তে সুচরিতা অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। লাবণ্যলীলারাও উপাসনাস্থলে আজ আসিবে এইরূপ তাহারা পরামর্শ করিয়াছিল কিন্তু ললিতা তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া আসিতে দেয় নাই। ললিতা জানিত, পরেশ বাবুর নির্জ্জন উপাসনায় যোগ দিয়া সুচরিতা যেন বিশেষভাবে তাঁহার আনন্দের অংশ ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিত—আজ প্রাতঃকালে সেই আশীর্ব্বাদ সঞ্চয় করিয়া লইবার জন্য সুচরিতার যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল তাহাই অনুভব করিয়া ললিতা অদ্যকার উপাসনার নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিতে দেয় নাই।

উপাসনা শেষ হইয়া গেলে যখন সুচরিতার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল তখন পরেশ বাবু কহিলেন, "মা, পিছন দিকে ফিরে তাকিয়ো না, সম্মুখের পথে অগ্রসর হয়ে যাও —মনে সঙ্কোচ রেখো না। যাই ঘটুক, যাই তোমার সম্মুখে উপস্থিত হোক, তার থেকে সম্পূর্ণ নিজের শক্তিতে ভালোকে গ্রহণ করবে এই পণ করে আনন্দের সঙ্গে বেরিয়ে পড়। ঈশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে তাঁকেই নিজের একমাত্র সহায় কর—তাহলে ভুল ত্রুটি ক্ষতির মধ্যে দিয়েও লাভের পথে চল্‌তে পারবে—আর যদি নিজেকে আধাআধি ভাগ কর, কতক ঈশ্বরে কতক অন্যত্রে, তাহলেই সমস্ত কঠিন হয়ে উঠ্‌বে। ঈশ্বর এই করুন আমাদের ক্ষুদ্র আশ্রয় তোমার পক্ষে আর যেন প্রয়োজন না হয়।"

উপাসনার পরে উভয়ে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন বসিবার ঘরে হারান বাবু অপেক্ষা করিয়া আছেন। সুচরিতা আজ কাহারও বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহভাব মনে রাখিবে না পণ করিয়া হারান বাবুকে নম্রভাবে নমস্কার করিল। হারান বাবু তৎক্ষণাৎ চৌকির উপরে নিজেকে শক্ত করিয়া তুলিয়া অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে কহিলেন— "সুচরিতা, এতদিন তুমি যে সত্যকে আশ্রয় করে ছিলে আজ তার থেকে পিছিয়ে পড়তে যাচ্চ, আজ আমাদের শোকের দিন।"

সুচরিতা কোনো উত্তর করিল না—কিন্তু যে রাগিণী তাহার মনের মধ্যে আজ শান্তির সঙ্গে করুণা মিশাইয়া সঙ্গীতে জমিয়া উঠিতেছিল তাহাতে একটা বেসুর আসিয়া পড়িল।

পরেশ বাবু কহিলেন—"অন্তর্যামী জানেন কে এগচ্চে, কে পিছচ্চে, বাইরে থেকে বিচার করে আমরা বৃথা উদ্বিগ্ন হই।"

হারান বাবু কহিলেন—তাহলে আপনি কি বলতে চান আপনার মনে কোনো আশঙ্কা নেই? আর আপনার অনুতাপেরও কোনো কারণ ঘটেনি?

পরেশ বাবু কহিলেন—পানু বাবু, কাল্পনিক আশঙ্কাকে আমি মনে স্থান দিইনে এবং অনুতাপের কারণ ঘটেছে কি না তা তখনি বুঝব যখন অনুতাপ জন্মাবে।

হারান বাবু কহিলেন—"এই যে আপনার কন্যা ললিতা একলা বিনয় বাবুর সঙ্গে ষ্টীমারে করে চলে এলেন এটাও কি কাল্পনিক?"

সুচরিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল। পরেশ বাবু কহিলেন—পানু বাবু, আপনার মন যে কোনো কারণে হোক্ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এই জন্যে এখন এসম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলাপ করলে আপনার প্রতি অন্যায় করা হবে।

হারান বাবু মাথা তুলিয়া বলিলেন—আমি উত্তেজনার বেগে কোনো কথা বলিনে—আমি যা বলি সে সম্বন্ধে আমার দায়িত্ববোধ যথেষ্ট আছে; সে জন্যে আপনি চিন্তা করবেন না। আপনাকে যা বলচি সে আমি ব্যক্তিগতভাবে বলচিনে, আমি ব্রাহ্মসমাজের তরফ থেকে বলচি—না বলা অন্যায় বলেই বলচি। আপনি যদি অন্ধ হয়ে না থাকতেন তা হলে, ঐ যে বিনয় বাবুর সঙ্গে ললিতা একলা চলে এল এই একটি ঘটনা থেকেই আপনি বুঝ্‌তে পারতেন আপনার এই পরিবার ব্রাহ্মসমাজের নোঙর ছিঁড়ে ভেসে চলে যাবার উপক্রম করচে। এতে যে শুধু আপনারই অনুতাপের কারণ ঘট্‌বে তা নয় এতে ব্রাহ্মসমাজেরও অগৌরবের কথা আছে"

পরেশ বাবু কহিলেন "নিন্দা করতে গেলে বাইরে থেকে করা যায় কিন্তু বিচার করতে গেলে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। কেবল ঘটনা থেকে মানুষকে দোষী করবেন না।"

হারান বাবু কহিলেন—"ঘটনা শুধু শুধু ঘটেনা, তাকে আপনারা ভিতরের থেকেই ঘটিয়ে তুলেছেন। আপনি এমন সব লোককে পরিবারের মধ্যে আত্মীয়ভাবে টান্‌চেন যারা আপনার পরিবারকে আপনার আত্মীয় সমাজ থেকে দূরে নিয়ে যেতে চায়। দূরেই ত নিয়ে গেল সে কি আপনি দেখ্‌তে পাচ্চেন না?"

পরেশ বাবু একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"আপনার সঙ্গে আমার দেখ্‌বার প্রণালী মেলে না।"

হারান বাবু কহিলেন—"আপনার না মিল্‌তে পারে। কিন্তু আমি সুচরিতাকেই সাক্ষী মান্‌চি উনিই সত্য করে বলুন্ দেখি, ললিতার সঙ্গে বিনয়ের যে সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে, সে কি শুধু বাইরের সম্বন্ধ? তাদের অন্তরকে কোনো-খানেই স্পর্শ করে নি?—না সুচরিতা চলে গেলে হবে না—একথার উত্তর দিতে হবে! এ গুরুতর কথা!"

সুচরিতা কঠোর হইয়া কহিল—যতই গুরুতর হোক্ একথায় আপনার কোনো অধিকার নেই!

হারান বাবু কহিলেন—"অধিকার না থাক্‌লে আমি যে শুধু চুপ করে থাক্‌তুম তা নয়, চিন্তাও করতুম না। সমাজকে তোমরা গ্রাহ্য না করতে পার কিন্তু যতদিন সমাজে আছ ততদিন সমাজ তোমাদের বিচার করতে বাধ্য।"

ললিতা ঝড়ের মত ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল—"সমাজ যদি আপনাকেই বিচারক পদে নিযুক্ত করে থাকেন তবে এ সমাজ থেকে নির্ব্বাসনই আমাদের পক্ষে শ্রেয়।"

হারান বাবু চৌকি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন "ললিতা, তুমি এসেছ আমি খুসি হয়েছি। তোমার সম্বন্ধে যা নালিশ তা তোমার সাম্‌নেই বিচার হওয়া উচিত।"

ক্রোধে সুচরিতার মুখ চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, সে কহিল—"হারান বাবু, আপনার ঘরে গিয়ে আপনার বিচার-শালা আহ্বান করুন। গৃহস্থের ঘরের মধ্যে চড়ে তাদের অপমান করবেন আপনার এ অধিকার আমরা কোনো মতেই মান্‌ব না। আয় ভাই ললিতা।"

ললিতা এক পা নড়িল না—কহিল—"না দিদি, আমি পালাব না। পানু বাবুর যা কিছু বলবার আছে সব আমি শুনে যেতে চাই। বলুন্, কি বল্‌বেন, বলুন্!"

হারান বাবু থমকিয়া গেলেন। পরেশ বাবু কহিলেন—"মা, ললিতা, আজ সুচরিতা আমাদের বাড়ি থেকে যাবে—আজ সকালে আমি কোনো রকম অশান্তি ঘট্‌তে দিতে

পারব না। হারান বাবু, আমাদের যতই অপরাধ থাক্ তবু আজকের মত আমাদের মাপ করতে হবে।”

হারান চুপ করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। সুচরিতা যতই তাঁহাকে বর্জ্জন করিতেছিল সুচরিতাকে ধরিয়া রাখিবার জেদ ততই তাঁহার বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল অসামান্য নৈতিক জোরের দ্বারা তিনি নিশ্চয়ই জিতিবেন। এখনো তিনি যে হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন তাহা নহে কিন্তু মাসীর সঙ্গে সুচরিতা অন্য বাড়িতে গেলে সেখানে তাঁহার শক্তি প্রতিহত হইতে থাকিবে এই আশঙ্কায় তাঁহার মন ক্ষুব্ধ ছিল। এই জন্য আজ তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্রগুলিকে শান দিয়া আনিয়াছিলেন। কোনোমতে আজ সকালবেলাকার মধ্যেই খুব কড়া রকম করিয়া বোঝাপড়া করিয়া লইতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। আজ সমস্ত সঙ্কোচ তিনি দূর করিয়াই আসিয়াছিলেন—কিন্তু অপর পক্ষেও যে এমন করিয়া সঙ্কোচ দূর করিতে পারে, ললিতা সুচরিতাও যে হঠাৎ তূণ হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া দাঁড়াইবে তাহা তিনি কল্পনাও করেন নাই। তিনি জানিতেন, তাঁহার নৈতিক অগ্নিবাণ যখন তিনি মহাতেজে নিক্ষেপ করিতে থাকিবেন অপর পক্ষের মাথা একেবারে হেঁট হইয়া যাইবে। ঠিক তেমনটি হইল না—অবসরও চলিয়া গেল। কিন্তু হারান বাবু হার মানিবেন না। তিনি মনে মনে কহিলেন, সত্যের জয় হইবেই অর্থাৎ হারান বাবুর জয় হইবেই। কিন্তু জয় ত শুধু শুধু হয় না। লড়াই করিতে হইবে। হারান বাবু কোমর বাঁধিয়া রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

সুচরিতা কহিল—“মাসি, আজ আমি সকলের সঙ্গে একসঙ্গে খাব—তুমি কিছু মনে করলে চল্‌বে না!”

হরিমোহিনী চুপ করিয়া রহিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন সুচরিতা সম্পূর্ণই তাঁহার হইয়াছে—বিশেষতঃ নিজের সম্পত্তির জোরে স্বাধীন হইয়া সে স্বতন্ত্র ঘর করিতে চলিয়াছে এখন হরিমোহিনীকে আর কোনো সঙ্কোচ করিতে হইবে না—ষোলো আনা নিজের মত করিয়া চলিতে পারিবেন। তাই, আজ যখন সুচরিতা শুচিতা বিসর্জ্জন করিয়া আবার সকলের সঙ্গে একত্রে অন্ন গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিল তখন তাঁহার ভাল লাগিল না, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

সুচরিতা তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া কহিল—“আমি তোমাকে নিশ্চয় বলছি এ'তে ঠাকুর খুসি হবেন। সেই আমার অন্তর্যামী ঠাকুর আমাকে সকলের সঙ্গে আজ এক সঙ্গে খেতে বলে দিয়েছেন। তাঁর কথা না মান্‌লে তিনি রাগ করবেন। তাঁর রাগকে আমি তোমার রাগের চেয়ে ভয় করি।”

যতদিন হরিমোহিনী বরদাসুন্দরীর কাছে অপমানিত হইতেছিলেন ততদিন সুচরিতা তাঁহার অপমানের অংশ লইবার জন্য তাঁহার আচার গ্রহণ করিয়াছিল এবং আজ সেই অপমান হইতে যখন নিষ্কৃতির দিন উপস্থিত হইল তখন সুচরিতা যে আচার সম্বন্ধে স্বাধীন হইতে দ্বিধা বোধ করিবে না, হরিমোহিনী তাহা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। হরিমোহিনী সুচরিতাকে সম্পূর্ণ বুঝিয়া লন নাই, বোঝাও তাঁহার পক্ষে শক্ত ছিল।

হরিমোহিনী সুচরিতাকে স্পষ্ট করিয়া নিষেধ করিলেন না কিন্তু মনে মনে রাগ করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন—মা গো, মানুষের ইহাতে যে কেমন করিয়া প্রবৃত্তি হইতে পারে তাহা আমি ভাবিয়া পাই না! ব্রাহ্মণের ঘরে ত জন্ম বটে!

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—“একটা কথা বলি বাছা, যা কর তা কর তোমাদের ঐ বেহারাটার হাতে জল খেয়ো না!”

সুচরিতা কহিল—কেন মাসি, ঐ রামদীন বেহারাই ত তার নিজের গোরু দুইয়ে তোমাকে দুধ দিয়ে যায়!

হরিমোহিনী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, “অবাক্ করলি! দুধ আর জল এক হল!”

সুচরিতা হাসিয়া কহিল—“আচ্ছা মাসি, রামদীনের ছোঁয়া জল আজ আমি খাবনা। কিন্তু সতীশকে যদি তুমি বারণ কর তবে সে ঠিক তার উলটো কাজটি করবে।”

হরিমোহিনী কহিলেন—“সতীশের কথা আলাদা।”

হরিমোহিনী জানিতেন পুরুষমানুষের সম্বন্ধে নিয়ম সংযমের ত্রুটি মাপ করিতেই হয়।

৪৪

হারান বাবু রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

আজ প্রায় পনেরো দিন হইয়া গিয়াছে ললিতা ষ্টীমারে

করিয়া বিনয়ের সঙ্গে আসিয়াছে। কথাটা দুই এক জনের কানে গিয়াছে এবং অল্পে অল্পে ব্যাপ্ত হইবারও চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সম্প্রতি দুই দিনের মধ্যেই এই সংবাদ শুক্‌না খড়ে আগুন লাগার মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ব্রাহ্মপরিবারের "ধর্ম্মনৈতিক জীবনে"র প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই প্রকারের কদাচারকে যে দমন করা কর্ত্তব্য হারান বাবু তাহা অনেককেই বুঝাইয়াছেন। এসব কথা বুঝাইতেও বেশি কষ্ট পাইতে হয় না। যখন আমরা "সত্যের অনুরোধে" "কর্ত্তব্যের অনুরোধে" পরের স্খলন লইয়া ঘৃণা প্রকাশ ও দণ্ডবিধান করিতে উদ্যত হই তখন সত্যের ও কর্ত্তব্যের অনুরোধ রক্ষা করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর হয় না। এই জন্য ব্রাহ্মসমাজে হারান বাবু যখন "অপ্রিয়" সত্য ঘোষণা ও "কঠোর" কর্ত্তব্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তখন এত বড় অপ্রিয়তা ও কঠোরতার ভয়ে তাঁহার সঙ্গে উৎসাহের সহিত যোগ দিতে অধিকাংশ লোক পরাংমুখ হইল না। ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী লোকেরা গাড়ি পাল্কি ভাড়া করিয়াও পরস্পরের বাড়ি গিয়া বলিয়া আসিলেন, আজকাল যখন এমন সকল ঘটনা ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন "ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন।" এই সঙ্গে, সুচরিতা যে হিন্দু হইয়াছে, এবং হিন্দুমাসীর ঘরে আশ্রয় লইয়া যাগযজ্ঞ তপজপ ও ঠাকুর সেবা লইয়া দিন যাপন করিতেছে একথাও পল্লবিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

অনেক দিন হইতে ললিতার মনে একটা লড়াই চলিতেছিল। সে প্রতিরাত্রে শুইতে যাইবার আগে বলিতেছিল কখনই আমি হার মানিবনা এবং প্রতিদিন ঘুম ভাঙিয়া বিছানায় বসিয়া বলিয়াছে কোনো মতেই আমি হার মানিব না। এই যে বিনয়ের চিন্তা তাহার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে—বিনয় নীচের ঘরে বসিয়া কথা কহিতেছে জানিতে পারিলে তাহার হৃৎপিণ্ডের রক্ত উতলা হইয়া উঠিতেছে, বিনয় দুই দিন তাহাদের বাড়িতে না আসিলে অবরুদ্ধ অভিমানে তাহার মন নিপীড়িত হইতেছে, মাঝে মাঝে সতীশকে নানা উপলক্ষ্যে বিনয়ের বাসায় যাইবার জন্য উৎসাহিত করিতেছে এবং সতীশ ফিরিয়া আসিলে, বিনয় কি করিতেছিল বিনয়ের সঙ্গে কি কথা হইল তাহার আদ্যোপান্ত সংবাদ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছে—ইহা ললিতার পক্ষে যতই অনিবার্য্য হইয়া উঠিতেছে ততই পরাভবের গ্লানিতে তাহাকে অধীর করিয়া তুলিতেছে। বিনয় ও গোরার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে বাধা দেন নাই বলিয়া এক একবার পরেশ বাবুর প্রতি তাহার রাগও হইত। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে লড়াই করিবে, মরিবে তবু হারিবে না, এই তাহার পণ ছিল। জীবন যে কেমন করিয়া কাটাইবে সে সম্বন্ধে নানা প্রকার কল্পনা তাহার মনের মধ্যে যাতায়াত করিতেছিল। য়ুরোপের লোকহিতৈষিণী রমণীদের জীবনচরিতে যে সকল কীর্ত্তিকাহিনী সে পাঠ করিয়াছিল সেইগুলি তাহার নিজের পক্ষে সাধ্য ও সম্ভবপর বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

একদিন সে পরেশ বাবুকে গিয়া কহিল, "বাবা, আমি কি কোনো মেয়ে-ইস্কুলে শেখাবার ভার নিতে পারিনে ?"

পরেশ বাবু তাঁহার মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ক্ষুধাতুর হৃদয়ের বেদনায় তাহার সকরুণ দুইটি চক্ষু যেন কাঙাল হইয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে। তিনি স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন "কেন পারবে না মা ? কিন্তু তেমন মেয়ে-ইস্কুল কোথায় ?"

যে সময়ের কথা হইতেছে তখন মেয়ে-ইস্কুল বেশি ছিল না, সামান্য পাঠশালা ছিল এবং ভদ্র ঘরের মেয়েরা শিক্ষয়িত্রীর কাজে তখন অগ্রসর হন নাই। ললিতা ব্যাকুল হইয়া কহিল, "ইস্কুল নেই বাবা ?"

পরেশ বাবু কহিলেন, "কই, দেখিনে ত !"

ললিতা কহিল, "আচ্ছা, বাবা, মেয়ে-ইস্কুল কি একটা করা যায় না ?"

পরেশ বাবু কহিলেন, "অনেক খরচের কথা, এবং অনেক লোকের সহায়তা চাই।"

ললিতা জানিত সৎকর্ম্মের সংকল্প জাগাইয়া তোলাই কঠিন কিন্তু তাহা সাধন করিবার পথেও যে এত বাধা তাহা সে পূর্ব্বে ভাবে নাই। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া সে আস্তে আস্তে উঠিয়া চলিয়া গেল। তাঁহার এই প্রিয়তমা কন্যাটির হৃদয়ের ব্যথা কোন্‌খানে পরেশ বাবু তাহাই বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। বিনয়ের সম্বন্ধে হারান বাবু সে দিন যে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন তাহাও

তাঁহার মনে পড়িল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নিজেকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি অবিবেচনার কাজ করিয়াছি? তাঁহার অন্য কোনো মেয়ে হইলে বিশেষ চিন্তার কারণ ছিল না—কিন্তু ললিতার জীবন যে ললিতার পক্ষে অত্যন্ত সত্য পদার্থ; সে ত আধাআধি কিছুই জানে না; সুখ দুঃখ তাহার পক্ষে কিছু-সত্য-কিছু-ফাঁকি নহে!

ললিতা প্রতিদিন নিজের জীবনের মধ্যে ব্যর্থ ধিক্কার বহন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে কেমন করিয়া? সে যে সম্মুখে কোথাও একটা প্রতিষ্ঠা, একটা মঙ্গল পরিণাম দেখিতে পাইতেছে না। এমনভাবে নিরুপায় ভাসিয়া চলিয়া যাওয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ নহে।

সেইদিনই মধ্যাহ্নে ললিতা সুচরিতার বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে গৃহসজ্জা বিশেষ কিছুই নাই। মেঝের উপর একটি ঘর জোড়া সতরঞ্চ, তাহারই একদিকে সুচরিতার বিছানা পাতা ও অন্য দিকে হরিমোহিনীর বিছানা। হরিমোহিনী খাটে শোন না বলিয়া সুচরিতাও তাঁহার সঙ্গে এক ঘরে নীচে বিছানা করিয়া শুইতেছে। দেয়ালে পরেশ বাবুর একখানি ছবি টাঙানো। পাশের একটি ছোটো ঘরে সতীশের খাট পড়িয়াছে এবং একধারে একটি ছোটো টেবিলের উপর দোয়াত কলম খাতা বই শ্লেট বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ানো রহিয়াছে। সতীশ ইস্কুলে গিয়াছে। বাড়ি নিস্তব্ধ।

আহারান্তে হরিমোহিনী তাঁহার মাদুরের উপর শুইয়া নিদ্রার উপক্রম করিতেছেন, এবং সুচরিতা পিঠে মুক্তচুল মেলিয়া দিয়া সতরঞ্চে বসিয়া কোলের উপর বালিশ লইয়া একমনে কি পড়িতেছে। সম্মুখে আরো কয়খানা বই পড়িয়া আছে।

ললিতাকে হঠাৎ ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সুচরিতা যেন লজ্জিত হইয়া প্রথমটা বই বন্ধ করিল, পরক্ষণে লজ্জার দ্বারাই লজ্জাকে দমন করিয়া বই যেমন ছিল তেমনিই রাখিল। এই বইগুলি গোরার রচনাবলী।

হরিমোহিনী উঠিয়া বসিয়া কহিলেন—"এস, এস, মা ললিতা এস! তোমাদের বাড়ি ছেড়ে সুচরিতার মনের মধ্যে কেমন করুচে সে আমি জানি। ওর মন খারাপ হলেই ঐ বইগুলো নিয়ে পড়তে বসে। এখনি আমি শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম তোমরা কেউ এলে ভাল হয়—অমনি তুমি এসে পড়েছ—অনেকদিন বাঁচবে মা!"

ললিতার মনে যে কথাটা ছিল, সুচরিতার কাছে বসিয়া সে একেবারেই তাহা আরম্ভ করিয়া দিল। সে কহিল "সুচিদিদি, আমাদের পাড়ায় মেয়েদের জন্যে যদি একটা ইস্কুল করা যায় তাহলে কেমন হয়?"

হরিমোহিনী অবাক্ হইয়া কহিলেন—"শোনো একবার কথা! তোমরা স্কুল করবে কি!"

সুচরিতা কহিল—"কেমন করে করা যাবে বল্? কে আমাদের সাহায্য করবে? বাবাকে বলেছিস্ কি?"

ললিতা কহিল—"আমরা দুজনে ত পড়াতে পারব। হয়ত বড়দিদিও রাজি হবে।"

সুচরিতা কহিল—"শুধু পড়ানো নিয়েত কথা নয়। কি রকম করে ইস্কুলের কাজ চালাতে হবে তার সব নিয়ম বেঁধে দেওয়া চাই, বাড়ি ঠিক করতে হবে, ছাত্রী সংগ্রহ করতে হবে, খরচ জোগাতে হবে। আমরা দুজন মেয়েমানুষ এর কি করতে পারি!"

ললিতা কহিল—"দিদি, ওকথা বললে চল্‌বে না। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি বলেই কি নিজের মনখানাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে পড়ে আছাড় খেতে থাক্‌ব? পৃথিবীর কোনো কাজেই লাগ্‌ব না?"

ললিতার কথাটার মধ্যে যে বেদনা ছিল সুচরিতার বুকের মধ্যে গিয়া তাহা বাজিয়া উঠিল। সে কোনো উত্তর না করিয়া ভাবিতে লাগিল।

ললিতা কহিল—"পাড়ায় ত অনেক মেয়ে আছে। আমরা যদি তাদের অম্‌নি পড়াতে চাই বাপ মারা ত খুসি হবে। তাদের যে ক'জনকে পাই তোমার এই বাড়িতে এনে পড়ালেই হবে। এতে খরচ কিসের?"

এই বাড়িতে রাজ্যের অপরিচিত ঘরের মেয়ে জড় করিয়া পড়াইবার প্রস্তাবে হরিমোহিনী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি নিরিবিলি পূজা অর্চ্চনা লইয়া শুদ্ধ শুচি হইয়া থাকিতে চান তাহার ব্যাঘাতের সম্ভাবনায় আপত্তি করিতে লাগিলেন।

সুচরিতা কহিল, "মাসি তোমার ভয় নেই, যদি ছাত্রী জোটে তাদের নিয়ে আমাদের নীচের তলার ঘরেই কাজ

চালাতে পারব, তোমার উপরের ঘরে আমরা উৎপাত করতে আসব না। তা ভাই ললিতা, যদি ছাত্রী পাওয়া যায়, তাহলে আমি রাজি আছি।"

ললিতা কহিল—"আচ্ছা দেখাই যাক্না।"

হরিমোহিনী বারম্বার কহিতে লাগিলেন, "মা সকল বিষয়েই তোমরা খৃষ্টানের মত হলে চলবে কেন? গৃহস্থ ঘরের মেয়ে ইস্কুল পড়ায় এ ত বাপের বয়সে শুনিনি!"

পরেশ বাবুর ছাতের উপর হইতে আশপাশের বাড়ির ছাতে মেয়েদের মধ্যে আলাপ পরিচয় চলিত। এই পরিচয়ের একটা মস্ত কণ্টক ছিল, পাশের বাড়ির মেয়েরা এবাড়ির মেয়েদের এত বয়সে এখনো বিবাহ হইল না বলিয়া প্রায়ই প্রশ্ন এবং বিস্ময় প্রকাশ করিত। ললিতা এই কারণে এই ছাতের আলাপে পারৎপক্ষে যোগ দিত না।

এই ছাতে ছাতে বন্ধুত্ব বিস্তারে লাবণ্যই ছিল সকলের চেয়ে উৎসাহী। অন্য বাড়ির সাংসারিক ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে তাহার কৌতূহলের সীমা ছিল না। তাহার প্রাতিবেশীদের দৈনিক জীবন যাত্রার প্রধান ও অপ্রধান অনেক বিষয়ই দূর হইতে বায়ুযোগে তাহার নিকট আলোচিত হইত। চিরুণী হস্তে কেশসংস্কার করিতে করিতে মুক্ত আকাশ তলে প্রায়ই তাহার অপরাহ্নসভা জমিত।

ললিতা তাহার সংকল্পিত মেয়ে ইস্কুলের ছাত্রীসংগ্রহের ভার লাবণ্যের উপর অর্পণ করিল। লাবণ্য ছাতে ছাতে যখন এই প্রস্তাব ঘোষণা করিয়া দিল তখন অনেক মেয়েই উৎসাহিত হইয়া উঠিল। ললিতা খুসি হইয়া সুচরিতার বাড়ির একতলার ঘর ঝাঁড় দিয়া ধুইয়া সাজাইয়া প্রস্তুত করিতে লাগিল।

কিন্তু তাহার স্কুলঘর শূন্যই রহিয়া গেল। বাড়ির কর্ত্তারা তাঁদের মেয়েদের ভুলাইয়া পড়াইবার ছলে ব্রাহ্ম-বাড়িতে লইয়া যাইবার প্রস্তাবে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এমন কি, এই উপলক্ষ্যেই যখন তাঁহারা জানিতে পারিলেন পরেশ বাবুর মেয়েদের সঙ্গে তাঁহাদের মেয়েদের আলাপ চলে তখন তাহাতে বাধা দেওয়াই তাঁহারা কর্ত্তব্য বোধ করিলেন। তাঁহাদের মেয়েদের ছাতে ওঠা বন্ধ হইবার জো হইল এবং ব্রাহ্মপ্রতিবেশীর মেয়েদের সাধু সংকল্পের প্রতি তাঁহারা সাধুভাষা প্রয়োগ করিলেন না। বেচারা লাবণ্য যথাসময়ে চিরুণী হাতে ছাতে উঠিয়া দেখে পার্শ্ববর্ত্তী ছাতগুলিতে নবীনাদের পরিবর্ত্তে প্রবীণাদের সমাগম হইতেছে এবং তাঁহাদের এক-জনের নিকট হইতেও সে সাদর সম্ভাষণ লাভ করিল না।

ললিতা ইহাতেও ক্ষান্ত হইল না। সে কহিল অনেক গরীব ব্রাহ্মমেয়ের বেথুন ইস্কুলে গিয়া পড়া দুঃসাধ্য, তাহাদের পড়াইবার ভার লইলে উপকার হইতে পারিবে।

এইরূপ ছাত্রী সন্ধানে সে নিজেও লাগিল সুধীরকেও লাগাইয়া দিল।

সেকালে পরেশ বাবুর মেয়েদের পড়াশুনার খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত ছিল। এমন কি, সে খ্যাতি সত্যকেও অনেক দূরে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। এই জন্য ইহারা মেয়েদের বিনা বেতনে পড়াইবার ভার লইবেন শুনিয়া অনেক পিতামাতাই খুসি হইয়া উঠিলেন।

প্রথমে পাঁচ ছয়টি মেয়ে লইয়া দুই চার দিনেই তাহার ইস্কুল বসিয়া গেল। পরেশ বাবুর সঙ্গে এই ইস্কুলের কথা আলোচনা করিয়া ইহার নিয়ম বাঁধিয়া ইহার আয়োজন করিয়া সে নিজেকে একমুহূর্ত্ত সময় দিল না। এমন কি, বৎসরের শেষে পরীক্ষা হইয়া গেলে মেয়েদের কিরূপ প্রাইজ দিতে হইবে তাহা লইয়া লাবণ্যর সঙ্গে ললিতার রীতিমত তর্ক বাধিয়া গেল—ললিতা যে বইগুলার কথা বলে লাবণ্যর তাহা পছন্দ হয় না, আবার লাবণ্যর সঙ্গে ললিতার পছন্দরও মিল হয় না। পরীক্ষা কে কে করিবে তাহা লইয়াও একটু তর্ক হইয়া গেল। লাবণ্য মোটের উপরে যদিও হারান বাবুকে দেখিতে পারিত না কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতে সে অভিভূত ছিল। হারান বাবু তাহাদের বিদ্যালয়ের পরীক্ষা অথবা শিক্ষা অথবা কোনো একটা কাজে নিযুক্ত থাকিলে সেটা যে বিশেষ গৌরবের বিষয় হইবে এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ মাত্র ছিল না। কিন্তু ললিতা কথাটাকে একেবারেই উড়াইয়া দিল—হারান বাবুর সঙ্গে তাহাদের এ বিদ্যালয়ের কোনো প্রকার সম্বন্ধই থাকিতে পারেনা।

দুই তিন দিনের মধ্যেই তাহার ছাত্রীর দল কমিতে কমিতে ক্লাশ শূন্য হইয়া গেল। ললিতা তাহার নির্জ্জন ক্লাসে বসিয়া পদশব্দ শুনিবামাত্র ছাত্রী সম্ভাবনায় সচকিত

হইয়া উঠে কিন্তু কেহই আসে না। এমনি করিয়া দুই প্রহর যখন হইয়া গেল তখন সে বুঝিল একটা কিছু গোল হইয়াছে।

নিকটে যে ছাত্রীটি ছিল ললিতা তাহার বাড়িতে গেল। ছাত্রী কাঁদো কাঁদো হইয়া কহিল—"মা আমাকে যেতে দিচ্চে না।" মা কহিলেন, অসুবিধা হয়। অসুবিধাটা যে কি তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল না। ললিতা অভিমানিনী মেয়ে; সে অন্য পক্ষে অনিচ্ছার লেশমাত্র লক্ষণ দেখিলে জেদ করিতে বা কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেই না। সে কহিল, যদি অসুবিধা হয় তা হলে কাজ কি!

ললিতা ইহার পরে যে বাড়িতে গেল সেখানে স্পষ্ট কথাই শুনিতে পাইল। তাহারা কহিল, সুচরিতা আজকাল হিন্দু হইয়াছে, সে জাত মানে, তাহার বাড়িতে ঠাকুর পূজা হয়, ইত্যাদি।

ললিতা কহিল সে জন্য যদি আপত্তি থাকে তবে না হয় আমাদের বাড়িতেই ইস্কুল বসিবে।

কিন্তু ইহাতেও আপত্তির খণ্ডন হইল না, আরো একটা কিছু বাকি আছে। ললিতা অন্য বাড়িতে না গিয়া সুধীরকে ডাকাইয়া পাঠাইল। জিজ্ঞাসা করিল, "সুধীর, কি হয়েছে সত্যি করে বল ত?"

সুধীর কহিল—"পানু বাবু তোমাদের এই ইস্কুলের বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লেগেচেন।"

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, দিদির বাড়িতে ঠাকুর পূজো হয় বলে?"

সুধীর কহিল—"শুধু তাই নয়।"

ললিতা অধীর হইয়া কহিল—"আর কি, বলই না।"

সুধীর কহিল—"সে অনেক কথা।"

ললিতা কহিল—"আমারো অপরাধ আছে বুঝি!"

সুধীর চুপ করিয়া রহিল। ললিতা মুখ লাল করিয়া বলিল—"এ আমার সেই ষ্টীমার যাত্রার শাস্তি! যদি অবিবেচনার কাজ করেই থাকি তবে ভাল কাজ করে প্রায়শ্চিত্ত করার পথ আমাদের সমাজে একবারেই বন্ধ বুঝি! আমার পক্ষে সমস্ত শুভকর্ম্ম এ সমাজে নিষিদ্ধ? আমার এবং আমাদের সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতির এই প্রণালী তোমরা ঠিক করেছ!"

সুধীর কথাটাকে একটু নরম করিবার জন্য কহিল—"ঠিক সে জন্যে নয়। বিনয় বাবুরা পাছে ক্রমে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন ওঁরা সেই ভয় করেন।"

ললিতা একেবারে আগুন হইয়া কহিল, "সে ভয়, না, সে ভাগ্য! যোগ্যতায় বিনয় বাবুর সঙ্গে তুলনা হয় এমন লোক ওঁদের মধ্যে ক'জন আছে!"

সুধীর ললিতার রাগ দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, "সে ত ঠিক কথা! কিন্তু বিনয় বাবু ত—"

ললিতা। ব্রাহ্মসমাজের লোক নন! সেই জন্যে ব্রাহ্মসমাজ তাঁকে দণ্ড দেবেন! এমন সমাজের জন্যে আমি গৌরব বোধ করিনে!

ছাত্রীদের সম্পূর্ণ তিরোধান দেখিয়া সুচরিতা, ব্যাপার খানা কি এবং কাহার দ্বারা ঘটিতেছে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। সে এসম্বন্ধে কোনো কথাটি না কহিয়া উপরের ঘরে সতীশকে তাহার আসন্ন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিতেছিল।

সুধীরের সঙ্গে কথা কহিয়া ললিতা সুচরিতার কাছে গেল, কহিল—"শুনেছ?"

সুচরিতা একটু হাসিয়া কহিল, "শুনি নি, কিন্তু সব বুঝেছি।"

ললিতা কহিল, "এ সব কি সহ্য করতে হবে?"

সুচরিতা ললিতার হাত ধরিয়া কহিল, "সহ্য করাতে ত অপমান নেই। বাবা কেমন করে সব সহ্য করেন দেখেছিস্ ত?"

ললিতা কহিল, "কিন্তু সুচি দিদি, আমার অনেক সময় মনে হয় সহ্য করার দ্বারা অন্যায়কে যেন স্বীকার করে নেওয়া হয়! অন্যায়কে সহ্য না করাই হচ্চে তার প্রতি উচিত ব্যবহার!"

সুচরিতা কহিল, "তুই কি করতে চাস্ তাই বল্!"

ললিতা কহিল, "তা আমি কিছু ভাবিনি—আমি কি করতে পারি তাও জানিনে—কিন্তু একটা কিছু করতেই হবে। আমাদের মত মেয়ে মানুষের সঙ্গে এমন নীচ ভাবে যারা লেগেছে তারা নিজেদের যত বড়লোক মনে করুক্ তারা কাপুরুষ। কিন্তু তাদের কাছে আমি কোনো মতেই হার মানব না—কোনো মতেই না। এতে তারা

যা করতে পারে করুক্!" বলিয়া ললিতা মাটিতে পদাঘাত করিল।

সুচরিতা কোনো উত্তর না করিয়া ধীরে ধীরে ললিতার হাতের উপর হাত বুলাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে কহিল, "ললিতা, ভাই, একবার বাবার সঙ্গে কথা কয়ে দেখ্।"

ললিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমি এখন তাঁর কাছেই যাচ্চি।"

ললিতা তাহাদের বাড়ির দ্বারের কাছে আসিয়া দেখিল নতশিরে বিনয় বাহির হইয়া আসিতেছে। ললিতাকে দেখিয়া বিনয় মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল—ললিতার সঙ্গে দুই একটা কথা কহিয়া লইবে কি না সে সম্বন্ধে তাহার মনে একটা বিতর্ক উপস্থিত হইল—কিন্তু আত্ম-সম্বরণ করিয়া ললিতার মুখের দিকে না চাহিয়া তাহাকে নমস্কার করিল ও মাথা হেঁট করিয়াই চলিয়া গেল।

ললিতাকে যেন অগ্নিতপ্ত শেলে বিদ্ধ করিল। সে দ্রুতপদে বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই একেবারে তাহার মাতার ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার মা তখন টেবিলের উপর একটা লম্বা সরু খাতা খুলিয়া হিসাবে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

ললিতার মুখ দেখিয়াই বরদাসুন্দরী মনে শঙ্কা গণিলেন। তাড়াতাড়ি হিসাবের খাতাটার মধ্যে একেবারে নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবার প্রয়াস পাইলেন—যেন একটা কি অঙ্ক আছে যাহা এখনি মিলাইতে না পারিলে তাঁহার সংসার একেবারে ছারখার হইয়া যাইবে।

ললিতা চৌকি টানিয়া টেবিলের কাছে বসিল। তবু বরদাসুন্দরী মুখ তুলিলেন না। ললিতা কহিল—"মা"!

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "রোস্ বাছা, আমি এই—" বলিয়া খাতাটার প্রতি নিতান্ত ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

ললিতা কহিল, "আমি বেশিক্ষণ তোমাকে বিরক্ত করব না। একটা কথা জান্তে চাই। বিনয় বাবু এসে-ছিলেন ?"

বরদাসুন্দরী খাতা হইতে মুখ না তুলিয়া কহিলেন "হাঁ"।

ললিতা। তাঁর সঙ্গে তোমার কি কথা হল ?

সে অনেক কথা।

ললিতা। আমার সম্বন্ধে কথা হয়েছে কি না ?

বরদাসুন্দরী পলায়নের পন্থা না দেখিয়া কলম ফেলিয়া খাতা হইতে মুখ তুলিয়া কহিলেন, "তা বাছা হয়েছিল! দেখ্‌লুম যে ক্রমে বাড়াবাড়ি হয়ে পড়চে—সমাজের লোকে চারদিকেই নিন্দে করচে তাই সাবধান করে দিতে হল।"

লজ্জায় ললিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল, তাহার মাথা ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কি বিনয় বাবুকে এখানে আস্‌তে নিষেধ করেছেন ?"

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "তিনি বুঝি এসব কথা ভাবেন ? যদি ভাব্‌তেন তাহলে গোড়াতেই এ সমস্ত হতে পারত না!"

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, "পানু বাবু আমাদের এখানে আস্‌তে পারবেন ?"

বরদাসুন্দরী আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "শোন একবার! পানু বাবু আস্‌বেন না কেন ?"

ললিতা। বিনয় বাবুই বা আস্‌বেন না কেন ?

বরদাসুন্দরী পুনরায় খাতা টানিয়া লইয়া কহিলেন, "ললিতা, তোর সঙ্গে আমি পারিনে, বাপু! যা এখন আমাকে জ্বালাস্‌নে—আমার অনেক কাজ আছে!"

ললিতা দুপুর বেলায় সুচরিতার বাড়িতে ইস্কুল করিতে যায় এই অবকাশে বিনয়কে ডাকাইয়া আনিয়া বরদাসুন্দরী তাঁহার যাহা বক্তব্য বলিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন, ললিতা টেরও পাইবে না। হঠাৎ চক্রান্ত এমন করিয়া ধরা পড়িল দেখিয়া তিনি বিপদবোধ করিলেন। বুঝিলেন, পরিণামে ইহার শান্তি নাই এবং সহজে ইহার নিষ্পত্তি হইবে না। নিজের কাণ্ডজ্ঞানহীন স্বামীর উপর তাঁহার সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল। এই অবোধ লোকটিকে লইয়া ঘরকন্না করা স্ত্রীলোকের পক্ষে কি বিড়ম্বনা!

ললিতা হৃদয়ভরা প্রলয় ঝড় বহন করিয়া লইয়া চলিয়া গেল। নীচের ঘরে বসিয়া পরেশ বাবু চিঠি লিখিতেছিলেন, সেখানে গিয়াই একেবারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, বিনয় বাবু কি আমাদের সঙ্গে মেশবার যোগ্য নন্ ?"

প্রশ্ন শুনিয়াই পরেশ বাবু অবস্থাটা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার পরিবার লইয়া সম্প্রতি তাঁহাদের সমাজে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তাহা পরেশ বাবুর অগোচর ছিল না। ইহা লইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট চিন্তা করিতেও

হইতেছে। বিনয়ের প্রতি ললিতার মনের ভাব সম্বন্ধে যদি তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত না হইত তবে তিনি বাহিরের কথায় কিছুমাত্র কান দিতেন না। কিন্তু যদি বিনয়ের প্রতি ললিতার অনুরাগ জন্মিয়া থাকে তবে সে স্থলে তাঁহার কর্ত্তব্য কি সে প্রশ্ন তিনি বরাবর নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা লওয়ার পর তাঁহার পরিবারে আবার এই একটা সঙ্কটের সময় উপস্থিত হইয়াছে। সেই জন্য একদিকে একটা ভয় এবং কষ্ট তাঁহাকে ভিতরে ভিতরে পীড়ন করিতেছে অন্যদিকে তাঁহার সমস্ত চিত্তশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া বলিতেছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের সময় যেমন একমাত্র ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি, সত্যকেই সুখ সম্পত্তি সমাজ সকলের উর্দ্ধে স্বীকার করিয়া জীবন চিরদিনের মত ধন্য হইয়াছে এখনো যদি সেইরূপ পরীক্ষার দিন উপস্থিত হয় তবে তাঁহার দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া উত্তীর্ণ হইব।

ললিতার প্রশ্নের উত্তরে পরেশ বাবু কহিলেন—"বিনয়কে আমি ত খুব ভাল বলেই জানি। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধিও যেমন, চরিত্রও তেমনি।"

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া ললিতা কহিল—"গৌর বাবুর মা এর মধ্যে দুদিন আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। সুচিদিদিকে নিয়ে তাঁর ওখানে আজ একবার যাব?"

পরেশ বাবু ক্ষণকালের জন্য উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি নিশ্চয় জানিতেন বর্ত্তমান আলোচনার সময় এইরূপ যাতায়াতে তাঁহাদের নিন্দা আরো প্রশ্রয় পাইবে। কিন্তু তাঁহার মন বলিয়া উঠিল, যতক্ষণ ইহা অন্যায় নহে ততক্ষণ আমি নিষেধ করিতে পারিব না। কহিলেন "আচ্ছা যাও! আমার কাজ আছে, নইলে আমিও তোমাদের সঙ্গে যেতুম!"

বুদ্ধ সমাজ-সংস্কারক, না মুক্তি-প্রচারক?

(জি-দে লাফোঁর ফরাসী হইতে)

এখন যদি আমরা বুদ্ধ-জীবনের সমস্ত উপাখ্যান-ভাগকে শুধু কবিকল্পনা বলিয়া নির্দ্ধারণ করি, তবে বুদ্ধজীবনের কোন্ অংশটিকে ঐতিহাসিক বলা যাইতে পারে? প্রাচীন কালের মহাকাব্য মাত্রই সৌর-উপাখ্যান—জর্ম্মান পণ্ডিতদিগের একটি নব্য সম্প্রদায় এইরূপ যে একটি মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, এস্থলে সে সম্বন্ধে আমরা কোন তর্ক উত্থাপন করিব না। Senart তাঁহার বুদ্ধ-উপাখ্যান নামক প্রবন্ধে, বুদ্ধজীবনের উপাখ্যানকে সৌর-উপাখ্যান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, বুদ্ধের জননী মায়াদেবী—সন্তান প্রসব করিবার পরেই যাঁহার মৃত্যু হয়—তিনি সেই প্রাভাতিক বাষ্প যাহা সূর্য্য-কিরণের দ্বারা অপসারিত হইয়া থাকে; বুদ্ধ—যিনি মায়াদেবীর কুক্ষি হইতে নিঃসৃত হইয়াছেন, তিনি সেই সূর্য্য যাহা তিমিররাশির মধ্য হইতে বাহির হইয়া থাকে। বুদ্ধ—যিনি বোধি-বৃক্ষতলে বসিয়া পাপ-পুরুষ মারের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তিনি সেই সৌর বীর যাঁহার চারিদিকে শৃঙ্খলমুক্ত ঝটিকা ছুটিয়া বেড়ায়;—আর বোধিবৃক্ষ কি?—না, মেঘরূপ বৃক্ষ। বুদ্ধদেব যে "ধর্ম্মচক্র" প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা কি?—না সেই সূর্য্য যাহার অগ্নিময় চক্র আকাশে বিঘূর্ণিত হইয়া থাকে। যে নগরে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই কপিলবস্তু কি?—না, বায়ুমণ্ডলের একটি নগর। এই মতটিতে একটু গুণপনা মাত্র প্রকাশ পাইতে পারে; তাহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। Oldenberg, তাঁহার বুদ্ধসম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থে, এই ফরাসী পণ্ডিতের মতটি তন্ন তন্ন রূপে আলোচনা করিয়া, তাঁহার সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। নিজের আদর্শ অনুসারে অন্যকে বিচার করা, নিজের ধারণা, নিজের আচার ব্যবহার, নিজের রীতি-নীতি অন্যতে আরোপ করা—এইরূপ একটা গর্হিত প্রবণতা আমাদের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা আমরা ভাবি না, যে যুগ আমাদের যুগ হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন সেই যুগের কথা বিচার করিতে হইলে, সেই যুগে আপনাকে লইয়া যাইতে হয়।

আমাদের মধ্যে যদি জীবন-চরিত লিখিবার একটা বাতিক থাকে—যে বাতিকের জোরে, আমাদের প্রখ্যাত লোকদিগের জীবনের ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র ঘটনা সকলও আমরা লিপিবদ্ধ করিয়া থাকি,—তাই বলিয়া, ঐরূপ বাতিক যে পুরাকালের সভ্য জাতিদিগের মধ্যেও থাকিবে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা ঠিক্ নহে। বস্তুত তাহার বিপরীতই দেখা

যায়। এই কারণেই পুরাকালের প্রসিদ্ধ লোকদিগের—বিশেষত. ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদিগের—যাহাকে প্রকৃত জীবন-চরিত বলে—সেরূপ কোন জীবন-চরিত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জরথুস্ত্রা, কংফুচু, মুসা, বুদ্ধ—তাঁহাদের শৈশবে কি করিতে পারিতেন. না৹ পারিতেন, তাহাতে প্রাচীনদিগের কিছুই আসিয়া যাইত না; তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থাই প্রাচীনদিগের নিকট গৌরবের জিনিস বলিয়া মনে হইত। কাজের দ্বারাই মানুষের যোগ্যতা নির্দ্ধারিত হয়। কাজের ভাল মন্দ আলোচনা করিয়াই কার্য্যকর্ত্তাকে বিচার করিতে হয়। ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদিগের সম্বন্ধে এই একটা বিশেষত্ব দেখা যায় যে তাঁহাদের শৈশব ও যৌবনের ঘটনা-সমূহ প্রায়ই তমসাচ্ছন্ন! মিসর দেশ হইতে প্রস্থান করিবার সময় মুসার বয়স ৮০ বৎসর ছিল এবং তিনি হেলিয়োপোলিসের পুরোহিত ছিলেন—এই দুইটি তথ্য ভিন্ন Exodus গ্রন্থ হইতে আর কিছুই জানা যায় না। জরথুস্ত্রা সম্বন্ধেও এই একই রূপ নীরবতা। বুদ্ধ যিনি ৪০ বৎসর বয়সে ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন এবং মহম্মদ যিনি ঐ একই বয়সে প্রবক্তার কার্য্য আরম্ভ করেন—ইঁহাদের সম্বন্ধেও এই একই কথা। Evangeles গ্রন্থেও খৃষ্টের শৈশবের কথা কিছুই নাই; ৩০ বৎসর বয়ক্রম কালে খৃষ্টের প্রচার কার্য্য আরম্ভ হয়। অতএব, বুদ্ধ কিরূপ ছিলেন জানিতে হইলে, বুদ্ধের প্রচার ও উপদেশ সম্বন্ধে যে সব গ্রন্থ আছে, সেই সব গ্রন্থের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হয়। তাঁহার যেরূপ অসাধারণ বুদ্ধি ছিল, তিনি যেরূপ গম্ভীর-প্রকৃতি ও চিন্তাশীল ছিলেন, তাহাতে ভারতের তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা দেখিয়া সমাজ-সংস্কারের কথা যে তাঁহার মনে উদয় হয় নাই, ইহা কখনই সম্ভব নহে। তিনি যেরূপ গভীর তত্ত্বানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে তখনকার পণ্ডিত দিগকে ছাড়াইয়া উঠিবারই কথা। কাজেও দেখা যায়, তিনি ধর্ম্মসংক্রান্ত ও দর্শনসংক্রান্ত বাগ্‌বিতণ্ডায় নিয়ত প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, কোন চিন্তাশীল দার্শনিককে বৌদ্ধধর্ম্ম কিছুই শিক্ষা দিতে পারে নাই; তাহার কারণ, কোন ধর্ম্মই কোন উচ্চ দর্শনতন্ত্রের উচ্চতম অংশের ব্যাখ্যা করে না; পরন্তু নিম্নতম অংশেরই ব্যাখ্যা করিয়া থাকে; কেন না, ধর্ম্মের উপদেশ সেই জনসাধারণের উদ্দেশেই প্রদত্ত হয় যাহারা নির্বোধ ও চিন্তা করিতে অসমর্থ। তাই ধর্ম্মব্যবস্থাপক মাত্রই স্বকীয় জ্ঞান ও ধীশক্তি হইতে এরূপ একটা বীজমন্ত্র বাহির করিতে চেষ্টা করেন যাহা সর্ব্বসাধারণের প্রতিই প্রযুজ্য; এবং এই অর্থেই তাঁহাদিগকে তাঁহাদের মতবাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত।

শাক্যমুনির চরিত্রগত বিশেষ লক্ষণ কি?—না, দয়া। বিশ্বমানবের দুঃখকষ্টে অনুকম্পান্বিত হইয়া তিনি চিন্তাশীল দার্শনিকের উচ্চভূমি পরিত্যাগ করিলেন; নিম্নবর্ণের লোক-দিগের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল; তাহাদের ঐহিক জীবনে কেবলই শ্রম, শ্রান্তি, রোগ, দুঃখক্লেশ এবং পারত্রিক জীবনে, সুদীর্ঘ দুঃখময় জন্মপরম্পরার কথা চিন্তা করিয়া, এই রাজকুমার,—যিনি জাত্যংশে ক্ষত্রিয় ও জ্ঞানাংশে ব্রাহ্মণ,—সকলের জন্য মুক্তির একটি বীজমন্ত্র আবিষ্কার করিতে অভিলাষী হইলেন। রাজপরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে ভিক্ষুর বেশ ধারণ করিয়া, তিনি পৃথিবীর সমস্ত অধিকার-চ্যুত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করি-লেন; ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগের জন্য মঠ নির্ম্মাণ করিলেন; উহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যব্রতে ব্রতী করিলেন; এইরূপে, এক আঘাতেই বর্ণভেদের লৌকিক প্রাচীর ভগ্ন করিলেন; এবং তাঁহার চিন্তাপ্রবাহকে নিম্নলিখিত সূত্রের আকারে পরিণত করিলেন:—"আমার এই ধর্ম্ম সকলের পক্ষেই হিতজনক; এবং যাহা সকলের পক্ষে হিতজনক সে ধর্ম্মটি কি? সে এমন একটি ধর্ম্ম যাহা অবলম্বন করিয়া, 'দূরাগত' প্রভৃতির ন্যায় অতি দীনহীন ভিক্ষুকও আপনা-দিগকে ধর্ম্মশীল করিয়া তুলিয়াছে।" যে যুগের এই কথা-গুলি, সেই যুগে যদি আপনাকে লইয়া যাও, এবং মনু-সংহিতা, বর্ণভেদের যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর উঠাইয়াছে তাহা যদি বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলে বুঝিবে এই কথাগুলির মধ্যে কতটা মহত্ত্ব আছে।

কতকগুলি পণ্ডিতের মত অনুসরণ করিয়া, বুদ্ধকে সমাজ-সংস্কারকরূপে দাঁড় করিতে যাওয়া একটা ভারী ভুল। রাষ্ট্রনীতি আসলে গৌণ-শ্রেণীয় নীতির মধ্যে ধর্ত্তব্য, কেননা, উহা বিশ্বমানবের কিয়দংশের স্বার্থ লইয়াই ব্যাপৃত;

অতএব, বুদ্ধকে রাষ্ট্রনৈতিকরূপে দাঁড় করাইতে গেলে তাঁহাকে ছোট করা হয়। তাঁহার উর্দ্ধ দৃষ্টি অন্যত্র ছিল; এই পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট হইতে মানুষকে উদ্ধার করা, সুখ ও দুঃখকে, দৈন্য ও সমৃদ্ধিকে সমানরূপে অবজ্ঞা করিতে শিক্ষা দেওয়া, যাহাতে মানুষের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয় সেইরূপ ধ্যানে নিমগ্ন হইতে উপদেশ দেওয়া, ইহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ জীবন যাপন করিয়া, প্রতিবাসীর প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য প্রকাশ করিয়া, মানুষ আপনার আত্মাকে উন্নত করিতে পারে, এবং এইরূপে মৃত্যুকালে সেই বিশুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয় যাহাতে করিয়া তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, এবং সে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া, সংসারচক্র অতিক্রম করিয়া, নিত্য শান্তি লাভ করে। মানুষের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য ইহাই বুদ্ধের উপদেশ। বুদ্ধ যে সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না তাহার প্রমাণ—বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম অবিরোধে পাশাপাশি একত্র বাস করিত; লোকসংখ্যা ও আচার ব্যবহারে বিভিন্ন হইলেও, তিব্বৎ, চীন, ব্রহ্মদেশ হইতে সিংহল পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসারিত হইয়াছিল; কেবল পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে, অর্থাৎ বুদ্ধদেবের মৃত্যুর প্রায় ১২০০ বৎসর পরে,—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উৎপীড়নে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে তিরোহিত হয়। তা'ছাড়া, বুদ্ধ যে সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না, তাহার আর এক প্রমাণ,—যেখানে আজিও বৌদ্ধধর্ম্ম রহিয়াছে—সেই সিংহলে ক্ষত্রিয়বর্ণ রহিত হয় নাই (৪১)। অতএব, জাতিভেদ উঠাইয়া দেওয়া তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, পরন্তু তাঁহার উপদেশের ফলে কার্য্যতঃ জাতিভেদ উঠিয়া যায়। তিনি পৌরোহিত্যপদ সকলের জন্যই উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন ও মঠের ভিক্ষুদের জন্য চিরব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন;—এই কারণেই ব্রাহ্মণ-বর্ণ রহিত হইয়া যায়। কেন না, ব্রাহ্মণেরা অপর বর্ণকে আপনাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিত না; পাছে ভিন্ন বর্ণের লোক তাহাদের মধ্যে মিশিয়া যায় এই জন্য ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকেই বিবাহ করিত, অপর বর্ণের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল।

কিরূপ চিন্তাপ্রণালী অনুসরণ করিয়া বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্ম ব্যবস্থা সকল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যদিও ইহা খুব নিশ্চিতরূপে এখন বলা বড়ই কঠিন, কিন্তু তাঁহার জীবন-চরিত ও তাঁহার উপদেশাদি হইতে এই সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া যায়। শাক্যমুনি শৈশব হইতেই ধ্যান-প্রবণ ছিলেন; তাঁহার বয়স-সুলভ ও তাহার উচ্চপদ-সুলভ আমোদ-প্রমোদে তিনি কখন যোগ দিতেন না। অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মচিন্তার আবির্ভাব হইলে, মানুষ বাহ্যবিষয়ে আর সুখ পায় না, সংসার তাহার নিকট আর রমণীয় বলিয়া মনে হয় না। শাক্যমুনি শীঘ্রই সংসারের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিলেন; তাঁহার যেরূপ সুকুমার হৃদয়, তাঁহার যেরূপ প্রখর বুদ্ধি, তাহাতে তিনি রাজদরবারের অসার ও কলুষিত জীবন-প্রণালী গ্রহণ করিতে পারিলেন না এবং যদিও তিনি এমন একটি সুপত্নী পাইয়াছিলেন যে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিত, যাহা হইতে তিনি একটি পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন—তবু তিনি স্ত্রী, পুত্র, রাজত্ব সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া তাপসব্রত অবলম্বন করিলেন। এই সময়ে গৌতম, শুধু নিজের মুক্তি চিন্তা করিতে-ছিলেন, শুধু পরম সত্যের অন্বেষণ করিতেছিলেন। ইহার জন্য তিনি সকল প্রকার ক্লেশস্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন। যে সন্ন্যাসীদিগের দ্বারা ভারত তখন পরিব্যাপ্ত ছিল, সেই সন্ন্যাসীদিগের দৃষ্টান্ত অনুসারে তিনি একজন প্রসিদ্ধ বিদ্বান ও শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং সূক্ষ্মতত্ত্বালোচনার সঙ্গে সঙ্গে, যার-পর-নাই কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যে সত্যের অন্বেষণ করিতেছিলেন তাহা প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, তপশ্চরণে তাঁহার শরীর ক্ষীণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িল; তখন তিনি একাকী একটা অরণ্যে গিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। অবশেষে সেই স্থানেই তিনি দুঃখের মূল কারণ ও দুঃখ নিবারণের উপায় আবিষ্কার করিলেন। যে জ্ঞানের জন্য তাঁহার একটা জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল, অবশেষে সেই জ্ঞান তিনি লাভ করিলেন। কিন্তু সেই জ্ঞান লাভ করিয়া এখন তিনি কি করিবেন? এই সময়ে হয়ত প্রচারের কথা তাঁহার মনে আসিয়াছিল, কিন্তু যখন ভাবিলেন এই প্রচারকার্য্য কি বিশাল ব্যাপার, তখন ভীত হইয়া সে সঙ্কল্প আবার পরিত্যাগ করিলেন। তিনি বলিলেন,— "যাহারা এখানকার সংসার-আবর্ত্তেই ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই

সব মনুষ্যের পক্ষে কার্য্যকারণতত্ত্ব, লয়তত্ত্ব, বিয়োগতত্ত্ব তৃষ্ণা ও বাসনার ক্ষয়, নির্ব্বাণ—এই সমস্ত বিষয় মনে ধারণা করা বড়ই কঠিন। অনেক কষ্টকর সংগ্রামের পর যাহা আমি লাভ করিয়াছি, তাহা জগতের নিকটপ্রকাশ করায় কি ফল? যাহার মন রাগ ও দ্বেষে পূর্ণ, সত্য তাহার নিকট চিরকালই প্রচ্ছন্ন থাকে।" এই সময়ে গৌতম, ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে প্রায় উদ্যত হইয়াছিলেন, তিনি বিজন বনে শান্তভাবে তাপসের জীবন যাপন করিবেন এবং শান্তচিত্তে নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন, এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণ এই স্বার্থপর ও কাপুরুষোচিত সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তিনি যে সত্য লাভ করিয়াছেন, তাহা জগতের নিকট প্রচার করিতে হইবে; যে সকল হতভাগ্য লোক, দুঃখকষ্টের মধ্যে জীবন যাপন করিতেছে, যাহাদের জীবনে সুখের আশামাত্র নাই, তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হইবে। অবশেষে তাঁহার ধর্ম্ম তিনি প্রচার করিবেন বলিয়া স্থির সঙ্কল্প হইলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন:—"নিত্যধামের দ্বার সকলের প্রতিই উদ্‌ঘাটিত হউক, যাহাদের কাণ আছে তাহারা এই কথা শুনুক ও শুনিয়া বিশ্বাস করুক।" শাক্যসিংহ অরণ্য পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যনগরী বারাণসীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন; এই খানেই তিনি তাঁহার প্রথম উপদেশ বিবৃত করিলেন,—সেই উপদেশের মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম্মের মুখ্য তত্ত্বগুলি সন্নিবিষ্ট আছে; এবং এই খানেই ৪০ বৎসর ধরিয়া তিনি তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি তাঁহার উপদেশের মধ্যে ঈশ্বরেরও উল্লেখ করিলেন না, জগতেরও উল্লেখ করিলেন না; বৌদ্ধধর্ম্মের যাহা একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়, সেই মুক্তি ও মুক্তিলাভের উপায় সম্বন্ধেই উপদেশ দিলেন। এই খানেই বুদ্ধের মনোগত চিন্তা ও হৃদয়ের তীব্র অনুভবশীলতা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। মানুষ দুঃখভোগ করিতেছে, কিন্তু মানুষের দুঃখভোগ করা উচিত নহে। মানুষ অজ্ঞ হউক বা জ্ঞানী হউক, জগতের উৎপত্তি ও পরিণাম জানুক বা নাই জানুক, এই জগৎ সসীম কি অসীম, মৃত্যুর পরেও সাধুপুরুষের অস্তিত্ব থাকে কি থাকে না—এসম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান থাকুক বা নাই থাকুক তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। এসমস্ত বিষয়ের উপর মানুষের শান্তি ও পরমতত্ত্বের জ্ঞান নির্ভর করে না, অতএব এ সমস্ত নিরর্থক। কিন্তু দুঃখ, দুঃখের মূল কারণ, দুঃখ নিবারণ ও দুঃখ নিবারণের উপায়,—এই চারিটি মুখ্যতত্ত্ব মানুষের জানা নিতান্তই আবশ্যক। যদি বুদ্ধ ঈশ্বরের কোন উল্লেখ করিয়া না থাকেন তবে তাহা অজ্ঞতাপ্রযুক্ত নহে (যাহা Barthelemy—Saint-Hilaireএর বিশ্বাস) পরন্তু তাঁহার মূল লক্ষ্য যে মুক্তি তাহার সহিত উহার কোন সংশ্রব নাই বলিয়াই উল্লেখ করেন নাই।

তা'ছাড়া, যে সকল বচনে ঈশ্বরের উল্লেখ আছে সেই সকল বচন সহজেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ইহার প্রমাণ—তিনি একস্থলে বলিয়াছেন:—"যে গৃহে সন্তানেরা পিতামাতাকে ভক্তি করে, সেই গৃহে ব্রহ্ম বাস করেন।" "অভিধর্ম্ম-কোষ" গ্রন্থের একস্থলে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটি বচন আছে, যাহা পাঠ করিলে এবিষয়ে আর কোন সংশয় থাকিতে পারে না:—"জীবেরা ঈশ্বরের দ্বারাও সৃষ্ট হয় নাই, আত্মার দ্বারাও সৃষ্ট হয় নাই, পঞ্চভূতের দ্বারাও সৃষ্ট হয় নাই।" এখানে এই বিষয়ের আলোচনা আর অধিক করিব না—যে অধ্যায়ে বৌদ্ধ মতবাদসমূহের ব্যাখ্যা করিব, সেই খানে আবার এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে। এখন আমি শুধু এইটুকু দেখাইব যে, তাঁহার সমসাময়িক ও ভবিষ্যৎযুগের দার্শনিক পণ্ডিতদিগের অবজ্ঞার পাত্র হইবার আশঙ্কাসত্ত্বেও, বুদ্ধদেব, ইতর সাধারণের—অর্থাৎ অজ্ঞ, দুর্ব্বলচিত্ত ও দরিদ্রদিগের মুক্তির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। সে সময়ে ভারতে যে সকল দর্শনতন্ত্র বিদ্যমান ছিল, তাহাদের অপেক্ষা উচ্চতর না হউক, তাহাদের সমান কোন এক দর্শনতন্ত্র তিনি স্থাপন করিলেও করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া, স্বশ্রেণীর লোকের নিন্দার ভাজন হইয়াও তিনি তাঁহার ধর্ম্মকে শুধু নৈতিক ভিত্তির উপর সংস্থাপন করিলেন, সকলকেই তৎগ্রহণের অধিকারী করিলেন এবং যে সকল বিষয়ের মীমাংসা করা অতীব দুরূহ, যে-সকল সমস্যার সহিত আধ্যাত্মিক মুক্তির কোন সংশ্রব নাই, সে সমস্ত এক পাশে সরাইয়া রাখিলেন;—চিত্রপটের আলোক-

ভাগে না আনিয়া ছায়া-ভাগে রাখিয়া দিলেন। খৃষ্টও কি ঐরূপ ধরণে কাজ করেন নাই? খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে যে কতকগুলি দুর্জ্ঞেয় রহস্য আছে, তাহা শুধু ভক্তদিগের জীবনে ব্যবহার করিবার জন্যই রহিয়াছে, তাহা চিন্তা-আলোচনার বিষয় নহে।

যাই হোক, বুদ্ধদেব যে করুণ-হৃদয় ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। তিনি বলিয়াছেন, "আমার এই মুক্তির ধর্ম্ম সকলেরই জন্য", এবং বিশ্বমানবের দুঃখ নিবারণের জন্য, তিনি একটি উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন; মনকে সমাহিত করিয়া, যোগে নিমগ্ন হইয়া, মন্ত্রাদি আবৃত্তি করিয়া, সংসারের দুঃখ সমূহকে অতিক্রম করিতে হইবে;—ইহাই তাঁহার উপদেশ।

যোগসাধন অপেক্ষা দুঃখ নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায় আর কি হইতে পারে?

অবশ্য, শাক্যমুনি,—বুদ্ধিমান, সুপণ্ডিত অনেক ব্রাহ্মণকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে কোনরূপ অনিচ্ছা কিংবা অবজ্ঞা প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু সেইরূপ সমান ভাবে, তিনি দরিদ্র অজ্ঞ ও দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিকেও সাদরে গ্রহণ করিতেন। অনেকগুলি বচনের দ্বারা আমাদের এই কথা সপ্রমাণ হয়; এবং এই কারণেই, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য সন্ন্যাসীরা তাঁহার বিদ্বেষী ছিল।

পূর্ণ নামক এক ব্যক্তির কাহিনী দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কোন বণিকের ঔরসজাত দাসীপুত্র পূর্ণ, দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া প্রভূত অর্থসঞ্চয় করে। তাহার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কাহাকে বিবাহ করিতে চাও? কিন্তু পূর্ণ উত্তর করিল:—"আমি ইন্দ্রিয় সুখের অভিলাষী নই। আপনার অনুমতি পাইলে, আমি ভিক্ষু-ব্রত গ্রহণ করিব।" তাহার ভ্রাতা যার-পর-নাই বিস্মিত হইয়া বলিল;—"কি! যখন আমরা দরিদ্র ছিলাম তখন ভিক্ষুবৃত্তি অবলম্বন করিবার কথা তোমার মনে আসে নাই; আর এখন আমরা ধনশালী হইয়াছি—এখন তুমি কিনা ধর্ম্মব্রত গ্রহণ করিবে?" অতএব ইহা হইতে সপ্রমাণ হয়, যাহারা দীন দরিদ্র নিরুপায় তাহারাও বুদ্ধের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিত। তাই ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধকে যখন-তখন উপহাস করিত। কোন অজাত-শিশু সম্বন্ধে উপদেশ দিবার সময় তিনি তাঁহার মনোভাব এইরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন:—"যখন গৌতম বলিয়াছিলেন, ঐ গর্ভস্থ শিশু আমার ধর্ম্মই অবলম্বন করিবে, তখন তিনি সত্য কথাই বলিয়াছিলেন। যখন তোমার পুত্রের অশন বসনের কোন উপায় থাকিবে না, তখন সে নিশ্চয়ই ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিবার জন্য, শ্রমণ গৌতমের নিকট আসিবে।" (৪৪)

একজন দুর্দশাগ্রস্ত দ্যূতকার, সংসারে বিরাগী হইয়া, ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিবার উদ্দেশে এই কথা বলে—"তখন আমি উন্নত মস্তকে রাজপথে চলিব।" আবার, কোশল-রাজের ভ্রাতা কাল নামক একটি যুবাপুরুষ, কোশলরাজের আদেশক্রমে ছিন্নাঙ্গ হওয়ায়, বুদ্ধের শিষ্য আনন্দ যখন তাহার ক্ষত সারাইয়া দেন তখন সে বুদ্ধের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করে। গত শতাব্দীতে একজন ভিক্ষু, Rhodia জাতের নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করায় সিংহলরাজ যখন তাহাকে অপমানিত করেন, তখন সে এইরূপ উত্তর করে; "ধর্ম্ম সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি হওয়া উচিত।"

আমার মতে প্রচার কার্য্যটাই বুদ্ধদেবের উদার লোক-হিতৈষণার একটা জলন্ত প্রমাণ।

তাঁহার পূর্ব্বে, প্রচার বলিয়া কোন পদ্ধতি কোন ধর্ম্মের মধ্যেই ছিল না; সকল ধর্ম্মেরই নিকট উহা অজ্ঞাত ছিল। পুরাকালে দীক্ষিত ব্যক্তিরাই ধর্ম্মমতগুলি জানিতে পারিত, সাধারণ লোকের নিকট উহার আলোচনা নিষিদ্ধ ছিল। আবার ভারতবর্ষে, পুরোহিত-জাতি ব্রাহ্মণেরাই ঐ সকল গুহ্য ধর্ম্মমতের একমাত্র রক্ষক ছিল, এবং একমাত্র উহারাই শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিতে পারিত।

শাক্যমুনির আগমনে সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইল; বিশেষাধিকারসম্পন্ন বর্ণেরা যে সকল সত্যকে অতি সাবধানে নিজের হাতে রাখিয়া দিয়াছিল, শাক্যমুনি সেই সমস্ত সত্য প্রচার করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিলেন।

ইহা হইতেই, বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে খুব একটা সাধাসিধা ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। এই সাদাসিধা ভাব,—এই সরলতা—উহাদের সাহিত্যের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়।

যাহাতে নির্ব্বোধ লোকেরাও অনায়াসে বুঝিতে পারে এই জন্য কোন বিষয় সম্বন্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিতে হইলে, অসংখ্যবার পুনরাবৃত্তি করিয়া তাহা বিবৃত করা হইত। আমি বৌদ্ধধর্ম্মের আদিম মতগুলির কথা বলিতেছি। পরে, অন্য সকল ধর্ম্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মের মতগুলিও ক্রমশ রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রজ্ঞা-পারমিতার ন্যায় গ্রন্থগুলি দর্শনগ্রন্থ বই আর কিছুই নহে,—তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলভাবটি নষ্ট হইয়াছে। বৌদ্ধ-সাহিত্য, সাহিত্যের হিসাবে যে খুব উচ্চদরের নহে—মধ্যম শ্রেণীর সাহিত্য,—এই সরলতাই তাহার মূল কারণ।

সৎধর্ম্মের দ্বারা, সত্যের দ্বারা যাহাতে সমস্ত জগৎ উপকৃত হয়, বিশেষত নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা উপকৃত হয়, এই উদ্দেশেই তিনি প্রচার-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করেন। এবং তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য তিনি তাঁহার কতকগুলি শিষ্যকে প্রচারক-পদে বরণ করিয়াছিলেন—তাহারাই দেশ বিদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইত।

ফলত, বৌদ্ধ ভিক্ষু শুধু নিজে কঠোর তপশ্চরণ করিয়া, নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপন করিয়াই সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করিতেন না, পরন্তু কঠোর পরীক্ষার মধ্যে থাকিয়া যাহাতে তাঁহার শুভচেষ্টায় ফলভাগী অন্য লোকেও হইতে পারে—এইরূপ সিদ্ধিলাভই তিনি আকাঙ্ক্ষা করিতেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম যে এত শীঘ্র দেশবিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, প্রচার-পদ্ধতিই তাহার নিগূঢ় কারণ। বুদ্ধদেব শান্তিময় প্রচারকার্য্যের দ্বারাই তাঁহার ধর্ম্ম চতুর্দ্দিকে প্রসারিত করিয়াছিলেন; তাঁহার দিগ্বিজয়ের মধ্যে একটুও রক্তের দাগ দেখা যায় না।

তাই আমরা দেখিতে পাই, যাহারা ভিক্ষুসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পায় না, তাহাদের উল্লেখ করিয়া এইরূপ লিখিত হইয়াছে:—"যাহারা রক্তপাত করিয়াছে তাহারা ভিক্ষু হইতে পারিবে না।"

'পাতিমোক্ষ' সংহিতায়, মহাপাপী, ঋণগ্রস্ত ও সৈনিক-পুরুষদিগকে ভিক্ষুশ্রেণীর মধ্যে গ্রহণ করিতে নিষেধ আছে (৪৫)। শাক্যমুনির প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল তাহা বোধ হয় যথেষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে:—তিনি মানুষকে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, ও ধর্ম্মাচরণের শিক্ষা দিয়া, মানুষকে মুক্তিদান করিবার জন্যই ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তাই, দার্শনিকের আসন ত্যাগ করিয়া তিনি ধর্ম্মপ্রচারক হইয়া দাঁড়াইলেন; এবং যে সত্য তিনি পাইয়াছিলেন, তাহা ৪০ বৎসর ধরিয়া জনসমাজে প্রচার করেন।

অবদান-শতক হইতে একটা বাক্য আমি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; তাহার সত্যতা "সংযুক্ত-নিকায়" নামক পালী ভাষার বৃহৎ সঙ্কলন-গ্রন্থে, ও ধম্মপদের পালী-ভাষ্যেও সমর্থিত হইয়াছে। উহা হইতে বুদ্ধের দয়া ও জ্ঞানের পরিচয় এবং ভারতীয় আর্য্যদিগের কোমল স্বভাবের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়; ইহা যুদ্ধসম্বন্ধে গৌতমের উক্তি।

কোশল-রাজ প্রসেনজিৎ ও মগধ-রাজ অজাত শত্রু—এই উভয়ের মধ্যে শত্রুতা ছিল। প্রসেনজিৎ যুদ্ধে তিনবার পরাজিত হইয়া, তাহার পর তিনি অজাতশত্রুকে পরাভূত করিয়া বন্দী করেন। অজাতশত্রুকে বুদ্ধের নিকট আনিয়া প্রসেনজিৎ বুদ্ধকে এই কথাগুলি বলেন:—"আর্য্য! এই অজাতশত্রু অনেকদিন হইতে আমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিতেছেন, আমি কিন্তু ইঁহার কোন অনিষ্ট করি নাই। বিনা কারণে ইনি আমাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। আমি ইঁহার প্রাণ বধ করিতে চাহি না,—আমার মিত্রের পুত্র বলিয়া ইহাকে আমি ছাড়িয়া দিব।" বুদ্ধ উত্তর করিলেন:—"হাঁ, উহাকে ছাড়িয়া দেও।" তাহার পর ভগবান এই কথাগুলি বলিলেন:—"বিজয় হইতে শত্রুতা উৎপন্ন হয়, বিজিত দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়। যে ব্যক্তি শান্তিপ্রিয়, সে জয় পরাজয় পরিত্যাগ করিয়া কল্যাণপথে বিচরণ করে।"

"সংযুক্ত নিকায়ে" এই বিষয়টি আরও স্পষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে।

"তখন ভগবান্ এই বিষয় অবগত হইয়া, এই গাথাগুলি আবৃত্তি করিলেন:—কোন বিশেষ কারণে উত্তেজিত হইয়া মানুষ মানুষকে কষ্ট দেয়, কোন ব্যক্তি অন্যের নিকট হইতে কষ্ট পাইলে, সে আবার অন্যকে কষ্ট দেয়। যতক্ষণ না দুর্বিপাক উপস্থিত হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ না পাপের ফল পাকিয়া উঠে, ততক্ষণ মানুষ মোহে মুগ্ধ থাকে, দুর্বিপাক উপস্থিত হইলে মূঢ় ব্যক্তিরা কষ্ট পায়। হত্যাকারী

মাত্রই পরিণামে অন্য হত্যাকারীর বধ্য হয়; বিজেতা মাত্রই পরিশেষে অন্য বিজেতার দ্বারা বিজিত হয়; যে গালি দেয় সে আবার অন্যের নিকট হইতে গালি খায়; যে অন্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, সে আবার অন্যলোকের ক্রোধের পাত্র হয়" (৪৬) জলপাই-উদ্যানে খৃষ্ট যে কথা বলিয়াছিলেন, ইহা কি তাহারই ভাষান্তর-বাক্য নহে?—"যে কেহ অসির দ্বারা আঘাত করিবে, সে অসির আঘাতেই মরিবে।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাট বা নালিতা।

প্রথমাধ্যায়—পাটগাছের বর্ণনা ও জাতি এবং বংশভেদ।

১। পাট ও শস্য সংগ্রাম।

'পাট' শব্দে সাধারণ ভাবে পণ্য আঁসযুক্ত নানাপ্রকার ছোট ছোট গাছকে বুঝায়—যথা মেষ্টা পাট, সন পাট, কোষ্টা পাট ইত্যাদি। শুধু 'পাট' বলিলে আমাদের দেশে কোষ্টা পাট বা নালিতাকেই বুঝায়। এই পাটই 'জুট' নামে পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছে। ডাক্তার রক্সবরা নামক বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিলাতে নমুনা স্বরূপ কিছু পাট পাঠাইয়াছিলেন। সেই সময়ে কটকে কোম্পানি-বাহাদুরের একটি বৃহৎ দড়ির কারখানা ছিল, এবং তথায় পাটকে 'জোট' বলিত। রক্সবরা সেই কারখানায়ই প্রথম পাটের ব্যবহার দর্শন করেন, এবং তথা হইতে 'জুট' নাম দিয়া বিলাতে তাহার নমুনা পাঠাইয়াছিলেন। সেই অবধি আমাদের পাট বা নালিতা পাশ্চাত্য জগতে 'জুট' নামে পরিচয় লাভ করিয়াছে। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আমাদের দেশে পাট বা নালিতার চাস বড় একটা ছিল না। কিন্তু সেই সন হইতেই পাটের বাণিজ্য আরম্ভ হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। তখন আমাদের দেশে কাপাসই প্রধান আঁসশস্য ছিল। কিন্তু পাটের চাসের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই কাপাসের চাস কমিতে আরম্ভ করিল—এবং পাট তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিল। তাহাতেও পাটের চাসের বৃদ্ধি বন্ধ হইল না। পাট এখন ধানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইয়াছে। উভয়ের মধ্যে মহা সংগ্রাম উপস্থিত। কে বলিবে এই কুরুক্ষেত্রে আমাদের খাদ্যশস্য ধান্যেরই জয়লাভ হইবে কি বিদেশীর প্রয়োজনীয় আঁস শস্য পাটেরই জয় হইবে, এবং সেই সঙ্গে আমাদিগকে পাট খাইয়া জীবন ধারণ করিতে শিখিতে হইবে।

পাট বা নালিতা জিনিসটা আমাদের নূতন নয়। পুরাকাল হইতে শাকের জন্য আমরা নালিতা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দড়িদড়া এবং ছালার জন্য আমরা পাটের আঁসও কিছু কিছু ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। জানা যায় শাকরূপে এই নালিতা গ্রীক্‌দের মধ্যে এবং ভূমধ্যসাগরের পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর দেশেও ব্যবহৃত হইত। চীন দেশেও পাট বহুকাল অবধি প্রচলিত। অধুনা আমেরিকার যুক্তরাজ্যে পাট চাসের বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে না। সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার মিশরদেশে (Egypt) ও পাটচাসের বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে এবং তথায় কৃতকার্য্য হইবারও বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। সেই সকল দেশে যদি পাটের চাষে বিশেষ সুবিধা হয় তবে পাটের বাজারে বাঙ্গলাদেশের বর্ত্তমান একাধিপত্য আর থাকিবে না। তখন বোধ হয় পাটের চাষাদের পুনর্ম্মুষিক হইয়া ধান্য কি অন্য কোন খাদ্য-শস্যেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। যাহাহউক বর্ত্তমানে পাট আমাদের প্রধান শস্য এবং বাঙ্গালীমাত্রেরই তাহার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা কর্ত্তব্য। তাই আমরা পাটগাছের বিস্তারিত বর্ণনা করিতেছি।

২। পাট গাছের বর্ণনা।

নালিতার গাছ বর্ষজীবী (annual) অর্থাৎ একই বৎসরে বা খন্দে ইহার গাছ জন্মিয়া পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়া এবং ভবিষ্যদ্‌ বংশ বিস্তারের জন্য বীজ উৎপাদন করিয়া মরিয়া যায়। ইহার কাণ্ড সরল, ৪ হাত হইতে ৮ হাত পর্য্যন্ত লম্বা। ইহার পত্র সরল, এবং প্রত্যেক প্রথমটি প্রত্যেক তৃতীয়টির উপরে অবস্থিত (alternate), পত্রের আকার কিঞ্চিৎ লম্বাগোল (oblong), পত্রের কিনারা করাতের দাঁতের মত কাঁচিকাটা (serrate) এবং উভয় পার্শ্বের শেষ খণ্ডদ্বয়ের অগ্রভাগে এক একটি ছোট কেশের মত দৃষ্ট হয়। ইহার পুষ্পকাণ্ড (peduncle)

ছোট। ফুল ছোট, এবং হরিদ্রাবর্ণ। ফুলের বহিরাবরণ (calyx) কোন জাতির সংলগ্ন ৪।৫টি অংশ (sepal) যুক্ত, কোন জাতির পৃথক ৪।৫টি অংশ (sepal) যুক্ত। পুষ্পের পাপড়ি-চক্র (corolla) ৫টি পাপড়ি (petal) যুক্ত। পুষ্পগুলি নিকট সন্নিবেশিত। পরাগ কেশর (stamens) অনেক। গর্ভকোষ দুইটি হইতে ছয়টি পর্য্যন্ত প্রকোষ্ঠ যুক্ত। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে অনেকগুলি করিয়া বীজ। গর্ভকেশর ক্ষুদ্র। কোন কোন জাতীয় নালিতার ফল লম্বা সরু নলের মত, আর কোন জাতির ফল গোল। উদ্ভিদ্ জগতে নালিতা রুদ্রাক্ষাদির সহিত একজাতিভুক্ত (natural order Tiliaceæ)। নালিতা (corchorus) সেই জাতিরই একটি বর্ষজীবী শাখা (genus)। এই শাখার আবার নানা প্রশাখা (species) আছে, এবং তাহাদের সকলেরই বল্কলের ভিতরের অংশ (liber) হইতে পাট বাহির করা যায়। এই সকল প্রশাখা মধ্যে দুইটিই মাত্র আমাদের কৃষির অন্তর্গত। একটি ঘিয়া বা মিঠা নালিতা (corchorus olitorius) যাহা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে পাটের জন্য এবং শাক খাওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে চাষ হয়। এবং অপরটি তিক্ত নালিতা (corchorus capsularis)। তাহা পূর্ব্ববঙ্গে শাকের জন্য এবং প্রচুর পরিমাণে পাটের জন্য চাষ হয়। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন যে এই উভয় জাতিই ২।৩টি বন্য বা জলজ নালিতা (corchorus) জাতীয় (যথা বন্য তিতাপাট C. Acutangulus, বেহারের জঙ্গলিপাট C. Trilocalaris, এবং বিল নালিতা C. Fascicularis) গাছ হইতে অন্যোন্য-সংযোগ (Cross-fertilization) এবং চাষ দ্বারা উন্নীত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। দেশকাল এবং অবস্থা ভেদে আকৃতি প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিবার নালিতার যেরূপ আশ্চর্য্য শক্তি দৃষ্ট হয় উদ্ভিদজগতে সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। এই কারণে বৈজ্ঞানিকদিগের অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত মনে হয় না। পাটপাতা শুকাইয়া রাখিয়া সেই শুষ্ক পত্র ভিজান জল, আমাশয় রোগের একটি ভাল ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়।

৩। ঘিয়া বা মিঠা নালিতা।
(Corchorus olitorius)

ঘিয়া বা মিঠা নালিতা বর্ষাকালে কলিকাতা অঞ্চলে অনেক স্থানে চাষ হয়। ইহার গাছ ৩।৪ হাত লম্বা হয়। গাছের গায়ে ক্ষুদ্র রোঁয়া থাকে না, কিন্তু পত্রের বোঁটার (Petiole) শেষার্দ্ধ এবং পত্রশিরাগুলি (Veins) কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ রোঁয়াযুক্ত। পত্র সরল লম্বা গোল; তিতা পাট অপেক্ষা গোলই বেশি, লম্বা কম। পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু হইয়া থাকে। পত্রের কিনারাতে করাতের দাঁতের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ। পুষ্প-কাণ্ডে (Peduncle) ২।১টি মাত্র ফুল জন্মে। পুষ্প ক্ষুদ্র হরিদ্রাবর্ণ। পুষ্পের বহিরাবরণে (Calyx) পাঁচটি পৃথক অংশ (sepal)। ফল প্রায় নলাকার লম্বা ঈষৎবক্র। ফলের অগ্রভাগ সরু (beaked)। ফলের গায়ে লম্বালম্বি ১০টি করিয়া গভীর রেখা। ফলের ভিতর পাঁচটি পরদা দ্বারা পাঁচটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে অনেকগুলি করিয়া বীজ থাকে। বীজগুলিও পরদাদ্বারা পরস্পর বিভক্ত। বীজ সবুজবর্ণ, প্রায় ত্রিকোণ। পত্রের আস্বাদন মিষ্ট না হইলেও তেমন তিক্ত নয়। এজন্য ইহার চারা গাছের পাতা শাকের জন্য কলিকাতায় বিশেষ প্রচলিত।

৪। তিতা নালিতা (C. capsularis)

তিতাপাট পূর্ব্ববঙ্গের বর্ষাকালীন প্রধান ফসল। ইহার গাছ ৫।৭ হাত লম্বা হয়। পত্র সরল লম্বা-গোল কিন্তু মিঠা পাট অপেক্ষা লম্বায় বেশি, এবং গোল কম। পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, এবং কিনারা করাতের দাঁতের মত কাটা, এবং তাহার নিম্নতমভাগে কেশের ন্যায় অংশ। মোটামুটি তিতাপাটের গাছও দেখিতে মিঠা পাটের গাছেরই মত। তবে ইহার পুষ্প কাণ্ডে (Peduncle) অপেক্ষাকৃত বেশি সংখ্যক ফুল থাকে। ফুলের বহিরাবরণে (calyx) পরস্পর সংযুক্ত পাঁচটি অংশ (sepals)। পুষ্পগুলি মিঠাপাট অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়। এবং হরিদ্রাবর্ণ হইলেও কিঞ্চিৎ সাদা। পাপড়ি পাঁচটি। ইহার ফল গোল, অগ্রভাগ যেন কাটা। ফলের উপরিভাগ অসমান কর্কশ এবং রেখাযুক্ত। ফলের ভিতরে পাঁচটি বীজকোষ পরদা দ্বারা বিভক্ত। প্রত্যেক বীজকোষে অপেক্ষাকৃত

অল্প সংখ্যক বীজ পরদা দ্বারা অবিভক্ত। বীজকোষ পাঁচটির মাঝে মাঝে আরও পাঁচটি বীজ শূন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ। তিতাপাটের বীজও মিঠাপাটেরই ন্যায় ত্রিকোণ—কিন্তু ইহার বর্ণ লাল। এই লাল বর্ণ দৃষ্টেই তিতাপাটের বীজ সবুজ বর্ণ মিঠাপাটের বীজ হইতে বাছিয়া লওয়া যায়। আবার পত্রের তিক্ত আস্বাদন দ্বারা তিতাপাটের অতি ক্ষুদ্র চারাগাছ ও মিঠাপাটের চারাগাছ হইতে সহজেই বাছিয়া লওয়া যায়।

মিঠাপাট এবং তিতাপাট এই উভয়ই আমাদের কৃষির অন্তর্গত। আমাদের কৃষিবিৎ পণ্ডিত শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই উভয় জাতীয় নালিতা গাছের তুলনা করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহারও সারমর্ম্ম এস্থলে দেওয়া যাইতেছে। তিতাপাটের মূল শিকড় (Taproot) অপেক্ষাকৃত কম লম্বা। তাহার প্রধান শাখা শিকড় সকল মাটির উপরিভাগে অবস্থিত। এই কারণে এই জাতীয় গাছ অল্প পরিশ্রমেই টানিয়া উৎপাটিত করিতে পারা যায়। মিঠাপাটের মূল শিকড় অনেক বেশি লম্বা এবং প্রধান শাখা শিকড়গুলি মাটির অপেক্ষাকৃত অধিক নিম্নে অবস্থিত। এজন্য মিঠাপাট টানিয়া সহজে উৎপাটিত করা যায় না। তিতাপাটের কাণ্ড অপেক্ষাকৃত কম সরল এবং প্র-কাণ্ড অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক ও অধিক লম্বা। মিঠাপাটের কাণ্ড খুব সরল, প্র-কাণ্ডের সংখ্যা কম এবং দৈর্ঘ্যে ছোট। তিতাপাটের পত্রাঙ্গ (stipules) পৃথক, ও ঘনসন্নিবিষ্ট, মিঠাপাটের পত্রাঙ্গ (stipules) অল্প সংখ্যক ও সংযুক্ত। তিতা পাটের নিম্নের পত্রগুলি সহজে ঝরিয়া পড়ে না, কিন্তু মিঠাপাটের নীচের পাতাগুলি অতি সহজেই ঝরিয়া পরে। তিতাপাটের ফুল মিঠাপাটের ফুল অপেক্ষা ছোট। ফল তিতাপাটের গোল এবং মিঠাপাটের লম্বা। বীজ তিতাপাটের লাল এবং মিঠাপাটের সবুজ। আস্বাদন তিতাপাটের খুব তিক্ত এবং মিঠাপাটের অতি সামান্য রকম তিক্ত।

৭। নালিতার বংশভেদ (Races)।

মিঠাপাট এবং তিতাপাট উভয়ই নানা প্রকার দৃষ্ট হয়। অনেকে মনে করেন যে এই সকল প্রকার ভেদকে উপশাখা (variety) নাম দেওয়া যায় না। কারণ তাহাদের প্রকার ভেদের (type) স্থায়িত্ব দৃষ্ট হয় না। উভয় বিধ পাটেরই পৃথকত্ব বংশভেদ জনিত (race) বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই সকল বিভিন্ন প্রকার পাটের যে সকল বিষয়ে পার্থক্য দৃষ্ট হয় তাহা মোটামুটী এই:—(ক) একই সময়ে বপন করিলেও কতকগুলি বংশীয় পাট অতি অল্প সময়েই বর্দ্ধিত হইয়া পুষ্প ধারণ করে; আর কতকগুলির পুষ্প ধারণ করিতে বিলম্ব হয়। (খ) একই প্রকার চাষ করিলেও, পূর্ণ বিকাশ লাভ হইলে, কতকগুলি অত্যন্ত সতেজ এবং দীর্ঘ কাণ্ড যুক্ত, আর কতকগুলি অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ এবং কম দীর্ঘ হয়। (গ) কাণ্ডের (stem) পত্রদণ্ডের (Petiole) রংএর মধ্যে বংশানুসারে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। কতকগুলির বর্ণ সবুজ এবং কতকগুলির লাল। মোটামুটী দেখা যায় যে যে সকল পাট পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে অধিক সময় নেয়, সেই সকলই অধিক পরিমাণে পণ্য পাটের আঁস (Jute-fibre) উৎপন্ন করে। ইহাও দৃষ্ট হয় যে গাছগুলি পুষ্ট হইলে পণ্য পাটও ভাল হয়। মিঠাপাটের বংশভেদ অপেক্ষাকৃত অল্প। তন্মধ্যে কয়েকটী উল্লেখ-যোগ্য। (১) তোষ—ইহা পাবনার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জেই বিশেষ প্রচলিত, দেশী লাল পাট নামে ইহা হুগলি জেলায়, এবং হালবিলাতী নামে ত্রিপুরা জিলাতে প্রচলিত। ইহার কাণ্ড লাল রং। পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগে। অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমীতে ইহার চাষ হয়। ক্ষেত্রে জল জমিলে তোষ জাতীয় গাছ যতই বড় হউক না কেন, ভাল হয় না। বেলে মাটিতে এই পাট অন্যান্য পাট অপেক্ষা ভাল হয়। তোষগাছের কাণ্ডের নিম্নভাগে শিকড় গুচ্ছ বাহির হয় না। ইহার আঁস (fibre) শক্ত এবং ওজনে অধিক। কিন্তু এই পাটের বাজার দর তিতাপাট অপেক্ষা কম। (২) বাজি পাট—ইহা ঢাকা অঞ্চলে এবং (৩) সাতনটী ইহা ফরিদ পুর অঞ্চলে প্রচলিত। ইহাদের উভয়েরই কাণ্ড সবুজ বর্ণ। এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই ইহারা পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। (৪) দেওনাল্যা—ইহা ঢাকা অঞ্চলে প্রচলিত, কাণ্ডের বর্ণ সবুজ এবং ইহা পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে অত্যন্ত অধিক সময় লাগে।

তিতাপাটের বংশভেদ (Races) মিঠাপাট অপেক্ষা

অনেক অধিক, তন্মধ্যে এই কয়টী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য—(১) দেশওয়াল পাট (C. Cap. Variety Ramosus) ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত। ইহার কাণ্ড ৪।৫ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়, কিন্তু অধিক জল পাইলে ইহার কাণ্ডের নিম্নদেশে লোমের মত শিকড় গুচ্ছ দৃষ্ট হয়। তবে ইহার বৃদ্ধি এত তাড়াতাড়ি হয় যে যদিও অন্যান্য জাতীয় নালিতার সঙ্গেই চৈত্র বৈশাখ মাসে (April, May) বপন করা যায়—শ্রাবণ মাস (June and July) মধ্যেই ইহার বিকাশ পূর্ণ হইয়া কাটিবার যোগ্য হয়। এজন্য ইহাকে আউসি পাটও বলে। ইহার দোষ এই যে শাখা প্রশাখা কিছু বেশী বাহির হয়, এবং প্রধান কাণ্ডও তত সরল হয় না। (২) বোম্বাই বা বাওয়া পাট (C. Cap. Variety Erectum) ইহাও ময়মনসিংহ এবং ফরিদপুরে বিশেষ প্রচলিত। ইহার শাখা প্রশাখা অত্যন্ত কম হয়, এবং ফলও কম হয়। ইহার কাণ্ড ৬ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। গোড়ায় অধিক জল থাকিলে, ইহারও কাণ্ডের নিম্নভাগে অসংখ্য শিকড় গুচ্ছ দৃষ্ট হয়। এই পাটের আঁস অন্যান্য পাট অপেক্ষা ভাল। এই পাটের বিকাশে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে। এবং চৈত্র বৈশাখ মাসে বপন করিলেও ইহা আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত কাটিবার যোগ্য হয়। বর্ষার জলে প্লাবিত না হয়, এইরূপ স্থানেই এই পাটের চাষ হয়। (৩) বরপাট বা তল্লাপাট (C. Cap. Variety Longum)—ইহার কাণ্ডের বর্ণ সবুজ। পূর্ব্ববঙ্গে মেঘনার উভয় পার্শ্বস্থ চর সমূহে এবং অন্যান্য যে যে স্থান বর্ষার জলে প্লাবিত হয়, সেখানেই এই পাটের চাষ হয়। ইহার কাণ্ড ৭।৮ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। অন্য কোন শ্রেণীর পাট এত লম্বা হয় না। নিতান্ত চারাগাছ ভিন্ন বর্ষার জলে কিম্বা জমিতে জল দাঁড়াইলে এই পাটের কোন ক্ষতি হয় না, ইহার কাণ্ডের নিম্নভাগে শিকড় গুচ্ছ হয় না। (৪) আলতা পাটি বা বিদ্যাসুন্দর—(C. Cap. Variety Rubra) ইহা রঙ্গপুর অঞ্চলেই বিশেষ প্রচলিত। ইহার কাণ্ড লাল বর্ণ। ইহার আঁসও কিঞ্চিৎ লাল আভাযুক্ত। এই জন্য বাজারে এই পাটের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম।

যে সকল স্থানে বর্ষার জল না উঠে এবং জমিতে জল না দাঁড়ায় সে সকল স্থানে মিঠাপাট (C. Olitorius) এবং যে সকল স্থানে বর্ষার জল উঠে এবং জমিতে জল দাঁড়ায়, সে সকল স্থানে তিতাপাট (C. Capsularis) ভাল জন্মায়। মোটামুটী দেখা যায় পূর্ব্ববঙ্গে, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, পাবনা, ঢাকা, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের চরে, ও পার্শ্ববর্ত্তী বিল সমূহে তিতাপাট (C. Capsularis) অধিক প্রচলিত। আবার পশ্চিমবঙ্গে, কলিকাতা অঞ্চলে এবং হুগলি বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতবর্ষে মিঠাপাটই (C. Olitorius) অধিক প্রচলিত। ধান্যের মত পাটেরও আউসি এবং আমনি এই দুই শ্রেণী আছে। মিটা এবং তিতা উভয় পাটেরই এই দুই শ্রেণী দৃষ্ট হয়। এবং যদিও সকল পাটই চৈত্র বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে বপন করা যায়, কয়েক জাতীয় পাট শ্রাবণ মাসের মধ্যেই (July and August) পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়া কাটিবার যোগ্য হয়। ইহাদিগকে আউসি পাট বলে। আবার কয়েক জাতীয় পাট আশ্বিন মাসে পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়া কাটিবার যোগ্য হয়। ইহাদিগকে আমনি পাট বলে। ইহাও দেখা যায় যে যে সকল দেশে জল কম হয়, যথা উত্তর বঙ্গে, সে সকল দেশে পাট অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পণ্য পাট তত ভাল হয় না, এবং পরিমাণেও কম হয়। আবার যে সকল দেশে প্রচুর জল হয়, যথা পূর্ব্ববঙ্গে, সেই সকল দেশে পাট পূর্ণ বিকাশ পাইতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে, এবং পণ্য পাট অধিক মূল্যবান এবং পরিমাণেও অধিক হয়।

দ্বিতীয়াধ্যায়—পাটের জল বায়ু ও চাষ।

৬। পাটের মাটি ও জল বায়ু।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে (অর্থাৎ যে সকল স্থানে উত্তাপ ৬০°ফ হইতে ১০০°ফ) উষ্ণ বায়ুতে এবং সিক্ত পলি ভূমিতে (alluvium) যে কোনরূপ মাটিতেই হউক অতি উত্তম রূপে নালিতার চাষ হইতে পারে। এই জন্যই বিষুব রেখার উত্তরে ২৩ ডিগ্রি (কর্কট ক্রান্তি) ও দক্ষিণে ২৩ ডিগ্রি (মকর ক্রান্তি) এই স্থান মধ্যে নদীর চরে এবং বিল এবং বিলের পার্শ্ববর্ত্তী জমিতে পাটের ভাল চাষ হয়। অধিকাংশ

জাতীয় পাট গাছ চারা অবস্থা অতিক্রম করিলে অর্দ্ধ জলমগ্ন থাকিলেই ভাল ফসল পাওয়া যায়। এই সকল কারণে পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসামের মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের চর ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম্য বিল সমূহে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল পাট হয়। যে সকল জমি বর্ষাকালে জলমগ্ন হয় না, সে সকল জমির জন্য মিঠাপাট বিশেষ উপযোগী। সিরাজ গঞ্জে দেখা যায়, এই জাতীয় পাট বর্ষাকালে অর্দ্ধ শুষ্ক জমি এবং বাস্তু ভূমিতে বর্দ্ধিত হইতেছে; কিন্তু তিতাপাট ৩।৪ এবং বংশভেদে ৫।৮ ফুট জলমগ্ন থাকিলেও অতি সতেজে বর্দ্ধিত হয়। এবং নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ভৈরব প্রভৃতি স্থানে অনেক সময় দেখা যায় কৃষকেরা ডুব দিয়া ডুব দিয়া পাট কাটিতেছে। এ কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে যদিও সিক্ত উষ্ণ বায়ু এবং আর্দ্র পলি ভূমি পাটের বিশেষ উপযোগী—তথাপি পাট গাছ ছোট চারা অবস্থায় থাকা কালীন যদি অত্যন্ত বর্ষা হইয়া জমিতে জল দাঁড়ায় তবে সকল জাতীয় পাট গাছই মরিয়া যায়। উপযুক্ত পরিমাণ জল পাইলে সকল মাটিতেই ভাল পাট হয় বটে, তথাপি সাধারণ ভাবে একথা বলা যায় যে দোয়াস (Loam) এবং আটাল (clay-loam) মাটিতে যে পাট হয়, তাহার আঁস অতি উৎকৃষ্ট, এবং বেলে মাটিতে (sandy loam) যে পাট হয় তাহার আঁস নিকৃষ্ট। তবে আঁসের গুণের উপর মূল্যের তারতম্য যতদিন উপযুক্ত মত না হয়—ততদিন কৃষকগণ পণ্য পাটের পরিমাণের উপরই দৃষ্টি রাখিবে। জল বায়ু যদি ঠিক থাকে তবে, মাটি বেলে কি আটাল, উৎপন্ন পণ্য পাটের পরিমাণ সম্বন্ধে বেশী কিছু আসে যায় না। তবে আটাল মাটির চাষে, বেলে এবং দোঁয়াস মাটী অপেক্ষা খরচ অধিক পড়ে।

৭। পাটের চাষ।

পাটের চাষের জন্য যতদূর সম্ভব গভীর চাষ করিয়া মাটি চূর্ণ করিয়া ধূলার মত করিতে হয়। অল্প খরচে চুক্তি করিয়া হল চালনা করাইলে পাটের উপযুক্ত চাষ হওয়া সম্ভব নয়। পুরোহিত যেমন চারি আনার চণ্ডীও জানে, এক আনার চণ্ডীও জানে—কৃষকও তেমনি আট আনার হল চালনাও জানে বার আনার হল চালনাও জানে। নিজের হাল গরু দ্বারা নিজে লাঙ্গল করিলে যেরূপ ইচ্ছামত গভীর করিয়া চাষ করা যায়; চুক্তির হাল গরু দ্বারা এমন কি অসন্তুষ্ট কম বেতনের চাকর দ্বারাও সেইরূপ হইবে না। অসন্তুষ্ট চাকর লাঙ্গলের কটি এমন করিয়া ধরিবে যে ফাল ভাসিয়া ভাসিয়া জমির ২।৩ ইঞ্চি মাত্র খুড়িয়া চলিয়া যাইবে। তাহাতে গরুর বা মানুষের কিছুই পরিশ্রম হইবে না। আবার সন্তুষ্ট প্রভুর হিতৈষী চাকর লাঙ্গলের কটি এমন করিয়া ধরিবে যে আমাদের এই ক্ষীণজীবী গরুতেই ফাল ৬।৭ ইঞ্চি পর্য্যন্ত গভীর মাটি খুড়িয়া যাইবে, কিন্তু এরূপ করিলে গরু এবং মানুষ উভয়েরই পরিশ্রম হইবে। পাটের চাষ উপযুক্ত মত গভীর হওয়া চাই। এজন্য অতি যত্নের সহিত এক লাঙ্গলের খনিত গর্ত্তের উপর দিয়া তাহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর একটী লাঙ্গল চালাইয়া জমি ১০।১২ ইঞ্চি গভীর করিয়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। নিজের ভাল চাকর ভিন্ন এইরূপ পরিশ্রম কেহ করিবে না। চুক্তির চাকর ২।৩ ইঞ্চির বেশি গভীর করিয়া বড় চাষ করে না। সাধারণতঃ খেতের ধান বা অন্য শস্য উঠিয়া গেলেই পাটের চাষ আরম্ভ হয়। যে সকল নীচা জমী কার্ত্তিক অগ্রাণ মাসেও না শুকায়, তাহাতে কলাই সরিষা প্রভৃতি রবি শস্যের সুবিধা হয় না। এরূপ নীচা জমিতে আমন ধান্য উঠিয়া গেলেই পৌষ মাসে অথবা জমি শুকাইবা মাত্র, অর্থাৎ অত্যন্ত শুকাইয়া শক্ত হইবার পূর্ব্বেই প্রথম চাষ দিতে হয়। চাষ দিতে বিলম্ব করিলে, মাটি অত্যন্ত শুকাইয়া শক্ত হইয়া যায়। এবং চাষ করিতে অধিকতর পরিশ্রম ও সময় লাগে। আটাল মাটির জমি হইলে, তাহা অতিরিক্ত শুকাইলে এত শক্ত হইয়া যায় যে তাহার উপযুক্ত কর্ষণে ব্যয় অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। যদি অনিবার্য্য কারণ বশতঃ জমি অতিরিক্ত শুকাইয়া শক্ত হইয়া পড়ে তবে কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া প্রথম বৃষ্টি হইলে, অথবা জল সিঞ্চনের বিশেষ সুবিধা থাকিলে জল সেচন বা "বুর" দিয়া (flooding) মাটি যখনই একটু শুষ্ক অথচ নরম থাকে তখনই চাষ দিতে হইবে। অপেক্ষাকৃত উচ্চ দোফসলি জমিতে কলাই সরিষা প্রভৃতি রবি শস্য হয়। এরূপ জমিতে মাঘ কি ফাল্গুন মাসে রবি শস্য উঠিয়া গেলেই প্রথম চাষ দিতে হয়—এস্থলেও মাটি শুকাইয়া

শক্ত হইয়া গেলে জলের সুবিধা থাকিলে "বুর" দিয়া অথবা যেই প্রথম বৃষ্টি হইয়া মাটি কিঞ্চিৎ শুষ্ক অথচ নরম হইবে তখনই প্রথম চাষ দিতে হইবে। অন্ততঃ চৈত্র মাসের মধ্যে প্রথম চাষ দিতেই হইবে। প্রথম চাষের অন্ততঃ ১০।১৫ দিন পর বৃষ্টির দিন দেখিয়া জমিতে ভাল, পচা গোবর সার ছড়াইয়া দিতে হয়, এবং বৃষ্টির জলটা কিঞ্চিৎ শুকাইলে দ্বিতীয় চাষ দিয়া মই দিতে হয়।

কৃষকের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে, একটা চাষ দিয়া, দ্বিতীয় চাষ দিবার পূর্ব্বে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়া আবশ্যক। যেন অম্লজান বায়ু (Oxygen) সূর্য্যরশ্মি এবং মাটিস্থিত বীজাণু (Bacteria) মাটির স্তরে স্তরে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিয়া তাহাতে উদ্ভিদের সহজপাচ্য খাদ্য প্রস্তুত করিয়া সঞ্চয় করিতে পারে। দ্বিতীয় চাষ ফাল্গুন কি চৈত্রের মাঝামাঝি শেষ হওয়া উচিত। তৎপরে ৭ হইতে ১৫ দিন অথবা যতদূর সম্ভব ফাক রাখিয়া জমি অনুসারে যে কয়টা চাষ প্রয়োজন তাহা দিতে হইবে; এবং প্রথম চাষের পর প্রত্যেক চাষের সঙ্গে সঙ্গে এক একবার মৈ দিতে হইবে। যদি মাটিতে ঢেলা বান্ধে, তবে দ্বিতীয় চাষের পরই মুগুরে পিটিয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া দেওয়া আবশ্যক। শেষ চাষ দিয়া বিদে বা আচড়া দ্বারা আবর্জ্জনা একত্র করিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। অথবা তাহা গর্ত্তে পুতিয়া ফাঁস প্রস্তুত করিয়া জমিতে ব্যবহার করিলে আরও ভাল হয়। অন্ততঃ আবর্জ্জনা পুড়াইয়া সেই ছাই জমিতে ছিটাইয়া দেওয়া সঙ্গত। পাটের হাল দেওয়া সম্বন্ধে সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে ফাল যেন মাটির খুব ভিতরে প্রবেশ করে। এক ফুট পর্য্যন্ত ভিতরে গেলেই খুব ভাল হয়। তবে কৃষকের দুর্ব্বল গরু দ্বারা তাহা চলে না। এজন্য এক লাঙ্গলের খনিত গর্ত্তের ভিতরে অন্য লাঙ্গল চালাইয়া চাষ যত গভীর করা যায়, তাহাই করিতে হইবে। চাষ গভীর, মাটী আগাছা ও ঢেলাশূন্য ধূলির ন্যায় চূর্ণীকৃত—এই সকলই পাটের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। বিলাতের পূর্ব্বকালের একজন বড় কৃষকের (Jethro Tull) একটী কথা আমাদের গরীব কৃষকের সর্ব্বদা মনে রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। তিনি তাঁহার জমিতে কখনও কোন সার ব্যবহার করিতেন না, এবং বলিতেন "চাষই ফাঁস" (Tillage is manure)। আমাদের গরীব কৃষক অপরিমিত সুদ দিয়া টাকা ধার করিয়া, সার ক্রয় করিবে আশা করা যায় না। চাষ ভাল করিয়া করিলে বিনা সারেও ভাল শস্য পাওয়া যায়। চাষ শেষ হইলে পরে মৈ দিয়া জমি সমান করিয়া বীজ ছিটাইয়া (বীজের সঙ্গে ছাই ও শুষ্ক মাটী মাখিয়া লইলে, সমানভাবে ছিটাইবার সুবিধা হয়) সমানভাবে একবার লম্বালম্বি আর একবার পাশাপাশি ফেলিতে হয়। বীজ ফেলিয়া একবার আচড়া দিয়া ঢাকিয়া দিয়া মৈ দিয়া সমান করিবে ও মাটিটা চাপিয়া দিবে। বিঘা প্রতি সোয়া সের হিসাবে বীজ ফেলাই ভাল। বেশী ফেলিলে গাছ দুর্ব্বল এবং পণ্যপাট নরম হয়। কম ফেলিলে গাছে ডাল পালা বেশী হয় এবং তাহাতে পণ্যপাট খারাপ হয়। চৈত্র বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসই বীজ ফেলিবার সময়।

যে দেশে যখন বর্ষা আরম্ভ হয় তখনই বীজ ফেলিতে হয়। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে চৈত্র বৈশাখ এবং পশ্চিমবঙ্গে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেই পাট বুনিবার সময়। বীজ ভাল হইলে গাছ ভাল হয়, এজন্য প্রত্যেক কৃষক আপনার ক্ষেত্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিপক্ক গাছ বাছিয়া বীজের জন্য যত্নের সহিত রক্ষা করিবে। অনেকে বলেন যে যে ক্ষেত্রের বীজ সেই ক্ষেত্রে না বুনিয়া অন্য ক্ষেত্রে বুনিলে অপেক্ষাকৃত ভাল হয়। এজন্য পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কৃষকেরা যদি আপনাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গাছের বীজ পরস্পরের সহিত বিনিময় করেন, তবে পাট গাছের আরো উন্নতি হইবে এরূপ আশা অনেকে করেন। "ফলেন পরিচীয়তে"। তবে এইরূপ বিনিময়ে প্রবঞ্চনারও আশঙ্কা আছে। বীজ বুনিবার ৫।৭ দিনের মধ্যেই চারা বাহির হয়।

৮। পাট গাছের যত্ন।

বেলে এবং দোয়াস মাটিতে চারা সহজেই বাহির হইয়া বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু আটাল মাটির উপরে অনেক সময় এমন শক্ত সরের মত বান্ধিয়া যায়, যে চারা বাহির হইয়াও বর্দ্ধিত হইতে পারে না। এরূপ স্থানে চারা গাছের শিকড় মাটিতে ভাল করিয়া ধরিলে পর—অনুমান বুনিবার ৮।১০ দিন পরে একবার আচড়া বা বিদে দ্বারা মাটির

উপরের সরটা ভাঙ্গিয়া দিবে। প্রাণিগণের মত গাছের ও শ্বাস প্রশ্বাস আছে এবং বাতাস বন্ধ হইলে যেমন প্রাণীরা শ্বাস বন্ধ হইয়া মরিয়া যায়, গাছ—বিশেষতঃ চারা গাছের শিকড়ের বাতাস বন্ধ হইলে মরিয়া যায়। বুদ্ধিমান কৃষক এজন্যই সময় মত নিড়াইয়া এবং আচড়া চালাইয়া এইরূপ সর ভাঙ্গিয়া গাছের শিকড়ে বাতাস প্রবেশের সুবিধা করিয়া দিবে। পাট গাছ ৮।৯ আঙ্গুল উচা হইলে আর একবার আচড়া বা বিদে চালাইয়া গাছ পাতলা করিয়া দিবে। সে সঙ্গেই গাছের চারিদিকের মাটি ও কতক ঢিলা করা হইবে এবং আগাছাও উঠান হইবে। যাহা অপূর্ণ থাকে তাহা হাতে গাছ উপড়াইয়া, নিড়াইয়া এবং আগাছা উঠাইয়া দিবে। মোটামুটি দেখিবে যেমন প্রত্যেক গাছের চারিদিকে ৪ হইতে ৬ ইঞ্চি অর্থাৎ ৫ হইতে ৮ আঙ্গুল পরিমাণ স্থান খালি থাকে। গাছ ১ হস্ত পরিমাণ উচ্চ হইলে আর আচড়া চালাইবে না। তখন হাতে নিড়াইয়া আগাছা তুলিবে এবং মাটি ঢিলা করিয়া দিবে। গাছ দুই কি আড়াই হাত উচ্চ হইলে শেষ নিড়ানি ও বাছাই দিবে। অতঃপর পাট গাছের আর কোন বিশেষ যত্নের আবশ্যক করে না।

৯। পাটের শত্রু।

অনাবৃষ্টি পাটের প্রধান শত্রু। পাট বুনিবার পর যদি অনেক দিন বৃষ্টি না হয় তবে পাট গাছের জোর অত্যন্ত কম হইয়া পড়ে, এবং ফসল পরিমাণে অত্যন্ত কম হয়। তাহার বাজার দরও কম হয়। অতি বৃষ্টিতে সময় ভেদে পাটের অনিষ্ট করিতে পারে। পাট গাছ যখন ছোট চারা অবস্থায় থাকে তখন যদি অত্যন্ত বৃষ্টি হয় তবে অনেক সময় গাছগুলি জল জমাতে গোড়া পচিয়া মরিয়া যায়—অথবা চারাগাছ জলে ডুবিয়া গিয়া শ্বাস বন্ধ হইয়া মরিয়া যায়। অতি বৃষ্টিতে মিঠা পাট জাতীয় গাছের অধিকতর অনিষ্টের আশঙ্কা। তিতা পাট জাতীয় গাছ চারা অবস্থা অতিক্রম করিলে পর যত বেশী জল পায় ততই জোরের সহিত বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

অনাবৃষ্টি অতি বৃষ্টির পর সকল শস্যেরই প্রধান শত্রু নানা প্রকার ছাতাধরা রোগ (Fungoid disease) এবং নানাজাতীয় পোকা। কিন্তু পাট সম্বন্ধে এ সকল শত্রু বড় বেশী অনিষ্ট করে না। তবে দুই প্রকারের পোকা সময় সময় বিশেষতঃ জলের অভাবে গাছগুলি দুর্ব্বল হইলে নালিতা গাছকে আক্রমণ করিতে দেখা যায়। তাহার একটী প্রজাপতি বা আঁইসযুক্ত পক্ষবিশিষ্ট (Lepidoptera) জাতীয় এক শ্রেণীর (Arctiidæ) অন্তর্গত। বাঙ্গালা কোন নামকরণ ঠিক হয় নাই। (ইংরাজি নাম Spilosoma)। এই পোকা পাট গাছ যখন কচি থাকে তখন তাহার পাতায় ডিম পাড়ে এবং সেই ডিম ফুটিয়া তাহা হইতে একপ্রকার শুয়া পোকা (Larva) নির্গত হয়।

সেই সকল শুয়া পোকা পাট গাছের কচি কচি পাতাগুলি খাইয়া বর্দ্ধিত হয় এবং শেষে গুটি বা কোষ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নিদ্রিত (Pupate) অবস্থায় থাকে এবং কিছুদিন অন্তে পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত প্রজাপতি (Imago) হইয়া বাহির হইয়া উড়িয়া যায়। এই পোকাই কৃমি (Larva) অবস্থায় পাট গাছের পাতা খাইয়া ফেলে। এবং তাহাতে সেই পাটের গাছ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ও অনেক গাছ মরিয়া যায়। যে সকল আক্রান্ত গাছ বাঁচিয়া থাকে তাহা হইতেও ভাল ফসল উৎপন্ন হয় না। এই সকল কৃমি (Caterpillar) দেখিতে সাদা এবং গায়ে কিছু কিছু লোম থাকাতে শুয়া পোকা নাম দেওয়া যায়। বিনা ব্যয়ে সুধু গায় খাটিয়া এই পোকার প্রতিকার করিতে হইলে পোকাগুলি হাতে ধরিয়া ধরিয়া একত্র করিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়াই ভাল। তদ্ভিন্ন যে জমিতে এই শুয়া পোকার উপদ্রব হয় তাহাতে বিঘা প্রতি ১০।১২টা মুরগী ছাড়িয়া দিলে অল্প সময় মধ্যেই পাট ক্ষেত এই শুয়া পোকার উপদ্রব হইতে মুক্ত হইবে। আমরা শিবপুর কৃষিক্ষেত্রে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া উপকার পাইয়াছি। পাটের চাষা অধিকাংশই মুসলমান। তাহাদের পক্ষে এই পোকার এবং এই জাতীয় অন্যান্য পোকার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবার এ অতি সহজ উপায়। এ সকল উপায় যাহারা অবলম্বনে অশক্ত তাহাদের পক্ষে কেরাসিন তেলের জল—দুই ছটাক কেরাসিনে একসের জল হিসাবে ঝাকরাইয়া ভাল করিয়া মিশাইয়া অথবা—তামাক পাতার

জল অর্থাৎ একছটাক তামাক পাতা একসের জলে ভাল করিয়া সিদ্ধ করিয়া তাহাতে সমান পরিমাণ চুণের জল মিশাইয়া প্রত্যেক গাছের গায়ে বাগানে জল দিবার ঝাঝ্‌রি দ্বারা বা ছিটাইয়া দেওয়া ভিন্ন অল্প ব্যয়সাধ্য প্রতিকারের অন্য উপায় দেখিতেছি না। যাহারা পরের পয়সা খরচ করেন অথবা নিজের পয়সা খরচ করিতেও কুণ্ঠিত নন তাহারা রীতিমত কেরাসিনের ঘি (Kerosine emulsion) প্রস্তুত করিয়া এবং এক্লেয়ার বেপরাইজার (Eclair vaporisor) ১৫৷২০ টাকা দামে ক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা প্রয়োগ করিতে পারেন। নিম্নলিখিত প্রণালীতে কেরাসিনের ঘি (Kerosine emulsion) প্রস্তুত করিতে হয়। এক পোয়া সাবান পাঁচ সের জলে মিশাইয়া ফেল এবং আগুনে সিদ্ধ করিয়া খুব গরম অবস্থাতে দশ সের কেরাসিন তেলে ঢালিয়া দিয়া পিচকারী দিয়া দশ মিনিট কাল তাহা খুব আলোড়ন করিয়া দেও। যখন দেখিবে ভাল করিয়া মিশিয়া গলা ঘির মত হইয়াছে, তখন ঠাণ্ডা হইতে দেও। দেখিবে তখন বেশ গাঢ় হইয়াছে। ইহারই নাম কেরাসিনের ঘি (Kerosine emulsion)। ব্যবহার করিবার সময় এই ঘির একভাগ লইয়া তাহাতে নয় ভাগ জল যোগ করিয়া পিচকারী দ্বারা খুব ভাল করিয়া মিশাইয়া গাছের উপরে প্রয়োগ কর। পার ত এক্লেয়ার বেপারাইজার (Eclair vaporisor) দ্বারা প্রয়োগ করিবে। আর তাহা না থাকিলে, বাগানে জল দিবার ঝাঁঝরি দ্বারা ঝারের মত করিয়া প্রয়োগ করিবে। এক্লেয়ার বেপরাইজার খরিদ করিতে ১৫৷২০৲ টাকা লাগে। আবার তাহা একটু মাত্র খারাপ বা বিকল হইলেই একেবারে অব্যবহার্য্য হইয়া যাইবে। পাড়াগাঁয়ে ইহার কোন মেরামত হইবে না। এরূপ অবস্থায় আমরা কৃষককে ইহা কিনিবার পরামর্শ দিতে পারি না।

আর এক রকমের পোকা আছে তাহাতেও পাটের খুব অনিষ্ট হয়। তাহা কঠিন পাখা বিশিষ্ট জাতীয় (Coleoptera) পোকার এক শাখার (Curca lionidae) অন্তর্গত। ইহা দেখিতে কাল এবং অতি ক্ষুদ্র কতকটা আমাদের পুরাতন চাউলের পোকার মত। এই পোকা দাঁত দিয়া (mandibles) পাট গাছের গাইটের (nodes) বাকল কাটিয়া সেই ছিদ্রের মধ্যে একটী একটী করিয়া ডিম পাড়ে। সেই ডিম ফুটিয়া ছোট কৃমি (larva) জন্মে, এবং তাহা গাছ খাইতে খাইতে বর্দ্ধিত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত অবস্থায় (pupa) কিছুকাল থাকিয়া পরে পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত পোকা (Imago) হইয়া বাহির হইয়া আবার গাছ খাইতে আরম্ভ করে, এবং শেষে ডিম পাড়িয়া বংশ বিস্তার করে। এই পোকার আক্রমণে পাট গাছ মরে না বটে; কিন্তু পাট মাঝে মাঝে কাটিয়া যায় এবং স্থানে স্থানে ময়লা দাগ পড়ে। আঁশ খারাপ এবং কম হয়, এবং তাহার দরও কম হয়। এই পোকার প্রতিকার করা কঠিন। কারণ ইহা অধিকাংশ কাল গাছের ভিতরে থাকে এবং পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইলে এক গাছ হইতে নিকটে অন্য গাছে উড়িয়া যায়।

কেরাসিনের ঘি (Kerosine emulsion) বা তামাক পাতার জল ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু আশানুরূপ ফলের সম্ভাবনা কম। একটী কথা কৃষকের মনে রাখা কর্ত্তব্য— যেমন মানুষের রোগাদি দুর্ব্বল গরিবদিগকেই বেশী আক্রমণ করে, তেমনি পোকাগুলিও দুর্ব্বল গাছগুলিকেই আক্রমণ করে। গাছ সতেজে বর্দ্ধিত হইলে তাহাতে এক প্রকার তিক্ত কটু রস জন্মে যাহা পোকার পক্ষে অখাদ্য এবং কষ্টদায়ক। এজন্য সর্ব্বদা (১) উপযুক্ত ফাঁস ব্যবহার করিয়া (২) কিম্বা নিড়াইয়া বা বিদে (আচড়া) চালাইয়া গাছের শিকড়ে হাওয়া প্রবেশের সুবিধা করিয়া (৩) আগাছা উঠাইয়া গাছের খাদ্যের অপচয় বন্ধ করিয়া এবং (৪) জলাভাব হইলে জলের বন্দোবস্ত করিয়া গাছকে সতেজে রক্ষা করিতে পারিলে গাছের কোন প্রকার পোকার আক্রমণের ভয় থাকে না।

পাটের সম্বন্ধে ছাতা ধরা রোগের (Fungoid disease) কথা বড় শোনা যায় না। তবে একটী রোগের কথা এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। পাটের গাছ চারা থাকা কালীন এমন কি এক হাত দেড় হাত লম্বা হওয়া পর্য্যন্ত ২।৪ দিন ক্রমাগত বৃষ্টি হইয়া জল না দাঁড়াইয়াও যদি জমি অত্যন্ত ভিজা (বা সেঁতসেতে) হইয়া যায়—তখন দেখা যায় যে স্থানে স্থানে, গাছগুলি ঢলিয়া পড়ে এবং মরিয়া যায়। মানুষকে সাপে কাটিলে যেরূপ হঠাৎ ঢলিয়া পড়ে,

গাছেরও প্রায় সেইরূপ অবস্থা হয়। ইহাও একপ্রকার ছাতা ধরা রোগ (Pythium de Baryanum)। ভিজা মাটিতে কচি কচি শালগম প্রভৃতি চারাও এই রোগে অনেক সময় মরিয়া যায়। ঠিক্ গাছের গোড়াতে এই রোগ প্রথম আক্রমণ করে। ক্রমে সমস্ত গাছের শরীরে বিস্তৃত হয়। অণুবীক্ষণের সাহায্যে এই রোগ বেশ প্রত্যক্ষ করা যায় এবং বৈজ্ঞানিকেরা এই রোগ সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য কথা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার এ স্থলে উল্লেখ করা গেল না। চারা অত্যন্ত ঘন করিয়া বুনিলে এবং সেই সঙ্গে জমি খুব ভিজা হইলে রোগের আশঙ্কা বেশী। এই রোগের চিকিৎসা অতি সহজ এবং বিনা ব্যয়েই করা যায়। যে সকল গাছ ঢলিয়া পড়িয়াছে সেগুলিকে তৎক্ষণাৎ উৎপাটিত করিয়া অনেক দূরে নিক্ষেপ করিবে। তারপর জমির জলপ্রণালীগুলি (Drain) কোদাল দিয়া ভাল করিয়া খুলিয়া দিবে। এবং জলপ্রণালীর সংখ্যা ও এই পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিবে যেন অল্পকাল মধ্যে জমিটা শুকাইয়া, বিদে বা আচড়া দিবার যোগ্য হয়। এবং বিলম্ব না করিয়া বিদে দিতে পারিলে দিবে। কিম্বা হাতে নিড়াইয়া বাছাই দিবে। অন্তত আক্রান্ত গাছের চতুঃপার্শ্বস্থ গাছগুলি হাতে নিড়াইয়া বাছাই দিবে। গাছের গোড়ায় এবং শিকড়ে বাতাস প্রবেশ করিতে পারিলে, এবং মাটি কিঞ্চিৎ শুকাইলেই এই রোগ নিবারণ হয়। সাধারণ কৃষকেরা এই রোগকে "হাজা" বা "পেকচিপা" লাগা বলে। (ক্রমশঃ)

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন।*

কালচক্রের পরিবর্ত্তনে বাঙ্গালীর অবস্থা দিন দিনই শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। যে বাঙ্গালীর বাহুবল-কাহিনী, যে বাঙ্গালীর বীরত্ব-গাথা যুগ যুগান্তর ধরিয়া ইতিহাসের পত্রে পত্রে জ্বলন্ত ভাষায় কীর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, স্মরণাতীত কাল হইতে যে বাঙ্গালীর গৌরব-গরিমা দিগ্দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, সেই বাঙ্গালী—বঙ্গ-জননীর প্রিয় সন্তান বাঙ্গালী আজ দুর্ব্বল কাপুরুষ বলিয়া নিন্দিত। বাঙ্গলার যে সকল স্বাধীন নরপতির অজেয় প্রতাপে শত্রুকুল সদা-সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিত, যে শূরবংশীয়, পালবংশীয় ও সেনবংশীয় নরপতিগণের বীরত্ব-গৌরব-পরিচয় দেশের নানা স্থানে অদ্যাপিও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, যে বাঙ্গালী প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, কংসনারায়ণ, কেদার রায় প্রভৃতি ভূঁইয়াগণের অতুল প্রতাপে জল স্থল প্রকম্পিত হইত; বেশিদিনের কথা নহে,—যে যুদ্ধ-বিশারদ মোহনলাল, মেনাহাতী, জানকীরাম প্রভৃতি সেনাপতিগণের দুদ্ধর্ষরণনীতি সমগ্র দেশকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া রাখিত, হায় সেই বাঙ্গলাদেশের সেই বাঙ্গালী বংশেরই আজ কি শোচনীয় পরিণাম!

আজ পাশ্চাত্য দেশাগত নবীন শ্বেতজাতির বীরত্ব ও মহত্বে প্রাচ্য দেশ মুখরিত। ভারতবর্ষ তাহাদের বিজয়লব্ধ সম্পত্তি বলিয়া তাহারা শ্লাঘা প্রকাশ করিতেছে। ইংরেজ ইতিহাস-লেখকগণ জগতের সমক্ষে প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন যে,—পঞ্চনদের পুণ্য-ক্ষেত্রে, পলাসীর আম্রকাননে—সর্ব্বত্রই বাঙ্গালী, ভারতবাসী, ইংরেজদের বাহুবলে ও বুদ্ধিকৌশলে পরাজয় ও বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইহাই কি সত্য? ভারতবর্ষ কি সত্য সত্যই ইংরেজদের বিজয়লব্ধ সম্পত্তি? ভারতবর্ষ কি সত্য সত্যই ইংরেজদের বাহুবলে বিজিত, না ভারতবাসী নিজেরাই আপনাদিগকে ইংরেজের অধীনে আনয়ন করিয়াছে? তাহারা নিজেরাই কি ইংরেজের হস্তে দেশের শাসনভার অর্পণ করে নাই? ভারতবর্ষ আপনিই কি আপনাকে জয় করে নাই?

আমরা বহুদিন ইংরেজদিগের লিখিত এবম্প্রকার অসত্য অলীক ইতিহাস পাঠ করিয়া সত্য সত্যই আপনাদিগকে মনুষ্যেতর শ্রেণীর মধ্যে গণনা করিয়া আসিতেছিলাম, পাশ্চাত্য অন্ধ-শিক্ষার মোহে আপনাকে ভুলিয়া, আপনার প্রাচীন ইতিহাস ভুলিয়া, বিদেশীয় ভাবে দেশীয় হৃদয় গঠিত করিয়া আসিয়াছি এবং স্বার্থপরতার কঠিন নিগড়ে সকলে শৃঙ্খলিত হইয়া রহিয়াছি। যে শিক্ষায় আত্মোন্নতি ও জাতীয় উন্নতি সাধন হইয়া থাকে, ভারতবাসীর ভাগ্যে সে শিক্ষালাভ বহুদিন ঘটে নাই। কিন্তু বিধাতার কৃপায় দেশের

* রংপুরস্থ উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন (১৩ই আষাঢ়, ১৩১৫ সাল) উপলক্ষ্যে লিখিত।

মধ্যে সুবাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে—দেশবাসীর প্রাণের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। যে পাশ্চাত্য অন্ধশিক্ষা-মোহে অভিভূত হইয়া আমরা স্বদেশ ও স্বজাতিকে ভুলিয়া নিজের স্বার্থসাধনের পন্থান্বেষণ করিয়া আসিতেছিলাম, এক্ষণে সেই প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত—সেই অন্ধ-মোহ দূরীভূত হইতে চলিয়াছে।

আমাদের পূর্ব্ব-স্বরূপ লাভ করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে জাতীয় ভাষার সাহায্যে জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও প্রাচীন ইতিহাস পাঠের ব্যবস্থা করিতে হইবে। জাতিত্ব-বন্ধনের মূলই জাতীয় সাহিত্য। যে জাতির মধ্যে জাতীয় সাহিত্য জনসাধারণের যত উপযোগী হইবে, ততই উহা জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইবে এবং এক জাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়েই একজাতীয়তার ভাব অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। এক বিজ্ঞ সমালোচক লিখিয়াছেন,—'সমগ্র-জাতির মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাহিত্য রচনা করিলে সাহিত্যের সাহায্যে বড় বৃহৎ, বড় মহৎ, বড় সুন্দর, বড় পবিত্র কার্য্য করিতে পারা যায়। সাহিত্য বড় সামান্য সামগ্রী নহে, বড় সহজ সামগ্রীও নহে। সুপ্রণালীতে রচিত হইলে, উহা জাতি গাড়বার কার্য্যে যেমন সহায়তা করে, কুপ্রণালীতে রচিত হইলে, জাতি ভাঙ্গিবার পক্ষে তেমনই কার্য্যকর হয়, জাতি গঠনের তেমনই প্রতিবন্ধকতা করে। গঠনের গুণে সাহিত্য যেমন সুন্দর, যেমন অমৃতময় ফল প্রসব করে, গঠনের দোষে তেমনই কদর্য্য, তেমনি বিষময় ফল প্রদান করে। যে সাহিত্যের ফল কদর্য্য ও বিষময়, যে সাহিত্য জাতি ভাঙ্গে বা জাতি গড়িতে দেয় না, তাহা জাতীয় সাহিত্যও নহে, প্রকৃত সাহিত্যও নহে।'

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া যে ভাষা ব্যবহার করে; যে ভাষায় স্বীয় হর্ষ বিষাদ, যাতনা আনন্দ, সুখ দুঃখ জ্ঞাপন করে—তাহা তাহার মাতৃভাষা। এই সাহিত্য ও জাতীয় সাহিত্য এক জিনিষ নহে। অবশ্য মাতৃভাষার শেষ পরিণতি জাতীয় সাহিত্যে,—চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সাহিত্যের নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে। মাতৃভাষার শিক্ষক রক্ষক যেমন শিশুর মাতৃগণ, জাতীয় সাহিত্যের রক্ষকও তেমনি দেশের জন-সাধারণ। দেশের সর্ব্ব শ্রেণীর সর্ব্বজাতীয় লোকের সাহচর্য্য ব্যতীত, অক্লান্ত অধ্যবসায় ব্যতীত জাতীয় সাহিত্য গঠিত ও উন্নত হইতে পারে না। এ কার্য্য স্বদেশের কার্য্য—স্বদেশবাসী প্রত্যেক নরনারীর কার্য্য; হর্ম্ম্য অট্টালিকাবাসী মহারাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী হইতে দীন কুটিরবাসী নিরন্ন নিরাশ্রয় ভিক্ষা-সম্বল ভিখারী—সকলকেই ইহার সেবায় মন প্রাণ সমর্পণ করিতে হইবে।

এক্ষণে আমি প্রাচীন সাহিত্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করতঃ অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের অর্থাৎ উত্তর বঙ্গীয় এই সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী-গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য—বাঙ্গলা। কিন্তু চির দিনই বাঙ্গলা আমাদের জাতীয় সাহিত্যের গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কত দিন হইতে বাঙ্গলা ভাষার সূত্রপাত হইয়াছে, কতদিন হইতে বাঙ্গলা বাঙ্গালীর লিখিত ভাষারূপে গণ্য হইয়াছে, তাহা এখনো নির্ণীত হয় নাই। তৎসম্বন্ধে নানা জনের নানা মত প্রচলিত আছে, তাহার আলোচনা এক্ষণে নিষ্প্রয়োজন। বৈদিক ভাষাই আর্য্যজাতির আদি ভাষা ছিল, পরে সংস্কৃত ভাষার প্রচলন হয়। সমাজ-বিপ্লব ধর্ম্ম-বিপ্লব ও রাষ্ট্র-বিপ্লব প্রভৃতি সমস্ত বিপ্লবই ভারত-বর্ষের বুকের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই সকল বিপ্লবে দেশের আভ্যন্তরীন অবস্থা যেমন পরিবর্ত্তিত হয়, দেশের ভাষাও সেই সঙ্গে প্রভূত পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষা বহুকাল এদেশে প্রভুত্ব বিস্তার করিলেও অকস্মাৎ বৌদ্ধ-বিপ্লবে তাহার আসন বিকম্পিত হইয়া উঠে, দেশের মধ্যে এক নব ভাষা মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হয়। এই ভাষার নাম—পালী; বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীরা এই ভাষার সাহায্যেই তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ, নীতিগ্রন্থ, ব্যবহারশাস্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিল। ইহা আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা। এই সময় হইতে সংস্কৃত ভাষা নিষ্প্রভ হইতে আরম্ভ হয়। তৎপর বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানে ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থানে পুনরায় সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা আরব্ধ হয়, কিন্তু পূর্ব্বের নবাগত ভাষাটীর সাহায্যে দেশে যে প্রাকৃত ভাষার স্তর সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা বিলুপ্ত হইল না। এই প্রাকৃত ও সংস্কৃতের মিশ্রণে গৌড়ীয় ভাষার সৃষ্টি। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর

প্রাকৃতব্যাকরণ মধ্যে গৌড়ীয় ভাষার আসন প্রদত্ত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই যে গৌড়ীয় বঙ্গ-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এবং বৌদ্ধযুগে যে তাহার বিস্তার ও উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহাও দেখান যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সামাজিক বিপ্লবে ভাষা বিপ্লব উপস্থিত হয়। এদেশের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কলহ ও ধর্ম্মপ্রভাব সংস্থাপন প্রচেষ্টা হইতেই প্রধানতঃ বঙ্গসাহিত্যের বিস্তার ও পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, মোসলমান প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মের ও ধর্ম্মাবলম্বীর প্রভাবই বঙ্গসাহিত্যগঠনের পক্ষে প্রভূত সহায়তা করিয়াছে। নিম্নে সংক্ষেপে তদ্বিষয় বর্ণন করিতেছি; কিন্তু গদ্য-সাহিত্য সম্বন্ধেই আমি বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর হইতে তৎশিষ্য-গণের ভক্তিপ্রবণতায় আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য পরিপুষ্টি লাভ করিতে আরম্ভ করে। তৎপূর্ব্বে এদেশবাসী নরনারী যোগীপাল, মহীপাল, গোপীপাল প্রভৃতির গীত আনন্দের সহিত আলাপ করিত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পাল রাজ-গণের রাজত্বকালে এই গীতের জন্ম হয় এবং এক্ষণে প্রাচীন বিরাট সাহিত্যের ক্ষীণ আভাস প্রদর্শন করিতেছে মাত্র। বর্ত্তমানকালে দেশমধ্য হইতে এই সকল গান এক রকম বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে, কেবল রংপুর ও দিনাজপুরের যোগীজাতিরা কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায় চালাইতেছে। নিম্নে এই সকল গানের স্থানবিশেষ উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতেই সভ্য মহোদয়গণ দেশের তাৎকালিক অবস্থারও কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

মাণিকচাঁদ দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে এ দেশের কোনো অংশে রাজত্ব করিতেন। মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোপীচন্দ্র পিতার পরিচয় প্রদান স্থলে এই মাত্র লিখিয়াছেন,—

সুবর্ণচন্দ্র মহারাজা ধাড়িচন্দ্র পিতা।
তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা॥

পরবর্ত্তী অংশপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পাটীকা নামক নগরে রাজার রাজধানী ছিল এবং তাঁহার পত্নীর নাম—ময়নামতী।

মাণিকচাঁদের গান যথা,—

ভাটি হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি।
সেই বাঙ্গাল আসিয়া মুলকত কৈল্ল কড়ী॥
আছিল দেড় বুড়ি খাজানা নৈল পোনার গণ্ডা।
লাঙ্গল বেচায় জোঙ্গাল বেচায় আরো বেচায় ফাল।
খাজনার তাপেতে বেচায় দুধের ছাওয়াল॥
রাঁড়ী কাঙ্গাল দুঃখির বড় দুক্ষ হইল।
থানে থানে তালুক সব ছন হইয়া গেল॥
ছোট রায়ত উঠে বলে বড় রায়ত ভাই।
প্রধানের বরাবর সবে চল যাই॥
কি আচ্ছ বলে প্রধান সকল।
যেত রায়ত পরামর্শ করিয়া প্রধানের বাড়ী
বৈলেচৈলে গেল॥

দিনাজপুর ও রংপুরের যোগীজাতি মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদের গান গাওনা করে কিন্তু তাহারাও সমগ্র গীতের উদ্ধার সাধন করিতে পারে নাই। উত্তর-বঙ্গের কোনো সভ্য এবিষয়ে যত্নবান হইলে আমাদের প্রাচীন ও প্রথম অবস্থার সাহিত্যের উদ্ধার সাধন হইতে পারে। এই সকল গীত ও খনা এবং ডাকের বচন প্রভৃতিই বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথমকালের রচনা বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ধারণা। কিন্তু পক্ষান্তরে অনেকের ধারণা যে, ইহা বাঙ্গলা সাহিত্যের আদিম রচনা নহে,—আদিমের নিকটবর্ত্তী মাত্র। ইহারো পূর্ব্বকালে বাঙ্গলা ভাষা রচিত হইয়াছে।

একাল পর্য্যন্ত যে সমুদয় গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণ', চণ্ডীদাসের 'চৈতন্য-রূপ প্রাপ্তি', রূপ গোস্বামীর 'কারিকা', কৃষ্ণদাস গোস্বামীর 'রাগময়ীকণা' এবং সহজিয়া সম্প্রদায়ের কতিপয় গ্রন্থে প্রাচীন বাঙ্গলার গদ্য সাহিত্যের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ সাহায্যেই আমরা বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

'শূন্য পুরাণ' বৌদ্ধ প্রভাব কালের পদ্যগদ্যময় গ্রন্থ। ইহার অধিকাংশই পদ্য, সামান্য অংশ মাত্র গদ্য। 'ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে সপ্রমাণ হইয়াছে এই পুস্তকখানি প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে।' এতদ্ পূর্ব্বে কোনো বাঙ্গালী লেখক গদ্য লিখিবার প্রয়াস

পাইয়াছিলেন কিনা অবগত হওয়া যায় না। শূন্য পুরাণের গদ্য রচনার নমুনা,—

"হে জঅসন্ধ হে বিজঅসন্ধ তুহ্মি সংখ হইএ চিরাই। তুহ্মার জলে স্নান করেন শ্রীধর্ম্ম গোসাঞি। অভিসেক জলে স্নান মনখির কৈসের পাবন সইতের পাবন সচল অচল সৃষ্টি সৃজিলেন গোসাঞি ভকত বৎসল।"

বৌদ্ধ প্রভাবকালে রচিত শূন্যপুরাণে গদ্য সাহিত্যের অবতারণা হইলেও সে কালের অপর কোনো লেখকের গ্রন্থে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব যুগেই গদ্য সাহিত্যের প্রচলন আরম্ভ হয়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস গদ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহাদের কণ্ঠে 'গদ্য পদ্যময় গীত' ধ্বনিত হইত। (১) সুতরাং 'চৈতন্যরূপ প্রাপ্তি' দ্বিজ চণ্ডাদাসের রচিত কি না, তাদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ দেখা যায় না। এই সকল আদিম গ্রন্থ সম্বন্ধে একটী কথা উল্লেখ যোগ্য বিবেচনা করি। মাতৃ-ক্রোড়-শায়িত শিশু যেমন অতি কষ্টে আধ আধ ভাষায় স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করে, 'চৈতন্যরূপ প্রাপ্তি' প্রভৃতি সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধনপ্রণালী বিষয়ক পুস্তকগুলিতেও তেমনি অতি কষ্টে রাহয়া রাহয়া আলোচ্য তথ্য পরিব্যক্ত হইয়াছে। সভ্য মহোদয়গণ তাহার একটু পরিচয় গ্রহণ করুন্,—

"জিহ্ রজকিনী তিহ্ রাগ মই। রাগআত্মা শ্রীমতীর অঙ্গ এক হন। জিহ্ চেতনরূপ তিহ্ চণ্ডীদাস। কার দেহ। শ্রীমতীর অন্তরঙ্গা দেহ। রজকিনী কার দেহ। চণ্ডীদাসের অন্তরঙ্গা দেহ।" ইত্যাদি

রূপ গোস্বামীর 'কারিকা' হইতে একটু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি;—"অথ বস্তু নির্ণয়। প্রথম শ্রীকৃষ্ণের গুণ নির্ণয়। শব্দ গুণ, গন্ধ গুণ, রূপ গুণ, রসগুণ, স্পর্শগুণ এই পাঁচগুণ। এই পঞ্চগুণ শ্রীমতী রাধিকাতেও বসে।"

'মুরসিদের বার মাস' নামক একখানি প্রাচীন অমুদ্রিত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার স্থানে স্থানে গদ্য রচনা দেখিতে পাওয়া যায়। পুস্তকখানি মোসলমান গ্রন্থকারের, সুতরাং তাহা হইতে একটু নমুনা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন;—

"জীবের জন্ম কিসে। * * * গঠন পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে। স্থিতি পঞ্চভূত আর বেদমায়াশক্তি? স্থত (?)। পিতার চাইর ৪ মাতার চাইর ৪ (এইভাবে ২৫ তত্ত্বের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তারপর—) ১ অপগুণ গৌরবর্ণ জিহ্বাতে স্থিতি। তার প্রতিক্ষ্য পঞ্চগুণ * মর্জাঞ্চ মল মূত্রঞ্চ পঞ্চমং অপপঞ্চ ইতি ৫। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেকালের মোসলমান লেখকও সংস্কৃতের আলোচনা করিতেন।

অতঃপর 'ব্রজ কারিকা' নামক একখানি বৈষ্ণব গ্রন্থের আলোচনা করিতেছি। ইহার পদ ছত্র প্রভৃতি কিছু দীর্ঘ,—যেন শিশুর মুখের আড়ষ্টভাব ক্রমেই সারিয়া আসিতেছে। গ্রন্থের ভাষা স্থানে স্থানে অস্পষ্ট হইলেও আলোচনার যোগ্য। যথা—

"শ্রীপঞ্চমী তিন দিবস থাকিতে শ্রীমতী বাপের ঘরে জান। মাঘ ফাল্গুন চৈত্র মাস পর্য্যন্ত দোলযাত্রা পূর্ণ হয়, যাবৎ তাবৎ বৃকভানুপুরে থাকেন। তথা থাকিয়া নিত্য খেলেন পাশা।" ইত্যাদি

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থসমূহ মোসলমান-শাসন-আমলে রচিত হইলেও, তাহাতে একটীও অ-সংস্কৃত বা বৈদেশিক শব্দ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহজিয়াগণই বাঙ্গলা গদ্যের প্রথম স্রষ্টা। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী হইতে এই গদ্য রচনার নমুনা পাওয়া গিয়াছে। সহজিয়া সম্প্রদায়ের রোপিত বীজ হইতেই বর্ত্তমান কালের এই মহান্ মহীরুহের উৎপত্তি। প্রথম কালের এই গ্রন্থ সমূহে ভাষার লালিত্য, বাক্যের সম্পূর্ণতা না থাকিলেও গ্রন্থকারের মনোভাব ব্যক্তির কোনো প্রতিবন্ধক উপস্থিত হওয়া প্রমাণ হয় না। এইরূপে সহজিয়াগণ গদ্য সাহিত্যের যে ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে আরম্ভ করেন, তাহার আংশিক পরিণতি সহস্র বৎসর পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত 'বেদাদিতত্ত্ব নির্ণয়' প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই। 'বেদাদিতত্ত্ব নির্ণয়' গ্রন্থখানি জনৈক বৈষ্ণব পণ্ডিত কর্ত্তৃক রচিত। গ্রন্থকার সুদীর্ঘ বাক্যাবলী দ্বারা দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রভৃতির বিবিধ তথ্য আলোচনা করিয়াছেন। দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতির কঠোর বিষয়ও যে বাঙ্গলা গদ্য ভাষায় আলোচিত হইতে পারে, তাহার প্রথম নিদর্শন এই গ্রন্থে পাইয়া কোন্ ব্যক্তি না প্রহৃষ্ট হইবেন?

(১) পদকল্পতরু—পঞ্চদশ শাখা দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থখানি প্রকাশের একান্ত উপযোগী, কিন্তু স্থানাভাব প্রযুক্ত তাহা হইতে নমুনা উদ্ধৃত করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সরল। 'বৃন্দাবন লীলা', 'শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা' প্রভৃতি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের রচিত কতিপয় গ্রন্থও এইরূপ সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ব্যাকরণের নিয়ম মানিত হয় নাই; সম্ভবতঃ তৎকালে কোনো বাঙ্গলা ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল না। না থাকিলেও পদ্যসাহিত্যে এরূপ বহুল প্রয়োগ-ব্যভিচার দৃষ্টিগোচর হয় না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে এতদ্দেশে ইংরেজ-প্রভাব প্রবর্ত্তিত হয়। ইংরেজগণ শাসনকার্য্যের সৌকার্য্যার্থে ও দেশীয়গণের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারের অভিপ্রায়ে বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি ও পুষ্টিসাধনে মনোনিবেশ করেন। এই সময় হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত গদ্য সাহিত্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়া, বর্ত্তমান কালে সাহিত্যোন্নতির জন্য কি পন্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য তাহার আলোচনা করিতে সচেষ্ট হইব। সপ্তদশ শতাব্দীর আরো বহুতর সৎক্রিয়া গ্রন্থে গদ্য সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তৎসমুদয়ের আলোচনা একদিনের একটী প্রবন্ধে করা দুষ্কর; কাযেই সে বাসনা পরিত্যক্ত হইল।

পূর্ব্বোক্ত সময়ের মধ্যে মার্সম্যান্, কেরী, ফষ্টার প্রভৃতি ইয়ুরোপীয়গণ দেশীয় গদ্য সাহিত্য প্রচারের প্রভূত চেষ্টা করিলেও পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেও তাদৃশ কোনো উন্নতি করিতে পারেন নাই। তাই রেভারেণ্ড লং সাহেব আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া-বাসী ইংরেজফিরিঙ্গীগণের দেশীয় ভাষা শিক্ষাকরার বিশেষ সুবিধা থাকিলেও তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়নে সমর্থ হন নাই। (১) তাঁহাদের ভাষাকে সাধারণতঃ 'খৃষ্টানী ভাষা' নামে অভিহিত করা হইত। এতৎসত্ত্বেও আমরা যখন দেখিতে পাই যে, কতিপয় বিদেশীয় ব্যক্তি আমাদের জাতীয় নবীন সাহিত্যপ্রচারের নিমিত্ত এরূপ অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তখন স্বতই আমাদের মন কৃতজ্ঞতা রসে আপ্লুত হইয়া উঠে। মিশনারীগণের নাম এই ভাবে বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে। মিঃ হালহেড ইয়ুরোপীয়দের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করেন এবং ১৭৭৮ অব্দে একখানি বাঙ্গলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

ইংরেজ সিভিলিয়ানদিগকে বঙ্গভাষা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত ১৮০০ অব্দে কলিকাতায় 'ফোর্টউইলিয়ম কলেজ' স্থাপিত হয়। কতিপয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হন। রামনাথ ন্যায়বাচস্পতি, রামরাম বসু, কালী-প্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত, শিবচন্দ্র তর্কালঙ্কার, পরে বিদ্যাসাগর, মদনমোহন প্রভৃতি সকলেই ফোর্টউইলিয়মে নিযুক্ত থাকিয়া বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। এই সময়ের অধিকাংশ গ্রন্থই সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ শব্দ যোজনা দ্বারা উৎকট। কাযেই এই সকল গ্রন্থ দ্বারা সাধারণের তাদৃশ উপকার দর্শায় নাই। আমরা এস্থলে এই সময়ের কতিপয় গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করিলাম।

বেণ্টো সাহেবের 'প্রশ্নোত্তরমালা' ১৭৬৫ অব্দে প্রকাশিত হয়। ইংরেজশাসন আরম্ভের ইহাই সর্ব্বপ্রথম গদ্যগ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তৎপর রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গলা সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। 'হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী' গ্রন্থই তাঁহার সর্ব্ব-প্রথম রচনা। রামমোহনের পিতা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া নাকি পুত্রের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। অতঃপর রামমোহন বহুতর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার পর আমরা কেরী সাহেবের গ্রন্থ দেখিতে পাই। তদীয় গ্রন্থে তৎকালীন দেশীয় সমাজের যে জীবন্ত চিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তাহার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

দুইটী রমণী ঘরকন্নার কথা বলিতেছে।—

"প্রথমা।—তোদের বৌ কেমন রাঁধিতে বাড়িতে পারে?

দ্বিতীয়া।—হাঁ বুন সেই বই আর কে রান্ধে? মেয়েরা

(১) "East Indians, though children of the soil, and so favourably situated in many cases for gaining a good knowledge of the native language, have done scarcely anything in Bengali composition. Russia can boast that her Milton, Poushkin is a Mulatta of Negro origin, but Bengal has never had either East Indians or Portuguese who were good vernacular writers."—Rev. Long.

কেহ এখানে নাই। আপনি কাচা বাচা নিয়া নড়িতে পারি না। সকল কাযি বড় বউ করে। ছোট বৌডা বড় হিঙ্গলদাগুড়া অঙ্গ লাড়ে না আর সদাই তার ঝকড়া। কি করিব বুন সহিতে হয় যদি কিছু বলি তবে লোকে বলিবে দেখ এ মাগী বৌদের দেখিতে পারে না। কিন্তু বুন কানা হাঁড়ি পানে চাহিয়া বড় বৌটী অতি ভাল। এ সংসারে কায কাম করে আর ছেল্যা পিল্যা খাওয়াইয়া আচিয়া দেয় আর আমাদের সেবা সুস্থ করে। তাহার জন্য আমাদের কোন ব্যামোহ নাই।"

১৮১২ অব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে "ইতিহাস-মালা" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়; তাহা হইতে একটী দেশীয় সমাজ চিত্র সভ্য মহোদয়গণকে উপহার প্রদান করিলাম।

"এক কৃষক লাঙ্গল চসিতে গিয়া কোন খালে, গোটা চব্বিশেক মৎস্য ধরিয়া গৃহে আনিয়া আপন গৃহিণীকে পাক করিতে দিয়া আপনি পুনর্ব্বার চসিতে গেল। তাহার গৃহিণী সে মৎস্য কয়টী পাক করিয়া মনে বিবেচনা করিল যে মৎস্য পাক করিলাম কিন্তু কি প্রকার হইয়াছে চাখিয়া দেখি। ইহা ভাবিয়া কিঞ্চিৎ ঝোল লইয়া খাইয়া দেখিল যে ঝোল সুরস হইয়াছে। পরে পুনর্ব্বার মনে ভাবিল মৎস্য কিরূপ হইয়াছে তাহাও চাখিয়া দেখি ইহা ভাবিয়া একটী মৎস্য খাইল। পুনর্ব্বার চিন্তা করিল ওটি কিরূপ হইয়াছে তাহাও চাখিতে হয় ভাবিয়া সেটীও খাইল। এইরূপ খাইতে খাইতে একটী মাত্র অবশিষ্ট রাখিল। পরে কৃষক ক্ষেত্র হইতে বাটী আইলে তাহার গৃহিণী সেই মৎস্যটী আর অন্ন তাহাকে দিলে কৃষক কহিল যে, এ কি? চব্বিশটি মৎস্য আনিয়াছি আর কি হইল? তখন তাহার স্ত্রী মৎস্যের হিসাব দিল :—

"মাছু আনিলা ছয় গণ্ডা
চিলে নিল দুই গণ্ডা
বাকী রইল ষোল।
তাহা ধুতে আটটা জলে পলাইল॥
তবে থাকিল আট।
দুইটায় কিনিলাম দুই আটি কাট॥
তবে থাকিল ছয়।
প্রতিবাসীকে চারিটা দিতে হয়।
তবে থাকিল দুই।
তার একটা চাখিয়া দেখিলাম মুঁই॥
তবে থাকিল এক।
অই পাতপানে চাহিয়ে দেখ॥
এখন হইস্ যদি মানসের পো
তবে কাঁটা খান খাইয়া মাছখান থো॥
আমি যেই মেয়ে।
তেঁই হিসাব দিলাম কয়ে॥"

বিদেশীয়দিগের এই সরল সমাজ-চিত্রের সহিত আমাদের দেশীয় পাণ্ডিত্যাভিমানী সংস্কৃতজ্ঞদিগের রচনা একবার তুলনা করিয়া দেখুন। গোলক শর্ম্মার 'হিতোপদেশ,' মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'পুরুষ-পরীক্ষা' ও 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা,' রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্র', চণ্ডী-চরণ মুন্সীর 'তোতার ইতিহাস', তারিণীচরণ মিত্রের 'ঈশপের গল্প', রামমোহন রায়ের 'বেদান্তসূত্র ভাষ্যানুবাদ' প্রভৃতি এবং অপরাপর গ্রন্থকারগণের রচিত 'মনোরঞ্জন ইতিহাস', 'নীতিকথা', শঙ্করাচার্য্যকৃত 'আনন্দলহরী' ও ইলিয়ড্ কাব্যের গদ্যানুবাদ, রাজা রাধাকান্ত দেবের স্ত্রী-শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ, আত্ম-তত্ত্বকৌমুদী, কলিরাজার যাত্রা প্রভৃতি এই সময় পর পর প্রকাশিত হয়। তৎপর মদন-মোহন তর্কালঙ্কারের বাসবদত্তা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থাবলী, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের হিতকর-প্রভাকর, বোধেন্দু-বিকাশ প্রভৃতি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল। আমরা প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত 'খৃষ্টানীভাষা' ও 'পাণ্ডিত ভাষার' ব্যবধান দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

বিদেশীয় সিভিলিয়ানদের পাঠ্য 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র মুখবন্ধ ;—"অকারাদি ক্ষকারান্তা ক্ষরমালা যদ্যপি পঞ্চাশৎ সংখ্যকা কিম্বা একপঞ্চাশৎ কিম্বা সপ্তপঞ্চাশৎ সংখ্যা পরিমিতা হউক তথাপি এতাবন্মাত্র কতিপয় বর্ণাবলী বিন্যাস বিশেষ বশতঃ বৈদিক-লৌকিক-সংস্কৃত-প্রাকৃত পৈশাচাদি অষ্টাদশ ভাষা ও নানাদেশীয় মনুষ্য জাতীয় ভাষা বিশেষ বশতঃ অনেক প্রকার ভাষা বৈচিত্র্য শাস্ত্রতো লোকতঃ প্রসিদ্ধ আছে।" আর না, ইহাই যথেষ্ট। ছাত্রের পক্ষে এই ভাষা আয়ত্ত করা কিরূপ দুরূহ তাহা

আপনারা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। আমার মনে হয়, বৈদেশিক সিভিলিয়ান সাহেবদিগকে এইরূপ 'কটমট' ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত বলিয়াই তাঁহারা দেশীয় ভাষা আয়ত্ব করিতে পারিতেন না। এই তো গেল, বৈদেশিকগণের শিক্ষা পুস্তক; এখন একবার আমাদের দেশীয় বালকগণের শিক্ষাগ্রন্থের ভাষার নমুনা দেখুন। নিম্নে প্রাচীন শিশুবোধক গ্রন্থ হইতে স্বামীর নিকট স্ত্রীর লিখিত একখানি পত্রের আদর্শ উদ্ধৃত করিলাম ;—

"ঐহিক পারত্রিক ভবার্ণব নাবিক শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বর
মধ্যম ভট্টাচার্য্য মহাশয় পদপল্লবাশ্রয়
প্রদানেষু—

শ্রীচরণ সরসী দিবানিশি সাধন প্রয়াসী দাসী শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দেবী প্রণম্য প্রিয়বর প্রাণেশ্বর নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীপদ সরোরুহ স্মরণমাত্র অত্র শুভবিশেষ। পরং মহাশয় ধনাভিলাষে পরদেশে চিরকাল কালযাপন করিতেছেন যেকালে এ দাসীর কালরূপ লগ্নে পাদক্ষেপ করিয়াছেন সেকাল হরণ করিয়া দ্বিতীয় কালের কালপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব পরকালের কালরূপকে কিছুকাল সান্ত্বনা করা দুই কালের সুখকর বিবেচনা করিবেন। * * * অতএব জাগ্রত নিদ্রিতার ন্যায় সংযোগ সঙ্কলন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীচরণযুগলে স্থানং প্রদানং কুরু নিবেদন মিতি।"

বর্ত্তমানকালের স্বামী পত্নীর নিকট হইতে এবম্প্রকার পত্র পাইলে যে কি করেন, তাহা বলা যায় না। প্রাচীনকালে অতিরিক্ত পণ্ডিতি দর্শাইবার আশায় ভাষাকে নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য করিবার প্রথা যেমন প্রচলিত ছিল, সেইরূপ প্রাচীন প্রথা, আচার ব্যবহার প্রভৃতিও 'মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ'এর ন্যায় ঠায়ঠারেই মানিত হইত। পূর্ব্বোক্ত পত্রখানিতে স্বামীর নাম করিতে হয় না বলিয়া, স্ত্রী তাহাকে 'প্রাণেশ্বর মধ্যম ভট্টাচার্য্য' নামে অভিহিত করিয়াছেন, যেন পৃথিবীতে আর কোনো মধ্যম ভট্টাচার্য্য থাকিতে পারে না।

একাল পর্য্যন্ত আমরা যতগুলি বাঙ্গলা গদ্য পুস্তকের উল্লেখ করিলাম, তাহার একখানিতেও দাঁড়ি, কমা প্রভৃতি ছেদ ব্যবহৃত হয় নাই। সহজিয়া সম্প্রদায়ের কোন কোন পুস্তকে দাঁড়ির স্থলে : বিসর্গ বা ॥ ডবল দাঁড়ি ব্যবহৃত হইয়াছে, কোন কোন পুস্তকে কিছুই ব্যবহৃত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমল হইতেই বাঙ্গলা গ্রন্থে দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলেন প্রভৃতি ছেদও পূর্ণ ছেদের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিসাধন অভিপ্রায়ে সরকারী শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে 'বঙ্গীয় সাহিত্য সভা' সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত হয়। ইহার পূর্ব্বে সরকার হইতে বঙ্গসাহিত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে আর একবার প্রচেষ্টা হইয়াছিল সত্য। বিজ্ঞান গ্রন্থের অনুবাদের নিমিত্ত 'বিজ্ঞান অনুবাদ সমিতি' অধ্যাপক উইলসনের সভাপতিত্বে ১৮২৮ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সমিতি হইতে 'বিজ্ঞান সেবধি' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় এবং তাহাতে ভারতীয় ভূগোল, যন্ত্রবিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান, বায়ুবিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই উভয় সভাই অধিক দিন অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে নাই। অতঃপর সরকার তরফ হইতে কলিকাতা, হুগলী, ঢাকা প্রভৃতি নগরে নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। এই স্কুলে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে বিজ্ঞান, ইতিহাস, ইউক্লিডের জ্যামিতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। শ্রীরামপুরের মিশনারী বিদ্যালয়েও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্যে ছাত্রগণকে বাঙ্গলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। এই বিদ্যালয়ের পাঠ্য স্বরূপ পদার্থবিদ্যাসার, উদ্ভিজ্জ বিদ্যা, কিমিয়া বিদ্যাসার, পদার্থ জ্ঞানমালা এবং চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কতিপয় বিজ্ঞানগ্রন্থ অনূদিত ও প্রচারিত হয়। রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে 'কিমিয়া বিদ্যাসার'ই বঙ্গভাষার প্রথম গ্রন্থ; ইহা মিঃ যোহন ম্যাক্ সাহেবের Principles of Chemistry নামক গ্রন্থের অনুবাদ। অনুবাদ হইলেও এই সময় হইতেই প্রমাণ হইতে থাকে যে, যত্ন ও পরিশ্রম করিলে বাঙ্গলা ভাষায় ইয়ুরোপীয় যাবতীয় বিজ্ঞানেরই আলোচনা করা যাইতে পারে।

ব্রাহ্ম সভা ও ব্রাহ্মগণ কর্ত্তৃকও বঙ্গভাষা কম গৌরবান্বিত হয় নাই। তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বঙ্গসাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছে। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে কতিপয় সিভিলিয়ান ও দেশীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির সাহায্যে কলিকাতায় Vernacular Literary Society

নামে এক সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় কিয়দ্দিবস এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন। সমিতির দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছিল। ইহার সভ্যগণকে মাসিক চাঁদা দিতে হইত এবং সম্পাদক মিত্রজা মহাশয় মাসিক ৮০৲ টাকা বেতন প্রাপ্ত হইতেন। সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল,—ইয়ুরোপীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির অনুবাদ ও তাহা দেশমধ্যে প্রচার। সমিতি দুই বৎসরে সতের থানি গ্রন্থ প্রকাশিত ও অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করে। সমিতির একতম সভাপতি মিঃ প্র্যাট্ বঙ্গসাহিত্যের আলোচনায় নিযুক্ত থাকা সময়ে, সাহিত্যের উন্নতির জন্য সবিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি সমিতির বার্ষিক বিবরণীতে লিখিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে অধিক মূল্যের গ্রন্থ বিক্রীত হইতে পারে না। গল্পের পুস্তক ও অন্যান্য আমোদজনক পুস্তকই দেশীয়গণের অধিকতর প্রিয় ও অধিক পরিমাণে বিক্রয় হয়। কিন্তু অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় এই ভাবের গ্রন্থাদি রচনা করা অতীব দুরূহ। প্র্যাট্ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, বর্ত্তমানকালেও সে অবস্থার বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এই সমিতি হইতে স্ত্রী ফেরিওয়ালা পুস্তক বিক্রয়ার্থে পল্লীগ্রামে প্রেরিত হইত। এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতগণও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এইভাবেই বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতি ও পুষ্টি সাধিত হয়। এই সময় পর্য্যন্ত দেশমধ্যে সাময়িক পত্রাদির প্রচলন ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতেই 'সমাচার দর্পণ', 'সংবাদ-কৌমুদী', 'চন্দ্রিকা' প্রভৃতি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রাদির প্রচার আরব্ধ হয়।

অতঃপর "বিদ্যাসাগরীয় যুগের" আরম্ভ। এই যুগেই বঙ্গসাহিত্য উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণের সূত্রপাত হয়। আমরা শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহিত একযোগে বলিতে পারি,—"ভাগীরথী যেমন হিমালয়ের দুর গভীর কন্দর হইতে নির্গত হইয়া ক্রমে স্বকীয় সঙ্কীর্ণভাব পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ বিশাল আকার ধারণ করেন এবং বহুজনপদ অতিক্রম করিয়া অবশেষে শতমুখে সাগর চুম্বনে কৃতার্থ হন, বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যও সেইরূপ সঙ্কীর্ণ ভাবস্রোতে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ প্রাচীন পণ্ডিতবর্গের পাণ্ডিত্যপ্রবাহে এবং তৎপরে মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহন প্রভৃতির প্রতিভায় স্বকীয় সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়াছে এবং বহু অবস্থা অতিক্রম করিয়া, বহুবিধ বিষয়ে বিভক্ত হইয়া শেষে বিদ্যাসাগর সঙ্গম লাভে কৃতার্থ হইয়াছে। ভাগীরথীর সাগরসঙ্গমস্থল যেরূপ মহাতীর্থ স্বরূপ, উহা যেমন সহস্র সহস্র তীর্থ যাত্রীর পবিত্রতাসাধক ও পুণ্য প্রবর্দ্ধক, বাঙ্গলা গদ্যরচনার বিদ্যাসাগর সঙ্গমও সাহিত্যিকগণের পক্ষে তাদৃশ মহাতীর্থ স্বরূপ। যে রচনা এক সময়ে উৎকট, দুর্ব্বোধ, বিশৃঙ্খল ও পূর্ব্বাপর রস সম্বন্ধবর্জ্জিত ছিল, বিদ্যাসাগর সংস্পর্শে তাহা সুললিত, সুখপাঠ্য ও সুসংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে এবং জগৎ সমক্ষে আপনার অনন্ত গুণগৌরব ও মহিমার পরিচয় দিতেছে। বিদ্যাসাগরের রচনায় বাঙ্গলা গদ্য ললিত মধুর শব্দাবলীর বিকাশ ভূমিতে পরিণত হইয়াছে।" বিদ্যাসাগরীয় যুগেই বঙ্গ গদ্যসাহিত্য প্রভূত শক্তিশালী হইয়া উঠে। এক দিকে বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন অক্লান্ত পরিশ্রমে নানা ভাষার জ্ঞান আহরণ করিয়া নানা সুললিত পদে ও শব্দে ভাষার পুষ্টি সাধনে রত হন, অপর দিকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনারায়ণ তর্করত্ন, এবং পরে দীনবন্ধু মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে "টেকচাঁদ ঠাকুর", কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাত্মারা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে মহা গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহারা চিরকাল অর্ঘ্য ও পূজা প্রাপ্ত হইতে থাকিবেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতেই, সাধারণতঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই বঙ্গদেশে সমাজবিপ্লবের ন্যায় এক ঘূর্ণাবর্ত্ত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। বিদেশীয় সভ্যতার আলোক-রশ্মিতে বঙ্গদেশ উদ্ভাসিত ও সঙ্গে সঙ্গে কুরীতি-স্রোত-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ বিদেশীয় রীতিনীতির অনুকরণে, বিদেশীয় পানাহারে অনুরক্ত হইয়া উঠেন। আবার সেই সঙ্গে তাঁহাদের চিত্তে দেশের এই পরাধীন অবস্থাও জাগ্রত হইয়া স্বদেশহিতকল্পে তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে লাগিল।

যে মাইকেল মধুসূদন দেশীয় আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া বিজাতীয় রমণীর কণ্ঠলগ্ন হইয়াছিলেন, তিনিও অবশেষে জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়া গাহিতে আরম্ভ করেন,—

"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।"

মাইকেলের এই কথাগুলি স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত হইয়া চিরকাল আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে আসন প্রাপ্ত হইবে। এই সময় হইতেই বঙ্গভাষা শতমুখী গঙ্গা-প্রবাহের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে নানা দিগ্দেশের অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। পূর্ব্বোক্ত সাহিত্য-রথিগণের প্রত্যেকের রচনা উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিবার অবসর আমার নাই, পরন্তু বর্ত্তমান যুগের বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস সংকলনের সময়ও উপস্থিত হয় নাই। বাঙ্গলা পদ্য সাহিত্য যেমন সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই উন্নতির পরিচয় দিয়া আসিতেছিল, গদ্য সাহিত্য সেরূপ পারে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই গদ্য সাহিত্যের উন্নতি সূচিত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতায় দেশমধ্যে যে প্রবাহ প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাতেই বাঙ্গালী বাঙ্গলাকে চিনিতে চেষ্টা করে, তাহাতেই বাঙ্গালা নিজেদের শোচনীয় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-মার্গে নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করেন। তিনিই সাহিত্য মধ্যে নূতন ভাব, নূতন চিন্তা, অভিনব কল্পনার প্রবর্ত্তন করিয়া বঙ্গবাসীকে আনন্দরসে আপ্লুত করিয়া তোলেন। কেনা জানে, সেকালে তাঁহার 'বঙ্গদর্শন' পাঠের নিমিত্ত সকলে উৎকণ্ঠিত চিত্তে মাসের দিন গণনা করিতেন। শেষাবস্থায় তিনি ধর্ম্ম-তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হন। আমি বহুপূর্ব্বে একবার বলিয়াছিলাম যে, সেই দেবদত্ত অসাধারণ প্রতিভা-সমন্বিত মস্তিষ্ক যেদিন ধর্ম্মতত্ত্বের স্তর বিন্যাসে নিয়োজিত হইয়াছিল, সেই দিনই বঙ্গোপন্যাস-লক্ষ্মী আপনার অঞ্চলকোণে উচ্ছ্বসিত নয়নবারি সংবরণ করিয়াছিল। তাহার কণ্ঠের সেই অস্ফুট রোদন-ধ্বনি দার্শনিক ঢক্কার সজোর আস্ফালন বশতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের কর্ণপটহে অগ্রসর হইবার অবসর পায় নাই। আমরা ধর্ম্মতত্ত্বের কাঙ্গাল ছিলাম না, আমাদের দেশ, আমাদের সাহিত্য, আমাদের জাতীয়তা ধর্ম্মপটে সমাচ্ছাদিত;—তাহারই তত্ত্বে আমরা জগতের মধ্যে বরণীয় জাতি। আমরা আবার নূতন করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের জন্য কাঙ্গাল সাজিব কেন? যাহারা সমগ্র জগতের ধর্ম্মপিপাসার বারি সঞ্চয় করিতে পারে, তাহাদিগকে গণ্ডুষপূর্ণ জলের জন্য লালায়িত হইলে শোভা পাইবে কেন? যাহা ছিল না, বঙ্কিম না জন্মাইলে যাহা আমাদের ভাগ্যে কোন দিন ঘটিত না, যাহার জন্য আমাদের ভাষা আবার বিদ্বজ্জন সমাজের আশীর্ম্মাল্যে নবভাবে বিভূষিত হইয়া তাহার মৃতজননীর কীর্ত্তিরক্ষা করিতে পারিত; একদিন বঙ্গভাষা প্রসূতি যে অতুলনীয় গৌরব গর্ব্বে স্ফীত হইয়া আপনার কোলের সন্তান 'শকুন্তলা'কে সর্ব্বভাষার সৌন্দর্য্যাধার করিয়া তুলিয়াছিল;—তাহারই জন্য আমরা কাঙ্গাল সাজিয়াছিলাম। দারিদ্র্য ঘুচিয়া আসিয়াছিল, চরণে নূপুর পাইয়াছিলাম, কটিতটে কণ্ঠা পাইয়াছিলাম, বুঝিবা কণ্ঠের হারও মিলিয়াছিল কিন্তু শিরোপরি সেই বিজয় কিরীট কোথায়? এখন আর আমাদের ভাষা নিরাভরণা নহে—মুকুটহীনা। ধর্ম্মতত্ত্বের স্রোত অসময়ে প্রবাহিত না হইলে সে শিরোভূষণ বঙ্কিম দিতে পারিতেন। বঙ্কিম বাঁচিয়া থাকিতেই সে আশা মরিয়া গিয়াছে।

বঙ্কিমের নামের সহিত আমাদের বাঙ্গলা উপন্যাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রের মহিমান্বিত প্রতিভা কিরণে বাঙ্গলা উপন্যাসের জন্ম। বঙ্কিমের কৃষ্ণকেশ শুভ্র হইতে না হইতেই, তাহার সৌন্দর্য্য, তাহার যৌবন ফুরাইয়া আসিয়াছিল। কোনো দেশের কোনো ভাষার কোনো স্তরের এরূপ অপূর্ব্ব ক্ষিপ্র উন্নতি এবং পরক্ষণে এরূপ শোচনীয় অবনতি সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সে উন্নতির রশ্মি এতই উজ্জ্বল যে, সুদূর ইংরাজি সাহিত্য-সাম্রাজ্ঞীও মুগ্ধনয়নে চকিতচিত্তে তাহার পানে চাহিয়াছিলেন,—সে আভরণ এমনই মূল্যবান যে, তিনি আপনার ভূষণ বিনিময়ে শ্বেতাঙ্গে তাহা ধারণ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু হায়! সে আভরণ অঙ্গাভরণ, শির আভরণ নহে। আমাদের এ ক্ষোভ যিনি দূর করিতে

পারিতেন, তিনি করেন নাই। ভবিষ্যতে কেহ পারিবেন কি না, সে আলোচনা এখন শোভন হয় না।

গদ্য সাহিত্য যেরূপভাবে নানা অবস্থা নানা সংকীর্ণতা পরিহার করতঃ বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে আপনাদের গোচরীভূত করিয়াছি। কিন্তু আমার সময়ের অল্পতায় এবং অবসরাভাব হেতু পূর্ণ-সফল-কাম হইতে পারিয়াছি বলিয়া আমার নিজেরই ধারণা হয় না। এরূপভাবে অসম্পূর্ণ ও অজ্ঞরচনা এরূপ পণ্ডিত সম্মিলনীতে উপস্থিত করা নিতান্তই ধৃষ্টতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া একার্য্য হইতে পশ্চাৎপদ হওয়াও আমি তুল্যরূপে ধৃষ্টতা বলিয়া মনে করি।

সাহিত্যের অপর শাখা—পদ্য; উহা মাণিকচাঁদের, গোপীচাঁদের গানের মধ্যদিয়া জন্মলাভ করিয়া, ডাক ও খনার বচনের মধ্য দিয়া পুষ্টিলাভ করতঃ শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব লেখকগণের কৃপায় উন্নতির সোপানে আরোহণ করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিনব প্রেম-তরঙ্গে নদীয়া যখন 'ডুবু ডুবু', তখন নানা দিগ্দেশ হইতে নানা জাতীয় ভক্ত আসিয়া তাঁহার প্রেম-মন্দাকিনী-স্রোতে নিমজ্জিত হয়। এই সময় একেশ্বরবাদী মোসলমানগণও বৈষ্ণব ধর্ম্মের মহিমাচ্ছটায় আকৃষ্ট হইয়া বৈষ্ণবরসের রসিক হইয়া উঠে এবং সুললিতপদে গৌর গুণগান কীর্ত্তনে মনোনিবেশ করে। এইভাবে নানা দিক হইতে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের নানা উত্তেজনা লইয়া বঙ্গসাহিত্য সাগর-সঙ্গমে মিলিত হয়।

এখন কথা এই—বঙ্গ সাহিত্য বর্ত্তমান সময়ে যে অবস্থায় সমানীত, তাহাই কি তাহার পূর্ণাবস্থা, না আর কোন বিষয়ে কোনো ভাবে তাহার উন্নতির উপায় অনুসৃত হইতে পারে। এই সঙ্গে বর্ত্তমান সাহিত্য সম্মিলনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তাও আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু সর্ব্ব প্রথমেই একটী কথা বলিয়া রাখি যে, এবিষয়ে সকলে সহসা একমত হইতে পারেন না; নানা জনের নানামত অবশ্যম্ভাবী। অনেকেই অনেক রকম প্রস্তাব উত্থাপিত করিবেন জানি। আমি যাহা বলিব, তাহা যে অভ্রান্তরূপে পরিগৃহীত হইবে, সেরূপ আশা আমার নাই। তবে আপনারা সকলে আমার কথাগুলি প্রণিধান করিবেন, যুক্তি তর্কের দ্বারা তাহার বৈধ অবৈধতা প্রতিপাদন করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

বাঙ্গালী পরাধীন—ইংরেজরাজের অধীনে বাস করিতেছে। ইংরেজি আজ রাজভাষা; রাজকার্য্য, ব্যবসায় বাণিজ্যের কার্য্য, শিক্ষা কার্য্য সমস্তই আজ ইংরেজি ভাষা সাহায্যে নির্ব্বাহিত হইতেছে। বাঙ্গালীর দেশে বাঙ্গালীর ভাষা প্রচলনের যে কোনরূপ সার্থকতা বা প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা আমাদের কর্ত্তাদের বিবেচনায় আইসে না। সময়ের স্রোতে দেশবাসীও নীয়মান, সকলেই স্ব স্ব পুত্র-পৌত্রাদিকে ইংরেজি শিক্ষার নিমিত্ত ইংরেজি স্কুলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেছেন। সকল বালকই যে এইভাবে বিদ্বান হইয়া আসিতেছেন, তাহা নহে। সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় অতি সামান্য মাত্র বাঙ্গালী উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। যাক্ সে কথা। এখন কথা এই যে—পরাধীন জাতি হইলেই কি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া বিজেতার ভাষা গ্রহণ করিতে হয়? জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত কুত্রাপি পাওয়া যায় বলিয়া আমার জানা নাই। বিশ্ববিজয়ী রোম যখন কাল-চক্রের পরিবর্ত্তনে বর্ব্বরদিগের হস্তে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেয়, তখন সে কোন্ ভাষা শিক্ষা করিয়াছিল? প্রাচীন গ্রাস্ তুরস্কের বাহুবলে পরাজিত হইয়া কি স্বীয় জাতীয় ভাষা বিসর্জ্জন দিয়াছিল? তারপর জর্ম্মন, স্যাক্সন্ প্রভৃতি অনেক জাতিরই এক সময় ভাগ্য বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের কেহই তো মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ভাষা—বিজেতার ভাষা গ্রহণ করে নাই। যাহারা তদ্রূপ করিয়াছে, তাহারা সম্ভবত মরিয়া গিয়াছে তাহাদের অস্তিত্বটুকুও অনন্তগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। তবে কি বাঙ্গালী, তুমিও নিজের অস্তিত্বটুকু—সত্তাটুকু পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিতে ইচ্ছা কর? না, ব্রতধারণ পূর্ব্বক মাতৃভাষার সেবায় মন প্রাণ সমর্পণ করিবে? আজ যে আমরা নানা দেশের বাঙ্গালী এথায় সমবেত হইয়াছি, কি উদ্দেশ্যে? আজ আমাদের জাতীয় সাহিত্য—বাঙ্গলা ভাষা দীনা নহে, আভরণ বিহীনা নহে, পরন্তু উহা বিপুল সম্পৎসারে গৌরবান্বিতা, তবে এখন আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য কি? আমি বলি প্রথমতঃ বাঙ্গলা ভাষায় উচ্চ শিক্ষা দানের নিমিত্ত বাঙ্গলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত। বিজ্ঞান, দর্শন,

ইতিহাস, শিল্প, প্রভৃতি যে যে শাখার উৎকৃষ্ট বাঙ্গলা পুস্তকের অভাব আছে তাহা পূরণ করিতে হইবে। যেদিন দেখিব বাঙ্গলার জেলায় জেলায়, সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে ইংরেজি বিদ্যালয়ের পার্শ্বে বড় বড় বঙ্গ বিদ্যালয় দণ্ডায়মান হইয়া দেশের অগণ্য সন্তানকে জাতীয় ভাষা শিক্ষা দিতেছে, জাতীয় ভাষার সাহায্যে দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান বিতরিত হইতেছে, সেইদিন জানিব বুঝিব আমাদের জাতীয় সাহিত্য পূর্ণ সফলতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে।

আজ দেশের মধ্য দিয়া এক নূতন বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে বাতাস উপেক্ষা করিয়া নিজের ইচ্ছামত বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিলে উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। আজ দেশের সমবেত শক্তি—সমস্ত নরনারী মাতৃ-পূজার অভিপ্রায়ে মাতৃ মন্দিরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। আমরা সাহিত্যসেবী বলিয়া কি পশ্চাৎপদ হইয়া রহিব? না, আমাদিগকেও সাহিত্যের ভিতর দিয়া মাতৃসেবা করিতে হইবে। দেশধর্ম্মই এক রকম সকল ধর্ম্মের সার। দেশের সেবাকে ধর্ম্মের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমরা মাতৃ ভূমির অর্চ্চনা করিতে পারি, তবেই আমাদের সকল সাধনা, সকল ব্রত উদ্যাপিত হইবে। স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর উন্নতি বিধান করিতে গেলে যে, অসংখ্য জীবের উপকার সাধন করা হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। ভগবানের সৃষ্টজীবের উপকার করিলে, ভগবানেরই সেবা অর্চ্চনা করা হয়, ভগবানের প্রসাদলাভ করা যায়। আমাদের দেশের নারীজাতি ধর্ম্মের জন্য কত স্বার্থত্যাগ, কত ব্রত কত উপবাস, কত দান কত ধ্যান করিয়া থাকেন, কতই না উপচিকীর্ষাপরতন্ত্রতার পরিচয় দেন, এ বিষয়ে সমগ্র ভারতের নারী সমাজ একমত। দেশের যেখানে যাইবে সেইখানেই মঠ ঘাট, মন্দির পান্থশালা প্রভৃতি নিত্য ভোগের কত উপাদান দেখিতে পাইবে। কিন্তু দেশের হিতের জন্য কে কবে লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছে? ধর্ম্মের জন্য যতটা এক-প্রাণতা আমরা দেখাইয়া থাকি, দেশের মঙ্গলের জন্য যদি ঐরূপ দেখাইতে পারি, তবে দেশের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হয়।

আমাদের দেশের নারীজাতিই সমাজের শিরোভূষণ, তাহাদের হস্তে মহান্ কর্ত্তব্যভার সন্ন্যস্ত। শিশু শিক্ষার প্রথম ভার জননীর হস্তেই ন্যস্ত থাকে। সেই নারীজাতিকে দেশধর্ম্মের মহনীয়ত্ব বুঝাইয়া দিলে দেশের প্রভূত উপকার হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ করিতে পারিলে স্বদেশ-প্রীতি, একপ্রাণতা, স্বার্থশূন্যতার অগণিত দৃষ্টান্ত আমরা বঙ্গের ঘরে ঘরে দেখিতে পাইব। অপরাপর ব্যক্তির পক্ষে এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে কিন্তু সাহিত্য-সেবী আমরা,—আমাদিগকে সাহিত্যের ভিতর দিয়াই এ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইবে। এই ভাবে পূর্ণমনস্কাম হইতে পারিলে, আমাদের জাতীয় সাহিত্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠাপন্ন এবং সর্ব্বজনীন সহানুভূতি লাভে সক্ষম হইবে।

এইরূপ অনুষ্ঠান অল্প সময়ে বা অল্প আয়োজনে সুসাধ্য নহে, স্বীকার করি এবং তজ্জন্যই এই উত্তর-বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনে আমি আজ নিম্ন লিখিত তিনটী প্রস্তাব উত্থাপিত করিতেছি। আমি যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিব, তাহা সকল স্থানের সকল সাহিত্যিকের প্রতি প্রযোজ্য হইলেও উত্তর বঙ্গীয় সাহিত্যসেবীর প্রতিই বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য বলিয়া মনে করিবেন। উত্তর বঙ্গে যখন লোকবল, ধনবল প্রভৃতি তাদৃশ ক্ষমতাপন্ন নহে, তখন উত্তর বঙ্গবাসীদিগকে অল্প আরম্ভেই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। সুতরাং সর্ব্বপ্রথম আমাদিগকে সাহিত্যের এই তিনটী শাখার সেবায় নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে সাফল্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে আমরা উত্তরোত্তর অন্যান্য শাখায় হস্তক্ষেপ করিব। পূর্ব্বোক্ত তিনটী শাখা,—(১) সাহিত্য শাখা, (২) ইতিহাস শাখা এবং (৩) বিজ্ঞান শাখা। এই তিন শাখায় কি কি বিষয় আলোচিত হওয়া উচিত, তাহা একে একে নিম্নে বিবৃত হইল। উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন যাহাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট উল্কার ন্যায় বিপথে পরিচালিত না হয়, তৎপক্ষে আমাদের সকলেরই চেষ্টিত হওয়া কর্ত্তব্য। রংপুরবাসী বন্ধুরা এই প্রথম সম্মিলন যে ভাবে চালাইবেন, ভবিষ্যতে সম্মিলন সেই ভাবেই চালিত হইবার আশা করা যায়। আরম্ভেই ইহা যাহাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়—বিপথগামী না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিত।

(১) সাহিত্য শাখা।

প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের

আলোচনা এবং বাঙ্গলা ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়নের চেষ্টা এই বিভাগের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে। সাহিত্যের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রাচীন কবি ও লেখক-দিগের জীবনী সংকলন এবং প্রাচীন গ্রন্থাদির আবিষ্কার, বিবরণ সংকলন, সমালোচনা ও প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাস প্রচার করিতে হইবে। আমাদের দেশের প্রতি গ্রামে প্রতি পল্লীতে কতশত কবি অজ্ঞাতে লোকলোচনের অন্তরালে লুক্কায়িত আছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই সকল সাহিত্যসেবীই আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যের আদিম লেখক। প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাসে তাহাদের স্থান অতি উচ্চে।

বাঙ্গলাভাষায় বাঙ্গলা ব্যাকরণ নামে প্রায় আড়াই শত ব্যাকরণ পুস্তক বর্ত্তমান ছিল সত্য, কিন্তু তাহার একখানিও প্রকৃত বাঙ্গলা ব্যাকরণ নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হাল্‌হেড্ সাহেবের ব্যাকরণই এই শ্রেণীর ব্যাকরণের মধ্যে প্রথম রচিত ও প্রকাশিত হয়। তৎপর যথাক্রমে কেরী সাহেবের ব্যাকরণ, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ', রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের 'বর্ণমালা ও ব্যাকরণ', হটন সাহেবের ও কীথ সাহেবের ব্যাকরণ, শ্যামাচরণের 'ইংরেজি বাঙ্গলা ব্যাকরণ' প্রকাশিত হয়। বাঙ্গলা ভাষার শব্দরূপ, ক্রিয়ারূপ, তদ্ধিত প্রত্যয় প্রভৃতি সংস্কৃতের সম্পূর্ণ অনুরূপ না হইলেও এই সকল ব্যাকরণে এতদুভয়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য প্রদর্শিত হয় নাই। পরবর্ত্তী বৈয়াকরণগণও পূর্ব্বোক্তের পদানুসরণ করিয়াছেন মাত্র। সুতরাং এসকল ব্যাকরণ বাঙ্গলা ব্যাকরণ নামের প্রকৃত উপযোগী নহে। বাঙ্গলা ব্যাকরণে বাঙ্গলা শব্দের ব্যুৎপত্তি বিচার, শব্দের ইতিহাস, ভাষার গঠন বৈচিত্র্য প্রদর্শন এবং বাঙ্গলার সহিত হিন্দী, উড়িয়া, আসামী প্রভৃতি ভাষার সম্বন্ধ নির্ণয় ও তুলনায় সমালোচনা প্রয়োজনীয়।

ব্যাকরণের ন্যায় বাঙ্গলা শব্দের অর্থ পরিজ্ঞাপক অনেকগুলি অভিধানও বর্ত্তমান আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় আমাদের, বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান উভয়েরই সর্ব্বপ্রথম প্রণেতা ইয়ুরোপীয় জাতি। ফষ্টার নামক এক সিভিলিয়ান সর্ব্বপ্রথম এক বাঙ্গলা অভিধান ১৭৯৯ অব্দে প্রকাশিত করেন; ইহাতে ১৮০০ অব্দের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। তৎপর যথাক্রমে মিলার সাহেবের অভিধান, ঠাকুরের বাঙ্গলা ইংরেজি অভিধান, পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের শব্দসিন্ধু অভিধান, কেরী সাহেবের অভিধান, পিয়ার্সন সাহেবের, মেণ্ডস সাহেবের, লাবাণ্ডিয়ার সাহেবের, ইটন সাহেবের, মটন সাহেবের, মার্সম্যান সাহেবের ও রবিন্‌সন্ সাহেবের অভিধান এবং বাঙ্গালী রচিত 'বাঙ্গলা কোষ গ্রন্থ', 'ধাতুশব্দজ', 'শব্দ কল্প লতিকা' প্রভৃতি সংকলিত ও প্রকাশিত হয়। এই সকল অভিধান দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের বর্দ্ধিত শক্তির পরিচয় পাওয়া গেলেও, প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই।

উত্তরবঙ্গীয় সম্মিলন দ্বারা উত্তরবঙ্গের শব্দ সংগ্রহের চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তৎপর এ অঞ্চলের গ্রাম্য গল্প, প্রবচন, প্রবাদ, উপকথা, গ্রাম্য গান, গাথা সংগ্রহ ও তাহার ইতিহাস বিশ্লেষণ এবং সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী সমাজে প্রচলিত বারব্রত কথা, রূপকথা, nursery tales ও rhymes প্রভৃতির আলোচনা অবশ্য করণীয়। দুই একজন লেখকের দৃষ্টি ইতিমধ্যেই এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে সত্য কিন্তু প্রত্যেক প্রদেশে তত্তৎ দেশবাসী সাহিত্যিকের যত্ন এ বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(২) ইতিহাস শাখা।

বাঙ্গলা দেশের ইতিহাস সংকলন এই শাখার মুখ্য উদ্দেশ্য। এ ইতিহাস দুই শ্রেণীর হইবে,—সামাজিক ও রাজনৈতিক। সামাজিক ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা রাজ-নৈতিক ইতিহাসাপেক্ষা কম নহে। কোম্পানীর আমলে ভারতবর্ষ ও বাঙ্গলা সম্বন্ধায় প্রায় কুড়িখানি পুস্তক রচিত হয়। ইহার অধিকাংশেই স্বাধীনমত প্রকাশের ও অভ্রান্ত সত্য প্রচারের ঐকান্তিকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৮৩২ খৃঃ অব্দে 'ঐতিহাসিক ব্যাকরণ' নামে একখানি বাঙ্গলার ইতিহাস রবিনসন সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহার প্রণেতা মিঃ কেরী। ঐতিহাসিক আলোচনার নিমিত্ত তৎকালে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে দ্বাদশটী দেশীয় সভ্য ছিলেন। সেই সমিতির উদ্যোগেই 'ঐতিহাসিক ব্যাকরণ' প্রকাশিত হয় কিন্তু ইহার এরূপ অদ্ভুত হইল কেন, তাহা ঠিক বলা কঠিন।

আলোচ্য ইতিহাস-শাখা প্রত্যেক জেলার বা গ্রামের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ; প্রাচীন মুদ্রা, খোদিত লিপি, প্রাচীন দুর্গ অট্টালিকা প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ চিত্র ও তাহার বিবরণ সংকলন; ঐতিহাসিক কিম্বদন্তীর উদ্ধার ও সমালোচনা ও ইতিহাসের সহিত তাহার সমন্বয়সাধন এবং ঐতিহাসিক ও প্রসিদ্ধ তীর্থাদির তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করিবে।

ভূগোল, খগোল, মানবজাতিবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি আপাততঃ এই শাখারই অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। দেশের সামাজিক আচার ব্যবহার, পর্ব্ব-উৎসবাদির আলোচনা এবং হাড়ি ডোম, বাগদি বাউরী, রাজবংশী প্রভৃতি অনার্য্য জাতি সমূহের সমাজতত্ত্ব ও আর্য্য জাতির সহিত তাহাদের সম্পর্ক বিচার করা বাঞ্ছনীয়। এতদ্ব্যতীত দেশের বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত এবং বিভিন্ন জাতির কুলগ্রন্থাদির আলোচনা এই শাখারই উদ্দেশ্য রূপে গণ্য হওয়া উচিত।

আর একটী কার্য্য আমার বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। আমাদের দেশের কৃষিশিল্প বাণিজ্যের একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ইতিবৃত্তের আবশ্যকতা অনেক দিন হইতে অনুভূত হইয়া আসিতেছে কিন্তু কাহাকেও এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে শুনি নাই। উত্তর বঙ্গের প্রতি জেলায় প্রতি নগরের ক্ষুদ্র, বৃহৎ, উন্নত অনুন্নত, জীবিত, অর্দ্ধমৃত, মৃত—সর্ব্ববিধ কৃষি শিল্পের একখানি ইতিহাস প্রস্তুত হইলে দেশের প্রভূত উপকার হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে কি উপায়ে মৃত শিল্পগুলির পুনরুদ্ধার সাধিত হইতে পারে, কি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কার্য্য করিলে জীবিত শিল্পাদির অধিকতর উন্নতি হইতে পারে তৎসমুদয়ের বিস্তৃত আলোচনা থাকিবে এবং কোন্ স্থানে কোন্ শিল্পের, কোন্ বাণিজ্যের বা কোন্ কৃষি কার্য্যের প্রচলন অধিক তাহারও আভাস প্রদত্ত হইবে। পরিশেষে দেশের শিল্প বাণিজ্যের পূর্ব্বতন গৌরব কাহিনী ও অবনতির কারণ পরম্পরা সংযোজিত করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়।

(৩) বিজ্ঞান শাখা।

যেরূপ সময় আসিয়াছে তাহাতে বিজ্ঞানের প্রভূত আলোচনা ব্যতীত আমরা সংসার ক্ষেত্রে জয়যুক্ত হইতে পারিব না। আমাদের প্রত্যেক কার্য্য—কৃষি শিল্প বাণিজ্যের প্রত্যেক কর্ম্ম বৈজ্ঞানিক মতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির বলে সম্পন্ন করিতে হইবে; নতুবা বৈদেশিক এবং প্রতিভা ও বিজ্ঞান বলে বলীয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীর হস্তে আমাদের শিল্প বাণিজ্যের অধোগতি অবশ্যম্ভাবী। কতদিন আমরা কেবল বৈদেশিক পদার্থের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দেশের জনসাধারণকে নিরস্ত রাখিব? অল্প সময়ে অধিক দ্রব্য উৎপাদন এবং সুলভে তাহার প্রচলন করিতে না পারিলে দেশের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। দেশের সকল লোকেই যে 'বয়কট' নীতি অবলম্বনে সুলভ মূল্যের বৈদেশিক সামগ্রী পরিহার করতঃ দেশীয় দ্রব্য উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিবে তাহার আশা করা বাতুলতা মাত্র। সুতরাং আমাদের বিজ্ঞানালোচনা সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য রূপে পরিগণিত হওয়া কর্ত্তব্য। দেশের নানা স্থানে যে সমুদয় সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠিত আছে বা ভবিষ্যতে হইবে, তাহাদের দৃষ্টি এবিষয়ে পতিত হওয়া প্রার্থনীয়। আমাদের রাজসাহীর সাহিত্য সভার (পরিষদের শাখা) ইহাই বিশেষত্ব! রাজসাহী শাখা-পরিষৎ যাবতীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনাই মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে স্থির করিয়াছে। কৃষিশিল্পের উন্নতি করিতে হইলে রসায়ন শাস্ত্রের এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির আলোচনার প্রাধান্য থাকা কর্ত্তব্য। তৎসহ জীব বিদ্যা, ভূবিদ্যা প্রভৃতির আলোচনাও থাকিবে। বঙ্গ দেশের কতিপয় স্থানে রাসায়নিক কর্ম্মাগার স্থাপিত হইয়াছে বটে এবং তাহা হইতে নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইতেছে কিন্তু এরূপ সীমাবদ্ধ স্থানে এ দুরূহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারেনা। দেশের অভাব যেমন গুরুতর, দেশের শিল্পালয় বা যন্ত্রালয়ও তদ্রূপ প্রচুর থাকা প্রয়োজনীয়। এইরূপ কারখানা যত অধিক সংখ্যায় স্থাপিত হইবে, ততই দেশের মঙ্গল হইতে থাকিবে। পূর্ব্বোক্ত তিন শাখারই প্রাচীন দ্রব্যাদি ও অভিনব যন্ত্র সামগ্রী প্রভৃতি সম্মিলনের সংসৃষ্ট প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে দুই একটী কথা বলিয়া আমি আমার প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে আমাদের জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় ধর্ম্মে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে অর্থাৎ দেশের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর

ভক্তি প্রবণতায়—বাঙ্গালী জাতির সাহিত্যের ক্রমোন্নতি হইতেই বাঙ্গলা সাহিত্য জন্ম লাভ করিয়াছে। ইহা কখনো কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। এক্ষণে সাহিত্যকে কর্ম্মে প্রবেশ করাইতে হইবে; সাহিত্যের দ্বারা যাহাতে দেশের স্থায়ী কায হইতে পারে—জনসাধারণের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে তৎপক্ষে আমাদিগকে যত্নবান হইতে হইবে।

জনৈক ইংরেজ লেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে, গার্হস্থ-জীবন ও নারীজাতির সামাজিক অবস্থা হইতেই সকল দেশের সভ্যতার পরিমাপ হইয়া থাকে। শিশুগণ শৈশবকালে স্বগৃহে জননীর নিকট যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই জাতীয় উন্নতির প্রধান উপাদান বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। নারীজাতির জীবন ও চিন্তাপ্রণালী উন্নত না হইলে কোন জাতিই প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে না। জননীই সন্তান-হৃদয়ে যথাকালে মহদ্ভাবের বীজ রোপণ করিয়া থাকেন।

প্রাচীন ভারতের নারীজাতির অবস্থা উন্নত থাকিলেও বর্ত্তমানকালে নারীজাতির অবস্থা দেখিয়া আমাদিগকে হতাশ হইতে হয়। জীবের যেমন দেহ আছে, সমাজেরও তেমন দেহ অনুমান করিয়া লওয়া যায়। জীবদেহের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যথোচিত বিকাশের অভাবে যেমন দেহের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি হয় না বা তাহার কার্য্যকারিতা উপলব্ধি হয় না; সমাজদেহেরও তদ্রূপ কোনো অঙ্গ দুর্ব্বল ও অপটু হইলে জাতীয় উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। নারীজাতি সমাজদেহের অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ পরিগণিত। এই অর্দ্ধাঙ্গ ক্ষীণ বা দুর্ব্বল হইলে সমাজদেহ কখনই পূর্ণ বিকাশিত হইতে পারিবে না। আজ সমগ্র ভারতবাসী উন্নতির পথে প্রধাবিত সত্য কিন্তু তাঁহারা সমাজের অপরার্দ্ধের প্রতি আস্থাবান নহেন; তাঁহারা ভুলিয়া যান—'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ', আর ভুলিয়া যান যে রমণীগণ সুশিক্ষা প্রভাবে দৃঢ়ব্রত হইলে অতি দুরূহ কর্ম্মও সাধ্যায়ত্ত হইয়া উঠে। তাঁহাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত,—

'না জাগিলে সব ভারত-ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।'

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে কার্থেজের সহিত রোমের জীবন-মরণ-সংগ্রামের সময় রমণীগণের বস্ত্রালঙ্কারের ব্যয় হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে রোমে এক আইন বিধিবদ্ধ হয়। রোমক মহিলাবৃন্দ স্বদেশ-প্রীতিতে পুরুষগণ অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না, তাঁহারা অক্ষুব্ধ চিত্তে এই রাজ-বিধি পালন করিতে থাকেন। গ্রীস্ দেশান্তর্গত আর্গস নামক স্থানের এক ক্ষুদ্র অধিপতি বিপক্ষের সহিত এক যুদ্ধে স্বাধিকারভুক্ত এক ক্ষুদ্র গ্রাম হারাইলে, অধিবাসিনী মহিলারা প্রতিজ্ঞা করেন যে, যতদিন না সেই গ্রামের পুনরুদ্ধার হইবে ততদিন তাঁহারা অলঙ্কার পরিধান করিবেন না বা কোনো প্রকার বিলাসে লিপ্ত হইবেন না। জাপানের মহিলারা এতই উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন যে, যখন বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় তখন ঐ ধর্ম্মের মূলতত্ত্বানুসন্ধানভার তিনজন রমণীর প্রতি ন্যস্ত হয়; তাঁহারা ভারতবর্ষে আগমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিবৃত্ত সংকলন করেন। প্রকৃত শিক্ষিতা হইলে রমণীগণ কিরূপ কার্য্যক্ষম ও স্বদেশ-প্রেমিক হন, তাহার শত শত দৃষ্টান্ত ইতিহাস হইতে প্রদর্শন করা যাইতে পারে। সুতরাং স্ত্রী-শিক্ষা যাহাতে প্রসারলাভ করে, রমণীবৃন্দের যাহাতে স্বাস্থ্যোন্নতি হয়, সভ্যতার স্রোতকে তাঁহারা যাহাতে বেগশালী করিতে পারেন তাহার উপায় অবলম্বন করা আশু কর্ত্তব্য। আজ এই জাতীয় অভ্যুত্থানের দিনে দেশের বিভিন্ন জাতিসমূহ যখন একই আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হইতে চেষ্টিত হইতেছে, তখন আমাদের সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—যে জাতিগঠনের ভার আমাদের উপর নহে, নারীগণের হস্তেই সন্ন্যস্ত।

সম্মিলন প্রতি বৎসর একস্থানে না হইয়া এক একবার উত্তরবঙ্গের এক একস্থানে হওয়া সঙ্গত বলিয়া বোধ করি। ইহাতে বিভিন্ন স্থানের সহিত আমাদের পরিচয় স্থাপিত হইবে। এই সম্মিলনে যে সকল প্রবন্ধ পঠিত হইবে এবং প্রদর্শনীতে যে সকল দ্রব্য প্রদর্শিত হইবে তাহাতে যে জেলায় সম্মিলন বসিতেছে সেই জেলার বিশেষত্ব থাকা আবশ্যক। সম্মিলন ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিবার ও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ও বাঙ্গালীর আশা আকাঙ্ক্ষার বিস্তার পরিচয় দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে বড়ই ভাল হয়।

আমাদের এই সম্মিলন যাহাতে কেবল প্রবন্ধপাঠে এবং জল্পনায় কল্পনায় পর্য্যবসিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং যাহারা কেবল প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা দ্বারা আপনাকে দেশের মধ্যে পরিচিত করিবার জন্য লালায়িত তাহাদের আক্রমণ হইতেও সম্মিলনের রক্ষার উপায়বিধান করিতে হইবে। ইহাতে এক দলের অযথা আক্রোশের আশঙ্কা করিলে চলিবে না। তৎপর সম্মিলনে যাহাতে কোনো একটা অনুষ্ঠান আরব্ধ হয়, একটা কোনো কাযের সূত্রপাত হয় এবং পরবর্ত্তী সম্মিলনে যাহাতে জবাবদেহী করিবার সংস্থান থাকে তাহার আয়োজন এখন হইতেই করিতে হইবে। এইরূপ কোন কায যদি আপনারা সম্পূর্ণ করিতে পারেন, বা কতকটা সূত্রপাত করিয়াও দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে সম্মিলন সার্থক হইবে; তাহা হইলে সম্মিলন দ্বারা প্রকৃতই দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে এবং সম্মিলনও ক্রমে ক্রমে সাফল্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে। আমি আর অধিক কিছু বলিব না, সভ্যগণের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কা করিতেছি। আজ আমরা যে মহানুভবের সভাপতিত্বে এস্থলে সম্মিলিত হইয়াছি, তিনি প্রকৃষ্টতর কথায় আমাপেক্ষা দক্ষতার সহিত আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্যের বিষয়ে আপনাদিগকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়া আমি উপবিষ্ট হইলাম।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

মনুষ্য সৃষ্টি।

(ফাল্গুনের প্রবাসীর অনুবৃত্তি)

অমেরুদণ্ডজাতির মধ্যে কতকগুলি জীব চর্ম্মত্যাগের পূর্ব্বোক্ত অসুবিধাটা বুঝিয়া উন্নতির আশায় চর্ম্মত্যাগ হইতে বিরত হইয়াছিল। কিন্তু এই সুবুদ্ধিও তাহাদের ভবিষ্যৎ পথ নিষ্কণ্টক করিতে পারে নাই। এক নূতন বিঘ্ন আসিয়া উন্নতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চর্ম্মত্যাগ অভ্যাস পরিহার করায়, ইহাদের সকলকেই অল্পায়ু ও ও ক্ষুদ্রাবয়ববিশিষ্ট হইয়া জন্মিতে হইত, এবং যাহারা জোর করিয়া দেহের আয়তন বৃদ্ধির চেষ্টা করিত তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনটা পুনঃ পুনঃ দেহের পরিবর্ত্তন করিতেই কাটিয়া যাইত।

আধুনিক রেসমকীট এবং নানা জাতীয় পতঙ্গগুলিই পূর্ব্বোক্ত জীবের বংশধর। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ উন্নতির পথ নির্ব্বাচনে যে ভ্রম করিয়াছিল, তাহারি ফলে অদ্যাপি ইহারা ক্ষুদ্রাবয়ববিশিষ্ট ও অল্পায়ু হইয়া জন্মিতেছে, এবং জীবনের অধিকাংশ সময়ই দেহপরিবর্ত্তন করিয়া কাটাইতেছে। বলা বাহুল্য এই প্রকার ক্ষুদ্র জাতি কখনই বুদ্ধিমান হইয়া উঠিতে পারে না। বুদ্ধির জন্য বৃহৎ মস্তিষ্কের প্রয়োজন। ক্ষুদ্রদেহে সে প্রকার মস্তিষ্কের স্থান নাই। পিপীলিকার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের শক্তি বৃহৎ মানবমস্তিষ্কের তুলনায় হীন নয় বলিয়া একটা কথা আছে। একথাটা যে সম্পূর্ণ নিরর্থক তাহা নানা পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়া গেছে।

বংশানুক্রমে বহুকাল একই কার্য্য অবিচ্ছেদে করিতে থাকিলে, কাজের ভিতরকার খুঁটিনাটি সকল ব্যাপার ভাল করিয়া বুঝিবার শক্তি সেই বংশের একটা বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়ায়। নানা জাতীয় জীবের বিশেষ বিশেষ বুদ্ধি, জ্ঞান ঠিক্ এই প্রকারেই ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া শেষে সেগুলি জাতিগত সম্পদ্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে জীবকে তাহার ক্ষুদ্রজীবনে দুই তিনবার দেহপরিবর্ত্তন করিতে হয়, সে কখনই অবিচ্ছেদে কোন একটা কার্য্য করিবার অবসর পাইতে পারে না। কাজেই ইহাতে তাহার বুদ্ধিও স্ফূর্ত্তি পাইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। পরিবর্ত্তনশীল দেহ লইয়া পতঙ্গজাতিকে ঠিক এই কারণেই অল্পবুদ্ধি হইয়া থাকিতে হইয়াছে। রেসমের কীট যখন শুঁয়োপোকার আকারে থাকে, তখন তাহাকে কেবল বৃক্ষপত্র আহার করিয়াই জীবনধারণ করিতে হয়। এই অবস্থায় ইহারা নানাশত্রুর গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সুস্বাদু পত্র উদরস্থ করিবার কৌশল শিখিয়া ফেলে। কিন্তু সেই পোকাগুলিই যখন সুদীর্ঘ নিদ্রার পর গুটি কাটিয়া প্রজাপতির আকারে বাহির হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের পূর্ব্বের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা কোন কাজেই লাগে না। এই অবস্থায় তাহাদিগকে সম্পূর্ণ নূতন শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া নূতন উপায়ে আহার সংগ্রহের জন্য শিক্ষানবিসি করিতে হয়। কাজেই পূর্ব্বাপর জীবনের কোন অভ্যাসই

তাহাদের মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধিকে উন্নত করিতে পারে না।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, অমেরুদণ্ড জীব প্রথমে তাহার সমেরুদণ্ড ভ্রাতাকে পশ্চাতে ফেলিয়া শেষে নিজেই পিছুনে পড়িয়াছিল; আত্মোন্নতি ও আত্মরক্ষার যে কয়েকটি উপায় গ্রহণ করিয়াছিল তাহার কোনটিই উহাদিগকে মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর করে নাই। যে সকল প্রাণী কোমলদেহে কঠিন মেরুদণ্ডকে পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, শেষে কেবল তাহারাই জয়ী হইয়া পড়িয়াছিল।

সমেরুদণ্ড জীব বহুকাল জলচর প্রাণীর আকারে সমুদ্রে বিচরণ করিয়াছিল, এবং পরবর্ত্তীযুগে ইহাদেরি কতকগুলি স্থলচর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ এই পরিবর্ত্তনের নানাপ্রকার কারণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে চন্দ্রের আকর্ষণকে যাঁহারা প্রধান কারণ বলিয়া উল্লেখ করেন, তাঁহাদেরি কথা যথার্থ বলিয়া মনে হয়। ইঁহারা বলেন, অতিপ্রাচীনকালে যখন চন্দ্র পৃথিবীর খুব নিকটে ছিল, তখন তাহার প্রবল টানে সমুদ্রজলে অত্যন্ত অধিক জোয়ার ভাঁটা হইত। এই জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল জলচর জীব স্থলে উঠিত, ভাঁটার জলের সঙ্গে তাহাদের সকলগুলি সমুদ্রে পড়িত না। এই প্রকারে কতকগুলি জীবকে প্রতিদিনই দুইবার করিয়া স্থলবাসী হইতে হইত। হঠাৎ প্রতিকূল অবস্থায় আসিয়া পড়িলে, প্রতিকূলকে অনুকূল করিয়া লওয়াই জীবের জীবত্ব। কাজেই সাধারণ জলচর জীব যে শ্বাসযন্ত্রের সাহায্যে জলের ভিতরকার অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া জীবিত থাকিত তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছিল। জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে স্থলে আসিয়া পড়িলে তাহা দ্বারা বায়ুর অক্সিজেন সংগ্রহ করা যাইত না। এই প্রয়োজনই জলচরের ফুল্‌কো (Gill) অলস করিয়া রাখিয়া নূতন শ্বাসযন্ত্র ফুস্‌ফুসের (Lungs) উৎপত্তি করিয়াছিল।

সমেরুদণ্ড জলচর জীব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্থলচর জীবে পরিণত হইয়া ক্রমোন্নতির পথ ধরিতে পারিয়াছিল কি না, এখন আলোচনা করা যাউক। জলচর জীব পরীক্ষা করিতে গেলেই প্রথমেই তাহার মস্তিষ্কের ক্ষুদ্রতা আমাদের চোখে পড়ে। এই অসম্পূর্ণতার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন নয়। যে জাতি আবশ্যকীয় সমস্ত জিনিস হাতের গোড়ায় পাইয়া একঘেয়ে জীবন অতিবাহন করে, তাহার মস্তিষ্কের বিকাশ কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। সর্ব্বদাই প্রায় সমোষ্ণ জলে বিচরণ করিয়া জলচরগণ জীবনকে খুবই একঘেয়ে করিয়া তুলিয়াছিল। শীতাতপ ঝড়বৃষ্টির অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইহাদিগকে মোটেই বুদ্ধির পরিচালনা করিতে হইত না, এবং আহার্য্যও প্রচুর পরিমাণে হাতের গোড়ায় সঞ্চিত থাকিত। কাজেই জলকে স্থায়ী আবাসস্থান রূপে নির্ব্বাচন করাই ইহাদের সর্ব্বনাশের মূল কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহাদেরি যে সকল বংশধর হঠাৎ স্থলচর হইয়া পড়িয়াছিল, উন্নতি কেবল তাহাদেরি নিকট সুলভ হইয়া আসিয়াছিল।

স্থলচর হইয়া জীবগণ বহুদিন একভাবে চলিতে পারে নাই। শীঘ্রই আর এক সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছিল। স্থলচরগণ অবস্থা বিশেষে পড়িয়া পক্ষী এবং স্তন্যপায়ী এই দুই পৃথক জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই জাত্যন্তর পরিগ্রহের কারণ নির্ণয় করিতে গেলে, রক্তসঞ্চলন পদ্ধতি ও শ্বাসযন্ত্রের ক্রমিক পরিবর্ত্তন অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাধারণ স্থলচরদিগের মধ্যে যাহাদের হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ফুস্‌ফুসের আয়তনও প্রসারিত হইয়াছিল, তাহারা আর পূর্ব্বের প্রকৃতি রক্ষা করিয়া থাকিতে পারে নাই। বৃহৎ ফুস্‌ফুসের সাহায্যে পরিস্কৃত হইয়া বিশুদ্ধ রক্ত সর্ব্বদাই তাহাদের ধমনীতে চলিত। তা'ছাড়া দেহাভ্যন্তরে বিশুদ্ধ অক্সিজেনের যোগে প্রবলভাবে রাসায়নিক কার্য্য সুরু হওয়ায় পূর্ব্বপুরুষদিগের তুলনায় তাহাদের শরীরের তাপও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়া গিয়াছিল। এই প্রকারে নবশক্তিযুক্ত হইয়া নূতন জীবগণ অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে নাই। সেই সময়ে সমগ্র ভূভাগ জলচর জীব হইতে উৎপন্ন মহাকায় সরীসৃপ (Reptiles) দ্বারা আকীর্ণ ছিল। ইহাদেরি সহোদরগণ যখন নূতন শক্তি এবং উন্নত প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিল, তখন নূতন পুরাতনে ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। নূতন জীব প্রচুর অক্সিজেন দেহস্থ করিয়া যে শক্তির সঞ্চয় করিত,

তাহাই উহাদিগকে মহাকায় সরীসৃপদিগের গ্রাস হইতে রক্ষা করিত। ক্ষিপ্রতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রতিযোগিতায় পুরাতন নূতনকে পরাভব করিতে পারিত না। ইহা ছাড়া এই সময়ে নূতন জাতিতে আর যে একটি শুভ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা পুরাতনকে আরো পশ্চাতে রাখিয়াছিল। পুরাতন জীবগণ বংশবিস্তারের জন্য অণ্ড প্রসব করিত, অথচ তাহাদেরি সন্তানদিগের শরীরে যখন উষ্ণ শোণিতধারা বহিতে লাগিল, তখন এই সৌভাগ্যবান বংশধরগণ অণ্ড প্রসব অভ্যাস ত্যাগ করিয়া জীবন্ত শাবক প্রসব করিতে আরম্ভ করিল। এই ব্যাপারটি নূতন জীবগুলিকে মনুষ্যত্বের দিকে এত অধিক অগ্রসর করিয়াছিল যে, মূল জীবের মনুষ্যত্বলাভের আশায় এখানেই জলাঞ্জলি পড়িয়াছিল।

নূতন জীব নিঃসহায় শিশুসন্তানগুলিকে প্রসব করিয়া প্রথম প্রথম বড়ই গোলযোগে পড়িত। শাবকগুলিকে শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করা তাহাদের জীবনের একটা প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইত। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, সন্তানরক্ষার এই চেষ্টাই জীবগণকে উন্নতির পথ দেখাইয়া দিয়াছিল। অনেক সময় দেখা যায়, কোন বিশেষ উন্নতির জন্য যখন সকল অবস্থাই অনুকূল, তখন প্রকৃতি সেই উন্নতিপথ রোধ করিবার জন্য মোহিনী বেশে আসিয়া জীবকে বিপথগামী করিয়া দেয়। নিঃসহায় শাবকগুলিকে রক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য যখন জীবগণ ব্যস্ত, তখন কাহারো উদরের নিম্নে চর্ম্মপুট নির্ম্মাণ করিয়া বা কাহারো লাঙ্গুলে শাবক ঝুলাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া স্বয়ং প্রকৃতি জীবগণের চিন্তা দূর করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কাঙ্গারু প্রভৃতি জীব প্রকৃতির এই অযাচিত দান গ্রহণ করিয়া চিন্তার দায় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। অপর জীবগণ মোহিনী প্রকৃতির মায়ায় ধরা দেয় নাই। ইহারা নৈসর্গিক উপায় ত্যাগ করিয়া, স্বাধীন চিন্তার সাহায্যে শাবক রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিল।

শাবকদিগকে স্তন্যদান করিলেই পিতামাতার কর্ত্তব্য শেষ হয় না। শিক্ষা-প্রদানেরও প্রয়োজন। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা বংশধরদিগকে জানাইবার যে একটুও আবশ্যক আছে, ইহার পূর্ব্বে কোন জীবই তাহা ভাল করিয়া অনুভব করে নাই। নিঃসহায় শিশুসন্তান প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়া অবধি জীবগণ এই ব্যাপারটির প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, এই জ্ঞান এবং পূর্ব্বোক্ত স্বাধীন চিন্তার চেষ্টা স্তন্যপায়ীদিগকে মনুষ্যত্বের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর করিয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জাতি বা যে ব্যক্তি জীবনের সমগ্র আবশ্যকীয় সামগ্রী সর্ব্বদাই সম্মুখে প্রস্তুত দেখিতে পায়, তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা অতি অল্পই থাকে। পক্ষিজাতি ও স্তন্যপায়িগণ একই মাতৃগর্ভ হইতে প্রসূত হইয়াছিল, এবং উষ্ণ শোণিত-ধারায় উভয়েরই দেহ শক্তিশালী হইত। সুতরাং এই অবস্থায় উভয়েরই উন্নতি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হইবারই কথা। কিন্তু পক্ষিজাতি উন্নতির পথ ধরিতে পারে নাই। পূর্ব্বোক্ত বিঘ্নটি আসিয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহারা অতি অল্পকাল মধ্যে শরীরের অনেক উন্নতি করিয়াছিল। অদ্যাপি ইহাদের উন্নতদেহের নিকট শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্যকেও পরাভব মানিতে হয়। কিন্তু শরীর রক্ষার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহার সকলি সম্মুখে প্রস্তুত পাইয়া তাহারা বুদ্ধিচালনার কোন সুযোগই পায় নাই। ইহাই মনুষ্যত্বের সোপানে উঠিবার পথে কণ্টক রোপণ করিয়াছিল। দৈহিক পূর্ণতায় সহিত কোন প্রকারে যদি বুদ্ধির পূর্ণতা আসিয়া যোগ দিত, তাহা হইলে পক্ষিজাতি যে কি আশ্চর্য্য জীবে পরিণত হইত তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না।

যাহা হউক সুপথগামী স্তন্যপায়িগণ ইহার পর কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া মনুষ্যত্বের দিকে আরো অগ্রসর হইয়াছিল, এখন তাহার আলোচনা করা যাউক। এই পথ আবিষ্কারের জন্য আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্‌গণকে বহু গবেষণা করিতে হইয়াছিল। গবেষণাকারীদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই এখন একবাক্যে বলিতেছেন, মহাকায় সরীসৃপ দ্বারা আচ্ছন্ন পৃথিবীতে ক্ষুদ্রকায় স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব হইলে, ঐ সকল বৃহৎজীবের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য স্তন্যপায়ীদিগকে নিরাপদ স্থান অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। সে সময় বৃহৎ বৃক্ষের অভাব ছিল

না। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, সম্ভবতঃ এই সময়ে অধিকাংশ স্তন্যপায়ী জীবই আধুনিক অপোসম্ (Opossum) প্রভৃতি প্রাণীর আকার ধারণ করিয়া বৃক্ষচর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণও এই সিদ্ধান্তের অনুমোদন করিতেছেন। অতি প্রাচীন শিলাস্তরে যে সকল জীবের চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের অনেকগুলিকেই বৃক্ষচর বলিয়া মনে হয়।

বৃক্ষচর প্রাণীর দেহ পরীক্ষা করিলে, গাছ আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য তাহাতে কেবল দুইটিমাত্র সুব্যবস্থা দেখা যায়। কতকগুলি প্রাণী তাহাদের দীর্ঘ নখ দিয়া শাখা-প্রশাখা আঁকড়াইয়া বৃক্ষবাস করে। অপর কতকগুলি তাহাদের অঙ্গুলিগুলিকে দীর্ঘ করিয়া ডাল ধরিবার সুবিধা করিয়া লয়। কোন্ প্রাকৃতিক অবস্থায় পড়িয়া সাধারণ স্তন্যপায়ী জীব ক্রমে দীর্ঘনখী বা দীর্ঘাঙ্গুলি প্রাণীতে পরিণত হইয়াছিল, তাহা এখন স্থির করিবার উপায় নাই। তবে সাধারণ স্তন্যপায়ী প্রাণী হইতেই যে উক্ত দুই শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা সুনিশ্চিত, এবং প্রতিযোগিতায় নখিগণকে পরাস্ত করিয়া অঙ্গুলিযুক্ত বৃক্ষচরগণই যে মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাও স্থির।

নখীদিগের নখই উন্নতির অন্তরায় হইয়াছিল। নখ দ্বারা ভাল করিয়া বৃক্ষশাখা আঁকড়াইয়া ধরা বড়ই কষ্টকর। দেহ পুষ্ট হইলে এই কার্য্য একেবারে অসম্ভবই হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু বৃহৎ অঙ্গুলিযুক্ত প্রাণী যতই পুষ্টাবয়ব হউক না কেন, অঙ্গুলি দ্বারা শাখা ধরিয়া সে অনায়াসে বৃক্ষে বিচরণ করিতে পারে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, নখের এই অনুপযোগিতাই বৃক্ষচারী নখিগণকে ক্ষুদ্রাবয়ব করিয়া রাখিয়াছিল। অপরদিকে দীর্ঘ অঙ্গুলিযুক্ত প্রাণিগণ ক্রমে দেহের সর্ব্বাঙ্গ পুষ্ট করিয়া উন্নত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

যে সকল মানসিক শক্তি মনুষ্যকে ইতরপ্রাণী হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, সেগুলির আলোচনা করিতে গেলে গণনাশক্তির কথা সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনে পড়িয়া যায়। পাঁচটি জিনিসের সহিত আর পাঁচটি জিনিস যোগ করিলে, এই নূতন জিনিস গুলি যে পূর্ব্বের দ্বিগুণ হইয়া পড়িল, তাহা ধারণা করিবার শক্তি কেবল মনুষ্যজাতিরই নিজস্ব। এই জ্ঞানের উন্মেষতত্ত্ব লইয়া ডাক্তার ওয়ালেস্ ও ডারুইন্ প্রভৃতি মহা পণ্ডিতগণ অনেক গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। দুই একটি নব্য পণ্ডিত এই সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া বলিতেছেন, পুরাতন স্তন্যপায়িগণ যখন শাখী হইয়া বৃক্ষে বিচরণ করিতেছিল, সম্ভবতঃ সেই সময়েই ইহাদের মস্তিষ্কে গণনা-শক্তির উন্মেষ হইয়াছিল। শাখী প্রাণিগণ যখন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লাফাইয়া পড়িত, তখন তাহাদিগকে বিশেষ চেষ্টা করিয়া দূরত্বের একটা নির্ভুল হিসাব মনে স্থির রাখিতে হইত। এই হিসাবের ভুলে হয়তো প্রথমে অনেক প্রাণীকে ভূপতিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল, কিন্তু শেষে তাহারা আর সে প্রকার ভুল করিত না। ইহা ছাড়া হস্ত পদের পেশীগুলিকে কত সঙ্কুচিত করিলে এক লম্ফে কতদূর পৌঁছান যায় শাখী স্তন্যপায়ীদিগকে তাহারও একটা হিসাব করিতে হইত। শেষে হয়তো এই হিসাবগুলি তাহারা যন্ত্রবৎ করিত, কিন্তু তথাপি পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারগুলিই যে স্তন্যপায়ীদিগের গণিত জ্ঞানের উন্মেষ করাইয়া দিয়াছিল তাহা আর অস্বীকার করা যায় না।

যখন কোন প্রাণী একটি বিশেষ শক্তি হইতে বঞ্চিত হয়, প্রায়ই অপর আর একটি শক্তি সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র শক্তি সমষ্টিকে পূর্ণ রাখে। ইহা একটা পরীক্ষিত প্রাকৃতিক নিয়ম। অন্ধের শ্রবণ ও স্পর্শশক্তির তীক্ষ্ণতা এবং বধিরের দৃষ্টিশক্তির প্রাখর্য্য চিরপ্রসিদ্ধ। এই প্রাকৃতিক নিয়মটিকে মনে রাখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, যখন মানবের অতি প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণ স্তন্যপায়ীর আকারে বৃক্ষে বিচরণ করিতেছিল, তখন সেই সকল প্রাণীতে আরো কতকগুলি মনুষ্যসুলভ শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। অনেক ইতর প্রাণীর তুলনায় মানুষের দৃষ্টি ও ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত অল্প। বৈজ্ঞানিক-গণ বলেন, মানবের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণ যখন শাখীর আকারে ছিল, তখন ধরাতলবিহারী প্রাণীদিগের ন্যায় তাহাদের ঘ্রাণ বা দৃষ্টিশক্তির চালনা করিতে হইত না। কাজেই ব্যবহারের অভাবে এগুলি ক্রমে অক্ষম হইয়া গিয়া অপর শক্তির উন্নতি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই অক্ষমতা বৃক্ষচর প্রাণীকে মনুষ্যত্বের দিকে যে কত অগ্রসর করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ঘ্রাণ-

শক্তির তীক্ষ্ণতা হারাইয়া ইহারা যখন কুকুরের মত গন্ধ গ্রহণ করিয়া আহার্য্য অনুসন্ধানাদি করিতে পারিত না, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অভাবে দূরস্থ শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করা যখন তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন আত্মরক্ষার অন্য উপায় না থাকায় বুদ্ধির পরিচালনা করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করা ব্যতীত তাহাদের আর গত্যন্তর ছিল না। এই পরিবর্ত্তনই ইহাদের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল।

ইহার পর পূর্ব্বোক্ত প্রাণীদিগের মধ্যে বুদ্ধি পরিচালনার কৌশল লইয়াই প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বৃক্ষবিহারী প্রাণী হইতে যখন হস্তপদাদিযুক্ত মনুষ্যাকৃতি জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল, তখন উহাদিগকে পশুপক্ষী বধ করিয়াই জীবন ধারণ করিতে হইত। বলা বাহুল্য এই কার্য্য তাহাদের বুদ্ধিবিকাশের খুবই সাহায্য করিত। সমস্ত বৎসর ধরিয়া কোন স্থলেই হাতের গোড়ায় শিকার পাওয়া যায় না। কাজেই বুদ্ধিমান শিকারীকে ভবিষ্যতের চিন্তা অভ্যাস করিতে হইয়াছিল। যাহারা এই চিন্তায় অনভ্যস্ত ছিল ক্ষুৎপিপাসা ও অনাহারে তাহাদের সকলকে সবংশে মৃত্যুমুখে পড়িতে হইত। এই প্রকারে কেবল একটিমাত্র উন্নতবুদ্ধি নরাকৃতি জাতি পৃথিবীতে টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছিল। ইহাকেই আধুনিক মানবজাতির পিতামহ বলা যাইতে পারে। এই অসম্পূর্ণ মানবই ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়া আধুনিক মনুষ্যজাতির সৃষ্টি করিয়াছে।

মনুষ্যসৃষ্টির ঠিক্ পূর্ব্বেকার ব্যাপারগুলি আলোচনা করিলে মনে হয়, অসম্পূর্ণ মানব কতকগুলি প্রাকৃতিক দানকে অব্যবহারে কার্য্যের অনুপযোগী করিয়া নিজের উন্নতি খুব দ্রুত করিয়া তুলিয়াছিল। এই স্বেচ্ছাকৃত নিঃসহায়তা মানুষকে ঘেরিয়া না দাঁড়াইলে, সেই মানুষ কখনই এতদিনে এখনকার মানুষে পরিণত হইতে পারিত না। সেই নিঃসহায়তাই মানুষকে গৃহবস্ত্র ও অস্ত্রাদি নির্ম্মাণের কৌশল শিখাইয়াছে। মানুষ যদি পক্ষীর ন্যায় প্রকৃতিদত্ত বস্ত্রে দেহ আবৃত রাখিত, এবং তাহাদের ন্যায় পক্ষবিশিষ্ট হইয়া যথেচ্ছা গমনাগমন করিয়া সহজে আহার্য্য সংস্থান করিতে পারিত, তবে আজ আমরা মনুষ্যজাতিতে আধুনিক সভ্যতার লেশমাত্র দেখিতাম না, এবং উড়িবার কল আবিষ্কারের জন্য দেশের বড় বড় পণ্ডিতদিগকে চিন্তাকুল দেখিতাম না। প্রকৃতির বৈরিতাই পশুত্বে মনুষ্যত্বের আরোপ করিয়াছে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

স্বয়ংবহ যন্ত্র।*

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক লিখিত।

বংগীয় সাহিত্য সম্মিলনে এই যে প্রবন্ধ উপস্থিত করিতেছি, তাহাতে নূতন কথা কিছুই নাই। ভ্রমগুলে নূতন না কি কিছুই নাই। থাক্ বা নাই থাক্, আমরা পুরাতনের দিকে তাকাইয়া সুখী হই, কখনও বা কদাচিৎ ক্ষুব্ধও হই। কিন্তু একথা নিশ্চিত, পুরাতনের সহিত নূতনের যোগ ঘটাইতে না পারিলে নূতন দ্বারা জাতীয় দেহের পুষ্টি হয় না।

কালের স্রোত বহিয়া যাইতেছে। প্রাচীনেরা দিনে সূর্য এবং রাত্রে তারা দেখিয়া সেই এক-টানা স্রোতের বিভাগ করিতেন। কিন্তু দিবা ও রাত্রি ছোট ছোট নয়, পূর্ব্বাহ্ণপরাহ্ণও ছোট নয়। দিবাভাগে উচ্চ বৃক্ষের ছায়া, যষ্টির ছায়া, এমন কি আমাদের দেহের ছায়া পরিমাণ করিয়া স্থূলতঃ কাল অবধারণ করায় বিচিত্র কিছু নাই। বোধ হয় ইহা হইতে দণ্ড অর্থে কাল-বিভাগ-বিশেষ হইয়াছে।

কিন্তু ছায়াও সূর্য-সাপেক্ষ। এই হেতু তাম্রী বা ঘটীর প্রচলন হইয়াছিল। তাম্রনির্মিত ঘটের নিম্নার্ধ লইয়া ঘটী যন্ত্র হইত। ইহার আকার মাথার খুলীর তুল্য। এই হেতু কোন কোন সিদ্ধান্তে ইহাকে কপাল-যন্ত্রও বলা হইয়াছে। ঘটের অধোভাগে সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকিত। স্বচ্ছ জলে ভাসাইয়া দিলে ঘটে ছিদ্র দিয়া জল প্রবেশ করিত এবং কিয়ৎ কাল পরে ডুবিয়া যাইত। অহোরাত্রে—জ্যোতিষে নাক্ষত্র অহোরাত্রে—ষাটি বার ডুবিতে পারে, এইরূপ প্রমাণের ঘটী নির্মিত হইত। যে সময়ে ঘটী একবার ডুবিত, সে সময়ের নাম ও ঘটী বা ঘটিকা। ঘটী হইতে বাংগলা ঘড়ী

---

* রাজশাহীতে বংগীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক সম্মিলনে পঠিত হইয়াছিল।

শব্দ। ঘটীতে ষাটি পল পরিমিত জল ধরিতে পারিত। ৬০ পলে এক ঘটিকা। বাংগলা তেলের পলাতে সেই পল শব্দ রহিয়াছে। ঋগ্বেদাংগ জ্যোতিষে ঘটীর পরিবর্তে প্রস্থ সংজ্ঞা আছে। বিষ্ণু পুরাণেও প্রস্থ সংজ্ঞা আছে। জল তৈলাদির মান পাত্রের নাম প্রস্থ ছিল। অতএব কত প্রাচীন কাল হইতে যে এদেশে ঘটী যন্ত্রের ব্যবহার আছে, তাহা বলিতে পারা যায় না।

কিন্তু যে যন্ত্র দ্বারা কালজ্ঞানার্থ লোক বসাইয়া রাখা আবশ্যক, তাহা কদাপি সকলের ব্যবহারযোগ্য হইতে পারে না। এই হেতু লল্লাদি জ্যোতিষী স্বেচ্ছামত ঘটী
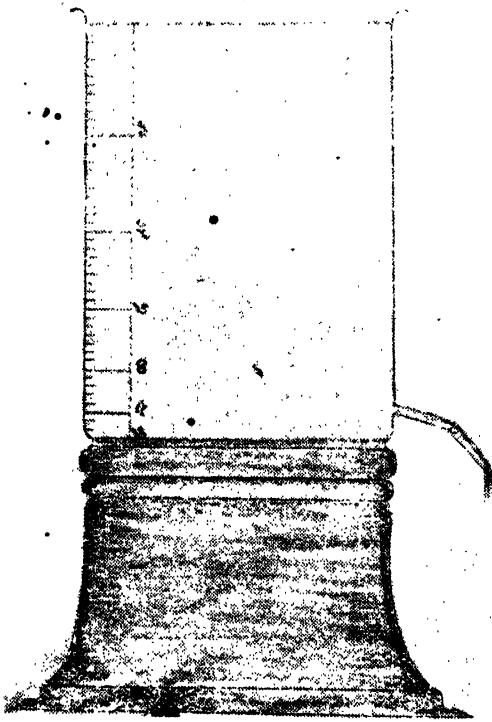
১ম চিত্র। নাড়িকাযন্ত্র।

নির্মাণের উপদেশ করিয়াছেন। এক অহোরাত্রে ঘটী কতবার ডুবিল তাহা জানিয়া ত্রৈরাশিক দ্বারা সেই ঘটী কাল পাওয়া যায়। ব্রহ্ম গুপ্ত (খ্রীঃ ৭ম শতাব্দী) অন্য প্রকার ঘটী যন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইষ্টপ্রমাণ নলকের (সমপরিবর্তুল পাত্রের) মূলে ছিদ্র করিয়া জল পূর্ণ করিবে। এক এক ঘটী কালে জলস্রাব হেতু জলের উচ্চতা যত যত কমিয়া যাইবে, নলকের গাএ সেখানে সেখানে অংক দিলে অনায়াসে কাল জ্ঞান হইতে পারিবে। ১ম চিত্র দেখুন। ঘটী যন্ত্রের প্রত্যেক নিমজ্জন না দেখিলে সময় জানা যায় না, নাড়িকা যন্ত্রে সে অসুবিধা নাই। বোধ হয় এই নাড়িকা যন্ত্র নাম হইতে দণ্ড বা ঘটীর নামান্তর নাড়ী বা নাড়িকা হইয়াছে।

শুধু এদেশে নয়, প্রাচীন মিশরে ও বেবিলোনিয়াতে এবং তথা হইতে গ্রীসে এবং য়ুরোপের অন্যান্য দেশে জলস্রাব দেখিয়া সময় জ্ঞান হইত। শুধু প্রাচীন কালই বা কেন, খ্রীষ্টের ১৬শ শতাব্দীতে দেনমার্ক দেশীয় প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ তায়কো-ব্রাহি তাঁহার বেধ-শালায় জল-ঘড়ী দ্বারা কাল পরিমাণ করিতেন। চীনেরা এখনও করে, এবং আমাদের দেশ হইতে তাঁবী এখনও তিরোহিত হয় নাই।

কিন্তু আমাদের তাম্রী ও য়ুরোপের জল-ঘড়ীর মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। এদেশে তাম্রীতে জল প্রবেশ দেখিয়া, য়ুরোপে পাত্র হইতে জল নিঃসরণ দেখিয়া কালজ্ঞান হইত। পাত্র হইতে ছিদ্র পথে জল নিঃসৃত হইতে থাকলে সমকালে সম পরিমিত জল বহির্গত হয় না। কারণ পাত্রে জলের উচ্চতা যত কমিতে থাকে, জল-স্রাব-বেগ তত কমে। এই হেতু জলপাত্র সর্ব্বদা জলপূর্ণ রাখিতে হইত। ২য় চিত্র দেখুন।

আরও প্রভেদ আছে। গ্রীকদিগের গণনায় দিবা অর্থে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্তকাল, এবং এই কালের দ্বাদশ ভাগের এক ভাগের নাম ঘণ্টা ছিল। সুতরাং গ্রীষ্মকালে তাহাদিগের ঘণ্টা দীর্ঘ এবং শীতকালে হ্রস্ব হইত। এরূপ অসমান ঘণ্টা জ্ঞাপক জল-ঘড়ী নির্মাণ করা সহজ ছিল না। আমাদের সে অসুবিধা ছিল না; জ্যোতিষে অপরিবর্তনীয় নাক্ষত্র অহোরাত্র, লৌকিক ব্যবহারে সাবন অহোরাত্র সমান ভাগ করিলেই চলিত। সুতরাং ঋতুভেদে ছোট-বড় ঘটী আবশ্যক হইত না।

পূর্বকালে নাড়িকা যন্ত্রের জল-স্রাব দ্বারা বহুবিধ যন্ত্র চালিত হইত। লল্ল (খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী,) ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর প্রভৃতি প্রাচীন খ্যাতনামা জ্যোতিষীগণ এই প্রকার যন্ত্র ন্যূনাধিক বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, সেদিনকার মহামহোপাধ্যায় ৺ চন্দ্রশেখর সিংহ সামন্ত মহাশয়ও এইরূপ
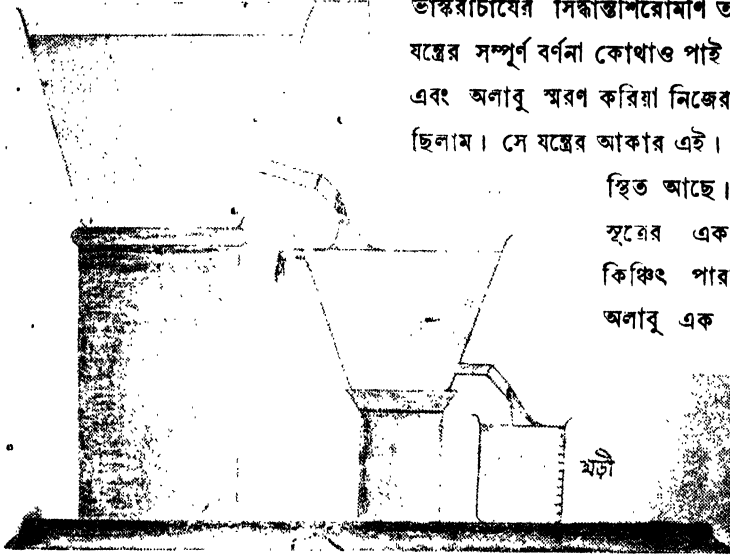
২য় চিত্র। জলঘড়ী।

যন্ত্র রচনা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন। যে যন্ত্র আপনি ভ্রমণ করিতে থাকে, যাহা কোন মানুষ চালায় না, সে যন্ত্রকে প্রাচীনেরা স্বয়ংবহ বলিতেন। একদিন সামন্ত মহাশয়কে স্বয়ংবহ নির্মাণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি লল্ল
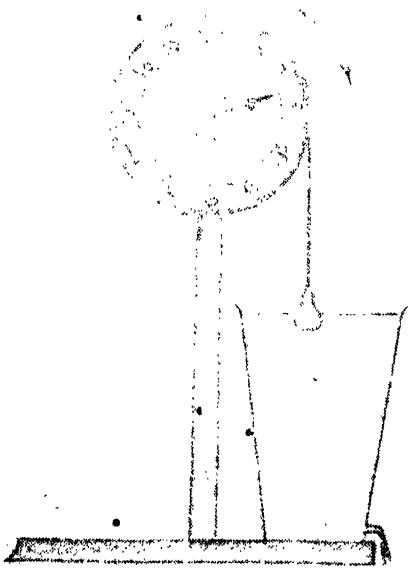
৩য় চিত্র। স্বয়ংবহ ঘটীচক্র।

ও ব্রহ্ম গুপ্ত কথনও দেখেন নাই; সূর্য সিদ্ধান্ত ও

ভাস্করাচার্যের সিদ্ধান্তশিরোমণি তাঁহার সম্বল ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, এই যন্ত্রের সম্পূর্ণ বর্ণনা কোথাও পাই নাই, প্রাচীন সিদ্ধান্ত-লিখিত সূত্র-জল-পারদ এবং অলাবু স্মরণ করিয়া নিজের অনুভব দ্বারা এক স্বয়ংবহ নির্মাণ করিয়াছিলাম। সে যন্ত্রের আকার এই। ৩য় চিত্র দেখুন। একটি চক্র দুই আধারে স্থিত আছে। চক্রের নেমিতে এক সূত্র বেষ্টিত আছে। সূত্রের এক অগ্র চক্রে বদ্ধ; অন্য অগ্র হইতে কিঞ্চিৎ পারদযুক্ত এক অলাবু লম্বিত আছে। এই অলাবু এক বৃহৎ জলকুণ্ডের জলে ভাসিতেছে। কুণ্ড হইতে জলস্রাব হইলে অলাবু নিম্নগামী হয়, তখন সূত্র বদ্ধ চক্রটি অল্পে অল্পে ঘুরিতে থাকে।

বলা বাহুল্য, তাঁহার উদ্ভাবনা শক্তির পরিচয়ে আশ্চর্য হইয়াছিলাম। আর বুঝিয়াছিলাম, আমাদের চিন্তা-প্রণালী অধুনা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। কারণ যদিও অবিকল এইরূপ যন্ত্র ব্রহ্মগুপ্ত বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার একটি আর্যা হইতে বস্তু জ্ঞান হওয়া দুরূহ।*

কোন প্রকারে একটা গতি পাইলে তদ্দ্বারা পুত্তলিকার নৃত্যের তুল্য অন্য বস্তুর গতি সম্পাদন করিতে পারা যায়। আমাদের পূর্ব্বাচার্যগণ নাড়িকা যন্ত্র সাহায্যে গ্রহ নক্ষত্র চক্রও ঘুরাইতেন। আজিকালি বিদ্যালয়ে বিলাতী 'ওরেরী' যন্ত্র যেরূপ, সেকালে গোল যন্ত্র সেরূপ ছিল। জলস্রাব দ্বারা তাহা ঘূর্ণিত হইত। সুতরাং প্রচুর শিল্পনৈপুণ্য আবশ্যক হইত। ইহা দ্বারা লগ্নাদি কালজ্ঞানও হইত।

লল্ল এবং ব্রহ্ম গুপ্ত কাল জ্ঞাপক বহুবিধ যন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। একটি এইরূপ। ৪র্থ চিত্র দেখুন। এক

* এমন দুরূহ যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়ও ব্রহ্মগুপ্তের টীকায় অর্থান্তর ঘটাইয়াছেন। দ্বিবেদী মহাশয় মনে করিয়াছেন, জলস্রাবের আঘাতে চক্রটি ভ্রমণ করিবে। বস্তুতঃ জলস্রাব-হেতু অলাবু নামিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে চক্রটি ভ্রমণ করে। ব্রহ্মগুপ্তের শ্লোকটি এই,—

কীল স্তোপরিগামিনি তৎপর্যন্ত সূত্রকে ধৃতমলাবু।
প্রাগ্‌ বম্নলকে প্রক্ষিপ্য নাড়িকা স্রবতি পানীয়ে॥

লল্ল স্পষ্ট। যথা,

জল কুণ্ডে ২ধশ্ছিদ্রে ঘটিকা কালাঙ্কিতে জলক্রান্ত্যা।
গোলে বেষ্টন সূত্রাগ্রবদ্ধতুম্বং ক্ষিপেৎ সরসম্‌
স্রবতি চ যথাযথান্ত গুধাতথালাবু গচ্ছমানমধঃ
ভ্রময়তি গোলকমতো মুক্তাক্ষা নাড়িকা যাতাঃ॥
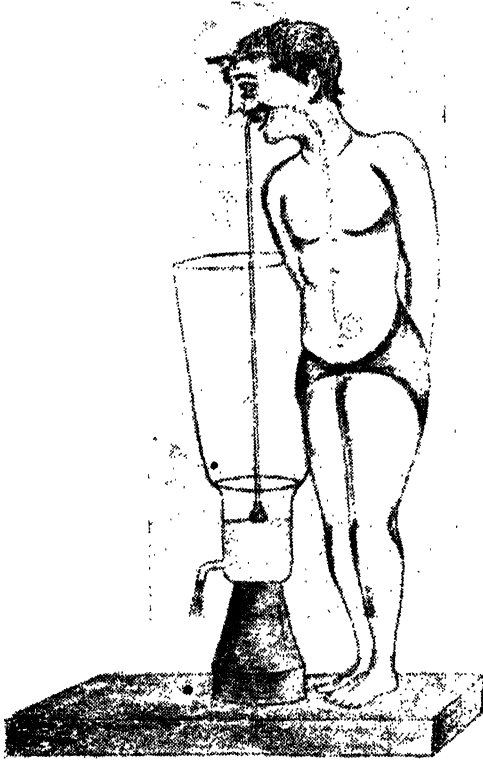
৪র্থ চিত্র। স্বয়ংবহ নরযন্ত্র।

মনুষ্যমূর্ত্তির মধ্যভাগে মুখপর্য্যন্ত এক ছিদ্র আছে। তাহার উদরে অতি দীর্ঘ কিন্তু অত্যল্পপরিসর বস্ত্রখণ্ড আছে। মনুষ্যের মুখ মধ্যে স্থাপিত এক কীলক-নলের (মসৃণ ঋজু দণ্ডের উপরে স্থিত নলের বা আধুনিক কপিকলের চাকার) উপর দিয়া বস্ত্রের এক অগ্র বহির্গত হইয়াছে। এই অগ্রে আবশ্যক পরিমিত পারদযুক্ত এক অলাবু বদ্ধ আছে। অলাবুটি এক কুণ্ডের জলে ভাসিতেছে। কুণ্ড হইতে জল যেমন নির্গত হইবে, মনুষ্যের মুখ হইতে বস্ত্রও তেমন বহির্গত হইবে। বস্ত্রের যত অঙ্গুলী বাহিরে আসিলে এক এক দণ্ড সময় হইত, তত অঙ্গুলা দূরে দূরে বস্ত্রে গুটিকা বদ্ধ থাকিত। দুই দণ্ড গত হইলে দুইটি গুটিকা, তিন দণ্ড গত হইলে তিনটি গুটিকা, এই ক্রমে গুটিকা বহির্গত হইত। কত দণ্ড সময় গত, তাহা গুটিকার সংখ্যা দেখিয়া সাধারণ লোকে বুঝিতে পারিত।

এইরূপ কোন যন্ত্রে এক নরমূর্ত্তি নিকটস্থ অন্য নরমূর্ত্তির মুখে জল নিক্ষেপ করিত, কোন যন্ত্রে বর মুখ দিয়া বধুর মুখে গুটিকা প্রক্ষেপ করিত, কোন যন্ত্রে দুই মল্ল যুদ্ধ করিত, কোন যন্ত্রে ময়ুর সর্প গিলিত, কোন যন্ত্রে কাঠি নিক্ষিপ্ত হইয়া পটহে কিংবা ঘণ্টায় শব্দ করিত, ইত্যাদি। এই সকল কৌতুকজনক যন্ত্রের উদ্দেশ্য কালজ্ঞাপন। আজি কালি যেমন বিলাতী ঘড়ীতে নরনারীর মূর্ত্তির অঙ্গ বিশেষ চালিত করিয়া শিল্পী গ্রাম্য জনকে বিস্মিত করে, সেকালের জল ঘড়ীতে তেমনি করিত। পটহবাদ্য কিংবা ঘণ্টাবাদ্যের সহিত আজিকালির বিলাতী ঘড়ীর ঘণ্টাবাদ্য তুলনা করা যাইতে পারে।

কথিত আছে পূর্ব্বকালে—খ্রীষ্টজন্মের নাকি পূর্ব্বে—আলেকজান্দ্রিয়া নগরে কোন জ্যোতিষী কুণ্ডে জলস্রাব করাইয়া ঘণ্টাঙ্কিত চক্র চালাইতেন। ৫ম চিত্র দেখুন। খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে কন্‌স্টান্টিনোপল নগরে এক 'চমৎকার পিত্তল ১টা হইতে ১২টা বাজাইত।' খ্রীঃ ৯ম শতাব্দীতে সম্রাট শার্লমেনকে পারস্যাধিপতি এক জল-ঘড়ী উপহার দিয়াছিলেন। তাহাতে ১২ঘণ্টা জানাইতে ১২টা দ্বার ছিল। এক এক ঘণ্টায় এক এক দ্বার খুলিত, এবং যত ঘণ্টা সময় তত গুটিকা বহির্গত হইয়া এক পটহের উপরে পড়িত।

মানুষের স্বভাব চিরদিন সর্ব্বত্র একই প্রকার আছে। শিল্পীর মন এক বিষয়ে আবদ্ধ থাকে না। যিনি একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন, তিনি অন্য যন্ত্র নির্ম্মাণে ধাবিত হন। সেকালের আর্য্যগণ পারদ জল তৈল সাহায্যে চক্র ভ্রমণের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এরূপ স্বয়ংবহ যন্ত্রের উল্লেখ লল্লে (খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) প্রথম পাই। তারপর ব্রহ্মগুপ্তে, তারপর ভাস্করাচার্য্যে (খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী) সেই যন্ত্রই ভিন্নাকারে পাই। ভাস্করের বর্ণনা অনুবাদ করিতেছি। 'গ্রন্থি কীলশূন্য লঘু কাষ্ঠময় [লল্ল বলেন শ্রীপর্ণী অর্থাৎ গামার কাঠের] এক চক্র ভ্রম-যন্ত্রে [কুন্দন-যন্ত্রে] সিদ্ধ করিবে। উহার নেমিতে সমপ্রমাণ, সমছিদ্রযুক্ত, সমগুরু অর যোজনা করিবে। এই সকল অর নদীর আবর্ত্তের ন্যায় একই দিকে কিঞ্চিৎ বক্র হইবে। অরের অর্দ্ধাংশ পারদ পূর্ণ করিয়া অরের ছিদ্রমুখ বন্ধ করিবে। এইরূপ চক্র দুই আধারে স্থিত হইলে স্বয়ং ভ্রমণ করিবে। কারণ যন্ত্রের একদিকে পারদ অর-মূলে এবং অন্যদিকে অর-অগ্রে
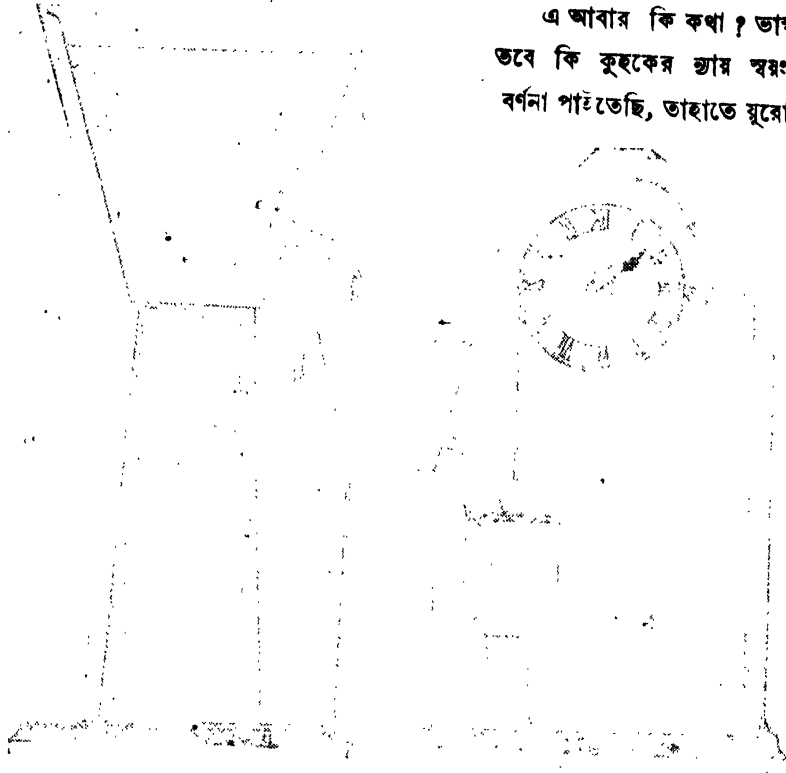
এ আবার কি কথা ? ভাস্করাচার্যও কুহকবিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। তবে কি কুহকের ন্যায় স্বয়ংবহও গুপ্ত রহিয়া গিয়াছে ? কিন্তু যে বর্ণনা পাইতেছি, তাহাতে য়ুরোপের সদাবহ আবর্ত্তচক্র মনে আসিতেছে। এই চক্রের আকার ৭ম চিত্রে প্রদর্শিত হইল। আবর্ত্তাকার অরসমূহের অন্তর্বর্ত্তী গুলিকার ভারে চক্রের ভ্রমণ কল্পিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এইরূপে চক্রভ্রমণ অসাধ্য।

৫ম চিত্র। স্বয়ংবহ জলঘড়ী।

ভাস্কর অন্য দুই প্রকার স্বয়ংবহ বর্ণনা করিয়াছেন। এই দুইটি বহুম গুপ্তে নাই। একটি এইরূপ। ৮ম চিত্র দেখুন। 'ভ্রম-যন্ত্র দ্বারা চক্রের নেমিতে দুই অংগুল গভীর এবং দুই অংগুল বিস্তৃত একটি সুষির বা নালা করিয়া চক্রটি দুই আধারে স্থাপন করিবে। নালীর উপরে তালপাতা মম্ দিয়া জুড়িবে। পরে তালপাতার কোন স্থানে ছিদ্র করিয়া নালী মধ্যে পারদ ঢালিবে যেন নালীর অধোভাগ পূর্ণ হয়। পুনর্ব্বার এক পার্শ্বে বিদ্ধ করিয়া জল প্রবেশ করাইবে যেন অন্য পার্শ্বে জল যায় না। অনন্তর ছিদ্র বন্ধ করিবে। এখন জলদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া চক্র স্বয়ং ভ্রমণ করিতে থাকিবে। পারদ দ্রব পদার্থ বটে, কিন্তু গুরু। এই হেতু উহাকে জল অন্য পার্শ্বে সরাইতে পারিবে না।'

ইহার অর্থ কি এই যে, পারদ অধোভাগেই থাকিবে; জল পারদ ঠেলিতে থাকিবে, এবং তাহাতেই চক্র ঘুরিতে থাকিবে ? যদি এই অর্থই ঠিক হয়, তাহা হইলে এখানে কাল্পনিক সদাবহের সুন্দর দৃষ্টান্ত পাইতেছি।

ইহার সহিত এই খ্রীষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের এক সদাবহ যন্ত্র তুলনা করুন। ৯ম চিত্রে এক কুণ্ডে পারদ, এবং কুণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে এক নলে জল আছে। পারদকুণ্ডের উপরে এক চাকা, এবং ভিতরে আর এক চাকা আছে। ঐ দুই চাকাকে বেষ্টন করিয়া এক সূত্র আছে।

ধাবিত হইবে। শেষোক্ত দিকের পারদের আকর্ষণে চক্র স্বয়ং ভ্রমণ করিবে।'

৬ষ্ঠ চিত্রে ঐরূপ চক্র প্রদর্শিত হইল। কিন্তু ব্যাপারটা কি ? ইহা কি আধুনিক বিজ্ঞানে নিন্দিত সদাবহ যন্ত্র ? কিংবা আরও কিছু ছিল, যাহা গুপ্ত রহিয়া গিয়াছে ? এরূপ যন্ত্রদ্বারা লল্ল ভগোলযন্ত্র ভ্রমণের কথা বলিয়াছেন। স্বয়ংবহ যন্ত্রের রহস্য পাছে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় (বর্ত্তমান) সূর্যসিদ্ধান্ত রহস্য গুপ্ত রাখিতে শিষ্যকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিয়াছেন। শিল্পকৌশল প্রকাশে যিনি এত শঙ্কিত, অবশ্য তিনি কোন কথা বলিতে পারেন না। এজন্য তিনি পারদ জল তৈলাদির প্রয়োগ 'দুর্লভ' বলিয়া সারিয়াছেন। তাঁহার টীকাকার রঙ্গনাথ (খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দী) বলেন, 'স্বয়ংবহ যন্ত্র অসাধারণ, মনুষ্যের অসাধ্য; এই হেতু উহা দুর্লভ; অন্যথা প্রতিগৃহে প্রচুর স্বয়ংবহ থাকিত। সমুদ্রের অন্য প্রান্তবাসী ফিরঙ্গেরা স্বয়ংবহ বিদ্যায় সম্যক্ অভ্যস্ত। ইহা কুহক বিদ্যার অন্তর্গত।'

৬ষ্ঠ চিত্র। স্বয়ংবহ।

৮ম চিত্র। স্বয়ংবহ?
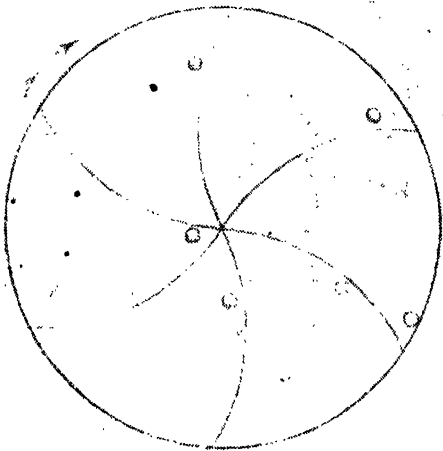
৭ম চিত্র। আবর্ত্তচক্র।

৯ম চিত্র। স্বয়ংবহ।

সূত্রে কতকগুলি লঘু (যেমন সোলার) বর্ত্তুল বদ্ধ আছে। বর্ত্তুলগুলি জলে ভাসিয়া উঠিতে থাকিবে, সঙ্গে সঙ্গে চাকা দুইটিও ঘুরিতে থাকিবে!

ভাস্করাচার্য্যের তৃতীয় স্বয়ংবহ এইরূপ। ১০ম চিত্র দেখুন। 'এক চক্রের নেমিতে ঘটী বদ্ধ আছে। কূপাদি হইতে জলোত্তোলনের ঘটচক্রবৎ এই চক্রকে দুই আধারে ধারণ করিবে। তাম্রাদি ধাতু নির্ম্মিত অঙ্কুশাকার এক নল দিয়া কুণ্ডের জল ঘটীমুখে পড়িবে। তখন চক্রটি
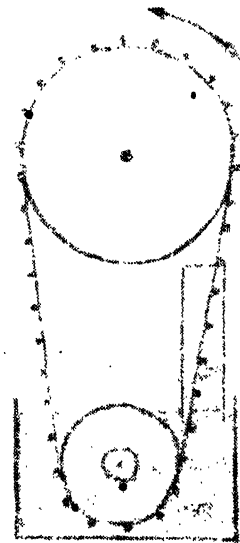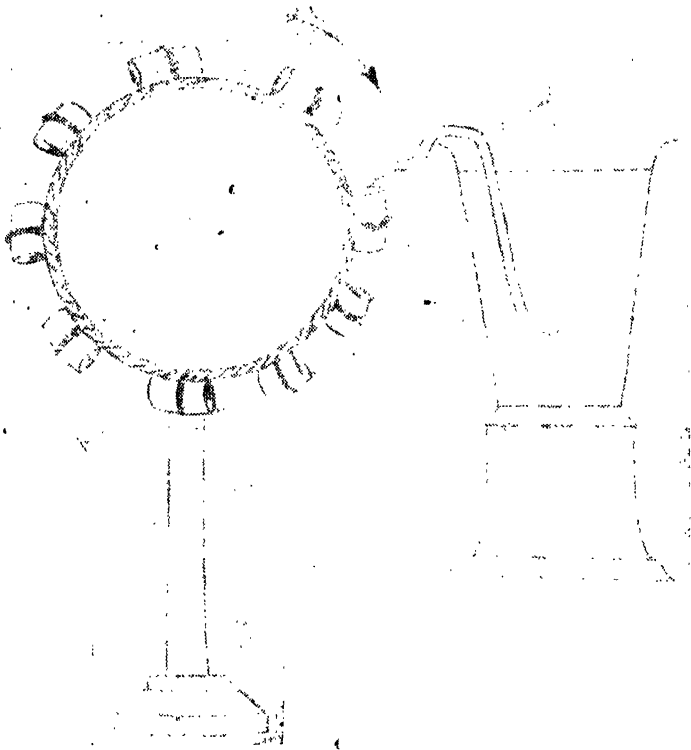
১০ম চিত্র। স্বয়ংবহ।

পূর্ণ ঘটী দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ঘুরিতে থাকিবে। চক্র হইতে চ্যুত জল চক্রের অধঃস্থিত প্রণালী দিয়া যদি কুণ্ডে গমন করে, তাহা হইলে কুণ্ডে পুনর্ব্বার জল প্রক্ষেপ আবশ্যক হইবে না।'

এখানে ভাস্কর প্রথমাংশ ঠিক বলিয়াছেন, বক্রাকার অঙ্কুশ যন্ত্র বা "কুক্কুটনাড়ী" যন্ত্রের (ইংরেজী সাইফন) প্রয়োগ দেখাইয়াছেন। ছিন্ন-কমল কমলিনী-নল লইয়া কুক্কুট নাড়ীর দৃষ্টান্তও দিয়াছেন। এবং বলিয়াছেন এই কুক্কুট নাড়ী শিল্পীদিগের এবং হরমেখলীদিগের নিকট প্রসিদ্ধ আছে। হরমেখলী কাহারা, তাহা এখন অজ্ঞাত। যাহা হউক, "চক্রচ্যুতং তদুদকং কুণ্ডে যাতি প্রণালিকয়া" বলিয়া নীচের জল উপরে উঠিবার সম্ভাবনা করিয়াছেন। আজিকালিও যে ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত য়ুরোপে পাওয়া যায় না, এমন নহে। এক কল্পনায়, এক জলচক্র আর্কিমীডের ইস্কুরূপ যন্ত্র চালিত করিতেছে। ঊর্দ্ধগত জল জলচক্রে পড়িয়া জলচক্রকে ঘূর্ণিত করিতেছে। ১১শ চিত্র দেখুন।

ভাস্করাচার্য স্বয়ংবহ যন্ত্রকে ক্রীড়নকতুল্য মনে করিতেন। এই হেতু লল্লের ও ব্রহ্মগুপ্তের স্বয়ংবহকে গ্রাম্য বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। কারণ তাহা সাপেক্ষ, অর্থাৎ জল ফুরাইয়া গেলে জল প্রক্ষেপের প্রয়োজন হয়। যে যন্ত্রে চতুরচমৎকারকরী যুক্তি থাকে, তাহা ভাস্করের মতে গ্রাম্য নহে।* বাস্তবিক তিনি প্রখরধীসম্পন্ন ছিলেন; বোধ হয় এই হেতু স্বয়ংবহ স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিবার তাঁহার ধৈর্য্য ছিল না।

দেখা গেল, প্রাচীনেরা স্বয়ংবহ অর্থে এমন যন্ত্র বুঝিতেন যাহা চালিত করিতে মানুষ আবশ্যক হয় না, এবং যাহা একবার চালিত হইলে সতত চলিতে থাকে। অর্থাৎ স্বয়ংবহ হইতে সদাবহে গিয়া পড়িয়াছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞান ঘোষণা করিতেছে, সদা গতি অসম্ভব। বলিতেছে, জড় সৃষ্টি করিতে পারা যায়
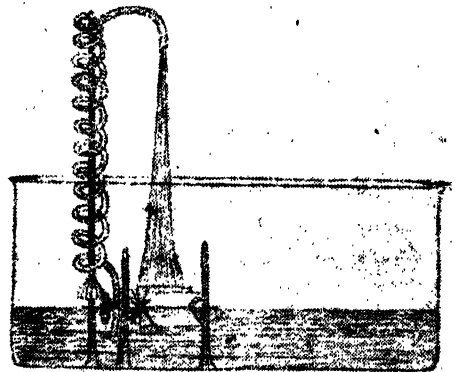
১১শ চিত্র। স্বয়ংবহ।

না, তেমনি শক্তিও পারা যায় না। যে যন্ত্রে শক্তি যত

* যথা,
যদধোরক্ত নলং তৎ সাপেক্ষত্বাৎ স্বয়ংবহং গ্রাম্যম্।
চতুরচমৎকারকরী যুক্তির্যন্ত্রং নহি গ্রাম্যম্॥
এবং বহুধা যন্ত্রং স্বয়ংবহং কুহকবিদ্যয়া ভবতি।
নেদং গোলাশ্রিতয়া পূর্ব্বোক্তত্বাময়াপ্যুক্তম্॥

থাকে, তাহা ততই থাকে, তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। পূর্ব্বকালে লোকে মনে করিত, (শুধু এদেশে নয় য়ুরোপেও), যে কাঠ লোহা পিতলের চাকা ও দণ্ডের যোগাযোগ ঘটনা দ্বারা প্রকৃতিকে ফাঁকি দিয়া কাজ করাইয়া লইতে পারা যায়। প্রকৃতির রহস্য প্রকৃতি গোপন করিয়া রাখিয়াছে। আমরা নিত্য দেখিতেছি, নদী বহিতেছে, বাতাস খেলিতেছে, গাছের ফল পড়িতেছে, আকাশে মেঘ বেড়াইতেছে। কই, কাজের ত বিরাম নাই! আকর্ষণ বিকর্ষণ, সংকোচন প্রসারণ, সংসক্তি ও আসক্তি এবং সমুদয় আণবিক ক্রিয়া গুপ্তবলের বাহ্যবিকাশ। কোন কোন ক্রিয়া নিরন্তর চলিতেছে। চলুক, আধুনিক বিজ্ঞান—আধুনিক বলিতেছি, কারণ শক্তি যে সৃষ্ট হইতে পারে না, এ তত্ত্ব অধিক দিন জানা যায় নাই,—আধুনিক বিজ্ঞান, স্পষ্টভাষায় বলিতেছে, যে শক্তিই কাজ করুক এবং যতক্ষণই করুক, বিরামই তাহার পরিণাম। এমন যে সুকৌশল সম্পন্ন আমাদের দেহ, যাহা নিজের জীর্ণ সংস্কার নিজেই করে, ইহারও কর্ম্মের বিরাম ঘটে। অথচ মানব-রচিত যন্ত্রের বিরাম ঘটিবে না—এরূপ সন্দেহ উদয় হয় নাই। আধুনিক বিজ্ঞানের দেশে, য়ুরোপ ও আমেরিকায় সদাবহ যন্ত্র আবিষ্কার-প্রলোভনে অদ্যাপি বহু ব্যক্তি প্রতারিত হইতেছে।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের মানদণ্ডে য়ুরোপের প্রাচীন জ্ঞান পরিমাণ করা ন্যায়সংগত নহে, আমাদের দেশের পুরাতন জ্ঞান পরিমাণ করাও নহে। আশ্চর্য্যের কথা কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত সূর্য সিদ্ধান্তে স্বয়ংবহ নাম পাইয়াই উৎফুল্ল চিত্তে প্রাচীন আর্যগণের জ্ঞান গরিমার প্রতি উপহাস বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বে দেখা গিয়াছে, সকল স্বয়ংবহ এক তত্ত্বে নির্মিত হয় নাই, পরন্তু জলচক্র নির্মাণ দ্বারা গতি সম্পাদন হেতু প্রাচীনদিগকে প্রশংসা করিতে হয়। বিলাতী ক্লক-ঘড়ীকে স্বয়ংবহ মনে করা যেরূপ, আমাদের সিদ্ধান্তের ভ্রমণশীল যন্ত্রকেও স্বয়ংবহ মনে করা সেরূপ। গুরু দ্রব্যের নিম্ন গতি দ্বারা চক্র ভ্রমণ করানই যাবতীয় স্বয়ংবহ যন্ত্রের মূলতত্ত্ব। খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীতে হাইগেন্‌স নামক পণ্ডিত দোলক প্রয়োগ করিয়া ক্লক ঘড়ীকে প্রকৃত কালমান যন্ত্র করিয়াছেন। আমাদের আর্যগণ দোলকশূন্য ক্লক-ঘড়ীর আবিষ্কর্তা বলিলে দোষ হয় না। কে জানে, এদেশ হইতে বিদেশে ক্লক-ঘড়ীর মূল-সূত্র যায় নাই?*

ক্ষোভের বিষয় এই যে, দেড় হাজার বৎসর পূর্বে যে জ্ঞান যে প্রয়োগকুশলতা এদেশে প্রচুর ছিল, ক্রমশঃ তাহার বিকাশ হয় নাই। পরন্তু বর্ত্তমানকালে তাহার লোপ ঘটিয়াছে। জলপ্রবাহে শক্তি যে লুক্কায়িত আছে, তাহা প্রাচীনেরা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আলোচনা করিয়াও প্রয়োগকুশল শিল্পী হইতে পারি নাই। আমাদের সুজলা নদীবহুলা বংগভূমির ধান্য জলাভাবে শুকাইয়া যায়, আমরা হা-অন্ন-স্বরে ক্রন্দন করি। আমরা মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছি, বায়ু বহে। কিন্তু যে শক্তি বহমান পবনে সঞ্চিত থাকে, তাহা দ্বারা কার্য সিদ্ধির পন্থা দেখি না। সূর্য আমাদের ন্যায় অ-পাত্রের দেশে এত তাপ বিতরণ না করিলে ভাল করিতেন, আমরা মুক্ত হস্তের দান ভোগ করিতে জানি না। রামায়ণের কবি ইন্দ্র বরুণ পবন তপনকে রাবণের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; আমরা দেখিয়াও দেখি না, কবিকল্পনা সফল হইয়াছে।

বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মাতৃভাষা কি?

[রাজসাহীর "বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনে" "বঙ্গীয় মুসলমানদের মাতৃভাষা কি?" নামক যে প্রবন্ধটী পাঠ করিয়াছিলাম তাহা প্রবাসীতে প্রকাশ করার জন্য পাঠাইলাম। ইতিপূর্ব্বে অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশার্থে পাঠান হয় নাই। যদি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশ হয়, তাহা আমার অনুমোদিত নহে।—আঃ মঃ খাঁ।]

কয়েক বৎসর যাবৎ, বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মাতৃভাষা কি,—এই প্রশ্ন লইয়া নানারূপ আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। এই প্রশ্ন উপযুক্তরূপে মীমাংসিত হওয়ার উপর বঙ্গীয় মুসলমানদিগের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ অল্পাধিক

* "He [Waltherus] is also the first astronomer who used clocks moved by weights for the purpose of measuring time. These pieces of mechanism were introduced originally from Eastern countries"—Grant's *History of Physical Astronomy*. Page 442.

পরিমাণে নির্ভর করে বলিয়াই এই সভায় বর্ত্তমান প্রবন্ধটী পেশ করা গেল।

এই প্রশ্ন মীমাংসা করিবার পূর্ব্বেই একটী অতি গুরুতর কথা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। "হইত" এবং "আছে" এই দু'টী কথায় অনেক প্রভেদ। "যদি আমি নবাব হইতাম তবে কি ভাল হইত" একথা আলোচনা করিয়া সময় নষ্ট করা নিতান্ত মূর্খতা মাত্র। "আমি কি আছি" ইহাই আমাদিগকে দেখিতে হইবে। বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মাতৃভাষা কি হইলে ভাল হইত কিম্বা কি হওয়া উচিত এ বিষয় আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; তাহাদের মাতৃভাষা কি, আমরা কেবল তাহাই দেখিব।

এই খানেই হয়ত অনেক প্রবীণ ও অভিজ্ঞ লোকের সহিত এ নবীন লেখকের মতভেদ হইবে। "যাহা করা উচিত তাহা করিতেই হইবে" এ উপদেশ অতি মূল্যবান হইলেও বর্ত্তমান স্থলে তাহার প্রয়োগ হইতে পারে না। ভাষার স্বভাব হইতে উৎপত্তি এবং স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী ইহার গঠন ও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; ইহা একপ্রকার মনুষ্যক্ষমতার বহির্ভূত।*

অনেকেই বলিয়া থাকেন বঙ্গীয় মুসলমানদিগের পক্ষে উর্দ্দু মাতৃভাষা হইলে ভাল হইত; তাহা হইলে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদিগের সহিত তাহাদের একতাবন্ধন অধিকতর দৃঢ় হইত। আমি বলি আরবী হইলে আরও ভাল হইত; কারণ তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদিগের সহিত তাহাদের একতাসূত্রে গ্রথিত হইবার সুবিধা হইত।

অনেকে আবার উর্দ্দুকেই বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মাতৃভাষা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদের অজুহাত এই যে বঙ্গীয় মুসলমানগণ যে ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহাতে অনেক আরবী ও পারসী শব্দ দেখা যায় সুতরাং উহাকে বাঙ্গলা বলা যায় না। বরং উর্দ্দু ভাষার সঙ্গে উহার একটা সম্বন্ধ স্থাপন করা যাইতে পারে। তাঁহাদের এই অজুহাত মানিয়া লইলে ইংরাজী ভাষাকেও আমরা ইংরাজী বলিতে পারি না, কারণ তাহাতে অনেক লাটিন ও গ্রীক শব্দ আছে; এবং স্পেনশ ভাষাকেও আরবী ভাষার একটি শাখা বলিতে হইবে, কারণ উহাতে অনেক আরবী শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক কেবল শব্দের ঐক্য দেখাইয়া এক ভাষাকে অপর ভাষার সঙ্গে সংযোগ করা যায় না, উভয় ভাষার ব্যাকরণের মিল দেখাইতে হইবে এবং যে পর্য্যন্ত বঙ্গীয় মুসলমানদের ব্যবহৃত ভাষার ব্যাকরণের ও উর্দ্দু ভাষার ব্যাকরণের সাদৃশ্য না দেখান যাইতে পারে সে পর্য্যন্ত উর্দ্দু ভাষাকে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মাতৃভাষা বলা যাইতে পারে না।*

কেহ কেহ আবার ঝগড়া ফসাদে না যাইয়া একটা মাঝামাঝি রকমের বন্দোবস্ত করিতে চাহেন। তাঁহারা বর্ত্তমান বাঙ্গলা ভাষাকে মুসলমানদের মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী নহেন; মুসলমানী বাঙ্গলা বলিয়া তাঁহারা একটি আলাহিদা বাঙ্গলা ভাষা তৈয়ার করিতে ইচ্ছুক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ভাষা কাহারও ইচ্ছাপূর্ব্বক তৈয়ার করিতে হয় না; উহা মনুষ্যের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে গঠিত হইয়া থাকে।† যদি বঙ্গীয় মুসলমানগণ বাঙ্গলা ভাষার উপর তাঁহাদের যে অধিকার পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে তাহা চিনিয়া উঠিতে পারেন তাহা হইলে এই বর্ত্তমান বাঙ্গলা ভাষাকেই তাঁহাদের মুসলমানী বাঙ্গলা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

দুঃখের বিষয় মুসলমানদের একটী জাতিগত দোষ হইয়া পড়িয়াছে এই যে তাঁহাদের যাহা আছে তাঁহারা তাহা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক নহেন অথচ যাহা গ্রহণ করিবার তাঁহাদের কোন দাবী দাওয়া নাই তাহা লইবার জন্য তাঁহারা ব্যগ্র।

* "Language is a natural organism possessed of a separate existence and as little subject to the will of the individual as the power of changing its song to the will of the nightingale."—Schleicher.

* "Unless the grammar agrees, no amount of similarity between the roots of two languages could warrant us in comparing them together."—Sayce.

† "Language, in fact, is a social creation; we may term it if we like, a human invention, but we must remember that it is no deliberate invention of an individual genius, but the unconscious invention of a whole community."—Sayce.

"A society never met together to *make* a language"—*The Same.*

বাঙ্গলা ভাষা নিজে বলিতেছে যে "আমি তোমাদের" তবুও বঙ্গীয় মুসলমানগণ বলিবেন যে এ বাঙ্গলা ভাষা আমাদের নহে। যে ভাষার মাল, মাত্তা, দৌলত, আসবাব মুসলমানের প্রদত্ত সে ভাষা মুসলমানের নহে, তবে কাহার ? যে ভাষার কাগজ, কলম, দোয়াত পর্য্যন্ত মুসলমানের দেওয়া সে ভাষা মুসলমানের নহে তবে কাহার ? যে ভাষার আইন, আদালত, মুন্সেফ, সেরেস্তাদার, নকলনবীশ, আমিন, উকীল, মোক্তার সমস্তই মুসলমানের দাবী সমর্থন করিতেছে সে ভাষা মুসলমানের নহে তবে কাহার ? যে ভাষার রঙ্গবেরঙ্গের লোক হরেক রকমের কাজ কারবারে বাঙ্গলা ভাষা একদিন অজ্ঞাতভাবে মুসলমানের হাতে তৈয়ারী হইয়াছিল বলিয়া গাওয়া দিতেছে সে ভাষা মুসলমানের নহে তবে কাহার ? এত সাক্ষী সাবুদ সত্ত্বেও অনেক নাছোড়বান্দা বাঙ্গালী মুসলমান মাথা নাড়িয়া বলিবেন যে এ বাঙ্গলা ভাষা আমাদের নহে !!!

যদি বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গলা ভাষাকে পায় না ঠেলিয়া নিয়মিতরূপে তাহার চর্চ্চা করিত তবে আমার বিশ্বাস আরও অনেক মুসলমানী শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় জায়গা পাইত। বর্ত্তমান সময় যে দুই একজন মুসলমান বাঙ্গলা ভাষা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহারা আবার বাঙ্গলা ভাষায় অভিজ্ঞতা দেখানের জন্য এতদূর ব্যস্ত যে অতি দুরূহ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিবেন অথচ যে দুই একটী মুসলমানী শব্দ পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গলা ভাষায় ঢুকিয়া পড়িয়াছে তাহার কাছ দিয়াও ঘেষিবেন না। সুতরাং মুসলমান সাম্রাজ্যের পতনের পর হইতে এ পর্য্যন্ত কোন নূতন মুসলমানী শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় দাখিল হইয়াছে কিনা সন্দেহ। বাঙ্গলা ভাষায় মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করিতে হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানদেরই যেন সরম কিছু জেয়াদা বলিয়া বোধ হয়।

এইরূপ নিজের জিনিস নিজে গ্রহণ না করাতে আমাদি দোষে বাঙ্গলা ভাষার উপর মুসলমানদের স্বত্ব রহিত হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে। হয়ত এক শতাব্দীর পর এ সমস্ত শব্দ যে মুসলমানী তাহার কোন প্রমাণ থাকিবে না। আমার মনে পড়ে এক সময় আমার একজন হিন্দু বন্ধু 'আসালতন' এই শব্দের উৎপত্তি ব্যাখ্যা কোন মুসলমানের নিকট হইতে এইরূপ শুনিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন, যথা :—

' "আসালতন"—আশালতা হইতে, যেহেতু আশাকে লোকে চিরকালই পোষণ করিয়া থাকে কখনই ছাড়িতে পারে না সেই হেতু 'আসালতন' অর্থ চিরকালের জন্য।

এই উৎপত্তি ব্যাখ্যা হিন্দু বন্ধুর স্বকপোল কল্পিত কি তাঁহার মুসলমান শিক্ষক হইতে গৃহীত বলিতে পারি না তবে মুসলমানগণ এরূপ খামখেয়ালির ঘোরে পড়িয়া থাকিলে কালে যে প্রায় সকল মুসলমানী শব্দেরই এই ধরণের উৎপত্তি ব্যাখ্যা শুনিতে হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বস্তুতঃ ধরিতে গেলে বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি মুসলমানদের হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্গে হিন্দু রাজত্বের সময় বিদ্বান ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ সংস্কৃত ভাষারই চর্চ্চা করিতেন, বাঙ্গলা ভাষার বড় ধার ধারিতেন না। মুসলমানদের আমলে সংস্কৃতের চর্চ্চা অনেক কমিয়া যায় এবং বাঙ্গলা ভাষা অল্পাধিক পরিমাণে বাদসাহী সুনজরে পতিত হয়।* সেই সময় হইতেই বাঙ্গলা ভাষায় নানা মুসলমানী শব্দ ঢুকিয়া উহার কলেবর বৃদ্ধি করিতে থাকে।

ইংলণ্ড নরমানদিগের দ্বারা অধিকৃত হইলে ইংলণ্ডের ভাষার যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল মুসলমানগণ বঙ্গ অধিকার করিলে পর বঙ্গীয় ভাষারও কতকটা সেইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। পুরাতন "এংগ্লো সেক্সন" নরম্যানদের হাতে পড়িয়া যেরূপ বর্ত্তমান ইংরাজী ভাষায় পরিণত হইয়াছে সেইরূপ পুরাতন "সাধুভাষা" মুসলমানদের হাতে পড়িয়া বর্ত্তমান বাঙ্গলা ভাষা হইয়া পড়িয়াছে। নরম্যান অধিকারের পর যেরূপ ইংলণ্ডের ভাষায় bilingualism অথবা দ্বিভাষত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল বঙ্গীয় ভাষায়ও যে মুসলমান অধিকারের পর সেইরূপ ঘটিয়াছিল তাহার প্রমাণ আজকালও পাওয়া যায় ; যথা :—

কাগজপত্র	খালখন্দক	সীমাসরহদ্দ
ধনদৌলত	কাণ্ডকারখানা	হাটবাজার
চাষ আবাদ	খরিদ বিক্রী	ঝড় তুফান

ইত্যাদি।

* হুসেনশাহ ও পরাগল খাঁ ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কিন্তু নরম্যানদের ইংলণ্ড বিজয়ে ও মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ে অনেক ফরাক। নরম্যান ও সেক্সন জাতিতে ও ধর্ম্মে একই ছিল; তাহাদের কেবল ভাষা বিভিন্ন ছিল। হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্ম জাতি ও ভাষা সকলই বিভিন্ন ছিল। সুতরাং কয়েক শতাব্দীর পর ইংলণ্ডে নরম্যান ও সেক্সনের মধ্যে কোন প্রভেদই রহিল না, কিন্তু বহু শতাব্দীর পর বঙ্গে এখনও হিন্দু মুসলমানের সেরূপ অবস্থা ঘটে নাই। অন্ততঃ ধর্ম্মে এখনও তাহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বঙ্গে হিন্দু মুসলমানের অবস্থারও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং সেই অনুসারে বাঙ্গলা ভাষারও যে কিছু তারতম্য না হইয়াছে এরূপ নহে। "সহরের চকমিলান দালান ইমারৎ" ছাড়িয়া এখন মুসলমানগণ "দেহাতের গয়রাবাদী জমী" সমূহ দখল করিয়াছে। "জবরদস্ত জমীদারের আসা সোটা" এখন "গরিব রাইয়তের আসানড়ি" হইয়া পড়িয়াছে। "কাজীসাহেব" এখন আর "মিয়াদ" দেন না তিনি "কাবিন" "রেজষ্টরী" করিয়াই খালাস। তাঁহার সেই অর্দ্ধগজ লম্বা "তাজ" এখন ক্ষুদ্র "টুপী"র আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বে "সহরে" থাকিতে আরবী ভাষা হইতে গৃহীত "চক" বাজার বুঝাইত এখন "দেহাতে" আসিয়া তাহার অর্থ হইল ক্ষেত। এখন মুসলমানেরা আর "টাকা" লইয়া "খাজানা তহসীল" করে না বরং "রুপিয়া" দিয়া "দেয় কর শোধ" করিয়া থাকে। মুসলমানগণকে উচ্চ "মসনদে" বসিয়া এখন আর "বাদসাহী খেয়ালে" ঝিমাইতে হয় না "জিরাতির মসুম বেমসুম" ঠাওরাইতেই এখন "হয়রান পেরেসান লবেজান।"

মোটের উপর দেখিতে গেলে তিন শ্রেণীর মুসলমান তিন ভাষা লইয়া বাঙ্গলা দেশে আসিয়াছিলেন; রাজা আসিয়াছিলেন পারস্য ভাষা লইয়া, সৈন্যগণ আসিয়াছিলেন তুর্কী ভাষা লইয়া এবং ধর্ম্ম প্রচারকগণ আসিয়াছিলেন আরবী ভাষা লইয়া। সুতরাং এই তিন ভাষারই প্রচুর মুসলমানী শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়।

মুসলমানগণ যোদ্ধাবেশে প্রথম বাঙ্গলা দেশে প্রবেশ করেন সুতরাং অনেক যুদ্ধ সম্বন্ধীয় মুসলমানি শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়; যথা তীর, কামান, তোপ, রেকাব, জীন, লাগাম, নিসান, নাকাড়া, বন্দুক, বারুদ, ইত্যাদি। কালক্রমে মুসলমানগণ বাঙ্গলা দেশের রাজা হইলেন এবং রাজকীয় কার্য্য সম্বন্ধীয় অনেক মুসলমানী শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় স্থান পাইল; বর্ত্তমান সময় আফিস আদালতের ব্যবহৃত শতকরা নিরানব্বই শব্দই মুসলমানি। "হাকিম" হইতে "পেয়াদা" "উকীল" হইতে "মওয়াক্কেল" "ফরিয়াদি" হইতে "কয়েদী" সমস্তই যে মুসলমানের হাতে গড়া ইহা সকলেই জানেন সুতরাং তাহার উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানগণ ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন সুতরাং বর্ত্তমান সময় ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় প্রচুর মুসলমানী শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। আমদানী, রপ্তানী, মাশুল, তেজারতী, পেশা, জমা খরচ, হাওলাত বরাত ইত্যাদি সমস্তই মুসলমানী। এইরূপ রাজকার্য্য ও বাণিজ্য উপলক্ষে মুসলমানগণ বাঙ্গলা দেশে বসবাস করা হেতু গৃহের অনেক জিনিসপত্রও মুসলমানী হইয়া পড়িল; যথা জিনিস, মাল, আসবাব, কুরসি, মেজ, চামচ, তক্তপোষ, পাপোষ, বালিশ, ফরস, চাদর, হুকা, পরদা, আতরদান, গোলাবপাশ, ইত্যাদি।

এ সব ত গেল দ্রব্যের নাম; ক্রমে অনেক মুসলমানী ভাবব্যঞ্জক শব্দও বাঙ্গলা ভাষায় ঢুকিতে আরম্ভ করিল। এই সমস্ত ভাবব্যঞ্জক শব্দের মধ্যে কতকগুলি যুদ্ধ সম্বন্ধীয়; যথা হাঙ্গামা, ফসাদ, জোর, জুলুম, জবরদস্তি, ফরিয়াদ, ইত্যাদি। কতকগুলি মনুষ্য প্রকৃতি সম্বন্ধীয়; যথা মেজাজ, গোসা, জেদ, তবিয়ত, ইত্যাদি এবং কতকগুলি আমোদ প্রমোদ সম্বন্ধীয় যথা খুসী, তামাসা, মজা, শিকার, ইত্যাদি। এ সমস্ত বিশেষ্য ছাড়া অনেক মুসলমানী বিশেষণও বাঙ্গলা ভাষায় দেখা যায়, যেমন গরিব, বেচারা, বেহায়া, বেমালুম, বজ্জাত, বদ, খারাপ, গোলাবী, দরকারী ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত আরবী ভাষা হইতে গৃহীত 'ওয়ালা' ও পারস্য ভাষা হইতে গৃহীত 'মন্ত,' এই উভয়ের সংযোগে এক প্রকার কর্ত্তৃবাচক শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় গঠিত হইয়া থাকে; যথা শ্রীমন্ত, ভাগ্যমন্ত, আক্কেলমন্ত, দানেশমন্ত, তামাকওয়ালা, টিকাওয়ালা, টিকিওয়ালা, ইত্যাদি। আবার পারস্য ভাষার "খোর" নানা শব্দের সহিত সংযুক্ত হইয়া বাঙ্গলা ভাষার গালির ভাণ্ডার বাড়াইয়া দিয়াছে; যেমন, গাঁজাখোর, নেশাখোর, তামাকখোর, সরাবখোর, হারামখোর, ইত্যাদি।

মোটের উপর বিশেষ্য ও বিশেষণ পর্য্যন্তই বাঙ্গলা ভাষায় মুসলমান প্রভাব পৌছিতে সক্ষম হইয়াছে। কোন মুসলমানী সর্ব্বনাম কি ক্রিয়া বাঙ্গলা ভাষায় দেখা যায় না; যদি দেখা যাইত তবে বাঙ্গলা ভাষা আর বর্ত্তমান বাঙ্গলা ভাষা থাকিত না। উর্দ্দুর সঙ্গে ও বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে এই খানেই বেমিল দেখা যায়।* আরবী ও পারসী বিশেষ্যের সঙ্গে বাঙ্গলা সহযোগী ক্রিয়া "করা" যোগ করিয়া এক প্রকার মুসলমানী ক্রিয়া গঠন করা হয় বটে কিন্তু উহাকে ঠিক খাঁটি মুসলমানী ক্রিয়া বলা যায় না।

উদাহরণ স্থলে উপরে যে সমস্ত মুসলমানী শব্দের তালিকা দেওয়া গিয়াছে তাহাদের প্রায় সমস্তই লিখিত বাঙ্গলা ভাষায় প্রচলিত দেখা যায়। সকলেই স্বীকার করিবেন যে ঐ সমস্ত শব্দ ছাড়া আরও অনেক মুসলমানি শব্দ বঙ্গীয় মুসলমানগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। বটতলার যে সব মুসলমানী পুথী আছে এবং যাহা অর্দ্ধ শিক্ষিত মুসলমানদের অতি আদরের বস্তু, ঐ সকল পুথির মধ্যেও এরূপ অনেক আরবী ও পারসী ভাষার শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা এখনও বাঙ্গলা ভাষায় সর্ব্বত্র গৃহীত হয় নাই। ঐ সকল শব্দের মানি অনেক সময় বাঙ্গালী মুসলমানগণই ভালরূপ বুঝিতে পারেন না, হিন্দুগণত দূরের কথা। যেমন কারবালা যুদ্ধ ক্ষেত্রে মহাত্মা হোসেন (রাঃ আঃ) তনয়া বিবি সখিনার সঙ্গে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মহাবীর কাসিমের বিবাহ সম্পন্ন হওয়া মাত্রই যখন কাসিম যুদ্ধ ক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন তখন কোন পুথিলেখক বিবি সখিনার মুখে লাইতেছেন :—

"আগে যদি জান্‌তাম্ কাসিম তুমি জঙ্গের পেয়ারা, †
"না দিতাম্ বিয়ার এজিন না পরিতাম সেয়ারা॥"

এই দুই পংক্তিতে 'জঙ্গ,' 'পেয়ারা,'* 'এজিন' ও 'সেয়ারা' এই চারিটীই মুসলমানী শব্দ। "জঙ্গ" এবং 'পেয়ার,' হিন্দু মুসলমান সকলেই হয়ত বুঝিবেন; 'এজিন' শব্দটী মুসলমানগণ বুঝিলেও হিন্দুগণ বুঝিবেন না; এবং 'সেয়ারা' শব্দটীর সঠিক অর্থ অনেক মুসলমানও ভালরূপ বুঝিবেন কি না সন্দেহ। এই সব পুথিতে শতকরা প্রায় পঞ্চাশটীই মুসলমানি শব্দ; কিন্তু তাহা হইলেও ইহাদের ভাষাকে উর্দ্দু বলা যাইতে পারেনা। কারণ যে সকল মুসলমানি শব্দ ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায় তাহাদের সকলেই বিশেষ্য কি বিশেষণ, সর্ব্বনাম কি ক্রিয়া নাই বলিলেও চলে; সুতরাং ইহাদের ভাষার ব্যাকরণের সঙ্গে উর্দ্দু ভাষার ব্যাকরণের কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই নাই।† অতএব আরবী ও পারসী শব্দ অধিক পরিমাণে ব্যবহার করেন কেবল এই অজুহাতে বঙ্গীয় মুসলমানগণ উর্দ্দু ভাষাকে তাঁহাদের মাতৃভাষা বলিয়া মনে করিতে পারেন না।

বাঙ্গলা ভাষায় অনেক মুসলমানী শব্দ এরূপ অবিকৃত ভাবে স্থান পাইয়াছে যে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সুদূর আরব দেশের মরুভূমি হইতে উত্থিত তামাসা, খেয়াল, ফউত, ফেরার, ইত্যাদি শব্দ সমূহের বঙ্গীয় প্রতিধ্বনি অতি শুদ্ধ ও সঠিক। আরব দেশের 'আতরের' ও পারস্য দেশের 'গোলাবের' সুগন্ধ বঙ্গীয় 'আতরে' ও গোলাবে প্রায় অটুট রহিয়াছে। আরবী 'বন্দুক' ও তুর্কী 'তোপ' বাঙ্গলায় আসিয়া একেবারে বেকল হইয়া পড়ে নাই। অথচ এমন অনেক মুসলমানী শব্দও দেখিতে পাওয়া যায় যাহা বাঙ্গলা দেশের জল পানিতে একেবারে খাস বাঙ্গালী হইয়া পড়িয়াছে, যেমন :—

---

* বাঙ্গলা, উর্দ্দু, পারসী ও সংস্কৃত সকলই এক মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের সর্ব্বনাম গুলি প্রায়ই এক ধরণের, বিশেষ উর্দ্দু ভাষার সর্ব্বনাম গুলিতে পারস্য ভাষার সর্ব্বনাম গুলির ছায়া অতি স্পষ্ট।

† জঙ্গ—লড়াই যুদ্ধ
পেয়ারা—প্রিয়
এজিন—অনুমতি
সেয়ারা—মাথার অলঙ্কার বিশেষ

* সংস্কৃত ও পারসী উভয়ই আর্য্যভাষা, সুতরাং পারসী ও সংস্কৃত শব্দ সমূহের মধ্যে যথেষ্ট আত্মীয়তা রহিয়াছে। 'পেয়ারা' শব্দটী সংস্কৃত 'প্রিয়' হইতে আসিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন কিন্তু পারসী "পেয়ারা" হইতে উহার উৎপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা কিছু বেশী বলিয়া বোধ হয়।

† উর্দ্দু ও বাঙ্গলা উভয়েই আর্য্যভাষা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কিন্তু মুসলমানদের ব্যবহৃত ভাষার ও উর্দ্দু ভাষার মধ্যে এরূপ কোন সম্বন্ধ নাই যাহাতে উর্দ্দু ভাষাকে তাহাদের literary ভাষা বলা যাইতে পারে।

বে আরাম=ব্যারাম=ব্যাম
বাহির=বাইর=বের
সেপাহী=সিপাহী—সিপাই
কেতাব (?)=খাতা
খানা (?)=খাতা
ইত্যাদি।

আবার অনেক মুসলমানি শব্দ বাঙ্গলা দেশে পদার্পণ করিয়া নূতন মানি হাসিল করিয়াছে। "খালি" এই শব্দ আরবী ভাষায় "শূন্য" (empty) বুঝায়, বাঙ্গলায় আসিয়া তাহার অন্য একটী অর্থ হইয়াছে "কেবল"; যেমন "তুমি খালি বান্দরামী করিতে পার"। "জব্‌ত" এই শব্দ আরবীতে কেবল "ধরা" বুঝায়। বাঙ্গলায় আসিয়া উহার আর একটী অর্থ হইয়াছে "নাকাল করা"; যেমন তাহাকে ভারি "জব্দ" করিয়াছি। "বাহার" এই শব্দ পারস্য ভাষায় "বসন্তকাল" বুঝায়, বাঙ্গলায় আসিয়া উহার অর্থ হইয়াছে "সৌন্দর্য্য"। "বহর" এই শব্দ আরবীতে সমুদ্র বুঝায়, বাঙ্গলায় আসিয়া উহার অর্থ হইয়াছে "বহুসংখ্যক নৌকার সমষ্টি"।

মুসলমানগণ হিন্দুর অস্পৃশ্য হইলেও খাটি মুসলমানী শব্দগুলির আলিঙ্গনাবদ্ধ হইতে সংস্কৃত শব্দসমূহকে বড় নারাজ দেখা যায় না। পারস্য শব্দ "সহর" প্রায়ই সংস্কৃত শব্দ "অঞ্চলের" অঞ্চল ধরিয়া থাকে; এই দুইয়ের সংযোগেই "সহরাঞ্চল" শব্দটীর উৎপত্তি হইয়াছে। সংস্কৃত "অন" মুসলমানী "আদায়ের" গায়ে পড়িয়া উহাকে "অনাদায়" করিয়া ফেলিয়াছে। পারস্য "জোর" সংস্কৃত "স"কে আলিঙ্গন করিয়া "সজোরে" পরিণত হইয়াছে। সংস্কৃত "সু" আরবী "নজর"কে বুকে লইয়া "সুনজর" করিয়াছে। এতৎসত্বেও উহাদের সংস্কৃতত্ব এখনও বহাল, বজায় ও অটুট রহিয়াছে!!!

বঙ্গ ভাষার বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে এই যে যাহাতে বঙ্গ ভাষার একখানা প্রকৃত অভিধান প্রণয়ন করা হয় তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগী হয়েন। যে সকল বাঙ্গলা অভিধান বর্ত্তমান সময় দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে বঙ্গ ভাষায় ব্যবহৃত সমুদয় শব্দগুলি স্থান পাইয়াছে কিনা তদ্বিষয় ঘোর সন্দেহ আছে; সকল শব্দের আবার উৎপত্তি ব্যাখ্যাও সঠিকরূপে দেওয়া হয় নাই। বিদেশী শব্দ মাত্রকেই সার্ব্বজনীন "যাবনক" আখ্যা দিয়াই অনেক অভিধানপ্রণেতা ক্ষান্ত রহিয়াছেন; উহা আরবী কি পারসী, তুর্কী কি ইংরেজী তাহার কোন উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। এই সভার গত অধিবেশনে এ বিষয় কিছু আলোচনা করা হইয়াছিল কিন্তু কার্য্যতঃ কতদূর অগ্রসর হওয়া গিয়াছে সর্ব্বসাধারণ তদ্বিষয় বিশেষ অবগত নহেন।

বঙ্গীয় মুসলমানগণের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা এত নিম্নস্তরে পৌঁছিয়াছে যে তদ্দরুণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বঙ্গভাষাকে যে সব শব্দ দান করিয়াছিলেন তাহাদিগকেও কিছু লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে। মুসলমানী শব্দগুলি যেন বঙ্গভাষায় ঢং সাজাইবার কতকগুলি উপকরণ হইয়া পড়িয়াছে। যখনই একটু বিদ্রূপ কৌতুকের প্রয়োজন তখনই মুসলমানী শব্দ লইয়া টানাটানি পড়িয়া যায়। যখনই হাস্যের ফোয়ারা ছুটাইতে চাহেন তখনই বঙ্গীয় লেখকগণের সুনজর মুসলমানী শব্দের উপর পতিত হয়। নবীন বঙ্গীয় লেখক "কলমের" স্থানে "লেখনী" ধারণ করিবেন, "কাগজ"না লইয়া "তুলট" দিয়া কোনরূপে কাজ চালাইবেন, "দোয়াতের" স্থানে হয়ত "মস্যাধার" নামক একটী দুর্লভ সংস্কৃত জিনিসের আমদানী করিবেন কিন্তু যেই একটু রসের প্রয়োজন অমনই মুসলমানী শব্দ না হইলেই নয়! "কাকার" স্থানে যখনই "চাচার" ব্যবহার হয় তখনই যেন লেখক ও পাঠক উভয়েরই বদনমণ্ডলে হাসির ঈষৎ বক্র রেখা প্রকটিত হয়, অথচ ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতানুসারে 'কাকা' পুরাতন কর্কশ gutteral দ্বারা গঠিত এবং 'চাচা' উক্ত শব্দেরই একটু মার্জ্জিত ও নব্য সভ্য আকার মাত্র!! *

গোঁয়ার ছেলের হাতের জিনিসকে খারাপ বলিলে সে যেমন উহা দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া কাঁদিতে থাকে, বঙ্গীয় মুসলমানগণও তেমনি বঙ্গভাষায় মুসলমানী শব্দ সমূহের এরূপ নিগ্রহ দেখিয়া এ বাঙ্গলা ভাষা তাঁহাদের নহে বলিয়া

* "......gutterals usually an important class of sounds in savage idioms."—Sayce.

মুখ ফিরাইয়া লইতেছেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না যে বঙ্গভাষায় মুসলমানী শব্দের এ নিগ্রহের জন্য হিন্দুগণ অপেক্ষা তাঁহারাই অধিকতর দায়ী। কয়জন বঙ্গীয় হিন্দুলেখকের মুসলমানী বাঙ্গলা শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে যথোচিত ব্যুৎপত্তি আছে? এ বিষয় শিক্ষিত বঙ্গীয় মুসলমানগণের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।* হিন্দুলেখকগণ বাঙ্গলা মুসলমানী শব্দ সমূহের প্রকৃত তথ্য নিরূপণে অসমর্থ হইয়াও অনেক সময় হাতের কাছের, ঘরের কোণে ব্যবহৃত মুসলমানী শব্দ ছাড়িয়া পরিশ্রমোপার্জ্জিত দুরূহ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হন। সুতরাং অন্যায় হঠকারিতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাঙ্গলা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া মনে করিয়া প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমানের তাহার যথোচিত চর্চ্চা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বস্তুতঃ মাতৃভাষার অনিশ্চয়তাই বঙ্গীয় মুসলমানদের শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ হওয়ার অন্যতম কারণ। মাতৃভাষা হৃদয়ে সুদৃঢ়ভাবে আসীন না হইলে অন্য কোন ভাষা তথায় দখল পায় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মাবলী দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এ কথাটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণও স্বীকার করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মানুযায়ী মাতৃভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য হওয়াতে মুসলমান ছাত্রগণ বিষম সমস্যায় পতিত হইয়াছে। বঙ্গীয় মুসলমান ছাত্রগণ ত উর্দ্দুকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিতে সাহসই পায় না, অধিকন্তু বাঙ্গলা ভাষার যথোচিত চর্চ্চা না থাকার দরুণ বাঙ্গলা ভাষায়ও তাহাদের হিন্দুসহপাঠিগণের সমকক্ষ হইতে তাহারা কখনই আশা করিতে পারে না। এদিকেত মাতৃভাষা লইয়া এই গোল, অন্যদিকে পারসীর সহিত আরবী শিক্ষা করার নিয়ম হওয়াতে মুসলমান ছাত্রগণের প্রতি জুলুমের একশেষ হইয়াছে। পারসীর স্থলে আরবী শিক্ষা করা খুবই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাই বলিয়া যে সব ছেলে আরবী ভাষার বিন্দুমাত্রও অবগত নহে তাহারা কি প্রকারে মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণ করায়ত্ত করিবে বাস্তবিকই তাহা ভাবিবার বিষয়। যে সব ছেলে নূতন নিয়মানুযায়ী এণ্ট্রেন্স পাশ করিবে তাহাদের পক্ষে এত কষ্টকর নাও হইতে পারে। সুতরাং ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষায় আরও দুই বৎসর পর ও বি, এ, পরীক্ষায় আরও চারি বৎসর পর নূতন নিয়মানুযায়ী আরবী ও পারসী শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলে হয়ত মুসলমান ছেলেদিগের একটু হাঁফ ছাড়িবার অবকাশ হইত।

এই মাতৃভাষার অনিশ্চয়তার দরুণই আবার মুসলমান ছেলেরা প্রতিযোগিতায় তাহাদের হিন্দুসহপাঠীদের সমকক্ষ হইতে অনেক সময় অক্ষম হইয়া পড়ে। যে স্থানে হিন্দু ছাত্রগণকে তিন ভাষা শিক্ষা করিতে হয় সে স্থানে বেচারা মুসলমান ছাত্রগণকে পঞ্চ ভাষা শিক্ষা না করিলে চলে না। এই Penta Lingua বা পঞ্চ ভাষার গোলে পড়িয়াই যে অনেক মেধাবী মুসলমান ছাত্রকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষা ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতে হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মুসলমান ছাত্রগণকে বাড়ীর কাজ কারবার চালানের জন্য কিছু বাঙ্গলা শিখিতে হয়, ধর্ম্ম-কর্ম্মের জন্য কিছু আরবী না শিখিলেও নয়, সহজে পরীক্ষা পাসকরার জন্যই হউক কি মুসলমানদের গৌরব পরিচায়ক ভাষা বলিয়াই হউক কিছু পারসী শিক্ষা না করিলেও চলেনা, আবার স্কুলের মৌলবী সাহেব বাঙ্গলা ভাষাকে "নফরৎ" করিয়া উর্দ্দুতে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন সুতরাং তাঁহার খাতিরে কিছু উর্দ্দু ভাষার অভিজ্ঞতার দরকার; সকলের উপর রাজভাষা ইংরেজীত আছেই। এই পঞ্চ ভাষার মারামারিতে মুসলমান ছাত্রগণ কোনটাই ভাল করিয়া শিখিবার অবসর পায় না।

যদি বাঙ্গলা ভাষাকে মাতৃভাষা ঠিক করিয়া মুসলমান ছাত্রগণ কেবল বাঙ্গলা, আরবী ও ইংরেজী শিক্ষা করে তাহা হইলে বোধ হয় সবদিক বজায় থাকিতে পাবে। যাঁহারা ভয় করেন যে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিলে মুসলমান ছাত্রগণ অতি দরকারী ধর্ম্ম বিষয়ক শব্দগুলিও শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারিবেনা তাঁহাদিগকে আমি এই বলিতে চাই যদি

---

* শ্রদ্ধেয় বাবু দীনেশচন্দ্র সেনের যদি একজন মুসলমান সাহায্যকারী থাকিতেন তবে হয়ত তিনি বঙ্গভাষায় মুসলমান প্রভাব আরও একটু ভালরূপে বুঝিতে পারিতেন। মাণিকচাঁদের গানে প্রাপ্ত আসা বাড়ি (হাতের লাঠি) কইতর (পায়রা) আউল (সিদ্ধপুরুষ) শব্দগুলি যে মুসলমানী তাহা যে কোন শিক্ষিত মুসলমান তাঁহাকে অনায়াসে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। তাহা হইলে মাণিকচাঁদের সময় নিরূপণে তাঁহাকে এত বিব্রত হইতে হইত না।

বর্ত্তমান সময়ের মত তোতা পাখীর ন্যায় আরবী না পড়াইয়া নিয়মিত মতে অর্থ সহ আরবী পড়ান যায় তাহা হইলে মুসলমান-ছাত্রগণও শুদ্ধ ভাবে ধর্ম্মশব্দগুলি উচ্চারণ করিতে ত পারিবেই অধিকন্তু তাহার মানিও বুঝিবে। যাঁহারা বলেন যে পারসী ভাষার মত সুললিত ও মুসলমানদের গৌরব পরিচায়ক ভাষাকে একেবারে ত্যাগ করা উচিত নহে, তাঁহাদিগকে আমি এই বলিতে চাই যে আরবী ভাষা জানা থাকিলে পারসী ভাষা শিক্ষা নিজে নিজেও করা যায় কিন্তু পারসীভাষাভিজ্ঞ কেহই সহজে আরবী ভাষা শিখিতে পারিবেন না। যাঁহারা বলেন যে উর্দ্দু জানা না থাকিলে ভদ্র সমাজে ও অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় সুবিধা হয় না তাঁহাদিগকে আমি এই বলিতে চাই যে ভারতের সকল প্রদেশেরই শিক্ষিত ও ভদ্র মুসলমানদের সঙ্গে ইংরাজী ভাষাতে আলাপ চলিতে পারে; অপর দিকে আরবী জানা থাকিলে প্রয়োজন মত যে উর্দ্দু ভাষায় দুই চারিটী কথা না বলা যায় এরূপ নহে।

সুতরাং বঙ্গীয় মুসলমান ছাত্রগণকে সর্ব্ব প্রথম কিছু বাঙ্গলা শিখাইয়া বাঙ্গলা ভাষার সাহায্যে আরবী ও ইংরেজী শিক্ষা দিলে সময়ও অল্প লাগিবে এবং আমার বিশ্বাস শিক্ষাও ভাল হইবে। এ কথাগুলি চিন্তাশীল মুসলমানগণ একটু বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কি?

আবদুল মজীদ খাঁ,
[রাজশাহী কলেজের আরবীর অধ্যাপক]।

আনন্দ।

সকল বস্তুরই দুইটা দিক আছে—একটা ভিতর, একটা বাহির। ভিতরের বস্তু বলিলে যাহা খাঁটি, যাহা আসল তাহাই বুঝায়, যেমন ভাষায় আমরা বলিয়া থাকি—অত বাজে কথা রাখিয়া দাও, ভিতরের কথাটা কি বল না,—অর্থাৎ, যাহা আসল, যাহা মূলকথা তাহাই বল।

কি জড় কি চৈতন্যময় সকল পদার্থের মধ্যেই যিনি যতটা এই ভিতরকার বস্তুর সহিত পরিচিত, তিনি ততটা সত্য যথার্থ উপলব্ধি করেন। ভৌতিকজগতে যিনি এই ভিতরকার বস্তুর সহিত সম্যক পরিচিত তাঁহাকে আমরা বৈজ্ঞানিক বলি, অধ্যাত্মজগতে যিনি এই ভিতরকার বস্তুটিকে সম্যক তলাইয়া দেখেন তাঁহাকে আমরা দার্শনিক, তত্ত্ববিৎ বলিয়া থাকি।

কিন্তু ইহা ছাড়া আর একটি জগৎ আছে যাহা উক্ত জগৎ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহাকে প্রেমের জগৎ বলা যাইতে পারে। এইখানে একটি ভিতরকার বস্তু আর একটি ভিতরকার বস্তুকে শুধু জানিয়া, উহার সহিত সম্যক পরিচিত হইয়া ক্ষান্ত নহে—স্বেচ্ছায় এক অন্যের নিকট আপনাকে ধরা দেয়, মধুপাত্রে মক্ষিকার ন্যায় আপনাকে একেবারে আটকাইয়া ফেলে। এইখানে বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকের সহিত প্রেমিকের তফাৎ।

জ্ঞান এবং প্রেম দু'য়েরই ভিতরকার বস্তু লইয়া কারবার, কিন্তু উভয়ের প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জ্ঞান জ্ঞেয় বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করিয়া ভিতরকার সন্ধান লইয়া ফিরিয়া আসে, প্রেম কিন্তু প্রিয়বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করিয়া আর ফিরিয়া আসিতে চায় না, সেইখানেই রহিয়া যায়। স্বেচ্ছায় আপনাকে দান করিয়াই প্রেমের একমাত্র চরিতার্থতা। জ্ঞানে আমরা সত্য অর্জ্জন করি, প্রেমে আমরা আপনাকে বর্জ্জন করিয়া প্রিয় বস্তুকে লাভ করি। সুনিপুণ চিকিৎসক জ্ঞানকৌশলে রোগের মূল নির্ণয় করিয়া, ব্যবস্থা দিয়া চলিয়া যান, কিন্তু আপনাকে দিয়া অহোরাত্র সেবা শুশ্রূষায় সেই রোগকে আরোগ্যের মুখে আনিতে একমাত্র প্রেমই সক্ষম।

প্রেমের নিকট নিজ সুখ দুঃখের পরিমাপ, হিসাব নিকাশ, ক্ষতিলাভ গণনা কিছুই নাই। প্রেম আত্মহারা। পৃথিবীর অন্যান্য যাবতীয় বস্তুরই একটা বাজার দর আছে, কিন্তু প্রেমের বস্তু বিনিময়ের বস্তু নহে, অমূল্য। এই জন্য পৃথিবীতে এত ধনরত্ন ঐশ্বর্য্য থাকিতেও প্রেমিক ঐ সকলের কাহারও সহিত প্রিয় বস্তুকে উপমেয় বা পরিমেয় বলিয়া জ্ঞান করেন না, প্রিয় বস্তুর সহিত অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ পাতিয়াই প্রেমিকের একমাত্র সুখ, আনন্দ।

দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাটিকে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। রঘুবংশে আছে—লক্ষ্মণ যখন সীতাকে গর্ভাবস্থায় বনে রাখিয়া রামচন্দ্রের নিদারুণ আজ্ঞা শ্রবণ করাইলেন, তখন

অন্যান্য নানা কথার পর সীতা রামচন্দ্রের উদ্দেশে বলিতেছেন,—

> সাহং তপঃ সূর্য্যনিবিষ্টদৃষ্টিঃ
> ঊর্দ্ধং প্রসূতে শ্চরিতুং যতিষ্যে।
> ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি
> ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ॥

প্রসবের পর আমি সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া এম্‌নি তপস্যায় নিযুক্ত থাকিতে চেষ্টা করিব, যাহাতে জন্মান্তরেও পুনঃ আমি যেন তোমাকেই ভর্ত্তারূপে পাই—আর যেন বিচ্ছেদ না হয়।

রামচন্দ্রের প্রতি সীতার এই উক্তি কেবলমাত্র কবি-কল্পনা নহে। ইহা সীতার যথার্থ প্রাণের কথা। পতি-প্রাণা সতী সহস্র দুঃখতাপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেও পতি হইতে কদাপি বিযুক্ত হইবার ইচ্ছা করেন না, কেন না, পতিই সতীর প্রাণ।

রামচন্দ্রকে পতিরূপে লাভ করিয়া সীতা জীবনে যে অশেষ দুঃখ ক্লেশ লাঞ্ছনা নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এক্ষণে, সকল দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা—রামচন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও সীতা জন্মান্তরেও পুনরায় সেই রামচন্দ্রকেই পতিরূপে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন;—শুধু আকাঙ্ক্ষা নহে, তজ্জন্য দুঃসহ তপশ্চরণেও উদ্যুক্তা! ইহা অপেক্ষা প্রেমের নিঃস্বার্থপরতা ও আত্মত্যাগের মহত্তর দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে!

বিশ্বপতি ভগবানকেও ভক্ত ঠিক এইরূপ ভাবেই দর্শন করেন। ভগবানকে পাইবার জন্য ভক্ত দুঃখের বোঝার পর বোঝা মাথায় তুলিয়া লইতে প্রস্তুত, কিন্তু জীবন-বল্লভের তিলমাত্র বিচ্ছেদ তাঁহার পক্ষে অসহ্য। কেন? কি জন্য? ইহারও সেই একমাত্র কারণ,—ভগবান যে ভক্তের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, প্রিয় হইতেও প্রিয়, সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়,—জীবনের একমাত্র আনন্দ আরামস্থল।

প্রেমের এই আত্মদান হইতে আনন্দ স্বতঃই উদ্ভূত হয়। আনন্দ পাইব বলিয়া প্রেম নহে, প্রেমের অবশ্যম্ভাবী ফলই আনন্দ। বীজ ধরণীগর্ভে আপনাকে দান করে, আর কোথা হইতে রসধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া, অভিষিক্ত করিয়া, ফুল ফল ফলে তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলে!

সকল আনন্দ অপেক্ষা পরমাত্মার সহিত সংযোগ-জনিত আনন্দকে আমাদের শাস্ত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দান করিয়াছেন। ইহার সহিত পৃথিবীর আর কিছুরই তুলনা হয় না।—

> রসো বৈ সঃ। রসংহ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি॥

সেই পরমাত্মা রসস্বরূপ, তৃপ্তিহেতু। সেই রসস্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন।

এই পরব্রহ্মকে লাভ করা বা পাওয়ার একটু বিশেষ অর্থ আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রেমে আমরা আপনাকে দান করিয়া প্রিয়বস্তুকে লাভ করি। পৃথিবীর অন্যান্য যাবতীয় বস্তুকে আমরা লাভ করিলাম বলিয়া মনে করি যখন উহাদিগকে কাজে খাটাইয়া স্বীয় প্রয়োজন সাধন করিতে পারি,—উহাদিগকে আপন হইতে পৃথক্‌ভাবে গ্রহণ করি, কিছুই দান করি না। পরব্রহ্মকে লাভ করা বা পাওয়ার অর্থ—আপনাকে দিয়ে ফেলা, স্বেচ্ছায় অধীনতা স্বীকার করা, আত্মাভিমান অহঙ্কারকে নাশ করা। প্রেমের লাভ এবং আনন্দ এই দানে, এই আত্মদানে, এই স্বাধীনতা-দানে। সংসারে প্রিয়তমকে লাভ করিয়া মানবের যে তৃপ্তি, যে আনন্দ, ভগবানে সেই আনন্দের পূর্ণতা, পরিসমাপ্তি।

শাস্ত্রে ভগবানকে অতীন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। এই অতীন্দ্রিয় পদার্থকে প্রেম যে কি চক্ষে দেখে তাহা সেই জানে! দেখিবার বস্তু নহে, ছুঁইবার বস্তু নহে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিবার বস্তু নহে,—তবুও জানিয়া আনন্দ, ভাবিয়া আনন্দ, ডাকিয়া আনন্দ,—জ্ঞানে আনন্দ, ধ্যানে আনন্দ, নামে আনন্দ। প্রেমের মত এরূপ সৃষ্টি-ছাড়া ধর্ম্ম জগতে আর কিছুরই নাই। শিশুর নিকট জননীর অঞ্চলটুকুর ন্যায় প্রেমিকের নিকট পরমাত্মার সৃষ্ট কণাটুকু, অণুপরমাণুটুকু পর্য্যন্তও গন্ধে ভরা আনন্দ পরিপূর্ণ।

আনন্দই ব্রহ্ম।—

> কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো নস্যাৎ।
> এষহ্যেবানন্দয়াতি॥

কেবা শরীর চেষ্টা করিত, কেবা জীবিত থাকিত,

যদি আকাশে এই আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন। ইনিই লোক সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন।

কত না ভাবে এই আনন্দময়ের সহিত সম্বন্ধ পাতিবার মানবের চেষ্টা। পিতা, মাতা, সখা, পতি,—কত না বিচিত্র মধুর সম্বন্ধে মানব তাঁহাকে চিরকাল সম্ভাষণ করিয়া আসিতেছে। সূর্য্য কিরণে মেঘের বর্ণ বৈচিত্র্যের ন্যায় অন্তরে তাঁহার প্রকাশে কত না ভাবের লীলাচাঞ্চল্য, উদয়াস্ত পরিবর্ত্তন!—সমীরণস্পর্শে শিশিরবিন্দুর-ন্যায় তাঁহার স্মরণেও অন্তরে কত না রসের স্পন্দন!—এইজন্য বৈষ্ণব শাস্ত্রে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রসের সমাবেশ; এইজন্য বাইবেলে ভগবানের সহিত মানবের সম্বন্ধ নির্ণয়ে গল্প দৃষ্টান্ত উপমা উপদেশে, পিতাপুত্র, জননীশিশু, পতি-পত্নী, বরবধূ, সখা প্রভৃতি কত না ভাবের অবতারণা; এইজন্য গীতায় "যে যে ভাবেই আমার শরণাপন্ন হউক্ না কেন, আমি তাহাকে সেই ভাবেই আশ্রয় দিয়া থাকি।"—শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি। হাফেজ, নানক,—সর্ব্বত্রই এই ভাবপ্রকাশ, এই সম্বন্ধ স্থাপনের বৈচিত্র। কিন্তু তথাপি, এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও চিরস্থায়ী একটি আনন্দসুর নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে।

ভাব বৈচিত্রের মধ্যেও আনন্দ আছে, কিন্তু যেখানে ভাব প্রতিহত সেখানে আনন্দ কোনমতেই তিষ্ঠিতে পারেনা। অবাধ স্বচ্ছন্দ গতিই সকল আনন্দের মূল। মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাসের ন্যায় যেখানে ভাবের ধারা সহজে স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত সেইখানেই আনন্দ। প্রিয়তম ও প্রেমিক, মাঝে কোন অন্তরাল নাই, ব্যবধান নাই, অন্য কোন চিন্তার ব্যাঘাত নাই,—কেবল যেখানে ভাবের অপ্রতিহত প্রবাহ যেখানে তন্ময়তা, সেইখানেই আনন্দ। ইহাই যোগের আনন্দ, মুক্তির আনন্দ। ইহারই জন্য রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধদেব পথের ভিখারী; ইহারই জন্য প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্যদেব গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী; ইহারই জন্য শিশু-হৃদয় ভক্ত রামকৃষ্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য উদাসী;—ইহারই জন্য সারা ত্রিভুবন পাগল।

সুখ এবং আনন্দ দুই বিভিন্ন বস্তু। সুখের মধ্যে আনন্দ না থাকিতে পারে, আবার দুঃখের মধ্যেও আনন্দ থাকিতে পারে। সমুদ্র যেমন সমস্ত নদনদীর সঙ্গমস্থল, আনন্দও তেম্‌নি সমস্ত সুখদুঃখের মিলন-পরিধি। সমুদ্র যেমন সমস্ত সলিলধারাকে বক্ষে টানিয়া আপনার প্রকৃতিগত করিয়া লয়, আনন্দও তেম্‌নি সমস্ত সুখদুঃখকে অন্তরে টানিয়া মধুময় করিয়া তোলে। আনন্দের সীমা রেখায় পৌঁছিলে সুখও আনন্দময়, দুঃখও আনন্দময়,—নহিলে সুখেও আনন্দ নাই, দুঃখেও আনন্দ নাই। যে রসে শুষ্কতরু ফুল্ল ফুলফলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, যে রসে শুষ্ক-স্তন পীযূষধারায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, যে রসে শুষ্ক মরুভূমি কোমল রসাল হয়, সেই রসই আনন্দ।

আনন্দ রস পবিত্রতার রস। অন্তরে প্রবেশ করিয়া, মিশিয়া, যতক্ষণ না এই পবিত্র রসকে আস্বাদন করিতে, প্রাণে অনুভব করিতে পারা যায়, ততক্ষণ আনন্দ লাভ দুর্ঘট। এই পবিত্র রসকে গ্রহণ করি বলিয়াই সাহিত্য, সঙ্গীত শিল্পকলা প্রভৃতির পুণ্য পরিচয়ে আমরা এত অসীম আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হই। এই রসকে অন্তরে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ঋষি কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ গিরিকন্দরে, নির্ঝরে, ফুলে ফলে, তরুপল্লবে, নির্জ্জনে বনে প্রকৃতির সর্ব্বত্রই এক মহান্ আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন এবং সাহিত্যে উহাকে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এখানেও সেই প্রেমের প্রতিষ্ঠা এবং সুখ ও আনন্দের প্রকৃতিগত বৈষম্য।

যেমন প্রকৃতিতে তেম্‌নি ব্যাপ্তিতেও সুখ এবং আনন্দে বহু প্রভেদ। সুখ ক্ষুদ্রায়তন কূপের ন্যায় সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ; আনন্দ অসীম সমুদ্রের ন্যায় মুক্ত, উদার, বিস্তীর্ণ! মানবের মন স্বভাবতই পূর্ণতার প্রয়াসী—যাহা পায় তাহাকে সম্পূর্ণরূপেই পাইতে চায়। এই জন্য উপনিষদে—যোবৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি—ভূমাতেই সুখ, স্বল্প পদার্থে সুখ নাই—এই কথা বলা হইয়াছে। এখানে সুখ অর্থে আনন্দ। সংসারের সুখে প্রাণ ভরে না, আশ মিটে না,—মন তৃপ্তি পায় না, স্থিতি লাভ করে না,—সে আরও চায়, কিন্তু কি যে চায় ভাল করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারে না,—নেতি, নেতি,—ইহা নয়, ইহা নয়, বলিয়া একে একে সকলই পরিত্যাগ করিতে থাকে,—অবশেষে যতক্ষণ না সেই ভূমা

আনন্দে গিয়া পৌঁছে, ততক্ষণ তাহার ব্যাকুলতার আর শেষ থাকে না।

মূঢ় নর! আনন্দ কোথায়! আনন্দের ব্যাঘাত জানিয়া যে সকলকে ধূলিবৎ পরিত্যাগ করিয়া মহাপুরুষেরা অন্যপথে গমন করিয়াছেন, সেই অসার অনিত্য তুচ্ছের মধ্যে তুমি আনন্দ খুঁজিতেছ!—বাহ্য চাকচিক্যময় মায়ার পুতুলকে আলিঙ্গন করিয়া তুমি জননীর উৎসঙ্গের অপার আনন্দ লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছ! কাঠের কঠিন চুষিকাটি মুখে দিয়া তুমি মাতৃস্তন্য সুধারসের অমৃত আস্বাদন উপভোগ করিবার ইচ্ছা করিতেছ! হায়, ভ্রান্ত! আনন্দ উহার মধ্যে কোথায়! আনন্দ উহার মধ্যে নাই, উহার মধ্যে নাই,—বাসনার বিটপী এই বিচিত্র বসুধায় কেবল একমাত্র আনন্দগন্ধরাজ চিরকাল চির শোভায় ফুটিয়া আছেন,—তিনি নিকটে দূরে, অন্তরে বাহিরে,—গন্ধেভরা, প্রাণে ভরা,—তিনিই তৃপ্তি, তিনিই শান্তি,—তিনিই একমাত্র চিরানন্দময় ব্রহ্ম।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সিরাজ-সমাধি।

খুসবাগ, মুর্শিদাবাদ।

নিভৃত এ আম্রকুঞ্জে প'ড়ে আসে বেলা
ধীরে ধীরে; পরিতেছে তিমির-মেখলা
শ্যামাঙ্গিনী বসুমতী সরমে হেলায়,
এ আম্রকাননে আজি বেলা যায় যায়।

বেলা যায় প্রতিদিন, কিন্তু আজিকার
সন্ধ্যা যেন সুনিবিড়, ঘন অন্ধকার
আনিতেছে জগতের পূর্ব্বতীর হ'তে,
যে দিক ভাসায় নিত্য আলোকের স্রোতে
এই বসুন্ধরা; আজি এ আম্র কাননে
এ বিজনে কার কথা ভাবি আন মনে;
কাহার সুদীর্ঘ তীব্র শোক-কাহিনীতে
বাজিয়া উঠেছে মোর হৃদয় নিভৃতে
অব্যক্ত রাগিণী? গুপ্ত প্রেম-অভিসারে
কবে কেহ এসেছিল, কেমনে তাহারে
করেছিল সম্ভাষণ দম্বিত অধর,
ঢেলেছিল বাক্যসুধা, আরো মিষ্টতর
মৃদু হাসি,—এ নহে গো হীন স্মৃতি তার

এই দীন কক্ষ আর এই অন্ধকার
সিংহাসন আজি তব, রাজত্ব তোমার
হে সিরাজ! ভাবিয়াছি আহা যতবার
এই নিদারুণ কথা, গিয়াছে টুটিয়া
অজ্ঞাতে অশ্রুর বাঁধ। কাঁপিয়াছে হিয়া
ভাবিয়াছি যতবার তব বরতনু
ধূলিমুষ্টি আজি, তার অণু পরমাণু
মিশায়ে গিয়াছে আহা এই ভূমিতলে!
কতজন রচিয়াছে কল্পনার বলে
অপূর্ব্ব কাহিনী কত তব নাম ল'য়ে
বীভৎস, ভীষণ। এই নিভৃত আলয়ে
এই সমাধির পাশে হৃদয় আমার
সে নিন্দুক দলে আজি দিতেছে ধিক্কার।

ইতিহাস,—সে কি কারো বিদ্বেষপ্রসূত
কল্পনা-কাহিনী, পিতৃমাতৃহীন সুত
পরদত্ত পিণ্ড ল'য়ে করে অহঙ্কার?
কে দিয়াছে কল্পনায় হেন অধিকার
যার মুখ চেয়ে আজি করে অপলাপ
নির্ভয়ে সে সত্যের সম্মান? অভিশাপ
এক কথা, ইতিহাস তার কেহ নয়,—
সত্যের সমষ্টি সে যে, সত্য অভিনয়।

আজ তবে এ নিভৃতে বিজন সন্ধ্যায়
হে সিরাজ দেখা হোক্ তোমায় আমায়
সত্যের আলোকে; সার্দ্ধ এক শতাব্দীর
পরে যেন আজ তুমি দাঁড়াইয়া স্থির
এই দীন সমাধির সিংহাসন পরে;
আর আমি, সসম্ভ্রমে শির নত ক'রে
আছি হেথা দাঁড়াইয়া ভ্রাতা দীনতম

একান্ত তোমারি। নহ তুমি নিরমম
অধম সিরাজ, ইংরাজের মনোমত
কল্পনার ছবি; নহ পরস্ত্রীনিরত *
পাষাণে কঠিন নর, পাপ-অবতার।

লহ তবে হে সিরাজ লহ নমস্কার
এই দীন ভ্রাতা হ'তে; তোমার চরণে
দিয়াছ যতনে স্থান যে নারী-রতনে
তাঁহারেও করি নমস্কার; প্রেমময়ী
লুৎফ বেগম আজ তুচ্ছ মৃত্যুজয়ী
তোমার চরণতলে। এ সুন্দর ছবি
কে দেখিবে?—ওই দূরে অস্তমান রবি,
আর হেথা আম্র-বনে সন্ধ্যার ছায়ায়
এই নগরোপকণ্ঠে, এই নিরালয়ে
কি অপূর্ব্ব শ্মশান-মিলন! চিরদিন,
তবে চিরদিন হেথা কোলাহলহীন
অযত্নবর্দ্ধিত এই শূন্য উপবনে
থাক' ধরণীর-ধূলি-বাসর-শয়নে।

কোথায় প্রাসাদ আজি লক্ষ বর্ত্তিকায়
সুশোভিত? চাটুকার কথায় কথায়
ফেণায়ে তুলিত হা'স অর্থলেশহীন,
কোথায় সে হাসিরাশি, কোথা সেই দীন
পরভাগ্যজীবী নর? কোথা দাসদাসী
কর্ম্মহীন ব'সে ব'সে করি' হাসাহাসি
কাটাত সময় যারা, আভূমিপ্রণত
মুহুর্মুহু হ'য়ে যারা জীবনের ব্রত
সাঙ্গ করে গেছে? কোথা নর্ত্তক গায়িকা
বিলোল চাহনি-ভরা, যার আখ্যায়িকা
বিশ্ব হ'তে মুছে গেছে?

অতীতের কথা
থাক্ আজি। জেগে উঠে নিদারুণ ব্যথা
খুলিলে ও জীবনীর অন্তিম অধ্যায়।
আসিছে আঁধার রাত্তি; নিয়াছে বিদায়
দিবালোক; জ্বালি' দিয়া শিয়রে তোমার
ক্ষুদ্র দীপ, নির্ম্মিত সে তুচ্ছ মৃত্তিকায়,
প্রহরী গিয়াছে গৃহে। তবে আর আজ
কহিব না কথা; তুমি ঘুমাও সিরাজ।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* ঐতিহাসিকগণ সিরাজকে এই সকল কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিয়াছেন। জগৎ শেঠের পরিবার সংক্রান্ত ঘটনাও মুর্শিদাবাদে মিথ্যা বলিয়া স্বীকৃত।

জ্যোৎস্নায়।

রোমাঞ্চ হ'তেছে মোর হেরি' আজি এ শান্ত মাধুরী!-
—যেন এক স্বপ্ন-বিশ্ব জুড়ি'
বিচ্ছুরিত—সুধাপ্লুত, সুনির্ম্মল, তরল আহ্লাদ!
যেন শুধু এক মধু-স্বাদ
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডভরা! যেন এক বিবৃত কল্পনা
অতীত জন্মের! উন্মাদনা
যেন আজি মূর্ত্তিমান—স্বচ্ছ, এহি অপূর্ব্ব স্বরূপে!
যেন চাহি' অজ্ঞাত মধুপে
চরাচরে ফুটি' আছে একটি বিরাট্ শতদল—
সুখ-স্বপ্নে রচিত, উজ্জ্বল!
আজি যেন আমি নাই! মনে হয়—যেন কি ঝঙ্কার
উঠি'ছে এ অঙ্গে অনিবার
পরাণ-প্রমত্ত করা! যেন আজি কোন-কিছু হায়--
জানা কিম্বা বুঝা নাহি যায়!
যেন হেরিতেছি—ব্যাপ্ত সুদুঃসহ সুখ-বেদনার
দীপ্ত এক মৌন হাহাকার!

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

চিত্র-পরিচয়।

বর্ত্তমান সংখ্যায় যে নানাবর্ণে চিত্রিত সুন্দর ছবিখানি দিলাম, তাহার মূল চিত্র শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর অঙ্কিত, এবং এখন শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্পত্তি। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন। তাঁহার মহিষী গান্ধারী সতীশিরোমণি

ছিলেন। তিনি স্বামীর চক্ষু নাই বলিয়া চিরজীবন নিজেরও চক্ষু বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। স্বামী যে শক্তি, সুখ ও সুবিধা হইতে বঞ্চিত, তিনি কেমন করিয়া তাহা সম্ভোগ করিবেন? অথচ নিজেকে স্বেচ্ছায় অন্ধ করিয়াও তিনি চিত্তের প্রসন্নতা হারান নাই। শিল্পী এই নারীকুলপূজ্যা গান্ধারীর চিত্র আঁকিয়াছেন। মানবমুখে চক্ষুই সর্ব্বাপেক্ষা ভাবব্যঞ্জক। গান্ধারীর চক্ষু আবৃত থাকা সত্বেও তাঁহার মুখ ভাববিহীন পুতুলের মত হয় নাই। ইহা চিত্রকরের নৈপুণ্যের পরিচায়ক।

ভারতে পতিব্রতাধর্ম্মের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে। কিন্তু ভারতের পুরুষগণ সতীত্বের প্রতিদান সাধারণতঃ যেরূপ করিয়া আসিতেছেন, তাহা ভাবিলে লজ্জায় অবসন্ন হইতে হয়। দাম্পত্যপ্রেমের একতরফা আদর্শে কখন কোন সমাজ বা জাতি আদর্শস্থানীয় হইতে পারে না।

জাপানে ভারতীয় ছাত্রের কত ব্যয় হয়।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু :—

বিনয় নিবেদন,

গত পৌষের প্রবাসীতে "জাপানে ভারতীয় ছাত্রের কত ব্যয় হয়" মক এক প্রতিবাদ লিপি প্রকাশিত হইয়াছে। লিপিপ্রেরক তাঁহার ম প্রকাশ করেন নাই সত্য কিন্তু অনেক দিন এক সঙ্গে বাস করা হেতু মাদের মনে হইতেছে লিপিপ্রেরককে যেন আমরা চিনিতে পারিয়াছি। মরা যাঁহা কে মনে করিতেছি তাহা যদি সত্য হয় তবে তিনি আমাদের কজন বিশেষ বন্ধু, কিন্তু সত্যের খাতিরে আজ বন্ধুর প্রতিবাদের ংশিক প্রতিবাদ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। লিপিপ্ররক লিখিয়াছেন যে 'জাপানে ৭৫৲ টাকা হইতে ৮০৲ টাকায় ভারতীয় ত্রদের পোষাক পরিচ্ছদ ও পুস্তকের ব্যয় ছাড়া এক প্রকার চলে'। নি যদি ভারতীয় সকল ছাত্রের কথা না লিখিয়া ভারতীয় কোন কোন ত্রের এক প্রকার চলে লিখিতেন, তবে আমাদের প্রতিবাদের প্রতিবাদ রিবার কিছুই দরকার হইত না।

জাপানপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা য়। প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ ধনীর ছেলে, তাঁহাদিগকে ধনীর মতই থাকা কার ; তাঁহাদিগকে সময় সময় জাপানস্থ বড় বড় লোকদিগের সঙ্গে লা মেসা করা দরকার এবং সময় ও সুবিধা হইলে অবকাশ মত ান কোন ভাল ভাল স্থান বেড়াইয়া আসা দরকার। তাহাতে টাকার কার। এবং এরূপ ছেলে না থাকিলে ভারত সম্বন্ধে জাপানীদের ত্র বলিয়া খারাপ ধারণাও হ তে পারে, আর জাপানস্থ বড় বড় কদের সঙ্গে মেলা মেসা করিলে অনেক শিক্ষাও হয়। কেন না পানস্থ বড় লোক আমাদের দেশস্থ বড় লোকদের মত শুধু টাকার মানুষ নয়। টাকা ব্যয় করিয়া স্কুল কলেজে পড়াও যেমন শিক্ষার জন্য, বড় লোকদের সঙ্গে মেলা-মেসা করা কি ভাল ভাল স্থান দেখাও অন্য রকমে শিক্ষা। এরূপ ছাত্রদের পক্ষে অনুান ৮০৲ টাকার অবশ্যই দরকার, অধিক যত হয় ততই ভাল। অবশ্যই অভিভাবকদের নিজ নিজ ছেলেদের উপর বিশ্বাস রাখিতেই হইবে যে তাঁহার ছেলে অপব্যয়ে টাকা উড়াইবে না। যাঁহাদের ছেলেদের উপর সেরূপ বিশ্বাস নাই তাঁহারা তাঁহাদের ছেলেদের জন্য কি বন্দোবস্ত করিবেন তাহা তাঁহারাই ভাল জানেন। আমি অভিভাবক। নই সে বিষয়ে অনধিকার চর্চ্চা করা আমার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।

দ্বিতীয় শ্রেণী, যাঁহারা মধ্যবিধ অবস্থাপন্ন লোক তাঁহাদিগকে সব সময় বড় মানুষদের সঙ্গে মেলা মেসার আশা ত্যাগই করিতে হইবে, কেন না টাকা কম। টাকার অভাবে বড় মানুষ ইত্যাদি ও ভাল-ভাল স্থান দেখিয়া যে শিক্ষা লাভ করা যায় অনেক সময় তাঁহাদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিতই থাকিতে হইবে। এরূপ ছেলে ৫০৲ টাকায় অনায়াসে তাঁহার নিজের বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারেন। আমি যখন জাপানে ছিলাম তখন এরূপ ছাত্রই অধিকাংশ ছিলেন, আমি নিজেও তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলাম।

তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণী হইতে মিতব্যয়ী। তাঁহাদের স্কুল কলেজে যাইবার ইচ্ছা বাধ্য হইয়াই ত্যাগ করিতে হইবে। তাঁহারা কোন কারখানায় ঢুকিয়া অনায়াসেই কোন শিল্প শিখিয়া যেতে পারেন। তাঁহারা সংযত চিত্ত হইতে অর্থাৎ অন্যান্য ছেলেরা সুখ সুবিধা ভোগ করিতেছে আমি কেন করিব না এই বাসনাটা ত্যাগ করিতে পারিলেই অনায়াসে ৩০৲।৩৫৲ টাকায় বেশ চালাইতে পারেন। তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখিতে হইবে যে তাঁহাদের শুধু কারখানায় যাইবেন এবং শিল্প শিখিবেন অন্য শিক্ষা তাঁহাদের জন্য নয়। তবে যদি খুব গোছাল ছেলে হন তবে উহা হইতেই কিছু টাকা বাঁচাইয়া সময় সময় কোন কোন স্থান বেড়াইয়া আসিতে পারেন।

জাপানে হোটেলের দর।

জাপানে ৮ ইয়েন অর্থাৎ ১২৲ টাকা হইতে উপরির দিকে যত হয়, হোটেল পাওয়া যায়। আমি যে হোটেলে ছিলাম সেখানে আরও ৩।৪ জন ভারতীয় ছাত্র ছিলেন। তাহার মধ্যে কেহ কেহ ৭০৲।৮০৲ টাকা করিয়া মাসিক খরচ পাইতেন। আমাদিগকে হোটেলে ১৪ ইয়েন, অর্থাৎ ২১৷৹ টাকা করিয়া মাসিক দিতে হইত। আমাদের হোটেলের নিকট অন্য এক হোটেলে আরও ২জন ভারতীয় ছাত্র ছিলেন। তাঁহাদিগকে মাসিক ১২ ইয়েন অর্থাৎ ১৮৲ টাকা করিয়া দিতে হইত। ৮ ইয়েনের অর্থাৎ ১২৲ টাকার হোটেলেও ২।৩ জন ভারতীয় ছাত্র ছিলেন। এই যে ৮ ইয়েন ১২ ইয়েন বা ১৪ ইয়েন মাসিক হোটেলে দেওয়া হয় ইহার মধ্যেই সব পাওয়া যাইবে অর্থাৎ ভাল দোতালায় একজনের একটি ঘর, বৈদ্যুতিক আলো, তিন বেলা খাবার, একদিন অন্তর, কোন স্থানে বা প্রত্যহ, স্নান। চাকর চাকরাণী সব। অবশ্য খাদ্য সবই জাপানি ধরণের, কিছুদিন অভ্যাসের পর শেষে হয় ত অভ্যস্থ হয়ে যেতে পারে। টোকিওতে ইণ্ডিয়া হাউস নামে ভারতীয় ছাত্রদের এক বাড়ী আছে, আমি যখন জাপানে ছিলাম তখন দেখিয়াছি সেখানে মাসিক ১৬।১৭ ইয়েন অর্থাৎ ২৪।২৫৷৹ টাকা খরচ পড়িত ; আজ কাল তাঁহারা কত ব্যয় করেন অবশ্যই তাহা জানি না। এই হ'ল থাকা খাওয়ার খরচ। ইহা ছাড়া ট্রাম ভাড়া ও অন্যান্য আরও খরচ আছে। সে সমস্ত বাহিরের খরচ যদি নিজ নিজ অবস্থা অনুসারে বুঝিয়া খরচ করা হয় তবে বোধ হয় কাহাকেও অসুবিধায় পড়িতে হয় না। আর একটী কথা বলিয়াই আমার লিপি শেষ করিতেছি, তাহা এই :— মিতব্যয়ী ছাত্রগণ যত জাপানী বন্ধু কম করিতে পারেন ততই তাঁহাদের

পক্ষে মঙ্গল, নতুবা হোটেলের বিল মাসের শেষে দেখিবেন যে প্রায় ডবল লম্বা ও ডবল টাকার অঙ্ক বুকে ধারণ করিয়া চাকরাণীর হস্তস্থিত রেকাবে চড়িয়া আপনার ঘরে হাজীর। যখন চাকরাণীকে মোট টাকার অঙ্কের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন * তখন যখন সে তাহার সঙ্গিনীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া (বিল লইয়া প্রায়ই দুজন চাকরাণী আসে) ১৪ ইয়েনএর স্থানে নিজু গো (২৫) নিজু রকু (২৬) ইয়েন হাঁকিবে, তখনই মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ইওরসি (আচ্ছা বেশ) বলিয়া আরাম কেদারায় শুয়ে পড়িতে হইবে। তাই বলিতে ইচ্ছা হইতেছে যে মিতব্যয়ী ছাত্রগণ পুর্ব্বেই যেন সে বিষয়ে সাবধান হন। বন্ধু বাড়ী এলে তাহাকে খাওয়ান ইহাই জাপানের রীতি। জাপানে স্বাবলম্বন চলে না, কোন কোন ছেলে প্রায় স্বাবলম্বী হয়ে জাপানে এসে, অনেক সময় অপরাপর ভারতী ছাত্রদিগকে অনেক অসুবিধায় ফেলিয়াছেন। সত্য বটে তাঁহাদের যদি মাসিক ৩০৲।৩৫৲ টাকাও আয় হইত তবে কাহারও দরজায় তাঁহাদিগকে যেতে হ'ত না।

* বিল, জাপানীতে লেখা থাকে।

সত্যের খাতিরে বন্ধুর প্রতিবাদ লিপির কিছু আংশিক প্রতিবাদ করিলাম; অনুগ্রহ করিয়া আপনার সুবিখ্যাত প্রবাসীতে যদি কিঞ্চিৎ স্থান দান করেন, আশা করি তাহাতে সত্য প্রচারিত হইবে।

বিনীত

শ্রীঅনাথবন্ধু সরকার।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু সরকার মহাশয় জাপানের খরচ সম্বন্ধে যাহা লিখিতেছেন উহার সত্যতা আমরা জাপানে অবস্থান করিয়া সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিয়াছি।

California University,
Berkeley, California,
U. S. A.

শ্রীনিরুপমচন্দ্র গুহ।
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র নাগ।
শ্রীজ্যোতীশচন্দ্র দাস।
B. D. Pande.
শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ গুহ।
শ্রীরাইমোহন দত্ত।

ভারতে বৌদ্ধ প্রভাবের শক্তি।

প্রীতিভাজনেষু

প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত সখারাম দেউস্কর আমার লিখিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন—সমস্তই ঠিক্। আমাদের দেশের ঐতিহাসিক রহস্য উঁহার ন্যায় যোগ্য ব্যক্তিগণের লেখনী হইতে সুসংস্কৃত হইয়া বাহির হইলে অনেকের অনেকপ্রকার ধন্দ মিটিয়া যাইতে পারে। উঁহার প্রদর্শিত ঐতিহাসিক বিবরণের বিরুদ্ধে আমার কোনো কথা বলিবার নাই। আমার বক্তব্য কথাটার প্রকৃত মর্ম্ম যাহা, তাহা অল্পের মধ্যে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইলে অনেকগুলা আনুসঙ্গিক বিষয় বাদ-সাদ দিয়া মোটের উপরে বলা ভিন্ন সব কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খুঁটাইয়া বলা আমা দ্বারা ঘটিয়া ওঠা অসম্ভব। বৌদ্ধধর্ম্মের উন্মূলনের পরে যখন ব্রাহ্মণপ্রধান ক্রিয়াকর্ম্ম আমাদের দেশে পুনর্ব্বার গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছিল, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব তাহার ভিতরে ভিতরে কার্য্য করিয়াছিল ইহা অতিশয় স্পষ্ট। এমন কি—বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের গোস্বামী পণ্ডিতেরা ভাবে গতিকে সহজে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, শঙ্করাচার্য্যের মত "প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধ মেব তৎ।" তা ছাড়া, ভবভূতি প্রভৃতি কবিদিগের গ্রন্থের পাতায় পাতায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব জানান্ দিতে ছাড়ে নাই। তা শুধু না—আমাদের দেশের অনেকানেক অবৈদিক রীতি পদ্ধতি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব দ্বারা ওতপ্রোত। এগুলিকেও আমি মোটামুটি হিসাবে বৌদ্ধের কোটায় নিক্ষেপ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি এবং এখনো বলিতেছি যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভিতরে স্বাধীন উদ্যমশীলতার ভাব একটি যাহা আছে, তাহা আমাদের দেশের মধ্যমাব্দীর বিজ্ঞানদর্শনাদির মূল প্রবর্ত্তক। অর্থাৎ আমি বলিতে চাই এই যে, বৌদ্ধধর্ম্ম গোড়ায়—প্রচ্ছন্ন ভাবেই হোক্ আর স্পষ্ট ভাবেই হোক্ কার্য্য না করিলে স্বাধীন চিন্তার স্রোত আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হইতে পারিত না। দুঃখের বিষয় এই যে, সে স্রোত জনসাধারণের ভোগে আসিতে না আসিতেই ভগীরথের অবতারেরা তাহাকে উল্টাপথে ফিরাইয়া দিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অন্তিম দশা এবং ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতির অভ্যুদয় দশার মাঝখানের কালাংশটুকু দেউস্কর মহাশয়ের ন্যায় ইতিহাসবেত্তাদিগের নিকটে দীর্ঘ বলিয়া মনে হইবারই কথা; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাহা বৌদ্ধ আমলেরই একপ্রকার পরিশিষ্ট বা লেজুড়। ফুল উন্মূলিত হইবার পরে ফুলের গন্ধ কিছুকাল ধরিয়া টেঁকিয়া ছিল—কিন্তু বিনা অবলম্বনে তাহা কতকাল টেঁকিয়া থাকিতে পারে? তার সাক্ষী—আমাদের দেশের দৈবজ্ঞদিগের মধ্যে কেবা জানে ভাস্করাচার্য্য, কেবা জানে আর্য্যভট্ট। সকলেই জানে পৃথিবী ত্রিকোণ, এবং চন্দ্রগ্রহণ রাহুর নষ্টামি। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব আপনাআপনি যত কাল টেঁকিয়াছিল—ছিল; কিন্তু সে প্রভাবের প্রতিরোধ করিয়া শাস্ত্রীয় শৃঙ্খল পরিধান করিতে হইবে—স্বাধীন চিন্তাকে মাথা তুলিতে দেওয়া হইবে না, নীচের জাতিকে নীচে দাবিয়া রাখিতে হইবে—উচ্চ জাতিকে স্বর্গে তুলিতে হইবে নিম্ন শ্রেণীর শাস্ত্রকারদিগের এই যে একটা ভূতগত সংকল্প, এই দুর্দান্ত সংকল্পটার কোপে পড়িয়া আমাদের দেশে ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রতিভাশালী পণ্ডিতগণের সমস্ত উদ্যম অধ্যবসায় ভণ্ডুল হইয়া গেল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব যতকাল জীবিত ছিল, ততকাল বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়াও বিনষ্ট হয় নাই—কিন্তু তাহার পরে যখন জনসাধারণের মধ্যে তাহার নাম গন্ধও রহিল না, তখন আমাদের দেশের অন্তঃকরণরাজ্য পরাধীনতা শৃঙ্খলে এরূপ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া পড়িল যে, এখনো পর্য্যন্ত আমাদের মনে পায়ে হাঁটিবার বল পৌঁছিতেছে না। আমাদের মনের যখন এইরূপ অবস্থা তখন আমাদের দেশ যে পরাধীন হইবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

শান্তি—শ্রীরজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ডিমাই দ্বাদশাংশতি ১৭ পৃষ্ঠা। মূল্য এক আনা। "ক্ষুদ্র পদ্য-কাব্য"। গ্রন্থকারের বক্তব্য একতাতেই শান্তি। বঙ্গের সমস্ত সন্তান একতাবদ্ধ হইলে দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইবে। এই সামান্য বক্তব্য ফেনাইয়া দীর্ঘ করা হইয়াছে। পদ্যে প্রবাহ আছে, স্থানে স্থানে কবিত্বও আছে, কিন্তু ভাবুকতা কুত্রাপি নাই। গ্রন্থকার অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত।

জাপানী ফানুস—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় বিরচিত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। রয়াল ষোড়শাংশিত ৮৫ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা মাত্র। কতকগুলি জাপানী উপকথার আখ্যান অবলম্বন করিয়া নিজের ভাবে কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ইহার রচনায় মণিবাবু সবিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ইহার বর্ণনার ভঙ্গী, শব্দের ঝঙ্কার ও লালিত্য, বর্ণচিত্র প্রভৃতি বহু গুণ এক অবনীন্দ্র বাবুর

রচনা ছাড়া আর কাহারো লেখাতে দেখি নাই। ইহা পাঠ করিয়া ছেলেরা হাসিবে, প্রীত হইবে, কিছু শিখিবে, চিন্তা করিবার মতও কিছু পাইবে। আধুনিক অনেক শিশুপাঠ্য পুস্তক শুধু বাচালতা ও লঘুতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে; আনন্দের সঙ্গে শিক্ষার আয়োজন, ও চিন্তার উপকরণ খুব অল্প পুস্তকেই দেখা যায়। মণিলাল বাবু সেই গতানুগতিক পথ ছাড়িয়া নূতন পথে দাঁড়াইয়াছেন ও তাঁহার প্রথম প্রয়াস জয়যুক্ত হইয়াছে। নবীন গ্রন্থকারের নিকট আমরা সুন্দরতর শিশুপাঠ্য পুস্তক আশা করিতেছি। এই পুস্তক শিশুদের পিতামাতাকেও কবিত্ব ও ভাবের রসদ জোগাইবে। দশখানি সুন্দর সুমুদ্রিত হাফটোন চিত্রে মণ্ডিত হইয়া পুস্তকখানি অধিকতর উপভোগ্য হইয়াছে। স্বদেশী এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা। মলাটের পরিকল্পনাটিও দৃষ্টিরঞ্জক। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত।

আমার গ্রন্থাবলী—শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত প্রণীত। নব্যভারত প্রেস হইতে প্রকাশিত। "আমার গ্রন্থাবলী" বলিলে পাঠককে প্যারী বাবুর গ্রন্থাবলী বুঝিতে হইবে। "আমার গ্রন্থাবলীর" মধ্যে আমরা প্যারী বাবুর নিম্নলিখিত বইগুলি অন্তর্ভুক্ত করিতেছি; (১) রত্নাকর—বাল্মীকির জীবনবৃত্তান্ত। মূল্য চারি আনা। (২) মহারাণা প্রতাপসিংহ। পদ্যে লেখা। মূল্য ছয় আনা। (৩) গার্গী—ব্রহ্মবাদিনী তপস্বিনীর বৃত্তান্ত। মূল্য তিন আনা। (৪) ধ্রুবের উপাখ্যান। মূল্য চারি আনা। (৫) আর্য্য-বিধবা বিধবা রমণীর আদর্শ, কর্ত্তব্য, সংযম, নিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি বিষয়ক। মূল্য তিন আনা। গ্রন্থগুলি সুলিখিত নীতিপূর্ণ। স্ত্রীপাঠ্য হইবার সর্ব্বাংশে উপযুক্ত। 'আর্য্য-বিধবা' বিধবাদের পাঠ করা উচিত। কিন্তু গ্রন্থগুলির রচনা সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। পৌরাণিক উপাখ্যানের সহিত স্বীয় কল্পনা মিশাইয়া যে ঔপন্যাসিক ভাব গ্রন্থগুলিতে দেওয়া হইয়াছে তাহা আমাদের ভালো লাগে নাই। কেবল উপাখ্যানটির বর্ণনা উপলক্ষে বর্ণিত চরিত্রের বিশেষত্ব, শিক্ষা ও নীতি পরিস্ফুট করিয়া দিলেই সুন্দর ও উপযোগী হইত। গ্রন্থগুলির মুদ্রণ ও সৌষ্ঠব মনোহর হয় নাই।

রেণু—শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। এই সর্ব্বজন সমাদৃত কবিতা পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। আমাদের দেশে কবিতা পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়াই তাহার লোকানুরঞ্জনের প্রকৃষ্ট পরিচয়। ছোট ছোট অনেকগুলি কবিতা ইহাতে একত্রিত হইয়াছে, তাই ইহার নাম রেণু। কিন্তু কবিতাগুলি ভাবে-মাধুর্য্যে-সৌন্দর্য্যে স্বর্ণরেণুর মত উজ্জ্বল। ভাষা সুমার্জ্জিত,—বক্তব্য বাহুল্যবর্জ্জিত। ছন্দে প্রবাহ আছে। অল্প অবসরের মধ্যে কোনো একটি ভাবকে সম্পূর্ণ ফুটাইয়া তোলা বড় কঠিন। সে কঠিন কর্ম্মে গ্রন্থকর্ত্রী সিদ্ধহস্ত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ছাপা কাগজ বাঁধাও ভালো। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

বঙ্গে ম্যালেরিয়া—শ্রীরাজকৃষ্ণ মণ্ডল প্রণীত। ডিমাই দ্বাদশাংশিত ... পৃষ্ঠা। মূল্য দশ আনা। ইহাতে গ্রন্থকারের নিজ অভিজ্ঞতায় ম্যালেরিয়ার কারণ ও প্রতিকার যাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ নহেন। ইহাতে অভিজ্ঞতালব্ধ তত্ত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কৌতুহলী পাঠক ও বিশেষজ্ঞেরা ইহার আলোচনা ও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

বৈশ্য-তত্ত্ব—অর্থাৎ গোপ ও সদ্গোপ জাতির বৈশ্যত্বের প্রমাণ ও লুপ্ত ইতিবৃত্ত। শ্রীগিরিশচন্দ্র ভাট মজুমদার ও শ্রীরজনীকান্ত ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত ও চাঁদপুর বৈশ্য সদ্গোপ সমিতি হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। বেদ, পুরাণ, সংহিতা, ইতিহাস হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে সদ্গোপ বৈশ্যবর্ণ। ঠিক্ই হইয়াছে। ইঁহারা আকৃতিতে অনার্য্য নহেন, শিক্ষার আর্য্যত্ব পাইলে কেহই ইঁহাদের উন্নতির পথ রুদ্ধ করিতে পারিবে না। দেশের সকল জাতির যে শুদ্ধ উন্নত হইবার প্রচেষ্টা জাগিয়াছে, ইহা আশাপ্রদ। সকলেই সামাজিক অধিকার যোগ্যতার দ্বারা বুঝিয়া লইতে পারিলে শাস্ত্রের দোহাই আবশ্যক হইবে না। আর যোগ্যতা যদি না লাভ হয়, শাস্ত্র কাহাকেও বড় করিতে পারে না। যোগ্যতা লাভের একমাত্র উপায় শিক্ষার বিস্তার। শিক্ষায় যোগ্যতা জোগায়, যোগ্যতায় সামাজিক অধিকার আপনি আয়ত্ত হয়। জ্ঞানে, চরিত্রে শুদ্ধ না হইলে শাস্ত্রের শুচিতার দোহাই নিরর্থক, পণ্ডশ্রম। ইহাই বুঝিয়া প্রতিষ্ঠার উপায় নির্দ্ধারণ করা উচিত, কেবল শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নহে। আমরা জানিয়া আশান্বিত হইয়াছি যে যাঁহাদের চেষ্টায় এই পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহারা উল্লিখিত সর্ব্ববিধ উপায়ই অবলম্বন করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত। সিটিবুক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত ভারতগৌরব গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত অন্যতম গ্রন্থ। ফুলস্কাপ অষ্টাংশিত ১১৬ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ আনা। ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী নহে—প্রতিভা ও মত বিশ্লেষণ। বিশ্লেষণ সুচারু হইয়াছে। ভাষা কবিত্বময় ও সুন্দর প্রবাহশীল। কিন্তু এক পর্য্যায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন পুস্তকের মধ্যে রচনাভঙ্গীর ঐক্য রক্ষিত হইতেছে না। ইহাতে কবিত্ব বিশ্লেষণ এমন গুরুভাবে হইয়াছে যে এই পর্য্যায়ের অপরগ্রন্থ যে সকল বালকে বুঝিবে ইহা তাহাদের পক্ষে নিতান্ত গুরুপাক হইবে। ইহা বয়স্কের উপভোগ্য, চিন্তাশীলের আলোচ্য হইয়াছে। কিন্তু বোধ হয় এই গ্রন্থাবলী বালকদিগের জন্যই রচিত হইতেছে।

শরশয্যা—প্রণেতা শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি, এল। প্রকাশক শ্রীউমেশচন্দ্র গুহ খাসনবিস। ক্রাউন অষ্টাংশিত ৪৩৮+২+জ+।৵০ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা বারো আনা। এখানি কাব্য, বোধ হয় মহাকাব্য। অষ্টাদশ সর্গে বিরচিত। অষ্টাদশ সর্গ লিখিয়াও গ্রন্থকারের তৃপ্তি হয় নাই, এক প্রকাণ্ড পরিশিষ্ট সংযোজিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া আরো বহুবিধ উপসর্গ ইহাতে আছে। সপ্তপৃষ্ঠাব্যাপী শুদ্ধিপত্রকেও আবার সংশোধন করিতে হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আপাতদৃষ্টিতে ছাপা কাগজ মন্দ নহে। সান্যাল প্রেসে ছাপা। এই কর্ম্মবহুলতার যুগে এত বড় দীর্ঘ কাব্য পড়িবার অবসর খুব অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে। এই জন্য বর্ত্তমান যুগে গীতিকবিতার একাধিপত্য। মানবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনস্তত্ত্ব গীতিকবিতার বিষয়; মহাকাব্যের বিষয় দীর্ঘ ঘটনাপরম্পরা। এই কাব্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্মদেবের শরশয্যায় উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, নানা ছন্দে সর্গগুলি বিরচিত। ভাবে ভাষায় ছন্দে বর্ণনায় বিশেষত্ব নাই। বহুস্থানে স্বরচিত শব্দ সম্প্রসারণ ও অপ্রচলিত শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহাই হউক গ্রন্থকারের অধ্যবসায় প্রশংসনীয়।

আত্মবিজ্ঞান—শ্রীতারকচন্দ্র দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত (২৮ এণ্টনি বাগান লেন) কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ক্রাউন অষ্টাংশিত ৩৬২ পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা। ইহাতে বেদান্ত মতে আত্মতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। এরূপ দার্শনিক গ্রন্থ বাঙ্গলায় বিরল, অধিকন্তু গ্রন্থকার বেদান্তমতের সহিত য়ুরোপীয় দার্শনিক মত তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার সকল প্রচলিত মত নিরপেক্ষ হইয়া তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। এই স্বাধীনতা অবলম্বনে তাঁহার সিদ্ধান্ত হয় ত অনেকের মতানৈক্য ঘটিতে পারে। কিন্তু তথাপি ইহা যে গতানুগতিক পথ হইতে স্বতন্ত্র এই জন্যই ইহা দার্শনিক ছাত্রের নিকট সমাদৃত হইবে। গ্রন্থমধ্যে বহু জটিল তত্ত্ব সরলভাবে মীমাংসা করিবার চেষ্টা হইয়াছে। গ্রন্থের সূচী ও বিবরণী খুব উপাদেয় হইয়াছে।

ধর্ম্মসমাজ ও স্বাধীনচিন্তা—শ্রীবনমালী বেদান্ততীর্থ, এম, এ, বিবৃত। গীতা সভার প্রকাশিত পুস্তকাবলীর অন্যতম পুস্তক। ডিমাই দ্বাদশাংশিত ৭১ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন আনা। ইহাতে শাস্ত্রপ্রমাণ সহযোগে ধর্ম্ম, সমাজ ও স্বাধীন চিন্তা কি এবং কিরূপ হওয়া উচিত। তাহারই আলোচনা হইয়াছে। গ্রন্থকার ইহাতে স্বাধীনচিন্তা, কুসংস্কারবিরোধিতা, অভ্যস্ত আচার অপেক্ষা বুদ্ধিমূলক অনুষ্ঠানের সপক্ষতা প্রভৃতির পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে বহু দার্শনিক তত্ত্বের সহিত হিন্দুর জাতিভেদ, স্ত্রীজাতির অবস্থা, বিধবা ও কুলীনকন্যার অবস্থা, আরাধনা বা উপাসনা, ইংরাজী শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার মনীষার পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থকার আপনার শিক্ষার সার্থকতা দেখাইয়াছেন। এই পুস্তক আমরা সকল হিন্দু নরনারীকে ভাল করিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পরীক্ষা—শ্রীরূপচন্দ্র ভাগবতীরদ্বারা রচিত। মূল্য চারি আনা। এখানি নাটক। আসামী প্রাদেশিক ভাষায় রচিত। আসামী বাংলারই উপভাষা। ইংরাজ স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইহা বাংলা হইতে স্বতন্ত্র করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন; আর আমরাও এমনি নির্বোধ যে অমনি আমরা নিজেরাই প্রাদেশিক ভাষাকে প্রাধান্য দিয়া standard বাংলা ভাষা হইতে পৃথক হইয়া পড়িতেছি। ইহাতে বাঙ্গলা ভাষারও লোকসান, নিজেদেরও সমূহ ক্ষতি, ইচ্ছা করিয়া বঞ্চিত হওয়া। Standard বাংলা ভাষা হইতে চট্টগ্রাম নোয়াখালির প্রাদেশিক ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যদি নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি কবিগণ প্রাদেশিক ভাষায় কাব্য রচনা করিতেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আজ কয়জন চিনিত। আসামী ভাষাও উচ্চারণ বৈষম্যে standard বাংলা হইতে পৃথক। এই বৈষম্য ত্যাগ করিয়া সুমহতী একতার প্রতি আসামবাসীদের আকর্ষণ নাই, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। সমালোচ্য গ্রন্থে অর্জ্জুনের সংযম পরীক্ষা বিবৃত হইয়াছে। অর্জ্জুন জ্ঞানসাহায্যে ইন্দ্রিয়ের প্রলোভন জয় করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন ইহাই বক্তব্য। ইহাতে নাটকত্ব কিছু নাই। কিন্তু বহুস্থানে কবিত্বের পরিচয় আছে। আসামী ভাষা বাংলার কতদূর অনুরূপ তাহা বুঝাইবার জন্য দুই পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"সখি; সংসারর
অনন্ত যৌবন, বিশ্বে অনন্ত আনন্দ,
তারো আগে এনে অহঙ্কার!"

হিন্দী বাঙ্গালা বর্ণ শিক্ষা—শ্রীরাধাচরণ গোস্বামীদ্বারা সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। নাগরী প্রচারক এণ্ড কোম্পানি, বৃন্দাবনে পাওয়া যায়। ডিমাই অষ্টাংশিত ১১ পৃষ্ঠা। মূল্য এক আনা। বাঙালীর হিন্দি শিক্ষার উপযোগী পুস্তক। বাংলা শব্দ বা পদের হিন্দি অনুবাদ দিয়া উভয় ভাষার রীতি দেখানো হইয়াছে।

সংস্কৃত প্রবেশিকা—গুরুকুল বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৵০ আনা, ইহাতে সংস্কৃত শিক্ষার্থীর কয়েকটি প্রাথমিক পাঠ আছে। প্রশ্ন উপদেশ প্রভৃতিও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, এ পুস্তক পাঠ করিতে হইলে নিতান্তই গুরুনির্ভর হইতে হয়।

বালকথানীতিমালা—গুরুকুল বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত সংস্কৃত পাঠ। পঞ্চতন্ত্র হইতে সংগৃহীত আখ্যান সহজ সংস্কৃতে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থশেষে কঠিন বাক্যের শব্দার্থ সূচী দেওয়া হইয়াছে। বিদ্যালয়পাঠ্য হইবার উপযোগী।

Harinabhi past and present—অমূল্যচরণ ভট্টাচার্য্য ও অন্নদা প্রসাদ ঘোষ কর্ত্তৃক বিবৃত। ক্রাউন অষ্টাংশিত ১৬ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই আনা। ইহাতে হরিনাভি গ্রামের পুরাতত্ত্ব ও বর্ত্তমান অবস্থা আলোচিত হইয়াছে।

Essays and Letters, parts I and II—By A. G. Banerji, published by S. C. Auddy & Co. ইহাতে প্রবন্ধ ও পত্র রচনার নমুনা, পদ্ধতি ও সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে। ছাত্রদের উপযোগী। ছাপা পরিষ্কার। ইংরাজী ও বিষয়নির্ব্বাচন ভাল। মূল্য দুইভাগের ছয় আনা ও আট আনা।

ভুতুড়ে কাণ্ড—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ছয় আনা। দ্বিতীয় সংস্করণ। তিন মাসের মধ্যে যে পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে তাহার অধিক পরিচয় অনাবশ্যক। দ্বিতীয় সংস্করণে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছে। ইহাতে সম্মোহনতত্ত্ব, পারলৌকিক তত্ত্ব, ইত্যাদির কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

মুদ্রা-রাক্ষস।

ভ্রমসংশোধন।

গত ফাল্গুন মাসের "প্রবাসীতে" প্রকাশিত "বৌদ্ধযুগ ও ভাস্করাচার্য্য" শীর্ষক প্রবন্ধে, ৬৩৬ পৃষ্ঠায় কয়েক স্থলেই লিপিকর প্রমাদবশে "১০৩৬ শকাব্দের" পরিবর্ত্তে "১৩০৬ শকাব্দে" এবং "১৩৭৫ শকাব্দের পরিবর্ত্তে" "১০৭৫ শকাব্দে" মুদ্রিত হইয়াছে।

৬১, ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।